সীরাত বিশ্বকোষ

(নবম খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
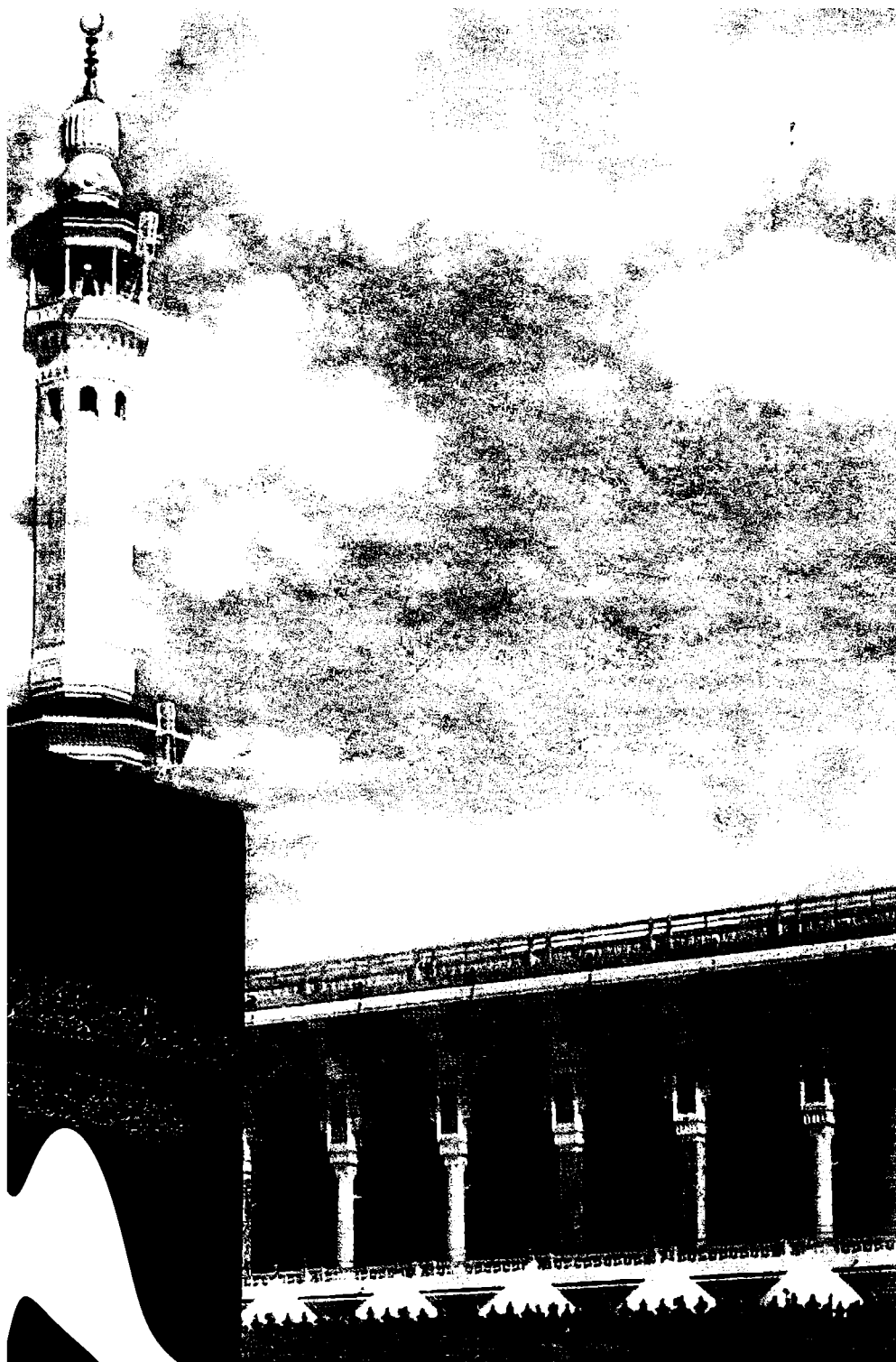
موسوعة سير الانبياء
باللغة البنغالية
المجلد التاسع

সীরাত বিশ্বকোষ

(নবম খণ্ড)

হযরত মুহাম্মাদ (স)

[SIRAT AL-NABI AND THE ORIENTALISTS (Vol. I-B)
-এর বঙ্গানুবাদ]

মুহাম্মদ মোহর আলী
পি.এইচ.ডি. (লন্ডন); ব্যারিস্টার এট ল'
অধ্যাপক ঃ ইসলামের ইতিহাস
সেন্টার ফর দি সার্ভিস অব সুন্নাহ এন্ড সীরাহ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মুনাওয়ারা
ভূতপূর্ব অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

সীরাত বিশ্বকোষ (নবম খণ্ড)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ ৫৩৬
ইসলামী প্রকাশনা কার্যক্রম
প্রকল্পের আওতায় অনূদিত ও প্রকাশিত

প্রকাশকাল
পৌষ ১৪১১
শাওয়াল ১৪২৫
সেপ্টেম্বর ২০০৪
ইবিবি প্রকাশনা ঃ ৪৪
ইফাবা প্রকাশনা ঃ ২৩০৯
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ২৯৭-২৪
ISBN ঃ 984-06-0973-4

বিষয় ঃ জীবন চরিত
আম্বিয়া (আ) ও সাহাবা-ই কিরাম (রা)

প্রকাশক
আবূ সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী
পরিচালক
ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মুকাররম, ঢাকা-১০০০

কম্পিউটার কম্পোজ
মডার্ণ কম্পিউটার প্রিন্টার্স
২০৫, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০।

মুদ্রণ ও বাঁধাই
আল আমিন প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স
৮৫, শরৎগুপ্ত রোড, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ৩৫০.০০

SIRAT BISHWAKOSH : The Encyclopaedia of Sirah in Bengali, 9th vol. by Dr. Mohammad Mohar Ali (Bar at-Law) and Published by A.S.M. Omar Ali on behalf of the Islamic Foundation Bangladesh under the Encyclopaedia of Sirat Project. September 2004

Price Tk. 350.00
U$: 15.00

সম্পাদনা

অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান

ড. এ. এইচ. এম. মুজতবা হোছাইন

অনুবাদকবৃন্দ

আফতাব হোসেন

আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন

হাসান আবদুল কাইয়্যুম

মোহাম্মদ আবু তাহের

সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

মোঃ আবুল কাসাম আজাদ

সূচীপত্র

বাইশতম অধ্যায়

তেইশতম অধ্যায়

চব্বিশতম অধ্যায়

ষষ্ঠ ভাগ

পঁচিশতম অধ্যায়

ছাব্বিশতম অধ্যায়

সাতাশতম অধ্যায়

আটাশতম অধ্যায়

ঊনত্রিশতম অধ্যায়

তিরিশতম অধ্যায়

একত্রিশতম অধ্যায়

বত্রিশতম অধ্যায়

তেত্রিশতম অধ্যায়

চৌত্রিশতম অধ্যায়

সপ্তম ভাগ

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

ছত্রিশতম অধ্যায়

সাঁইত্রিশতম অধ্যায়

আমাদের কথা

আলহামদু লিল্লাহ। যাঁহার অসীম রহমত ও তৌফীকে সীরাত বিশ্বকোষ ৯ম খণ্ড আজ আমরা পাঠকের হাতে তুলিয়া দিতে পারিতেছি সেই মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো কোটি শুকরিয়া জানাই। অসংখ্য দরূদ ও সালাম আখেরী নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি, বিশ্ব মানবতার কল্যাণ ও শান্তির জন্যই যিনি প্রেরিত হইয়াছিলেন।

আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রিয় সৃষ্টি মানবজাতিকে তাহাদের পদস্খলন ও অধপতন হইতে উদ্ধার করিয়া উভয় জগতের শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবার জন্য যুগে যুগে তাঁহারই মনোনীত একদল আদর্শবান, নিষ্পাপ ও নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী মানুষ প্রেরণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নবী-রাসূল নামে খ্যাত ও পরিচিত।

আল্লাহ প্রদত্ত বিধান তথা তাঁহাদের আনীত শিক্ষামালার পরিপূর্ণ স্ফুরণ ঘটিয়াছিল তাঁহাদের জীবন ও কর্মে। হযরত রাসূলে করীম (স) শেষ নবী। তাঁহার পর আর কোন নবী বা রাসূল আগমন করিবেন না। তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা উত্তম আদর্শরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ۔

"তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রহিয়াছে উত্তম আদর্শ" (৩৩ ঃ ২১)।

তাই অধঃপতিত ও পথভ্রষ্ট মানুষের সঠিক পথ শান্তির পথ প্রাপ্তির জন্য তাঁহাকে অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন। আর সেইজন্য প্রয়োজন তাঁহার জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। সেই লক্ষ্য সামনে রাখিয়াই আমাদের এই পদক্ষেপ। পূর্বে প্রকাশিত খণ্ডগুলির মধ্যে প্রথম ৩টি খণ্ড ছিল হযরত আদম (আ) হইতে হযরত ঈসা (আ) পর্যন্ত প্রেরিত নবী-রাসূলগণের জীবন চরিত সম্পর্কিত। ৪র্থ খণ্ড হইতে শুরু হয় সর্বযুগের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব ও সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর জীবনচরিত।

৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও বর্তমান ৯ম খণ্ডটি তাহারই ধারাবাহিকতা। তবে এই খণ্ডটি মূলত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ড. মুহাম্মদ মোহর আলী কর্তৃক দুই খণ্ডে রচিত Sirat Al-Nabi And The Orientalist গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের অনুবাদ।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ইয়াহূদী-খৃস্টান পণ্ডিতবর্গ নিতান্ত বিদ্বেষপ্রসূত হইয়া যুগে যুগে মহামানব হযরত রাসূলে কারীম (স)-এর চরিত্র হননের অপচেষ্টা চালাইয়াছে। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁহার সুউন্নত চরিত্রের সাক্ষ্য দিয়া বলিয়াছেন ঃ

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ "তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত" (৬৮ ঃ ৪)।

নির্জলা মিথ্যা, মনগড়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও স্বকপোল-কল্পিত অপবাদ দিয়া তাহারা তাঁহার সেই 'মহান চরিত্রে' কলুষতার ছাপ দেওয়ার অপপ্রয়াস চালাইয়াছে। উইলিয়াম মূইর, ডি.এস. মারগোলিয়থ ও ডব্লিউ. মন্টগোমারী ওয়াট প্রমুখ পণ্ডিত ইংরেজী ভাষায় তাহাদের এইসব চিন্তাধারা তুলিয়া ধরিয়াছেন। ড. এম. মোহর আলী উল্লিখিত পুস্তক রচনার মাধ্যমে সেইসব অপচেষ্টার যথোচিত জওয়াব দিয়াছেন যাহা দুই খণ্ডে মদীনা মুনাওয়ারা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাংলাভাষী পাঠকদের তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর পক্ষ হইতে উক্ত গ্রন্থ অনুবাদ করাইয়া প্রকাশ করা হইল। এতদ্ব্যতীত রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবন ও কর্মের উপর আরও তিনটি খণ্ড এবং সাহাবায়ে কিরামের জীবনীর উপর আরও দশটি খণ্ড প্রণয়নের পকিল্পনা সামনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইতেছি। এই মহতী প্রয়াস যাহাতে সাফল্যমণ্ডিত হয় সেজন্য আমরা আমাদের সম্মানিত পাঠক সমীপে আন্তরিক দু'আ ও মুনাজাতের বিনীত অনুরোধ করিতেছি।

সীরাত বিশ্বকোষ ৮-ম ও ৯ম খণ্ডের মূল গ্রন্থকার জনাব ড. মুহাম্মদ মোহর আলী বাংলাদেশের অন্যতম কৃতি সন্তান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের এই সাবেক অধ্যাপক সম্প্রতি মুসলিম ইতিহাস রচনায় তাঁহার অমূল্য অবদানের জন্য বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কারে ভূষিত হইয়াছেন।

Sirat Al-Nabi And The Orientalist নামক বইটি প্রকাশিত হইলে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ হইতে সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্পের আওতায় প্রকাশিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর দুইটি খণ্ড হিসাবে ইহার অনুবাদ প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

উক্ত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের পক্ষ হইতে ড. মোহর আলী সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হইলে তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন হইতে তাঁহার বই-এর অনুবাদ প্রকাশের সম্মতি প্রদান করেন। এজন্য আমরা তাঁহার নিকট আমাদের সুগভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

মূল গ্রন্থটি রচনা করিতে তিনি যেই নিরলস শ্রম দিয়াছেন ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন এক কথায় তাহা অনন্য। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি ইহা তাঁহার অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও ভালবাসার প্রমাণ। কাল কিয়ামতে ইহা তাঁহার নাজাত ও রাসূলুল্লাহ (স)-এর শাফা'আত লাভের ওয়াসিলা হইতে পারে একথা আমরা আন্তরিকভাবেই বিশ্বাস করি। পরম করুণাময়ের নিকট আমরা লেখকের নিরোগ ও কর্মময় দীর্ঘ জীবন কামনা করি যাহাতে তিনি এক্ষেত্রে আরও মূল্যবান অবদান রাখিতে পারেন।

এতদসঙ্গে বর্তমান গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবর্গ ছাড়াও অনুবাদকবৃন্দ যাহারা নিরলস পরিশ্রম করিয়াছেন আমি তাহাদের সকলকে সশ্রদ্ধ মুবারকবাদ জানাইতেছি। প্রকল্পের পরিচালক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ, প্রেসের কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ এবং সীরাত বিশ্বকোষ প্রণয়ন ও প্রকাশে সহযোগিতা দানকারী অন্য সকলকেই জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাদের সকলকে 'আহসানুল জাযা' দান করুন।

বাংলা ভাষায় নবী-রাসূল ও সাহাবীগণের উপর সীরাত বিশ্বকোষ সংকলন ও রচনার ক্ষেত্রে ইহা আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা। আর প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে ইহাতে ভুল-ত্রুটি থাকিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ মেহেরবানী করিয়া সেইসব ত্রুটি নির্দেশ করিলে আগামী সংস্করণে আমরা তাহা সংশোধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

এতদ্ব্যতীত কোন মূল্যবান পরামর্শ থাকিলে তাহার আলোকে পরবর্তী খণ্ডগুলি আরও সমৃদ্ধ করিতেও আমরা প্রয়াস পাইব ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুলের জন্য জানাই আকুল মুনাজাত। আমীন।

এ. জেড. এম. শামসুল আলম

মহাপরিচালক

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রকাশকের আরয

আলহামদু লিল্লাহ। পরম আকাঙ্ক্ষিত সীরাত বিশ্বকোষ-এর ৯ম খণ্ডটিও প্রকাশিত হইল। ইহার জন্য আমরা সর্বপ্রথম সকল কর্মের নিয়ামক পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে লাখো-কোটি হাম্‌দ ও শোকর পেশ করিতেছি। অযুত সালাত ও সালাম প্রিয়নবী সায়্যিদুল মুরসালীন, খাতিমুন নাবিয়্যীন, শাফীউল মুযনিবীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি যাঁহার সীমাহীন ত্যাগ ও কুরবানীর ওসীলায় আমরা পেয়েছি হিদায়াতরূপ অমূল্য সম্পদ আর পৃথিবীর তাবৎ মানবমণ্ডলী পেয়েছে আলোকোজ্জ্বল এক অতুলনীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও জীবনবোধ।

রাসূলুল্লাহ (স)-সহ অসংখ্য নবী-রাসূল অন্ধকারে নিমজ্জিত ও পথহারা মানবসমাজের পথ প্রদর্শনের জন্যই পৃথিবীর বুকে পাঠানো হইয়াছিল। আর এসব নবী-রাসূলের উপর অবতীর্ণ সহীফা ও কিতাবসমূহের পর তাঁহাদের সীরাত তথা জীবন চরিতকেই সমগ্র মানবমণ্ডলীর, বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ্‌র সামনে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় দিগদর্শন হিসাবে পেশ করা হইয়াছে, যাহাতে ইহার আলোকে পথ চলা উম্মাহ্‌র জন্য সহজ হয়।

আম্বিয়াকুল শিরোমণি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-কে তাই "আমি তো ইহার পূর্বে তোমাদের মধ্যে জীবনের দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়াছি" (১০ ঃ ১৬) বলিয়া নিজের সমগ্র জীবনকেই হিদায়াতের বাস্তব নমুনা হিসাবে পেশ করিতে দেখি। অতঃপর কুরআনুল কারীমও তাঁহার জীবনে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে বলিয়া ঘোষণা দিয়াছেঃ "তোমাদের মধ্যে যাহারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করে তাহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ্‌র মধ্যে উত্তম আদর্শ রহিয়াছে" (৩৩ ঃ ২১)।

অতএব উত্তম আদর্শের উজ্জ্বলতম নমুনা হিসাবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সীরাত তথা জীবনচরিতকে পরবর্তী বংশধরদের সংরক্ষণের স্বার্থে উম্মাহ্‌র সচেতন আলিম-উলামা ও লেখক-সাহিত্যিক ইহার প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন এবং জীবনের এক বিরাট অংশ এমনকি কেহ কেহ তাঁহাদের জীবনের প্রায় সমস্তটাই ইহার পেছনে ব্যয় করেন। তাঁহাদের মধ্যে ইব্‌ন হিশাম, ইব্‌ন ইসহাক, ইব্‌ন সা'দ, আল-বালাযুরী, ইব্‌ন হাযম, ইব্‌ন আবদিল বার্‌র, সুহায়লী, সুলায়মান ইব্‌ন মূসা আল-আন্দালুসী, ইব্‌ন সায়্যিদিন নাস, ইব্‌নুল কায়্যিম, ইব্‌ন কাছীর, আল-মাকরিযী, আল-কাসতাল্লানী, আল-হালাবী ও আয-যুরকানী সমধিক খ্যাত ও প্রসিদ্ধ।

আধুনিক সীরাত লেখকদের মধ্যে আব্বাস মাহমূদ আল-আক্কাদ, মুহাম্মাদ আহমাদ জা'দ আল-মাওলা, ইউসুফ আস-সালিহী আশ-শামী, আবূ যুহরা, মুহাম্মাদ আতিয়্যা আল-আবরাশী, মুহাম্মাদ আবদুল ফাত্তাহ ইবরাহীম, মুহাম্মাদ ইযযাত দারওয়াযা, আবদুর রহমান আশ-শারকাবী, আবদুর রাযযাক নাওফাল, মুহাম্মাদ জামালুদ্দীন মাসরূর, কাযী সুলায়মান মনসূরপুরী, আবদুর রউফ দানাপুরী, মানাযির আহসান গিলানী, আল্লামা শিবলী নুমানী, সায়্যিদ সুলায়মান নদবী, হিফজুর রহমান সিউহারবী, মুহাম্মাদ হুসায়ন হায়কাল, মাওলানা আশ্‌রাফ আলী থানবী, মুফতী মুহাম্মাদ শফী, ইদরীস কানদেহ্‌লবী, মাওলানা আকরম খাঁ, অধ্যাপক আবদুল খালেক, কবি গোলাম মোস্তফা, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী নদবী প্রমুখ বিখ্যাত। আল-হামদুলিল্লাহ, সীরাত লেখকদের এই ধারা আজও অব্যাহত রহিয়াছে।

অতঃপর সীরাত রচয়িতাদের কাতারে কেবল আলিম-উলামা ও মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরাই নন, অমুসলিম ঐতিহাসিক ও লেখক-সাহিত্যিকদের একটি অংশও আগাইয়া আসেন। তাহাদের মধ্যে পাশ্চাত্যের খৃস্টান ঐতিহাসিক ও মনীষী পণ্ডিতদের স্থান শীর্ষে। তাহারা প্রধানত জ্ঞানের সাধক ও গবেষক হিসাবে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা প্রায় ১৫০ কোটি মুসলমানের ধর্ম, জীবনদর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, রাজনীতি, আচার-আচরণ ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানিবার দুর্নিবার আগ্রহ, সেই সঙ্গে এই বিশাল জনগোষ্ঠীর জনক ও ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে খ্যাত ও পরিচিত নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনচরিত এবং মানব সভ্যতার ইতিহাসে তাঁহার বিশাল বিপুল অবদান সম্পর্কে অবহিত হইবার অপরিমেয় অনুসন্ধিৎসা লইয়া আগাইয়া আসেন। সাধারণত ইহারা Orientalist (প্রাচ্যবিদ) নামেই পরিচিত। আরব বিশ্বে তাহাদিগকেই 'মুসতাশরিকূন' বলা হয়।

প্রাচ্যবিদদের এই তালিকা খুবই দীর্ঘ। তাহাদের মধ্যে যাহারা নানা কারণে মুসলিম বিশ্বে খ্যাত ও পরিচিত তাহাদের মধ্যে একটি বিশেষ সময় কালের ব্যাপ্তি ও বিবেচনায় এই গ্রন্থের মূল লেখক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক জনাব ড. মুহাম্মদ মোহর আলী গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হিসাবে শীর্ষস্থানীয় তিনজন প্রাচ্যবিদ মি. উইলিয়ম ম্যুর, ডি.এস. মারগোলিয়থ ও ডব্লিউ মন্টগোমারী ওয়াট-এর এতদ্‌সংক্রান্ত অর্থাৎ কেবল সীরাত সংক্রান্ত রচনাবলীকে বাছিয়া লইয়াছেন।

অতঃপর তাহাদের লেখার আলোকে তিনি তাহাদের এই সব রচনার পেছনে নিহিত উদ্দেশ্য ও মানসিকতা তুলিয়া ধরিয়াছেন। আর সেই উদ্দেশ্য হইল ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীদের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে তাহাদের অধিকৃত উপনিবেশসমূহের বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করা। আর তাহাদের হাতিয়ার হিসাবে এইসব প্রাচ্যবিদ সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন ও মিশনারীদের রাসূলুল্লাহ (স)-কে গালি-গালাজ বা নিন্দা করার পূর্বের নীতি পরিত্যাগ করিয়া মুসলিম জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া তোলা এবং ইহার পথ হিসাবে সীরাত আলোচনায় আপাত সহনশীল ও উদার মনে হইলেও উহার অন্তরালে এক সূক্ষ্ম ও সুদূরপ্রসারী তাহারা চক্রান্ত গ্রহণ করে। তাহারা তাহাদের রচনায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার উপর জোর প্রদান এবং অন্যান্য যোগ্যতা ও গুণাবলীর স্বীকৃতি দিলেও তাঁহার নবী ও রাসূল হওয়ার বিষয়টি স্বীকার করেন না এবং ইহার স্বীকৃতিও দেন না, বরং বিভিন্ন কৌশলে এই ধারণা দিতে প্রয়াস পান যে, যদিও তিনি নিজে নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি একজন রাসূল ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র ওহীর প্রাপক ছিলেন, তদসত্ত্বেও তিনি ঐ বিশ্বাসে ভ্রান্তিতে ছিলেন।

ড. মুহাম্মদ মোহর আলী প্রাচ্যবিদদের প্রতিনিধি স্থানীয় প্রাগুক্ত তিনজনের লিখিত পুস্তক হইতে এই জাতীয় অপচেষ্টার উল্লেখপূর্বক ইহার যথাযথ জওয়াব প্রদানের মাধ্যমে তাহাদের মুখোশ উন্মোচিত করিয়াছেন। ফলে প্রাচ্যবিদদের ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার প্রতি সাধারণভাবে শ্রদ্ধাশীল এদেশের শিক্ষিত জনসমষ্টির একটি অংশের সামনে তাহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও স্বরূপ ধরা পড়িবে এবং আমরাও তাহাদের এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণালব্ধ ফসল সম্পর্কে সতর্ক হইতে পারিব।

অতএব, Sirat Al-Nabi and The Orientalists নামের এই বইটি (দুই খণ্ডে) প্রকাশিত হইবার পরই ইহার লেখক ড. মুহাম্মদ মোহর আলী সাহেবের সঙ্গে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগের "সীরাত বিশ্বকোষ প্রকল্পের" আওতায় ইহার অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি প্রদানের জন্য যোগাযোগ করা হয়। তিনি সানন্দে ইহার অনুমতি প্রদান করায় আমরা তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞ। পরম করুণাময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে আমরা জনাব ড. মুহাম্মদ মোহর আলীর

সুস্থ, নীরোগ ও কর্মময় দীর্ঘায়ু কামনা করিতেছি। আমরা আন্তরিকভাবে ইহা বিশ্বাস করি যে, এই গ্রন্থ রচনা করিতে তিনি যেই নিরলস নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন পরম করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনই ইহার জাযা দিবেন এবং এই জাযা তিনি তাঁহার শান মুতাবিকই দিবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আলোচ্য ৯ম খণ্ডটিও হইবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর মক্কী জীবন পর্যন্ত সীমিত। লেখক তাঁহার স্বাস্থ্যগত কারণে ইহার পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাদানী জীবনের উপর কাজ শুরু করিতে পারেন নাই। আমরা মেহেরবান মালিকের দরবারে তাঁহার সুস্থতার জন্য বিনীত মুনাজাত জানাই যাহাতে এই পর্যায়ের অসম্পূর্ণ কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করিতে পারেন এবং প্রাচ্যবিদদের যাবতীয় অপপ্রয়াসের দালীলিক প্রমাণপঞ্জী পেশের মাধ্যমে ইহার যথাযোগ্য জওয়াব রাখিয়া যাইতে সক্ষম হন।

এতদ্সঙ্গে আমরা আমাদের সম্মানিত অনুবাদকবৃন্দের খেদমতে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি যাহারা স্বল্প সময়ের মধ্যে ইহার অনুবাদ সম্পন্ন করিয়া প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদিগকে সহায়তা করিয়াছেন। মুহতারাম সম্পাদকদ্বয়ের খেদমতেও সম্পাদনার দুরূহ দায়িত্ব পালন করিতে যেই নিরলস শ্রম দিয়াছেন, তজ্জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিশেষত ইহার অন্যতম সম্পাদক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুহতারাম অধ্যাপক মাওলানা আবদুল মান্নান সাহেব বার্ধক্যজনিত শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতা লইয়াও যেই শ্রম দিয়াছেন তাহার তুলনা নাই। আমরা তাঁহার সুস্থতার জন্য মেহেরবান ও করুণানিধান প্রভুর দরবারে আকুল মুনাজাত জানাইতেছি।

আমরা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক সচিব এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর বর্তমান মহাপরিচালক বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব এ.জেড.এম. শামসুল আলম সাহেবকেও আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ইসলামী বিশ্বকোষের সূচনায় ও সফল সমাপ্তিতে তাঁহার প্রবল আগ্রহ ও অব্যাহত প্রেরণা আমাদিগকে বিপুলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছে। সীরাত বিশ্বকোষের প্রতিও তাঁহার আগ্রহ ও আকর্ষণ সীমাহীন।

অতঃপর সচিব, পরিচালক অর্থ, প্রকাশনা পরিচালক, পরিচালক পরিকল্পনা, লাইব্রেরিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার প্রতি তাহাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। সেই সঙ্গে গবেষণা কর্মকর্তা, প্রকাশনা কর্মকর্তাসহ আমার সকল সহকর্মী এবং ইহার কম্পোজ, মুদ্রণ, বাঁধাই ও প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সকলকে তাহাদের নিরন্তর শ্রম ও সহযোগিতার জন্য মুবারকবাদ জানাইতেছি। আল্লাহ্ পাক সকলের খেদমত কবুল করুন ও ইহার উত্তম জাযা প্রদান করুন।

পরিশেষে সম্মানিত পাঠকবৃন্দের খেদমতে আমাদের বিনীত আরয, সীরাত বিশ্বকোষের কোথাও ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হইলে কিংবা কোনরূপ সীমাবদ্ধতা নজরে আসিলে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচরে আনিবেন এবং পরবর্তী সংস্করণ যাহাতে অধিকতর উন্নত, তথ্যসমৃদ্ধ ও নির্ভুল হয় তজ্জন্য মূল্যবান পরামর্শ প্রদান করিয়া আমাদিগকে সাহায্য করিবেন। আমরা সকলের নিকট দোআপ্রার্থী।

আবু সাঈদ মুহাম্মদ ওমর আলী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين .

ভূমিকা

গ্রন্থখানির পরিধি ও রচনার উদ্দেশ্য ইহার ১ম খণ্ডের ভূমিকায় উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাতে মহানবী (স)-এর মিশনের প্রেক্ষাপট হইতে ইহার শুরু পর্যন্ত অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। বর্তমান খণ্ডটি পূর্ববর্তী খণ্ডের ধারাবাহিকতা। পূর্ববর্তী খণ্ডের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে বর্তমান (ইংরেজী সংস্করণ) খণ্ডের পৃষ্ঠা নম্বর, বিভাগ ও অধ্যায়গুলির ক্রমিক নম্বর দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে পঞ্চম হইতে সপ্তম ভাগ, ২১তম হইতে ৩৯তম অধ্যায় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে এবং মহানবী (স) -এর মিশনের প্রারম্ভিক পর্যায় হইতে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত বিস্তারিতভাবে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। ১ম খণ্ডের অনুরূপ এই খণ্ডেও প্রতিটি অধ্যায়ের প্রধান ঘটনাবলী ও ইহার বিকাশ এক বা একাধিক অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। পাশাপাশি ইহার উপর প্রাচ্য ভাষা বিশারদদের মতামত ও পরামর্শের বিশ্লেষণ ও গবেষণার বিবরণও সংযুক্ত করা হইয়াছে। যতদূর সম্ভব বিশ্বস্ততার সহিত প্রাচ্য ভাষাবিদদের যুক্তি ও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার সঙ্গত কারণসমূহের সারসংক্ষেপের উদ্যোগ গ্রহণের চেষ্টা করা হইয়াছে।

আমি বাদশাহ ফাহ্দ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স-এর কর্তৃপক্ষের প্রতি, বিশেষ করিয়া ইহার সুপারভাইজার জেনারেল সম্মানিত ড. আবদুল্লাহ ইব্ন আবদিল মুহসিন আত-তুর্কী এবং ইহার মহাসচিব ড. মুহাম্মাদ সালিম ইব্ন শুদায়্যিদ আল-আওফীকে এই রচনা প্রকাশের গুরুদায়িত্ব পালনের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। এই গ্রন্থের রচনা প্রকল্পে সহায়তা দানের জন্য ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মদীনা মুনাওয়ারা কর্তৃপক্ষকে, বিশেষ করিয়া ইহার প্রেসিডেন্ট ডঃ আবদুল্লাহ ইব্ন সালিহ্ আল-উবায়দকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। আমি "Centre for the Service of Sunnah and Sirah" -এর পরিচালক ড. মারযূক ইব্ন হায়্যাছ আয-যাহ্রানীকে তাঁহার অব্যাহত সাহায্য এবং এই প্রকল্প সম্পন্ন করার উৎসাহ যোগানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আমি এই কেন্দ্রের সকল সহকর্মীকে ধন্যবাদ জানাই, বিশেষ করিয়া সীরাত বিভাগের দুইজন সহকর্মী, শায়খ সাফিয়্যুর রহমান মুবারকপুরী এবং শায়খ আহমাদ

আবদুল্লাহ্ বাজুরকে রেফারেন্সসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষার ও আরবী ভাষা ফ্যাকাল্টির ড. ভি. আবদুর রাহীমকে আমাকে উৎসাহিত এবং বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই। আমার স্ত্রী রাজিয়াকে অব্যাহতভাবে উৎসাহ দান ও সকল সম্ভাব্য পন্থায় সাহায্য করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

এই রচনা প্রস্তুতকরণের জন্য আমাকে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ইহার উচ্চ শিক্ষা বিভাগের গ্রন্থাগার, "দি সেন্টার ফর দি সার্ভিস অব সুন্নাহ এন্ড সীরাহ" -এর গ্রন্থাগারে, মসজিদে নববীর গ্রন্থাগারে, মদীনা মুনাওয়ারার ইমাম মুহাম্মাদ ইসলামিক ইউনিভার্সিটির দাওয়াহ্ ফ্যাকাল্টির ওরিয়েন্টাল সেকশনের গ্রন্থাগার, "দি লাইব্রেরী অব দি স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিস"-এর গ্রন্থাগারে এবং বৃটিশ লাইব্রেরীতে (বৃটিশ মিউজিয়াম) কাজ করিতে হইয়াছে। সর্বত্রই আমি সৌজন্যপূর্ণ আচরণ লাভ করিয়াছি এবং প্রত্যাশিত সহযোগিতা পাইয়াছি। আমি সকল লাইব্রেরী ও ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

মসজিদে নববী
১৯ যুলকা'দা, ১৪১৩ হি.
১০ মে, ১৯৯৩ খৃ.।

এম. এম. আলী

শব্দসংক্ষেপ

আল-আযরাকী	আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন আহ্মাদ' আল-আযরাকী, আখবার মাক্কা ওয়ামা জাআ ফীহা মিনাল আছার, সম্পা. রুশদী আস-সালিহ মুলহিস, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯।
আল-ফাসী	আবূ তায়্যিব মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ আত-তাকী আল-ফাসী, আল-'ইকদুছ ছামীন ফী তারীখ আল-বালাদ আল-আমীন, ৮ খণ্ডে, কায়রো ১৩৭৯-১৩৮৮ হি.।
B.S.A.Ȯ.S	Bulletin of the school of Oriental and African Studies, London.
বুখারী	আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসাম'ঈল আল-বুখারী, সাহীহ আল-বুখারী (হাদীছ নম্বর ফাতহুল বারীর ক্রমানুসারে প্রদত্ত)।
ইব্ন হিশাম	আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক ইব্ন হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, সম্পা. মুহাম্মাদ আস-সাক্কা প্রমুখ, ২ খণ্ডে, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫।
ইব্ন সা'দ	মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মানী' আবূ 'আবদুল্লাহ, আত-তাবাকাত আল-কুবরা, ৮ খণ্ডে, বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৫।
J.R.A.S.	Journal of Asiatic Society of Great Britain and Ireland, London.
M.W.	The Moslem World, Hartford Seminary Foundation, Connecticut, U.S.A.
মুসলিম	আবুল হাসান মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নায়সাবূরী, সাহীহ মুসলিম (ফুয়াদ 'আবদুল বাকী কর্তৃক সম্পাদিত, ৫ খণ্ডে সমাপ্ত সংস্করণের হাদীছের ক্রমিক সংখ্যা অনুসরণ করা হইয়াছে, ইস্তাম্বুল, তা. বি.)।
মুসনাদ	আবূ 'আবদুল্লাহ আহমাদ ইব্ন হাম্বল ইব্ন মুহাম্মাদ, মুসনাদ আল-ইমাম আহ্মাদ ইব্ন হাম্বাল ওয়া বিহামিশিহী, মুনতাখাব কানযুল উম্মাল, ৬ খণ্ডে, পুরাতন সংস্করণ, তা. বি।

সুহায়লী	আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবিল হাসান আল-খাছ'আমী, আর-রাওদুল উনুফ ফী তাফসীর আস-সীরাহ আন-নাবাবিয়্যাহ লি-ইব্ন হিশাম, সম্পা. তা-হা 'আবদুর রঊফ সা'ঈদ, ৪ খণ্ডে, বৈরূত ১৩৯৮ হি.।
T.G.U.O.S.	Transactions of the Glasgow University Oriental Society, Glasgow.
তায়ালিসী	সুলায়মান ইব্ন দাউদ ইবনুল জারূদ আবী দাউদ, মুসনাদ আবী দাউদ আত-তায়ালিসী, বৈরূত, তা. বি।
তিরমিযী	আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরাহ, আল-জামে' আস-সাহীহ ওয়া হুয়া সুনান আত-তিরমিযী, সম্পা. আহ্মাদ মুহাম্মাদ শাকির, ৪ খণ্ডে, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৩৯৮/১৯৮৭।
Watt, M. at M.	W. Montgomary Watt, Muhammad at Mecca, Oxford, Clarindon press, ১৯৮৮ খৃ.।
Watt, M's M.	W. Montgomary Watt, Muhammad's Mecca, Edinberg ১৯৮৮ খৃ.।

পঞ্চম ভাগ

THE EARLY PHASE OF THE MISSION

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়

একবিংশ অধ্যায়

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়

এক ঃ প্রারম্ভিক কালপরিক্রমা

মহানবী ﷺ -এর নবুওয়াত প্রাপ্তির প্রাথমিক পর্যায়ে ওহী নাযিল হওয়ার ক্ষেত্রে কিছু কালের বিরতি বা ফাতরাহ ঘটে। এই বিরতি কালের মেয়াদ ছিল সর্বাধিক[1] কয়েক সপ্তাহ। বেশিরভাগ সূত্রের তথ্য অনুযায়ী সূরা আল-মুদ্দাছ্ছিরের প্রথম কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই বিরতি বা ফাতরাহ-এর অবসান ঘটে। আর ইহার দ্বারাই রিসালাত বা রাসূল হিসাবে মহানবী ﷺ -এর ধর্ম প্রচার মিশনের সূচনা ঘটে।[2] উল্লিখিত সূরার দ্বিতীয় আয়াতে মহানবী ﷺ-এর প্রতি 'গাত্রোত্থান কর ও সাবধান কর' অর্থাৎ তাঁহার উম্মতদিগকে ভুল বিশ্বাস ও রীতির পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়ার জন্য সরাসরি আদের্শ প্রদান করা হয়। সূরার তৃতীয় আয়াতে তিনি তাঁহার উম্মতদিগকে যে শিক্ষা দান করিবেন উহার প্রধান মূল ভাবকে সুনির্দিষ্ট আকারে উল্লেখ করা হইয়াছে। "আর আপনি আপনার প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন" وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ইহার অর্থ এই যে, আল্লাহ শ্রেষ্ঠ (اَللّٰهُ اَكْبَرُ) ইহা তাঁহাকে ঘোষণা করিতে হইবে। আর সকল প্রকারের শিরক বা আল্লাহ্র সহিত অংশীদারির বিরুদ্ধে নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া অন্যান্য সকল কাল্পনিক দেব-দেবীর উপর আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠত্ব ও একত্ব ঘোষণা করিতে হইবে। "হুঁশিয়ার" করার নির্দেশের অর্থ এই যে, মানুষের শির্ক-এর পরিণতির বিরুদ্ধে তাহাদিগকে হুঁশিয়ার করা।

বোধগম্যভাবেই আল্লাহ্র রাসূল প্রথমে তাঁহার এইসব শিক্ষার কথা ঐসব ব্যক্তিকেই অবহিত করেন যাঁহাদের প্রতি তিনি আস্থা স্থাপন করিতে পারেন এবং অনুকূল সাড়া পাওয়ার কিংবা অন্ততপক্ষে তাঁহার বক্তব্যের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা হইবে এই রকম আশা করিতে পারেন। ইব্ন ইসহাক আমাদিগকে এই মর্মে অবহিত করিয়াছেন যে, প্রথম তিনটি বৎসর আল্লাহ্র রাসূল ﷺ তাঁহার ধর্মীয় প্রচারের কাজটিতে "গোপনীয়তা রক্ষা করিয়াছিলেন"। এই তিনটি বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে যাহা দিয়াছেন উহা প্রকাশ্যে প্রচার করার জন্য তাঁহাকে নির্দেশ দেন। আল্লাহ্র এই নূতন নির্দেশ ১৫ ঃ ৯৪ ও ২৬ ঃ ২১৪ আয়াতে অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সূরাগুলি ঐ সময়ে অবতীর্ণ হয়।[3] এই দুইটি আয়াত নিম্নরূপ ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ .

"অতএব তুমি যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা প্রকাশ্যে (স্পষ্টত) প্রচার কর এবং মুশরিকদিগকে উপেক্ষা কর" (১৫ ঃ ৯৪)।[3]

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ .

"এবং নিকটতম জ্ঞাতিবর্গকে সতর্ক কর" (২৬ ঃ ২১৪)।

ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা অনুসরণে আত-তাবারী বলেন, নবূওয়াত প্রাপ্তির প্রথম তিনটি বৎসর ইসলাম প্রচার চলে গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া।[৪] পরবর্তী কালের লেখকগণ কেবল এই ধারাটি অনুসরণ করিয়াছেন এবং উল্লিখিত বিবৃতিটিকে হুবহু গ্রহণ করিয়াছেন।

গোপনে ইসলাম প্রচারের কাল হিসাবে বর্ণনা করিয়া যে উক্তি প্রদান করা হইয়াছে সেই উক্তিটিকে অবশ্য সতর্কতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে। ইব্‌ন ইসহাক ও আত-তাবারী এই ক্ষেত্রে যে বর্ণনা দিয়াছেন এবং অন্যদিকে কুরআন হইতে এই সম্পর্কিত বিষয়ের যে তথ্যাদি পাওয়া যায় তাহাতে গোপনে ইসলাম প্রচারের এই মেয়াদটি গ্রহণ করিতেই হইবে এইরূপ যথেষ্ট সমর্থন মিলে না। বাস্তবিকপক্ষে ইব্‌ন ইসহাক তাঁহার বিবৃতির স্বপক্ষে বা বুনিয়াদ হিসাবে কোন সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের উল্লেখ করেন নাই কিংবা কোন সনদেরও বরাত দেন নাই, বরং তিনি তাঁহার উক্তি দিয়াছেন সাধারণ ধারণা فِيْمَا بَلَغَنِىْ (আমি জানিতে পারিয়াছি) এই ভিত্তিতে। ইহার চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইতেছে তিনি খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পর ইসলাম গ্রহণকারী তিন ব্যক্তির মধ্যে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসাবে আবূ বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের তথ্য সঠিকভাবেই শনাক্ত করিয়াছেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন, আবূ বকর (রা) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার সমাজের লোকজনকে আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাইয়াছিলেন।[৫]

ইব্‌ন ইসহাক প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন গোত্রের পাঁচ ব্যক্তির উল্লেখ করেন যাহারা আবূ বাক্‌র (রা)-এর প্রেরণায় বিভিন্ন গোত্র হইতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬] এইসব বর্ণনা শেষে ইব্‌ন ইসহাক গোপনে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে উল্লিখিত উক্তি প্রদান করেন। তাঁহার এই বিবরণ বা অন্য কোন সূত্র হইতে আমরা এমন আভাস পাই না যে, আবূ বাক্‌র (রা) ও অন্য যাঁহারা ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন তাঁহাদের এই ধর্মান্তরের ঘটনা ইসলামের প্রারম্ভিক তিন বৎসরের পর ঘটে। তাই ইব্‌ন ইসহাক গোপনে ইসলাম প্রচারের যে তিন বৎসর বলিতে যাহা বুঝাইতে চাহিতেছেন তাহা স্পষ্টতই ইসলামের একান্ত প্রচারের মেয়াদকেই বুঝাইয়াছেন। একান্ত প্রচার চলিয়াছে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ব্যক্তিবিশেষের নিকট আহ্বান হিসাবে যাহা সমাবেশে কিংবা বাজার, মেলা কিংবা এমন আরও কোন প্রকাশ্য সরকারী স্থানে সমবেত জনতার নিকট প্রচারের বিপরীত অর্থ বহন করে।

দ্বিতীয়ত, যাঁহারা গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই একই বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে আত-তাবারী ইয়ামানের আফীফ আল-কিন্দীর বিবরণের দুইটি ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। আফীফ বলিয়াছেন, তিনি ইসলাম গ্রহণের আগে একবার হজ্জের সময় মীনায় আসিয়াছিলেন। সেখানে তাহার বন্ধু ও মহানবী ﷺ-এর চাচা 'আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের সঙ্গে তাঁহার

দেখা হয়। সেখানে আফীফ সুদর্শন চেহারার এক যুবককে দেখিতে পান। তিনি আরও লক্ষ্য করেন যে, ঐ যুবকের সহিত এক মহিলা ও একটি বালক রহিয়াছে। তাহারা কা'বামুখী হইয়া নামায আদায় করিতেছিলেন। আফীফ তাহাদের ও তাহাদের এই ব্যতিক্রমী ধর্মাচরণ সম্পর্কে জানিতে চাহিলে 'আব্বাস তাহাকে জানান, যুবকটি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মাদ ইব্ন আবদুল্লাহ, মহিলাটি তাঁহার স্ত্রী খাদীজা (রা) ও বালকটি তাহারই আরেক ভ্রাতুষ্পুত্র আলী ইব্ন আবী তালিব (রা)। তিনি আফীফকে আরও জানান যে, প্রথমোক্ত যুবক আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার বার্তাবাহক মনোনীত করিয়াছেন বলিয়া দাবি করেন। আর মহিলা ও বালকটি তাঁহার কথায় ঈমান আনিয়া তাঁহার ধর্মানুসারী হইয়াছেন। পরবর্তী কালে আফীফ অনুশোচনা করিয়া বলিতেন, তখনই যদি তিনি ইসলাম গ্রহণ করিতেন তাহা হইলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী হিসাবে চতুর্থ ব্যক্তির সম্মানের অধিকারী হইতে পারিতেন।[৭] ঐ বিবরণ হইতে পরিষ্কার যে, মুহাম্মাদ যে আল্লাহ্র বার্তাবাহক—সে হিসাবে তাঁহার ধর্ম প্রচারের মিশন ও তাঁহার কার্যকলাপ কোন গোপনীয় ও লোকজনের নিকট অজ্ঞাত বিষয় ছিল না। শুধু তাহাই নহে, তিনি কোন কোন সময় লোকদৃষ্টির সম্মুখেও, যেমন হজ্জের সময়ে মিনাতেও নূতন পদ্ধতিতে উপাসনা করিতেন।

একই বিবরণ পাওয়া যায় আবূ বাক্র ও তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন উছমান আত-তায়মী (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের বিবরণ হইতে। বলা হইয়াছে যে, আবূ বাক্র হাকাম ইব্ন হিযামের এক পরিচারিকার নিকট হইতে মুহাম্মাদের নবূওয়াত প্রাপ্তির কথা জানিতে পারেন। তিনি ঐ পরিচারিকার সহিত ঐ সময় বসা ছিলেন। তিনি তথ্যটি জানামাত্রই দ্রুত মহানবী-এর নিকট যান এবং তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর আর কোন প্রশ্ন না তুলিয়া নিঃসংশয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৮]

তালহা সম্পর্কে বলা হইয়াছে, (বুসরাতে) বাণিজ্যে যাইয়া তিনি জানিতে পারেন, মক্কায় একজন নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছে। পরে তিনি বসরা হইতে ফিরিয়া মক্কা নগরের লোকজনের নিকট জানিতে পারেন যে, মুহাম্মাদ আল-আমীন নবূওয়াতপ্রাপ্ত হইয়াছেন এবং আবূ বাক্র ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা শোনার পর তালহা আবূ বাক্রকে সঙ্গে লইয়া মহানবী -এর নিকট যান ও ইসলাম গ্রহণ করেন।[৯]

আবূ বাক্র (রা) ও তালহার ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে আরও বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহারা উভয়ে ছিলেন বানূ তায়ম গোত্রের লোক। এই ঘটনায় কুরায়শ গোত্রের সিংহ বলিয়া পরিচিত বানূ আসাদ গোত্রের নাওফাল ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ এত ক্রুদ্ধ হন যে, তিনি আবূ বাক্র ও তালহা উভয়কে নূতন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করার শাস্তি হিসাবে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া রাখেন। এই ঘটনায় বানূ তায়ম গোত্রের লোকেরা তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাইতে সাহসী হয় নাই। এই ঘটনার জন্য আবূ বাক্র ও তালহা আল-কারিনান বা "দুই সহযোগী" বলিয়া পরিচিত হন।[১০] এই তথ্য হইতে প্রমাণ মিলে যে, মক্কার জনসমাজে আবূ বাক্র (রা) ও তালহার মত গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের

ইসলাম গ্রহণ কার্যত নগরে বহুল আলোচিত বিষয় হইয়া উঠে। আর নূতন এই আন্দোলন ও এই আন্দোলনের প্রতি বিরোধিতার প্রশ্নে মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্বেগ ও বিরোধিতার বিষয়টিও একেবারে গোড়া হইতেই স্পষ্ট হইয়া উঠে।

উল্লিখিত বিবরণে যেসব বাস্তব সত্য ফুটিয়া উঠে সেই বিষয়ে আল-কুরআনে জোর সমর্থন পাওয়া যায়। নবী ﷺ -এর প্রতি ওহী নাযিল সম্পর্কিত সূরা আল-কালাম (৬৮)-এর প্রথম কয়েকটি আয়াতে এই সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে উহার সহিত ঐ বিবরণের কোন পার্থক্য নাই। এইসব আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ[১১]

مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ . وَاِنَّ لَكَ لاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ . وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ . فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ . بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ . اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِه وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ .

"তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহে তুমি উন্মাদ (ভূতগ্রস্ত) নও। তোমার জন্য অবশ্যই রহিয়াছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার। তুমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত। শীঘ্রই তুমি দেখিবে এবং উহারাও দেখিবে তোমাদিগের মধ্যে কে বিকারগ্রস্ত। তোমার প্রতিপালক তো সম্যক অবগত আছেন কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন তাহাদিগকে যাহারা সৎ পথপ্রাপ্ত" (৬৮ ঃ ২-৭)।

আল-কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ হইতে স্পষ্ট যে, মহানবী ﷺ ইতোমধ্যেই জনগণকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানাইতে শুরু করিয়াছিলেন এবং ইহার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে তাঁহার মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে ও তিনি সঠিক পথ ভ্রান্ত হইয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করিতে থাকে।[১২] কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ মহানবীকে তাঁহার চারিত্রিক মাহাত্ম্য এবং তাঁহার কাজ ও আচরণের নির্ভুলতা সম্পর্কে আশ্বস্ত করিতেছে।

সূরা ৯৬ 'আলাকের ঃ ৯-১০ আয়াতেও একই সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, যদিও ইহা এই সূরার প্রথম কয়েকটি আয়াত হইতে পৃথকভাবে অবতীর্ণ হয়, যদিও আলোচ্য আয়াত দুইটি প্রথমগুলি হইতে খুব বেশি পরের দিকের নহে। এই দুই আয়াতে মক্কার এক বিশিষ্ট অবিশ্বাসী (আবূ জাহ্ল)-এর উল্লেখ রহিয়াছে এই বাক্যনিচয়ে যে, "যে আল্লাহ্র বান্দা (অর্থাৎ মহানবী)-কে নিষেধ করিয়া থাকে যখন তিনি নামায পড়েন"। ঘটনাক্রমে, নবী হিসাবে কর্মজীবনের একেবারে এই গোড়ার দিকে অন্যান্য লোকের দৃষ্টির আওতায় মহানবীর নামায আদায়ের এই বাস্তব সত্যটির সহিত উল্লিখিত আফীফ আল-কিন্দীর বর্ণনার নিবিড় মিল লক্ষ্য করা যায়। এমনকি ইব্ন ইসহাক উল্লিখিত ১৫ ঃ ৯৪ আয়াতেও প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য একটি নির্দেশনা রহিয়াছে যাহা

হইতে ধরিয়া লওয়া যায়, আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক তথা রাসূলের কার্যকলাপ ও মিশন সম্পর্কে ইতোমধ্যেই লোকেরা জানিয়া ফেলিয়াছে। আর মহানবী ﷺ-এর সেই প্রচারকর্মের কারণেই অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতে শুরু করে। ইহা এই কারণেই বলা যে, পরবর্তী আয়াতে বলা হইয়াছে ঃ "যাহারা আপনাকে উপহাস-বিদ্রূপ করে নিশ্চয় আমরা আপনার জন্য যথেষ্ট" (اِنَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِءِيْنَ)।

বলাবাহুল্য, ইসলাম প্রচারের শুরুতেই উপহাস-বিদ্রূপ ও তাঁহার বিরুদ্ধে মাথা খারাপ হইয়া যাওয়ার দোষারোপকে স্বাভাবিক ধরনের প্রতিক্রিয়াই বলিতে হয়।

অবশ্য এই রকম সুপরিজ্ঞাত বিবরণও রহিয়াছে যে, মহানবী ﷺ আল্লাহ্‌র নিকট হয় আবূ জাহ্‌ল অথবা 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে ইসলাম কবুল করাইয়া ইসলামকে জোরদার করার প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[১৩] এই বিষয়ে ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা) বলিয়াছেন, 'উমারের ইসলাম গ্রহণের আগে মুসলমানরা দুর্বল ছিল। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের পর মুসলমানরা শক্তি অর্জন করে।[১৪] 'উমার (রা) নিজে ইসলাম গ্রহণের পর মন্তব্য করেন, "মুসলমানরা যদি সঠিক পথে থাকিয়া থাকে তাহা হইলে তাহারা কেন তাহাদের কার্যকলাপ গোপন রাখিবে।"[১৫] এইসব বিবরণ অবশ্যই নির্ভুল; কিন্তু এইসব বিবরণ সত্যিকার অর্থে একথা প্রমাণ করে না যে, তিন বৎসর ধরিয়া গোপনে ইসলামের প্রচারকার্য চলে; বরং এইসব বিবরণ হইতে ইহা ধরিয়া লওয়া যায় যে, ঐ সময় ইসলামের বিরোধিতা ও নির্যাতন-নিপীড়নের অস্তিত্ব ছিল, আর সেই কারণেই মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কিত প্রচার অনেকটাই নীরবে সম্পন্ন করেন।

যে ঘটনার কারণে মহানবী ﷺ সাফা পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত দারুল আরকামকে তাঁহার কার্যকলাপের কেন্দ্র এবং মুসলমানদের নামায আদায় ও সভা-সমিতির জায়গা হিসাবে বাছিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়া থাকে উহাও আমাদিগকে একই সিদ্ধান্তে উপনীত করে। বলা হইয়া থাকে, মুসলমানরা অবিশ্বাসীদের হাতে হয়রানি ও নির্যাতনের ভয়ে মক্কার নির্জন উপত্যকা এলাকাগুলিতে নামায পড়িতেন। একবার এ ধরনের সালাতরত থাকার সময় একই কাফিরকে সা'দ ইব্‌ন আবী ওয়াক্কাস (রা) জখম করেন।[১৬] এই ঘটনা ঘটে মহানবী ﷺ মানুষকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের আহ্বান জানানোর অন্তত দুই বৎসর পরে। তবে আর যাহাই হউক, একেবারে গোড়া হইতেই দারুল আরকামকে মুসলমানদের মিলিত হইবার স্থান হিসাবে বাছিয়া লওয়া হয় নাই। আর সুনিশ্চিতভাবেই তাহা করা হয় নাই আবু জাহ্‌লের নিজ গোত্র বানূ মাখযূমে আল-আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকামের ইসলাম গ্রহণসহ মহানবী ﷺ -এর নিজ পরিবার-পরিমণ্ডলের বেশ কিছু লোকের ইসলাম গ্রহণের আগে পর্যন্ত। বলাবাহুল্য, আল-আরকাম ইব্‌ন আবিল আরকাম (রা) ছিলেন ঐ বাড়িটির মালিক।

আমরা এইসব বিষয় একত্রে সম্পর্কিত করিয়া বিচার করিয়া দেখিলে এই রকম একটা ছবিই আমাদের মানসপটে প্রতিভাত হইবে যে, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তাঁহার লোকজনকে "সতর্ক

করা” ও নামায আদায়ের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে আদিষ্ট হওয়ার অব্যবহিত পরই ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। তাঁহার নবূওয়াত ও রিসালাতের বিষয়টি তখন আর গোপন কিছু ছিল না। গোড়া হইতেই বিষয়টি মক্কাবাসীর জানা ছিল। নূতন পদ্ধতিতে নামায আদায়ের বিষয়টিও জনসাধারণ লক্ষ্য করিয়াছিল। ইসলামে অন্যতম আদি দীক্ষাগ্রহণকারী আবূ বাক্‌র (রা) তাঁহার নূতন ধর্ম গ্রহণের বিষয় কোন রকম চাপিয়া যাওয়ার চেষ্টা না করিয়া বরং বিভিন্ন গোত্রের কয়েকজন বিত্তবান ব্যক্তিকেও নূতন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণে সম্মত করান। এইভাবে ইসলাম ক্রমান্বয়ে শক্তি সঞ্চয় করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে রক্ষণশীল কুরায়শ নেতারা উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। তাহারা তাই ইসলামের বিরোধিতা করা শুরু করে।

এই বিরোধিতা কোন কোন সময়ে শারীরিকভাবে নাজেহাল করার পর্যায়ে চলিয়া যায়। আবূ বাক্‌র ও তালহা (রা) এই ধরনের লাঞ্ছনার শিকার হন। এইসব ঘটনার কারণে মহানবী ও মুসলমানরা সতর্ক হইতে বাধ্য হন। তাহারা হয়রানি ও প্রকাশ্য সংঘাত এড়াইবার জন্য তাহাদের নামায আদায়ের কাজটি মানুষের অগোচরে সম্পন্ন করিতে থাকেন। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সংঘাত এড়ানো যায় নাই। সেইজন্যই পরিশেষে দারুল আরকামকে মুসলমানদের নামায আদায় ও সভা-সমাবেশের স্থান হিসাবে নির্ধারিত করা হয়। আনুমানিক তিন বৎসর শেষে ১৫ ঃ ৯৪ ও ২৬ ঃ ২১৪ আয়াত নাযিল করা হয় এবং তাহাতে আল্লাহ্‌র রাসূলকে বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া ইসলাম প্রচার চালাইয়া যাওয়ার এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগের মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের পদ্ধতিটি সম্প্রসারিত করিয়া বিভিন্ন মেলা, বাজার ও অন্যান্য জনসমাবেশে প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। তাই ইব্‌ন ইসহাক আবূ বাক্‌র তাহার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে প্রচার করেন ও অন্যদিগকেও ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জন্য বলেন বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন সেই উক্তি এবং মহানবীর তিন বৎসরের ইসলাম প্রচারের শেষে কুরআন নাযিল উক্ত অনুচ্ছেদের মর্মানুযায়ী ইসলামের ‘প্রকাশ্য’ প্রচার শুরু হয় বলিয়া যে উক্তি রহিয়াছে উভয়টিই সত্য।

দুই ঃ আদি মুসলমানগণ

সর্বসম্মত বর্ণনামতে প্রথমে যিনি ঈমান আনয়ন করেন তিনি হইলেন মহানবী -এর পত্নী খাদীজা (রা)। তাঁহার পরে রহিয়াছেন তিন ব্যক্তি ঃ ‘আলী ইব্‌ন আবূ তালিব, যায়দ ইব্‌ন হারিছা ও আবূ বাক্‌র (রা)। তবে এইসব ব্যক্তির মধ্যে আগে-পরে কে ইসলাম গ্রহণ করেন এই ব্যাপারে মতপার্থক্য রহিয়াছে।[১৭] অবশ্য এই বিষয়টি সন্দেহাতীত যে, খাদীজা (রা)-র পর তাঁহারাই সবার আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের মাঝে সময়ের ব্যবধান খুব বেশি ছিল না। আলী ও যায়দ (রা) মহানবী -এর পরিবারভুক্ত থাকায় নিঃসন্দেহে বলা যায়, আবূ বাক্‌রই প্রথম বাহিরের লোক হিসাবে তাঁহার প্রতি ঈমান আনেন। প্রায় সকল বিবরণেই বলা হইয়াছে, আলী ১০ বৎসর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। সায়্যিদ আবুল ‘আলা মওদূদীর উল্লেখ অনুযায়ী ইহাও অনুমান করা চলে যে, মহানবীর কন্যা যয়নব, উম্মে কুলছূম ও রুকায়্যা (রা), যাহাদের

ইসলামের বাণী প্রচারের আগেই বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল তাহারাও সকলে অবশ্যই তাহাদের পিতা-মাতার অনুসরণে ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। আর ফাতিমা (রা)-র বেলায় বলা চলে, ইসলামের দাওয়াতের এক বৎসর আগে ইসলামের দোলনাতেই তাঁহার জন্ম হয়।[১৮]

আবূ বাক্র (রা) ছিলেন মহানবীর বাল্যবন্ধু। তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যবসায়ী। যথেষ্ট বিত্তের অধিকারী ছিলেন তিনি। তাঁহার সজ্জনসুলভ গুণাবলীর জন্য সকলেই তাঁহাকে পছন্দ করিত। তিনি কুরায়শ পরিবারের ইতিহাস ও বংশতালিকা সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের অনতিকাল পরই তাঁহার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুবর্গ ও পরিচিতজনের মধ্যে ইসলামের সত্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁহার এই প্রয়াসের ফলে চার গোত্রের কমপক্ষে পাঁচ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৯] তাহারা হইলেন ঃ

বানূ উমায়্যা গোত্রের 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান ইব্ন আবিল 'আস (রা)

বানূ আসাদ গোত্রের যুবায়র ইবনুল আওয়াম ইব্ন খুওয়ায়লিদ (রা)

বানূ যুহরা গোত্রের 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা)

বানূ যুহরা গোত্রের সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (মালিক ইব্ন উহায়ব) (রা)

বানূ তায়ম গোত্রের তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন উছমান (রা)

আবূ বাক্র (রা) এইসব ব্যক্তিকে মহানবীর নিকট লইয়া আসিলে তাঁহারা তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন ও নামায আদায় করেন।[২০] তারপর তাঁহারা তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতম মহলে নূতন ধর্মবিশ্বাসের প্রচারক হিসাবে কাজ করেন। ইব্ন ইসহাক কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোকের একটি তালিকা দিয়াছেন যাহারা ইসলামের এই প্রাথমিক পর্যায়ে ও তাহার ভাষায় ইসলামের 'প্রকাশ্য' প্রচারের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন।[২১] এই তালিকায় অন্তত দুইজনের নাম দেখা যায় যাঁহারা ঐ সময় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন আইশা (রা) যিনি তখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই। এতদ্ব্যতীত তালিকাটি সম্পূর্ণ নহে, ইহাতে অনেকেরই নাম বাদ পড়িয়াছে যাঁহারা প্রাথমিক যুগে ইসলাম কবুল করিয়াছিলেন। তবে ইব্ন ইসহাকের এই তালিকা হইতেও স্পষ্ট দেখা যায় যে, এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ কুরায়শ গোত্র ছিল না, যে গোত্র হইতে কেহ এই সময়কালে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইব্ন ইসহাকের তালিকায় গোত্রওয়ারি যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিলিবণ্টন নিঃসন্দেহে ছিল নিম্নরূপ ঃ

বানূ হাশিম

১. 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা)

২. জা'ফার ইব্ন আবূ তালিব (রা)

৩. তাঁহার (জা'ফার) স্ত্রী আসমা বিন্ত 'উমায়স (রা)

বানুল মুত্তালিব

৪. উবায়দা ইবনুল হারিছ ইবনুল মুত্তালিব (রা)

বানূ 'আব্দ শাম্স ইব্ন 'আব্দ মানাফ

৫. আবূ হুযায়ফা ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ (রা)

বানূ উমায়্যা

৬. 'উছমান ইব্ন আফ্ফান (রা)

৭. খালিদ ইব্ন সা'ঈদ ইবনুল 'আস ইব্ন উমায়্যা (রা)

৮. তাঁহার স্ত্রী উমায়মা (বা উমায়না) বিন্ত খাল্ফ (মূলত বানূ খুযাআ গোত্র হইতে)

বানূ উমায়্যা ঃ মিত্র (মাওয়ালী) গোত্র

৯. 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ ইব্ন রিআব (রা)

১০. আবূ আহমাদ ইব্ন জাহ্শ ইব্ন রিআব (রা)

বানূ তায়ম

১১. আবূ বাক্র (রা)

১২. তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ (রা)

১৩. আসমা বিন্ত আবূ বাক্র (রা)

বানূ তায়মের মিত্র

১৪. সুহায়ব ইব্ন সিনান আর-রূমী (রা)

বানূ আসাদ

১৫. আয-যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা)

বানূ যুহ্রা

১৬. আবদুর রাহমান ইব্ন 'আওফ (রা)

১৭. সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)

১৮. উমায়র ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)

১৯. আল-মুত্তালিব ইব্ন আযহার (১৬ নং-এর জ্ঞাতিভ্রাতা)

২০. রামলা বিন্ত আবী 'আওফ (বানূ সাহ্ম গোত্রভুক্ত ও ১৯ নং-এ উল্লিখিত ব্যক্তির স্ত্রী)

বানূ যুহ্রা গোত্রের মিত্র

২১. আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রা)

২২. খাব্বাব ইব্নুল আরাত (রা)

২৩. মাসঊদ ইব্ন রাবী ইব্ন আল-কারী (রা)

বানূ আদিয়্যি

২৪. সা'ঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল (রা)

২৫. তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত আল-খাত্তাব (উমার ইবনুল খাত্তাবের বোন) (রা)

২৬. 'আমের ইব্ন রাবী'আ (আবূ আবদুল্লাহ্) (রা)

২৭. নু'আয়ম ইব্ন 'আবদুল্লাহ আন-নাহ্হাম (রা)

বানূ আদিয়্যির মিত্র

২৮. খালিদ ইব্ন বুকায়র ইব্ন আব্দ ইয়ালীল (রা)

২৯. আমির ইব্ন বুকায়র ইব্ন আব্দ ইয়ালীল (রা)

৩০. আকীল ইব্ন বুকায়র ইব্ন আব্দ ইয়ালীল (রা)

৩১. ইলয়াস ইব্ন বুকায়র.... (রা)

৩২. ওয়াকিদ ইব্ন আবদুল্লাহ (রা)

বানূ জুমাহ

৩৩. 'উছমান ইব্ন মাযঊন (রা)

৩৪. কুদামা ইব্ন মাযঊন (রা)

৩৫. আবদুল্লাহ ইব্ন মাযঊন (রা)

৩৬. আস-সাঈদ ইব্ন উছমান ইব্ন মাযঊন (রা)

৩৭. মা'মার ইবনুল হারিছ ইব্ন মা'মার (রা)

৩৮. হাতিব ইবনুল হারিছ ইব্ন মা'মার (রা)

৩৯. তাঁহার স্ত্রী ফাতিমা বিন্ত মুজাল্লাল (রা)

৪০. হাত্তাব ইবনুল হারিছ (রা)

৪১. তাঁহার স্ত্রী ফুকায়হা বিন্ত ইয়াসির (রা)

বানূ সাহ্ম

৪২. হুলায়স ইব্ন হুযাফা (রা)

বানূ মাখযূম

৪৩. আবূ সালামা (আবদুল্লাহ ইব্ন আবদুল আসাদ) (রা)

৪৪. আল-আরকাম ইব্ন আবিল আরকাম (রা)

৪৫. আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আ

৪৬. তাঁহার স্ত্রী আসমা বিন্ত সালামা

বানূ মাখযূমের মিত্র

৪৭. 'আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রা)

বানূ আমের ইব্ন খুওয়ায়লিদ

৪৮. সালীত ইব্ন 'আমর (ইব্ন 'আব্দ শাম্স) (রা)

৪৯. হাতিব ইব্ন 'আমর (ইব্ন 'আব্দ শাম্স) (রা)

বানূ ফিহ্র ইব্ন মালিক

৫০. আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)

ফলত এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিবার ও গোত্র ছিল না যে পরিবার বা গোত্র হইতে কেহ না কেহ নূতন ধর্মবিশ্বাস গ্রহণ করেন নাই। ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি না হইলেও এতগুলি গোত্র ইহাতে জড়িত হওয়ার কারণে ইসলামের আন্দোলন প্রকাশ্যে শুরু না করা হইলেও তাহা আর যাহাই হউক কোন গোপন ব্যাপার ছিল না। যে তালিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে উহা সম্পূর্ণ ও বিশদ নয়, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা অন্যান্য সূত্র হইতেও অন্ততপক্ষে সমান সংখ্যক আরও অন্যদের নাম পাইয়াছি, তাঁহারাও একেবারে গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরত করার আগেই সুনিশ্চিতভাবে নবূওয়াত মিশনের পঞ্চম বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে তাঁহাদের এই ধর্মান্তরের ঘটনা ঘটে। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রকাশ্য ধর্মপ্রচার মিশনের খুব বেশি হইলে দেড় বৎসরের মধ্যেই এই ঘটনা ঘটে। ইব্ন ইসহাকের রচনায় আদিতে ইসলাম গ্রহণকারী যাহাদের নাম তাহার তালিকায় স্থান পায় নাই তাঁহাদের নাম এই অধ্যায়ের শেষে প্রদত্ত হইবে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইব্ন ইসহাক যাঁহাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং যে তালিকাটি উপরে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে সেই তালিকায় অন্তত এমন তিনজনের নাম রহিয়াছে যাঁহারা মহানবীর বিরোধী পক্ষের বিশিষ্ট নেতাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। এই তিনজনের অন্যতম হইলেন আবূ হুযায়ফা ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ (নং ৫)। তিনি ইসলাম বিরোধী নেতা 'উতবা ইব্ন রাবীআর অন্যতম পুত্র। দ্বিতীয় ব্যক্তি হইলে খালিদ ইব্ন সাঈদ ইবনুল আস ইব্ন উমায়্যা (নং ৭) যাঁহার পিতা সাঈদ ইবনুল 'আস (বা আবূ উহায়হা নামে সুপরিচিত) ছিলেন মহানবীর বিশিষ্ট বিরোধীদের অন্যতম। তৃতীয় ব্যক্তি হইলেন আয়্যাশ ইব্ন আবূ রাবী'আ, মহানবীর প্রচণ্ডতম বিরোধী আবূ জাহ্লের সৎভাই।

তিন ঃ. প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার

ইসলামের প্রারম্ভিক তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর কুরআনের ১৫ ঃ ৯৪ ও ২৬ ঃ ২১৪ নং আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই আয়াতগুলিতে অবিশ্বাসীদের উপহাস-বিদ্রূপ ও বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া ধর্মপ্রচার করা এবং অবিশ্বাস ও বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসের পরিণাম সম্পর্কে আত্মীয়-স্বজনকে

হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি বিভিন্ন নির্দেশ ছিল। মহানবী এইসব নির্দেশ বাস্তবায়িত করার জন্য অবিলম্বে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। মহানবীর এই ব্যবস্থা গ্রহণের নিখুঁত, নির্ভুল কালপঞ্জী কি তাহা জানা যায় না। তবে ইহা স্পষ্ট যে, এই ব্যবস্থাগুলি দ্রুত একের পর এক গৃহীত হয় এবং এইগুলি মহানবীর কাজ ও মিশনের ক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

(ক) মহানবী -এর অন্যতম পদক্ষেপ ছিল, মোটামুটি তাঁহার নিজ পরিবার ও জ্ঞাতিবর্গের প্রতি নিঃশর্ত ইসলাম গ্রহণের আহ্বান ও বহু দেব-দেবীর বিশ্বাস বর্জন। তিনি ইহার পদ্ধতি হিসাবে এক রাত্রে বানূ হাশিম ও বানূ মুত্তালিবের সকল সদস্যকে এক ভোজসভায় দাওয়াত দেন। হামযা ও আবূ লাহাবসহ অনুমানিক ৪০ হইতে ৪৫ ব্যক্তি ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দেন। খাওয়া-দাওয়ার পর মহানবী ঐ সমাবেশের উদ্দেশ্যে কিছু বলিতে উদ্যত হইলে আবূ লাহাব তাঁহাকে বাধা দিয়া কথা বলিতে শুরু করে। মহানবীর উদ্দেশ্যে বক্তব্যে আবূ লাহাব তাঁহাকে মনে করাইয়া দেয় যে, এই ভোজসভায় যাহারা উপস্থিত তাহারা সকলেই তাহার জ্যেষ্ঠ ও গুরুজন, তাঁহারা তাঁহার চাচা ও জ্ঞাতি ভাই। তাই তিনি তাহাদের নিকট আর যা-ই চাহেন, তিনি যেন তাহাদের ধর্মবিশ্বাস বদলানোর জন্য না বলেন। কেননা তাহার প্রচারের কারণে সকল আরব গোত্রের বিরোধিতা মোকাবিলা করার মত সামর্থ্য তাঁহার গোত্র তথা গোটা কুরায়শ বংশের লোকদের নাই। সে তাহার বক্তব্যের ইতি টানে এই মন্তব্যে যে, অন্যরা মুহাম্মাদকে সংযত করার ব্যবস্থা গ্রহণের আগে যদি বানূ হাশিমই মুহাম্মাদকে সংযত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করে উহাই শোভনীয় হইবে। সে আরও জানায়, তাহার এমন আর কোন লোকের কথা জানা নাই যে, তাহার নিজ গোত্রের জন্য এত ঝামেলা ও কষ্ট লইয়া আসিয়াছে। কার্যত মহানবী এই অনুষ্ঠানে কোন কথা বলারই সুযোগ পান নাই।[২২]

তিনি ইহাতে দমিয়া না গিয়া আরেক রাত্রে আরেক ভোজসভার আয়োজন করেন এবং উহাতেও ঐসব লোককেই আবার দাওয়াত করা হয়। এইবার তিনি খানাপিনা শেষে তাহাদের উদ্দেশ্যে কথা বলেন। তিনি তাঁহার বক্তব্যে তাঁহার কাজ ও মিশন সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়া স্পষ্ট বলেন যে, তিনি তাহাদের সমীপে এমন এক বিষয় লইয়া আসিয়াছেন যাহা তাহাদের কেবল ইহকালেরই কল্যাণ করিবে না, বরং ইহাতে তাহাদের পারলৌকিক কল্যাণও নিহিত রহিয়াছে। এই সম্পর্কে একাধিক বিবরণ পাওয়া যায়। একটি বিবরণে বলা হইয়াছে, তিনি তাঁহার গোত্র ও পরিবারের সদস্যদের ব্যক্তিগতভাবে নাম ধরিয়া তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন এবং তাঁহার আত্মীয় ও জ্ঞাতিবর্গকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আল্লাহ্‌র বিচার ও শাস্তি যদি আসে তাহা হইলে তখন সেইসবের প্রতিকারে তাঁহার কিছুই করার থাকিবে না। তিনি তাঁহার আন্তরিকতার আরও পরিচয় দিয়া তাহাদেরকে আরও জানান যে, এই জড়জগতে যাহা কিছু সহায়-সম্পত্তি আছে উহার সবকিছুই তাহারা তাঁহার নিকট চাহিতে পারেন, কিন্তু তাহাদের অবিশ্বাসের কারণে যে পরিণতি আসিবে তাহা হইতে তাহাদের রক্ষা করার কোন ক্ষমতাই তাঁহার নাই। আলোচনা শেষে আবূ

তালিব বলেন, তিনি যদিও তাঁহার এতকালের পিতৃপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস বিসর্জন দিতে প্রস্তুত নহেন, তবুও তিনি মহানবীকে অন্যের বিরোধিতা ও শত্রুতার হাত হইতে রক্ষা করিতে ও সহায়তা দিতে সবকিছুই করিবেন। তবে আবূ লাহাব আবূ তালিবের এই ভূমিকায় খোলাখুলি দ্বিমত জানাইয়া আবারও বলে, মহানবী ﷺ -কে বাধা দিয়া সংযত করা তাহার গোত্রের কর্তব্য।[২৩]

এই দুই ভোজসভায় যেসব ঘটনা ঘটে ও সেসব ঘটনায় যাহা কিছু প্রকাশ পায় তাহার আলোকে ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে মনে করেন, এইসব ঘটনা ইসলামের প্রকাশ্য প্রচারের সময়কে সূচিত করিয়াছে। তবে বিষয়গুলি কিছুটা সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিলেই ইহা দেখা যাইবে, নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করার জন্য মহানবী ﷺ-এর ইহা কুরআনের নির্দেশ এবং তিনি সেসব নির্দেশ বাস্তবায়নে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেগুলির তাৎপর্য আরও গভীর। বস্তুতপক্ষে মহানবী ﷺ -এর মিশনের জন্য যে ব্যবস্থা বা পদক্ষেপগুলির বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে সেগুলি কেবল মহানবীর মিশন ও কাজ, তাঁহার পরিবার ও গোত্রকে জানানোর জন্য প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন ছিল না। এইসব বিষয়ে তাঁহার পরিবার ও গোত্র অবহিত ছিল। আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তাহারা তাহাদের গোত্রের কোন কোন সদস্যের, অন্ততপক্ষে আলী (রা)-র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ সম্পর্কে জানিতেন। কুরআনের নির্দেশাবলী ও উল্লিখিত ঘটনাবলীর তিন ধরনের তাৎপর্য রহিয়াছে।

প্রথমত, ইহার অর্থ কেবল মক্কার অন্যান্য লোকের মনোভাব ও বিরোধিতাকেই শুধু নয়, বরং তাঁহার নিজ গোত্রের মনোভাবে ইতস্তত না করিয়াও মহানবীকে তাঁহার ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত থাকিতে হইবে। তাঁহাকে ঐসব লোকজনের প্রতি সত্য গ্রহণের জন্য আনুষ্ঠানিক ও সত্যিকারের আহ্বান জানাইতে হইবে। তাহাতে তাহাদের সহায়তা ও সহানুভূতি তিনি হারাইবেন তাহা ভাবিলে চলিবে না।[২]

দ্বিতীয়ত, যাহাদের উদ্দেশ্যে সত্য প্রচারিত হইতেছে তাহাদের মনে এমন কোন সন্দেহ থাকিতে দিলে চলিবে না যে, মহানবী ﷺ -এর সহিত রক্তের সম্পর্ক ও তাঁহাকে জড়জাগতিক সমর্থন দেওয়ার কারণে তিনি রোজ হাশরের দিন তাঁহার সাহায্য তাহারা পাইবেন এবং ঐ সময়ে অন্যদের তুলনায় এক ধরনের অগ্রাধিকার বিবেচনা লাভ করিবেন; বরং তাহাদিগকে পরিষ্কার এই কথাই জানাইয়া দিতে হইবে যে, ইসলামে ঈমান আনিয়া ভ্রান্ত পথ পরিহার না করিলে খোদ মহানবীও যদি ইচ্ছা করেন তাহা হইলেও তিনি তাহাদের কোন সাহায্যে আসিবেন না।

তৃতীয়ত, মহানবী ﷺ -এর মিশন ও কাজ এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যাহার ফলে তিনি যে সংগ্রামে নিয়োজিত ও জড়িত এবং যে সংগ্রাম ইতোমধ্যে চলিয়াছে উহার প্রতি তাঁহার আত্মীয়বর্গের অবস্থান ও নীতি সঠিকভাবে কি তাঁহার তাহা নির্ধারণ করা প্রয়োজন।

প্রথম ভোজসভায় আবূ লাহাবের বক্তব্য হইতে পরিষ্কার যে, আবূ লাহাব কথাগুলি বলিয়াছে মহানবী ﷺ-এর মিশন কি সে সম্পর্কে না জানিয়া। তবে এই মিশনের নিহিত তাৎপর্য কি ও

উহার ফলে গোটা গোত্রের উপর ইহার কি ফলাফল ও দায়দায়িত্ব বর্তাইবে সে সম্পর্কে সজাগ থাকিয়া। এই বাস্তব সত্যের আলোকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, "এইসব ভোজসভা কার্যত ছিল গোটা গোত্র পরিষদের এক পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন বিশেষ। এই অধিবেশনের কাজ ছিল মহানবীর মিশনের ইস্যু এবং এই মিশনের আলোকে তাঁহার বিরোধিতার কি নীতি গোত্র গ্রহণ করিবে সেই বিষয় বিবেচনা। ভোজসভায় আবূ তালিবের বিবৃতিটি শুধুই তাহার ব্যক্তিগত অভিমতের বহিঃপ্রকাশ নয়, বরং তাহা ছিল গোটা গোত্রের এক নীতি নির্ধারণী বিবৃতি। ইহা ছিল কালের বিচারে এক অত্যন্ত তাৎপর্যময় সিদ্ধান্ত যাহাতে সুদূরপ্রসারী ফলাফল নিহিত ছিল। আবূ তালিব তাহার জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাহার ঘোষিত নীতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করেন।

অন্যদিকে আবূ লাহাবের সিদ্ধান্তটিও ছিল সমান তাৎপর্যময়। সে প্রকাশ্যে ও কোন রকম সংশয় না রাখিয়াই মহানবীর মিশনের প্রতি তাহার বিরোধিতার নীতি ঘোষণা করে। অবশ্য সে ইহা করিতে যাইয়া দুইভাবে আরবদের স্বীকৃত প্রথা ও দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভঙ্গ করে। সে প্রকাশ্যেই গোত্রের প্রায় সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধাচরণ করে, আর এই আচরণের মধ্য দিয়া গোত্র সংহতিতে চিড় ধরায়। অন্যদের বিরোধিতা ও শত্রুতার বিরুদ্ধে গোত্রের একজন সদস্যকে সম্পর্কিত ইস্যু নির্বিশেষে সমর্থন দেওয়া ও তাহাকে রক্ষা করার সর্বজনীন আরব রীতিপ্রথাও সে বিসর্জন দেয়। ইহা ছাড়াও তাহার এই আচরণ আরও অস্বাভাবিক এই কারণে যে, সে ছিল মহানবী ﷺ -এর চাচা,[২৫] আর আরব ধারণায় তাহার অবস্থান ছিল পিতার মতই।

আবূ লাহাব তাহার নিজ গোত্রের পারিষদবর্গের সম্মুখে মহানবীর বিরোধিতা করার কথা তো ঘোষণা করিলই, সে সামগ্রিকভাবে মক্কার বিভিন্ন গোত্রের এক প্রকাশ্য সমাবেশেও একই সংকল্প ব্যক্ত করে। এই ঘটনাটি ঘটে যখন মহানবী ﷺ দৃশ্যত তাঁহার সত্য প্রচারের প্রকাশ্য কার্যসূচী অনুসারে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তখনকার দিনে স্বীকৃত সামাজিক রীতি অনুযায়ী, যদি কোন ব্যক্তি তাহার অনুসারী লোকজনের জন্য বিপদ আসন্ন মনে করে, যেমন ধরা যাক, সংশ্লিষ্ট লোকালয় বা বসতির নিকট বৈরী শত্রুদল আকস্মিকভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, সেই অবস্থায় ঐ ব্যক্তি কোন উঁচু জায়গায় যাইয়া উচ্চস্বরে বিপদের বার্তা জানাইয়া তাহার লোকজনকে হুঁশিয়ার করিয়া দিতে পারে। এই রীতি অনুসরণ করিয়া মহানবী ﷺ একদিন সকালে কা'বার নিকটস্থ সাফা পাহাড়ের শীর্ষে আরোহণ করিয়া সর্বোচ্চ গলায় চীৎকার করিয়া বিভিন্ন গোত্র ও পরিবারের নাম ধরিয়া বিপদ সম্পর্কে হুঁশিয়ারি জ্ঞাপন করেন। এই বার্তা পাইয়া অচিরেই লোকজন সেখানে যাইয়া সমবেত হয়। যাহারা নিজেরা আসিতে পারিল না তাহারা আসলে কি হইয়াছে তাহা জানার জন্য কোন একজনকে পাঠাইয়া দেয়। এইভাবে মক্কাবাসী লোকজন যখন সাফা পাহাড়ের পাদদেশে সমবেত হইল তখন মহানবী ﷺ তাহাদিগকে প্রশ্ন করিতে থাকিলেন যে, তিনি যদি তাহাদিগকে বলেন যে, পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় এক দুশমন বাহিনী শহরে আকস্মিক হামলা চালানোর জন্য পাহাড়ের ঐ পারে অপেক্ষা করিতেছে তাহা হইলে কি তাহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবে? সমবেত লোকজন চিৎকার করিয়া জানায় যে, তাহারা তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থাপন

করিবে। তাহারা ইহার সহিত আরও জানায়, মুহাম্মাদ কখনও তাহাদের সাথে মিথ্যাচার করিয়াছেন বলিয়া তাহাদের জানা নাই। ইহা শুনিবার পর মহানবী ﷺ তাহাদের উদ্দেশ্যে বলিলেন, তিনি তাহাদিগকে ইহা অপেক্ষাও আসন্ন গুরুতর ও অনিবার্য বিপদের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করার জন্যই এইখানে উপস্থিত হইয়াছেন। আর সেই বিপদ হইল, তাহারা যদি কেবল আল্লাহ্‌কে উপাসনা ছাড়া বিভিন্ন আকারে বহু ঈশ্বরবাদী কার্যকলাপে রত থাকে তাহা হইলে তাহাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত ও শাস্তি নামিয়া আসিবে। তিনি আরও স্পষ্ট উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তাঁহাকেই তাঁহার রাসূল নিযুক্ত করিয়াছেন জনগণকে সতর্ক করার জন্য।

সাফা পাহাড়ে এই প্রকাশ্য আহ্বানের ঘটনার বিবরণগুলিতে সমবেত অন্যান্য গোত্রের লোকজনের আশু প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ নাই। তবে এইসব বিবরণে সুনির্দিষ্টভাবে আবূ লাহাবের প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল তাহার উল্লেখ আছে। আবূ লাহাব আর সকলের মধ্য হইতে সম্মুখে আগাইয়া আসিয়া প্রকাশ্যে মহানবী ﷺ -এর বিরোধিতা করার ঘোষণা দেয়। সে মহানবীর নিন্দা জানায় ও তাঁহার ধ্বংস কামনা করে।[২৬] কোন কোন বিবরণ অনুযায়ী, আবূ লাহাবের এই মনোভাব ও কাজের পরিণতি হিসাবে সূরা মাসাদ (১১১) অবতীর্ণ হয়।[২৭]

এই ঘটনা হইতে ইসলামের প্রথম প্রকাশ্য প্রচার পর্যায় কিভাবে শুরু হয় তাহার ধারণা পাওয়া যায়। বিভিন্ন সূত্রে আরও তিনটি ঘটনার কথা বলা হইয়াছে। এইসব ঘটনার প্রকৃতিদৃষ্টে অবশ্যই এইগুলিকে ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকের সময়ের বলিয়াই ধরিতে হয়। প্রথম ঘটনা অনুযায়ী, মহানবী ﷺ একদিন কয়েকজন অনুসারী লইয়া কা'বাগৃহের আঙ্গিনায় যান ও সেখানে সমাগত লোকজনের উদ্দেশ্যে তিনি মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দিয়া কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনার আহ্বান জানান। এই সময় সেখানে উপস্থিত কুরায়শ নেতৃবর্গ ও তাহাদের সমর্থকরা তাঁহার উপর হামলা চালায়। মহানবী ﷺ -এর সৎপুত্র[২৮] আল-হারিছ ইব্‌ন আবী হালাহ (রা) তাঁহাকে রক্ষা করিতে আগাইয়া আসিলে তাঁহাকেও এমন প্রচণ্ড প্রহার করা হয় যে, তাহার ফলে হারিছ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।[২৯] তিনিই ইসলামের প্রথম শহীদ।

দ্বিতীয় ঘটনাও অনুরূপ ধরনের। আবূ বাক্‌র (রা) মহানবী ﷺ -এর নিকট কা'বায় যাইয়া সত্য ঘোষণা ও কুরআন পাঠের অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। কিন্তু মহানবী ﷺ তাঁহাকে বলিলেন যে, মুসলমানের সংখ্যা তখনও খুবই কম। তাহা ছাড়া তাঁহার নিকট খবর রহিয়াছে যে, অবিশ্বাসীরা আবূ বাক্‌রকে মারধর করিতে পারে। তবুও পরে আবূ বাক্‌রের অশেষ উৎসাহ-উদ্দীপনায় তিনি সেখানে যাইবেনই বলিয়া জানাইতে থাকায় মহানবী ﷺ শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে কা'বায় যাওয়ার অনুমতি দেন। আবূ বাক্‌র (রা) কা'বা প্রাঙ্গণে যাইয়া উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ শুরু করিলে অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলে ও তাঁহার উপর আক্রমণ চালায়। এই হামলায় নেতৃত্ব দেয় বানূ আব্‌দ শামসের 'উতবা ইব্‌ন রাবী'আ। 'উতবা তাহার জুতা দিয়া আবূ বাক্‌রকে প্রচণ্ড প্রহার করিলে তিনি গুরুতর জখম হন, বিশেষ করিয়া তাঁহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত

হয় এবং তিনি অজ্ঞান হইয়া যান। আবূ বাক্‌রের নিজ গোত্র বানূ তায়মের কিছু লোক তাঁহাকে ঐ অবস্থায় উদ্ধার করে। সকালে এই ঘটনার পর সন্ধ্যা পর্যন্ত আবূ বাক্‌রের জ্ঞান ফিরে নাই। এই ঘটনায় আন্তগোত্র যুদ্ধ বাঁধিয়া যাইবার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কারণ বানূ তায়ম গোত্রের লোকেরা দল বাঁধিয়া কা'বায় আসিয়া যদি আবূ বাক্‌র মারা যান তাহা হইলে সেক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রতিশোধ, বিশেষ করিয়া উতবাকে হত্যার শপথ নেয়। ভাগ্যক্রমে রাত্রে আবূ বাক্‌রের জ্ঞান ফিরিয়া আসে ও তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠেন।[৩০] আল-হারিছ ইব্‌ন আবী হালাহ হত্যা কিংবা আবূ বাক্‌রের উপর হামলার কারণে বস্তুতপক্ষে আন্তগোত্র সংঘাত বাঁধিয়া যাওয়ার সমূহ আশঙ্কা দেখা দিলেও মহানবী ﷺ উভয় ক্ষেত্রেই সংযমের পরিচয় দেওয়ার ফলে ঘটনা তেমন পরিণতির দিকে গড়াইতে পারে নাই।

তৃতীয় ঘটনাটি ঘটে 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা)-কে কেন্দ্র করিয়া। আবূ বাক্‌রের মত তিনিও একদিন কা'বাগৃহ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া তৌহীদের বাণী ঘোষণা করেন ও উচ্চঃস্বরে কুরআন পাঠ করেন। তাঁহার উপরও একইভাবে হামলা চালাইয়া তাহাকে জখম করা হয়। মহানবী ﷺ এইবারও ধৈর্যধারণ করিয়া গোত্রে গোত্রে সংঘাত বাঁধার আশঙ্কা নিবারণ করেন।[৩১]

এই ধরনের বিরোধিতা সত্ত্বেও, আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ তাঁহার প্রচারকার্য অব্যাহত রাখেন। বিভিন্ন বিবরণ হইতে জানা যায়, তিনি মক্কা ও নিকটবর্তী এলাকার বিভিন্ন গোত্র ও উপগোত্রীয়দের নিকট ধর্মপ্রচার মিশনে যাইতেন। মাঝে মাঝে এইসব গোত্র ও উপগোত্রের লোকেরা তাঁহার প্রতি বিরূপ আচরণও করিত। ইহা ছাড়াও মহানবী ﷺ বিভিন্ন বাজার ও মেলায় যাইতেন। মেলা অনুষ্ঠিত হইত বৎসরের বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে। এইসব মেলার মধ্যে উকাজ, মাররুয্‌-যাহরান ও মাজান্নার নাম উল্লেখযোগ্য। মেলায় তিনি ইসলাম প্রচার করিতেন।

আরব জনসমাজের বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস, বিশেষ করিয়া মক্কার সমাজ ও এই সমাজ নেতাদের মর্যাদা ও প্রভাবের বিষয়ে অবহিত থাকার কারণে তিনি এইসব নেতাদের ব্যাপারে বিশেষ মনযোগী হন। স্বভাবতই তাঁহার ধারণা ছিল, তাহারা ইসলাম গ্রহণ করিলে, এমনকি এইসব নেতার কয়েকজনও ধর্মান্তরিত হইলে সাধারণ মানুষের জন্য ইসলামের সত্য গ্রহণ সহজতর হইবে। আমরা কুরআন হইতে অন্তত দুইটি ঘটনা লক্ষ করি যে, দুই ঘটনায় মহানবী ﷺ-কে দেখিতে পাই যে, তিনি মক্কার জনসমাজ নেতাদের নিকট ইসলামের শিক্ষা প্রচারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। একবার তিনি মক্কার কয়েকজন নেতার সহিত আলাপ করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার এই আলাপচারিতার মাধ্যমে তাহাদিগকে ইসলামের সত্যতায় বিশ্বাস স্থাপনের জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই আলোচনার মাঝে ইব্‌ন উম্মে মাকতূম নামক জনৈক অন্ধ ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ইসলামের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য বলিয়া নেতাদের সহিত তাঁহার আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটান। আল্লাহ্‌র রাসূল নেতাদের মন জয় করার একান্ত আগ্রহে ইব্‌ন উম্মে মাকতূমের কথায় তেমন মনযোগ দিলেন না। আর এই উপলক্ষ্যেই অবতীর্ণ হয় সূরা 'আবাসা

(৮০)। এই সূরায় আল্লাহ্র রাসূলকে মৃদু ভর্ৎসনা করা হয়, অন্ধ লোকটির কথায় মনোনিবেশ না করার জন্য। এই সূরায় তাঁহাকে মনে করাইয়া দেওয়া হয় যাহারা আন্তরিক নহে ও উদ্ধত স্বভাবের তাহাদের অপেক্ষা বরং যাহারা আন্তরিকভাবে জানিতে চায় তাহাদের প্রতিই যথার্থ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।[৩২]

অন্য এক উপলক্ষে মক্কার নেতারা ইসলাম সম্পর্কিত বিষয়ে মহানবী ﷺ -এর সহিত আলোচনায় বসিতে সম্মত হয়। তবে তাহাদের শর্ত ছিল, ইসলাম গ্রহণকারী যেসব গরীব লোক মহানবীর সঙ্গে থাকে তাহাদিগকে ঐ আলোচনার সময় সরাইয়া দিতে হইবে। কেননা মক্কার নেতারা মনে করে, তাহাদের ধারণায় যেসব লোকের কোন সামাজিক মর্যাদা নাই, অবস্থানও নাই তাহাদের সহিত বসা তাহাদের মর্যাদার জন্য অবমাননাকর। এই অবস্থায় অনতিবিলম্বে আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে যে সঠিক পথনির্দেশনা দিলেন তাহা রহিয়াছে সূরা ৬ ঃ ৫২ ও সূরা ১৮ ঃ ২৮ আয়াতে। তাঁহাকে এইসব আয়াতে বলা হইল, অবিশ্বাসী ঐ নেতাদের দাবির নিকট আত্মসমর্পণ না করিতে, বরং তাঁহাকে আন্তরিক ও নিষ্ঠাবান ঈমানদারদিগকে লইয়াই সুখী-সন্তুষ্ট থাকার জন্য বলা হইল।[৩৩]

চার ঃ মক্কা ও মক্কার বাহিরে

মক্কার নেতারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামকে বুঝিবার আন্তরিক চেষ্টা করে নাই বরং তাহারা ইহার একান্ত বিরোধিতা করিতেছিল। এই বিরোধিতার প্রকৃতি ও বিভিন্ন দিক পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হইবে। এখানে শুধু এই উল্লেখই করা যায়, মক্কার নেতাদের বৈরিতা ও নির্যাতন- নিপীড়নসুলভ আচরণে বরং উল্টা ফল ফলে। কিছু সংখ্যক লোক এই কারণেই ইসলাম গ্রহণ করে। অনেক সময় ইসলামের সত্য একজন সাবেক প্রবল ইসলাম বিরোধীর হৃদয়েও নিজ ছাপ রাখিতে সক্ষম হয়। কোন কোন সময় মহানবী ﷺ ও ইসলামের বিরুদ্ধে কুরায়শ বংশীয় লোকদের অপপ্রচারও পরোক্ষভাবে তাঁহার নাম প্রচার ও ইসলামের ধ্যান-ধারণা মক্কার বাহিরে ও গোটা আরবের অন্যত্রও প্রচারে সহায়ক হয়। ক্রমান্বয়ে ইসলামের অগ্রগতির এই তিন বৈশিষ্ট্য একদিকে মক্কার অভিজাত শ্রেণীর হামযা ও উমারের ইসলাম গ্রহণ আরও বৈশিষ্ট্যময় হইয়া আছে।

(ক) হামযার ইসলাম গ্রহণ

হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা) ছিলেন মহানবী ﷺ-এর চাচা ও তাঁহার প্রায় সমবয়সী। তিনি খুবই বলবান পুরুষ ও অত্যন্ত সাহসী ব্যক্তি ছিলেন। আর এই কারণে তৎকালীন জনসমাজ তাহাকে যেমন শ্রদ্ধা করিত, তেমন ভয়ও করিত। তাঁহার ইসলাম গ্রহণের আশু কারণ মহানবী ﷺ-এর প্রতি আবূ জাহলের খারাপ আচরণ। একবার সাফা পাহাড়ের নিকটবর্তী রাস্তায় মহানবীর সহিত আবূ জাহলের দেখা হইলে সে তাঁহাকে খুবই কটুবাক্যে গালিগালাজ করে ও তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করে। মহানবী ﷺ আবূ জাহলের সব দুর্ব্যবহার ও কটূক্তি নীরবে সহ্য করেন এবং

সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়া সেসবের কোন প্রত্যুত্তর করেন নাই। ইহার পর আবূ জাহ্ল কা'বার আঙ্গিনায় যাইয়া তাহার সঙ্গীদের সহিত বসিয়া থাকে। এই ঘটনাটি ঐ এলাকাবাসী আবদুল্লাহ ইব্ন জুদআনের অন্যতম গৃহপরিচারিকা প্রত্যক্ষ করার পর বিস্তারিতভাবে ঘটনাটি হামযা (রা)-কে জানায়। হামযা এক শিকার অভিযান শেষে ফিরিতেছিলেন। তিনি বিবরণ শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন। তিনি সরাসরি তীর-ধনুকে সজ্জিত অবস্থায় কা'বায় হাজির হন। কেন মুহাম্মাদ ﷺ -এর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছে ও তাহাকে গালি দিয়াছে জানিতে চাহিয়া তিনি আবূ জাহ্লকে আঘাত করেন এবং বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ যে শিক্ষা প্রচার করেন তিনি নিজেও তাহা বিশ্বাস করেন। ইহাতে আবূ জাহলের বানূ মাখযূম গোত্রের সমর্থকরা হামযাকে পাল্টা হামলা করিতে উদ্যত হইলে আবূ জাহ্ল নিজ অন্যায় সম্পর্কে সচেতন থাকা ও হামযা যদি ইসলাম গ্রহণ করে তাহা হইলে অবস্থা কি দাঁড়াইবে সেই আশঙ্কায় ঐ সমর্থকদিগকে নিবৃত্ত ও সংযত করে। সে স্বীকার করে যে, সত্যিই সে মুহাম্মাদের প্রতি খুবই দুর্ব্যবহার করিয়াছে। আবূ জাহলের এই হঠকারিতায় অবিশ্বাসীদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। কেননা হামযার হৃদয় সত্যিই বদলাইয়া যায় ও তিনি মহানবীর নিকট যাইয়া ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।[৩৪]

হামযা (রা) ঠিক কবে ইসলাম গ্রহণ করেন ইহাতে মতপার্থক্য আছে। বিশিষ্ট সূত্রগুলির মধ্যে কাহারও কাহারও মতে তিনি মহানবীর ধর্মীয় প্রচার মিশনের দ্বিতীয় বৎসরে, আবার অন্য কাহারও কাহারও মতে ষষ্ঠ বৎসরে[৩৫] ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে উল্লিখিত দুইটি সময়ই ঠিক নহে বলিয়াই মনে হয়। মহানবীর গোপনে ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকে অর্থাৎ মহানবীর মিশনের তৃতীয় বৎসরের পরই খুব সম্ভবত হামযা ইসলাম গ্রহণ করেন—ইহাই স্পষ্টত মনে হয়। অন্যদিকে আবার ইহাও সাধারণত স্বীকার করা হইয়া থাকে যে, হামযা উমারের আগে ইসলাম গ্রহণ করেন। উমার (রা) সম্ভবত মহানবী ﷺ -এর মিশনের ৫ম বৎসরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই ঘটনা ঘটে একদল মুসলমানের প্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরতের সামান্য কিছুকাল পর। হামযার ইসলাম গ্রহণ ইসলামের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ইব্ন ইসহাক সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, অবিশ্বাসীরা হামযার ইসলাম গ্রহণের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতির বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করে এবং তাহারা তাহাদের অত্যাচার-নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ হইতে নিবৃত্ত হয়।[৩৬]

(খ) উমার (রা)-র ইসলাম গ্রহণ

ইসলামের জন্য পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ছিল বানূ আদিয়্যি গোত্রের উমার ইবনুল খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ। তিনিও হামযার মতই সমান শক্তিশালী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। আর তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে তিনি ইসলাম ও মহানবীর ঘোরতম বিরোধীও ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের জন্য তিনি তাঁহার নিজের কয়েকজন আত্মীয়সহ তৎকালীন নও-মুসলিমদের উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালাইতেন। তিনি অবশ্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। গোটা পরিস্থিতি তিনি তাঁহার ত্বরিৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিতেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন

এক মহৎ হৃদয়ের ব্যক্তি। তাঁহার বোন ফাতিমা ও বোনের স্বামী সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আমর ও তাঁহার বয়সে বড় সৎভাই যায়দ ইবনুল খাত্তাব তাঁহার আগেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩৭] মনে হয় উমার নিজেও এইভাবে ক্রমেই ইসলামের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন। উমারের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে একাধিক বিবরণ পাওয়া যায়।[৩৮] এইসব বিবরণে খুঁটিনাটি বিষয়ে তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে বিবরণগুলি একে অন্যের সমর্থক বলিতেই হইবে। এইসব বিবরণের সবগুলিই কমবেশী নিচে বর্ণিত বিষয়গুলির ব্যাপারে একমত।

(১) উমার (রা) যে সময়ে ইসলাম গ্রহণ করেন তখনও মুসলমানদের অবস্থা খুবই দুর্বল ছিল। তাহাদের বেশিরভাগ লোকই তাহাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন রাখার চেষ্টা করিত এবং মহানবী ﷺ তাঁহার নিজের প্রধান কর্মতৎপরতা দারুল আরকামেই সীমিত রাখিয়াছিলেন। উমারের নিজ বিবৃতি অনুযায়ী, তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কারণে মক্কায় হেন কোন মুসলমান ছিল না যাহার প্রতি দুর্ব্যবহার বা জুলুম-অত্যাচার করা হয় নাই।

(২) উমারের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়াসে ফল নয় কিংবা প্রকাশ্যে ইসলামের প্রচার শুনিয়াও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন হয় আকস্মিক ঘটনাক্রমে অথবা তিনি নিজের ইচ্ছায় কুরআনের পাঠ শুনিয়া বা কিছু আয়াত পড়িয়া তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াই ইসলাম গ্রহণ করেন।

(৩) আবূ বাক্রের মতই তিনিও ইসলাম গ্রহণ করার পর বিষয়টি গোপন রাখেন নাই। তিনি প্রকাশ্য জনসমক্ষে তাৎক্ষণিকভাবে ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। আর ইহার পরিণতি হিসাবে তিনি নিন্দিত হন। অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে লইয়া টানা-হেঁচড়া করে।

উমারের ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে যেসব বিবরণ রহিয়াছে সেগুলিকে উহাদের মূল বিষয়বস্তু অনুযায়ী তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(ক) যেসব বিবরণে আবূ জাহ্ল বা উমারের ইসলামে ধর্মান্তরের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করার ও মুসলমানদের অবস্থার উন্নতির জন্য মহানবীর ইচ্ছা ও আল্লাহ্র নিকট মুনাজাতের কথা বলা হইয়াছে; (খ) যেগুলিতে প্রধানত উমারের ইসলাম গ্রহণের পরিস্থিতির বর্ণনা রহিয়াছে; (গ) যেগুলিতে উমারের ধর্মান্তর গ্রহণের আশু ফলাফলের বর্ণনা রহিয়াছে।

উল্লিখিত প্রথম শ্রেণীর বিবরণগুলির বিষয়ে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[৩৯] দ্বিতীয় শ্রেণীর বিবরণের বিষয়ে আমরা খোদ উমারের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি পাই। তাঁহার এই দুই বিবৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে দুই ধারায় বিভক্ত বিভিন্ন বয়ানকারীদের বর্ণনার মাধ্যমে। এই দুই বিবৃতির ভাষ্য ও বর্ণনার খুঁটিনাটিতে ঈষৎ তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। একটি বর্ণনা অনুযায়ী, একদিন উমার (রা) মহানবী ﷺ -কে শারীরিকভাবে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দেখিতে পান, মহানবী ইতোমধ্যে কা'বাগৃহে যাইয়া সেখানে নামায পড়িতে শুরু করিয়াছেন। উমার নীরবে তাঁহার পিছনে যাইয়া দাঁড়ান এবং নামাযের অংশ হিসাবে

সূরা হাক্কা (৬৯)-এর অংশবিশেষের তিলাওয়াত শুনিতে থাকেন। তাহাতে তিনি এতই অভিভূত হন যে, ইসলামের মর্মবাণী তাঁহার হৃদয়ের মর্মস্থলে পৌছিয়া যায়।[৪০] এই বিবরণেরই কিছুটা ঈষৎ ভিন্ন ভাষ্য অনুযায়ী, ঘটনাটি ঘটে রাত্রে। আর সেই সঙ্গে ইহাও যোগ করা হয় যে, মহানবী ﷺ তাঁহার নামায আদায়ের পর ঘরে ফিরিতেছিলেন। সেই সময় উমার (রা) তাঁহাকে পিছন হইতে অনুসরণ করেন। মহানবী ﷺ এক পর্যায়ে কেহ তাঁহার পিছু লইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে উমার (রা) তাহার পরিচয় প্রকাশ করিয়া তাঁহার ঈমান আনার কথা ঘোষণা করেন।[৪১]

উমার (রা)-এর দ্বিতীয় বিবৃতিতে তুলনামূলকভাবে বিশদতর বর্ণনা রহিয়াছে। এই বিবৃতিতে বলা হইয়াছে, একদিন উমার তাঁহার তরবারি লইয়া মহানবী ﷺ-কে হত্যার সংকল্প সহকারে বাহির হন।[৪২] পথে তাঁহার সহিত নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌র সহিত দেখা হয়। এই নু'আয়ম ছিলেন উমারের নিজ গোত্রের লোক যিনি ইসলাম গ্রহণ করিলেও সেই কথা অত্যাচার-নিপীড়নের ভয়ে গোপন রাখিয়াছিলেন। উমার (রা) কোথায় রওয়ানা হইয়াছেন সেকথা নু'আয়ম জানিতে চাহিলে উমার তাঁহার অভিপ্রায় খুলিয়া বলেন এবং মহানবী ﷺ সম্পর্কে কটুবাক্য উচ্চারণ করেন। নু'আয়ম তাহাকে তাহার নিজের ঘর আগে ঠিক করার কথা বলিয়া গন্তব্য হইতে ফিরান। নু'আয়মের এই মন্তব্যে উমার বিস্মিত হইয়া তাঁহার মন্তব্যের অর্থ ও ব্যাখ্যা কী তাহা নু'আয়মের নিকট জানিতে চাহেন। ইহার পর নু'আয়ম তাহার নিকট সত্য প্রকাশ করিয়া বলেন, উমারের নিজ বোন ফাতিমা ও তাঁহার স্বামী সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (ইব্‌ন আমর) মুসলমান হইয়াছেন।

ইহাতে উমার (রা) তাহার গন্তব্য বদলাইয়া তাঁহার বোনের বাড়িতে যান। সেখানে যাইয়া তিনি দেখিতে পান ঘটনা সত্য। তাঁহার বোন ও ভগ্নিপতি কুরআন পাঠে নিয়োজিত রহিয়াছেন। ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রথমে সাঈদকে আঘাত করেন এবং তাহাকে রক্ষা করিতে তাঁহার বোন আগাইয়া আসিলে ফাতিমাকেও আঘাত হানেন। কিন্তু সেই আঘাতে বোনের রক্ত ঝরিতে দেখিয়া উমার অনুতপ্ত হন। তিনি মেযাজ শান্ত হইবার পর তাঁহার বোনকে একান্ত অনুরোধ করেন তাহারা দুইজনে যাহা পড়িতেছিলেন তাহা তাঁহাকে দেখাইতে। ফাতিমা প্রথমে আপত্তি জানাইলেও পরে তিনি উমারকে কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতটি দেখান।

উমার (রা) কুরআনের অংশটি পড়িতে যাইয়া এতখানি মুগ্ধ হন ও অভিভূত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন যাহাতে বুঝা যায়, তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। উমারের এই মনোভাবে উৎসাহিত হইয়া ইহার আগে তাহাকে আসিতে দেখিয়া ঐ বাড়িতে আত্মগোপন করিয়া থাকা খাব্‌বাব ইবনুল আরাত (রা) বাহির হইয়া আসিয়া উমারকে অভিনন্দন জানাইয়া বলেন, মহানবী ﷺ এই সেদিন তিনি যাহাতে ইসলাম গ্রহণ করেন সেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট মুনাজাত করিয়াছিলেন।

উল্লেখ আবশ্যক যে, এই খাব্বাব (রা) সাঈদ পরিবারকে গোপনে সাহায্য-সহযোগিতা করিতেছিলেন। উমার (রা) বলিয়াছেন, ঐ সময়ে আর্থিক অবস্থা ভালো নয় এমন যেসব ব্যক্তি

ইসলাম কবুল করেন তাহাদের কয়েকজনের আশ্রয় ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তিনি কোন কোন বিত্তবান মুসলিমের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, উমারের বোন ফাতিমা ও সাঈদের পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব খাব্বাবের উপর সেইভাবেই অর্পিত হইয়াছিল।

কিন্তু মহানবী ﷺ সেই সময় সাফা পাহাড়ের নিকট দারুল আরকামে রহিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে জানানো হইলে উমার সেখানে যান এবং মহানবীর হস্ত স্পর্শ করিয়া তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। উপস্থিত মুসলমানরা এই ঘটনায় এতই পুলকিত হন যে, তাহারা আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত করিয়া তোলেন। মক্কার রাস্তা হইতেও সেই আওয়াজ শুনিতে পাওয়া যায়। উমার আরও বলেন যে, ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানগণ তাহাদের কার্যকলাপ গোপন রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৪৩]

তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ফল সম্পর্কে উমার নিজেই বর্ণনা দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বিষয় সকলকে জানাইতে চান ও অন্যান্য নও মুসলিমরা যে বিরোধিতা ও নিপীড়নের মুখামুখি হইয়াছেন তিনিও তাহার মোকাবিলা করিতে চান। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রথমে মক্কার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নেতার (একটি ভাষ্যের বর্ণনা অনুযায়ী, এই নেতার নাম আবূ জাহ্ল) বাড়ি যান। উমার (রা) তাহার বাড়ির দরজার কড়া নাড়াইলে আবূ জাহ্ল বাহিরে আসিলে তিনি তাহাকে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বিষয় জানান। আবূ জাহ্ল প্রথমে হতবাক হইয়া যায়। উমার তাহাকে বিষয়টি বারংবার জানাইলে সে তাঁহাকে ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগের জন্য বলে এবং তাহার সামনে তাহার গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। উমার ইহার পর আরও এক কুরায়শ নেতার বাড়িতে যান। ঐ নেতাও আবূ জাহলের অনুরূপ আচরণ করে।

পরিশেষে তিনি উপস্থিত হন কা'বাগৃহে। সেখানে জমায়েত একদল কুরায়শ গোত্রের লোকের সামনে তিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বিষয় ঘোষণা করেন। তাহার এই ঘোষণায় কুপিত হইয়া সমবেত কুরায়শরা তাঁহার উপর হামলা চালায়। উমার (রা) তাহাদের হামলার মোকাবিলায় অবতীর্ণ হন। তবে অনেক টানা-হেঁচড়ার পর আল-আস ইব্ন ওয়াইল জানান, তিনি উমারের পক্ষ লইবেন এবং তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। ইহাতে উপস্থিত জনতা নিবৃত্ত হয়। ওয়াইলের ক্ষোভ ও হতাশা প্রকাশ সত্ত্বেও উমার তাঁহার সাহায্য লইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেন।[৪৪] উমারের পুত্রের অন্য দুইটি বিবৃতি অনুযায়ী স্পষ্ট বুঝা যায়, মক্কার অবিশ্বাসীরা প্রকৃতপক্ষে উমারের ইসলাম গ্রহণ করার জন্য তাঁহাকে টানা-হেঁচড়া করিয়াছিল এবং আল-আস ইব্ন ওয়াইল তাঁহাকে রক্ষা করার প্রস্তাব দিয়াছিলেন।[৪৫]

ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা অনুসারে, আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের প্রথম দলটির হিজরতের অল্পকাল পরেই উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।[৪৬] এই ঘটনা ঘটে মহানবীর ইসলাম প্রচার মিশনের পঞ্চম বৎসরে। পক্ষান্তরে ওয়াকিদীও তাহাকে অনুসরণ করিয়া ইব্ন সাঈদ ও আরও কিছু

লেখকের মতে উমার ইসলাম প্রচার মিশনের ষষ্ঠ বৎসরে ইসলাম গ্রহণ করেন। এইসব বিবরণ এই মর্মে একমত যে, উমারের ইসলাম গ্রহণের ফলে মুসলমানদের অবস্থা সবিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠে। ইহার আগে মুসলমানরা পবিত্র কা'বাগৃহে প্রকাশ্যে নামায আদায় করিতে পারিতেন না। তবে উমারের ইসলাম গ্রহণের পর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।[৪৭] তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি মদীনায় মহানবী ﷺ -এর হিজরতের আগে বলা যায়, ইসলামের বিরাট সাফল্যের একটা মাইলফলক। এই ঘটনার আগে আর কোন গুরুত্বপূর্ণ কুরায়শ নেতাকে ইসলাম গ্রহণ করিতে দেখা যায় নাই। অবশ্য উমারের ইসলাম গ্রহণের সময় নাগাদ ইসলাম মক্কার সীমানা ছাড়াইয়া যায় এবং আরবের অন্যান্য গোত্রের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করিতে শুরু করে।

(গ) তুফায়ল ইব্ন আমর আদ-দাওসীর ইসলাম গ্রহণ

মক্কার বাহিরে ইসলামের আদি পর্বে কোন ব্যক্তির ইসলাম গ্রহণের অন্যতম দৃষ্টান্ত হইলেন তুফায়ল ইব্ন আমর আদ-দাওসী (রা)। তিনি নিজে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার এই বর্ণনায় একদিকে মক্কার তৎকালীন নেতারা মহানবীর সঙ্গে বাহির হইতে আগত মেহমান ও বিদেশী ব্যবসায়ীদের কেমন করিয়া বাধা দিয়াছিল এবং অন্যদিগকে তাহাদের সেই সৃষ্ট বাধা কেমন করিয়া পরোক্ষে উল্টা আরবের অভ্যন্তরভাগে ইসলাম প্রচারের অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার চিত্র পাওয়া যায়। তুফায়ল (রা) তাঁহার নিজ গোত্র আদ-দাওস-এর অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি একজন কবিও বটে।

তিনি জানাইতেছেন, একবার তিনি কোন কাজে মক্কায় আসেন। তিনি মক্কায় পৌঁছিতে না পৌঁছিতে কয়েকজন কুরায়শ তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে মুহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলে যে, মুহাম্মাদ একজন বিভ্রান্ত ও রহস্যময় ব্যক্তি। সে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করিতেছে। তাহার কথা যাদুকরের মত। তাঁহার কথায় ছেলে বাবা-মা হইতে, ভাই ভাই হইতে এবং স্বামী স্ত্রী হইতে আলাদা হইয়া যাইতেছে। তাহারা তুফায়লকে বলে, তিনি কখনও মুহাম্মাদের সঙ্গে কোনক্রমেই যেন দেখা না করেন এবং তাঁহার কথা না শুনেন। তুফায়ল তাহাদের কথায় পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করিয়া ঠিক করেন যে, তিনি মহানবীকে এড়াইয়া চলিবেন।

পরের দিন তুফায়ল কা'বায় আসিয়া দেখিতে পান, মহানবী ﷺ সেখানে নামায পড়িতেছেন। নামাযের মধ্যে মহানবী ﷺ কুরআনের যেসব আয়াত তিলাওয়াত করিতেছিলেন তাহা ঘটনাক্রমে তাহার কানে আসে। আয়াতের কথাগুলি তুফায়নের নিকট এতই সুমধুর ও মর্মে রেখাপাতকারী মনে হয় যে, তিনি নিজের বিবেক ও চেতনায় এই বিতর্কে প্রবৃত্ত হন যে, তিনি নিজে একজন কবি ও বুদ্ধিদীপ্ত যুবক। তিনি সঠিক ও সত্য হইতে ভুল ও মিথ্যাকে আলাদা করিয়া চিনিয়া লইতে সমর্থ। তাহা হইলে মুহাম্মাদ কি বলিতে চান তাহা শুনিতে ও তাঁহার সহিত দেখা করায় আপত্তির কি থাকিতে পারে। যদি মুহাম্মাদের বক্তব্য ভালো হয় তবে তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, আর যদি তাহা না হয় তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করিবেন ও তাহাকে ছাড়িয়া আসিবেন।

এইভাবে নিজের বিবেকের সহিত লড়িয়া তিনি মহানবী ﷺ নামাযশেষে যখন ঘরে ফিরিলেন, তাঁহার অনুসরণ করিয়া মহানবীর গৃহে যাইয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন। তিনি তাঁহাকে জানাইলেন যে, তাঁহার সকল আত্মীয়বর্গ মহানবী ﷺ সম্পর্কে তাঁহাকে জানাইয়াছেন এবং মাত্র কিছুক্ষণ আগে নামাযে মহানবীর কুরআন তিলাওয়াত শুনিয়া তাঁহার সম্পর্কে তাঁহার নিজেরও একটা ধারণা হইয়াছে। তুফায়ল ইহার পর মহানবীকে তাঁহার নিজের প্রতি মহানবীর কী বক্তব্য থাকিতে পারে তাহা জানিতে চাহিলেন। এ অনুরোধের আলোকে মহানবী ﷺ তুফায়লের নিকট ইসলামকে তুলিয়া ধরিয়া কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করিয়া শুনান। তুফায়ল এইসবের প্রতিক্রিয়ায় বলিলেন, "সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহার আগে আর কখনও এতো সুন্দর কথা শুনি নাই, এমন যুক্তিপূর্ণ বিবৃতিও আমার কানে কখনও আসে নাই, আমি তৎক্ষণাৎ ইসলাম গ্রহণ করিলাম।"

তুফায়লের নিজের অনুরোধে মহানবী ﷺ তুফায়লকে তাঁহার নিজের গোত্রের লোকজনের মধ্যে ইসলাম প্রচারে অনুমতি দিলেন। বাড়ি ফিরিয়া তুফায়ল তাঁহার নিজ পরিবারের সদস্যদিগকে ইসলাম কবুল করাইলেন ও তাঁহার গোত্রের লোকজনের মধ্যে ইসলাম প্রচারের নিয়োজিত থাকিলেন। মহানবীর মদীনায় হিজরতের আগে তুফায়ল তাহার সহিত দ্বিতীয়বারের মত সাক্ষাত করেন এবং খন্দকের যুদ্ধের পর তাঁহার নিজ গোত্রের ৭০ হইতে ৮০টি মুসলিম পরিবারসহ মদীনায় মহানবীর সহিত মিলিত হন।[৪৮]

ঘটনার অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে বুঝায় যায় যে, ইসলামের প্রকাশ্য প্রচার শুরুর অল্পকাল পরেই তুফায়ল (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। কারণ বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের পরের অধ্যায়ে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, তখন হইতে মক্কার কুরায়শ নেতারা মহানবী ﷺ সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন বিবৃতি না দিয়া একই রকমের বিবৃতি দিতে শুরু করে। এখন হইতে তাহাদের বক্তব্য ছিল, মুহাম্মাদ একজন যাদুকর। ইহার আগে মক্কার নেতারা মহানবী ﷺ সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য দিয়া থাকিত।

(ঘ) দিমাদ আল-আযদীর ইসলাম গ্রহণ

তুফায়লের প্রায় অনুরূপ পরিস্থিতিতেই আয্দ শানাওয়া গোত্রের দিমাদ ইব্ন ছা'লাবা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন। মহানবীর সঙ্গে তাঁহার জানা-শোনা ছিল বহু দিনের। দিমাদ পেশায় ছিলেন এক ধরনের হাতুড়ে চিকিৎসক। বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি ও অসুস্থতার চিকিৎসা করিতেন যাদু-টোনা ও ফুঁ দিয়া। তাহারা বলিল, মুহাম্মাদ পাগল হইয়া গিয়াছে। তিনিও তাহাদিগকে বলিলেন, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাত পাওয়ার সুযোগ হইলে হয়ত তাঁহাকে নিরাময় করিয়া তুলিতে পারিবেন। বাস্তবিকই তিনি মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়া তাঁহাকে তাহার "পাগলামি" হইতে সারাইয়া তোলার প্রস্তাব দেন। ইহাতে মহানবী ﷺ তাহার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত কথাগুলি বলেন ঃ[৪৯]

"সকল প্রশংসা আল্লাহ্র। আমি তাঁহার প্রশংসা করি ও তাঁহার সাহায্য চাই। তিনি যাহাকে পথ দেখান, কেহ তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে না। তিনি যাহাকে বিপথে যাইতে দেন, কেহ তাহাকে সঠিক পথে পরিচালিত করিতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাসনার যোগ্য নহে, কেহ তাঁহার শরীক নহে। আমি সাক্ষ্য দিতেছি, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার বান্দা ও বার্তাবাহক (রাসূল)।"[৪৯]

মহানবী ﷺ তাঁহার এইসব কথা শেষ করিতে না করিতেই দিমাদ তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া তাঁহার ঐ উক্তিগুলির পুনরাবৃত্তি করার অনুরোধ জানান। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে মহানবী ﷺ তিনবার তাঁহার ঐ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেন। দিমাদ বলিলেন, গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুটোনাকারী বা কবি যে ধরনের বাক্যবিন্যাসে কথা বলিয়া থাকে তিনি তাহার সহিত সুপরিচিত। কিন্তু মহানবীর কথাগুলির সহিত তাহাদের কথাবার্তার ধরনের কোনই মিল নাই। তাঁহার কথাগুলি সমুদ্রের গভীরতায় অর্থের তাৎপর্য বহন করে। আর তাই দিমাদ জানান, তিনি সেই মুহূর্তেই ও সেখানেই ইসলাম কবুল করেন। মহানবী ﷺ তাঁহাকে তাঁহার নিজ গোত্রের লোকজনের মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া ইসলাম প্রচারের অনুরোধ জানান। দিমাদ (রা) সেই অনুরোধ রক্ষা করেন।[৫০]

(ঙ) 'আমর ইব্ন 'আবাসা ও আবূ যার আল-গিফারী (রা)-র ইসলাম গ্রহণ

তুফায়ল ও দিমাদ (রা) মহানবীর প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহার বিরুদ্ধে কুরায়শ নেতাদের অপপ্রচারে। তবে 'আমর ইব্ন 'আবাসা আস-সুলামী ও আবূ যার আল-গিফারী (জুনদুব ইব্ন জুনাদা) কোনভাবে লোকজনের নিকট হইতে জানিতে পারিয়া মহানবীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন।

'আমর ইব্ন 'আবাসা হানীফ সম্প্রদায়ের অন্যতম লোক যিনি মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ও একমাত্র আল্লাহ্র উপাসনা শুরু করিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। তিনি বলিতেছেন, একদিন তিনি যখন তাঁহার কিছু শ্রোতার উদ্দেশ্যে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিতেছিলেন, তখন শ্রোতাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি তাঁহাকে জানান যে, মক্কায় এক ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে যিনি এই ধরনের মতবাদ প্রচার করিতেছেন। ইহা জানিতে পারিয়া 'আমর মক্কায় আসেন এবং এখানে আসিয়া জানিতে পারেন যে, তিনি যাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন সেই ব্যক্তি অপ্রকাশ্যে কাজ করিতেছেন। একমাত্র রাত্রে যখন ঐ ব্যক্তি কা'বা প্রদক্ষিণ করিতে আসেন তখন ছাড়া তাঁহার দেখা পাওয়া যায় না।

'আমর সেই অনুযায়ী, কা'বায় রাত্রে তাঁহার প্রতীক্ষায় থাকিলেন। মহানবী ﷺ যখন সেখানে আসিলেন 'আমর তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিলেন। তিনি তাহার নিজের ও তাহার মিশন সম্পর্কে জানিতে চাহিলে মহানবী ﷺ তাহাকে জানাইলেন, তাঁহাকে আল্লাহ্র বার্তাবাহক হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্র কোন শরীক নাই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনিই কেবল

উপাসনার যোগ্য। মহানবী ﷺ তাহাকে ইসলামের আরও অন্যান্য শিক্ষা সম্পর্কেও জানান। ইহার পর 'আমর মহানবীর নিকট জানিতে চাহিলেন আর কাহারা তাঁহার এই শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। তিনি জবাবে বলিলেন, তাহার সহিত রহিয়াছেন একজন দাস ও একজন আযাদ ব্যক্তি। 'আমর অতঃপর মহানবীর হাতে হাত রাখিয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

পরে 'আমর (রা) দাবি করেন যে, তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তি। কিন্তু তাহার এই দাবি খুব একটা সঠিক মনে হয় না। তবে ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাহার ইসলাম গ্রহণের ঘটনাটি ইসলাম প্রচারের খুবই গোড়ার দিকেই ঘটে। ইবনুল আছীর সুনির্দিষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, 'আমর (রা) মহানবীর ইসলাম প্রচারের একেবারে প্রথমদিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন (اسلم قديما اول الاسلام)। ইসলাম গ্রহণ করার পর 'আমর মহানবীর সহিত থাকার অনুমতি চাহিলে মহানবী ﷺ তাহাকে তাঁহার সহিত থাকা অপেক্ষা বরং তাহার গোত্রের লোকজনের মধ্যে ফিরিয়া যাইয়া ইসলাম প্রচার করিতে বলেন। 'আমর মহানবীর কথামত তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকজনের মধ্যে দীর্ঘকাল ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত থাকেন। মহানবী ﷺ মদীনায় হিজরত করিয়াছেন এই সংবাদ পাওয়ার পর তিনি সেখানে যাইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন।[৫১]

'আমর ইব্ন আবাসা (রা)-র মত আবূ যার (রা)-ও নিজে বলিয়াছেন যে, মক্কায় এক ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল বলিয়া দাবি করিতেছেন, এই খবর পাইয়া আসল ঘটনা জানার জন্য তিনি তাহার ভাইকে সেখানে পাঠন। তাহার ভাই মক্কায় আসিয়া মহানবীর সঙ্গে দেখা করেন ও পরে নিজ এলাকায় ফিরিয়া যাইয়া আল্লাহ্র রাসূল সম্পর্কে তাহার অত্যন্ত অনুকূল ধারণার কথা আবূ যারকে জানান। আবূ যার অবশ্য তাহাতে খুব একটা তৃপ্ত না হইয়া তিনি নিজে মক্কায় আসেন। তিনি মহানবীকে চিনিতেন না এবং তাঁহার সম্পর্কে কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস করিলেন না অবিশ্বাসীদের অত্যাচার-নিপীড়নের ভয়ে। তাই তিনি কা'বায় তাঁহার অপেক্ষায় রহিলেন। একদিন সন্ধ্যায় 'আলী (রা) তাহার পাশ দিয়া যাইতেছিলেন। আলী (রা) আবূ যারকে একজন অচেনা আগন্তুক হিসাবে বুঝিতে পারিলেন। তিনি আবূ যারকে রাত্রে তাহার বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণের দাওয়াত জানাইলে আবূ যার গিফারী (রা) তাহাতে সম্মত হইলেন, তবে নিজের পরিচয় সম্পর্কে তাহাকে কিছু বলিলেন না।

পরের দিনও আলী (রা) লক্ষ্য করিলেন যে, সেই একই ব্যক্তি কা'বায় অপেক্ষা করিতেছেন। লোকটি এখনও তাহার থাকার জায়গা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই মনে করিয়া আলী (রা) আবার তাহাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া গেলেন। পথে আলী (রা) তাহার নিকট জানিতে চাহিলেন, মক্কায় তিনি কেন আসিয়াছেন। আবূ যার প্রথমে সেই কথা বলিতে ইতস্তত করিলেন। পরে আলী (রা) বিষয়টির গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন—তাঁহার নিকট হইতে এই অঙ্গীকার পাইয়া আবূ যার গিফারী তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি এক ব্যক্তির সন্ধানে আসিয়াছেন যিনি নিজেকে আল্লাহ্র রাসূল

বলিয়া দাবি করিয়াছেন। আলী তাহাকে বলিলেন, তিনি ঠিক পথেই ও সঠিক ব্যক্তির সহিতই এই মুহূর্তে চলিয়াছেন। কেননা তিনি নিজে মহানবীর নিকটই যাইতেছেন। এইভাবে আবূ যার আলীর সহায়তায় মহানবীর ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাঁহার সহিত কথা বলার পর ইসলাম গ্রহণ করেন।

মহানবী ﷺ তাহাকে তাহার ইসলাম গ্রহণের বিষয় মক্কাবাসীর নিকট গোপন রাখার জন্য বলেন। তবে ইসলামের সত্যের সন্ধান পাইয়া অনুপ্রাণিত ও উদ্দীপিত আবূ যার (রা) এই বিষয়ে প্রকাশ্য ঘোষণা দিতে চাহেন। বাস্তবিকই পরের দিন সকালে তিনি কা'বায় আসিয়া তাঁহার ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। তিনি উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তাঁহার এ ঘোষণায় কা'বায় সমবেত অবিশ্বাসীরা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া তাঁহার উপর হামলা চালাইয়া তাহাকে বেদম প্রহার করে। কিন্তু সময়মত মহানবীর চাচা 'আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব সেখানে আসিয়া পড়ায় তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করেন। তিনি অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে ইহার আগে গলা চড়াইয়া বলেন, এই ব্যক্তি গিফার গোত্রের লোক। তাহাদের এলাকা হইয়াই কুরায়শদের বাণিজ্য কাফেলা চলাচল করে। কাজেই সাবধান! ইহাতে অবিশ্বাসীরা আবূ যারকে প্রহার বন্ধ করে। পরের দিনও আবূ যার একই ঘোষণা দেন কা'বায়। অবিশ্বাসীরা আবারও তাহাকে মারধর করে। আর আব্বাস একইভাবে আবার তাঁহাকে তাহাদের হাত হইতে রক্ষা করেন।[৫২]

আবূ যার (রা) ঠিক কোন্ তারিখে ইসলাম গ্রহণ করেন তাহা লইয়া বিভিন্ন সূত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। অনেকের উল্লেখ অনুযায়ী তিনি মহানবীর মক্কায় ইসলাম প্রচার মিশনের শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে তাঁহার ইসলাম গ্রহণের যে পরিস্থিতি ও ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাতে মনে হয়, মক্কায় প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়াও আবূ মূসা আল-আশ'আরী (আবদুল্লাহ ইব্ন কায়স)[৫৩] ও মুআয়কিব ইব্ন আবী ফাতিমা আদ-দাওসীর[৫৪] মত ব্যক্তিদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে বলা যায়, তাহারা আবিসিনিয়ায় প্রথম মুসলিম দলের হিজরতের অনেক আগেই মক্কায় আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

উপরে যেসব ঘটনার উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে আরবদের মধ্যে ইসলাম কিভাবে প্রসার ঘটে তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। ইসলামের অগ্রগতির অন্তত তিনটি সুস্পষ্ট ধারা আমরা চিহ্নিত করিতে পারি। প্রথমত, ইসলামের আবির্ভাবের আগেও যাহারা তাওহীদের দিকে ঝুঁকিয়া ছিল। আমরা এ শ্রেণীর লোকের দৃষ্টান্ত হিসাবে হানীফ সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিতে পারি। তাঁহারা তুলনামূলকভাবে অনেকটা আগেভাগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কার বাহির হইতে আমর ইব্ন 'আবাসা, 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ ও কিছুটা হইলেও সা'ঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন আমরের ইসলাম গ্রহণের কথা আমরা এই শ্রেণীর মধ্যে ফেলিতে পারি।

দ্বিতীয়ত, নানা উপলক্ষে মক্কায় আগত ব্যবসায়ী ও আগন্তুকদের কথা উল্লেখ করা যায়, যাহারা স্বাভাবিক কারণেই ইসলাম সম্পর্কিত এই নূতন আন্দোলনের বিষয় জানিতে পারেন। ইহাদের অনেকে কুরায়শ নেতাদের অপপ্রচারণায় মহানবী ﷺ সম্পর্কে কৌতুহলী হইয়া ওঠেন, গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিয়া ও শেষ পর্যন্ত ইসলাম কবুলও করেন। তুফায়ল ইব্ন 'আমর আদ-দাওসী ও দিমাদ আল-আযদী এই শ্রেণীর মধ্যে পড়েন।

তৃতীয়ত, তাহাদের মত মক্কার বাহিরের লোক যাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন এবং অন্যান্য আগন্তুক যাহারা মহানবীর ইসলামের বার্তা তাহাদের নিজ নিজ জনপদবাসী ও লোকালয়ে লইয়া যান। এইভাবে মহানবী ﷺ এবং ইসলামের অভ্যুদয় সম্পর্কে অবহিত হইয়া আবূ যার গিফারী (রা)-এর মত আরও কৌতুহলী ও জ্ঞানানুসন্ধানী ব্যক্তি নিজেরা মক্কায় আসিয়া বাস্তব তথ্যাদি সম্পর্কে সরেযমিনে অবহিত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।

বুরায়দা ইবনুল হাসিব ইব্ন আবদুল্লাহ (রা) ও তাঁহার গোত্রের লোকজনের ইসলাম গ্রহণের কৌতুহলোদ্দীপক ঘটনা হইতে ইসলাম উল্লিখিত প্রক্রিয়াগুলির মধ্য দিয়া আরবের প্রাণকেন্দ্রের প্রবেশ করিতেছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা হইয়াছে যে, বুরায়দার সঙ্গে ৮০টি পরিবার আসিয়া মদীনার পথে হিজরতকালে মহানবীর সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহার নিকট সকলে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৫৫] বুরায়দা যে এতগুলি পরিবার লইয়া এমন এক জায়গায় ও সময়ে ইসলাম কবুল করেন, যাহা অন্যথায় এমন কাজ করার জন্য খুব একটা অনুকূল ছিল না। বিষয়টির উল্লেখ করিয়া সায়্যিদ আবুল আলা মওদূদী[৫৬] বলেন যে, ইসলাম ও মহানবী ﷺ সম্পর্কে বুরায়দা (রা) নিশ্চয়ই আগে হইতে অবগত ছিলেন।

উপরে যেসব দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করা হইল, বিশেষ করিয়া ইসলামের একেবারের গোড়ার দিকের যেসব দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, সেগুলির আওতায় যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেন তাহারা সকলেই ইসলাম গ্রহণের পর নিজ নিজ জনপদে ফিরিয়া যান। কেননা মহানবী ﷺ তাহাদেরকে বিশেষ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় যাইয়া ইসলাম প্রচার করার জন্য বলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, ইসলামের প্রথম প্রকাশ্য প্রচারের অল্প কালের মধ্যেই এবং বস্তুত আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের হিজরতের বেশ আগে হইতেই মহানবী ﷺ মক্কার বাহিরে ইসলামের প্রচারের পরিকল্পনা করিতেছিলেন। ইসলাম প্রচার মিশনের পঞ্চম বৎসরে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের হিজরতের মিশনটিকে ইসলামের এক ধরনের সম্প্রসারণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির ফল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। এই ঘটনাটি তাই ইসলামের অগ্রযাত্রার পথে পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বিশেষ। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে অবশ্যই ইসলামের এই আদি পর্যায়ের মিশন ও মক্কায় ক্রমবর্ধমান ইসলাম বিরোধিতা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণ কি বলেন সেই সম্পর্কেও আলোচনা করা প্রয়োজন।

অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন

পরিশিষ্ট

একবিংশ অধ্যায়

ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন হিশামের সীরাত গ্রন্থদ্বয়ে সন্নিবেশিত আদি পর্যায়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারীদের তালিকায় যেসব ব্যক্তি স্থান পান নাই তাহাদের তালিকা।[৫৭]

বানূ হাশিম

(৫১) সাফিয়্যা বিন্‌ত 'আবদুল মুত্তালিব (মহানবীর ফুফু ও আয-যুবায়র ইবনুল আওয়ামের মাতা—উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৪৯২-৪৯৩)।

বানূ 'আব্‌দ শাম্‌স

(৫২) সাহ্‌লা বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন আমর (আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন 'উতবা ইব্‌ন রাবী'আর স্ত্রী), ইনি ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (أسلم قديما) তাঁহার স্বামীর সহিত তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৩৩৬-৩৩৭, নং ৫৯৫, কিতাবুন নিসা)।

বানূ উমায়্যা

(৫৩) উম্মু হাবীবা (রামলা), আবূ সুফিয়ানের কন্যা। তিনি ইসলামের একেবারে গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামী উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাহশের সহিত আবিসিনিয়া হিজরত করেন। পরবর্তী কালে তিনি হন উম্মুল মু'মিনীন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৬, নং ৪৩৪; উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৫৭৩-৫৭৪)।

বানূ উমায়্যার মিত্র গোত্র

(৫৪) উবায়দুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ (প্রাগুক্ত)।

বানূ তায়ম

(৫৫) উম্মু রূমান (আবূ বাক্‌রের স্ত্রী, আয়েশা ও আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বাক্‌রের মাতা)। তিনি ইসলামের গোড়ার দিকেই ইসলাম গ্রহণ করেন (আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৪৫০-৪৫২, নং ১২৭১ কিতাবুন নিসা; উসদুল গাবা, ৫খ., ৫৮৩)।

(৫৬) আল-হারিছ ইব্ন খালিদ ইব্ন সাখর ইব্ন 'আমির ইসলামের আদি পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্ন ইসহাক ও অন্যান্য সূত্রের মতে তিনি তাঁহার স্ত্রীকে লইয়া আবিসিনিয়া হিজরত করেন (আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৭৭, নং ১৩৯৭; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৩৩৫-৩৩৬)।

বানূ আসাদ ইব্ন আবদুল 'উযযা

(৫৭) খালিদ ইব্ন হিযাম (খাদীজার ভ্রাতুষ্পুত্র ও হাকীম ইব্ন হিযামের ভাই)। ইসলাম প্রচারের সূচনা পর্বেই তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকালে ইন্তিকাল করেন। একটি বিবরণ অনুযায়ী কুরআনের আয়াত (৪ ঃ ১০০) وَمَنْ يَّخْرُجْ مِنْ بَيْتِهٖ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهٗ عَلَى اللّٰهِ . তাঁহার সম্পর্কেই নাযিল হইয়াছিল (আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ৪০৩, নং ২১৫৪; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৭৮)।

(৫৮) আল-আসওয়াদ ইব্ন নাওফাল ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ (খাদীজার ভ্রাতুষ্পুত্র ও ওয়ারাকা ইব্ন নাওফাল ইব্ন আসাদের জ্ঞাতি ভ্রাতা অর্থাৎ চাচাতো ভাই)। তিনি ইসলামের আদি পর্যায়েই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী, দ্বিতীয়বার হিজরতের সময় তিনি আবিসিনিয়ায় যান। তাঁহার পিতা নাওফাল ইব্ন খুওয়ায়লিদ মুসলমানদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করিয়াছিল (উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৮৭-৮৮; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ৪৬, নং ১৭১)।

(৫৯) 'আমর ইব্ন উমায়্যা ইবনুল হারিছ ইব্ন আসাদ ইব্ন 'আবদুল 'উযযা ইসলামের সূচনা পর্বে ইসলাম কবুল করিয়া আবিসিনিয়া হিজরত করেন ও সেখানেই ইন্তিকাল করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৮৫)।

(৬০) ইয়াযীদ ইব্ন যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ। তিনি একজন কুরায়শ অভিজাত। সকল বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করা হইত। তিনি ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ১১০।)

বানূ যুহ্রা

(৬১) আমের ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস-এর ভাই, উপরের তালিকায় ১৭ নং)। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী মাত্র দশ ব্যক্তির পরই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহার উল্লেখেই কুরআনের ২৯ ঃ ৮ আয়াতটি নাযিল হয়। আল-বালাযুরীর বর্ণনা অনুযায়ী, আমের আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় হিজরতকারী দলের সদস্য ছিলেন (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ২৫৭, নং ৪৪২৩)।

(৬২) তুলায়ব ইব্ন আযহার (আল-মুত্তালিব ইব্ন আযহার, উপরে তালিকায় ১৯ নং)। ইনি ইসলামের আদি পর্বেই তাহার ভাইয়ের সহিত একত্রে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানেই উভয়ে ইন্তিকাল করেন (আল-ইসাবা, ২খ., ২৩৩, নং ৪২৮৫; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৬৪)।

(৬৩) আবদুল্লাহ ইব্ন শিহাব (ইমাম আয-যুহরীর নানা)। ইনি ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৩, পৃ. ১৮৪; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩২৫, নং ৪৭৫২)।

বানূ যুহ্‌রার মিত্র গোত্রসমূহ

(৬৪) উতবা ইব্ন মাস'উদ (আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদের ভাই, উপরে তালিকায় ২১ নং)। ইনি ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুসলমানদের দ্বিতীয় হিজরতকারী দলের সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৬৬-৩৬৭; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৫, নং ৫৪১৪)।

(৬৫) মিকদাদ ইব্ন আমর আল-কিন্দী। ইসলামের একান্ত আদি পর্যায়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪০৯-৪১১)।

(৬৬) শুরাহবীল ইব্ন হাসানা আল-কিন্দী। ইসলামের আদি পর্যায়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে আবিসিনিয়ায় এবং পরবর্তী কালে মদীনায় হিজরত করেন (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ১৪৩, নং ৩৮৬৯ ও উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৯১; নীচে আরও দ্র. নং ৭৩-৭৬)।

বানূ আদিয়্যি

(৬৭) যায়দ ইবনুল খাত্তাব ('উমার ইবনুল খাত্তাবের বৈমাত্রেয় ভাই)। ইনি ইসলামের আদি পর্বেই ইসলাম গ্রহণ করেন ও ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হন। 'উমার (রা) এই বিষয়ে মন্তব্য করেন যে, তাহার ভাই দুইটি উত্তম বিষয়ে তাহার অপেক্ষা আগাইয়া রহিয়াছেন ঃ (এক) তাঁহার আগেই যায়দের ইসলাম গ্রহণ ও (দুই) শাহাদত প্রাপ্তি (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৩৮-২৩৯)।

(৬৮) লায়লা বিনতি আবী হাছমা (আমের ইব্ন রাবী'আ আল-আনজীর স্ত্রী, উপরের তালিকায় ২৬ নং)। তিনি ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথমে স্বামীর সহিত তিনি আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমার (রা) এই দম্পতিকে তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে অত্যাচার ও নিপীড়ন করিতেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৫৪১)।

(৬৯) মা'মার ইব্ন আবদুল্লাহ ইব্ন নাদলা ঃ ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়াগামী মুসলমানদের দ্বিতীয় দলের সহিত আবিসিনিয়ায় এবং পরে মদীনায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৪০০)।

(৭০) আদিয়্যি ইব্ন নাদলা ঃ অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পুত্র নু'মানের সহিত আবিসিনিয়া হিজরত করেন। আদিয়্যি আবিসিনিয়ায় ইনতিকাল করিলে তাঁহার পুত্র নু'মান তাঁহার ওয়ারিছ হন। ইসলামের ইতিহাসে তখন সেটিই ছিল প্রথম উত্তরাধিকার যেখানে মৃত ব্যক্তি ও তাহার ওয়ারিছ উভয়েই মুসলিম ছিলেন (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৯৮; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৭১, নং ৫৪৯১)।

(৭১) নু'মান ইব্ন আদিয়্যি ইব্ন নাদলা ঃ ইসলামের আদি পর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়া পিতার সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন এবং পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন (প্রাগুক্ত, আরও দ্র. উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ২৬-২৭)।

(৭২) 'উরওয়া ইব্ন উছাছা (আমর ইবনুল আসের বৈপিত্রেয় ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ৪০২-৪০৩)।

বানূ জুমাহ

(৭৩) সুফ্য়ান ইব্ন মা'মার ইব্ন হাবীব ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্ত্রী হাসানা এবং দুই পুত্র জাবির ও জুনাদাসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩২১-৩২২; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৫৭, নং ৩৩২৯)।

(৭৪) হাসানা (উম্মে শুরাহবীল) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামী ও পুত্রদের সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (প্রাগুক্ত; আরও দ্র. উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৪২৫)।

(৭৫) জাবির ইব্ন সুফ্য়ান (জাবির ইব্ন হাসানা আল-কিন্দী নামেই অধিক পরিচিত) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতা-মাতার সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৫৩; ২খ., পৃ. ৩২১-৩২২, ৩৯১; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২১১, নং ১০১৬; ২খ., পৃ. ১৪৩, নং ৩৮৬৯)।

(৭৬) জুনাদা ইব্ন সুফ্য়ান (জুনাদা ইব্ন হাসানা আল-কিন্দী নামেই সমধিক পরিচিত) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার পিতা-মাতা ও ভাইদের সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ২৯৯; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৪৬, নং ১২০৫ এবং উপরে নং ৭৩-৭৫-এর আওতায় সূত্রসমূহ)।

(৭৭) নুবায়হ ইব্ন উছমান ইব্ন রাবী'আ ইব্ন ওয়াহব ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুযায়ী আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ১৫; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৫৫২, নং ৮৬৮৬)।

বানূ আবদুদ দার

(৭৮) মুস'আব ইব্ন উমায়র ইব্ন হাশিম ইব্ন আব্দ মানাফ ইব্ন আবদুদ-দার ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তবে বিষয়টি তিনি তাঁহার পিতা-মাতার নিকট গোপন রাখেন। পরে বিষয়টি তাহারা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে গৃহে আটক রাখেন। অবশ্য তিনি বাড়ি হইতে পলাইয়া যাইতে সক্ষম হন এবং পরে আবিসিনিয়াযাত্রী প্রথম মুসলিম দলের সহিত আবিসিনিয়ায় যান। মহানবী ﷺ আল-আকাবার শপথের পর এই মুস'আবকেই আনসারদিগকে কুরআন শিক্ষা দানের জন্য মদীনায় পাঠান (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৩৬৮-৩৭০; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৪২১, নং ৮০০২)।

(৭৯) আবুর রূম ইব্ন উমায়র (মুসআবের ভাই) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তাহার ভাইয়ের সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ১৯৪)।

(৮০) ফিরাস ইবনুন নাদর ইবনুল হারিছ, ইব্ন ইসহাকের মতে ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ১৭৭)।

(৮০ক) জাহ্ম ইব্ন কায়স ইব্ন আব্দ ইব্ন শুরাহবীল, ইব্ন ইসহাকের মতে ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৩১১, ৩১২; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৫৪, নং ১২৪৮)।

বানূ সাহ্ম

(৮১) আবদুল্লাহ ইব্ন হুযাফা ইব্ন কায়স ইব্ন আদিয়্যি (উপরের তালিকায় ৪২ নং-এর ভাই) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ভাই কায়স ইব্ন হুযায়ফার সঙ্গে আবিসিনিয়ার দ্বিতীয় মুসলিম যাত্রীদলের সঙ্গে হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ১৪২-১৪৩; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ২৯৬, নং ৪৬২২)।

(৮২) কায়স ইব্ন হুযাফা (৮১ নং-এর পূর্বে) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া ভাইয়ের সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ২১১)।

(৮৩) আবূ কায়স ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদিয়্যি ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়া হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ২৭৯-২৮০)।

(৮৪) আবদুল্লাহ ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদিয়্যি (আবূ কায়সের ভাই, উপরে ৮৩ নং) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ২৯২, নং ৪৬০৫)।

(৮৫) আস-সাইব ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদিয়্যি ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮-৯, নং ৩০৫৮)।

(৮৬) আল-হাজ্জাজ ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদিয়্যি (আস-সাইবের ভাই, উপরে দ্র. ৮৫) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (প্রাগুক্ত, ১খ., ৩১১, নং ১৬১৫)।

(৮৭) সাঈদ ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদিয়্যি (আল-হাজ্জাজের ভাই, উপরে দ্র. ৮৬ নং) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ৪৪, নং ৩২৫১)।

(৮৮) বিশর ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন আদিয়্যি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ১৮৪-১৮৫)।

(৮৯) হাশিম ইবনুল আস ইব্ন ওয়াইল (আম্র ইবনুল আসের ছোট ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., ৬৩-৬৪)।

বানূ সাহ্মের মিত্র গোত্রসমূহ

(৯০) উমায়র ইব্ন রিয়াব ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ১৪৩; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৩১-৩২, নং ৬০৩২)।

(৯১) মাহমিয়্যা ইব্ন জায্ (আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মুল ফাদালের বৈপিত্রেয় ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৩৩৪; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৩৮৮, নং ৭৮২৩)।

বানূ মাখযূম

(৯২) হিশাম (অথবা হাশিম) ইব্ন আবী হুযায়ফা ইবনুল মুগীরা ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৬০-৬১; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৬০৩, নং ৮৯৬২; আরও দ্র. ৮৯১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯৩)।

(৯৩) হাববার ইব্ন সুফ্য়ান ইব্ন 'আবদুল আসাদ ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৫৪; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৫৯৯, নং ৮৯৩০)।

(৯৪) আবদুল্লাহ ইব্ন সুফ্য়ান ইব্ন আবদুল আসাদ (হাববারের ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩১৯, নং ৪৭২১)।

(৯৫) উম্মু সালামা বিন্ত আবী উমায়্যা ইবনুল মুগীরা (উম্মুল মু'মিনীন) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রথম স্বামী আবূ সালামা ইব্ন আবদুল আসাদের সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৫৮৮-৫৯০; আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৪৫৮-৪৬০, নং ১৩০৯, কিতাবুন নিসা)।

(৯৬) সালামা ইব্ন হিশাম ইবনুল মুগীরা (আবূ জাহলের ভাই ও খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের চাচাতো ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। তিনি সেখান হইতে দেশে ফিরিয়া আসিলে তাহার আত্মীয়রা তাহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখে এবং নির্যাতন করে। তাহারা তাহাকে মদীনায় হিজরত করিতে দেয় নাই (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৪১; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৬৮-৬৯, নং ৩৪০৩)।

বানূ মাখযূমের মিত্র গোত্রসমূহ

(৯৭) ইয়াসির (আম্মার ইব্ন ইয়াসিরের পিতা, উপরের তালিকায় ৪৭ নং ও আবূ হুযায়ফা ইবনুল মুগীরার মিত্র) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত

করেন। এখানে তাঁহার উপর প্রচণ্ড অত্যাচার-নির্যাতন চলে (উসদ্‌ল গাবা, ৫খ., পৃ. ৯৮; আরও দ্র. ৪খ., পৃ. ৪৩; আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৬৪৭-৬৪৮, নং ৯২০৮)।

(৯৮) মূল গ্রন্থে ৯৮ ক্রমিকের কোন উল্লেখ নাই (অনুবাদক)।

(৯৯) আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইয়াসির (৯৭ নং-এ উল্লিখিত ব্যক্তির পিতা) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাহার উপর নিদারুন নির্যাতনের কারণে তিনি শাহাদাতবরণ করেন (প্রাগুক্ত)।

বানূ আমের ইব্‌ন লুআয়্যি

(১০০) আবূ সাবরা ইব্‌ন আবী রুহ্‌ম (মহানবীর ফুফু বাররা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিবের পুত্র) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণের পর যথাক্রমে আবিসিনিয়া ও মদীনায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ২০৭; আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৮৪, নং ৫০০, কিতাবুল কুনা)।

(১০১) উম্মু কুলছূম বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (উপর্যুক্ত আবূ সুবরাহ্‌র স্ত্রী এবং বিশিষ্ট কুরায়শ অভিজাত ও প্রধান সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর-এর কন্যা) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীসহ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৬১৩; আল-ইসাবা, ৪খ., ৪৯০, নং ১৪৭৩, কিতাবুন নিসা)।

(১০২) 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (উম্মু কুলছূম ও আবূ জানদালের ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ১৮১; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৩২২, নং ৫৭৩৬)।

(১০৩) আবূ জানদাল ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুহায়লের ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেই কারণে তাঁহার পরিবার তাঁহার উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চালায় (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ১৬০, আল-ইসাবা, ৪খ., ৩৪, নং ২০৩ ,কিতাবুন নিসা।

(১০৪) সাকরান ইব্‌ন 'আমর (সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর ও হাতিব ইব্‌ন আমরের ভাই, উপরে নং ৪৯) উম্মুল মুমিনীন হযরত সাওদা বিন্‌ত যাম'আর প্রথম স্বামী। তিনি ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া সস্ত্রীক আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩২৪-৩২৫; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৫৯, নং ৩৩৩৭)।

(১০৫) সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (উম্মুল মুমিনীন, সাকরানের সাবেক স্ত্রী) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া প্রথম স্বামীর সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (পূর্বোক্ত বরাত; উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৪৮৫-৪৮৬; আল-ইসাবা, ৪খ., পৃ. ৩৩৮-৩৩৯, নং ৬০৬, কিতাবুন নিসা)।

(১০৬) ইয়াকাজা বিন্ত আলকামা (সুহায়ল ইব্ন আমরের ভাই সালীত ইব্ন 'আমরের [নং ৪৮, উ. দ্র.] স্ত্রী) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীর সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৬২৫-৬২৬)।

(১০৭) মালিক ইব্ন যাম'আ (উম্মুল মুমিনীন সওদার ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্ত্রী 'আমরাহ বিন্ত আস-সা'দীর সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ২৮০; ইব্ন হিশাম, ৩২৯)।

(১০৮) 'আমরাহ বিন্ত আস-সাদী (উপর্যুক্ত মালিকের স্ত্রী) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া স্বামীর সহিত আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (প্রাগুক্ত; আরও দ্র. উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৫১০)।

(১০৯) ইব্ন উম্মে মাকতূম (আমর ইব্ন উম্মে মাকতূম, উম্মুল মুমিনীন খাদীজার মামাতো ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও পরে মদীনায় হিজরত করেন (আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৫২৩-৫২৪, নং ৫৭৬৪)।

বানূ ফিহ্র ইব্ন মালিক

(১১০) সুহায়ল ইব্ন বায়দা ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া প্রথমে আবিসিনিয়ায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩৭০; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৯১, নং ৩৫৬১)।

(১১১) সাঈদ ইব্ন আব্দ কায়স ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ৩১২; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৯, নং ৩২৭২)।

(১১২) 'আমর ইবনুল হারিছ ইব্ন যুবায়র ঃ ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন ও ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৯৫; আল-ইসাবাহ, ২খ., পৃ. ৫৩০, নং ৫৭৯৯)।

(১১৩) উছমান ইব্ন আব্দ গানম ইব্ন যুহায়র (আবদুর রহমান ইব্ন আওফের চাচাতো ভাই) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিরা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৩৭৫; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ৪৬১, নং ৫৪৪৪)।

বানূ আব্দ ইব্ন কুসায়্যি

(১১৪) তুলায়ব ইব্ন 'উমায়র ইব্ন ওয়াহ্ব (মহানবীর চাচী আরওয়াহ বিন্ত আবদুল মুত্তালিবের পুত্র) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৬৫; আল-ইসাবা, ২খ., পৃ. ২৩৩, নং ৪২৮৮)।

দাস-দাসী ও অন্যান্য ব্যক্তি

(১১৫) বিলাল ইব্‌ন রাবাহ (উমায়্যা ইব্‌ন খালাফের গোলাম) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এইজন্য তাঁহার উপর চরম নির্যাতন চালানো হয়। একটি বিবরণে বলা হইয়াছে যে, তিনি হইলেন আল্লাহ্‌র রাসূলসহ সেই সাত ব্যক্তির একজন যিনি তাঁহার ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা প্রকাশ্যে জনসমক্ষে দিয়াছিলেন। অন্য পাঁচজন হইলেন ঃ আবূ বাক্‌র, সুহায়ব, আম্মার, খাব্বাব ও সুমায়্যা (ইব্‌ন হিশাম, ৩১৭-৩১৮; ইব্‌ন সা'দ, ৩খ., ২৩২-২৩৩; উদসুল গাবা, ১খ., পৃ. ২০৬-২০৯)।

(১১৬) সুমায়্যা (আবূ হুযায়ফার ক্রীতদাসী ও আম্মার ইব্‌ন ইয়াসিরের মাতা) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে স্বামী ও পুত্রগণসহ ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহার উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়। আবূ জাহ্‌ল তাঁহাকে এক পর্যায়ে হত্যা করে। তিনিই ইসলামে প্রথম মহিলা শহীদ (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩১৯-৩২০; ইব্‌ন সাদ, ৩খ., পৃ. ২৩৩, ২৪৬-২৪৯; উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৪৮১-৪৮২)।

(১১৭) হামামা (বিলালের মাতা) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। সেজন্য তাঁহার উপর অত্যাচার-নির্যাতন চালানো হয় (আল-ইসতীআব, ৪খ., পৃ. ১৮১৩, নং ৩৩০১)।

(১১৮) আবূ ফুকায়হা (বানূ আবদুদ দারের দাস) ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁহার উপর নিপীড়ন-নিগ্রহ চালানো হয় (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ২৭৩)।

(১১৯) 'আমর ইব্‌ন ফুহায়রা (তুফায়ল ইবনুল হারিছের দাস) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সে কারণে তাঁহার উপর অত্যাচার-নিপীড়ন চলে (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩১৮; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৯০-৯১)।

(১২০) লুবায়না বা লুবায়বা। এই মহিলাকে ইব্‌ন হিশাম বানূ মুয়াম্মালের ক্রীতদাসী হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এজন্য তাঁহার উপর অত্যাচার-নির্যাতন চলে। বিশেষ করিয়া উমার ইবনুল খাত্তাব ইসলাম গ্রহণের আগে এই মহিলার উপর নিপীড়ন চালান (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩১০)।

(১২১) উম্মু 'উবায়স (বানূ যুহরা বা বানূ তায়ম-এর ক্রীতদাসী) ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সেজন্য তাঁহার উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালানো হয় (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩১৮, উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৬০১)।

(১২২) যান্নীরা আর-রুমিয়্যা (বানূ আদিয়্যি বা বানূ মাখযূমের ক্রীতদাসী) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং এজন্য নির্যাতন ভোগ করেন (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩১৮; উসদুল গাবা, ৫খ., ৪৬২)।

(১২৩) নাহদিয়্যা ও তাঁহার কন্যা (বানূ 'আবদুদ দারের ক্রীতদাসী) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এজন্য তাঁহাদিগকে অত্যাচার-নির্যাতন ভোগ করিতে হয় (ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ৩১৮-৩১৯)।

(১২৪) উম্মু আয়মান বারাকা বিন্‌ত ছা'লাবা (আল্লাহ্‌র রাসূলের পারিবারিক পরিচারিকা) ইসলামের অতি আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করিয়া প্রথমে আবিসিনিয়া ও পরে মদীনায় হিজরত করেন (উসদুল গাবা, ৫খ., পৃ. ৫৬৭)।

(১২৫) মিহজান ইবনুল আদরা আল-আসলামী ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (আল-ইসাবা, ৩খ., পৃ. ৩৬৬-৩৬৭, নং ৭৭৩৮)।

(১২৬) মাস'উদ ইব্‌ন রাবী'আ ইব্‌ন আমর (বানূ আল-হূন ইব্‌ন খুযায়মা) মহানবী ﷺ-এর দারুল আরকামে প্রবেশের আগেই ইসলামের অতি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন (উসদুল গাবা, ৪খ., পৃ. ৩৫৭)।

অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন

তথ্যনির্দেশিকা

১. উপরে দ্র. পৃ. ৩৯০। আরও দ্র. মুহাম্মাদ আবূ শাহবাহ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা ইত্যাদি, ১খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪ ও মুহাম্মাদ ইযযাত দারওয়াজা, সীরাতুর রাসূল, ১খ., পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮)।

২. ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্য (ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৪১) সূরা আদ-দুহা, (৯৬) ফাতরাহ্‌র পর নাযিল হইয়াছিল বলিয়া যে বয়ান দিয়াছেন তাহা ঐ সূরাটি নাযিল হওয়ার উপলক্ষ সংক্রান্ত বিষয়ে বুখারী প্রদত্ত বিবরণ (নং ৪৯৫০) অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য নহে। কুরআন সম্পর্কিত কোন বিশেষজ্ঞ (উলূমুল কুরআন) ব্যক্তিই এই সূরা ফাতরাহ-এর পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন না, যদিও তাহারা এই সূরা গোড়ার দিকেই অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন (দ্র. আস-সুয়ূতী, আল-ইতকান, পৃ. ১০)।

৩. ইব্‌ন হিশাম ১খ., পৃ. ২৬২।

৪. আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., পৃ. ১১৬৯।

৫. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ২৪৯, মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

قَالَ ابْنُ اِسْحَاقَ فَلَمَّا اَسْلَمَ اَبُوْ بَكْرٍ (رض) اَظْهَرَ اِسْلاَمَهُ وَدَعَا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ .

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫০-৬২; পরেও দ্র. পৃ. ৫২০-৫২১)।

৭. আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., পৃ. ১১৬০-১১৬৩; আরও দ্র. উসদুল গাবা, নং ৩৬৯৬ ও ইসতীআব, ৩খ., পৃ. ১২৪১-১২৪৩ (২০৩৬)।

৮. আয-যুরকানী, শারহ মাওয়াহিব, সায়্যিদ মওদূদী কর্তৃক উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, ২খ., পৃ. ১৪৫।

৯. আল-ইসাবা, নং ৪২৬৬ (২খ., পৃ. ২২৯)।

১০. ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া, ৭খ., পৃ. ২৪৭; ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৮২।

১১. বস্তুতপক্ষে, ইহা দ্বিতীয় প্রত্যাদেশ হিসাবে সর্বজনীনভাবে গণ্য।

১২. নিম্নে দ্র. পৃ. ৬২০-৬২১।

১৩. মুসনাদ, ২খ., পৃ. ৯৫; তিরমিযী, নং ৩৭৬৪; আল-মুসতাদরাক, ৩খ., পৃ. ৮৩; ইব্ন মাজা, ১খ., পৃ. ৩৯ (নং ১০৫); ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৬৯।

১৪. বুখারী, নং ৪৮৬৪।

১৫. ইব্ন সা'দ, তাবাকাত, ৩খ., পৃ. ২৬৯; ইবনুল জাওযী, মানাকিব উমার, (বাব ২), পৃ. ১৮।

১৬. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৬৩।

১৭. দ্র. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৪৫-২৪৬, ২৪৭, ২৪৯; ইব্ন ইসহাক, আস-সিয়্যার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৩৮-১৪০; আয-যাহাবী, আস-সীরাত ইত্যাদি, পৃ. ১২৭, ১৩৭-১৩৮ ও সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা, ২খ., পৃ. ১১৫; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৩০৯-৩১০, ৩১২-৩১৩, ৩১৭(১/১১৫৯-১১৬০, ১১৬৩-১১৬৪, ১১৬৮)।

১৮. সায়্যিদ মওদূদী, পূ. গ্র, ২খ., পৃ. ১৪৩-১৪৪, পাদটীকা।

১৯. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ২৫০-২৫২।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫২-২৬২।

২২. ইব্ন ইসহাক, কিতাবুস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৪৫-১৪৬; আত-তাবারী, তারীখ, (১/১১৭১-১১৭২); ইবনুল আছীর, আল-কামিল ইত্যাদি, ২খ., পৃ. ৪০-৪১। আয-যাহাবী, আস-সীরাত, পৃ. ১৪৪-১৪৫।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. এই ঘটনা সম্পর্কিত অপর এক বিবরণের ভাষ্য অনুযায়ী আভাস পাওয়া যায় যে, মহানবী ﷺ বাস্তবিকই এই প্রশ্নে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিলেন। দ্র. ইব্ন ইসহাক, কিতাবুস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৪৫-১৪৬।

২৫. আবূ তালিব ও আবূ লাহাব ভিন্ন ভিন্ন মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

২৬. দ্র. ইব্ন সা'দ, ১খ., ২০০।

২৭. প্রাগুক্ত, বুখারী, নং ৪৯৭১। আরও দ্র. তাবারী, তাফসীর, ৩০খ., পৃ. ৩৩৬-৩৩৭ এবং ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৮খ., পৃ. ৫৩৪।

২৮. প্রথম স্বামীর ঔরসে খাদীজা (রা)-এর পুত্র।

২৯. আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ২৯৩, নং ১৫০১।

৩০. ইব্ন আল-কাছীর, আল-বিদায়া, ৩খ., পৃ. ৩০-৩১; আল-ইসাবা, ৫খ., পৃ. ৪৪৭, নং ১২৫৪ (কিতাবুন নিসা, উম্মুল খায়র)।

৩১. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩১৪-৩১৫।

৩২. দৃষ্টান্ত হিসাবে দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর, ৩০খ., পৃ. ৩৩ ও ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৮খ., পৃ. ৩৪২-৩৪৩।

৩৩. দ্র. মুসলিম (সম্পা. এফ. এ. বাকী), নং ২৪১৩; আল-কুরতুবী, তাফসীর, ৬খ., পৃ. ৪২১-৪৩৩ ও ১০খ., পৃ. ৩৯০-৩৯১; ইব্ন কাছীর, তাফসীর ৩খ., পৃ. ২৫৪-২৫৫ ও ৫খ., পৃ. ১৪৮।

৩৪. ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৯১-২৯২; ইব্ন ইসহাক, কিতাবুস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৭১-১৭২। এই বর্ণনার আরেক ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণের আগে কিছু ইতস্তত করিয়া পরিশেষে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন।

৩৫. দ্র. যুরকানী, শারূহ মাওয়াহিব, ১খ., পৃ. ৩০৮-৩০৯; আল-ইসাবা, ১খ., পৃ. ৩৫৩-৩৫৪, নং ১৮২৬।

৩৬. ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৯১।

৩৭. উসদুল গাবা, ২খ., পৃ. ২৩৮-২৩৯, ইয়ামামার যুদ্ধে যায়দ ইবনুল খাত্তাব (রা) শহীদ হইলে উমার (রা) এই মর্মে মন্তব্য করেন যে, তাহার এই ভ্রাতা দুইটি উত্তম বিষয়ে তাঁহার চাইতে আগাইয়া রহিয়াছেন ঃ (এক) ইসলাম গ্রহণ ও (দুই) শহীদের সম্মান প্রাপ্তি।

৩৮. উসদুল গাবা, ৩খ. (নূতন সংস্করণ), নং ৩৮২৪-এ বেশিরভাগ বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়াছে; আরও দ্র. আয-যাহাবী আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যাহ, বৈরূত, ১৯৮৭, পৃ. ১৭২-১৮১; ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৪২-৩৫০; ইব্ন সা'দ, ৩খ., পৃ. ৩৬৯; মুসনাদ, ১খ., পৃ. ১৭-১৮।

৩৯. পূর্বে দ্র., পৃ. ৫১৮-৫১৯।

৪০. মুসনাদ, ১খ., পৃ. ১৭, ১৮।

৪১. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৪৭-৩৪৮; আয-যাহাবী, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, পৃ. স্থা., পৃ. ১৭৩; ইবনুল জাওযী, মানাকিব উমার, পৃ. ১৫।

৪২. ইব্ন ইসহাক বলিয়াছেন, কুরায়শ নেতারা মহানবী ﷺ -কে হত্যা করার জন্য উমারকে নিয়োজিত করিয়াছিল (কিতাবুস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৮১)। আরও দ্র. উসদুল গাবা, পৃ. স্থা।

৪৩. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৪৫-৩৪৬; ইব্ন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২৬৭-২৬৯; উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৬৪৪-৬৪৭।

৪৪. প্রাগুক্ত, আরও দ্র. ইব্ন ইসহাক, কিতাবুস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৮৪-১৮৫।

৪৫. বুখারী, নং ৩৮৬৪-৩৮৬৫; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ., পৃ. ৯; ইবনুল জাওযী, পূ. গ্র.।

৪৬. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩৪২, ৩৪৩-৩৪৪।

৪৭. দৃষ্টান্ত স্বরূপ দ্র. ইব্ন সা'দ, ৩খ., পৃ. ২৭০; ইব্ন হিশাম, পৃ. ২৪২; ইব্ন ইসহাক, কিতাবুস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৮৫।

৪৮. উসদুল গাবা, ৩খ., পৃ. ৫৪-৫৫।

৪৯. ইসলামী বিষয়ের আলোচনায় সচরাচর পুনরাবৃত্তি ফর্মুলাটির আরবী মূল পাঠ ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।

৫১. প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ১২০-১২১।

৫২. বুখারী, নং ৩৮৬১; উসদুল গাবা, ১খ., পৃ. ৩০১-৩০৩।

৫৩. প্রাগুক্ত, ৩খ., পৃ. ২৪৫-২৪৬; ৫খ., পৃ. ৩০৮-৩০৯।

৫৪. প্রাগুক্ত, ৪খ., পৃ. ৪০২-৪০৩।

৫৫. প্রাগুক্ত, ১খ., পৃ. ১৭৫-১৭৬।

৫৬. সায়্যিদ মওদূদী, পূ. গ্র., ২খ., পৃ. ৫৪২।

৫৭. উপরে দ্র. পৃ. ৫২১-৫২৪।

বাইশতম অধ্যায়

মার্গোলিয়থের তত্ত্ব ঃ ইসলাম একটি গুপ্ত সঙ্ঘ

'ওহী' সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের অভিমত বাদ দিলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রাথমিক পর্যায়ের ধর্ম প্রচার সংক্রান্ত তাহাদের ধারণা মূলত তিনটি বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ঃ (ক) তথাকথিত 'গুপ্ত প্রচারণা'-এর সময়কাল, (খ) নবদীক্ষিত মুসলমানদের চরিত্র ও উদ্দেশ্য, (গ) প্রাথমিক অবস্থায় অবতীর্ণ 'ওহী'র বিষয়বস্তু ও শিক্ষা। উল্লেখ্য যে, ইব্‌ন ইসহাকের ভাষায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রাথমিক অবস্থায় 'সংগোপনে' ধর্মপ্রচার পরিচালনা করেন। আমরা ইতোমধ্যে তাহার উক্ত মন্তব্য পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং তাহার প্রদত্ত অপরাপর তথ্যের আলোকে এবং এই বিষয়ে পবিত্র কুরআনের প্রাথমিক দলীলের ভিত্তিতে আমরা প্রমাণ করিয়াছি যে, ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও একাকী মনোযোগ আকর্ষণ। কোনক্রমেই ইহা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার অনুসারীদের জন্য 'গুপ্ত' প্রচারণার উদ্যোগ নয়।[১]

ইব্‌ন ইসহাকের বক্তব্যের মর্ম অন্তত যথার্থভাবে উপলব্ধি করিয়া উইলিয়াম মুইর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "ব্যক্তিগত আবেদন ও গুপ্ত প্রচারণায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন বৎসর কাটাইয়াছেন— এই বক্তব্যের কোন দৃঢ় ভিত্তি নাই বলিলেই চলে"। মুইর অভিমত ব্যক্ত করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী প্রাপ্ত হইবার পর 'ধারাবাহিক স্বল্প সময়ের' জন্য স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত উদ্বুদ্ধকরণ ও দা'ওয়াতের মাধ্যমে তাঁহার মিশন অব্যাহত রাখেন। কিন্তু কোনক্রমে ইহা নিশ্চিত বিশ্বাস করা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতী মিশন 'সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল'। তিনি আরো বলেন, ব্যক্তিগত দাওয়াত প্রদানের স্বল্প সময় অতিবাহিত হইবার পর তিনি উঠিয়া দাঁড়াইবার এবং জোরেশোরে সত্য প্রচারে আল্লাহর নির্দেশ লাভ করেন, সাথে সাথে তিনি মক্কার সকল জনগোষ্ঠীর কাছে দাওয়াত পৌঁছাইয়া দেন।[২]

অনুরূপভাবে মুইর নবদীক্ষিত মুসলমানদের চরিত্র ও ধর্মান্তরকরণ বিষয়ে উল্লিখিত সূত্র প্রদত্ত তথ্যকে গ্রহণ করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, নবদীক্ষিতগণ ছিলেন অধিকাংশ রাসূলুল্লাহ ﷺ

-এর আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু।[৩] শেষোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে মুইর মন্তব্য করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সুদৃঢ় আন্তরিকতায় ইহা স্পষ্ট যে, নবদীক্ষিত মুসলমানগণ কেবল উন্নত নৈতিক চরিত্রেরই অধিকারী ছিলেন না, বরং তাঁহার (মুহাম্মাদ ﷺ-এর) ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যও ছিলেন, যাহারা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইবার কারণে ঐসব অসামঞ্জস্য আবিষ্কারে কোনমতেই ব্যর্থ হইতেন না যাহা সাধারণত কোন বিদেশী ও মুনাফিকসুলভ প্রতারকদের বক্তব্যে কমবেশী বিদ্যমান থাকে।[৪] উক্ত মন্তব্য প্রকাশের মাধ্যমে মুইর মূলত স্প্রেঙ্গারের সিদ্ধান্তকে কিছুটা মানিয়া লইয়াছেন নিম্নোক্ত ভাষায় ঃ

"জীবনের প্রারম্ভে মুহাম্মাদের আন্তরিকতার গ্যারান্টি এবং বস্তুত কিছুটা পরিবর্ধিত হইয়া সারা জীবন জুড়িয়া আবূ বাক্‌র (রা)-এর বিশ্বাস বিবেচনায় স্প্রেঙ্গারের অভিমতের সহিত আমি ঐকমত্য পোষণ করি"।[৫]

মার্গোলিয়থের অভিমত উপরিউক্ত অভিমতের সম্পূর্ণ বিপরীত। মার্গোলিয়থের পুরা মনোযোগ পরিচালিত হইয়াছে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে একজন প্রতারক ও প্রবঞ্চকরূপে উপস্থাপন করার প্রয়াসে। তাহার, মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উচ্চাভিলাষী ও মানবচরিত্রের একজন নিরাবেগ বিচারক হিসাবে পয়গাম্বরের ভূমিকা পালনে সতর্ক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে আল্লাহর পক্ষ হইতে প্রত্যাদেশ লাভের মিথ্যা দাবি করিয়া বসেন। এই প্রস্তাবনা হইতে অগ্রসর হইয়া মার্গোলিয়থ ইবন্ ইসহাকের বক্তব্যকে বিকৃত করিয়া 'গুপ্ত সঙ্ঘ'-এর থিওরী নির্মাণ করেন এবং বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ চল্লিশ বৎসর বয়সে গুপ্ত সঙ্ঘের প্রধানরূপে নিজেকে উপস্থাপন করেন।[৬] বস্তুত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিশনের প্রথম পর্যায়কে 'গুপ্ত সঙ্ঘরূপে ইসলাম' শিরোনাম দিয়া[৭] মার্গোলিয়থ কেবল ওহীর বিষয়বস্তু, পদ্ধতি ও বিন্যাস সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলক মন্তব্যই করেন নাই, বরং সত্য বিকৃত করিয়া তাঁহার থিওরীকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করিবার লক্ষ্যে প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারী প্রত্যেক সাহাবী সম্পর্কে তথ্য বিকৃতি ঘটাইয়া জঘন্য পন্থায় দোষারোপ করিতে ছাড়েন নাই।

এক ঃ আবূ বাক্‌র (রা)-এর বিরুদ্ধে বক্রোক্তি

প্রথমত মার্গোলিয়থ আবূ বাক্‌র (রা)-এর প্রসঙ্গ টানেন যিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত এবং অপরাপর মানুষের ইসলাম গ্রহণে যাঁহার ভূমিকা বেশ জোরালো। মার্গোলিয়থ বলেন, "মুহাম্মাদ উনচল্লিশ বৎসর বয়সে আবূ বাক্‌র (রা)-এর সহিত পরিচিত অথবা ঘনিষ্ঠ হন"। 'ব্যবসায়িক দক্ষতা' 'উল্লেখযোগ্য ঐশ্বর্য, দয়া ও সৌজন্যপূর্ণ স্বভাব এবং আকর্ষণীয় জীবন আচরণ-এর কারণে আবূ বাক্‌রের সান্নিধ্য মক্কার মানুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত ও আকর্ষণীয় হইয়া উঠে এবং তিনি একজন বীর পূজারী হইয়াছিলেন। সাধারণত নারীসুলভ যোগ্যতা যদি কারো থাকে, পুরুষের মধ্যেও অনেক সময় এমন যোগ্যতা পাওয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চাত দিকে না তাকাইয়া কোন প্রশ্ন ছাড়াই অথবা অঙ্গভঙ্গি সহকারে তাৎক্ষণিকভাবে তাহাকে পুরোভাগে

আনিবার চেষ্টা করা হয়।[৮] মার্গোলিয়থ আরো বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মানব চরিত্রের একজন বিচক্ষণ বিচারক হিসাবে আবূ বাক্র (রা)-এর এই যোগ্যতাকে উপলব্ধি করেন এবং কাজে লাগান। 'অতঃপর অন্তরঙ্গতা সৃষ্টির এক বৎসর পর' ধর্মান্তরকরণ সম্পন্ন হয়, মুহাম্মাদের মাধ্যমে নয় বরং আবূ বাক্রের ইচ্ছায়।[৯] মার্গোলিয়থ আরও দৃঢ়তার সহিত বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ অন্য জগত হইতে প্রাপ্ত আল্লাহর বাণী প্রচারে মাধ্যম ভূমিকা পালনকারী হিসাবে নিজেকে প্রকাশ[১০] করেন এবং ইহা সম্ভব হইয়াছে 'আবূ বাক্রের গ্রহণ ক্ষমতার কারণে'।[১১]

মার্গোলিয়থের অন্যান্য মন্তব্য বিশ্লেষণের পূর্বে উপরিউক্ত বক্তব্যের অসারতা উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরী। দাওয়াত প্রদানের এক বৎসর পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র (রা)-এর সহিত ঘনিষ্ঠ হন অথবা পরিচিতি লাভ করেন—এমন মন্তব্যের পশ্চাতে তিনি কোন সূত্র উল্লেখ করেন নাই। বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র হইতে জানা যায়, কিশোরকাল হইতে তাঁহারা একে অপরের সহিত পরিচিত ছিলেন। তৎকালীন মক্কার ন্যায় একটি ছোট শহরে বসবাসকারী রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্র (রা) একে অপরের সহিত প্রায় সঁইত্রিশ বৎসরব্যাপী[১২] একে অপরের অপরিচিত থাকিবেন ইহা সাধারণ ধারণার অগম্য। এইরূপ সমাজে একে অপরের জীবনধারা ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সম্যক অবগত থাকেন। আবূ বাক্র (রা) -এর ব্যতিক্রমধর্মী যোগ্যতা, বিশেষত আকর্ষণীয় জীবন আচরণ-এর ফলে মানুষ তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য উদগ্রীব থাকিত, মার্গোলিয়থের এমন মন্তব্য স্ববিরোধী ও বেমানান। নবূওয়াতের মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে যিনি কা'বা গৃহ পূনঃনির্মাণের ইতিহাস খ্যাত গোত্রীয় বিতর্কে সালিশী ভূমিকা পালন করেন তাঁহাকে ঐ এলাকার মানুষ চিনিবে না এমন তো হইতে পারে না।

"মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি ও ভাগ্যান্বেষণের তাড়নাই আবূ বাক্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ", মার্গোলিয়থের এমন উক্তি এইখানে সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর ও অযৌক্তিক। এই কথা সর্বজনবিদিত যে, দীন প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন মাত্রাতিরিক্ত ভক্তিযোগ্য কোন বীরপুরুষ ছিলেন না, তেমনি তাঁহার আন্দোলনের পথে কোন বিশেষ অনুগ্রহ তখন সুপ্রসন্ন হয় নাই। সুতরাং আবূ বাক্র (রা)-এর ব্যবসায়িক সূক্ষ্মবুদ্ধির কারণে কোন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বীরপুরুষ হিসাবে স্বীকৃতি দিবেন এমন এক সময়ে যখন একজনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই অথবা সৌভাগ্যের পাখি যখনও ডানা মেলে নাই, বিষয়টি এইখানে বিশ্লেষিত হওয়া দরকার। মোটকথা, আবূ বাক্র (রা) এতকাল পর্যন্ত কম বিত্তশালী ছিলেন না অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ হইতে কম পরিচিত ব্যক্তিও ছিলেন না।

মার্গোলিয়থ সম্ভবত ইঙ্গিত দিতে চাহিয়াছেন যে, আবূ বাক্র (রা) ছিলেন নবূওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রথম ব্যক্তি। অথচ ইহা স্পষ্টত সর্বসম্মত বর্ণনার সহিত সাংঘর্ষিক। কেননা খাদীজাতু'ল-কুবরা (রা) হইতেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াতে বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রথম ব্যক্তি। মার্গোলিয়থ নিম্নোক্ত গুপ্ত পাদটীকার উদ্ধৃতি দিয়া নবূওয়াতে প্রথম বিশ্বাস স্থাপনকারী প্রশ্নকে সযত্নে এড়াইয়া যান। "নলডেকে (in ZDMG, পৃ. ১৬-২১) অপরাপর কুরায়শদের

সহিত নবদীক্ষিত খাদীজা, যায়দ, 'আলী এবং কতিপয় ক্রীতদাস, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও আবূ বাক্রের নাম ক্রমানুযায়ী বর্ণনা করেন।"[১৩]

এইখানে অবশ্যই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, নলডেকে নয়, বরং বিপুল সংখ্যক সূত্র ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষত যায়দ (রা), 'আলী (রা) ও আবূ বাক্র (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ক্রমধারা বিন্যাসে ভিন্নমত পোষণ করেন। যায়দ (রা) ও 'আলী (রা)-র মধ্যে কে আগে ইসলাম কবূল করেন এই বিষয়ে বর্ণনার ভিন্নতা যাহাই থাকুক না কেন তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের পিছনে আবূ বাক্র (রা)-এর কোন ভূমিকা ছিল না। নলডেকের ধারাক্রম অনুযায়ী ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে আবূ বাক্র (রা)-এর স্থান প্রায় অষ্টম। আবূ বাক্র (রা)-কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীরূপে চিত্রায়িত করিবার পশ্চাতে কি যুক্তি রহিয়াছে মার্গোলিয়থ তাহাই উল্লেখ করেন নাই। নির্ভরযোগ্য সূত্র অনুযায়ী আবূ বাক্র (রা)-এর প্রচেষ্টায় চার কি পাঁচজন ইসলাম গ্রহণ করেন। নবদীক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ইহার চাইতে দশ গুণ বেশী। তাঁহারা হয়ত নিজেদের আগ্রহে অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতী কার্যক্রমে ইসলাম কবুল করিয়া ধন্য হন। মার্গোলিয়থ নিজেই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, নবূওয়াতের প্রচার শুরু (মার্গোলিয়থের ভাষায় পাবলিসিটি)[১৪] হওয়ার পূর্বে নবদীক্ষিতদের সংখ্যা ছিল প্রায় এক শত। তিনি দশজনকে ইসলামে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পেশ করিতে পারেন নাই।

দাওয়াতী কর্মের সূচনা ও আবূ বাক্র (রা)-এর ব্যাপারে ভ্রান্তিপূর্ণ মন্তব্য সত্ত্বেও মার্গোলিয়থ খাদীজা (রা)-এর মর্যাদা এবং তাঁহার ইসলাম গ্রহণে আবূ বাক্র (রা)-এর ভূমিকার অনুপস্থিতিকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। মার্গোলিয়থ নিয়ম মাফিক খাদীজা (রা)-এর ব্যাপারেও তথ্য বিকৃতি ও ভুল ব্যাখ্যা করিতে ছাড়েন নাই। নিজ স্বামী কর্তৃক ওহী প্রাপ্তির অব্যবহিত পর ওয়ারাকা ইবন্ নাওফাল-এর সহিত খাদীজা (রা)-এর সাক্ষাতের ঐতিহাসিক ঘটনাকেও তিনি গ্রহণ করেন নাই। তথাপি মার্গোলিয়থ প্রত্যয়ের সহিত অভিমত ব্যক্ত করেন, "মক্কার তৎকালীন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য তাঁহার জ্ঞাতি ভাইয়ের চিন্তাপ্রসূত বিবেচনার দ্বারা তিনি মানসিক প্রস্তুতি লাভ করেন"।[১৫]

মার্গোলিয়থ ইঙ্গিত দিয়া বলেন, "প্রিয় সন্তান বিয়োগের পর মাতৃসুলভ দুঃখ" তাঁহার ইসলাম গ্রহণের অন্যতম কারণ।[১৬] তাঁহার প্রত্যয়কে দৃঢ় করিবার জন্য তিনি একটি হাদীছের উদ্ধৃতি প্রদান করেন।[১৭] একবার খাদীজা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানিতে চাহেন যে, তাঁহাদের মৃত সন্তান কি জাহান্নামে যাইবে? মার্গোলিয়থ বলেন, "প্রশ্নের উত্তরে" রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরআনের একটি উদ্ধৃতি পেশ করেন ঃ "এবং যাহারা ঈমান আনে আর তাহাদের সন্তান-সন্ততি ঈমানে তাহাদের অনুগামী হয়, তাহাদের সহিত মিলিত করিব তাহাদের সন্তান-সন্ততিকে এবং তাহাদের কর্মফল আমি কিছুমাত্র হ্রাস করিব না; প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী"[১৮] একটি বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর। এতদ্বারা মৃত প্রিয় সন্তানের পরকালীন শান্তির নিশ্চয়তা শোকাহত মায়ের

ধর্মান্তরকে শর্তসাপেক্ষ করা হয়। বিস্ময়ের কিছু নাই খাদীজা (রা) দাওয়াতী কাজে নিজের মন-প্রাণ নিবেদিত করেন এবং জান্নাতে একটি বিশেষ মাকামের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হন।[১৯]

মার্গোলিয়থের উপরিউক্ত বক্তব্য অসঙ্গতিপূর্ণ ও সুস্পষ্ট ত্রুটিযুক্ত। ওয়ারাকা ইব্‌ন নাওফালের সহিত খাদীজা (রা)-এর সাক্ষাতের সত্য ঘটনাকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। তবুও পরবর্তীতে খাদীজা (রা) -এর উপর ওয়ারাকার প্রভাব সম্পর্কিত অনুমান তাহাদের প্রথম সাক্ষাতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। কারণ খাদীজা (রা) -এর সহিত ওয়ারাকার কোন সংস্রব অথবা এমনকি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ অথবা এই ধর্ম সম্পর্কে কোন জ্ঞান তাহার ছিল এই রকম সামান্যতম উল্লেখ পরোক্ষভাবেও নাই।

মার্গোলিয়থ আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন যে, ওয়ারাকার পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানের দ্বারা খাদীজা (রা) মানসিকভাবে মক্কার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন অথচ তাঁহার স্বামী রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ওহী লাভের ঘটনা জ্ঞাতি ভাই ওয়ারাকার কাছে বিবৃত করা তাঁহার পক্ষে ছিল একান্তই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, ইহা সম্পূর্ণ অসঙ্গত যে, সন্তানের মৃত্যুতে মাতৃসুলভ দুঃখই খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ। মৃত সন্তানের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত খাদীজা (রা)-এর কথিত আলাপ এবং পবিত্র কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতে (৫২ ঃ ২১) তাঁহার ইসলাম গ্রহণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সমর্থনের অনেক পরবর্তী ঘটনা। তৃতীয়ত, মার্গোলিয়থ সুস্পষ্টভাবে পবিত্র কুরআনের ৫২ঃ২১ আয়াতের অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা কোনক্রমেই মা-বাবার ধর্মবিশ্বাসের উপর 'বীজ'-এর মুক্তি নির্ভরশীল নয়। এমনকি মার্গোলিয়থ উক্ত আয়াতের অনুবাদে উল্লেখ করেন যে, 'বীজ' অবশ্যই মা-বাবার 'ধর্ম বিশ্বাস'-কে অনুসরণ করিবে। মূলত সংশ্লিষ্ট আয়াতে ব্যক্তিগত জবাবদিহির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। মার্গোলিয়থ আয়াতের শেষাংশটি উদ্ধৃত করেন নাই যেখানে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে ঃ "প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী"।[২০]

মূলত মার্গোলিয়থ পরবর্তীতে তাহার কটাক্ষপূর্ণ মন্তব্যের সহিত নিজেই বিরোধিতায় নামিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ফাতরাহ (ওহীর অবতরণে বিরতি)-এর ঘটনা এবং খাদীজা (রা) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সান্ত্বনা দানের ঘটনা উল্লেখ করেন। উহাতে বলা হইয়াছে যে, দৃঢ় বিচারশক্তি সম্পন্ন মহিলা তাহাঁর স্বামীকে বাধ্য করেন যাহাতে নিজের আপন পথে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন।[২১]

মার্গোলিয়থ সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেন নাই যে, ওয়ারাকার পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধান যদি খাদীজা (রা) এমন মন-মানসকে মক্কার পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, দাওয়াতী মিশন দ্বারা যদি খাদীজা (রা) প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত হইয়া তাঁহার স্বামী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে মিশন চালাইয়া যাইতে 'বাধ্য' করেন অথবা প্ররোচিত করেন তাহা হইলে সন্তান হারানোর বেদনায় দুঃখের মিনতি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রদত্ত পরকালীন সুখ প্রাপ্তির কথিত আশ্বাস খাদীজা (রা)-এর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কারণ, একথা বলার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। খাদীজা

(রা)-এর কর্মপ্রয়াস সম্পর্কে উপরিউক্ত মন্তব্য করিতে গিয়া মার্গোলিয়থ সম্ভবত উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন যে, ইহা আবূ বাক্‌র (রা)-এর ভূমিকার ব্যাপারে তাহার মতবাদের সহিত কিছুটা স্ববিরোধী। অতঃপর সত্বর তিনি বলেন, "কিন্তু বাস্তবে তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) আবূ বাক্‌র-এর সহিত দাওয়াতী মিশন চালাইতে বাধ্য হইয়াছেন যিনি তাৎক্ষণিকভাবে ধর্মান্তরকরণ শুরু করিয়াছিলেন"।[২২] এইখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার মিশন পরিচালনায় কোন ব্যক্তি দ্বারা বাধ্য হন নাই, এমনকি খাদীজা (রা) ও আবূ বাক্‌র (রা)-এর দ্বারাও নহেন। কেবল আবূ বাক্‌র (রা) -এর ইসলাম গ্রহণের ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার দাওয়াতী কর্মে অটল ছিলেন এমন প্রশ্নও অবান্তর। ইতোপূর্বে মার্গোলিয়থ মন্তব্য করিয়াছিলেন, "আবূ বাক্‌র-এর প্রথম বৎসরের প্রচারণার ফলে তিনজন ইসলাম গ্রহণ করেন"।[২৩]

কোন ধর্মপ্রচারকের মিশন পরিচালনার জন্য স্পষ্টত ইহা কোনক্রমে উৎসাহব্যঞ্জক সংখ্যা যেমন নয় তেমনি বাধ্যবাধকতার প্রসঙ্গটিও অসঙ্গতিপূর্ণ। তাহার ভাষায় তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ নবূওয়াতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা হইতে অগ্রসর হইয়া আল্লাহর রাসূলের ভূমিকা পালনের সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন এবং আবূ বাক্‌র (রা)-এর 'গ্রহণক্ষমতা' ও তাঁহার ধর্মান্তর প্রক্রিয়ায় বাধ্য হইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার মিশন পরিচালনা করেন। সঙ্গত কারণে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, যদি আবূ বাক্‌র (রা) সরল বিশ্বসী ও বীর পূজক হইয়া অন্যের ভাগ্য অনুসরণে প্রস্তুত থাকেন তাহা হইলে কেন অন্যরা এই 'প্রচারণায়' বশীভূত হইবে? তাহারাও কি বীর পূজক ও অন্যের সৌভাগ্য অনুসরণকারী? খাদীজা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের দৃষ্টান্ত পেশ সত্যিকার অর্থে মার্গোলিয়থের মতবাদের সুস্পষ্ট খণ্ডন। মার্গোলিয়থ বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর আগ্রহে আবূ বাক্‌র (রা) 'গভীর গোপনীয়তায়' এই প্রচারণা অব্যাহত রাখেন এবং 'প্রথম হইতে' আবিসিনীয় ক্রীতদাস বিলাল তাহাকে সহায়তা প্রদান করেন। মার্গোলিয়থের ভাষায়, বিলাল (রা) হইতেছেন ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর উপস্থাপিত বাণীতে 'কতিপয় আবিসিনীয় উপাদান' আরোপের প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন তিনি। 'কিছুকাল পর আবূ বাক্‌র (রা) কর্তৃক বিলাল (রা)-কে ক্রয় করিয়া মুক্তি দেওয়া হয়।[২৪]

এইখানেও মার্গোলিয়থ বেশ কিছু ভ্রান্তিপূর্ণ তথ্য প্রদান করিয়াছেন। বিলাল (রা) ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন না। ইহা মোটেও সত্য নহে যে, বিলাল (রা) হইতে উৎসারিত আবিসিনীয় উপাদান পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে। সর্বোপরি তাঁহার ইসলাম গ্রহণ মোটেও 'গোপন' ব্যাপার ছিল না। সম্পূর্ণ বিপরীত তথ্য হইতেছে, বিলাল (রা) প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁহার মালিক তাঁহার উপর এমন অমানবিক নির্যাতন চালায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রা) ইহাতে মর্মপীড়া অনুভব করেন এবং আবূ বাক্‌র (রা) মালিকের নিকট হইতে তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুক্ত করিয়া দেন।[২৫] আবূ বাক্‌র (রা)-এর কথিত 'গোপন' ধর্মান্তরকরণ প্রক্রিয়ায় বিলাল (রা)-এর প্রসঙ্গ টানিয়া পাঠকদের মার্গোলিয়থ বিভ্রান্ত করিবার অপপ্রয়াস চালাইয়াছেন। সন্দেহাতীতভাবে প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তিদের অন্যতম বিলাল (রা)-এর উপর

নির্যাতনের ঘটনা এবং তাঁহাকে মালিকের নিকট হইতে আবূ বাক্‌র (রা) কর্তৃক ক্রয় ও মুক্তি দানের বিষয় কোনক্রমেই 'সুগভীর গোপনীয়তা' ছিল না। তিনি চূড়ান্তভাবে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াছেন এবং গোপন ধর্মান্তরকরণের মতবাদ ফাঁদিয়াছেন।

দুই ঃ উছমান ইব্ন আফ্‌ফান (রা) ও অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ

মার্গোলিয়থ (তাহার ভাষায়) ইসলাম গ্রহণকারী তৃতীয় ব্যক্তি হযরত 'উছমান ইব্ন 'আফ্‌ফান (রা)-এর প্রসঙ্গ টানিয়া নানা কাল্পনিক অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। মার্গোলিয়থ বলেন, 'উছমান (রা) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সুন্দরী কন্যা রুকায়্যা (রা)-কে ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে জনৈক ব্যক্তির সহিত বিবাহার্থ বাগদানের কথা পাকাপাকি হইয়াছে এই কথা জানিতে পারিয়া মর্মজ্বালা অনুভব করিলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার দুঃখের কথা বন্ধু আবূ বাক্‌র (রা)-এর গোচরীভূত করেন। মার্গোলিয়থের ভাষায়, "আবূ বাক্‌র (রা) উছমান (রা)-কে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নবূওয়াতের উপর ঈমান আনয়ন করেন তাহা হইলে নবী নন্দিনী তাঁহার হাতে আসিবে। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাৎক্ষণিকভাবে এই প্রস্তাব উপেক্ষা করেন। আবূ বাক্‌র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কানে কিছু গোপন কথা ফেলিয়া দিলে বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়া যায়। "উছমান (রা) হইয়া যান মুসলমান এবং রুকায়্যা পরিণত হন তাঁহার স্ত্রীতে"।[২৬]

ইহা স্বীকৃত সত্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই কন্যা রুকায়্যা ও উম্মে কুলছূম (রা) নবূওয়াতের প্রচারের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিতৃব্য আবূ লাহাবের দুই ছেলের সহিত বিবাহার্থ বাগদান সম্পন্ন হয়। বিবাহের বাগদান ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পর 'উছমান (রা) দুই ভগ্নিকে বিবাহ করেন, একজনের মৃত্যুর পর অপরজনকে। মার্গোলিয়থ নির্লজ্জভাবে এইসব সত্য বিকৃত করিয়া হযরত 'উছমান (রা) সম্পর্কে কল্পনা নির্ভর কাহিনী তৈয়ার করিয়াছেন এবং এক আঘাতে সংশ্লিষ্ট তিনজনের চরিত্র হননের অপপ্রয়াস চালাইয়াছেন। অবশ্য মার্গোলিয়থ তাহার কল্পকাহিনীর স্বপক্ষে কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নাই। কারণ মার্গোলিয়থ তাহার সূত্র উল্লেখ করিবার মত সমর্থনযোগ্য কোন তথ্যের হদিস পান নাই।

সূত্রের প্রশ্ন বাদ দিলেও কল্পকাহিনীর মামুলী উপাদান ও সাধারণ জ্ঞানই মার্গোলিয়থের কটূক্তি ও মিথ্যাচারের পরিচয় বহন করে। নবূওয়াতের প্রথম বৎসর আবূ বাক্‌র (রা)-এর অনুরোধে 'উছমান (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন, এই কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য। কিন্তু আবূ লাহাবের পুত্রদ্বয়ের সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যাদ্বয়ের বিবাহার্থ বাগদান ভাঙ্গিয়া যায় নবূওয়াতের তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসরে। এই ভাঙ্গন ঘটে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ হইতে নয়, বরং আবূ লাহাব ও তদীয় স্ত্রী উম্মু জামীলের অনুরোধে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতী মিশনের কারণে তখন তাহারা ছিল ঘোরতর বিরোধী। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আবূ লাহাব কেবল রুকায়্যা (রা)-এর বিবাহের বাগদান ভাঙ্গিয়া দেয় নাই, বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপর কন্যার বিবাহও ভাঙ্গিয়া দেয়। দাওয়াতী মিশনের প্রাথমিক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বাভাবিকভাবে নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের

সহযোগিতা বলিষ্ঠ আকারে পাইতে চাহিয়াছিলেন। শুধু স্বগোত্রের মধ্যে ভাঙ্গন, পরিবারের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি এবং পিতৃব্য আবূ লাহাবের সহিত সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে তাঁহার কোন ইচ্ছাই প্রতিফলিত হয় নাই। যেহেতু ঐ সময় পর্যন্ত আবূ লাহাব প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে কোন বৈরিতা তাঁহার প্রতি প্রদর্শন করে নাই। কথিত সম্পর্কচ্ছেদের প্রচেষ্টার বিপরীতে যে প্রবল যুক্তি তাহা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, এই রকম সম্পর্ক ছিন্ন করিবার প্রচেষ্টা যে কোন সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার পরিপন্থী। এই রকম চিন্তা-ভাবনা অনভিপ্রেত ও অবিবেচনাপ্রসূত। কথিত পদক্ষেপ কার্যকর করা গেলে ব্যক্তিবিশেষের আনুগত্যের বিনিময়ে অপরের বৈরী মনোভাব এবং তাঁহার সহিত সম্পর্কচ্ছেদের প্রশ্নটি সঙ্গত কারণে আসিয়া যাইত। কোন যুক্তি বিবেচক ব্যক্তিই এই তথাকথিত বুঝাপড়ার তাৎপর্য ও তাহার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে উপলব্ধি করিতে পারিবে না—ইহা কল্পনা করাও বাতুলতা।

অধিকন্তু 'উছমান (রা) আবদুস শামস গোত্রের ঘনিষ্ঠজন যাহারা বনূ হাশিমের মত 'আবদ মানাফের পুত্র ছিল। ইহা ছাড়া 'উছমান (রা)-এর নানী বায়দা হইতেছেন আবদুল মুত্তালিবের কন্যা যিনি রাসূলুল্লাহ (রা)-এর ফুফু। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের সহিত 'উছমান (রা) অজানা ও অপরিচিত ছিলেন না। যদি সত্যিকার অর্থে 'উছমান (রা) রুকায়্যা (রা) কর্তৃক মোহাবিষ্ট হইতেন তাহা হইলে তিনি সহজে বিবাহের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব দিতেন, অন্যের সহিত বিবাহার্থ বাগদানের জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। আবূ বাক্র (রা)-এর মধ্যস্থতার জন্য অপেক্ষা করিতে হইত না। মার্গোলিয়থ নাটকীয়তার পরশে নির্জলা মিথ্যায় ভরপুর এই কল্পকাহিনীকে বিশিষ্টতা দিয়াছেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, তিনি যখন আবূ বাক্র (রা)-কে তাঁহার গোপন বাসনা ব্যক্ত করেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ "সরাসরি উপেক্ষা করেন"। "আবূ বাক্র (রা) তাঁহার কানে কানে কিছু বলিলে বিবাহের কথা পাকাপাকি হইয়া যায়" যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার কন্যার বাগদান ভাঙ্গিয়া দেওয়ার প্রস্তুতির জন্য 'উছমান (রা)-এর বিবাহের প্রস্তাব উপেক্ষা করেন যেন নির্দ্বিধায় আদ্যোপান্ত চিন্তা না করিয়া এমন তাৎক্ষণিক মারাত্মক সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার সন্তানদ্বয়ের সুখ, তাঁহার দাওয়াতী মিশনের ভবিষ্যত, স্বীয় চাচা ও পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক তিনি যেন মোটেই বিবেচনায় আনিলেন না। অথচ তাঁহার গোত্রের অপরাপর সদস্যগণ তখন প্রকাশ্যে তাঁহার দাওয়াতী কর্মকাণ্ডের বিরোধিতায় অবতরণ করে নাই। রুকায়্যা (রা)-কে হাতের নাগালে পাওয়ার প্রতিশ্রুতিই যদি 'উছমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের একমাত্র কারণ হইত তাহা হইলে তিন বৎসর তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইল কেন?

'উছমান (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে জালিয়াতপূর্ণ ও হাস্যকর গল্প তৈয়ার করিয়া মার্গোলিয়থ একের পর এক দশজন সাহাবীর ইসলাম গ্রহণের বিষয় লইয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহারা হইতেছেন ঃ (১) খালিদ ইব্‌ন সাঈদ (রা), (২) আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'ঊদ (রা), (৩) উছমান ইব্‌ন মায'ঊন (রা), (৪) সাঈদ ইব্‌ন যায়দ (রা), (৫) আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রা), (৬) মিকদাদ (রা), (৭) উতবা ইব্‌ন গাযওয়ান (রা), (৮) যুবায়র ইবনুল আওয়াম

(রা)), (৯) সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা) ও (১০) তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা)।[২৭] ইহাদের মধ্যে ৫, ৮, ৯ ও ১০ নম্বর ব্যক্তি নিঃসন্দেহে আবূ বাক্র (রা)-এর অনুরোধে ইসলাম কবুল করেন। খালিদ ইব্ন সা'ঈদ (রা)-ও ঐ দলের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন। অন্যদের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আবূ বাক্র (রা)-এর কোন প্রচেষ্টা ছিল না। এই কথাটি এমনকি মার্গোলিয়থের বিশ্লেষণে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংখ্যার দিক দিয়া ২ নম্বর ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তি আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) সম্পর্কিত যেই হাদীছটি উদ্ধৃত করা হইয়াছ তাহাতে দেখা যায়, আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাৎ করেন যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আবূ বাক্র (রা) সমভিব্যাহারে কোথাও যাইতেছিলেন। এই সাক্ষাতের ফলে আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা) ইসলাম কবূল করিয়া ধন্য হন। ইহাতে অবশ্য আবূ বাক্র (রা)-এর কোন কৃতিত্ব ছিল না। আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-এর সাক্ষাতের সময় আবূ বাক্র (রা) কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত অবস্থান করেন মাত্র। মার্গোলিয়থ কর্তৃক উদ্ধৃত হাদীছের দ্বারা এই কথারও প্রমাণ মিলে না যে, আবূ বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উক্ত স্থানে লইয়া আসিয়াছিলেন কিংবা তিনি 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন।

অনুরূপভাবে উদ্ধৃত হাদীছে উছমান ইব্ন মাযঊন (রা)-এর ধর্মান্তরণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত অবস্থানের জন্য আসেন এবং কিছু আলাপ-আলোচনার পর তিনি ইসলাম কবুল করেন।[২৮] উছমান ইব্ন মাযঊন (রা)-এর ধর্মান্তরণে আবূ বাক্র (রা)-এর কোন প্রয়াসের কথা উক্ত হাদীছে উল্লেখ নাই। ৪ নং সাঈদ ইব্ন যায়দ ইব্ন 'আমর ইব্ন নুফায়ল (রা) সম্পর্কে মার্গোলিয়থ স্বয়ং উল্লেখ করেন যে, মক্কার পৌত্তলিক ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্টিই সাঈদ-এর ইসলাম গ্রহণের কারণ।[২৯] "আবূ বাক্র (রা) কর্তৃক ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁহাকে গণনা করা হয় না"। মিকদাদ ও উতবা (রা)-এর ধর্মান্তরণ সম্পর্কে মার্গোলিয়থ আবূ বাক্র (রা)-এর সংশ্লিষ্টতার কোন তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারেন নাই।[৩০] মার্গোলিয়থ যেইসব তথ্য ও উদাহরণ পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, আবূ বাক্র (রা)-এর প্রচেষ্টায় দশজনের বেশী মানুষ মুসলমান হন নাই। এই সংখ্যাটি প্রাথমিক অবস্থায় ইসলাম গ্রহণকারীদের পূর্ণ সংখ্যার একটি ভগ্নাংশ মাত্র। সুতরাং এইসব তথ্য ও উপাত্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষে "আবূ বাক্র (রা) কর্তৃক পরিচালিত গোপন প্রচারণার মতবাদ"-এর অনুকূলে কোন জোরালো দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে না।

তিন ঃ তথাকথিত গোপনীয়তার প্রমাণ

গুপ্ত সঙ্ঘ মতবাদকে টিকাইয়া রাখিবার জন্য মার্গোলিয়থ অনেক অনুমান লইয়া অগ্রসর হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিম্নোক্ত বিখ্যাত মন্তব্যকে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেন। "যখনই কোন ব্যক্তির নিকট ইসলামের দাওয়াত পেশ করা হয় প্রথমে তিনি ইতস্ততবোধ করেন এবং এই সম্পর্কিত কিছু প্রশ্ন করিয়া বসেন। আবূ বাক্র (রা) এই ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম যিনি বিনা দ্বিধায় ও বিনা বাক্যব্যয়ে ইসলাম কবূল করেন"। মার্গোলিয়থ উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া

ইঙ্গিত দেন, প্রথম অবস্থায় নবদীক্ষিত মুসলমানদের "কতিপয় মারাত্মক দায়িত্ব" পালন করিতে হয় এবং গুপ্ত সঙ্ঘের কর্মকাণ্ডকে মানিয়া লইয়া তাহাদিগকে জীবনের খাতিরে কিছু একটা সংঘটিত করিতে হয়। যেই বিরোধের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা উৎকণ্ঠা হইতে উদ্ভূত এবং সেই উৎকণ্ঠা নূতন ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণ জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে স্বাভাবিকভাবে অনুভব করেন। বিশেষত সেই অভীষ্ট লক্ষ্যটির যাত্রাপথ ও কর্মকাণ্ডের গতি প্রক্রিয়া তখনও পর্যন্ত ছিল সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত।[৩১]

ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, মার্গোলিয়থের উপর্যুক্ত মন্তব্য সম্পূর্ণ অনুমান নির্ভর এবং ইহার সমর্থনে তাহার জোরালো কোন প্রমাণ নাই। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথিত ইতস্ততবোধ নবদীক্ষিতদের মারাত্মক ও অনির্ধারিত দায়িত্ব পূরণের জন্য নহে, বরং ইহা ছিল জীবনে ধর্ম পরিবর্তনের অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের স্বাভাবিক সতর্কতার কারণে। মার্গোলিয়থ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে, কল্পিত দায়িত্ব অনির্ধারিত। তাহার অনুমান নির্ভর 'মারাত্মক' ও 'গোপন' সঙ্ঘের 'বৈশিষ্ট্য' এই শব্দাবলী মিথ্যার ফুলঝুরি মাত্র। নবদীক্ষিত মুসলমানদের গোপনে কিছু বাধ্যবাধকতা পালন করিতে হয়। মার্গোলিয়থ তাহার প্রকৃতি ও ব্যাপ্তি সম্পর্কে কোন বিস্তারিত নির্দেশনা দিতে পারেন নাই। আসলে নবদীক্ষিত মুসলমানদের যেই বাধ্যবাধকতা পালন করিতে হয় তাহা হইল, একমাত্র ও একক আল্লাহর উপর ঈমান এবং হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -এর নুবূওয়াতের স্বীকৃতি।

মার্গোলিয়থের অনুমান হইতেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি সহজবোধ্য মন্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট অপব্যাখ্যা দ্বারা মিথ্যাচার। রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত মন্তব্য দ্বারা আবূ বাক্র (রা) -এর ধর্মনিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা এবং অন্যদের প্রতি কোন কটাক্ষ নহে, এই সত্যটাই তুলিয়া ধরিতে চাহিয়াছেন। একই প্রয়াস ও এই উদ্দেশ্য ইসলাম একটি 'গুপ্তসংঘ' এই তত্ত্বটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করিবার জন্য মার্গোলিয়থ বলেন, মুসলমানদের সালাত আদায় করা হয় 'কঠোর গোপনীয়তায়', তাদের জামাআত অনুষ্ঠিত হয় 'ব্যাপক সতর্কতার মধ্যে'[৩২] এবং তিনি (মহানবী) রহস্যজনক ধ্যান-তন্ময়তার মাধ্যমে কেবল ধর্মান্তরিতদের উপস্থিতিতেই 'ওহী সৃষ্টি করিতেন', অপরিচিত আগন্তুকদের উপস্থিতি সেইখানে থাকিত না।[৩৩] মার্গোলিয়থ আরো মন্তব্য করেন, ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ ﷺ নিয়মিত নির্জন ও 'গুপ্তস্থানে', বিশেষত হেরা পর্বতের গুহায় চলিয়া যাইতেন ওহী সৃষ্টির জন্য।[৩৪] 'অধিকন্তু' মার্গোলিয়থ বলেন, "প্রাথমিক পর্যায়ে যাহাদের চরিত্রের ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত ছিলেন না এবং যাহারা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতে প্রস্তুত ছিল না তাহাদিগকে তিনি সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন না"।[৩৫] মার্গোলিয়থের এসব মন্তব্য ইঙ্গিত দিতেছে যে, ওহী প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যেন জনসমক্ষ হইতে নিজেকে প্রত্যাহার করিয়া লইতেন এবং একজন গোপন প্রতিনিধির মাধ্যমে নবদীক্ষিতদের হাত করিবার জন্য প্রয়াসী ছিলেন সুকৌশলে!

বাস্তবতার সহিত পরিচিত যে কোন ব্যক্তি ভালভাবে জানেন যে, আসল ঘটনা এইরূপ ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে মক্কার প্রতিপক্ষ শক্তির অব্যাহত বিরোধিতায়ও রাসূলুল্লাহ ﷺ জনগণের সাক্ষাত ও দৃশ্য হইতে নিজকে গোপন করেন নাই অথবা তিনি তাঁহার অনুগামী কর্তৃক সার্বক্ষণিক প্রহরারত অবস্থায়ও ছিলেন না। মুসলমানদের সালাত ও ধর্মীয় জমায়েতের ব্যাপারে মার্গোলিয়থ তাহার মন্তব্যে সম্ভবত 'দারুল- আরকাম'কে সালাত ও ধর্মীয় সমাবেশের স্থান হিসাবে বাছাই করিয়াছিলেন।[৩৬] মূলত এই উদ্ধৃতির মাধ্যমে মার্গোলিয়থ তাহার তত্ত্বের সমর্থনে আরও একটি যুক্তি খোঁজার প্রয়াস চালাইয়াছেন।[৩৭]

প্রচারণা ও মক্কার বৈরী শক্তির বিরোধিতার কারণেই দারুল আরকামকে সালাত্ আদায় ও ধর্মীয় মিলনস্থলরূপে বাছাই করা হইয়াছে। ওহী অবতরণের পদ্ধতি সম্পর্কে মার্গোলিয়থের মন্তব্যের জবাব ইতোপূর্বে প্রদান করা হইয়াছে।[৩৮] "ইহা কোনভাবেই দাওয়াতী মিশনের গুপ্ত বৈশিষ্ট্যের প্রভাব নহে"। এইখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ওহী অবতরণের পদ্ধতি যাহাই হউক না কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক ওহী গ্রহণের সত্যতা ও দাবি "নবদীক্ষিত মুসলমান" ও মক্কার কাফিরদের নিকট কোনক্রমেই গোপন ব্যাপার ছিল না।

মার্গোলিয়থের তৃতীয় ধৃষ্টতা হইতেছে, তাহার মতে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রচারণাকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। এই ধারণার সমর্থনে তিনি 'আমর ইব্ন 'আবাসা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের প্রসঙ্গ টানিয়াছেন। মার্গোলিয়থ বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দলে প্রকাশ্যে যোগ দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে তাহা করিতে নিষেধ করা হয় এবং বলা হয়, তিনি নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়া ভালভাবে এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।[৩৯]

'আমর ইব্ন 'আবাসার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ইতোপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।[৪০] রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের কথা মক্কায় প্রচার করিতে নিষেধ করেন যাহাতে তিনি মক্কার কাফিরদের নির্যাতন হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন। কারণ তাহারা নির্যাতনের ক্ষেত্রে শহরবাসী ও বিদেশী অভ্যাগতদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিত না। 'আমরকে সতর্ক করিবার অর্থ ইহা নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার মিশনকে গোপন রাখিতে চাহিয়াছেন।

অনুরূপভাবে তিনি আবূ যার গিফারী (রা)-কেও ইসলাম গ্রহণের কথা মক্কায় প্রচার করিবার ঝুঁকি লইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মক্কার কাফিরদের কঠোর রূঢ় আচরণের আশঙ্কা সত্ত্বেও সতর্কতার পরামর্শ উপেক্ষা করেন।[৪১] রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মক্কার বাহিরের নবদীক্ষিত মুসলমানদের এইরূপ সতর্ক করিয়া দেওয়া, তাঁহাদের প্রতি মক্কার কাফিরদের নির্যাতন এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের সতর্কতা উপেক্ষা এই কথা জোর দিয়া প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মিশন ছিল উন্মুক্ত প্রকৃতির। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতী মিশন ও সংগঠন কোনক্রমেই কল্পনাপ্রসূত, গুপ্ত ও রহস্যজনক ছিল না।

মার্গোলিয়থের আরও একটি চরম আপত্তিকর উক্তি হইতেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রা) নবদীক্ষিত মুসলমানদের ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে 'জাগতিক সহায়তা ' প্রদানের মাধ্যমে তাঁহাদের অর্থ -সম্পদ ব্যয় করেন। মার্গোলিয়থ তাহার উক্তিকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য পবিত্র কুরআনের ঘোষণা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হাদীছের উদ্ধৃতি পেশ করেন। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, তিনি তাঁহার নবূওয়াতী মিশনের মাধ্যমে পার্থিব কোন লাভ কামনা করেন নাই। মার্গোলিয়থ বলেন, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ দান-খয়রাত নিজের ও নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য প্রত্যাখ্যান করেন। ইহা দাবা খেলার গুটি হিসাবে বেশ সফল চাল চালাইতে সক্ষম হয়।[৪২] মার্গোলিয়থ আরো বলেন, দাসমুক্তিকে অত্যন্ত ছওয়াবের কাজরূপে ঘোষণা করা হয় এবং আবূ বাক্‌র (রা) ঐ নীতিমালা অনুসরণ করেন।[৪৩] এই অভিযোগ আনা হইয়াছে যে, বহু লোককে ঘুষ দিয়া ইসলাম গ্রহণে প্রলুব্ধ করা হইয়াছে।[৪৪]

তথ্য বিকৃতিতে মার্গোলিয়থের যে পারঙ্গমতা তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাহার বিকৃত তথ্যই ইহার বাস্তব প্রমাণ যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দা'ওয়াতী মিশন পরিচালনায় কোন অশুভ ও হীন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তাঁহার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেন নাই। পাঠক উপলব্ধি করিতে অসমর্থ হইবেন যে, বিকৃত তথ্য কিভাবে তাহার কথিত 'গুপ্ত সংঘ'-এর প্রমাণের সমর্থনে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই কথা সকলেরই জানা যে, আবূ বাক্‌র (রা) বেশ কিছু দাস-দাসীকে ক্রয় পূর্বক আযাদ করিয়া দেন যাহারা তাহাদের মনিবগণ কর্তৃক সীমাহীন অমানুষিক নির্যাতনের কবলে পতিত হইয়াছিলেন।

ইহাও সত্য যে, ধর্ম পরিবর্তনের কারণে বহু নবদীক্ষিত মুসলমান যখন তাহাদের ব্যবসা ও জীবিকা অর্জনের উপকরণ হারাইয়া ফেলেন তখন কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বাক্‌র (রা) নহেন, বরং বিত্তশালী মুসলমানগণ তাহাদের সমর্থনে ও প্রতিপালনে আগাইয়া আসেন। এই পদক্ষেপ ছিল কাফিরদের নির্যাতন ও মৃত্যুর হাত হইতে দরিদ্র নবদীক্ষিত মুসলমানদের উদ্ধার ও রক্ষা করিবার লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টান্ত। ইহা কোনক্রমে গুপ্ত ও রহস্যময় সংগঠনের কর্মকাণ্ড হইতে পারে না। ধর্ম পরিবর্তনের ও পৌত্তলিক রীতি-প্রথা ত্যাগের সংবাদ যতক্ষণ ছড়াইয়া না পড়িত ততক্ষণ কাহারও ঘাড়ে নির্যাতনের খড়গ নামিত না। দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয় ও মুক্তি প্রদান তৎকালীন মক্কার সমাজে কোনক্রমে গোপন তৎপরতা ছিল না।

কিছু মানুষকে ঘুষের মাধ্যমে প্রলুব্ধ করিয়া মুসলমান বানানো হইয়াছে এমন একটি চরম অসত্য অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন মার্গোলিয়থ। ইহার সমর্থনে তিনি মুসনাদ আহমাদ ইব্‌ন হাম্বল-এর ৩য় খণ্ড, ১৭৫ রিওয়ায়াতের উদ্ধৃতি পেশ করিয়াছে। আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত রিওয়ায়াতে বলা হইয়াছে, একদা এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট আসিয়া কিছু পার্থিব সাহায্য প্রার্থনা করিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে বিচরণরত পুরা একপাল ভেড়া তাহাকে প্রদান করিলেন। লোকটি তাহার সমাজে প্রত্যাবর্তন করিয়া সকলকে ইসলাম

গ্রহণের আবেদন জানাইল এবং এই কথাও বলিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ এতই উদারতার সহিত দান করেন যে, সম্পত্তি নিঃশেষ হইয়া যাইবে ইহার যেমন পরোয়া করেন না তেমনি ইহার দ্বারা দরিদ্র হওয়ার আশঙ্কাও তাঁহার নাই। আনাস (রা) আরও বলেন, যদিও মাঝেমধ্যে কোন ব্যক্তি হীন উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকে এবং সেই দিন যাইতে না যাইতেই দুনিয়ার যে কোন সম্পদের তুলনায় ইসলাম তাহার নিকট অত্যন্ত প্রিয় হইয়া উঠে।[৪৫]

মার্গোলিয়থ স্পষ্টত উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে তাহার অভিযোগের সমর্থনে যুক্তি তালাশ করিয়াছেন। ইহা করিতে গিয়া তিনি হয়ত উক্ত বর্ণনার তিনটি সুস্পষ্ট বিষয়কে ভুল বুঝিয়াছেন অথবা উপেক্ষা করিয়াছেন। (এক) তিনি এমন একটি সত্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন তাহা হইল, আনাস (রা) যেই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সংঘটিত হইয়াছে মদীনায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবনের শেষ প্রান্তে, মক্কায় নয়। মার্গোলিয়থের কথিত অভিযোগ অনুসারে মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে গুপ্ত সংঘের প্রধানরূপে আদৌ কাজ করিবার প্রয়োজন ছিল না। ইহা ছাড়া আনাস (রা) মদীনার বাসিন্দা এবং হিজরতের দশ বৎসর পূর্বে তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[৪৬]

(দুই) উক্ত বর্ণনায় স্পষ্টত বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দান করিয়াছেন আলোচ্য ব্যক্তিটির সাহায্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে। এই অনুদান কোনক্রমে পরোক্ষ ঘুষ নয়। কারণ ইহা গোপনে প্রদান করা হয় নাই অথবা অনুদান গ্রহীতাদের ইসলাম কবুলের শর্ত আরোপ করা হয় নাই। হাদীছে এই কথাও উল্লেখ নাই যে, অনুদানের ফলস্বরূপ সুবিধাভোগী লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে।

(তিন) উল্লিখিত হাদীছে যাহাতে কোন দ্বিধা না থাকে আনাস (রা) সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন, যদিও পার্থিব বিবেচনায় কেহ ইসলাম গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া থাকেন কিন্তু শীঘ্রই তিনি পরিবর্তিত ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছেন এবং পার্থিব কোন লাভের চাইতে ধর্মবিশ্বাসই তাহার নিকট অত্যধিক মূল্যবান হইয়া উঠে। ইসলামে দীক্ষিত করিবার জন্য অর্থ-সম্পদের ব্যবহারের দৃষ্টান্ত আদৌ সত্য নহে। উল্লিখিত বর্ণনায় একদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বদান্যতার, অন্যদিকে অন্যের উপর তাঁহার নৈতিক-আধ্যাত্মিক প্রভাবের গুরুত্বারোপ করা হইয়াছে।

মার্গোলিয়থ তাহার কথিত তত্ত্বের প্রমাণ খুঁজিবার জন্য নবদীক্ষিত মুসলমানদের দৃঢ় ঈমানী শক্তি ও পৌত্তলিক ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগের জন্য নিদারুন পীড়ন ও লাঞ্ছনার প্রকৃত ঘটনাকে বিকৃত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে মার্গোলিয়থ এমন একটি আইনের উদ্ধৃতি দিয়াছেন যাহা পরবর্তীতে প্রণীত হইয়াছে এবং মুরতাদদের (ধর্মত্যাগকারী) শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডকে অনুমোদন করা হইয়াছে। তিনি বলেন, ইহা ছিল "গুপ্ত সংঘের সাধারণ আইন" যাহা অতি শীঘ্রই ইসলাম শক্তিশালী হওয়া পর্যন্ত 'স্বীকৃত' ছিল এবং প্রকৃত ঘটনা হইতেছে, বহু নবদীক্ষিত মুসলমান নির্যাতন সত্ত্বেও ইসলামের প্রতি দৃঢ় আস্থাশীল ছিলেন, যদিও ইসলামের প্রাথমিক যুগ হইতে এই আইন প্রচলিত ছিল।[৪৭] মার্গোলিয়থের প্রস্তাবনা তাহার কপটতার সহিত সংঘাতপূর্ণ। তিনি স্বীকার

করিয়াছেন যে, আলোচ্য আইনটি পরবর্তী সময়ে প্রণীত হইয়াছে যখন ইসলাম বেশ শক্তিশালী । তিনি ব্যাখ্যা করেন নাই, কেন বৈশিষ্ট্যসূচক গুপ্ত সঙ্ঘের কল্পিত আইন ঘোষণা করিতে হইয়াছিল—যখন ইহা সঙ্গতভাবে গুপ্ত দলও নয় বা বোধগম্য কারণে ইহার প্রয়োজনও নাই।

এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, যে কোন সংগঠনের টিকিয়া থাকিবার ক্ষমতা নির্ভর করে উহার সহজাত শক্তির উপর এবং আইনের কার্যকারিতা ইহার প্রায়োগিকতার উপর নির্ভরশীল। উপযোগিতার উদ্দেশ্যে ইহার কার্যকারিতার দৃষ্টান্ত দ্বারা ভীতি সঞ্চারকে উৎসাহিত করা হইয়াছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম সঙ্গত কারণে অত্যন্ত দুর্বল থাকায় এইরূপ আইন যেমন প্রণীত হইতে পারে না, তেমনি ইহা কার্যকর করিবার চিন্তাও আসে নাই। কল্পিত আইনের প্রয়োগ প্রচেষ্টা যাহাই থাকুক না কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পুরা মক্কী জীবনে ইহা কার্যকর হওয়ার কোন নজীর নাই। যদিও মার্গোলিয়থের মতে, ঈমান আনিবার পর বহু মুসলমান ইসলাম পরিত্যাগ করিয়াছিল।[৪৮]

সুতরাং "ইসলাম একটি গুপ্ত সঙ্ঘ" মার্গোলিয়থের এই তত্ত্ব হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত, যুক্তি বিরুদ্ধ ও অসমর্থনীয়। ইতোপূর্বে উল্লিখিত ওহী সম্পর্কিত তাহার মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ওহী উদ্ভাবনের জন্য কল্পনা ও অনুশীলনের আশ্রয় লইয়া বিভিন্ন দৃশ্যপটের 'অবতারণা' করিতেন এবং এইসব ওহী'র বিষয়বস্তু ইয়াহূদী-খৃস্টান উৎস হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আলোচ্য প্রসঙ্গটি আমরা ইতোমধ্যে পর্যালোচনা করিয়াছি। অতএব আমাদের এইখানে থামিয়া থাকিবার প্রয়োজন নাই।[৪৯]

মার্গোলিয়থ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন যে, একেবারে শুরু হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ পৌত্তলিকতার প্রচলিত আদর্শ, আচরণ ও রীতিনীতি হইতে নিজকে অবশ্য নিরাপদ দূরত্বে সরাইয়া রাখেন এবং "ইসলামের কতিপয় বিধিনিষেধ" অবশ্য ঘোষণা করেন। মার্গোলিয়থের নিজের ভাষায়, "শেষ বিচার দিবসের ভীতি সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করিবার জন্য ইহা কোনক্রমে পর্যাপ্ত নয়; নিজের পরিত্রাণের জন্য আমাকে কি কি কাজ করিতে হইবে ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে হইবে। ইহার সন্তোষজনক উত্তর খুঁজিতে গেলে সঙ্গত কারণে কিছু বিধিনিষেধের কথা আসিয়া যায়। ইহা প্রতীয়মান হয় যে, পরিধেয় বস্ত্র পবিত্র রাখিবার জন্য বিধান রহিয়াছে এবং প্রতিমা পূজা হইতে বিরত থাকিবার তাগিদ রহিয়াছে"।[৫০] ইতোপূর্বে মার্গোলিয়থ মন্তব্য করেন, "মুহাম্মাদ ﷺ-এর শিক্ষার স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য হইতেছে তাওহীদে বিশ্বাস এবং মানুষের পারলৌকিক জীবনের ধ্যান-ধারণা যাহা প্রকৃতি পূজার মতবাদ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নতর"।[৫১]

অনুবাদ ঃ আ.ফ.ম. খালিদ হোসেন

তথ্যনির্দেশিকা

১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬-৫১৭।

২. উইলিয়াম মুইর, দি লাইফ অব মাহোমেট, ৩য় সং., পৃ.৬০।

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬, ৫৯।

৪. প্রাগুক্ত, ৫৪।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬, টীকা।

৬. মার্গোলিয়থ, মুহাম্মাদ, ৩য় সং, পৃ. ৭২।

৭. প্রাগুক্ত, ৩য় অধ্যায়।

৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।

১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৩-৮৪, পৃ. ৮৪; এখানে উল্লেখ্য যে, কার্যত মার্গোলিয়থের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মহানবী ﷺ-এর অনুরূপ বৈশিষ্ট্য প্রদান করিতে গিয়া এম. রডিনশন তাঁহাকে সৃষ্টিকর্তার শিংগা এবং বেল বাঁশি আখ্যায়িত করেন (T.G.U.O.S., vii, p. 22)।

১১. পূর্বোক্ত বরাত।

১২. বয়সের দিক হইতে দুইজন প্রায় সমসাময়িক। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তুলনায় আবূ বাক্র (রা) দুই বৎসরের ছোট ছিলেন।

১৩. মার্গোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯, পাদটীকা।

১৪. প্রাগুক্ত, ১১২।

১৫. প্রাগুক্ত, ৯৩।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. মুসনাদ, ৬ খণ্ড, পৃ. ৬৮।

১৮. আল-কুরআন, ৫২ ঃ ২১।

১৯. মার্গোলিয়থ, পূ. গ্র., পৃ. ৯৩, ৯৪; উদ্ধৃতি মুসনাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৫৬।

২০. আল-কুরআনের ৫২ ঃ ২১ আয়াতের শেষাংশে বলা হইয়াছে ঃ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ.

২১. মার্গোলিয়থ, প্রাগুক্ত, ৯৫।

২২. মার্গোলিয়থ, প্রাগুক্ত, ৯৫।

২৩. প্রাগুক্ত।

২৪. মার্গোলিয়থ, ৯৫, ৯৬।

২৫. দ্রষ্টব্য, ইবন্ হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩১৭-৩১৯।

২৬. মার্গোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৭।

২৭. মার্গোলিয়থ, ৯৮-৯৯।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯ (উদ্ধৃতি মুসনাদ, ১খ, পৃ. ৩১৮)।

২৯. প্রাগুক্ত।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৯-১০০।

৩১. মার্গোলিয়থ, পৃ. ১০১-১০২।

৩২. প্রাগুক্ত, ১০৩।

৩৩. প্রাগুক্ত, ১০৪-১০৫।

৩৪. প্রাগুক্ত, ১০৮।

৩৫. প্রাগুক্ত, ১০৬।

৩৬. উপরে দ্র. পৃ. ৫১৯ এবং নিম্নে দ্র. পৃ. ৬৫২।

৩৭. মার্গোলিয়থ, পূ. স্থা., পৃ. ১০৮।

৩৮. উপরে দ্র. ৪১০-৪২২।

৩৯. মার্গোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৭-১০৮।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৬-৫৩৭।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮।

৪২. মার্গোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৩ ।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪, উদ্ধৃতি মুসনাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১২; ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫।

৪৫. মুসনাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৫; রিয়াদ সং. (৬ খণ্ড একত্রে), নং ১২৮২১, ১৩৭৬৬ এবং ১৪০৭৪। হাদীছের মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

عن انس ان رجلا اتى النبى ﷺ يسئله فاعطاه رسول الله ﷺ غنما بين جبلين فاتى الرجل قومه فقال اى قومى اسلموا فوالله ان محمدا ليعطى عطية رجل ما يخاف الفاقه او قال الفقر . قال انس ان كان الرجل لياتى النبى ﷺ يسلم ما يريد الا ان يصيب عرضا من الدنيا او قال دنيا يصيبها فما يمسى من يومه ذلك حتى يكون دينه احب اليه او قال اكبر عليه من الدنيا وما فيها .

৪৬. আল-ইসাবা, ১খ., ৭১, নং ২৭৭।

৪৭. মার্গোলিয়থ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৪।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২২।

৪৯. উপরে দ্র. অধ্যায় ৯।

৫০. মার্গোলিয়থ, পূ. গ্র., পৃ. ৯৪ (দ্র. পরোক্ষ উল্লেখ কুরআন, ৭৪ ঃ ৪-৫)।

৫১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

তেইশতম অধ্যায়

প্রথমদিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহের বিষয়বস্তু সম্পর্কিত বেল-ওয়াট তত্ত্ব

ইসলামের গোড়ার দিককার মুসলমানদের সম্পর্কে পর্যালোচনা করার আগে ওয়াট তাহার ভাষায় কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আল্লাহ্‌র বাণী প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। সমসাময়িক মক্কার আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির সহিত কুরআনের প্রথমদিককার অবতীর্ণ আয়াতগুলির মধ্যে সম্পর্ক দেখাইবার জন্যই তিনি ইহা করিয়াছেন এবং সমসাময়িক পরিস্থিতির সহিত এই সম্পর্কের ভিত্তিতে তিনি সাধারণভাবে ইসলামের অভ্যুদয়ের একটা আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা দেওয়ারও প্রয়াস পাইয়াছেন। তাহার বক্তব্য অনুযায়ী, গোড়ার দিকে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করে বিশেষত তাহারা মক্কার ঐ বিরাজমান পরিস্থিতির কারণেই ইসলাম গ্রহণ করে। আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে, মার্গোলিয়থের সহিত তাঁহার অভিমতের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। কারণ তিনি অন্তত ইহা স্বীকার করেন যে, একেবারে গোড়ার দিক হইতেই মহানবী ﷺ তৎকালীন মক্কার জনসমাজে প্রচলিত অবিশ্বাসীদের ধ্যান-ধারণা ও রীতি হইতে স্পষ্টত ভিন্ন মতবাদ প্রচার করেন। তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শের অত্যন্ত বৈশিষ্ট্যময় দিকগুলির মধ্যে ছিল ঃ আগাগোড়া আখিরাত সম্পর্কিত ধারণা ও স্রষ্টার একত্বে বিশ্বাস। ওয়াট অবশ্য আমাদের এইরূপ বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, মহানবী ﷺ যেমন অবিশ্বাসী মূর্তিপূজকদিগের লালিত বিশ্বাস ও আচার-রীতি হইতে স্পষ্টত ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন নাই, তেমনি তিনি পরিষ্কারভাবে একত্ববাদের ধারণাও প্রদান করেন নাই। ওয়াটের মতে, প্রথমদিকে মহানবী ﷺ কেবল স্রষ্টার একত্ব সম্পর্কে এবং কেবল তাঁহার 'মহত্ত্ব' ও 'ক্ষমতা' প্রশ্নে গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলেন, মানুষের কর্তব্য হইল স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। এই তত্ত্ব দিতে গিয়া ওয়াট যাহা করিয়াছেন তাহা হইল, তিনি তাহার পূর্ববর্তী বেলের ধারণাকে গ্রহণ করিয়া উহাকে আরও বিকশিত করিয়াছেন। বেলের তত্ত্ব হইল, মুহাম্মাদ ﷺ প্রথমদিকে মক্কার অন্যান্য দেবদেবীর বিরুদ্ধে কিছু বলেন নাই, কেবল কৃতজ্ঞতা লাভে আল্লাহ্‌র দাবিকে তুলিয়া ধরিয়াছিলেন।[১] নিম্নে তাহার গৃহীত তত্ত্ব ও বিকাশের সারমর্ম দেওয়া হইল ঃ

এক ঃ প্রথমদিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াত ও সেইগুলির শিক্ষা ওয়াট যেভাবে শনাক্ত করিয়াছেন

ওয়াট তাঁহার 'প্রাথমিক আয়াতসমূহ'[২] শীর্ষক অধ্যায়টিকে চার ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই ভাগগুলির নামকরণ করা হইয়াছে ঃ "কুরআনের সূরা / আয়াতসমূহের তারিখ নির্ধারণ"[৩], "প্রাথমিক আয়াতগুলির বিষয়বস্তু"[৪], "মক্কার সমসাময়িক পরিস্থিতির সহিত অবতীর্ণ আয়াতসমূহ বা বার্তার সম্পর্ক"[৫] ও "আরও অন্যান্য ধ্যান-ধারণা"[৬]। ওয়াটের রচনার এই অধ্যায়ের প্রথম ভাগ ব্যতীত অন্য তিনটি ভাগকে আবার কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। আমাদের এই বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের আলোচনায় অগ্রসর হইবার সাথে সাথে এই উপবিভাগ বিবেচনা করা হইবে।

প্রথম ভাগ ঃ ওয়াট "কুরআনের সূরা/আয়াতসমূহের তারিখ নির্ধারণ" অংশে থিওডোর নোলডেকের লেখার উল্লেখ করেন। নোলডেকে উনিশ শতকের শেষভাগে রচিত তাহার এই লেখায় কুরআনের সূরাগুলিকে চারটি কালের আওতায় শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন। এই চার মেয়াদের তিনটি মক্কার আর একটি মদীনার। এইভাবে কালমেয়াদী শ্রেণীবিন্যাসের নেপথ্য ধারণাটি হইতেছে, হয় আয়াতগুলি আগে বা গোড়ার দিকে কিংবা শেষের দিকে অবতীর্ণ, দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত–এই সব ভিত্তিতে। ওয়াটের কথা অনুযায়ী, নোলডেকের এই রচনার মুখ্য অগ্রগতি ঘটিয়াছে রিচার্ড বেলের লেখায়। বেল তাহার লেখায় ইঙ্গিত গ্রহণ করিয়াছেন এই বাস্তবতা হইতে যে, প্রায় সকল সূরাতেই এমন সব আয়াত রহিয়াছে যেগুলি বিভিন্ন সময়ে নাযিল হইয়াছে। সময়ের বিভিন্নতার ভিত্তিতে বেল কুরআনের প্রায় প্রতিটি সূরাকে ছোট ছোট আয়াতে ভাগ করিয়াছেন তাহার নিজ দৃষ্টির বিবেচনায় এইসব আয়াতের মূল ভাবসমূহের ঐক্য ও সংহতির আলোকে এবং সেইগুলির অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ সেইভাবে নির্ধারণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।[৭] ওয়াট উল্লিখিত দুই পণ্ডিত ব্যক্তির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে কুরআনের কোন কোন আয়াত গোড়ার দিকের তাহা বাছাই করিয়াছেন। এই বিষয়ে তাহার বক্তব্য হইতেছে, তিনি তাহার এই নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যেসব সূরা বা সূরার অংশবিশেষ উল্লিখিত দুই প্রাচ্যবিদের অন্যতম নোলডেকে মক্কার 'প্রথম আমলের' এবং বেল 'গোড়ার দিকের' বা 'মক্কার প্রথম আমলের' বলিয়াছেন সেইগুলিই তিনি তাহার ধর্তব্যে লইয়াছেন। ওয়াট আরও বলিয়াছেন, তিনি তাহার এই শ্রেণীবিন্যাসের আওতায় ঐসব আয়াত বাদ দিয়াছেন যেসব আয়াতে "মুহাম্মাদ ﷺ ও কুরআনের বিরোধিতা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন"। তাহার এই আয়াত বাদ দেওয়ার কাজটি এই ভিত্তিতে করা হইয়াছে, "যেসব আয়াতের কারণে সাধারণ বিরোধিতা সৃষ্টি হইতে পারে সেগুলি অবশ্যই ঘোষিত হইয়া থাকিবে"।[৮] তিনি কুরআনের যেসব আয়াত এইভাবে বাছাই করেন সেইগুলি হইল ঃ

৯৬. সূরা আল-'আলাক ঃ ১-৮।

৭৪. সূরা আল-মুদ্দাছ্ছির ঃ ১-১০।

১০৬. সূরা কুরায়শ।

৯০. সূরা আল-বালাদ ঃ ১-১১।

৯৩. সূরা আদ-দুহা।

৮৬. সূরা আত-তারিক ঃ ১-১০।

৮০. সূরা 'আবাসা ঃ ১-৩২।

৮৭. সূরা আল-আ'লা ঃ ১-৯; ১৪-১৫।

৮৪. সূরা আল-ইনশিকাক ঃ ১-১২।

৮৮. সূরা আল-গাশিয়াহ ঃ ১৮-২০।

৫১. সূরা আয-যারিয়াত ঃ ১-৬।

৫১. সূরা আত-তূর ঃ "কতিপয় আয়াত"।

৫৫. সূরা আর-রাহমান।

দ্বিতীয় ভাগ ঃ ওয়াট এইভাবে তাহার ধারণায় কুরআনের কোন কোন সূরা আগের দিকে অবতীর্ণ তাহা বাছাই করার পর তাহার লেখা অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভাগে এইসব গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহার লেখার উপবিভাগ (ক)-এ 'স্রষ্টার মহত্ত্ব ও ক্ষমতা' শিরোনামে উল্লিখিত আয়াতগুলির কিছু আয়াতের অংশবিশেষ অনুবাদের আকারে বরাত দিয়াছেন।[৯] তিনি এখানে বলিয়াছেন, এইসব আয়াতে স্রষ্টার মহত্ত্ব ও ক্ষমতার বিষয়ে, বিশেষ করিয়া তাঁহার মানুষকে সৃষ্টি ও মানুষকে তাঁহার নির্দেশনা দান, মানুষকে তাহার অস্তিত্ব রক্ষার ব্যবস্থাদি এবং মহাকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলী সৃষ্টির উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি একই সাথে এইসব সৃষ্টির নশ্বরতা ও স্রষ্টার অবিনশ্বরতা তথা স্থায়িত্বের[১০] বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এইসব আয়াতই প্রমাণ দেয় যে, কুরআনে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বকে কোন অজ্ঞাত কিছু হিসাবে দেখাইবার চেষ্টা করে নাই, বরং ইহাতে স্রষ্টার প্রতি এক ধরনের অস্পষ্ট বিশ্বাস রহিয়াছে, যে অস্পষ্ট বিশ্বাস আরও সুনির্দিষ্ট ও বলবতী" হইয়া উঠিয়াছে–এই মর্মে গুরুত্ব আরোপের মাধ্যম যে "নানা ধরনের সাধারণ ঘটনার নেপথ্যে রহিয়াছেন আল্লাহ"। ওয়াট আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, এইসব বিষয় সাধারণত এই মতের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে যে, আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণাটি ইয়াহূদী-খৃস্টান একেশ্বরবাদ[১১] হইতে আরববাসীদের মনে সঞ্চারিত হইয়া আসিতেছিল। দ্বিতীয়, তিনি বলেন, আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও মহত্ত্বের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ ছিল অবিশ্বাসী মূর্তিপূজকদের অন্যান্য দেবদেবীদের আল্লাহ্‌কে কতকটা সদৃশ কিছু হিসাবে স্রষ্টা সম্পর্কে যে ভ্রমাত্মক ধারণা ছিল তাহা শুধরাইবার পথে প্রথম পদক্ষেপ। "এইসব আয়াতে আল্লাহ্‌র একত্বের বিষয়ে কোন উল্লেখ নাই, তাওহীদ তত্ত্বের উপর কোন রকম গুরুত্ব আরোপ নাই, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কোন নিন্দাও নাই"। তিনি জোর দিয়া

বলেন, কুরআনের গোড়ার দিকের আয়াতগুলির উদ্দেশ্য ছিল কেবল "স্রষ্টা সম্পর্কিত অস্পষ্ট বিশ্বাসের কতিপয় দিককে এই বিশ্বাসের সহিত গৌণ পর্যায়ের দেবদেবীদের অস্তিত্ব মানিয়া লইবার মানসিকতা ও বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদের মধ্যকার বৈপরীত্য স্পষ্ট না করিয়াই ইতিবাচকভাবে গড়িয়া তোলা" যাহার অস্তিত্ব চিন্তাশীল মক্কাবাসীদের মধ্যে তৎকালে বিদ্যমান ছিল।[১২]

উপবিভাগ (খ) অংশে ওয়াট কুরআনের গোড়ার দিকের অবতীর্ণ আয়াতসমূহের আরেকটি বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। উহা হইল ঃ এইসব আয়াতে গুরুত্ব আরোপ করিয়া বলা হইয়াছে, বিচারার্থ মানুষকে রোজ হাশরে আল্লাহ্র দিকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। ওয়াট তাহার এই বক্তব্যের সমর্থনে সুনির্দিষ্টভাবে কুরআনের সূরা ও আয়াত ঃ ৯৬ঃ৮; ৮৪ঃ৮-১০; ৮০ঃ২২; ৮৬ঃ৪ ও ৮৪ঃ১২-এর উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি এইগুলির বরাত অনুবাদের মাধ্যমে[১৩] করিয়াছেন।

কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির তৃতীয় একটি দিকের বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে উপবিভাগ (গ) অংশে। ওয়াট এ আলোচনার শিরোনাম দিয়াছেন 'মানুষের সাড়া, কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা'। তিনি এই আলোচনায় 'তগা' (طغى) ও 'ইসতাগনা' (استغنى) শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন আর এই শব্দগুলির ব্যাখ্যায় তৎকালীন মক্কাবাসীদের 'ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ' বা 'গোয়ার্তুমি'র উল্লেখ করিয়াছেন। মক্কাবাসীদের এই ধরনের আচরণে তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, বিত্তজনিত প্রতিপত্তির কারণে "তাহারা নিজদেরকে কোন উর্ধ্বতন শক্তির অধীন বলিয়া মনে করিত না। আর তাহারা যে সৃষ্টজীব তাহাদের সেই বোধটুকুও লোপ পাইয়াছিল"।[১৪] এই আয়াতগুলি তাহাদিগকে স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। আর যেহেতু উপাসনার মধ্যে কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি ঘটে সেহেতু কুরআন নাযিলের গোড়ার দিকের কয়েকটি আয়াতে উপাসনা বা 'ইবাদতের জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে ওয়াট সূরা ৭৪ঃ৩ প., ১০৬ ও ৮৭ঃ১৪ প. আয়াত উল্লেখ করিয়াছেন। ওয়াট এই মর্মে রায় দিয়াছেন যে, উপাসনা একেবারে গোড়া হইতেই মুহাম্মাদ ﷺ -এর ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য আর তাঁহার প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদের বিরোধিতার অভিব্যক্তি ঘটে গোড়ার দিকে এই উপাসনা[১৫] বা নামাযের বিরুদ্ধতার মাধ্যমে।[১৫]

একইভাবে ওয়াটের এ অধ্যায়ের উপবিভাগ (ঘ)[১৬] অংশে তিনি যাহা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাহা তাঁহার মতে গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির চতুর্থ বৈশিষ্ট্য। তিনি এই বৈশিষ্ট্যকে "দানশীলতা ও পরিশুদ্ধি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তিনি দানশীলতার সহিত পরিশুদ্ধির যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছেন কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কিছু আয়াতে সন্নিবেশিত 'তাযাক্কা/ইয়াতাযাক্কা' (تزكى: يتزكى) শব্দনিচয়ের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক অর্থ ও তাৎপর্যের ভিত্তিতে। বস্তুত তিনি এই অংশে এই বিষয়ে তাহার যুক্তিতর্ক দিয়াছেন এবং তাহার রায়ের ভিত্তিতে তিনি বলিয়াছেন যে, মক্কা ও মদীনায় গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কুরআনের কোন কোন

আয়াতে উল্লিখিত 'তাযাক্কা' শব্দটি হিব্রু, আরামীয় ও সিরিয়াক ধাতুমূলের অনুরূপ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল। তাই ফলত ইহার অর্থ "নৈতিক পরিশুদ্ধি যে বিষয়ে একটা আবছা ধারণা আরবদের মনে ইয়াহূদী-খৃষ্টীয় প্রভাবের কারণে গড়িয়া উঠিয়াছিল"।[১৭] তাই তিনি যুক্তি তুলিয়া বলিতে চাহিয়াছেন যে, ঐ শব্দটি কার্যত "ধর্মপ্রাণ বা 'ন্যায়পরায়ণতার' প্রায় একই অর্থ বহন করে এবং শব্দটি ইসলামের অভ্যুদয়ের একেবারে গোড়ার দিকে মুহাম্মাদ ﷺ -এর অনুসারীদের যাহা করণীয় ছিল তাহার সর্বাঙ্গীন বিবৃতি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আর সেই সাথে নৈতিকতার দিকটির উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়"।[১৮] এই নৈতিকতার দিকটির অন্বেষণে ওয়াট অনুবাদের মাধ্যমে কুরআনের সূরা ৯০ঃ১১, ১০৪ঃ১-৩, ৯২ঃ৫-১১, ৫৩ঃ৫৪, ১০০ঃ৬-১১, ৮৯ঃ১৮-২১, ৬৮ঃ১৭-৩৩, ৬৯ঃ৩৩-৩৫, ৫১ঃ১৭-১৯ ও ৭০ঃ১৭[১৯] বরাত দিয়া বলিয়াছেন যে, এই আয়াতগুলির বিষয়বস্তুর মূলভাব কার্যত এই যে, গরীব, আশ্রয়হীনদের খাওয়ানো উত্তম কাজ আর একান্ত নিজের জন্য বিত্তসঞ্চয় মন্দ কাজ।[২০] এইভাবে ওয়াট কার্যত বলিতে চাহিয়াছেন, তাযাক্কা ও দানশীলতা সমার্থক। তিনি পরিশেষে এই রায় দিয়াছেন যে, কুরআনের গোড়ার দিকের আয়াতগুলির নৈতিকতার সবটুকুই দানশীলতা এবং দারিদ্র্য ও দীনতার সাথে সম্পর্কিত।"[২১]

পরিশেষে (ঙ) উপবিভাগ অংশে ওয়াট 'কুরআনের গোড়ার দিকের আয়াতগুলির আরও একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা মহানবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর 'নাযীর ও 'মুযাক্কির' হিসাবে বিশেষ কার্যভূমিকা। তিনি বলিয়াছেন, "আরবী 'আনযারা' (انذر) শব্দটির সহিত ইংরাজি warn শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। warn শব্দের অর্থ কোন ব্যক্তিকে কোন বিপজ্জনক, ক্ষতিকর বা ভীতিপ্রদ কোন কিছু সম্পর্কে অবহিত করা যাহাতে তিনি নিজেকে সতর্ক রাখিতে পারেন কিংবা তাহাকে একটা ভীতিতে রাখা যায়"। ইহার আরও নিহিত তাৎপর্য এই যে, "গোড়া হইতেই কোন না কোন আকারে বিচার সম্পর্কিত ধারণার অস্তিত্ব অবশ্যই থাকিবে।"[২২] ইহার আলোকে ওয়াটের রায় হইল, কুরআনের গোড়ার দিকের আয়াতগুলির বেলায় "মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবুওয়াতের কার্যভূমিকা তাহার অধ্যায়ের উল্লিখিত উপবিভাগ (ক) ও (খ)-এ যেভাবে বর্ণিত আছে অর্থাৎ 'আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও ক্ষমতা' এবং 'বিচারের জন্য মানুষের আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের' বিষয়ে মানুষের মনোযোগ আকর্ষণে সীমিত ছিল।"[২৩]

দুই ঃ উল্লিখিত অনুমানগুলির সত্যতা যাচাই

(ক) আয়াতের ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচন

ওয়াট এইভাবেই কুরআনের গোড়ার দিকের আয়াতগুলির বিভিন্ন দিক ও মহানবী ﷺ-এর প্রাথমিক কার্যভূমিকা সম্পর্কে যাহা ধারণা করেন তাহা শনাক্ত করিয়াছেন। কুরআনের গোড়ার দিকের আয়াতগুলিতে অবশ্য আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও ক্ষমতা, বিচারের জন্য মানুষের তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্তনের, রোজ হাশর বা চূড়ান্ত বিচার দিনের এবং আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞ থাকিবার ও তাঁহার 'ইবাদত' করিবার কর্তব্যের কথাই বলা হইয়াছে। ইহাও সত্য যে, 'কুরআনের গোড়ার

দিকের আয়াতগুলিতে ঢালাও বস্তুবাদ ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে বক্তব্য দেওয়া হইয়াছে এবং দানশীলতা ও দয়াধর্মের অনুকূলে আহ্বান জানানো হইয়াছে। তবে ইহাও আদৌ সত্য নহে যে, সব আয়াতে 'আল্লাহ্র একত্বের বিষয়ে কোনই উল্লেখ নাই', এই বিষয়ে কোন গুরুত্ব আরোপও পরিদৃষ্ট হয় না এবং 'পৌত্তলিকতার কোন নিন্দা নাই'। ইহাও সত্য নহে যে, গোড়ার দিকে মহানবী ﷺ -এর কার্যভূমিকা কেবল আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ক্ষমতার, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা এবং সেই কৃতজ্ঞতার অভিব্যক্তি হিসাবে 'ইবাদত করার ঔচিত্যের প্রতি মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করার কাজেই সীমিত ছিল না। ওয়াট গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতসমূহের ত্রুটিপূর্ণ বাছাই করার ভিত্তিতে এইসব অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি একই সাথে এইসব আয়াতের ত্রুটিপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণও দিয়াছেন ও ধারাবাহিক কয়েকটি ত্রুটিপূর্ণ ধারণাও প্রকাশ করিয়াছেন। তবে বাস্তব তথ্যাদি, যুক্তি, এমনকি তাঁর নিজ যুক্তি-তর্কের সুরও তার নিজ সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে।

কুরআনের আয়াতসমূহের বাছাইয়ে স্পষ্ট ত্রুটির কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে বেল কুরআনের সূরা/আয়াতসমূহ নাযিলের যেসব তারিখ নির্ধারণ করিয়াছেন উহাতে নিহিত রহিয়াছে। ওয়াট তাহার রায়মূলক বিবৃতি-বয়ানগুলি ইহার ভিত্তিতেই দিয়াছেন। আর সেই কারণেই তাহার অভিমত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তমূলক কিছু নহে। অন্যত্র উল্লেখ করা হইয়াছে,[২৪] মুসলিম বিশেষজ্ঞদিগকে বাদ দিলেও এমনকি পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদগণও বেলের উল্লিখিত তারিখ নির্ধারণ সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করেন নাই। ওয়াট বেলের তারিখ নির্ধারণ সম্পর্কে নিজেও গুরুতর সংশয়ের আভাস দিয়াছেন এই মর্মে উক্তিতে (এখানেও তাহা করিয়াছেন) যে, ইহা ঠিক হইবার প্রবল সম্ভাবনা থাকিলেও মোটেও কিন্তু সুনিশ্চিত নহে। কেননা এই বিষয়ে ভিন্ন বিকল্প অভিমতও সম্ভব।[২৫] এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির বিষয়বস্তু সম্পর্কে এমন অস্বাভাবিক ঘোষণা দেওয়ার জন্য এমন অনিশ্চয়তার বুনিয়াদে অগ্রসর হওয়ার কাজটি স্পষ্টতই বিপজ্জনক।

কিন্তু ওয়াট এমনকি নিজেকে ঐসব আয়াতের মধ্যেও সীমিত রাখেন নাই যেসব আয়াতকে নোলডেকে ও বেল উভয়ই প্রথম দিকে অবতীর্ণ বলিয়া মনে করেন। ওয়াট বলিয়াছেন, তিনি এই আয়াতগুলির মধ্যে এমন কিছু আয়াত বিবেচনা বহির্ভূত রাখিয়াছেন যেগুলির মধ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতা সৃষ্টির প্রাক-ধারণা রহিয়াছে। কেননা তাহার মতে, "এই ধরনের বিরোধিতার সৃষ্টি হইবার আগেই কুরআনের যেসব আয়াত বা বার্তায় বিরোধিতা সৃষ্টির মত প্রবণতা রহিয়াছে সেগুলি ঘোষিত হওয়া ছিল আবশ্যিক"। এই ধরনের বিতর্কমূলক যুক্তি আলোচ্য ক্ষেত্রে কোন নিরাপদ নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করিতে পারে না। কেননা মহানবী ﷺ -এর নবূওয়াত ও আল্লাহ্র তরফ হইতে বার্তা প্রদানের দাবির বিরোধিতা ও দাবির বিরুদ্ধে আপত্তি একান্ত সূচনা হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। নোলডেকে ও বেল উভয়ই এই বাস্তবতাটি লক্ষ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। কেননা তাহারা কুরআনের কোন কোন আয়াত গোড়ার দিকের তাহা নির্ধারণে যাচাই করিবার এই কষ্টিপাথরটি প্রয়োগ করেন নাই। ওয়াট নিজেও কার্যত যে বক্তব্য দিয়াছেন তাহা কড়াকড়ি অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই বিষয়ে তিনি নিজেও সচেতন।

কেননা তিনি কুরআনের যেসব আয়াত নির্বাচিত করিয়াছেন উহা করিবার পর তিনি বলিতেছেন, বুঝা যায় এইসব আয়াতের কোনও কোনও আয়াতের অবতীর্ণ হওয়ার তারিখ "ঐসব আয়াতের মর্মবাণীর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া দেখা যাইবার পর সেইগুলির অবতীর্ণ হইবার কাল উহার পরে নির্ধারণের দরকার পড়ে"; তবে যেহেতু আয়াতগুলি যুক্তির দিক হইতে আগে অবতীর্ণ তিনি সেই সম্ভাবনাকে উপেক্ষা করিয়াছেন।[২৬] আয়াতগুলি বোধগম্যভাবেই সেইগুলির বিরুদ্ধে বিরোধিতা দেখা দেওয়ার পরে "কিন্তু যুক্তির দিক হইতে উহার আগেই অবতীর্ণ" বলিয়া ওয়াট যে দাবি করিয়াছেন তাহা দিয়া তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন তাহা পরিষ্কার নহে। এখন ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে তাহার বাছাই করা কুরআনের কয়েকটি আয়াতে। মক্কার এইসব আয়াতের মর্মবাণীর বিরুদ্ধে বিরোধিতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিছু আয়াতের বরাত দিয়াছেন যেইগুলির বরাত নোলডেকে ও বেল আগেই দিয়াছেন যদিও এইসব আয়াতে এগুলির বিরুদ্ধে বিরোধিতার আভাস রহিয়াছে। কুরআনের সেই সূরাসমূহের আয়াতগুলি হইল যথাক্রমে ঃ ১০৪ ঃ ১-৩; ৯২ঃ৫-১১; ৬৮ঃ১৭-৩৩; ৫৩-৫৪ পরবর্তী; ১০০ঃ৬-১১; ৮৯ঃ১৮-২১; ৬৯ঃ৩৩-৩৫; ৫১ঃ১৭-১৯ ও ৭০ঃ১৭ পরবর্তী।[২৭] ওয়াট তাহার বইয়ের ৬১ পৃষ্ঠায় গোড়ার দিকে অবতীর্ণ বলিয়া যেসব আয়াতের তালিকা দিয়াছেন উহা হইতে এইগুলি ভিন্ন।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর মিশনের একান্ত সূচনা হইতেই উহার যে বিরোধ দেখা দেয় তাহা কার্যত ওয়াটও কবুল করিয়াছেন তাঁহার এই বক্তব্যে যে, ইবাদত "নামায পড়া" "মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথম হইতেই"। আর ইহার বিরোধিতাও করা হইয়াছে প্রথম হইতেই।[২৮] এই উক্তি করার পর ওয়াটের উচিত ছিল ভাবিয়া দেখা 'ইবাদতের মধ্যে কি তাৎপর্য নিহিত রহিয়াছে যাহা উহার বিরোধিতার কারণ হইতে পারে। এখনই প্রমাণ দেওয়া হইবে যে, তিনি উহা শুধু করিতে ব্যর্থই হন নাই, তিনি কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কতিপয় আয়াতে সন্নিবেশিত নামায পড়ার আদেশকে হয় ভুল বুঝিয়াছেন, নয় ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে যাহাই হউক তাহার নিজ স্বীকারোক্তি ও আচরণে ওয়াট নিজে যেসব শর্তারোপ করিয়াছেন তাহা একান্তভাবে নিজেও অনুসরণ করেন নাই। তিনি কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ বলিয়া এমন কিছু আয়াত নির্বাচিত করিয়াছেন যেইগুলির কারণে বিরোধিতা সৃষ্টি হইবারই কথা। তিনি এইসব আয়াত বাছিয়া লইয়াছেন এইগুলি তাঁহার মতের সমর্থক বলিয়া, অথচ একই শ্রেণীতে পড়ে সেগুলি তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন অত্যন্ত বোধগম্য কারণেই। কেননা তিনি যে বক্তব্য উপস্থাপন করিতে চাহেন সেইগুলি তাহা সমর্থন করে না।

ইহা না করিয়া নিরপেক্ষ দৃষ্টি অবলম্বন করিলে দেখা যাইত যে, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কিছু আয়াত দ্বিধাহীনভাবেই একত্ববাদের কথা ঘোষণা ও পৌত্তলিকতা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।[২৯] এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, কুরআনের অন্ততপক্ষে আনুমানিক ২০ হইতে ২৫টির মত আয়াত ও সূরা আবশ্যিকভাবেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কর্তৃক তাঁহার বাণী প্রচার শুরু করার আগেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। ওয়াট নিজেই কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কিছু আয়াত সন্ধান করিতে গিয়া আনুমানিক ২২টির বরাত দিয়াছেন। ২০ হইতে ২৫টি আয়াত ও সূরার মধ্যে সীমিত

রাখিয়া তাঁহার এই তালিকার সংশোধন করা হইলে (করাও উচিত) গোটা চিত্র একেবারেই বদলাইয়া যাইত। এমনি করিয়া সূরা ফাতিহার কথাই ধরা যাক। এই সূরাটি মুসলিম আলিমদের মত অনুযায়ী আয়াত নাযিল হইবার ক্রম অনুসারে ইহার অবস্থান পঞ্চম মাত্র হইলেও রডওয়েল ও মুইরের দাবি অনুযায়ী অষ্টম। ইহাতে একত্ববাদ সম্পর্কে অত্যন্ত পরিষ্কার বিবৃতি রহিয়াছে। সূরা ফাতিহার শেষ আয়াতটিকে যদিও অনেক সময় মনে করা হইয়া থাকে যে, উহাতে 'কোন অনির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের' উল্লেখ রহিয়াছে (যাহা মার্গোলিয়থ উল্লেখ করিয়াছেন) উহা ধর্তব্যে না আনিলে সূরার বক্তব্য ও অর্থ পরিষ্কার ও সর্বজনীন হইয়া উঠিবে।

অনুরূপভাবে ৭৩ নং সূরা অর্থাৎ সূরা আল-মুয্যাম্মিলের কমপক্ষে প্রথম ৯ বা ১০টি আয়াত যাহা নাযিলের অগ্রাধিকার গণনায় তৃতীয়, কিন্তু রডওয়েল, জেফারি ও নোলডেকের হিসাবমতে যথাক্রমে তৃতীয়, ২৩তম ও ৩৩তম। এই সূরার ৯ম আয়াতে বলা হইয়াছেঃ

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلاً .

"আল্লাহ হইতেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের প্রভু, তিনি ব্যতীত 'ইবাদতের যোগ্য কেহই নাই। অতএব তাঁহাকেই গ্রহণ কর তোমার কর্মবিধায়করূপে"।

আরও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, এই বিশেষ আয়াতটিতে ইহার বিরুদ্ধে মক্কায় কোন প্রকারের বিরোধিতা সৃষ্টির কোন উল্লেখ নাই।

আবার সূরা নং ১১২ তথা আল-ইখলাস-এর কথা ধরা যাইতে পারে। এই সূরাটিকে মুসলিম আলিমগণ নাযিলের ক্রমানুসারে ২২তম বলিয়া ধরিয়া থাকেন। কিন্তু রডওয়েল ও মুইর ইহার অবস্থান নির্ধারণ করিয়াছেন যথাক্রমে দশম ও ২০তম। এই সূরাটি একত্ববাদের চিরায়ত বিবৃতিবিশেষ। ইহাতে সরাসরি আপোসহীনভাবে পৌত্তলিকতাকে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। সূরা কাফিরূনের (সূরা ১০৯) বিষয়েও একই কথা প্রযোজ্য। এই সূরার অবতীর্ণ হওয়ার কালপঞ্জিতে অবস্থান বিশেষজ্ঞ আলিমগণের মতে অষ্টাদশ; রডওয়েলের মতে দ্বাদশ।

ওয়াট এইসব সূরা বা আয়াতই শুধু পাশ কাটাইয়া যান নাই, এমনকি তিনি যেসব সূরা বাছাই করিয়াছেন সেইগুলি হইতেই অতি যত্ন ও সতর্কতা সহকারে সেইসব অংশ বাদ দিয়াছেন যেইগুলিতে একত্ববাদের জোরালো বক্তব্য রহিয়াছে, যদিও সেগুলিতে মক্কায় এসব বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন বিরোধিতার উল্লেখ নাই। সূরা নং ৫১ (আয-যারিয়াত) এই ক্ষেত্রে তাহার উক্তরূপ পক্ষপাতের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। ওয়াট এই সূরা হইতে ১-৬ আয়াতগুলি গ্রহণ করিলেও তাহার আলোচনা হইতে সুনির্দিষ্টভাবেই ৫১ নং আয়াতটিকে বাদ দিয়াছেন যাহাতে বলা হইয়াছে : "তোমরা আল্লাহ্র সহিত কোন ইলাহ স্থির করিও না; আমি তোমাদিগের জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে স্পষ্ট ও প্রকাশ্য সতর্ককারী"।

এই আয়াতটি ওয়াটের বাদ দেওয়ার কারণ বেল-এর মতানুযায়ী "আয়াতটি নিশ্চিতভাবেই কুরআনে পরবর্তী কালে সংযোজন করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়"। তাহার এইরূপ অনুমান ও ধারণার সপক্ষে ওয়াট আরও বলিয়াছেন, 'এই আয়াতটিকে পুনরাবৃত্তিমূলক বলিয়াই মনে হয়।

কেননা ইহার বিষয় আগে ইতোমধ্যে বলা হইয়াছে। যদি ইহা কোন নূতন বিষয় হইত তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাতে আরও বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হইত'।[৩০] এখানে আবারও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই আয়াত ও ইহার পূর্ববর্তী পাঁচটি আয়াত সুসংহতিময় কার্যত একক আয়াত বা অনুচ্ছেদ বিশেষ। এইসব আয়াতে ওয়াট কথিত 'আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও ক্ষমতার' প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। ইহাতে মক্কায় ইহার বক্তব্যের বিরুদ্ধে কোন বিরোধিতা সৃষ্টির কোনও আভাস নাই। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল এইসব আয়াতে 'নাযীর' (সতর্ককারী) হিসাবে মহানবী ﷺ-এর ভূমিকার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে বিষয়টিকে ওয়াট সবিশেষ স্বীকৃতি দিয়াছেন যাহাতে আবার তাহার হুঁশিয়ারির বিষয়ের একটি পূর্বাভাসও রহিয়াছে। এইভাবে দেখা যায়, ওয়াট ও বেলের নিজ নির্ধারিত শর্তানুসারেই আয়াতগুলি কুরআনের গোড়ার দিকে নাযিল হওয়া আয়াতগুলির তাহারা যে তালিকা করিয়াছেন উহার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত ছিল। একমাত্র যে কারণে ওয়াট তাহার উক্ত তালিকা হইতে এই আয়াত বাদ দিতে মনস্থ করেন তাহা হইল, ঐ আয়াতে একত্ববাদের স্পষ্ট ঘোষণা। আর ঐ আয়াতটি যে একটি গোটা অনুচ্ছেদের অঙ্গ উপাদান বা ইউনিট উহার উদ্ধৃতি দিলেই সেই প্রমাণ মিলিবে ঃ

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ. وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ. وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ. فَفِرُّوْا اِلَى اللّٰهِ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ. وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ اِنِّيْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ .

"আমি আকাশ নির্মাণ করিয়াছি আমার ক্ষমতাবলে এবং আমি অবশ্যই মহা সম্প্রসারণকারী।[৩১] আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করিয়া দিয়াছি কতই না চমৎকারভাবে। আমি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করিয়াছি জোড়ায় জোড়ায় যাহাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। অতএব তোমরা আল্লাহ্‌র দিকে ধাবিত হও; আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে স্পষ্ট সতর্ককারী। আর তোমরা আল্লাহ্‌র সহিত কোন ইলাহ স্থির করিও না; আমি তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট হইতে স্পষ্ট সতর্ককারী" (৫১ ঃ ৪৭-৫১)।

একত্ববাদী তত্ত্বের ইহা হইতে বলিষ্ঠতর ও প্রকাশ্য সংজ্ঞা ও ঘোষণা আর কিছু হইতে পারে না। মানুষ যাহাতে নিয়োজিত উহা হইতে তাহাদেরকে আল্লাহ্‌ সমীপে "পলায়নের" জন্য ইহার তুলনায় অন্য কোন বলিষ্ঠ উপদেশ হইতে পারে না। মহানবী ﷺ কিসের বিরুদ্ধে সতর্ক ও হুঁশিয়ার করিতেছেন ইহার অপেক্ষা উহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ আর কিছুই হইতে পারে না। তাই ইহা বিস্ময়কর যে, ওয়াট এই যুক্তির অবতারণা করেন, "যদি ইহা কোন নূতন বিষয় হইত তাহা হইলে উহা নিশ্চয় অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিত"। ইহা আদৌ বোধগম্য নহে এই বিষয়ে অধিকতর গুরুত্ব কী হইতে পারে। কিন্তু ওয়াট যেহেতু উক্ত প্রথম ছয় আয়াতকে ইসলামের আদি পর্বের একেবারে গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য

করিয়াছেন এবং সূরার ৫১তম আয়াতকে পরবর্তী কালে সংযোজিত ও সেই সাথে ইতোমধ্যে আলোচিত বিষয় তথ্য পুনরাবৃত্তি বলেন সেহেতু একমাত্র তাঁহার জন্য যৌক্তিক হইতে পারে যদি তিনি যেসব আয়াত আলোচ্য আয়াতটির আগে অবতীর্ণ সেইগুলি শনাক্ত করিবার প্রয়াসে এই প্রশ্নটি আলোচনায় উত্থাপন করিতেন। কেননা সেইগুলিতেই এই বিষয়টির প্রথম উল্লেখ রহিয়াছে যে বিষয়টির পুনরাবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে ৫১ঃ৫১ আয়াতে। ওয়াট অবশ্য এইগুলির কোন কিছুই করেন নাই।

একইভাবে ৫২ নং সূরা (আত-তূর) সম্পর্কে তাহার বক্তব্য ব্যক্তিনির্ভর ও বিতর্কিত। তিনি এই সূরা হইতে প্রথমে কোন আয়াত বা অনুচ্ছেদের সুনির্দিষ্ট উল্লেখ না করিয়া কেবল উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই সূরার কোন কোন আয়াত আগে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পরে তিনি তাঁহার লেখার উপবিভাগ (খ)-এ বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তনের বিষয় আলোচনা প্রসঙ্গে এই সূরার ৭ ও ৮ নং আয়াতের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, এই আয়াত দুইটিতে বিচার ও শাস্তির সত্যতা ও অনিবার্যতার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।[৩২] আয়াত দুইটি হইল ঃ

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ . مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ.

"সৃষ্টিকর্তার শাস্তি অবশ্যই আসিবে এবং কেহই তাহা এড়াইতে পারিবে না"।

এই সূরার প্রথম ছয়টি আয়াত হইল এই বিষয়ে 'শপথ' বিশেষ যাহাতে এই বিবৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্ববর্তী সূরার (৫১ ঃ আয-যারিয়াত) প্রথম ছয়টি আয়াত যেইগুলিকে ওয়াট তাহার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন এবং যেইগুলির বরাতও তিনি তাহার রচনার উপভাগে দিয়াছেন সেইগুলিতেও একই বিষয়ে বলা হইয়াছে। এই সূরার প্রথম চার আয়াত হইল 'শপথ' যেগুলিতে ৫-৬ আয়াতের বক্তব্যের বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। এই আয়াতগুলিতে বলা হইয়াছে ঃ

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ . وَاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ .

"যাহার প্রতিশ্রুতি (হুঁশিয়ারি) তোমাদিগকে দেওয়া হইয়াছে নিশ্চয় তাহা সত্য। বিচার সুনিশ্চিতভাবেই অনিবার্য"।

এ অবস্থায় এই ছয় আয়াত (কার্যত দুই)[৩৩] অথবা সূরা ৫২-এর (আত-তূর) দুই আয়াত সেই কর্তব্যের উল্লেখ ছাড়াই নাযিল হইয়াছে (যে কর্তব্য বিষয়ে নিশ্চিতভাবেই জবাবদিহি করিতে হইবে ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার জন্য শাস্তি অনিবার্য)—ইহা আর যাহাই হউক বিশ্বাসযোগ্য নহে। এখানে বিবেচ্য বিষয় "আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও ক্ষমতা" নহে বরং বিবেচ্য ছিল আল্লাহ্‌র উলূহিয়্যাত বা তাঁহার আল্লাহ হওয়া এবং মানুষের কাছে তাঁহার সর্বাত্মক ও অবিভাজ্য আনুগত্যের দাবি। ইহাই হইল সূরা নং ৫১ এবং উপরে প্রদর্শিত মতে সূরা নং ৫২-এর অধিকতর মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যাহা সূরাগুলির মূল ভাব ও অবয়বও বটে। দুই সূরাতেই এই প্রধান মূল ভাবের

উপস্থাপনা করিয়া হাশরের বিচার ও শাস্তির অবধারিত অনিবার্যতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা হইয়াছে। এই ধারার সহিত সঙ্গতি রাখিয়াই ৫২ নং সূরার ৪৩ আয়াত ঐ প্রশ্নটির সম্ভাবনা নির্মূল করিয়াছে এই ভাষায়, "না কি আল্লাহ ব্যতীত উহাদিগের অন্য কোন ইলাহ আছে? উহারা যাহাকে তাঁহার শরীক স্থির করে আল্লাহ তাহা হইতে পূত, পবিত্র"।[৩৪] এই সূরার সমাপ্তি ঘটিয়াছে তাঁহাকে (কেবলই তাঁহাকে) উপাসনা করিবার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাইবার মাধ্যমে।[৩৫] এমনিভাবে এই সূরার মধ্যে একটি সামগ্রিক একত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ইহার প্রধান মূল ভাব হইল আল্লাহ্র পরম একত্ব এবং তাঁহার প্রতি মানুষের অবিভাজ্য অনুগত্যে তাঁহার দাবি। আর এই মূল ভাবের অবিচ্ছেদ্য অংশ হইল বিচার ও শাস্তির বিষয়ে হুঁশিয়ারি। এই হুঁশিয়ারি উহার মৌলিক বিষয় হইতে বাদ দেওয়া এবং আগের আয়াত হইতে পৃথক ও স্বতন্ত্র বিবেচনা করা কিংবা উহার পরবর্তী বলিয়া বিবেচনা হইবে একান্তই একতরফা ও অস্বাভাবিক।

বাস্তবিকপক্ষে ওয়াট এই ধরনের অস্বাভাবিক ব্যবচ্ছেদ-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া তাহার নিজ অবস্থানের বা বক্তব্যের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। কারণ তিনি তাহার আলোচনার এই উপবিভাগের শেষের দিকে মন্তব্য করিয়াছেন, "৫১:৫ প. ও ৫২:৭ প. এই আয়াতগুলি সম্পর্কে এইমাত্র যে আলোচনা করা হইল ... তাহাতে মনে হয় এইগুলি বরং দ্বিতীয় স্তরে উত্তরণের সহিত সম্পর্কিত যখন ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতা দেখা দিতেছিল এবং রোজ হাশর বা শেষ বিচারের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছিল"।[৩৬]

ওয়াটের এই মন্তব্যটি এই সত্যতা বা বাস্তবতার আরেক স্বীকৃতি যে, মহানবী ﷺ-এর মিশনের বিরোধিতা ও আপত্তি ইসলামের সূচনা হইতেই শুরু হয়। ইহাতে ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এই আয়াতগুলিতে ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতা দেখা দেওয়ার কোন ইঙ্গিত নাই বা আছে বলিয়া যে যুক্তিতর্ক উত্থাপন করা হইয়াছে সেইগুলি ধোপে টিকে না। এইভাবে ওয়াট যে বিভ্রান্তি ও আপস করিয়া যে অযৌক্তিক জোড়াতালি দিয়াছেন তাহা সহজেই এড়ানো যাইত যদি তিনি বিচার ও শাস্তি সংক্রান্ত আয়াতগুলিকে একতরফাভাবে আল্লাহ্র তাওহীদের মৌলিক ইস্যুকে বিচ্ছিন্ন না করিতেন। কারণ আল্লাহ্র একত্ব হইল তাঁহার বিচার ও শাস্তির বিষয়বস্তু যাহার উল্লেখ আবশ্যিকভাবেই তাঁহার একত্বের ঘোষণার সহিত যুগপৎ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ওয়াট (অথবা তাহার নেতৃস্থানীয় পূর্ববর্তী বেল) এই আয়াত অবতীর্ণ হইবার তারিখ পরবর্তী কালে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।.

(খ) আয়াতসমূহের ভ্রান্ত বিশ্লেষণ

এই ধরনের আয়াত ও সূরাগুলির কথা বাদ দিলেও ওয়াট যেসব আয়াত নিজে বাছিয়া লইয়াছেন সেইগুলিতেও তাওহীদ বা আল্লাহ্র পরম একত্ব ও পৌত্তলিকতা প্রত্যাখ্যানের অভ্রান্ত উল্লেখ রহিয়াছে। তিনি এই ক্ষেত্রে হয় এইগুলির নিহিত তাৎপর্য বুঝিতে পারেন নাই অথবা এইগুলির ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন যাহাতে তাহা তাহার নিজের ধারণার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিয়া লওয়া যায়। ওয়াটের এই ধরনের মূল ইস্যুর পাশ কাটানোর জ্বলন্ত নিদর্শন হইল সূরা ৭৪:৩

(আল-মুদ্দাছ্ছির) সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য। তিনি এই সূরার সম্পর্কিত আয়াতের অনুবাদ তাহার রচনার "আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ক্ষমতা" সম্পর্কিত উপবিভাগে দেন নাই। কিন্তু তিনি উহা করিয়াছেন তাঁহার লেখার উপবিভাগ (গ)-এর 'কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা' শিরোনামের আলোচনায়। তিনি এখানে আয়াতের অনুবাদ করিয়াছেন ঃ "Thy Lord magnify" "তোমার প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা কর" এবং বলিয়াছেন, ইহা হইল উপাসনা করার একটি আদেশ।[৩৭]

ইহার পর "মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিজ কাজ বা কর্মবৃত্তি" শিরোনামের (ঘ) উপবিভাগেও তিনি আবারও অনুবাদ উপস্থাপনা করিয়া বলিয়াছেন, ইহাতে মুহাম্মাদ ﷺ-এর 'নাযীর' (সতর্ককারী)[৩৮] হিসাবে কর্তব্যকর্মের উল্লেখ রহিয়াছে। বস্তুত এই আয়াত ইবাদতের নির্দেশ নয়, বরং ইহা সরাসরি পূর্ববর্তী আয়াতের অংশ যাহাতে মহানবী ﷺ-কে আদেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ "উঠিয়া দাঁড়াও, সতর্ক কর" (قُمْ فَأَنْذِرْ)। এই দুই আয়াতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে গিয়া ওয়াট কিছুটা বিভ্রান্তভাবে বলেন যে, পরের আয়াতটি পরবর্তী কালে নাযিল হওয়া 'অন্যান্য আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যাহাতে মহানবী ﷺ-এর "নিজের অনন্যসাধারণ ও বিশেষ কর্মদায়িত্বের" আভাস রহিয়াছে। ইহা অবশ্যই লক্ষণীয় যে, ইহা আর কোন আয়াত নহে, বরং "তোমার প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা কর" এই আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতমাত্র। বাস্তবিকপক্ষে আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে,[৩৯] দ্বিতীয় আয়াতে প্রদত্ত নির্দেশে সূরা ৭৪ঃ১-৭ আয়াতের সকল নির্দেশ ইহার সহিত সম্পর্কিত এবং মহানবী ﷺ যে হুঁশিয়ারি দানের জন্য আদিষ্ট তাহার সরলীকৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ। তাহা হইলে 'কাব্বির' বলিতে আসলে কী বুঝাইতে পারে? আর কিসের সহিত তুলনাক্রমে এই মহত্ত্ব ঘোষণার কাজটি করিতে হইবে। যদি ইহার সরলার্থ হইয়া থাকে আল্লাহ্র মহত্ত্ব বা শুভত্ব প্রকাশ তাহা হইলে সর্তক করার সহিত উহার আর কোন সম্পর্ক থাকে না। তাই এই পরিপ্রেক্ষিত ও উল্লিখিত নির্দেশ এখানে লইয়া আসার বিষয়টি বিবেচনায় রাখিয়া বলিতেই হয় যে, 'কাব্বির' অবশ্যই সব কিছুর ও সর্বোপরি সকল ধারণাগত অপর্যাপ্ততাকে ছাপাইয়া "আপন প্রভুর" বিশেষ ও পরম মহত্ত্ব বুঝাইতেই ব্যবহৃত হইয়াছে যাহাতে এই বিশেষ মহত্ত্বের প্রতি ঔদাসীন্য ও অবজ্ঞার বেলায় সতর্ক করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। "কাব্বির" ধারণা এখানে ইহাই আর এই ধারণাতেই তাহারা ইহাকে বুঝিয়া থাকে যাহারা ইহার উদ্দিষ্ট। এই বিশেষ আকারে অর্থাৎ 'কাব্বির'-এর ধারণায় কুরআনের আরেকটি জায়গায় মাত্র রহিয়াছে যেখানে প্রসঙ্গ ইহার অর্থকে অত্যন্ত সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে। ইহা রহিয়াছে সূরা ১৭ঃ ১১১ (সূরাতুল ইসরা) এইভাবে ঃ

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهُ شَرِيْكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِىٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا .

"এবং বল, প্রশংসা আল্লাহ্রই যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, যাঁহার সার্বভৌমত্বে কোন অংশী নাই এবং যিনি দুর্দশাগ্রস্ত নন যেজন্য তাঁহার সাহায্যকারী প্রয়োজন হইতে পারে। সুতরাং সসম্ভ্রমে তুমি তাঁহার মহত্ত্ব ঘোষণা কর"।

এই আয়াতের প্রথম অংশ হইল তাকবীর তথা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ঘোষণা সম্পর্কিত কাজের সংজ্ঞা আর এই সংজ্ঞায়নের ধারণাতেই 'কাব্বির' নির্দেশটি প্রদত্ত হইয়াছে এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার একবারে শুরু হইতেই এই ধারণাতেই 'কাব্বির'-কে বুঝিতে হইবে। ইসলামী পরিভাষায় তখন হইতেই কাব্বির শব্দটির অর্থ ঃ আল্লাহু আকবার, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ।

আয়াতের চতুর্থ আদেশ বাক্যেই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইয়াছে। অর্থাৎ ৭৪ঃ৫ "অপবিত্রতা হইতে দূরে থাক" (وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ) । আরবী ভাষায় সকল স্বীকৃত বিশারদ আর-রুজায (اَلرُّجْزُ) বলিতে মূর্তিপূজা বুঝাইয়া থাকেন। আর এই আয়াতকে মূর্তিপূজা পরিহারের জন্য নির্দেশ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মূর্তি ইত্যাদিকে ময়লা, নোংরা ও অপরিচ্ছন্নতা বিবেচনা করা হইয়াছে।[৪০] আর-রুজ্‌য শব্দটি আর-রিজস্‌ (الرِّجْسُ) শব্দটির সমার্থক যাহা ফখরুদ্দীন আর-রাযী উল্লেখ করিয়াছেন। কুরআনের অন্যত্র মূর্তিপূজাকে রিজ্‌স্‌ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে (দ্র. সূরা ২২ ঃ ৩০)।[৪১]

এই আদেশ এমনি করিয়া "উঠিয়া দাঁড়াও ও সতর্ক কর" মর্মে নির্দেশের সহিত সরাসরি সম্পর্কিত এবং ইহার উল্লেখ একই আয়াতে থাকিলেও ওয়াট সূরা ৭৪ঃ৫ আয়াতকে প্রসঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার রচনার উপাবিভাগ (খ)-এর "বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তন" শিরোনামের আওতায় ইহা সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। বেলের অনুসরণে ওয়াট বলিয়াছেন, রুজ্‌য শব্দটি সিরীয় 'রুগজা' শব্দ হইতে উদ্ভূত যাহার অর্থ "ভয়ঙ্কর ক্রোধ"। তাহার মতে, শব্দটি "মূলত কথিত মহাপ্রলয়ের (কিয়ামত) তাৎপর্য হইতে উদ্ভূত" হইয়াছিল।[৪২] শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও এখানে 'ভয়ঙ্কর ক্রোধ" অর্থটি আদৌ প্রাসঙ্গিক নহে এবং অনুপযুক্তও বটে, যতই ইহাতে কিয়ামতের তাৎপর্য অনুমান করা হউক না কেন। কেননা তাহাতে আরও প্রশ্ন উঠিবে এই যে, 'তাহা হইলে ঐ "ভয়ঙ্কর ক্রোধ" কাহার ও কিজন্য? যদি ইহাকে ধরা হয় আল্লাহ্‌র 'ভয়ঙ্কর ক্রোধ' ও আর কিছুই মোটেও যথার্থ হইবে না তাহা হইলে ইহা সম্পর্কিত হওয়া উচিত পূর্ববর্তী নির্দেশের সহিত যাহাকে আমরা বলিতে পারি ঃ 'আল্লাহ্‌র "মহত্ত্ব" ঘোষণার কর্তব্য যাহাতে ব্যর্থ হইলে আল্লাহ্‌র ন্যায়সঙ্গত "ভয়ানক ক্রোধের" কারণ ঘটিতে পারে।

এই আয়াতের (৭৪ ঃ ১-১০) আলোচনা ছাড়িয়া যাইবার আগে ইহার উল্লেখ আবশ্যক যে, এই বার্তার বিরুদ্ধে মক্কার সমসাময়িক জনসমাজের বিরোধিতা দেখা দেওয়া সম্পর্কে কমপক্ষে দুইবার উল্লেখ রহিয়াছে। প্রথমে উল্লেখ রহিয়াছে সূরা ৭৪-এর ৭ম আয়াতে ঃ "তোমার প্রভুর জন্য ধৈর্যশীল হও" (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) । মহানবী ﷺ -কে সরলভাবেই বলা হয় যে, 'নাযীর' হিসাবে দায়িত্ব পালনে তাঁহাকে ধৈর্যশীল হইতে হইবে। স্পষ্টতই ঐ সময়টি তাঁহার জন্য কঠিন ছিল। হয় সেই দুঃসময়টি ইতোমধ্যেই আসিয়া গিয়াছিল অথবা তাঁহার ইসলাম প্রচারের কারণে তাহা প্রায় সন্নিকটবর্তী হইয়াছিল।

একইভাবে আয়াত ৭৪ ঃ ১০-এ বলা হইয়াছে, রোজ হাশর কাফিরদের জন্য মোটেও সহজ হইবে না। ইহাতে বুঝা যায় যে, কিছু লোক ইতোমধ্যেই নিজদেরকে কাফির বা বার্তা

প্রত্যাখ্যানকারী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিল। ওয়াট আয়াতটির এই তাৎপর্যটি এড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়াই মনে হয়, যদিও তিনি 'কাফির' শব্দটির উপবিভাগ (খ)-এ অবিশ্বাসী বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার গ্রন্থের "কৃতজ্ঞতা ও উপাসনা" শীর্ষক উপবিভাগে (গ) এড়াইয়া গিয়াছেন।[৪৩] তিনি সূরা ৮০:১৭ আয়াতের 'মা আকফারাহু'র সহিত ৭৪:১০ আয়াতের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে বলিয়াছেন যে, রোজ হাশর বা চূড়ান্ত বিচারের দিন কাফিরদের জন্য কঠিন হইবে। সম্ভবত আয়াতের প্রাথমিক শ্রোতাদের জন্য ইহার অর্থ হইবে "অকৃতজ্ঞদের জন্য" এই চূড়ান্ত বিচারের দিন হইবে কঠিন।[৪৪] এখানে একই শব্দ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিভিন্ন অর্থ পরিগ্রহ করিয়াছে। 'কাফির' শব্দটির সাদামাঠা সরলার্থ হইতেছে 'বার্তা' প্রত্যাখ্যানকারী। আর সে কারণেই তাহারা অবিশ্বাসী। ৭৪:১০ আয়াতে অনুরূপ শব্দের সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক অর্থই বার্তা প্রত্যাখ্যানকারী অবিশ্বাসী। ওয়াটও এই শব্দের এই অনুবাদই করিয়াছেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একই কথা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বলা হইয়াছে। কাফির শব্দের সাধারণ অর্থ বার্তা প্রত্যাখ্যানকারী বা অবিশ্বাসী। ৭৪:১০-এর প্রকৃত অর্থ ওয়াটের প্রথম অনুবাদের অনুরূপ। ফলে ইহা দেখানোর প্রয়োজন নাই যে "এই আয়াতের প্রথম শ্রোতাদের বেলায় "সম্ভবত ইহার অর্থ "অকৃতজ্ঞতা"।

এখানে সমস্যা এই যে, ওয়াট আল্লাহ্র মহত্ত্ব, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার কর্তব্য ও উপাসনা সম্পর্কিত বয়ান বা বিবৃতি বলিয়া যাহা উল্লেখ করিয়াছেন তাহার সহিত তাৎপর্য অনুধাবনে হয় তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা অনুধাবন করিলেও তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন। ইহার ব্যাখ্যা এখনই পাওয়া যাইবে। তিনি এই কারণেই একেক জায়গায় একক শব্দনিচয়ের একেক অর্থ তথা একেবারেই ভিন্ন অর্থ দিয়াছেন। কাফির শব্দের প্রাথমিক বা অগ্রগণ্য অর্থ কি উহা সূরা ৪৩:২৪ আয়াতে (قَالُوْا انَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِه كفِرُوْنَ) স্পষ্ট। ইহাতে বলা হইয়াছে ঃ "তাহারা বলিল, তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।" সে যাহাই হউক, এমনকি যদি ধরিয়া লওয়া হয় সূরা ৭৪:১০-এ সন্নিবেশিত শব্দটির অর্থ "অকৃতজ্ঞতা" তাহা হইলেও ঐ বার্তায় কোনও এক ধরনের প্রত্যাখ্যান প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যাওয়া ও তদ্দারা বিরোধিতা গড়িয়া উঠার কথাও বুঝাইবে।

একত্ববাদের সঠিক তত্ত্ব সম্পর্কে সমান প্রত্যয় গুরুত্ব সহকারে ওয়াট নির্বাচিত আরও একটি আয়াতে (সূরা ৮৭ ঃ ১) উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى ; এই আয়াতের "Glorify the name of your Lord, the Most High" (তুমি তোমার সুমহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ঘোষণা কর যাহা অত্যন্ত মহত) এই অনুবাদ হইবে নিকৃষ্ট ও বেঠিক। সাব্বিহ· (سَبِّحْ) শব্দের অর্থ হইল নায্যিহ্ (نَزِّهْ) অর্থাৎ কাহাকেও পবিত্র ঘোষণা করা, সকল প্রকার গলদ, দোষ, পঙ্কিলতা ও ঘাটতি হইতে মুক্ত ঘোষণা করা বা কাহারও প্রতি এই গুণাবলী আরোপ করা।[৪৫]

এমনিভাবে আয়াতটি বাস্তবিকপক্ষে "আপনার সুমহান (শ্রেষ্ঠ) প্রভুর" প্রতি কোন প্রকার ভ্রান্ত অনুমান আরোপ, যেমন তাঁহার অংশী রহিয়াছে কিংবা তিনি অন্য কোন সত্তার সহ-সত্তা যাহা

সমসাময়িক মক্কাবাসী ও আরব সাধারণ বিশ্বাস করিত, এই সকল কিছু হইতে মুক্ত হিসাবে তাঁহার পবিত্রতা, মহিমা ও সর্বোত্তীর্ণতা ঘোষণা করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ। বুঝিতে হইবে যে, এই নির্দেশ বিরাজমান পরিস্থিতি ও ধারণার আলোকে দেওয়া হয়। আরবী ভাষা ও কুরআনের অভিধানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশারদ বলিয়াছেন, সাব্‌বিহ্ (سَبِّحْ) ও সুব্‌হ়ান (سُبْحَانَ) এই দুইটি শব্দ কুরআনে আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত করিয়া কমপক্ষে সাতভাবে প্রয়োগ করা হইয়াছে আল্লাহ্‌র গুণাবলীর ইতিবাচক বা নেতিবাচক প্রেক্ষাপটে।[৪৬] নেতিবাচকভাবে এই শব্দগুলি দ্বারা আল্লাহ্‌র পরম পবিত্রতা এবং সকল প্রকারের দুর্বলতা ও পশ্চাদপদতা, বিশেষ করিয়া কোন সহযোগী হইতে আল্লাহ্‌র মুক্ত ও পবিত্র হওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করিয়া থাকে। আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কিত করিয়া সুবহ়ান (سُبْحَانَ) শব্দটির ব্যবহার হইতে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট। এই রকমের কতকগুলি দৃষ্টান্ত নিচে প্রদত্ত হইল। বিষয়টির বোধগম্য সরল ব্যাখ্যাও এইসব দৃষ্টান্তে নিহিত রহিয়াছে ঃ

১। ৫২ ঃ ৪৩ = أَمْ لَهُمْ إِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

২। ৫৯ ঃ ২৩ = هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ..... سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

৩। ৩৯-০৪ = سُبْحَانَهُ هُوَ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ .

৪। ২৮ ঃ ৬৮ = سُبْحَانَ اللّٰهِ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

৫। ১২ ঃ ১০৮ = سُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

৬-৯। ৩৯ঃ৬৭, ৩০ ঃ ৪০. ১৬ ঃ ১ এবং ১০ ঃ ৮ = سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .

৭। ৯ ঃ ৩১ = لاَ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ .[৪৭]

ইহাও উল্লেখ করা যায় যে, আল-আ'লা (الأعلى) বা সর্বোন্নত/সর্বশ্রেষ্ঠ-এর মধ্যে তাওহীদের একই তাৎপর্য বিদ্যমান। কেননা আল্লাহ্‌কে শ্রেষ্ঠ ও আর সকলের উর্ধ্বে গণ্য করিতে হইবে। তা'আলা (تعالى) এই সাধিত বা প্রত্যয়ান্ত শব্দটির ঠিক এই ধারণাতেই উল্লিখিত ৪-৯ দৃষ্টান্তে উহার বরাত দেওয়া হইয়াছে। ২৭ ঃ ৬৩; ২৩ ঃ ৯৬; ১৬-৩ ও ৭ ঃ ১৯০ আয়াতগুলিতে এই রকম আরও কিছু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। প্রথম আয়াতের পাঠ ঃ আল্লাহ্‌র সহিত অন্য কোন ইলাহ আছে কি? উহারা যাহাদিগকে তাঁহার অংশী করে তিনি তাহাদের হইতে বহু উর্ধ্বে" ইহা হইতে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, "তোমার/তোমাদিগের প্রভু"-কে সর্বোন্নত/সর্বশ্রেষ্ঠ হিসাবে বর্ণনা আসলে সঠিক অর্থে একত্ববাদের অভ্রান্ত বিবৃতায়ন ও ব্যাখ্যা।

'তাযাক্কা/ইয়ায্‌যাক্কা' শব্দনিচয়ের মাঝেও তাওহীদের একই ধারণা নিহিত। প্রধানত জেফারি রচিত Foreign vocabulary of the Qura'n-এর উপর ভিত্তি করিয়া ওয়াট ঐসব শব্দকে সিরীয়/হিব্রু/আরামীয় ভাষা উদ্ভূত বলিয়া চিহ্নিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ওয়াট আরও বলিয়াছেন যে, মদীনায় কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার আমলে এই শব্দগুলির অর্থ বদলাইয়া যায়। তিনি ইহার পর কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির, যাহাকে তিনি কেবল

নীতিমাত্র বলিয়া বিবেচনা করেন, প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া বলেন, একেবারে গোড়ার দিকে 'ইয়ায্‌যাক্কা' বলিতে, যেমন নীতি অর্থাৎ দানশীলতা অনুশীলনের মাধ্যমে ধর্ম বা ন্যায়নিষ্ঠা অর্জনকে বুঝাইত। এই যুক্তির গোলকধাঁধাঁর কথা ছাড়িয়া দিলেও এইসব ধারণা-অনুমানের ব্যাপারে কেবল এই কথা মনে রাখা আবশ্যক ইতোপূর্বে[৪৮] বলা হইয়াছে যে, এমনকি বিদেশী ভাষা উদ্ভূত কোন শব্দ যখন আরেকটি দেশ বা সমাজে পরিগৃহীত ও প্রচলিত হয় তখন মূল ভাষায় ঐ শব্দের যে অর্থ থাকে সাধারণত শব্দটি এমন বা এমন সব অর্থবাহী হইয়া উঠে যাহা উহা হইতে একবারেই বদলাইয়া যায়। ইহা ছাড়াও কোনও বিশেষ ভাষার বিশেষ কোন শব্দ সাধারণত প্রাসঙ্গিক প্রেক্ষাপটের কারণে বিভিন্ন ধারণায় ব্যবহৃত হয়। তাই মদীনায় অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতে 'তাযাক্কা' শব্দটির ব্যবহার যে মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতের ঐ শব্দের অর্থের পরিবর্তে ভিন্ন অর্থ ও ধারণায় ব্যবহৃত হইয়া শব্দটির নিহিতার্থ বদলাইয়াছেই তাহা বুঝাইতে হইবে এমন নহে। ৮০ঃ৩ ও ৮০ঃ৭ আয়াতে 'ইয়ায্‌যাক্কা' শব্দটির ব্যবহার রহিয়াছে। বিষয়টির সর্বোত্তম ব্যাখ্যা রহিয়াছে এখানে। ওয়াট উল্লিখিত উভয় আয়াতই যুগপৎ একই সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন। এই আয়াতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -কে মৃদু ভর্ৎসনা করা হইয়াছে এই কারণে যে, তিনি সামান্য এক অন্ধ ব্যক্তির (ইব্‌ন উম্ম মাকতূম) কথায় মনোযোগ না দিয়া মক্কার এক ধনী ব্যক্তির ব্যাপারে বিশেষ মনোনিবেশ করেন যে ব্যক্তি নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ (ইসতাগনা) মনে করে। অথচ অন্ধ ব্যক্তিও ইয়ায্‌যাক্কার অধিকারী অর্থাৎ ধর্ম ও ন্যায়নিষ্ঠা তাহার থাকিতেও পারিত। এখন যুক্তি হিসাবে ধরিয়া লওয়া যাক ধনী লোকটির কোন ইয়াযযাক্কা না থাকিলেও তাহাতে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন দোষ হইত না। এখন এই বিষয় স্পষ্ট যে, ঐ ধনী ও গর্বিত লোকটি হয়তো দানশীলতা অনুশীলনের মাধ্যমে ন্যায় ও ধর্মনিষ্ঠা অর্জন করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু এই ইয়াযযাক্কা উল্লিখিত গরীব, অন্ধ ব্যক্তিটির বেলায় প্রযোজ্য হইবে না। কেননা এই ধরনের ধর্ম বা ন্যায়নিষ্ঠা অর্জনের আবশ্যকতা তাহার জন্য নাই। মূল কথা এই যে, কুরআনের বহু জায়গায় 'ইয়াযযাক্কা' ও 'ইয়াতাযাক্কা' শব্দ দুইটি একজন ব্যক্তির তাহার নিজেকে পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদের পঙ্কিলতা হইতে পবিত্র ও শুদ্ধ করিয়া তাহার আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যমণ্ডিত করার পথ প্রশস্ত করিবার ধারণায় ব্যবহৃত হইয়াছে। অন্য কথায় ইয়ায্‌যাক্কা'র অর্থ সুনিশ্চিতভাবেই ৮০ ঃ ৩ আয়াত-এর ন্যায় তাওহীদকে গ্রহণ করা।[৪৯] এই কারণে কুরআনের অন্যতম ব্যাখ্যাকারী ইব্‌ন যায়দ ওয়াটের মতোই বর্ণনা করেন[৫০] যে, গোটা কুরআনে উল্লিখিত আত-তাযাক্কা শব্দটির অর্থ ইসলাম।[৫১] ওয়াট কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলিতে সন্নিবেশিত এই শব্দটির সাধারণ অর্থ-তাৎপর্য বিরোধিতায় উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেও শেষ পর্যন্ত তাহার সেই বিতর্ক গোলকধাঁধাঁর দুর্বোধ্য জটাজুটে পর্যবসিত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, গরীব ও অন্ধ লোকটি কিংবা গর্বিত ধনী মক্কাবাসী দুইজনের কেহই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট দানশীলতার নীতির শিক্ষা লইতে আসে নাই।

বস্তুত ওয়াট যাহা শনাক্ত করিয়াছেন তাহা হইল আল্লাহ্‌র মহত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং "বিচারের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট মানুষের প্রত্যাবর্তনের" গুরুত্ব। আর এই সবের উদ্দেশ্য হইল আল্লাহ্‌র একত্ব বা

তাওহীদের বিষয়টিকে তুলিয়া ধরা। মহানবী ﷺ -এর 'কর্তব্যকর্ম' নাযীর বা সতর্ককারীর ভূমিকাকে একই উদ্দেশ্যে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। ওয়াট স্বীকার করেন, সতর্ক করার কাজের অর্থ হইল, "কোন মানুষকে বিপজ্জনক, ক্ষতিকর বা ভয়ঙ্কর প্রকৃতির কোন কিছু সম্পর্কে পূর্বাহ্নে অবহিত করা যাহাতে ঐ ব্যক্তি ঐসব আশঙ্কার বিরুদ্ধে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে এবং ঐসব আশঙ্কা সম্পর্কে তাহার মনে ভীতি জাগ্রত হয়"। তাওহীদ প্রত্যাখ্যান ও বহু ঈশ্বরবাদে নিমগ্ন হওয়ার ভয়ঙ্কর পরিণতির বিরুদ্ধেই মহানবী ﷺ হুঁশিয়ার করিয়াছিলেন, কেবল আল্লাহ্‌র প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া বা আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব সম্পর্কে উদাসীনতার অপরাধের বিষয়ে নহে। একইভাবে বিচার ও শাস্তির অনিবার্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করার উদ্দেশ্য হইল একত্ববাদের বিষয়টির একই মূল ভাব প্রতিষ্ঠিত করা। তাই ওয়াট যাহাকে কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির বিশিষ্ট দিক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সত্যিকার অর্থে একত্ববাদের মূল ধারণার সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে নিবিড় ও একাত্ম। আল্লাহ্‌র ইবাদতের উপর যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এমনকি উহাকেও ওয়াট আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কর্তব্যের আবশ্যকতা হিসাবে দেখাইয়াছেন। আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়টি তাওহীদের এক ব্যবহারিক প্রদর্শনী মাত্র।

এখানে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, তাওহীদ ধারণার তিনটি দিক আছে। ইহার দুইটি হইল তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যা এবং তাওহীদ আল-উলূহিয়্যা। তাওহীদ আর-রুবূবিয়্যা বা সকল বিষয়ে আল্লাহ্‌কে স্রষ্টা ও পরম প্রভু হিসাবে আল্লাহকে স্বীকার করিয়া লওয়া বিষয়টি আরবদের আবছাভাবে জানা ছিল। আর তাহাদের এই অবগতির কারণ ধারণাটি ইয়াহূদী-খৃস্টীয় ধ্যানধারণা হইতে নহে, যাহা ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন, বরং আরবদের এইসব বিশ্বাসের আদি উৎস ছিল নবী ইবরাহীম (আ)-এর ঐশী বার্তায় যে বার্তায় পরে গলদ ও বিভ্রান্তি মিশিয়াছে। এই বিভ্রান্তি ঘটিয়াছে প্রধানত তাওহীদ আল-উলূহিয়্যাতে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ই একমাত্র উপাস্য—এই ধারণা ও বিশ্বাসে। এই বিষয়টি সমসাময়িক আরব, "বিধর্মী অবিশ্বাসী ও খৃষ্টান" সকলেই বিস্মৃত হয়।

ওয়াট বিষয়ের এই দিকটি উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। আর তাই তিনি এই বিষয়ে অসঙ্গতিপূর্ণ বিবৃতি দিয়াছেন। তিনি প্রথমে বলিয়াছেন, "কুরআনে আল্লাহ্‌তে এক ধরনের অস্পষ্ট বিশ্বাসের কথা বলা হইয়াছে ও পরে ইহাকে অধিকতর যথার্থ করা হইয়াছে" ইত্যাদি।[৫২] আর উহার অল্প পরেই তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "কুরআন প্রচ্ছন্নভাবে নূতন করিয়া যাত্রা শুরু করিলেও বস্তুতপক্ষে হানীফিয়্যা[৫৩] সম্পর্কিত জ্ঞানানুসন্ধানের মত একত্ববাদের আবছা, অস্পষ্ট ও নীহারিকাবৎ প্রবণতাসমূহের কেবল "সংহতি-সমন্বয়ের একটি কেন্দ্র" হিসাবে কাজ করিয়াছে। পরিশেষে তিনি তাহার অধিকতর সাম্প্রতিক রচনায় বলিয়াছেন, "'Muhammad at Mecca' লেখার পর হইতে এই যাবত আমি তৎকালে মক্কায় এমন বহু লোকের অস্তিত্ব সম্পর্কে অধিকতর পরিপূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছি যাহারা আল্লাহ্‌কে সর্বোচ্চ ও শ্রেষ্ঠ দেবতা বলিয়া জানিত এবং

একই সঙ্গে তাহারা ইহাও মনে করিত যে, অন্যান্য দেবতাও তাঁহার সহিত সুপারিশকারী হিসাবে থাকিতে পারে। ফলত আমি এখন এই বিষয়টিকে সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করি"।[৫৪]

কুরআনের যে কোন সতর্ক পাঠকের এই বিষয়টি লইয়া আল-মাস'উদী বা ইব্ন তায়মিয়্যার মত স্বীকৃত মুসলিম বিশারদদের লেখা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকিবার কথা। দীর্ঘকাল হইতেই সেল ও হিট্টির ন্যায় ওয়াটের অনেক পূর্ববর্তী প্রাচ্যবিদ কর্তৃকও এই বিষয়টি স্বীকৃত।[৫৫] যাহা হউক, ওয়াট যে শেষাবধি এই বিষয়ে "পরিপূর্ণভাবে অবগত হইয়াছেন" উহা উত্তম সুনিশ্চয়। কিন্তু তিনি যাহা পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করেন না তাহা হইল, মহানবী ﷺ ঐ সময় তাঁহার নিজ সমাজ ও সমসাময়িক যুগের বাস্তবতা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন। আর তাই তাঁহার জন্য প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য তাঁহার জনসমাজের সাধারণ মানুষ যে ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার মাঝে ছিল সেই ভুল ও ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূর করা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। আর সেই কারণেই যখন কুরায়শদের প্রতি "এই গৃহের প্রভুর উপাসনা"[৫৬] করার আহ্বান জানানো হয় তখন তাহাদিগকে প্রকৃতপক্ষে ঐসব কাল্পনিক দেবদেবীর পূজা-উপাসনা পরিত্যাগ করার জন্য জোর আহ্বান জানানো হয়—যেসব দেবদেবীকে তাহারা 'আলিহা (ইলাহ-এর বহুবচন) অর্থাৎ পূজার আধেয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। ঠিক সেই কারণেই কেবল আল্লাহ্‌র উপাসনার জন্য একেবারে প্রথম হইতেই বিশেষ করিয়া তাগিদ দেওয়া হয় যাহাকে ওয়াট বলিয়াছেন, প্রথম হইতেই মুহাম্মাদের অনুসারী সম্প্রদায়ের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। ইহার কারণ হইল, আল্লাহ্‌র উপাসনা শুরু হইতেই ছিল এবং ওয়াটের মতে ইহা "প্রথম হইতেই মুহাম্মাদের অনুসারী সম্প্রদায়ের অত্যন্ত লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য"। নূতন ধরনের এই উপাসনার ঠিক এই নিহিত তাৎপর্যের জন্যই গোড়া হইতেই "ইহার বিরোধিতা দেখা দেয়"। কেননা একমাত্র ও অদ্বিতীয় ইলাহ হিসাবে আল্লাহ্‌র উপাসনার অর্থ ছিল অন্যান্য কাল্পনিক ইলাহসমূহের প্রকাশ্য ও দ্বিধাহীন বর্জন যে সব ইলাহের ভক্ত ছিল ঐসব দেবদেবীর অভিভাবক যাজক-পুরোহিত। আর এই কারণেও ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের প্রথম ফর্মুলা একেবারে সূচনা পর্ব হইতেই ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নাই), লা রব ইল্লাল-লাহ নহে। আল্লাহ্‌র উলূহিয়্যার স্বীকৃতি সম্ভব করিতে হইলে রুবূবিয়্যাতের স্বীকৃতিও আবশ্যক হয়। কিন্তু ইহার বিপরীতক্রমে অর্থাৎ রুবূবিয়্যার জন্য উলূহিয়্যার স্বীকৃতি নহে।

এমনি করিয়া আমরা অবশেষে আসিয়া উপনীত হই ওয়াটের প্রধান অভিসন্দর্ভের এই মর্মের প্রকল্পে যে, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াত বা বার্তাগুলিতে কেবল "আল্লাহ্‌র প্রতি একটা আবছা বিশ্বাসের কতিপয় দিককে ইতিবাচকভাবে গড়িয়া তোলা হইয়াছিল"[৫৭] এবং এই বার্তাগুলি অন্যথায় হানীফ[৫৮] সম্প্রদায়ের মাঝে আল্লাহ্‌র বিশ্বাস সম্পর্কিত বিশ্বাসের যে আবছা, নীহারিকাবৎ প্রবণতা ছিল সেইগুলির "সংহতির কেন্দ্র হিসাবে" কাজ করে। আল্লাহ্‌র প্রতি এই আবছা বিশ্বাসের অস্তিত্ব এবং হানীফিয়্যা বিশ্বাস অনুসন্ধানের প্রবণতার স্বীকৃতি বাস্তবিকপক্ষে ওয়াটের ধারণা ও অনুমানের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী আপত্তি বিশেষ। কেননা এই পরিস্থিতিতে মহানবী ﷺ যেমন তাঁহার নূতন মিশন শুরু করিতে পারিতেন না, তেমনি ইসলামের গোড়ার দিকে প্রাথমিকভাবে তিনি যে বার্তা প্রচার করিয়াছেন উহা উল্লিখিত আবছা বিশ্বাস ও প্রবণতা

অপেক্ষা লক্ষণীয় ও উন্নততর বলিয়া সহজেই মনে না হইলে উহার প্রতি কেহ কোন রকম কর্ণপাতও করিত না। বিশেষ করিয়া হানীফ সম্প্রদায় ও অন্যান্য ব্যক্তি যাহারা অনুরূপ প্রবণতাসম্পন্ন ছিলেন এবং যাহাদের কিছু লোক মহানবী -এর শিক্ষা গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁহার অনুসারী হইয়াছিলেন তাহারা উহা করিতেন না যদি তাঁহারা তাঁহার বার্তার মাঝে নূতন ও উন্নততর কিছুর সন্ধান না পাইতেন।

এখানে এই আলোকে মনে রাখা আবশ্যক যে, বহু হানীফ প্রকাশ্যেই মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি তুলিয়া উহা পরিত্যাগই করেন নাই; বরং তাহারা ঐসব দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত মাংস ও খাদ্য গ্রহণের অভ্যাসও ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই ধরনের এক ব্যক্তির অন্তত এই বিষয়ে প্রদত্ত বিবৃতি আমাদের হাতে আছে। তাঁহার নাম 'আমর ইবন 'আবাসা (রা) যিনি মহানবী -এর আবির্ভাবের কথা শুনিয়া তাঁহার ইসলামী মিশনের অতি প্রারম্ভে তাঁহার সমীপে আসিয়া তাঁহাকে সরাসরি প্রশ্ন করেন, তাঁহার নবী হওয়া দ্বারা তিনি কি বুঝাইতে চাহিয়াছেন? মহানবী তাঁহার নিকট ব্যাখ্যা করিয়া ইহার জবাবে জানান, আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার শিক্ষা, যেমন আল্লাহ্‌র একত্ব (তাওহীদ) ও তাঁহার সহিত কাহাকেও শরীক না করার শিক্ষা প্রচার করার জন্য নির্বাচিত করিয়াছেন। এই জবাবে 'আমর ইব্‌ন 'আবাসা (রা) মিশনের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস আনয়ন করেন।[৫৯]

ইহা অবশ্যই গুরুত্বের সহিত উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই বিবৃতি বা বয়ান দিলেন এমন এক ব্যক্তি যিনি ঘটনায় সরাসরি জড়িত ব্যক্তিদেরই একজন। আর সেই কারণে তাঁহার পক্ষে তাঁহার এই বিবৃতিতে পরে রং চড়াইবার কোন কারণই নাই। এই কাহিনী হইতে বুঝা যায় আরও অনেকের ক্ষেত্রে কি ঘটিয়াছিল যাহারা হানাফিয়্যার ধারণা ও প্রেরণা কিংবা একত্ববাদী প্রবণতা প্রসারে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। যদি মহানবী যাহাকে আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও ক্ষমতার ধারণা বলা হয়–সেই সব ধারণাকে "ইতিবাচকভাবে" ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়া তোলার প্রচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলনে নিজেকে সীমিত রাখিতেন তাহা হইলে কেহ আর তাঁহার সান্নিধ্যে সমবেত হইত না। আল্লাহ্‌র মহত্ব ও ক্ষমতার কথার সরল ধারণাটি নূতন কিছু ছিল না, ছিল না যেমন বিধর্মীদের কাছে, ছিল না আরও বিশেষ করিয়া "চিন্তাশীল মক্কাবাসিগণ", হানীফ ও তাহাদের মতো আরও সকলের নিকট। ওয়াট তাহার নিজ অদ্ভূত অভিমত উপস্থাপনায় ইহাকে "স্যাটানিক ভার্সেস"-এর বর্ণিত প্রশ্নসাপেক্ষ কাহিনী ও মক্কাবাসীদের মধ্যে ইসলাম বিরোধিতা উন্মেষ সম্পর্কিত তাঁহার নিজ তত্ত্বের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিতে কেবলই পণ্ডশ্রম করিয়াছেন।[৬০] এই প্রশ্নে যাইবার আগে অবশ্য দেখা দরকার মক্কার সমসাময়িক কালে কুরআনের গোড়ার দিকে নাযিলকৃত আয়াত বা বার্তাগুলির যোগসূত্র সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য কি।

তিন ঃ সমসাময়িক অবস্থার সহিত প্রাসঙ্গিকতা

মহানবী সম্পর্কে আধুনিক লেখকদের লেখার শুরুতে কার্যত এমন একজন লেখকও ছিলেন না যিনি কোন না কোন আকারে-প্রকারে মহানবী ও ইসলামের আবির্ভাবের সঙ্গে

তৎকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির যোগসূত্র স্থাপনের প্রয়াস পান নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ফিলিপ কে হিট্টি আরবের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতি পর্যালোচনার পর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, "একজন বিরাট ধর্মীয় ও জাতীয় নেতার উত্থানের জন্য পরিস্থিতির রঙ্গমঞ্চ ছিল প্রস্তুত এবং সেই তাৎপর্যপূর্ণ সময়টিতে ইহার জন্য মনস্তাত্ত্বিক অবস্থাও ছিল একান্ত অনুকূল"।[৬১] আর এই কারণেই ওয়াট মক্কার তৎকালীন পরিস্থিতির সহিত যোগসূত্র বা সম্পর্কের বিষয়ে যে মনোনিবেশ করিয়াছেন তাহা নূতন কোন কিছু ছিল না। অবশ্য হিট্টির এই তুলনায় দুইটি প্রধান বিষয়ে বিশিষ্টতার দাবিদার। (এক) তিনি আর যে কোন লেখক অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্ব ও সঙ্কল্পের সহিত বিশুদ্ধ নিরপেক্ষতাবাদী দৃষ্টিতে ইসলামের আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিবেন না জানাইলেও কার্যত তিনি শুধু উহাই করিয়াছেন। (দুই) তিনি এক বিশেষ ধরনের সমসাময়িক পরিস্থিতির কথা কল্পনা করিয়া উহার পর তিনি ঐ পরিস্থিতির সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য বাস্তব তথ্যাদির বিকৃতি ঘটাইয়াছেন।

এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, একবারে শুরুতেই গোড়ার ও পরের দিকের অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলির সহিত মক্কার তৎকালের অবস্থার অবশ্যই মিল রহিয়াছে। এই সম্পর্ক বিশেষ ও নির্বিশেষ বা সর্বজনীন–উভয়ই। এই সম্পর্ক পরিক্রমায় আরবের ঐ সময়কার বিশেষ সামাজিক ও ধর্মীয় পরিস্থিতির আশু প্রেক্ষাপট বিবেচনা লাভ করিয়াছে। তবে যেখানে বা যখনই কোন ভুল-ভ্রান্তি, পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদ, সামাজিক অবিচার, মানবিক অধিকার ও মূল্যবোধ লঙ্ঘন ঘটিয়া থাকুক কিংবা জীবনের সার্থকতার ধারণার অবলুপ্তি বা জড়জাগতিকতায় একান্ত মগ্নতা–যাহাই ঘটিয়া থাকুক ইহা সমানভাবেই প্রযোজ্য ও সম্পর্কিত। বাস্তবিকপক্ষে কোনও নির্দিষ্ট পরিস্থিতির সহিত কুরআনের কোন বার্তার সম্পর্ক অস্বীকার করা হইবে উহার খোদ উদ্দেশ্য ও আবশ্যকতার অস্বীকৃতি। প্রাসঙ্গিকতা বা যোগসূত্রের এই সুপরিসর পরিমণ্ডলে অবশ্য এই সম্পর্কে কোন নিহিত তাৎপর্য অনুমান বা ধারণা করার ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। প্রাচ্যবিদগণ ঠিক এই রকম যেইসব তাৎপর্য ও ধারণা করিয়াছেন, বিশেষ করিয়া ওয়াটের ধারণা-অনুমানগুলির নিবিড় যাচাই ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন।

ওয়াট এই বিষয়টি তাঁহার রচনার ৩য় অধ্যায়ের ৩য় ও ৪র্থ ভাগে এবং বিশেষ করিয়া ৩য় ভাগে আলোচনা করিয়াছেন।[৬২] তিনি কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলিকে "নিরাময় বা প্রতিকার" হইতে স্বতন্ত্র "সমসাময়িক পরিস্থিতির অসুস্থতার কারণ নির্ণয়" বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আর উহার পর তিনি তাঁহার রচনার 'সামাজিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় বিষয়' এই শিরনামের আওতায় চার উপভাগে "যুগপৎ রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ে" প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এইসব উপভাগের কেন্দ্রীয় মূল ভাব হইল তাহার এই অনুমান যে, মক্কার বাণিজ্যিক জীবন ব্যক্তিবাদের প্রসার ঘটায় এবং উহার ফলে "সমাজ সংহতি দুর্বল" হইয়া পড়ে। অনুরূপভাবে তাহার এইসব উপভাগে এই সাধারণ রায় দেওয়া হইয়াছে যে, কুরআনের শিক্ষাগুলি এই পরিস্থিতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ করিয়া লওয়া হয় এবং এই শিক্ষাগুলি প্রধানত প্রাক-ইসলামী আরবের বেদুঈন মূল্যবোধ ও ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলা হইয়াছিল।

ওয়াট তাহার রচনার প্রথম উপভাগে সামাজিক পরিস্থিতি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। তিনি উল্লেখ করিয়াছেন, সমসাময়িক কালে বিপুল বিত্ত সঞ্চয়েই অনেক মক্কাবাসী ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল যাহা তাহার বক্তব্য অনুসারে ছিল ব্যক্তিবাদ বিকাশের অন্যতম লক্ষণ। কুরআনে দেখানো হইয়াছে, "তৎকালে ইয়াতীমদের প্রতি দৃশ্যত তাহাদের অভিভাবক আত্মীয়বর্গ দুর্ব্যবহার করিত"। এইসব কারণে মক্কার ধনী ও দরিদ্র্যের মধ্যে কিংবা বলা যায়, "ধনী, প্রায় বিত্তবান ও দরিদ্র্যদের" মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া যায় এবং সামাজিক সংহতি দুর্বল হইয়া পড়ে, গোত্র ও পারিবারিক সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত যে সমষ্টি ও নিরাপত্তাবোধের ধারণা ছিল সেই ধারণা লুপ্ত হয়।[৬৩]

এমনিভাবে সামাজিক অসুস্থতাগুলিকে শনাক্ত করিয়া ওয়াট তিনভাবে এই পরিস্থিতির সহিত কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলির সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন। সামাজিক সংহতির প্রশ্নে তিনি বলিয়াছেন, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলি এই পরিস্থিতিজনিত সমস্যাবলীর বিষয়ে এক রকমের প্রাক-হুঁশিয়ারির চেয়ে বেশি কিছু নহে যাহাতে ধর্মে সমাজ সংহতির একটা নূতন ভিত্তি পাওয়া যাইতে পারে।[৬৪] আর বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের মধ্যে যে ব্যবধানের কথা বলা হইয়াছে, সেই সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, বদান্যতার ভিত্তিতে মানুষকে সমাজের অছি (৭০:২৪) হিসাবে আংশিক আস্থা স্থাপন করিয়া তাহাকে সম্পদের মালিক করা হয় যাহার ফলে সমস্যার কিছুটা লাঘব হইতে পারে। ব্যক্তিবাদ সম্পর্কে ওয়াট বলেন, "পুরাতন গোত্রীয় সংহতিতে ফিরিবার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না, বরং ব্যক্তি হিসাবে মানুষের তাহার নিজ সম্পর্কে চেতনাই কায়েমি হইয়া বসে"। তাই কুরআন শেষ বিচারের ধারণায় এই বাস্তবতা স্বীকার করিয়া লইয়াছে যে, রোজ হাশরের বিচার মূলত ব্যক্তি ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইবে।[৬৫]

ওয়াট এইখানে ও তাহার ৩য় অধ্যায়ের অবশিষ্ট অংশে যাহা বলেন তাহাও কার্যত ইসলামের অভ্যুদয় সম্পর্কে তাহার অর্থনৈতিক ব্যাখ্যারই আরেকটি দিকমাত্র। বস্তুতপক্ষে ওয়াট ইহার একটু পরেই পরিষ্কার উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা হইল "ইসলামের অভ্যুদয় কোন না কোনভাবে একটি বেদুঈন/যাযাবর অর্থনীতি হইতে বাণিজ্যপ্রধান অর্থনীতিতে উত্তরণের সহিত সম্পর্কিত"।[৬৬] এই বর্ণনা ও বক্তব্যে সাধারণভাবে ওয়াট হয় পরিস্থিতির অতি সরলায়ন অথবা অতিরঞ্জন ঘটাইয়াছেন। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে ও ইহার অর্ধ শতক বা তাহারও বেশি কাল আগে মক্কার অর্থনীতির বেদুঈন অর্থনীতি হইতে বাণিজ্য ভিত্তিক অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটিয়াছিল বরং মক্কার ইতিহাসের একান্ত সূচনালগ্ন হইতেই এবং বস্তুতপক্ষে মক্কার কুরায়শদের বসতি স্থাপনের সময় হইতেই মক্কার অর্থনীতি তেজি বা মন্দা যাহাই হউক, সওদাগরি অর্থনীতি বলিয়াই লক্ষ্য করা যায়। ইহার পূর্ববর্তী শতকগুলির কালপরিক্রমায় কুরায়শগণ একটি সওদাগর সম্প্রদায় হিসাবেই অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে কিংবা সমৃদ্ধও হইয়া উঠিয়াছে। আর তাই ইসলামের অভ্যুদয়ের সহিত যুগপৎ মক্কার অর্থনীতির বেদুঈন/যাযাবর অর্থনীতি হইতে বাণিজ্য অর্থনীতিতে উত্তরণ ঘটে বা ইসলামের অভ্যুদয়ের কারণই ইহা ঘটে—এই উক্তি নিদারুণ বিভ্রান্তিকর বা ভ্রান্ত উক্তি ছাড়া কিছু নহে।

এইসব মৌলিক ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া ওয়াট আরও তিনটি ধারণা ব্যক্ত করিয়াছেন। (১) তিনি বলেন, ধনসম্পদ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হইবার ফলে "বিত্তবান, প্রায় বিত্তবান ও গরীবের" মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়া যায়; (২) সম্পদের এই কেন্দ্রীভবন হইল ব্যক্তিতান্ত্রিকতার বিকাশ লাভের কারণ ও ফল; এবং (৩) এইসব কারণ ও ফল অর্থাৎ কিছু ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত হওয়া ও ব্যক্তিতান্ত্রিকতার বিকাশ সামাজিক সংহতিকে দুর্বল করিয়া তোলে যাহা গোত্র ও পারিবারিক সম্পর্ক হইতে উদ্ভূত হয়। ওয়াটের এই সকল ধারণাই প্রধানত ভ্রান্ত।

প্রথম অনুমানের আলোকে দেখা যায় যে, ইসলামের আবির্ভাবকালে মক্কাতে ব্যবসায়িক কর্মতৎপরতা বাড়িয়া যায় এবং ইহার ফলে কিছু ব্যক্তির হাতে অস্বাভাবিক পরিমাণ ধনসম্পদ সঞ্চিত হইতে থাকে। খুব সাম্প্রতিক কালের একজন লেখক তথ্যপ্রমাণসহ দেখাইয়াছেন যে, এই মতামত গ্রহণযোগ্য নহে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, 'বিশ্বস্ততার ব্যাপারে অনির্ভরযোগ্য' লেখক হেনরী ল্যামেন্‌স-এর সিদ্ধান্ত নির্বিচারে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহার দায় সারিয়াছেন।[৬৭] মক্কায় বেশ কিছু ধনী ও তথাকথিত গোত্রনেতা ছিলেন যাহারা আর যাহাই হউক সাম্প্রতিক কালে হঠাৎ করিয়া গজাইয়া উঠা কেহ বা কাহারা নহেন। ওয়াট স্বীকার করিয়াছেন যে, মক্কার ইতিহাসের একান্ত সূচনা হইতেই বিভিন্ন গোত্র ও গোত্রনেতার মধ্যে সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির হাত বদল চলিয়া আসিতেছিল। যেহেতু এই ধারা কোন নূতন ঘটনা নহে বা হঠাৎ করিয়া উদ্ভব হয় নাই সেইহেতু এই ধারণা ভুল যে, বিত্তের কারণে "ধনী, খুব ধনী নয় ও গরীবের" মধ্যে ব্যবধান বাড়িয়াছে।

মূলত সর্বশেষ ধারণা অর্থাৎ ধনী, খুব ধনী নয় ও গরীবের" ধারণাটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। ওয়াটের এই ধারণা বরং প্রতারণামূলক বলিয়াই প্রতীয়মান হয় যখন আমরা বলি, "ধনী, খুব ধনী নয় ও গরীব"। কেননা ইহা স্পষ্ট যে, এইসব আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্যের ভেদরেখা যেমন ব্যাপক নয় তেমনি অসাধারণ রকমে দৃষ্টিগোচরও নহে। ওয়াটের পেশকৃত এই অভিমত দুইটি পরস্পর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক উদ্ভট রফা বলিয়াই মনে হয়। ইসলামের উত্থানের এক ধরনের ছদ্ম আর্থ-সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। অথচ সেই তিনিই আবার সেইসব ব্যক্তিদের সহিত একমত পোষণ করেন নাই যাহারা বলিতে চাহিয়াছেন যে ইসলাম হইতেছে এক ধরনের সমাজতান্ত্রিক সংস্কার আন্দোলন। তাহার এই ব্যাখ্যায় ইহাও প্রমাণিত যে, তাহার ধারণা এবং প্রকৃত ঘটনার মধ্যে গরমিল সম্পর্কেও তিনি সচেতন। যেমন পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, যাহারা প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণ করেন তাহাদের সকলেই কার্যত 'ধনী' ও 'খুব ধনী নহে'- এমন শ্রেণীর লোক, তাহারা 'গরীব' শ্রেণীর লোক নহেন। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, উল্লিখিত শ্রেণীগুলির প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর মাঝে ব্যবধানের প্রকৃতি যাহাই হউক না কেন যাহারা ইসলামের আদি পর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারা এই ধরনের আর্থ-সামাজিক কারণে[৬৮] এই ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। কুরআনে দানশীলতার পক্ষে যে বলিষ্ঠ আবেদন রহিয়াছে উহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য "ধনী, খুব ধনী নয় ও গরীবের" মধ্যে ব্যবধান দূর করা –এই ধারণাও গুরুত্ব লাভের দাবিদার নহে।

একইভাবে ওয়াটের মতবাদে মক্কায় ব্যক্তিবাদের অনুমতি প্রসার সম্পর্কে যে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং যাহাকে মক্কায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের যুগপৎ কারণ ও ফল বলা হইয়াছে তাহাও বিভ্রান্তিকর। গোত্র ও কওম কাঠামোর মধ্যে বেশ ভালো মাত্রায় ব্যক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অস্তিত্ব স্মরণাতীত কাল হইতেই বিদ্যমান ছিল। কথিত কালপরিক্রমায় মক্কাবাসীরা ধন-সম্পদের মালিকানা ও ধনসম্পত্তি কাহাকেও প্রদান করা এবং ব্যবসা-বাণিজ্য বা পেশা নির্বাচনেও স্বাধীনতা ভোগ করিয়াছে। ওয়াট নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, বেদুঈন আরব সমাজে গোত্র মর্যাদার অভিব্যক্তি ছিল মুরুআতের আদর্শ। আর এই আদর্শ বলিতে সাধারণত গোত্রের একজন সদস্যের ইজ্জত বা সম্মানকে বুঝাইত। ইহা ছাড়াও মানুষের শক্তি ও ক্ষমতার প্রতিও 'বেদুঈন' সমাজ অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিল।[৬৯] অতীতের মত ইসলামের উত্থান পর্বেও রক্তের আত্মীয়তা যেমন উপেক্ষণীয় ছিল না, বিকল্পও ছিল না, বরং কোন ব্যক্তির স্বার্থে যদি তিনি যথেষ্ট ক্ষমতাবান হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাধারণত তাহার গোত্র তাহার স্বার্থকে নিজেদের স্বার্থ হিসাবে বিবেচনা করিত। আল-'আস ইবনে ওয়াইল-এর সমর্থনে যাহারা হিলফুল ফুযূল-এ যোগ দেয় নাই তাহাদের বিষয়টিকে এই ক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাইতে পারে। তবে ইহার বাহিরে মক্কার জনসমাজের উত্থানকালে ব্যক্তিবাদের অধিকতর বিকাশ দৃষ্টিগোচর নহে।

কুরআন প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ্র নিকট জবাবদিহি হইবার জন্য গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। কুরআন ইহা করিয়া থাকে এই কারণে নহে যে, "ব্যক্তি হিসাবে মানুষের নিজ সম্পর্কে চেতনাবোধ স্থায়ী এবং সেই কারণেই বিষয়টিকে বিবেচনায় গ্রহণ করিতে হইবে" কিংবা এই কারণেও নহে যে, "পুরাতন গোত্র সংহতি ফিরিয়া আসিবার কোন সম্ভাবনাই নাই" যাহা ওয়াট আমাদের বিশ্বাস করাইতে চাহিয়াছেন।[৭০] আসলে ইহা ঘটে বিপরীত কারণে। কারণটি হইল মানুষ আল্লাহ্র প্রতি তাহার নিজ ও ব্যক্তিগত জবাবদিহিতার বিষয় বিস্মৃত হয় এবং এই প্রচলিত ধারণা প্রধান্য বিস্তার করে যে, কোন ব্যক্তি কোন একটি বিশেষ নরগোষ্ঠী বা গোত্রভুক্ত হওয়ার কারণে ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট বিশেষ বিবেচনা লাভের অধিকারী হইবেন কিংবা তাহার পাপ অন্য কেহ মোচন করিবেন কিংবা প্রভাবশালী সমাজনেতারা তাহার পক্ষে রহিয়াছেন বিধায় তাহার দেবতা ও অর্ধদেবতারা আল্লাহ সমীপে তাহার পক্ষে ওকালতি বা সুপারিশ করিবে।

উল্লিখিত এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের জন্যই কুরআন প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের নীতি মানিয়া চলিবার বিষয়ে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকে। নবী ও রাসূলগণও এই নিয়মের বাহিরে নহেন। এই কারণেই কুরআন এ যাবত অনুসৃত ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া মানবীয় বিষয়ে সত্যিকারের ব্যক্তিবাদের প্রবর্তন করিয়াছে এবং গোত্রের কোন সদস্যের স্বার্থরক্ষায় কেহ যদি তাহার কৃতকর্মের ভালমন্দ বিচার নির্বিশেষে কোন কার্যব্যবস্থা গ্রহণকে সম্মানের কাজ মনে করিয়া থাকে তবে তেমন গোত্রীয় ভাবনার মূলে কুঠারাঘাত হানিয়াছে খোদ ইসলাম। নিরাময় বা প্রতিকারের মধ্য হইতে অসুস্থতা বা গলদ বাহির করার প্রয়াসে ওয়াট একান্ত বিপরীত ধারায় বিন্যস্ত বক্তব্য দিয়াই দায় সারিয়াছেন।

এমনকি এই ধারণাও আদৌ যথার্থ নহে যে, মক্কার জনসমাজে ব্যক্তিবাদের অনুমিত বিকাশ গোত্র ও কওম সংহতিকে এমন পর্যায়ে ক্ষুণ্ন করিয়াছিল যাহার পরিণামে "গোত্রীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক হইতে যে নিরাপত্তার" ধারণা জন্মিয়া থাকে সেই ধারণার বিলুপ্তি ঘটিয়াছিল। অথচ বাস্তবতা আদৌ এমন ছিল না। বরাবরের মতই ইসলামের উত্থানের প্রাক্কালেও গোত্র ও পারিবারিক সংহতিবোধ দৃঢ় ও কার্যকর ছিল। হিজরতের পূর্ববর্তী গোটা কাল-পরিক্রমায় গোত্র সংহতির ঐতিহাসিক ব্যবস্থার আওতায় খোদ মহানবী ﷺ-এর নিরাপত্তা রক্ষিত হইয়াছিল। যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারা সামাজিক সংহতির একটি বিকল্প ধারা অন্বেষণের ইচ্ছা হইতেই এই ধর্ম গ্রহণ করেন বলিয়া প্রমাণ নাই। যখন আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম কাফেলার সদস্যগণ মক্কায়[৭১] ফিরিয়া আসেন তাহাদের প্রত্যেকে মক্কায় প্রবেশের আগে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও হেফাজতের সনাতন ব্যবস্থার শরণ গ্রহণ করেন এবং উহা নিশ্চিত করেন। ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে গোত্রীয় ও কওমী সংহতির ধারণা লোপ পায় বলিয়া যে অনুমান ওয়াট করিয়াছেন তাহা যে তাহার অসার কল্পনামাত্র তাহা ফাঁস হইয়া পড়ে যখন তিনি এই মর্মে উক্তি করেন, "গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলি উল্লিখিত অবস্থার তথা ধর্মে সামাজিক নিরাপত্তার একটা নূতন বুনিয়াদ পাওয়ার প্রত্যাশায়" সত্যিকারের প্রতিকারের নিমিত্ত বড়জোর প্রাক-হুঁশিয়ারি মাত্র, উহার বেশি কিছু নহে।[৭২]

বলা বাহুল্য, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলিতে এমনকি কথিত "নিরাময়ের বা প্রতিকারের কোন প্রাক হুঁশিয়ারি" পর্যন্ত নাই। ইহার কারণ, ওয়াট যে যে ব্যাধি বা সমস্যার বিষয় কল্পনা করিয়াছেন তাহার কোন অস্তিত্বই ছিল না। ইসলাম অবশ্য চূড়ান্ত পর্যায়ে সামাজিক সংহতির একটি নূতন বুনিয়াদ দিয়াছে ঠিকই তবে তাহা ঘটিয়াছে পরবর্তী কালে। আর যখন ইহা করা হয় তখন উহার কারণ সামাজিক নিরাপত্তার সনাতন ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়া বরং ইসলামের সাফল্যের মুখে কোন নূতন পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়াতেই উহা ঘটে। আর পূর্ববর্তী বিস্ময়ের ব্যাপারে বলা যায়, এখানেও ওয়াটকে মনে হয় তিনি তাহার "নিরাময় বা প্রতিকার" হইতে ব্যাধি বা সমস্যা বাহির করার নীতির প্রলোভনের জটাজুটে হারাইয়া গিয়াছেন এবং এখানেও তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য দিয়া উহাকে বাস্তব তথ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন।

ওয়াট তাহার আলোচনার দ্বিতীয় উপভাগে মক্কার নৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করিয়াছেন এবং মক্কায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভাব সম্পর্কিত তাহার একই ধারণার উপর কমবেশি গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তবে ইহা উহা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে। এখানে তিনি বলিয়াছেন, পুরাতন বেদুঈন মুরুওয়াহ বিশেষত ইহার "দুর্বলকে রক্ষা ও সবলকে প্রতিরোধ"-এর বৈশিষ্ট্যটি মক্কায় নীরবে পরিত্যক্ত হয় এই কারণে যে, "বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনে সাফল্যের সহিত দুর্বলকে অবেহলা করার ও ক্ষমতাবানদের সহিত সখ্যতা চর্চার" একটা সম্পর্ক রহিয়াছে। ইহার আরও একটি কারণ এই যে, অর্থ সংস্থান ব্যবসায়ে নিয়োজিত ব্যক্তিরা "তাহাদের বিত্ত সর্বদাই বাড়াইবার

প্রচেষ্টায়" নিয়োজিত থাকে। জনমতে মুরুওয়াতের উল্লিখিত আদর্শের অনুমোদন ইসলামের আবির্ভাবের কালেও বহাল ছিল, তবে "মক্কায় বিপুল বিত্ত গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে মক্কায় জনমত উহার গুরুত্ব বহুলাংশে হারায়। ইহার পাশাপাশি মক্কার নগর জনপদে মরু অঞ্চলের মতই দানশীলতা ও বদান্যতার প্রয়োজন আগের মতই গুরুত্বপূর্ণ থাকিয়া যায়।"[৭৩]

ওয়াট ইহার পর যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আরব বেদুঈনরা বদান্যতাকে সব সময়ই পূণ্যকর্ম জ্ঞানে উহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে। আর এই ধরনের কাজের প্রতি জোর দিয়া কুরআন আরব আদর্শের এই বিশেষ দিকটি তুলিয়া ধরে। এইভাবে কুরআন এইসব দানশীলতামূলক কাজের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করিয়া পুরাতন এক আরব আদর্শের পুনরুজ্জীবনই করে নাই, বরং ইহার জন্য একটি নূতন বিধান প্রদান করিয়াছে যাহাকে "পরকালের শাস্তি ও পুরস্কার" হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলি "এক নূতন নৈতিকতা সৃষ্টির একটি উপায় বা উৎস প্রদান করিয়াছে যাহা হইল আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট আদেশ ও মহানবী ﷺ যাহার মাধ্যমে এই সব আয়াত বা ঐশী আদেশ নাযিল হয়। আল্লাহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট এই নৈতিক আদর্শ বস্তুত অতিরিক্ত বিধান"।[৭৪]

মক্কার ধনী ও অহঙ্কারী গোত্রনেতাদের এই আদর্শ পরিত্যাগ সম্পর্কে ওয়াট যাহা বলেন সম্ভবত তাহা সত্য। তবে তাহার এই বক্তব্য মক্কার তৎকালীন সংখ্যাগরিষ্ঠের বেলায় গড়পড়তা আরোপের বিষয়টি নিঃসন্দেহে যথার্থ নহে। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, "পরলোকে পুরস্কার ও শাস্তির ঐশী বিধান", "প্রত্যাদিষ্ট ঐশী আদেশ ও মহানবী যাহার মাধ্যমে ঐশী আদেশ প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছে" তাঁহার মাঝে কুরআন এই পুরাতন আদর্শের বিকল্প এক "নৈতিকতা" ও "বিধান" দিয়াছে–একথা বলিয়া ওয়াট মূল বিষয়টি ধরিয়াছেন ঠিকই কিন্তু তিনি তাহা খোলাখুলি স্বীকার করেন নাই। "ধর্মীয় পুরস্কার ও শাস্তি" এবং আল্লাহ্‌র আদেশ অলঙ্ঘনীয় "বিধান" হইতে পারে যদি অন্য সকল শক্তি ও সত্তার উপর তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য এবং সেই সঙ্গে রাসূলের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিজেকে প্রকাশের কথা প্রথমত স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। আর সরলার্থে ইহাই হইল তাওহীদ ও রিসালাতের নিখুঁত স্বীকৃতি যাহা স্বাভাবিক কারণেই আল্লাহ্‌র অন্য সকল আয়াতের সূচনা। ওয়াট যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা এই বাস্তবতার প্রতি দিকনির্দেশ করিলেও তিনি তাহার সরল স্বীকারোক্তি দেন নাই, বরং তিনি আমাদের ইহাই বিশ্বাস করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন যে, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলিতে মৌলিক বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই।

অনুরূপভাবে ওয়াট মক্কার জনসমাজের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতি সম্পর্কে যেসব ব্যাখ্যা দিয়াছেন ও অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে এই কথাই বলিতে হয়, তিনি গাছে চড়িয়া গোটা বনভূমি দেখিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মক্কাবাসীরা তাহাদের বিত্ত-সম্পদ ও সমৃদ্ধির কারণে "মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে বিরাট ধারণা গড়িয়া তোলে এবং মানুষ যে সৃষ্ট জীবমাত্র সে কথা ভুলিয়া যায়"। ওয়াট বলিয়াছেন, যাযাবর ও গরীব বেদুঈনরা মানুষের ক্ষমতা সম্পর্কে উচ্চ

ধারণা পোষণ করিত; তবে তাহাদের এই ধারণা বা বিশ্বাস কিছুটা নমনীয় হইয়া উঠে নিয়তির ব্যাপারে তাহাদের বিশ্বাসের কারণে। ওয়াটের মতে বেদুঈনরা বিশ্বাস করিত যে, নিয়তি বা ভবিতব্য তাহাদের অস্তিত্ব রক্ষা, তাহাদের মৃত্যু, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা দুঃখ-কষ্ট বা সন্তান-ছেলে বা মেয়ে জন্মিবার বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে।[৭৫] ওয়াট তাহার এই বক্তব্যের কলেবর আরও কিছুটা সম্প্রসারিত করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলি এইসব বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যাগুলির মোকাবিলা করিয়াছে ঐশী এখতিয়ার হিসাবে এগুলিকে বর্ণনা করিয়া যাহা ইসলামে অবিশ্বাসীদের মতে নিয়তি বা কালের বিষয়। আল্লাহ্‌র শক্তি, ক্ষমতা ও মহত্ত্বের প্রকাশ দেখানো হইয়াছে উদ্ভিদের (ফসল) বাড়িয়া উঠার মাঝে। আর নিখুঁতভাবে ইহাই হইল রুজি বা ভরণপোষণ তথা অস্তিত্ব রক্ষার অবলম্বন। মানুষকে সৃষ্টির ব্যাপারে স্রষ্টার ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে তাহার স্ত্রী-পুরুষ পরিচায়ক লিঙ্গ নির্ধারণ যদিও এই বিষয়টির কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই। আল্লাহ্‌ই মানুষের মৃত্যু ঘটান এবং তিনিই শেষ বিচার বা রোজ হাশরের দিন মানুষের চূড়ান্ত সুখশান্তি বা কষ্টনিগ্রহ নির্ধারণ করিবেন।[৭৬]

মক্কাবাসীর বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বলিয়া যাহাকে শনাক্ত করা হইয়াছে তাহা সম্ভবত মাত্র মুষ্টিমেয় কিছু বিত্তবান মক্কাবাসীর দৃষ্টিভঙ্গি। নিয়তি ও চারটি বিশেষ বিষয় যেগুলিকে নিয়তির সহিত অভিন্ন বলিয়া শনাক্ত করা হইয়া থাকে সেইসব বিষয়ে সাধারণ মক্কাবাসী ও বেদুঈন যাযাবর জনগোষ্ঠীর মতামতও অভিন্ন ছিল। শুধু তাহাই নহে, মক্কার অনেক ধনী ব্যক্তিও এইসব বিষয়েও নিয়তির প্রশ্নে তাহাদের পূর্ববিশ্বাস আদৌ পরিত্যাগ করে নাই। সর্বোপরি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, মক্কার ধনী, খুব ধনী নয় বা বেদুঈন কেহই উক্ত চারটি বিষয়ের কারণে অশুভকে দূরে রাখিতে বা কৃপালাভের উদ্দেশ্যে বহু দেবদবীর উপাসনায় বিরত হয় নাই। আর এইসব কারণেই যদি ওয়াটের বক্তব্য অনুযায়ী কুরআন উক্ত বিষয়গুলিকে আল্লাহ্‌র এখতিয়ারের আওতায় আনিয়া থাকেন তাহা হইলে যৌক্তিক ও স্পষ্ট কারণেই বলিতে হয় যে, কুরআন এই ক্ষেত্রে একান্তভাবেই ঐসব বিশেষ এখতিয়ারে আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব ও ক্ষমতা ঘোষণা করিয়াছে মাত্র এবং একই সঙ্গে আরব, বেদুঈন ও নগরবাসিগণ সকলে একই উদ্দেশ্যে উপাসনা করিত, তাহাদের আনুকূল্য লাভের চেষ্টা করিত সেইসব দেবদেবীর অক্ষমতা ও অকার্যকারিতার বাস্তবতাকেই স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছে। অন্য কথায় পৃথিবীতে কুরআনের গোড়ার দিকের আয়াতগুলি নাযিল হইয়াছিল তাওহীদ তত্ত্বের একটি দিককে তুলিয়া ধরিবার ও প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মাত্র।

ওয়াট তাহার রচনার চতুর্থ উপভাগে মক্কার ধর্ম পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনায় এই মৌলিক বাস্তবতাটি উপেক্ষা করার বা পাশ কাটাইয়া যাইতে দৃঢ়সংকল্প বলিয়াই মনে হয়। ওয়াট তাহার আলোচনার চতুর্থ উপভাগে যথেষ্ট সতর্কতার সাথে মক্কাবাসীর দেবদেবীর পূজা-অর্চনার বিষয়ের কোন উল্লেখ এড়াইয়া গিয়াছেন। তাহার আলোচনায় মনে হইয়াছে, মক্কাবাসীদের এই দেবদেবীর উপাসনার অস্তিত্ব আদৌ যেন ছিল না কিংবা এই পরিস্থিতি এমন তাৎপর্যহীন পর্যায়ে হ্রাস পাইয়াছিল যে, তিনি উহাকে আদৌ কোন ধর্মীয় পরিস্থিতি হিসাবে বিবেচ্য মনে করেন নাই।

বিষয়টি এই কারণেই আরও বিস্ময়কর যে, তাহার লেখায় অল্প পরেই আমরা লক্ষ্য করিতেছি, তিনি আমাদিগকে ইহা বিশ্বাস করাইতে চাহিতেছেন যে, মক্কার নেতাদের স্বার্থপরতা ও তাহাদের মধ্যে বদান্যতার অভাবের বিরুদ্ধে মহানবী ﷺ কর্তৃক নিন্দা ও প্রতিবাদের কারণেই মক্কায় তাঁহার বিরোধিতা দেখা দেয় নাই, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে বৈরিতা সৃষ্টি হয় মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে তাঁহার নিন্দায়। মক্কার ধর্মীয় পরিস্থিতি সম্পর্কিত গোটা আলোচায় দেবদেবীর একমাত্র পরোক্ষ উল্লেখ হইল সম্ভবত মক্কাবাসীরা বদান্যতাসুলভ কাজকে স্বীকৃতি দিয়াছিল যাহা মুরুওয়াতের আদর্শের সহিতও সঙ্গতিপূর্ণ। মক্কাবাসীদের বদান্যতাসুলভ কাজের ধারণাটি ছিল ত্যাগ বা উৎসর্গ ধরনের একটা কিছুর "ঠিক যাহা তাহাদের পূর্বপুরুষগণ দেবদেবীর পূজা ও তাহাদের আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়ার অনুরূপ"।[৭৭]

ওয়াট তাহার ভোল এমন করিয়া পাল্টাইলেন সে বিষয়ে কোন প্রশ্ন তুলিবার আবশ্যকতা আমাদের নাই। কেননা তাহার আলোচনার এই পর্যায়ের সামান্য আগেই আভাস দিয়াছেন যে, বদান্যতা বা দানশীলতার আদর্শের বিষয়টি হইতে বিত্তবান মক্কাবাসীদের দৃষ্টি হয় সরিয়া যায় কিংবা উহা তাহাদের নূতন দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সম্পর্কহীন হইয়া পড়ে। তাহা যাহা হউক কিন্তু এইভাবে ওয়াট দেবদেবী ও এইগুলির পূজা-অর্চনাকে নেপথ্যে ঠেলিয়া দিয়া বলিয়াছেন যে, প্রাক-ইসলামী মক্কার ধর্ম "মানুষ যাহা অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে" এবং যাহাতে "তাহারা জীবন ও মর্যাদার অর্থ খুঁজিয়া পায়" সেইসবের সহিত সম্পর্কিত ছিল। অবশ্য তাহার মতে যদিও "পুরাতন বেদুঈন ধর্ম ইজ্জত ও সম্মানের" এবং "গোত্র রক্ষার মাঝে জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইত সেই ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমবর্ধমান ব্যক্তিবাদের প্রসারে মক্কায় বিপর্যস্ত হয়"। তিনি বলেন, মক্কায় সম্পদ ও বিত্তের "অতি প্রাধান্য" ইজ্জত ও মর্যাদার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু ইহা "ছিল এক নূতন আদর্শ ও ধর্ম যাহা সামান্য সংখ্যক লোকের বড়জোর এক বা দুই পুরুষের চাহিদা মিটাইতে হয়তো বা পারে কিন্তু দীর্ঘকাল পরিসরে এক বিশাল জনসম্প্রদায়ের প্রয়োজন মিটাইতে পারিবে এমন মনে হয় না"। কেননা লোকে অচিরেই দেখিবে, জীবনের আরও অনেক কিছুই রহিয়াছে যাহা আর যাহাই হউক অর্থবিত্ত ক্রয় করিতে অক্ষম। ওয়াটের চূড়ান্ত রায় হইল, বিত্তভিত্তিক "এই ধর্মের অপর্যাপ্ততার কারণে সৃষ্ট উত্তেজনা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেন যাহাদের কিছু বিত্ত রহিয়াছে অথচ খুবই বিত্তবান নহে এমন লোকেরা"। কেননা তাহাদেরই "অর্থের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা" লইয়া ভাবিবার মত অবসর ও সামর্থ্য রহিয়াছে।[৭৮]

উল্লিখিত শেষ বাক্যটির মাঝেই মক্কার 'বিত্তবান ও বিত্তহীনদের মধ্যে" সংগ্রাম তত্ত্বের একটি পূর্বাভাস রহিয়াছে। এই তত্ত্বের তিনি অতঃপর বিশদ অবতারণা করিয়াছেন যাহা ইতোমধ্যে পাঠকদের দৃষ্টিগোচরও হইয়াছে। এখানে মনে রাখা দরকার, ওয়াট মক্কার ধর্মীয় পরিস্থিতির যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহা বিভ্রান্তিকর যদি নাও হয় উহা অতি মাত্রায় বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তিনি মক্কার তৎকালীন ধর্মীয় পরিস্থিতির সবচেয়ে অবশ্যম্ভাবী দিক, যেমন বহু ঈশ্বরবাদ ও মূর্তিপূজার বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াছেন। বলা দরকার, মক্কার অভিজাত শ্রেণী

ও যাজক-পুরোহিত শ্রেণী ছিল ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ওয়াটের "বিত্তবৈভব ধর্মতন্ত্রের" বিষয় সব রকমের ছাড় দেওয়ার পরও ইহা বলা চলে না যে, মক্কাবাসীরা, এমনকি খুব ধনী ব্যক্তিরাও নাস্তিক ও সর্বাত্মক অর্থে নিরীশ্বরবাদী জড়বাদীতে পর্যবসিত হইয়াছিল। এমনকি, তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে সমৃদ্ধি এবং তাহাদের মাঝে অনুমিত নব্য ব্যক্তিবাদের প্রসারের কারণেও তাহাদের গোত্রীয় মান-মর্যাদা ও সামাজিক সংহতি ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা ও বিশ্বাস লোপ পায় নাই। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের দেবদেবীকে বিসর্জন দেয় নাই। এখানে ওয়াট যাহা বলিতে চাহিয়াছেন তাহা আদতে ওয়াট মক্কাব সামাজিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে ইতোপূর্বে যে বক্তব্য দিয়াছেন উহারই পুনরুক্তি মাত্র। আর এই পুনরাবৃত্তি করিতে গিয়া ওয়াটকে দেখা যায় নানাভাবে ও আকারে-ইঙ্গিতে মক্কার সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক পরিস্থিতি, বিশেষ করিয়া মহানুভব দানশীলতা ও গোত্রীয় ইজ্জত এবং ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে এক করিয়া দেখিয়াছেন। ওয়াট পুনরুক্তি করিয়া বলিয়াছেন, গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলিতে মানুষ সৃষ্টজীব—এই কথা গুরুত্ব সহকারে বারবার উল্লেখ করা হইয়াছে। কুরআন মানুষকে জানাইয়া দিয়াছে, আল্লাহ্ তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও সুখী জীবনের জন্য যাহা প্রয়োজন সবকিছুই দিয়াছেন, তাঁহার নিকটই মানুষকে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাই কুরআন মানুষকে উদাত্ত আহ্বান জানাইয়াছে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে, তাঁহার উপাসনা করিতে ও মহানুভব হইতে। সামগ্রিকভাবে "গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলিতে মূলত আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ক্ষমতা (স্রষ্টা ও বিচারক হিসাবে) সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে এবং মানুষের প্রতি আহ্বান জানানো হইয়াছে আল্লাহ্র প্রতি তাহার নির্ভরশীলতা স্বীকারের বিষয় অভিব্যক্ত করিতে"।[৭৯]

হাঁ, আদিপর্বে নাযিলকৃত কুরআনের আয়াতগুলিতে এইসবই করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন হইল, "আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ক্ষমতার" বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা ও "আল্লাহ্র প্রতি মানুষকে তাঁহার উপর নির্ভরশীলতার স্বীকৃতি" ও এই বিষয়ক অভিব্যক্তি কেমন করিয়া সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্র পরম একত্বের (তাওহীদ) নীতির শিক্ষা আলাদা হইতে পারে? আর প্রসঙ্গ হইতে কেবল দেবদেবীর উল্লেখ বাদ দিয়াও অবস্থার লেশমাত্র পরিবর্তন ঘটে না। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, আল্লাহ্র মহত্ত্ব ও ক্ষমতা এবং মানুষ একান্তই সৃষ্টজীবমাত্র—এই সব বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে শুধু "বিত্ত-ধর্মের" পটভূমিকায় নহে, বরং ঐ গুরুত্ব আরোপ বেশি করিয়া করা হইয়াছে অন্যান্য বিশ্বাস, আচার-রীতি ও আনুগত্য, বিশেষ করিয়া মানুষের কল্পিত দেব-দেবীসহ বহু দেবদেবী উপাসনার প্রেক্ষাপটে। তাই সর্ববিবেচনায় আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং মানুষের প্রতি অন্য সকল দেবদেবীর প্রতি বিশ্বাস ও আনুগত্য বিসর্জন দিয়া এই বিশ্বজগতে 'একমাত্র আল্লাহ্র নিকট ফিরিবার' শিক্ষা ও বাস্তবিকপক্ষে 'পরকালে তাঁহার নিকট ফিরিবার' আহ্বানই বটে।

পরিশেষে আগে হইতেই অস্তিত্বশীল আদর্শ, যেমন বদান্যতা, নিয়তিতে বিশ্বাস ইত্যাদিকে ইসলামে পরিগ্রহণ বা অভিযোজন সম্পর্কে একটি কথা বলা প্রয়োজন। বদান্যতা ও নিয়তিতে বিশ্বাস—এই দুইটি বিষয়, বিশেষ করিয়া বদান্যতা আরব সমাজে বিদ্যমান ছিল। আর উহা না

থাকিলে প্রাচ্যবিদগণ গ্রীক-সিরীয়-আরামীয় বা খৃষ্টান-ইয়াহূদী ঐতিহ্যের মাঝে এই গুণগুলিকে আবিষ্কারের জন্য সুনিশ্চিতভাবেই যে কোন শ্রম স্বীকারেও কুণ্ঠিত হইতেন না। কুরআন রচিত হইয়াছে ইসলামের আগে হইতেই অস্তিত্বশীল উপকরণ হইতে বলিয়া সাধারণভাবে অনেকে দাবি করেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে ইতোপূর্বে যথাস্থানে আলোচনা করা হইয়াছে।[৮০]

এইখানে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ আবশ্যক যে, কুরআন বা মহানবী ﷺ কেহই নূতন কোন কিছু প্রবর্তনের দাবিদার নহেন। আর বিষয়টি চাপিয়া যাওয়ার কোন প্রয়াসও নাই; বরং কুরআন ও মহানবী ﷺ মানুষকে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও সর্বাত্মক একত্ববাদ গ্রহণ করিতে এই পরম প্রত্যয়ের ভিত্তিতে যে, পূর্ববর্তী সকল নবীই এই একই বার্তা ও শিক্ষা জনসমাজে প্রচার করিয়াছেন। কা'বা বা জেরুসালেমের ধর্মীয় পবিত্র স্থানগুলি মহানবী ﷺ ও তাঁহার অনুসারিগণ প্রথমবারের মত নির্মাণ করেন নাই। মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই এইসবের অস্তিত্ব ছিল। অনুরূপভাবে সালাত বা নামায, সিয়াম বা রোযা, হজ্জ পালন ও কুরবানী এইসব কিছুই পূর্ব হইতে ছিল। ইসলাম কেবল এইগুলি পরিগ্রহণ করিয়াছে এবং সেইগুলিকে স্বীকৃতি দান করিয়াছে। প্রাচ্যবিদদের সচরাচর এই দাবির কারণে নহে যে, সেইগুলি আরব কাফিরদের রীতি ও আচার ছিল, বরং এই কারণে যাহা কুরআন ও মহানবী ﷺ অত্যন্ত সুস্থভাবে দাবি করিয়াছেন এইগুলিরও প্রবর্তন করা হইয়াছে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে নবীগণ কর্তৃক। এইসব প্রত্যয়মূলক দাবির সত্যতা ইসলামের সমালোচকদের পবিত্র গ্রন্থের লেখা হইতেই স্পষ্ট। আর এই কারণেই কুরআন ও মহানবী ﷺ প্রায়ই যাহারা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব বা প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ সম্পর্কে অবহিত তাহাদের দাবি হইতে সমর্থন লইতে চাহিয়াছেন। আর সেই কারণেই ইসলাম কেমন করিয়া পূর্ববর্তী উপকরণের উপর নিজের কাঠামো গড়িয়াছে তাহা দেখানোর বিষয়টি তেমন গুরুত্ব লাভের দাবিদার নহে। বরং ইহা হইতে ঢের বেশি গুরুত্বের দাবিদার, কেন কুরআন ও মহানবী ﷺ ইহা প্রত্যয়বলিষ্ঠতায় করিয়াছেন। আর তাহা হইলেই দেখা যাইবে কুরআনের সত্যিকারের মৌলিকত্ব এই সত্যতার স্বীকৃতিতে নিহিত যে, আল্লাহ্র একত্ব বলিতে সকল কালে ও পরিবেশে সকল জনসম্প্রদায়ের নিকট আল্লাহ্র বার্তার ঐক্য ও অভিন্নতা তথা গোটা মানবজাতির মৌলিক একত্ব ও স্বীকৃতিকেও বুঝাইয়া থাকে। কুরআন এই মর্মে দাবি করে যে, যুগে যুগে মানুষ পথচ্যুত হইয়াছে এবং সকল নবীর মাধ্যমে মানব জনসমাজে পৌঁছাইয়া দেওয়া চিরন্তন সত্যবার্তা ও শিক্ষা হইতে তাহারা বিচ্যুত হইয়াছে। কুরআন আল্লাহ্র এইসব বার্তার পুনরাবৃত্তি করিয়াছে এবং বাণীবদ্ধ করিয়া মানব জাতির প্রতি একমাত্র এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ এবং তাঁহার সত্য ও চিরন্তন বার্তার শিক্ষায় প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাইয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে কুরআন কেবল উহার সমসাময়িক পরিস্থিতির জন্যই প্রসঙ্গিক নহে, বরং মানবজাতির নিরবচ্ছিন্ন পরিস্থিত পরিক্রমায়ও প্রাসঙ্গিক ও সম্পর্কিত বটে।

অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন

তথ্যনির্দেশিকা

১. R. Bell, The Beginning of Muhammad's Religious Activity, T.G.U.O.S, vii, 16-24, specially p. 20.

২. M. at M., Chap. III pp 62-85.

৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬০-৬১।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২-৭২।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৯।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯-৮৫।

৭. Supra, pp 21-23 for a discussion on Bell's dating of the Qur'an.

৮. ওয়াট, পূ.গ্র., পৃ. ৬১।

৯.অনূদিত আয়াতসমূহ ৯৬ ঃ ১-৫, ৯০ ঃ ৪, ৮-১০, ৮০ঃ১৭-২২, ৮৭ ঃ ১-৩, ৬-৮; ৫৫ঃ১-৩, ৯-১১, ২০প.; ৯৩ ঃ ৩-৮; ১০৬ ঃ ১-৪; ৮৮ ঃ ১৭-২০।

১০. ওয়াট, পূ. গ্র., ৬২-৬৩।

১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৩।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৬।

১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।

১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৫-১৬৯।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯।

১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭০।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

২২. প্রাগুক্ত।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

২৪. উপরে দ্র. পৃ. ২১-২৩।

২৫. ওয়াট, পূ. গ্র., পৃ. ৬১।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬১।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯-৭০।

২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

২৯. উপরে দ্র., পৃ. ৩৯০-৪০০।

৩০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৩১. Supra, এই বক্তব্যের তাৎপর্যের জন্য দেখুন পৃ. ৩০৯-৩১০ (মূল গ্রন্থ)।

৩২. প্রাগুক্ত, পৃ.৬৫-৬৬।

৩৩. প্রথম চার আয়াত শুধু শপথ।

৩৪. ৫২ ঃ ৪ = أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ .

৩৫. ৫২ ঃ ৪৯ = وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ .

"এবং তাঁহার পবিত্রতা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও তারকার অস্তগমনের পর" (৫২ ঃ ৪৯)।

৩৬. ওয়াট, পূর্বোক্ত স্থানে, পৃ. ৬৬।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৭।

৩৮. পূ. গ্র., পৃ. ৭১।

৩৯. উপরে দ্র. পৃ. ৩৯৫-৬।

৪০. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর, ২৯খ., ৯৩; ফাখরুদ্দীন আর-রাযী, তাফসীরু'ল কাবীর, ৩০খ., ১৯৩।

৪১. পূ. গ্র., আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ . ; আরও দ্র. ৫ ঃ ৯৩; ৯ঃ৯৫ ও ১২৫।

৪২. ওয়াট, পূ. স্থা., ৬৪।

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬।

৪৫. দ্র. তাজুল-'আরূস, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৬।

৪৬. মাজদুদ্দীন মুহাম্মাদ ইয়া'কূব আল-ফীরূযাবাদী, বাসাইর যাবিত-তাময়ীয ফী লাতাইফ আল-কিতাবিল 'আযীয, ২য় সং., মিসর ১৯৬৮ খৃ., ৩খ., ১৭২-৮।

৪৭. আরো দ্র. ১২ ঃ ১০৮; ৬ ঃ ১০০; ৪ ঃ ১৭১; ২৫ ঃ ১৮; ৩৪ ঃ ৪১; ৩৭ ঃ ১৮০।

৪৮. উপরে দ্র. পৃ. ৪২৫-৪২৬।

৪৯. ফীরূযাবাদী, পূ. স্থা., পৃ. ১৩৫। তিনি এই শব্দটির জন্য ১৬ ধরনের অর্থ চিহ্নিত করিয়াছেন (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৪-১৩৫)।

৫০. ওয়াট, পূ. স্থা., পৃ. ৬৮।

৫১. আত-তাবারী, তাফসীর, সূরা ৭৯ ঃ ১৮।

৫২. ওয়াট, পূ. স্থা, পৃ. ৬৩।

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬

৫৪. Watt, Mohammad's Mecca, Edinburgh University Press 1988, Preface, vii.

৫৫. Hitti যেমন বলিয়াছেন, "আল্লাহ (আল্লাহ, আল-ইলাহ) যদিও মুখ্য কিন্তু মক্কার একমাত্র 'দেবতা' নহেন। দক্ষিণ আরবীয় ভাষার দু'টি লিপিতে দুইবার এই নামটির উল্লেখ দেখা যায়.... মুহাম্মাদ ﷺ -এর পিতার নাম ছিল আবদুল্লাহ (আল্লাহ্র দাস বা উপাসক)। প্রাক-ইসলামী যুগের মক্কাবাসীরা আল্লাহ্কে স্রষ্টা ও শ্রেষ্ঠ উপায় দানকারী হিসাবে দেখিত এবং তাঁহাকে এমন বিশেষ বিপদের সময় স্মরণ করা হইত যে বিপদের বিষয় সূরা ৩১ ঃ ২৪, ৩১; ৬ ঃ ১৩৭, ১০৯; ১০ ঃ ২৩ আয়াত হইতে অনুমান করা যায়" (P.K. Hitti, History of the Arbas (frist published 1937), 10th edition, reprinted 1986, pp. 100-101.

৫৬. ওয়াট এখানে সেবা শব্দটি দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছেন উহা প্রকৃতপক্ষে সঠিক অর্থ নয় (Watt), Muhammad at Macca, p.67).

৫৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪।

৫৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

৫৯. মুসনাদ, ৪খ., ১১১, ১১২; ইবন সা'দ, ৪খ., ২১৪-২১৯।

৬০. নিম্নে দ্র. অধ্যায় ২৯ ও ৩১।

৬১. Hitti, পূ. গ্র., ১০৮।

৬২. ওয়াট, পূ. গ্র., পৃ. ৭২, ৭৯।

৬৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২-৭৩।

৬৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৬৫ . প্রাগুক্ত।

৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯। এই ধারণাটি সত্যিকার অর্থে ওয়াটের নহে, বরং বেল ও সি.সি. টরির ।

৬৭. Patricia Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam, Oxford 1987, p. 3.

৬৮. নিম্নে দ্র. পৃ. ৬০১-৬০২।

৬৯. ওয়াট, পূ. গ্র., পৃ. ৭৪, ৭৬।

৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩।

৭১. নিম্নে দ্র. পৃ. ৬৭২-৬৭৩।

৭২. ওয়াট, পূ., পৃ. গ্র ৭৩।

৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৪-৭৫।

৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৫-৭৬।

৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬।

৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭।

৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৮-৭৯।

৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ.৭৯।

৮০. উপরে দ্র. অধ্যায় ১১। ওয়াট এখানে তাহার রচনার 'The Originality of the Quran' শীর্ষক উপবিভাগে এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনী ব্যবহারের ক্ষেত্রে কুরআনের মৌলিকতা এখানেই যে, উহাতে বাস্তবতা নহে, বরং "গুরুত্ব আরোপের বিষয়" নির্বাচন এবং 'আনবা' এই পারিভাষিক শব্দটি এখানে বাস্তবতা নহে "তাৎপর্যকে" বুঝাইয়াছে (প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০-৮৫)। এখানে যাহা বলিতে চাওয়া হইয়াছে তাহার অযৌক্তিকতা সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে (উপরে দ্র. পৃ. ২৭৮-২৮২)।

চব্বিশতম অধ্যায়

ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায় এবং ওয়াটের আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা

মক্কায় কুরায়শদের সবল ও দুর্বল গোত্রগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল—ওয়াট এই মর্মে অনুমান করিয়াছেন বলিয়া লক্ষ্য করা গিয়াছে।[১] আর সেই পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি মক্কার সমসাময়িক পরিস্থিতি, যেমন হারবুল ফিজার ও হিলফুল ফুযূল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি এমনকি এই আভাস দিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার নবুওয়াত প্রাপ্তির আগে "মক্কার অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য" হইতে হয়তো বাদ পড়িয়াছিলেন অথবা "হয়তো এইভাবে বাদ পড়েন নাই"। এইসব ধারণা-অনুমানের গলদ ও অগ্রহণযোগ্যতার বিষয় ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। মহানবী ﷺ-এর ইসলাম প্রচার মিশনের সূচনাপর্বের আলোচনায় ওয়াট একই ধরনের ইতোপূর্বে কল্পনার অবতারণা করিয়াছেন, যদিও উহা তিনি সরাসরি না করিয়া পরোক্ষভাবে করিয়াছেন একটা সমাজতাত্ত্বিক আত্মিক ধারণার মাধ্যমে। ধারণাটির প্রতিপাদ্য মক্কার 'গরীব ও ধনীদের মধ্যকার সংগ্রাম'। তিনি তাঁহার লেখার এই পর্যায়ে ইসলামের আদি পর্বে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সম্পর্কে কিছু সাধারণ অভিমত ব্যক্ত করার পর তিনি তাঁহার মূল অভিসন্দর্ভ লইয়া বিস্তারিত আলোচনায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এই বিষয়টিই বর্তমান অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

এক ঃ প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারীদের সম্পর্কে মন্তব্য

মহানবী ﷺ -এর প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা সম্পর্কে ওয়াটের অভিমতের অনুরূপ আদি পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেন উহার সহিত মার্গোলিয়থের অভিমতের অত্যন্ত তীব্র ও শাণিত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে মার্গোলিয়থ পরবর্তীকালে যখন "গোপন সমাজ হিসাবে ইসলাম" সম্পর্কে তাহার তত্ত্ব প্রধানত আবূ বাক্র (রা)-এর ভিত্তিতে গড়িয়া তুলিতে প্রবৃত্ত হন তখন সেই আলোকে ওয়াট আবূ বাক্রের গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ ও মহানবী ﷺ-এর নিকট অন্য কয়েকজনকে ইসলাম কবুল করার জন্য লইয়া যাইবার বিষয়টি লইয়া প্রশ্ন উত্থাপন করেন। আবূ বাক্র (রা) প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী

ব্যক্তিদের অন্যতম বা সর্বপ্রথম ব্যক্তি। ওয়াট অবশ্য তাঁহার উত্থাপিত এই প্রশ্নে মার্গোলিয়থের নাম উল্লেখ করেন নাই। সাধারণভাবে তিনি গোড়ার দিকে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁহাদের যে তালিকা ইবন ইসহাক দিয়াছেন ওয়াট তাহাকে "মোটামুটি সঠিক" হিসাবে গ্রহণ করেন। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, যেহেতু ইসলামের শরীফ শ্রেণীর লোক কাহারা হইতে পারে তাহা পুঁথিগতভাবে ইসলামী জনসমাজের সেবার উপর নির্ভরশীল, সেহেতু ইসলামে বিশেষ বিশেষ ধর্মান্তরিত ব্যক্তির "উত্তর পুরুষরাই" "এই মর্যাদায় তাহাদের পূর্বপুরুষগণের দাবিদার হইবার যোগ্যতাকে সবচেয়ে বেশি কাজে লাগান"। তাই যদি কাহারও পক্ষে দাবি করা হয় যে, "তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম বিশজনের অন্তর্ভুক্ত তাহা হইলে নিরাপদেই এই অনুমান করা চলে যে, আবূ বাক্র (রা) ৩৫তম [২] বা ইহার কাছাকাছি স্থানের অধিকারী মুসলিম। ওয়াট এই প্রসঙ্গে আলী (রা) ,আবূ বাকর ও যায়দ ইবন হারিছার ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ক্রমিক সংখ্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিবরণের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, হয়তো বা আবূ বাকরের "পরবর্তী কালের গুরুত্বের বিষয়টি আগের কালের রেকর্ড বা দলীলাদিতে ভূতাপেক্ষভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে"। এই কারণে বলা যায়, যায়দ ইব্ন হারিছা (রা) সম্ভবত প্রথম মুসলিম হইবার দাবিদার হিসাবে সর্বোত্তম প্রার্থী।[৩] আবূ বাক্র (রা) পাঁচ ব্যক্তির একটি গ্রুপকে ইসলাম গ্রহণের জন্য মহানবী ﷺ-এর সকাশে আনিয়াছিলেন। আবূ বাক্র (রা) যেই পাঁচজনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন তিনি সেই ব্যাপারেও প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহারা হইলন ঃ 'উছমান ইবন 'আফ্ফান, আজ-জুবায়র ইবনুল 'আওয়াম, 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ, সা'দ ইবন আবী ওয়াক্কাস ও তালহা ইবন উবায়দুল্লাহ (রা)।

ওয়াট উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই পাঁচ ব্যক্তি হইলেন সেই সব ব্যক্তি যাহাদেরকে 'উমার (রা) তাঁহার ইন্তেকালের পূর্বে খিলাফতের উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি সমাধানের জন্য 'আলীকে তাহাদের সহিত একত্রে মনোনীত করিয়াছিলেন। ওয়াট প্রচ্ছন্নভাবে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন যে, এই বাস্তবতার প্রতিফলন রহিয়াছে ঐ পাঁচ ব্যক্তির প্রথমে ইসলাম গ্রহণের মধ্যে। তিনি বলিয়াছেন, "ইহা বিশ্বাস করা কঠিন যে, বিশ বৎসরেরও বেশি কাল আগে এই অভিন্ন পাঁচ ব্যক্তিই গ্রুপ[৪] হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর সমীপে হাজির হইয়াছিলেন"। ওয়াট এই গ্রুপটি সম্পর্কে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, এই গ্রুপের আবদুর রহমান ইবন 'আওফ আরও একটি ভিন্ন গ্রুপের সহিত ইসলাম গ্রহণ করেন বলিয়া অন্য একটি বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত গ্রুপে আর যাঁহারা ছিলেন তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন 'উছমান ইবন মায'উন। ইহা ছাড়া আরও অন্যান্য বিবরণের অস্তিত্ব রহিয়াছে যেইগুলিতে এই শেষোক্ত গ্রুপে আরও চারজনের উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁহারা হইতেছেন ঃ খালিদ ইবন সা'ঈদ, আবূ যার, 'আমর ইবন 'আবাসা ও আয-যুবায়র (রা)। তাঁহাদের প্রত্যেকে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে চতুর্থ বা পঞ্চম স্থানের অধিকারী হইবার দাবিদার।[৫]

প্রথম ইসলাম গ্রহণের দাবিদার তিন বা চারজন পুরুষ ব্যক্তির ধর্মান্তর গ্রহণের বিষয়ে বিভিন্ন বিবরণের মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টি সুবিদিত। ইহাও সত্য যে, এই মর্মে একাধিক বিবরণ রহিয়াছে যে, শেষে যে চারজনের নামোল্লেখ রহিয়াছে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে সেই বিবরণই উল্লেখ রহিয়াছে তাঁহাদের প্রত্যেকেই চতুর্থ বা পঞ্চম ইসলাম ধর্ম গ্রহণকারী হইবার দাবি কারিয়াছেন। উল্লিখিত বিবরণগুলির মধ্যে যে ভিন্নতা দেখা যায় উহাতে এই বাস্তবতাই ফুটিয়া উঠে যে, এই ইসলাম গ্রহণকারীদের প্রত্যেকেই তাঁহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের সঠিক সময় সম্পর্কে কিংবা তাঁহাদের আগে অন্যরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকিলে সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন না। একজনকে অগ্রাহ্য করিয়া আরেকজনকে গৌরবান্বিত করার কোন সচেতন প্রয়াস বলিয়া কোন রকম সাক্ষ্য-প্রমাণ নাই। এমনকি এই চার ব্যক্তি এবং আলী, যায়দ ও আবূ বাকরের ইসলামের গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে তাঁহাদের উত্তরপুরুষের লোকজন বা তাঁহাদের অনুরাগীরা এরকম দাবি করিয়াছিলেন বলিয়াও দেখা যায় না।

ইহা সত্য যে, ইসলামে আভিজাত্য ও মহত্ত্ব ইসলামী জনসমাজের জন্য কী সেবা প্রদান করা হইয়াছে তাহার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু এই যে পরবর্তী কালের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইল তাহা যাঁহারা ইসলামের আদি পর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সহিত যুগপৎ সহসম্পর্কিত ছিল না। আর তাহা ছাড়া আগে ইসলাম গ্রহণের ভিত্তিতে আভিজাত্যের দাবিও কোনোক্রমেই করা হয় নাই, যদিও সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণের খোদ বিষয়টিই একটি সম্মানসূচক বৈশিষ্ট্য দিয়া থাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে। আদি ইসলাম গ্রহণকারীদের বলা হইয়া থাকে 'আস-সাবিকূ'ন আল-আওয়ালূন'। তাঁহাদের কেহ বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার অবস্থানে পৌছাইয়া থাকুন বা না থাকুন উহা নির্বিশিষে তাঁহাদিগকে সর্বদাই এক বিশেষ মর্যাদার চোখে দেখা হইত।

ওয়াট বলিয়াছেন, "প্রথম পুরুষ মুসলিম হইবার মর্যাদার দাবিদার হইবার ব্যাপারে যায়দ ইবন হারিছার দাবিই সম্ভবত সর্বাগ্রগণ্য"। ইহা বলিয়া বস্তুত ওয়াট নোলডেকের অভিমতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। বলাবাহুল্য, ওয়াট এই প্রসঙ্গে নোলডেকের বরাতও দিয়াছেন। এখানে আবারও জোর দিয়া বলা যায় যে, 'আলী, যায়দ ও আবূ বাকরের বিষয়ে প্রাসঙ্গিক যে বিবরণগুলির কথা জানা যায় সেগুলি তাঁহাদের প্রত্যেকেই প্রথম পুরুষ মুসলিম দাবিদার হইবার পক্ষেই বলিয়াছে। যেহেতু প্রথম দুইজন–'আলী ও যায়দ মহানবী ﷺ-এর পরিবারের সদস্য সেহেতু নিরাপদেই এই ধারণা করা চলে যে, এই চৌহদ্দির বাহিরে আবূ বাকরই প্রথম পুরুষ মুসলিম। তবে ঘটনা যাহাই হউক, আবূ বাকরের পরবর্তীকালীন গুরুত্ব ও প্রাধান্যের কারণেই তাঁহার সেই আভিজাত্য পূর্ববর্তী কালের ধর্মান্তর সম্পর্কিত দলীলাদিতে ঐ আভিজাত্য প্রতিফলিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তির পরবর্তীকালীন প্রাধান্য ও মর্যাদা কোন ব্যক্তির ধর্মান্তরনের ঘটনার দলীলপত্রে ভূতাপেক্ষভাবে যদি কখনও আদৌ প্রতিফলিত হইয়া থাকে বলিয়া দাবি করা হয় তাহা হইলে

যুক্তিসঙ্গতভাবেই 'উমারের বেলায় তো উহাই ঘটা উচিত ছিল। কেননা তিনি ইসলামে আভিজাত্য ও প্রাধান্যমূলক অবস্থান ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছিলেন। যদিও তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী চল্লিশ ব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া এই মর্মে কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই।

ওয়াট নিজে উল্লেখ করিয়াছেন, "ইসলামের সূচনাপর্বে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁহাদের তালিকায় বেশ কিছু ব্যক্তির নাম অন্তর্ভুক্ত, যাহারা পরবর্তী কালেও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হইতে পারেন নাই"।[৬] ধর্মান্তরণের তালিকায় "যাহারা পূর্বে বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না এমন লোকদিগকেই স্থান দেওয়া হইয়াছে"। এইভাবে যে সাধারণ চিত্রটি ফুটিয়া উঠে তাহা হইল, এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা প্রথম মুসলমান হওয়ার তালিকাভুক্ত হওয়ার কোন দাবি না করা হইলেও তাঁহারা ইসলামে পরবর্তী কালে বিশিষ্টতার অধিকারী হন। আবার এমন কিছু ব্যক্তি আছেন যাঁহারা বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে সুখ্যাত না হইলেও তাঁহাদিগকে একান্ত আদিপর্বে প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই বিষয়ে একান্ত যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত বোধ হয় ইহাই হইতে পারে যে, এক বা দুইজন যাঁহারা প্রাধান্য ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করেন এবং যাঁহাদের অত্যন্ত গোড়ার দিকের ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে বলা হয় তাঁহাদের রেকর্ডপত্রের কারণে সন্দেহভাজন করার কোন কারণই নাই।

একইভাবে আবূ বাকর (রা) যে পাঁচ ব্যক্তিকে ইসলামের ছায়াতলে লইয়া আসেন বলিয়া উল্লেখ করা হয় তাঁহাদের সম্পর্কে সন্দেহ উত্থাপন করা অযৌক্তিক। 'উমার (রা) ঐ পাঁচ ব্যক্তিকে খিলাফতের প্রশ্নের নিষ্পত্তির জন্য নির্বাচিত করিলেও তাঁহাদের ইসলামে ধর্মান্তর গ্রহণের দলীলাদিতে উহার প্রতিফলন আদৌ ঘটে নাই। তবে তাঁহারা ঐ কাজের জন্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন—খোদ এই বিষয়টিই তাঁহারা যে ইসলামের সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন উহার প্রত্যয়ন এবং ইসলামের কারণে ও সেবায় তাঁহাদের চারিত্রিক সততা, দৃঢ়তা, আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার অন্যতম প্রমাণ বটে। 'উমার (রা) তাঁহাদের সমসাময়িক ও সহযোগী নাগরিক ও তাঁহার নিজের ইসলাম গ্রহণের আগে ও পরে তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের কারণে নিশ্চয়ই বর্ণিত ব্যক্তিদের পূর্বপরিচয় ও পটভূমি এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন ও অবহিত হইয়াই তাঁহাদিগকে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন। ওয়াটের এই বক্তব্যও মোটেই সঠিক নহে যে, এই পাঁচ ব্যক্তি একসাথে "একটি গ্রুপ" হিসাবে মহানবী ﷺ-এর নিকট আসিয়াছিলেন ইসলাম গ্রহণের জন্য। বিভিন্ন বর্ণনা হইতে যাহা বুঝা যায় তাহা হইল, আবূ বাক্র (রা) তাঁহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে সম্মত করাইয়াছিলেন এবং তিনিই মহানবী ﷺ-এর নিকট তাঁহাদেরকে লইয়া গিয়াছিলেন, যদিও একসাথে তাঁহাদের তিনি মহানবী ﷺ সকাশে লইয়া যান নাই।

দুই ঃ ছয় সমাজতাত্ত্বিক বিন্যাস

ইসলামের সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের জরিপ প্রসঙ্গে ওয়াট তাঁহাদের ধর্মান্তর গ্রহণের নেপথ্যে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কারণ সনাক্ত করিবার জন্য তাঁহাদের আর্থ-সামাজিক পটভূমির ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। এইজন্য তিনি সঠিকভাবে কোন গোত্রের সামাজিক অবস্থান এবং ঐ গোত্রের নির্দিষ্ট ব্যক্তির অবস্থান নির্ণয় করেন। গোত্র সম্পর্কে তাহার মূল্যায়ন নিম্নরূপ ঃ

হাশিম ঃ "আবূ তালিবের নেতৃত্বাধীন ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছিল"।[৭]

আল-মুত্তালিব ঃ "এই গোত্র দৃশ্যত খুবই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং হাশিম গোত্রের উপর খুব বেশি রকমে নির্ভরশীল ছিলেন"।[৮]

তায়ম ঃ "মক্কার বিষয়াবলী পরিচালনায় এই গোত্রকে তুচ্ছ গণ্য করা হইত"।[৯]

যুহ্‌রা ঃ "আল-মুত্তালিব ও তায়ম-এর তুলনায় এই গোত্র অধিকতর উন্নত এবং 'আবদ শাম্‌স গোত্রের সহিত ইহার ব্যবসায়িক ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল"।[১০]

'আদিয়্যি ঃ অবস্থানগত মর্যাদা সাধারণ, "সম্ভবত ইহার অবস্থারও ক্রমাবনতি চলিতেছিল। 'উমার (রা) ব্যতীত এই গোত্রের আর কেহ মক্কায় প্রতিপত্তি লাভ করে নাই"।[১১]

আল-হারিছ ইব্‌ন ফিহ্‌র ঃ "ইহার অবস্থানগত মর্যাদা সম্ভবত উন্নত হইতেছিল, তবুও এই গোত্রের গুরুত্ব প্রথম সারির মর্যাদার ছিল না"।[১২]

'আমের ঃ "হিজরতের সময় এই গোত্রের অবস্থানগত মর্যাদা বৃদ্ধি পায় বলিয়াই মনে হয়", কিন্তু সাধারণভাবে ইহার অবস্থানগত মর্যাদা ছিল আল-হারিছ ইবন ফিহ্‌রের অনুরূপ"।[১৩]

আসাদ ঃ "স্পষ্টতই এই গোত্রের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল"; ইহা হিলফুল-ফুযূলের পুরাতন সহযোগীদের পরিত্যাগ করিয়া 'বৃহৎ ব্যবসায়ী সমাজে' যোগ দেয়।"[১৪]

নাওফাল ঃ "এই গোত্রের লোকজনের সংখ্যা বেশী না হইলেও ইহার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। গোত্রটি 'আব্‌দ শাম্‌স ও মাখযূম গোত্রের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষা করে"।[১৫]

'আব্‌দ শাম্‌স ঃ "মাখযূম গোত্রের সহিত ইহার বিবাদ ছিল। মাখযূম ছিল মক্কার শীর্ষস্থানীয় গোত্র" কিন্তু "দুই গোত্রের মধ্যকার তিক্ততা অকারণে ছিল না"।[১৬]

মাখযূম ঃ "মাখযূম দৃশ্যত মক্কার আধিপত্যশীল প্রভাবশালী রাজনৈতিক জনগোষ্ঠী...."।[১৭]

সাহ্‌ম ঃ "সাহ্‌ম মক্কার অন্যতম অধিকতর ক্ষমতাশালী গোত্র ছিল"।[১৮]

জুমাহ ঃ এই গোত্রও ক্ষমতাশালী ছিল, তবে সাহ্‌ম গোত্রের মতো ততোখানি ক্ষমতাধর ছিল না"।[১৯]

'আবদুদ-দার ঃ এক সময় শীর্ষস্থানীয় থাকিলেও "বর্তমানে মক্কায় ইহাকে খুব একটা ধর্তব্য মনে করা হয় না"।[২০]

ওয়াটের মূল্যায়নে দেখা যায়, ১৪টি গোত্রের মধ্যে মোটামুটি সাতটিকে কম-বেশি ক্ষমতাধর ও বিশিষ্ট বলিয়া উল্লেখ করা হয়। বাকী সাতটিকে ততটা ক্ষমতাধর মনে করা হয় না। প্রথম শ্রেণীভুক্ত হইল ঃ মাখযূম, 'আব্দ শাম্স, সাহ্ম, জুমাহ্, নাওফাল, আসাদ ও যুহরা; দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসে হাশিম, আল-মুত্তালিব, তায়ম, 'আদী, আল-হারিছ ইব্ন ফিহ্র, 'আমের ও 'আবদুদ-দার। ওয়াট সুনির্দিষ্টভাবে ষাট জনেরও সামান্য বেশি কিছু লোকের নাম উল্লেখ করিয়াছেন যাহারা এইসব গোত্রের ও গোত্রের অনুগত (হুলাফা) গোত্র সমবায়ের লোক এবং যাহারা ইসলাম প্রচারের গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি কয়েকজন গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণকারীর ব্যক্তি পর্যায়ের অবস্থানগত মর্যাদার আভাস দিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব গোত্র হইতে ইসলাম গ্রহণ করেন তাহাদের মিত্রগণসহ। ইহার পর ওয়াট "ইসলামের সূচনাপর্বে ইসলাম কবুলকারী মুখ্য মুসলিমদের" তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যেমন (এক) সেরা পরিবারগুলির অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সী যুবক "সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী গোত্রসমূহের সর্বাপেক্ষা প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী পরিবারের পুরুষ"; (দুই) অন্যান্য পরিবারের সাধারণত তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি, "যাহাদিগকে পূর্ববর্তী শ্রেণীর লোকদের চেয়ে সুনির্দিষ্টভাবে আলাদা করা যায় না" এবং (তিন) কোন গোত্রের সহিত নিবিড় সম্পর্ক নাই এমন সব পুরুষ "তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যক কিছু ইসলামে দীক্ষিত ব্যক্তি"।[২১] ওয়াট মিত্র গোত্রকে উহাদের মূল গোত্র হইতে আলাদা শ্রেণী হিসাবে দেখান নাই। তিনি বলিয়াছেন, এসব ব্যক্তির প্রায় সকলেই উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।[২২]

গোত্র এবং ধর্মান্তরিতদের জরিপে ওয়াট দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ-এর ইসলাম মূলত তরুণ বয়স্কদের আন্দোলন। দ্বিতীয়ত, ইহা নিম্নশ্রেণী বা পতিতদের আন্দোলন নহে, এই আন্দোলনে সমর্থন আসিয়াছে কার্যত মধ্যবিত্ত শ্রেণী হইতে যাহারা নিজেদের সহিত সমাজের শীর্ষশ্রেণীর মধ্যকার বৈষম্য উপলব্ধি করিয়াছেন, অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাহারা অপেক্ষাকৃত কম সুবিধাভোগী।

সবশেষে ওয়াট বলেন, এই সংগ্রাম "ধনী ও নিঃস্বদের মধ্যে ছিল না, ইহা ছিল বিত্তশালী ও কম বিত্তশালীর মধ্যে"।[২৩]

তিন ঃ কাহিনী ও বাস্তবতা এই কল্পকাহিনীকে নাকচ করে

এখন ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ইসলামের আদিপর্বে অধিকাংশ ধর্মান্তরিতই ছিল তরুণ বয়স্ক। এই বিষয়টির উপর ওয়াটের মত একজন মিসরীয় লেখকও জোর দিয়াছেন।[২৪] ইহাও সত্য যে, ইসলাম নিম্ন ও পতিত শ্রেণীর মানুষের আন্দোলন নহে। কিন্তু ওয়াটের একান্ত নিজস্ব অভিমতের বক্তব্য হইতেছে, মক্কার ইসলামী আন্দোলন ছিল ধনী ও প্রায় ধনী শ্রেণীর মধ্যকার

সংগ্রাম। তাঁহার এই অভিমত ধোপে টিকিবার নহে। তিনি তাঁহার এই বক্তব্যের সপক্ষে জানাইয়াছেন, ইসলামের আদিপর্বে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ, এমনকি তাহাদের একটি বিরাট অংশ, যাহারা মক্কার জনসমাজের শীর্ষ শ্রেণী ও নিজেদের মধ্যকার বৈষম্যবোধজনিত হতাশায় ভুগিতেছিলেন ইহা ছিল বাস্তবিকপক্ষে তাহাদের দুই শ্রেণীর মধ্যকার এক ধরনের সংগ্রামবিশেষ। তাঁহার এই যুক্তি বাস্তবতার কষ্টিপাথরে টিকে না, এমনকি ওয়াট নিজে যেসব তথ্য দিয়াছেন তাহার আলোকেও নহে। এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে, ওয়াট ইসলামের সূচনাপর্বে যে ষাট জনের মত ধর্মান্তরিত ব্যক্তির তালিকা সুনির্দিষ্টভাবে দিয়াছেন তাহাদের চল্লিশ জনেরও বেশি লোককে ওয়াটের নিজ জরিপ অনুযায়ী মনে হয় অধিকতর প্রভাবশালী ও উন্নত গোত্রেরই সদস্য। অপরদিকে, উল্লিখিত ষাট জনের অর্ধেকেরও কম ব্যক্তি অন্যান্য গোত্রের সদস্য বলিয়াই দেখা যায়। এমনকি এই শেষোক্ত গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত গোত্রসমূহের ধর্মান্তরিতদের বেলায় ওয়াট স্বীকার করিয়াছেন, "আমরা এই তালিকার যতই নিচের দিকে যাইব ততই লক্ষ্য করিব যে, এইসব দুর্বলতর গোত্র ও গোত্রপ্রধানদের মধ্যে এমন সব মুসলমান রহিয়াছেন যাঁহারা তাঁহাদের নিজ নিজ গোত্রে ও পরিবারের প্রভাবশালী ব্যক্তি।[২৫] এক্ষেত্রে ওয়াট স্পষ্টত আবূ বাক্র, ' 'উমার, তালহা ও 'আবদুর রহমান ইবন 'আওফ (রা)-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন এবং তাঁহাদের নিজ নিজ গোত্রে তাঁহাদের বিশিষ্ট মর্যাদা ও প্রভাবের[২৬] বিষয় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই ইহা কল্পনাও করা যায় না যে, এই তথাকথিত দুর্বলতর গোত্রের এই ধরনের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাহাদের অপেক্ষা ধনী ও আরও ক্ষমতাধর ব্যক্তির পাশাপাশি নিজেদের বৈষম্যমূলক ব্যবধান লইয়া নিজেদের মধ্যে ধূমায়িত ক্ষোভ পোষণ করিতেছিলেন। আর যদি উহা সত্যই হইয়া থাকে তাহা হইলে এইসব দুর্বলতর গোত্রের সাধারণ সদস্যদের মাঝে সেই অসন্তোষবোধ তো আরও ব্যাপক ও আরও তীব্র হইবার কথা এবং সেই ক্ষেত্রে আমাদের তরফ হইতেও ইসলামের প্রতি এইসব লোকের ব্যাপকতর প্রাথমিক সাড়া লক্ষ্য করিবার কথা। কিন্তু বাস্তবে তাহা ঘটে নাই।

ওয়াট সবল ও দুর্বল গোত্রের ইসলাম গ্রহণকারী কিছু ব্যক্তির বেলায় দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নিজ নিজ পরিবার ও গোত্রে এইসব ব্যক্তির অবস্থানগত মর্যাদা ছিল 'নিকৃষ্টতর'। এই প্রয়াসের নেপথ্যে তাহার সুনিশ্চিত উদ্দেশ্য ছিল বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের মধ্যে সংগ্রামের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্য যেসব যুক্তি উপস্থাপিত করা হইয়াছে সেগুলি হয় আদৌ বোধগম্যভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে কিংবা একান্ত অনুমান নির্ভর। দৃষ্টান্ত হিসাবে 'আব্দ শাম্স গোত্রীয় 'উছমান ইবন আফফান, আবূ হুযায়ফা ইবন 'উতবা ইবন রাবী'আ এবং খালিদ ইব্ন সা'ঈদ আল-আস (আবূ উহায়হা)—ইসলামের সূচনাপর্বে ধর্মান্তরিত এই তিন ব্যক্তির আলোচনা প্রসঙ্গে ওয়াট বলিয়াছেন, 'উছমান (রা)-এর আশু পূর্বপুরুষগণ সমাজে তেমন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন না আর তিনি (উছমান) "হয়তো তাঁহার অপেক্ষাকৃত বেশি ধনী ও ক্ষমতাধর আত্মীয়ের ব্যাপারে ঈর্ষা পোষণ করিতেন"।[২৭]

তবে 'উছমান (রা) এইরূপ ঈর্ষাপোষণ করিতেন বলিয়া ওয়াট এই যে দাবি করিতেছেন উহার সপক্ষে তিনি কোন সুনির্দিষ্ট তথ্যের উল্লেখ করেন নাই। উল্লিখিত অন্য দুই ব্যক্তি প্রসঙ্গে ওয়াট বলিয়াছেন, এই দুই ব্যক্তি গোত্রপ্রধানের পুত্র হইলেও তাহাদের "মাতা ছিলেন কুরায়শদের গরীব আত্মীয় কিনানা বংশের কন্যা"।[২৮] আলোচ্য এই দুই ব্যক্তির পিতা কথিত গরীব পরিবারে বিবাহ করিয়াও কেন তাঁহাদের নিজেদের অবস্থানগত মর্যাদার অবনতি ঘটিল না, সমাজ নেতৃপদেই থাকিয়া গেলেন এবং কেনই বা তাহাদের পুত্রদ্বয়কে একই কারণে পরিবারের নিকৃষ্টতর সদস্য মনে করা হইল তাহা বোধগম্য নহে। অধিকন্তু যুক্তি হিসাবে বলা যায়, নিজ নিজ পরিবারে যদি গোত্রের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতার পুত্ররা নিকৃষ্ট গণ্য হইয়াই থাকেন তবুও একথা সত্য যে, আবূ হুযায়ফা ও খালিদের সাধারণ অবস্থানগত মর্যাদা তাহাদের গোত্রের ভিতরে বা বাহিরে অন্য কোন যুবকের তুলনায় উন্নত না হইয়া থাকিলেও কোনভাবেই নিকৃষ্ট ছিল না।

বানূ সাহ্ম গোত্রের খুনায়স ইবন হুযায়ফা ইবন কায়স সম্পর্কে ওয়াটের অভিমত হইল, যতদূর অনুমান করা যায় "ব্যক্তিগতভাবে" তিনি তাঁহার নিজ গোত্রের "অন্যতম কম গুরুত্বসম্পন্ন শাখার সদস্য ছিলেন"।[২৯] এই ক্ষেত্রেও ওয়াট এই অনুমানের কোন ভিত্তি উল্লেখ করেন নাই। অনুরূপভাবে একই গোত্রের অন্য ছয় ধর্মান্তরিত ব্যক্তি যাঁহারা সকলেই গোত্রপ্রধান আল-হারিছ ইবন কায়সের পুত্র এবং যাহারা ইসলামের গোড়ার দিকে শরণার্থীরূপে আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন তাহাদের কথাও এখানে উল্লেখ করা যায়। ওয়াট-এর উল্লেখ অনুযায়ী, "হারিছের মৃত্যুর পর তাহার পরিবার বুঝিতে পারে যে, তাহাদের অবস্থানগত মর্যাদা রক্ষা করা খুবই কঠিন।[৩০] স্পষ্টতই ধর্মান্তরণের পর আল-হারিছের পুত্ররা বুঝিতে পারেন যে, মক্কাতে তাহাদের অবস্থানগত মর্যাদা রক্ষা করাও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। তবে তাহাদের অবস্থার জন্য তাহাদের পরিবারের সদস্যদের ইসলাম গ্রহণ দায়ী, ইহার পূর্ববর্তী কোন কারণ আদৌ দায়ী নহে। আর আবিসিনিয়ায় হিজরতও বোধগম্যভাবে তাহাদের পারিবারিক মর্যাদা পুনরুদ্ধারের কোন কৌশল হইতে পারে না। একইভাবে ওয়াটের মূল্যায়ন অনুযায়ী ধারণা, একই ধরনের অবস্থা খুব গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের ধর্মান্তরিতদের ক্ষেত্রেও ঘটিয়াছিল। বানূ হাশিমের জা'ফার ইবন আবী তালিব এবং হামযা ইবন 'আবদুল মুত্তালিবের উল্লেখ করিয়া ওয়াট তাহাদের বৈবাহিক বিষয় ছাড়া আর কিছুকেই সম্পর্কিত করিতে পারেন নাই।

তিনি বলিয়াছেন, উল্লিখিত দুইজনেরই তাহাদের গোত্রে অবস্থানগত "নিম্নমর্যাদা" এই বাস্তবতায় প্রমাণিত যে, "তাঁহারা বেদুঈন গোত্র খাছ'আম-এ বিবাহ করিয়াছিলেন"।[৩১] স্পষ্টত, প্রভাবশালী বা অপ্রভাবশালী যে গোত্রেরই যুবক হউক না কেন গোত্রে তাহাদের অনুমিত সুবিধা বঞ্চনার কারণে তাহাদের মাঝে অসন্তোষ বিরাজ করিবে তাহা প্রমাণ করার জন্য এই ধরনের যুক্তি যথেষ্ট নহে। আরও উল্লেখ করা যায় যে, কিনানার মত গোত্র সামাজিক মর্যাদার দিক হইতে আদৌ নিম্ন মর্যাদার ছিল না, আর গরীব বা বেদুঈন গোত্রে বিবাহের প্রশ্নে কোন সংস্কারও জড়িত

ছিল না। এমনকি আনতারা ইবন শাদ্দাদের মত ক্রীতদাসীর পুত্রেরাও আরব জনসমাজে অত্যন্ত সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আমরা যদি ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণের সামাজিক মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াটের বক্তব্য গ্রহণ করি এবং তাহার অন্যান্য মতামতও গ্রহণ করি, যেমন তাহার এই কথা মানিয়া লই যে, ঐ সময় গোত্র সদস্যদের উপর সংশ্লিষ্ট গোত্রের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল ও সেই অনুপাতের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া ব্যক্তিবাদের[৩২] বিকাশ ঘটিয়াছিল ও ফলত একজন উচ্চাভিলাষী যুবক সব সময় তাহার ব্যক্তিস্বার্থকে গোত্রের স্বার্থের সহিত অভিন্ন না দেখিয়া অন্যান্য উপায়ে তাহার ভাগ্যের উন্নতির সন্ধান করিত তাহা হইলেও উহা হইবে যুক্তির অর্ধাংশ মাত্র। ওয়াটের তত্ত্ব প্রমাণ করিবার জন্য ইহাও দেখানো প্রয়োজন যে, ইসলামের প্রাথমিক শিক্ষা ও বার্তায় মক্কায় যাহারা 'প্রায় বিত্তবান' ছিলেন তাহাদের আর্থসামাজিক অবস্থান 'বিত্তবান' পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার মতো আশু ও সুনিশ্চিত সম্ভাবনার আশ্বাস ছিল কি না। কিন্তু কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কিছু আয়াতে কুরায়শ নেতাদের চরম জড়বাদ ও ধনসম্পদে আসক্তির নিন্দা এবং গরীব, ইয়াতীম ও অভাবী মানুষের সেবার সনাতন কর্তব্য, ন্যায়ানুগ ব্যবসায়-বাণিজ্য, বিশেষ করিয়া পণ্যে সঠিক ওজন ও মাপের ব্যাপারে সবিশেষ আহ্বান ও গুরুত্ব আরোপ ছাড়া আর কোনও নির্দিষ্ট অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের কথা বলা হয় নাই, যাহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল 'প্রায় বিত্তবান'দের অবস্থানগত মর্যাদার উন্নতি। আর এই যুক্তির অবতারণার সুযোগও এখানে নাই যে, উল্লিখিত ধারায় সংস্কার কার্যক্রম গৃহীত হইলে উল্লিখিত যুবকদের অবস্থার উন্নতি যে কোন উপায়ে হইতে পারিত যাহাতে তাহাদের পক্ষে তাহাদের নিজ নিজ গোত্র ও পরিবারের প্রতি তাহাদের প্রাথমিক আনুগত্য অনতিবিলম্বে নেপথ্যে ঠেলিয়া দেওয়া এবং তাহাদের পূর্বপুরুষদের বিশ্বাস ও মূর্তিপূজা-উপাসনা বিসর্জন দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব হইত।

ইহা ছাড়াও এমন দৃষ্টান্তও ইসলামের আদি পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীরা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া তাহাদের আশু বৈষয়িক উন্নতি ঘটাইতে পারিয়াছেন এমস কোন দৃষ্টান্ত নাই; বরং হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর ন্যায় ধর্মান্তরিত ব্যক্তি তাহার সম্পদ গরীব ও অভাবী ধর্মান্তরিতদের জন্য ব্যয় করিয়াছিলেন যখন সুহায়ব ইবন সিনানের ন্যায় ব্যক্তিরা আলোর পথ অবলম্বনকারী কুরায়শদের চোখ বন্ধ করিবার জন্য তাহাদের কষ্টার্জিত সম্পদ বিলাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অপরদিকে গোত্রের সহিত সম্পর্কিত নয় এমন প্রবাসী ব্যক্তিগণ ইসলামে ধর্মান্তরিত হওয়ায় তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও পেশা হারাইয়াছেন। কাজেই ইহা সুনিশ্চিত যে, এই দৃশ্যপটে বা পরিস্থিতিতে আর যাহাই হউক বিত্তবান শ্রেণীর মর্যাদা অর্জনে সংগ্রামরত কথিত প্রায় বিত্তবান একদল লোকের সংগ্রাম সত্য হইতে পারে না।

ইসলামের গোড়ার দিকে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের কারণগুলি "আরও পরিপূর্ণভাবে" বিবেচনা করার পর ওয়াট তাহার তত্ত্বের আওতা হইতে

অধিকাংশ গোড়ার দিকে ইসলামে ধর্মান্তরিতদেরকে বাদ দিয়াছেন। তিনি এইজন্য 'হানীফদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন ও বলিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ ইসলামের আহ্বান জানাইবার প্রাক্কালে "অনেকটা অস্পষ্ট ধরনের একত্ববাদ প্রবণতার ব্যাপক বিস্তার ঘটিয়াছিল", আর উবায়দুল্লাহ ইবন জাহশ, 'উছমান ইবন মায'উন ও সা'ঈদ ইবন যায়দ ইবন 'আমরের মত ব্যক্তি "এইসব অস্পষ্ট নীহারিকাবৎ প্রবণতার সমন্বয় কেন্দ্র হিসাবে ভূমিকা পালন করেন"।[৩৩] ইহার পরেই ওয়াট বলিয়াছেন, অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রশ্নগুলি "গোড়ার দিকে এই একত্ববাদী প্রবণতার" সহিত সম্পর্কিত হইলেও যাহারা অবিশ্বাসীদের মতবাদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ লইয়াছিলেন তাঁহাদের প্রেক্ষাপটে বিষয়টি আলোচনার সর্বোত্তম অবকাশ রহিয়াছে।[৩৪] কিন্তু ইহার পরপরই বিশিষ্ট ও মক্কার উল্লিখিত "তিন শ্রেণীর সর্বোত্তম পরিবারের বয়সে তরুণ সন্তানদের" প্রসঙ্গে ওয়াট বলেন, তাহারা যাহা করিতেছিল উহার "আর্থ-রাজনৈতিক দিকগুলি সম্পর্কে সম্ভবত জানা ছিল না, অন্তত তাহাদের এই চেতনা ছিল বলিয়া দৃশ্যত মনে হয় না"।[৩৫] এই তরুণতর গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য খালিদ ইবন সা'ঈদকে লইয়া আলোচনায় ওয়াটের অভিমত এই যে, খালিদ "যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন কেবল ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ই তাঁহার চিত্ত জুড়িয়া ছিল আর অন্য কিছু নহে"। ইহা ছাড়া মক্কায় হাতে গোনা লোকের হাতে ক্রমবর্ধমান হারে বিত্ত সঞ্চিত হওয়ার বিষয়টি তাহার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ না ঘটাইয়া পারে না। আর উহার ফলেই একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তিনি সচেতন হইয়া উঠেন।[৩৬]

এই প্রসঙ্গে ওয়াট খালিদের একটি স্বপ্নের বিষয় আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। এই স্বপ্নে তিনি দেখিতে পান, তিনি নিজে একটি অগ্নিকুণ্ডের কিনারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং তাঁহার পিতা তাঁহাকে ঐ অগ্নিকুণ্ডে ঠেলিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। যুগপৎ অন্য এক ব্যক্তি আবার খালিদকে অগ্নিকুণ্ডে পতন হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছে। ওয়াটের ধারণায় এই স্বপ্নের অর্থ সম্ভবত খালিদের পিতা খালিদকে "মক্কার অর্থ সংসস্থানমূলক ব্যবসায়ের ঘূর্ণাবর্তে জোরপূর্বক ঠেলিয়া দিতে চাহেন যাহা খালিদের বিবেচনায় মানুষের আত্মাকে ধ্বংস করিয়া দেয়"।[৩৭] ওয়াট তাঁহার রায়ে বলেন, সত্য যাহাই হইয়া থাকুক, খালিদের গোটা সক্রিয় চিন্তাভাবনা একান্তভাবেই ধর্মীয় বলিয়াই মনে হয়।[৩৮] তিনি এই বক্তব্যের রেশ ধরিয়াই বলেন, যাঁহারা ইসলামের গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা উহা করিযাছিলেন অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে।

তিনি অতঃপর হামযা এবং 'উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া সম্পর্কিত গোত্রগুলির মূল্যায়নে বলিয়াছেন যে, এই গোত্রগুলি প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিনিধি বলিয়া ধরিতে হইবে। তিনি হামযা ও 'উমার (রা)-এর উভয় গোত্র সম্পর্কে এই মর্মে মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের ধর্মান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাঁহাদের "নিজ পরিবার বা গোত্রের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি সম্পর্কিত"। "আরেক গোত্রের লোক কর্তৃক ভ্রাতুষ্পুত্রকে আক্রমণ ও অবমাননা হইতে রক্ষার জন্যই হামযা (রা) হামলাকারীদের

বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া আগাইয়া যান"। আর 'উমার (রা) তাঁহার ভগিনী ও তাঁহার স্বামীর বিরুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন এই কারণে যে, "তাঁহার আশঙ্কা হয়, বোন ও বোনের স্বামীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাঁহার গোত্রের সাধারণ অবস্থানগত অবস্থার আরও অবনতি ঘটিতে পারে"।[৩৯] ওয়াট আরও মত প্রকাশ করেন যে, "উমার (রা)-এর ধর্মান্তরিত হওয়ার নেপথ্যে" অর্থনৈতিক কারণ প্রচ্ছন্ন ছিল না।[৪০]

তাই ওয়াটের নিজ স্বীকারোক্তি অনুযাযী হামযা ও 'উমার (রা) হইলেন দ্বিতীয় শ্রেণীর গোত্রগুলির যথাক্রমে দুই প্রতিনিধিত্বকারী। তাঁহারা যদিও তাঁহাদের গোত্র আনুগত্যের কারণে তাঁহাদের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া দেখাইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা মোটেও বাস্তবিকপক্ষে অর্থনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ওয়াট বলেন, উমার (রা) তাঁহার বোন ও বোনের স্বামীর ধর্মান্তরণের ঘটনায় এই মর্মে শঙ্কায় ছিলেন, "ইহার ফলে তাঁহার নিজ গোত্রের সাধারণ অবস্থানের অবনতি ঘটিতে পারে"।[৪১] এইখানে ওয়াট যে মনোভঙ্গির পরিচয় দিয়াছেন তাহা স্পষ্টতই সমসাময়িক প্রায় বিত্তবানেরা ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাহাদের বৈষয়িক অবস্থার উন্নতি করিতে চাহিয়াছিল বলিয়া ওয়াট ইতোপূর্বে যে তত্ত্ব দিয়াছেন তাহার একান্ত বিপরীত।

ওয়াট ইহার পর তৎকালে মক্কার ধর্মান্তরিত তৃতীয় শ্রেণীটির বিচার-বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোন আর্থ-রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বা সম্ভাবনা অপেক্ষা বরং তাহাদের নিজেদের নিরপত্তাহীনতার প্রশ্নটি তাহাদিগকে এই বিষয়ে অধিকতর প্রভাবিত করিয়াছিল।[৪২] ওয়াট ইহার পর অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে যদি অর্থনৈতিক সংস্কারের কোন প্রত্যাশা থাকিত তাহা হইলে "আমরা উহাদিগকে ইসলাম গ্রহণকারীদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে দেখিবার আশা করিতে পারিতাম"। এইসাথে তিনি এই মন্তব্যও যোগ করেন যে, কুরআনের গোড়ার দিকে অবতীর্ণ আয়াতগুলিতে এই ধরনের সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে আর গোটা বার্তাই ছিল মক্কার তৎকালীন পরিস্থিতির সহিত সম্পর্কিত। তিনি আরও অভিমত প্রকাশ করেন, "যদি কোন ব্যক্তি আয়াতের বার্তায় নিহিত এই ধরনের আর্থ-রাজনৈতিক তাৎপর্যের কারণেই প্রধানত ইসলাম গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে উহাতে অবাক হইবার কিছু নাই। তবুও খুব বেশি লোক এইভাবে ইসলাম গ্রহণে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এমন সম্ভাবনা কম"।[৪৩]

ইহা ঠিক যে, কিছু লোক যদি "তাহাদের ধর্মান্তর গ্রহণের বেলায় জড়, পার্থিব ও বৈষয়িক কারণে অনুপ্রেরণা বোধ না করিয়া থাকে" তাহা হইলে উহা আশ্চর্যের ব্যাপার হইতে পারে না। কিন্তু যেহেতু ওয়াট নিজেই বলিয়াছেন, "এমন লোক সংখ্যায় খুব বেশি হইবে তেমন সম্ভবনা কম" সেহেতু সত্যই বিস্ময়কর বিষয় যে, ইহা সত্ত্বেও ওয়াটের কার্যত সাধারণীকরণ অনুযায়ী স্বীকার করিতেই হয়, মক্কার তৎকালীন বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের মধ্যে যে সংগ্রামতত্ত্ব তিনি

খাড়া করিতে চাহিয়াছেন তাহা টিকিবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। বস্তুতপক্ষে তাহার এই শেষ মন্তব্যটি হইল তাহার নিজ তত্ত্ব রক্ষায় তাহার মরিয়া হইয়াও এক বেপরোয়া প্রয়াস। কেননা এত বিপুল সংখ্যক বাস্তব তথ্যাদির সত্যতা তাহার পক্ষেও অস্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। গোড়ার দিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলির অর্থনৈতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তাহার উল্লেখও তাহার তত্ত্ব রক্ষার আরও একটি দুর্বল প্রয়াস। কেননা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আগের দিকে অবতীর্ণ কুরআনের আয়াতগুলিতে যেসব অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে সেগুলিকে কোনভাবেই প্রায় বিত্তবানদের অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে নিবেদিত বলা যাইতে পারে না। এমনকি মক্কায় তৎকালীন পরিস্থিতির সহিত এইসব আয়াতের শিক্ষার সম্পর্কের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। তাহাতে ওয়াটের তত্ত্ব প্রমাণ করিবার কোন সুবিধাই হইবে না। এই বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

চার ঃ নূতন বোতলে পুরাতন মদ

ওয়াটের নিজস্ব বিশ্লেষণের ভিত্তিতে মক্কার তৎকালীন পরিস্থিতি ছিল নিম্নরূপ ঃ (১) "সেরা পরিবারের তরুণ বয়সী সন্তান" যাহাদিগকে ওয়াট ধর্মান্তরিত প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন তাহারা ইসলামের গোড়ার দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের আনুমানিক মোট ৬০ জনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। তাঁহারা অর্থনৈতিক নহে, ধর্মীয় কারণেই কেবল ইসলাম গ্রহণে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। বস্তুতপক্ষে এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে না যে, বিত্তবানদের পর্যায়ে তাঁহারা নিজেদেরকে উন্নীত করিবার লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। কেননা তাঁহারা তো ইতোমধ্যে 'বিত্তবান শ্রেণীরই' অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাঁহারা ইসলামের অতি সূচনাপর্বে ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল সেরা পরিবারের সন্তান—এই বাস্তবতাই ওয়াটের এই মর্মে প্রদত্ত তত্ত্বকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করে যে, বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের মধ্যে সংগ্রামের কারণেই এই ধর্মান্তর ঘটে।

(২) ওয়াট কথিত দ্বিতীয় শ্রেণী যাহারা অন্যান্য পরিবারের তরুণ বয়স্ক ব্যক্তি, "যাহাদিগকে উল্লিখিত প্রথম শ্রেণী হইতে তীক্ষ্ণভাবে পৃথক করা যায় না" তাঁহাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামের আদি পর্বে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে যদি তাঁহাদের সমাজে অর্থনৈতিক সংস্কারের আশা থাকিয়া থাকে তাহা হইলে আমরা অনুরূপ পরিস্থিতিতে ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহারা ঐ প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন। অথচ তিনি সুনির্দিষ্টভাবে এই শ্রেণীর মাত্র দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন হামযা ও 'উমার (রা)। এই দুই ব্যক্তি প্রসঙ্গে অর্থাৎ হামযা ও 'উমার (রা)-এর দুইটি ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাঁহারা তাহার বক্তব্য অনুযায়ী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইলেও অর্থনৈতিক প্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ওয়াট নাম ধরিয়া এই শ্রেণীর আর কাহারও উল্লেখ করেন নাই যাঁহারা স্পষ্টত অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ

করিয়াছিলেন। অবস্থা যাহাই হউক, এই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ইসলামের আদি পর্বে মোট ইসলাম গ্রহণকারীদের তুলনায় নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন মাত্র।

(৩) ওয়াটের উল্লিখিত তৃতীয় শ্রেণী হইল, "সেইসব মানুষ যাহারা কোন গোত্রের সহিত নিবিড় সম্পর্কিত নহেন"। ওয়াটের মতে ইহাদের সংখ্যা "তুলনামূলকভাবে কম"। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সুবিধা অপেক্ষা তাহাদের নিরাপত্তাহীনতাবোধই বরং এই বিষয়ে তাহাদের বেশি প্রভাবিত করিয়াছিল।

ওয়াট এইসব বাস্তব তথ্যাদি তাহার নিজ তত্ত্ব বাতিল করিবার জন্যই উল্লেখ করিয়াছেন মনে করা মোটেও ঠিক হইবে না বরং বিপরীতভাবে ইহার নেপথ্যে তাহার একটি পরিষ্কার লক্ষ্য ছিল। তিনি তাহার এই লক্ষ্যকে তৎকালের মক্কায় বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের সংগ্রাম তত্ত্বের এক ধরনের মোটফল হিসাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিবৃত ঘটনাসমূহের জরিপ হইতে ওয়াট বলেন, কেবল মহানবী ﷺ এবং "তাঁহার অনুসারীদের মধ্যকার বিচক্ষণতর" ব্যক্তিগণ যাঁহারা তাঁহার বার্তার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন আর ইহার নিশ্চয়তার গুরুত্ব তাঁহারা উপলব্ধি করিয়া মুসলিম সংক্রান্ত বিষয়াবলী পরিচালনা করিয়াছিলেন ও নির্দেশনা দিয়াছিলেন যদিও ধর্মীয় ভিত্তিতেই মানুষের প্রতি ইসলামের আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল। আর ইসলামে ধর্মান্তরিত প্রায় সকলেই কেবল ধর্মীয় প্রেরণাতেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ওয়াট বলিয়াছেন, মহানবী ﷺ "কোনও বিচক্ষণ সমাজতান্ত্রিক সংস্কারক ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক নূতন ধর্মের উদগাতা"। তিনি তাঁহার সমসাময়িক কালের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনাচার সম্পর্কে অবহিত থাকিয়াই "ধর্মের বিষয়কেই মৌলিক বিষয় গণ্য করিয়া এই বিষয়েই তাঁহার মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন"।[৪৪] তাই "ধর্মের ভিত্তিতেই মানুষকে ইসলামের আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছিল" এবং ইহাই ঐসব মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করিয়া দেয় যাহার ভিত্তিতে তাঁহারা মহানবী ﷺ-এর আহ্বানে সাড়া দেন এবং ইসলামের ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে সর্বাত্মক নিষ্ঠায় গ্রহণ করেন। তাই তাঁহাদের ধর্মান্তর গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অর্থনীতি ও রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহাদের সচেতন কোন চিন্তাভাবনার ভূমিকা বলিতে গেলে ছিলই না।[৪৫] তবুও আবার ওয়াট এই কথাও বলিয়াছেন, "মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ অনুসারীরা নিশ্চয় মহানবী ﷺ-এর বার্তা ও শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন এবং মুসলমানদের বিষয়াবলী পরিচালনায় এইসব বিষয়কে তাহারা নিশ্চয়ই গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।[৪৬]

এখন বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের মধ্যে সংগ্রামের বিশদভাবে গড়িয়া তোলা তত্ত্বের সারমর্ম যদি ইহাই হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহা বলার আদৌ অপেক্ষা রাখে না যে, ওয়াটের এই বক্তব্য তাহার বহু পূর্ববর্তী পণ্ডিতের বক্তব্যের তুলনায় আদৌ ভিন্ন নহে। এই শেষোক্ত প্রাচ্যবিদগণ বহুভাবেই জানাইয়াছেন, মহানবী ﷺ তাঁহার সমসাময়িক জনসমাজের আর্থ-সামাজিক ও

রাজনৈতিক অসুস্থতার বিষয়ে অবহিত হ[ই]য়াই সমাজ সংস্কারের কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহার প্রকৃতি মূলত ধর্মীয়। তবুও এই কার্যসূচী বা আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল তাঁহার নিজের ও কথিত দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদাসম্পন্ন গোত্রগুলির আর্থ-রাজনৈতিক অবস্থান উন্নয়ন সাধন। এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে, মহানবী ﷺ -এর চরম শত্রু আবূ জাহল মহানবী ﷺ -এর স্বার্থকে দেখিত বানূ মাখযূমের সহিত বানূ হাশিমের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব দখলের প্রতিযোগিতার দৃষ্টিকোণ হইতে।[৪৭] প্রাচ্যবিদগণ কম-বেশি এই অভিমতই পোষণ করেন এবং তাহারা ইসলামের অভ্যুদয়কে কোনও না কোনওভাবে কুরায়শদের আওতাধীন গোত্রগুলির মধ্যে স্বার্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতা হিসাবে। এই পুরাতন, সনাতন, অতি সরল ও বহুকাল আগেই বরং খণ্ডিত বক্তব্যের সহিত ওয়াট বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের স্বার্থের সংঘাতের ছদ্ম সমাজতান্ত্রিক তত্ত্বের মাত্রা যোগ করিয়াছেন। ওয়াট কুরায়শদের দুই গোত্রের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য লইয়া তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলিয়া, মক্কার ব্যবসায়ী সমাজে অভিজাত ও কুলীন ব্যক্তিবাদ বিকাশের তত্ত্ব দিয়া, মক্কার তৎকালীন গোত্রগুলির মধ্যে তুলনামূলক অবস্থানগত মর্যাদার বিষয় আলোচনা করিয়া এবং মহানবী ﷺ -এর গোত্রকে (বানূ হাশিম) দ্বিতীয় শ্রেণীর মর্যাদায় নামাইয়া দিয়া, যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন নিজ নিজ গোত্র ও পরিবারে তাহাদের ব্যক্তিগত সামাজিক মর্যাদা শনাক্ত করার যুগপৎ প্রয়াস চালাইয়া এবং সেই সাথে আদি ইসলাম গ্রহণকারীরা সাত্যিকার অর্থে অর্থনৈতিক প্রেরণায় ইসলাম গ্রহণ করেন নাই এমন স্ববিরোধী দাবি করিয়া এবং সর্বোপরি তাঁহার বিত্তবান ও প্রায় বিত্তবানদের মধ্যে সংগ্রামের মহাতত্ত্ব হাজির করিয়া যাহা করিয়াছেন তাহা হইল সেই খাড়া-বড়ি-থোড় পুরাতন ও বাসি মদকে চকচকে নূতন বোতলে হাজির করা মাত্র।

এইভাবে ওয়াট ইসলামের অভ্যুদয় সম্পর্কে কেবল সত্যিকার অর্থেই নিরাসক্ত ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হন নাই, বরং তিনি তাঁহার কথিত "সেরা পরিবারগুলির" সদস্যদেরও অবমূল্যায়ন করিয়াছেন। তিনি দাবি করিয়াছেন, এইসব পরিবারের অপেক্ষাকৃত কম বয়সী পুরুষেরা ইসলামের আর্থ-রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, তাঁহারা ধর্মীয় চেতনায় ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথচ এ কথা সত্য নহে। ইহা সত্য হইতে পারে না। আবূ জাহলের মত ব্যক্তিগণ মহানবী ﷺ-এর মিশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ঠিকই লক্ষ্য করিয়াছিল এবং বিষয়টি সম্পর্কে সে তাহার গোত্রের লোকজনকে নিরন্তর সতর্কও করিয়াছিল। বাস্তবিকপক্ষে ঐসব পরিবারের বয়সে অপেক্ষাকৃত ব্যক্তিরা আবূ জাহল ও তাহার মত ব্যক্তিদের মতই এই বিষয়ে সমান সচেতন ছিল যে, ইসলাম গ্রহণের অর্থ হইবে ধর্মীয় ও পার্থিব সকল বিষয়েই মহানবী ﷺ -এর নেতৃত্ব স্বীকার করা। তবুও ঐ বয়সে তরুণ ঐ ব্যক্তিরা জড়বাদ উদ্ভূত 'ব্যক্তিবাদের' কারণে নহে, বরং তাঁহারা সত্যকে ভালোবাসেন বলিয়াই অন্যান্য সকল কারণের উর্ধ্বে থাকিয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অপরদিকে তথাকথিত দ্বিতীয় শ্রেণীর গোত্রের কোনও প্রশ্নই উঠিতে পারে না। বিশেষ করিয়া মহানবী ﷺ-এর গোত্র বানূ হাশিম কিছুই বুঝে না তাহা হইতে পারে না। কেননা

অন্ততপক্ষে আবূ জাহ্‌ল প্রকাশ্যে ইহাকে তাহার গোত্র ও বানূ হাশিমের মধ্যে নেতৃত্বের প্রশ্ন বলিয়া বিবেচনা করিত। অথচ বানূ হাশিম গোত্রের নেতা আবূ তালিব বা এই গোত্রের অন্য সদস্যদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ইসলাম গ্রহণ করে নাই। বরং খোদ বানূ হাশিমেরই অন্যতম নেতা আবূ লাহাব এমনকি মহানবী ﷺ-এর বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। স্পষ্টতই বানূ হাশিম গোত্রের নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যদের গরিষ্ঠদের এই মনোভাবের কারণ হইল, আবূ জাহলের তীব্র আক্রমণাত্মক সমালোচনা সত্ত্বেও মহানবী ﷺ-এর মিশনের বিষয়টিকে বানূ হাশিম ও বানূ মাখযূমের মধ্যকার নেতৃত্বের প্রশ্ন হিসাবে দেখে নাই। কেননা সমসাময়িক মক্কার জনসমাজে তাহাদের মধ্য হইতে মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাব ঘটিয়া থাকুক বা না থাকুক তাহাদের নিজেদের আভিজাত্য, কৌলিন্য বা সমাজে নেতৃত্বের অবস্থান সম্পর্কে তাহাদের আত্মপ্রত্যয় অক্ষুণ্ণ ছিল এবং তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষের অনুসৃত ধর্মে তাহাদের বিশ্বাস ও অনান্য বিবেচনার নিরিখে তলাইয়া যায় নাই।

যেহেতু বানূ হাশিমের নেতৃত্ব ও সাধারণ সদস্যরা মহানবী ﷺ-এর মিশনকে তাহাদের ও বানূ মাখযূমের মধ্যকার নেতৃত্বের ইস্যু বলিয়া মনে করে নাই সেহেতু মহানবী ﷺ মক্কার জনসমাজের নিজে বা তাঁহার গোত্রের জন্য নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন এমন প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। অবশ্য তিনি ও তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিচক্ষণ অনুসারিগণ ইসলামের রাজনৈতিক তাৎপর্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু এইসব তাৎপর্যের বাস্তবায়ন কখনও তাঁহাদের প্রাথমিক বা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহারা ইসলামের মিশন সফল হইলে কোন বৈষয়িক সুবিধা প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখিয়া কখনও ইসলাম গ্রহণে তৎপর হন নাই, ইহা তাহাদের প্রাথমিক বা মাধ্যমিক অভিপ্রায়ও ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে কুরআন এই সুনির্দিষ্ট অভিযোগের প্রত্যুত্তরে বারংবার উল্লেখ করিয়াছে যে, নেতৃত্ব দখল বা বৈষয়িক সুবিধা লাভ কোনটিই মহানবী ﷺ-এর মিশনের লক্ষ্য নহে কিংবা সেগুলি ইসলামের সত্যিকারের ইস্যুও নহে। উল্লিখিত অভিযোগ কুরআনে বারংবার অস্বীকারের বিষয় হইতে ইহাই স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে, মহানবী ﷺ-এর মিশনের রাজনৈতিক তাৎপর্য প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত কিছু ছিল না যাহার বিষয় কেবল মহানবী ﷺ ও তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীরাই জানিতেন, যেমনটি ওয়াট ধারণা করেন। ওয়াটের তত্ত্ব তাই মক্কার অবিশ্বাসীরা যে অভিযোগ করিয়াছিল কেবল উহারই নয়া লেবাসে উপস্থাপন মাত্র। একইভাবে ওয়াট মূল বিবেচ্য বিষয়টিকেই উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। কোন রাজনৈতিক বা বৈষয়িক মতলব যে মহানবী ﷺ-কে পরিচালিত করে নাই তাহার সর্বোত্তম ব্যাখ্যা এই বাস্তবতায় প্রমাণিত হয় যে, যখন মহানবী ﷺ -এর মিশনের পরিপূর্ণ সাফল্য আসে তখনও তিনি প্রাপ্ত সুফল তাঁহার নিজ গোত্র বা কথিত প্রায় বিত্তবানদের মধ্যে সীমিত রাখেন নাই।[৪৮]

অনুবাদ ঃ আফতাব হোসেন

তথ্যনির্দেশিকা

১. উপরে দ্র. অধ্যায় ৯।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৩. প্রাগুক্ত।

৪. প্রাগুক্ত।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭।

৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত, ৯৮।

১০. প্রাগুক্ত।

১১. প্রাগুক্ত, ৯১।

১২. প্রাগুক্ত।

১৩. প্রাগুক্ত, ৯২।

১৪. প্রাগুক্ত, ৯২।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

১৮. প্রাগুক্ত, ৯৪।

১৯. প্রাগুক্ত।

২০. প্রাগুক্ত।

২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫।

২২. প্রাগুক্ত,পৃ. ৯৫-৯৬।

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬।

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬, বরাত আবদুল মুতাআল-আস-সাউদী, শাবাবুল কুরায়শ, কায়রো ১৯৪৭ খৃ.।

২৫. ওয়াট, পূ.গ্র., ৯৫।

২৬. দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৯-৯০।

২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩।

২৮. প্রাগুক্ত।

২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪।

৩০. প্রাগুক্ত।

৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮।

৩২. দ্রষ্টব্য প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-২০।

৩৩. . প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭।

৩৫. প্রাগুক্ত।

৩৬. প্রাগুক্ত, ৯৭।

৩৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৭-৯৮।

৩৮. প্রাগুক্ত, ৯৮।

৩৯. প্রাগুক্ত।

৪০. প্রাগুক্ত।

৪১. [অধিকতর অবনতি] এই কথাগুলি ওয়াট বানূ আদীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গোত্র হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছেন যাহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৪২. ওয়াট. পৃ. গ্র., ৯৮।

৪৩. প্রাগুক্ত।

৪৪. প্রাগুক্ত, ৯৯।

৪৫. প্রাগুক্ত।

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. নিম্নে দ্র., ৬১৮-৬১৯।

৪৮. উপরে দ্র. অধ্যায় ৪, ৯।

ষষ্ঠ ভাগ

THE MAKKAN OPPOSITION

মক্কাবাসীদের বিরোধিতা

পঁচিশতম অধ্যায়

মক্কাবাসীদের বিরোধিতা ঃ প্রকৃতি, কারণ ও প্রত্যক্ষ অভিযোগ আনয়ন

এক ঃ বিরোধিতার প্রকৃতি

রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দাওয়াতের ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মক্কার অভিজাত শ্রেণী এবং সাধারণ লোকজনের মধ্যে এমন কিছু ভাল মানুষ ছিলেন যাঁহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া সত্যকে গ্রহণ করিয়া লইলেন। তাঁহারা নূতন বিশ্বাসে বিশ্বাসী হইয়া নিজেদেরকে সত্যের আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন এবং তাঁহাদের জানমাল সত্য প্রতিষ্ঠায় উৎসর্গ করিলেন।

দ্বিতীয়ত, মক্কার জনগোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ, বিশেষ করিয়া নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিবিধ কারণে প্রিয়নবী ﷺ -এর দাওয়াতের বিরোধিতা করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে এমন কিছু একগুঁয়ে লোক ছিল যাহারা সর্বাত্মক শক্তি দিয়া এই নূতন বিশ্বাসের বিস্তারের বিরুদ্ধাচরণে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল এবং অংকুরেই ইহার বিনাশ সাধনে লিপ্ত হইল। আর এক শ্রেণীর কম-বেশি তারুণ্যদীপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন যাঁহারা এই আধুনিক আন্দোলনের অনুসারী হইয়াছিলেন।

তৃতীয়ত, মক্কা নগরীর বাহিরের, ইহার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের এবং তায়েফের গোত্রগুলি এই আন্দোলন সম্পর্কে যখন জানিতে পারিল তখন তাহাদের মনোভাবে সাধারণত নির্লিপ্ততার অথবা আন্তরিক ঔৎসুক্য জাগ্রত হইল।

প্রধানত মক্কার অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে মক্কার জনসাধারণকে প্ররোচিত করিতেছিল এবং তাহাদিগকে সংগঠিত করিয়া নেতৃত্ব দিতেছিল। তদুপরি মক্কার বাহিরের কোন কোন গোত্রকেও বিরোধিতায় প্ররোচিত করিল। মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত পর্যন্ত প্রিয়নবী ﷺ -এর ও ইসলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রধানত লিপ্ত হইয়াছিল মক্কার অভিজাতবর্গ ও পুরোহিত শ্রেণী।

বিরোধের বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করিলে মক্কার নেতৃবৃন্দের এই ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইবে। কুরআন মজীদের বেশ কিছু আয়াতে কারীমায় তাহাদের এই ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমাসমূহ উল্লেখ করা যায়। মক্কার নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের চেলা-চামুণ্ডাদের প্রিয়নবী ﷺ -এর বিরুদ্ধাচরণ এবং সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে আখিরাতে তাহাদের কি পরিণতি হইবে তাহার বিশদ বিবরণ রহিয়াছে।

(ক) ৩৪ ঃ ৩১-৩৩ (সূরা সাবা) ঃ

.....وَلَوْ تَرَى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ . يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ الْقَوْلَ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لَوْ لَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ . قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَاۤءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِيْنَ . وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَاْمُرُوْنَنَا اَنْ نَّكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهٗ اَنْدَادًا . وَاَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَاَوُا الْعَذَابَ . وَجَعَلْنَا الْاَغْلٰلَ فِيْ اَعْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

".....তুমি যদি পাপিষ্ঠদেরকে (যালিমদেরকে) দেখিতে, যখন তাহাদেরকে তাহাদের রব-এর সম্মুখে দাঁড় করানো হইবে তখন তাহারা পরস্পর কথা কাটাকাটি (বাদানুবাদ) করিতে থাকিবে। যাহাদেরকে দুর্বল মনে করা হয় তাহারা দাম্ভিকদেরকে বলিবে, তোমরা যদি না থাকিতে তাহা হইলে আমরা অবশ্যই মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতাম। দাম্ভিকরা যাহাদের দুর্বল মনে করা হয় তাহাদেরকে বলিবে, তোমাদের নিকট সৎপথের দিশা (হিদায়াত) আসিবার পর আমরা কি তোমাদের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম? বস্তুত তোমরাই তো ছিলে অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত। যাহাদেরকে দুর্বল মনে করা হয় তাহারা দাম্ভিকদেরকে বলিবে, বস্তুত তোমরাই তো রাত্রিতে ও দিবসে চক্রান্ত করিয়া আমাদেরকে নির্দেশ দিতে যেনো আমরা আল্লাহ্‌কে না মানি এবং তাঁহার সমকক্ষ কোনো কিছুকে স্থাপন করি (অর্থাৎ শিরক করি)। যখন তাহারা 'আযাব প্রত্যক্ষ করিবে তখন অনুতাপ গোপন রাখিবে এবং আমি (আল্লাহ) কাফিরদের গলায় শিকলের বেড়ী পরাইব। উহাদেরকে উহারা যাহা করিত তাহারই প্রতিফল দেওয়া হইবে" (৩৪ ঃ ৩১-৩৩)।

(খ) ৩৩ ঃ ৬৭-৬৮ (সূরা আহযাব) ঃ

وَقَالُوْا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاۤءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَ . رَبَّنَا اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيْرًا .

"আর তাহারা বলিবে, হে আমাদের রব! আমরা আমাদের প্রধানদের ও ক্ষমতাবানদের আজ্ঞা পালন করিয়াছিলাম আর উহারা আমাদেরকে বিপথে পরিচালিত করিয়াছিল। হে আমাদের রব! উহাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং উহাদেরকে মহা অভিসম্পাত করুন" (৩৩ ঃ ৬৭-৬৮)।

(গ) ৪০ ঃ ৪৭-৪৮ (সূরা মুমিন) ঃ

وَاِذْ يَتَحَاجُّوْنَ فِى النَّارِ فَيَقُوْلُ الضُّعَفٰؤُا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْآ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُّغْنُوْنَ عَنَّا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ . قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْآ اِنَّا كُلٌّ فِيْهَا . اِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ .

"আর যখন উহারা জাহান্নামে পরস্পর তর্ক-বিতর্কে করিতে থাকিবে তখন দুর্বলেরা দাম্ভিকদেরকে বলিবে, আমরা তো কেবল তোমাদেরই অনুসরণ করিয়াছিলাম। এখন কি তোমরা আমাদিগকে হইতে জাহান্নামের অগ্নির কিয়ংদশ নিবারণ করিবে? দাম্ভিকেরা বলিবে, আমরা তো সকলেই ইহাতে (অগ্নিতে) আছি। নিশ্চয় আল্লাহ বান্দাদের বিচার তো করিয়া ফেলিয়াছেন" (৪০ ঃ ৪৭-৪৮)।[১]

প্রিয়নবী ﷺ-এর দাওয়াতী কার্যের বিরোধিতা করার সূত্রপাত হয় একেবারে উহার সূচনালগ্ন হইতেই। অন্যান্য ঘটনার মধ্যে আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) ও তালহা (রা) ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁহাদের উপর নিপীড়ন এবং কাফির-মুশরিকদের দ্বারা নিগৃহীত ও নিপীড়িত যাহাতে না হইতে হয় তাহা এড়াইবার জন্য মুসলিমগণ সংগোপনে নির্জন উপত্যকাসমূহে তাঁহাদের সালাতসমূহ সম্পাদন ইত্যাদি দৃষ্টান্তসমূহ হইতে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায়।[২] দারুল আর্কাম তাঁহাদের সভা-সমাবেশ ও সালাতের মিলনস্থল নির্ধারিত হওয়ার পূর্বে এইসব ঘটনা সংঘটিত হয়। এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইব্ন ইসহাক ইহাও বর্ণনা করিয়াছেন যে, কাফির-মুশিরকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বিরুদ্ধে তৎপর হয় নাই যতক্ষণ না তিনি তাহাদের দেব-দেবীসমূহ সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন এবং মিথ্যা ও বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন।[৩]

ইব্ন ইসহাকের এই আনুপূর্বিক বর্ণনার অর্থ ইহা নহে যে, প্রাথমিক পর্যায়ে এমন এক সময় ছিল যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দেব-দেবীদের ব্যাপারে নিশ্চুপ ছিলেন এবং তাহাদের মূর্তিপূজার ব্যাপারে কোনরূপ সমালোচনামুখর হইয়া উঠেন নাই। দেব-দেবীদেরকে বাতিল ঘোষণা করা এবং অদ্বিতীয় আল্লাহ্রই কেবল ইবাদত করাই হইতেছে তাওহীদের মর্মবাণী—যদ্দ্বারা ইসলামের প্রচারের কার্যক্রম সূচিত হইয়াছিল। ইহা ছাড়া আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রিয়নবী ﷺ -কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন, "উঠুন আর সতর্ক করুন এবং আপনার রব-এর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন" (৭৪ ঃ ২-৩)।

এই যে নির্দেশ তাহা সর্বসম্মতভাবে দীন প্রচার (রিসালা)-এর প্রারম্ভেরই আহ্বান হিসাবে বিবেচিত হয়। এই সমস্ত বিবরণের প্রেক্ষিতে ইব্ন ইসহাক প্রদত্ত বর্ণনা হইতে ইহাই অনুধাবন করা যায় যে, মক্কার নেতৃবৃন্দ তাহাদের বিরোধিতা শুরু করে একটি নির্ধারিত মতলব আঁটিয়া এবং এই কারণে তাহারা সংগঠিত হইতে থাকে। যখনই তাহারা উপলব্ধি করে যে, এই নূতন আন্দোলন তাহাদের পুরোহিত শ্রেণী এবং আরবদের প্রধান প্রধান দেব-দেবীরা সংস্থাপিত রহিয়াছে

যে কা'বা গৃহে তাহার তত্ত্বাবধায়কদের প্রতি এক মারাত্মক হুমকি। বস্তুত ইব্ন ইসহাকের এই বর্ণনা তাঁহার অন্য এক বর্ণনার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নহে। কারণ তিনি অন্য এক বর্ণনায় বলিয়াছেন যে, দাওয়াতী কার্যক্রমের তৃতীয় বর্ষের শেষের দিকে প্রকাশ্যে বা সর্বসাধারণ্যে ইসলাম প্রচার করা শুরু হয়। যদি এই দুইটি বর্ণনা একত্র করিয়া বিচার করা হয় তাহা হইলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, দৃঢ় সংকল্পিত ও সংঘবদ্ধ বিরোধিতার সূচনা হয় সর্বসাধারণ্যে প্রচারের প্রারম্ভেই। পূর্বে ইসলামের প্রতি যে বিরোধ তাহা প্রধানত ছিল পরিবার ও ব্যক্তি পর্যায়ে এবং কিছুটা পরিবারের বাধ্যবাধকতা ও দমন নিগ্রহে ধর্মান্তরিত হওয়ার ফলে উদ্ভূত অবস্থাতে যদিও কখনও কখনও দলবদ্ধ বিরোধিতায় মাথাচাড়া দিয়া উঠিতেছিল। যেমনটি দেখা যায় ঐ ঘটনায় যাহা মুসলিমগণকে সভার স্থান দারুল আরকামকে তাহাদের সভাস্থল নির্ধারণ করিতে বাধ্য করায়। ইব্ন সা'দ বিরোধী নেতৃবৃন্দের একটি ব্যাপক তালিকা দিয়াছেন। এই তালিকা ইব্ন ইসহাকসহ অন্যান্য সকলের দ্বারাই কম-বেশি সমর্থিত, গৃহীত ও অনুমোদিত হইয়াছে, যাহাতে প্রধান প্রধান প্রতিপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, বিভিন্ন ঘটনার বিবরণ সহকারে। গোষ্ঠী, বংশ বা গোত্র অনুযায়ী বিন্যস্ত করিয়া নিম্নে তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

১.	আবূ লাহাব	বনূ হাশিম
২.	আবূ জাহ্ল	বনূ মাখ্যূম
৩.	আল-ওয়ালীদ ইব্নুল মুগীরা	বনূ মাখ্যূম
৪.	আবূ কায়স ইব্নুল ফাকিহ্	বনূ মাখ্যূম
৫.	যুহায়র ইব্ন আবী উমায়্যা	বনূ মাখ্যূম
৬.	আস-সাইব ইব্ন সায়ফিয়্যা ইব্ন আবিদ	বনূ মাখ্যূম
৭.	আল-আসওয়াদ ইব্ন 'আব্দিল আসাদ	বনূ মাখ্যূম
৮.	আল-আসওয়াদ ইব্ন 'আব্দ ইয়াগূছ	বনূ মাখ্যূম
৯.	আল-হারিছ ইব্ন কায়স ইব্ন 'আদিয়্যি (অন্যভাবে ইবনুল গায়তালাহ্ নামেও পরিচিত)।	বনূ 'আদিয়্যি
১০.	উমায়্যা ইব্ন খালাফ	বনূ জুমাহ্
১১.	উবায়্য ইব্ন খালাফ (উমায়্যা ইব্ন খালাফের ভাই)	বনূ জুমাহ্
১২.	আল-'আস ইব্ন ওয়াইল	বনূ সাহ্ম
১৩.	মুনাব্বিহ্ ইব্নুল হাজ্জাজ	বনূ সাহ্ম
১৪.	আল্-নাদর ইব্নুল হারিছ	বনূ 'আবদিদ দার
১৫.	আল-'আস ইব্ন সা'ঈদ ইব্নুল 'আস	বনূ উমায়্যা (বনূ আব্দ শাম্স)

১৬.	'উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত (মুঈত)	বনূ উমায়্যা (বনূ আব্দ শাম্স)
১৭.	ইব্নুল আস'দা আল-হুযালী	বনূ উমায়্যা (বনূ আব্দ শাম্স)
১৮.	আল-হাকাম ইব্ন আবিল 'আস	বনূ উমায়্যা (বনূ আব্দ শাম্স)
১৯.	আল-'আস ইব্ন হাশিম (আবুল বাখতারী)	বনূ আসাদ
২০.	'আদিয়্যি ইবনুল হাম্রা	বনূ ছাকীফ

এই সমস্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রিয়নবী ﷺ -এর বদ্ধমূল মারাত্মক শত্রু ছিল আবূ জাহ্ল্, আবূ লাহাব এবং 'উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত। ইব্ন সা'দ আরও কয়েকজনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা হইতেছে ঃ বনূ আব্দ শাম্সের উতবা ইব্ন রাবী'আ ও তাহার ভ্রাতা শায়বা ইব্ন রাবী'আ এবং বনূ উমায়্যার আবূ সুফ্য়ান। ইহারা ছিল বিরোধী দলের নেতা। ইব্ন সা'দ বলেন, ইহারা নরমপন্থী শত্রু ছিল।[৪] 'উতবা যেভাবে প্রহার করিয়া আবূ বাক্র (রা)-কে অজ্ঞান করিয়া ফেলে তাহাতে ইহা প্রমাণিত হয় না যে, 'উত্বা আচরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নরমপন্থী ছিল। যদিও তাহার পরবর্তী সময়ের ভূমিকা ইব্ন সা'দের মূল্যায়নকে সমর্থন করে। একইভাবে আবূ সুফ্য়ানের প্রাথমিক কর্মকাণ্ড যাহাই হউক না কেন তাহার পরবর্তী সময়ের ভূমিকা তাহাকে একজন নরমপন্থী শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে না। এখানে উল্লিখিত ব্যক্তিদের মধ্যে চরম অন্যন্যোপায় অবস্থায় উপনীত হইয়া শেষমেশ আবূ সুফ্য়ান ও আল-হাকাম ইব্ন আবুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করেন। অবশ্য আরও বেশ কিছু নেতা ছিল যাহাদের নাম উল্লেখ এখানে করা হয় নাই। যেমন বনূ আসাদের কুরায়শ সিংহ নাওফাল ইব্ন খুওয়ায়লিদ ইব্ন আসাদ এবং বনূ আমের ইব্ন লু'আয়্যি-এর সুহায়ল ইব্ন 'উমায়র। শেষোক্ত ব্যক্তির কুরায়শের মধ্যে বেশ নাম-ডাক ছিল। এই সেই ব্যক্তি যে তাহাদের পক্ষে প্রিয়নবী ﷺ-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন করিয়াছিল।

এই নেতৃবৃন্দের অবস্থান খুবই কঠিন ও জটিল ছিল। ইহা ছাড়াও তাহারা ঐতিহ্যগত গোত্রীয় কোন্দল ও রক্তের প্রতিশোধের কলহে লিপ্ত ছিল। তাহাদের ইতিহাসে, সম্ভবত মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম রক্ষণশীল নেতৃবৃন্দের একটি গোষ্ঠী আকস্মিকভাবে এমন এক মহাবিপ্লবী চিন্তাধারার সম্মুখীন হইল যাহা তাহাদের সমগ্র সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের দিক নির্দেশন স্বরূপ আবির্ভূত হইল।এই কারণে এই অবস্থায় তাহাদের সাড়া ও প্রতিক্রিয়া ছিল সর্বদা বহুমুখী, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর এবং সময়ে সময়ে হতাশাব্যঞ্জক। শক্তিধর আবূ জাহ্ল বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে বনূ মাখযূমের ব্যাপারে বাহাদুরি ফলানোর উদ্যোগ লইল, কিন্তু সে এই কঠিন সত্য হইতে তাহার নিজের বা অন্যদের চক্ষুদ্বয় বন্ধ রাখিতে পারে নাই। তাহার নিজ গোত্রেরই বিপুল সংখ্যক লোক, এমনকি তাহার সৎ ভ্রাতাই এই নূতন দীন (ইসলাম) কেবল গ্রহণই করেন নাই, বরং তাহার গোত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য আরকাম ইব্ন আবুল আরকাম (রা)-এর মত ব্যক্তিত্বও তাঁহার নিজ গৃহকে মুসলিমগণের জন্য ইবাদতগাহ্ ও সভাস্থলে পরিণত করিয়াছিলেন।

একইভাবে উত্‌বা ইব্‌ন রাবী'আ, যদিও সে আবূ বাক্‌র (রা)-কে মারধর করিয়া অজ্ঞান করিয়া ফেলিয়াছিল, সেও তাহার পুত্র আবূ হুযায়ফার বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। হুযায়ফা (রা) ছিলেন প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। বনূ আসাদের কুরায়শ সিংহ নাওফাল ইব্‌ন খুওয়ায়লিদ ইব্‌ন আসাদের ব্যাপারও ঐ একই রকমের। তিনি আবূ বাক্‌র (রা) ও তালহা (রা)-কে ইসলামে দাখিল হইবার কারণে এক সময় একসঙ্গে শাস্তি দিবার জন্য বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনিই ইসলামে দাখিল হইয়া তাঁহাদের আপদে-বিপদে, কষ্টে-নির্যাতনে সারা জীবনের সঙ্গী হিসাবে পরিণত হইয়াছিলেন। শুধু কি তাই, প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী তাহার নিজ পুত্র আল-আসওয়াদ ইব্‌ন নাওফাল-এর প্রতি যে নির্যাতন চালাইয়াছিলেন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। এখানে ইসলামের সেই প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন গোত্র, উপগোত্র ও পরিবার তাহাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল—তাহার সামান্য কয়েকটি নজীর উপস্থাপন করা হইল বিষয়টি সম্যকভাবে দেখাইবার জন্য। স্পষ্টতই এই অবস্থাতে প্রাচীন কালের দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের যে ধরন ছিল তাহা অকার্যকর হইয়া গিয়াছিল।

অবস্থার জটিলতা স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীদের দ্বারা গৃহীত কৌশল ও নিয়ম-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও চরম জটিলতার সৃষ্টি করিল। বস্তুত স্বাভাবিকভাবেই তাহারা (কাফির -মুশরিক) এই আন্দোলনকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে উপেক্ষা করিল, এমনকি রসূলুল্লাহ ﷺ-এর আন্দোলনকে স্তব্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে বিদ্রূপ ও উপহাস করিতে লাগিল। একই সময় তাহারা আরও মারাত্মক উপায় প্রয়োগ করিল। যেমন– যাঁহারা ঈমান আনয়ন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহাদের পাইল তাঁহাদের উপর জোর-জবরদস্তি ও দৈহিক নির্যাতন প্রয়োগ করিতে লাগিল। তাহারা বনূ হাশিম ও 'আবদুল মুত্তালিবের উপর প্রিয়নবী ﷺ -এর তাওহীদ প্রচারকে থামাইবার জন্য চাপ প্রয়োগ করিতে লাগিল। কখনও কখনও তাহারা একটা আপোস-মীমাংসারও প্রস্তাব আনয়ন করিল। আবার এক পর্যায়ে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্তও গ্রহণ করিল এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা বাস্তবায়নেরও কয়েকবার প্রচেষ্টা চালায়। যুগপৎভাবে তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে নানা যুক্তি-তর্ক ও আপত্তির অবতারণা করিল এবং এমনও দাবি করিল যে, তিনি অলৌকিকতা এবং অন্যান্য অস্বাভাবিক কার্য (যাদু ইত্যাদি) সম্পাদন করেন।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত কৌশল ও পদক্ষেপ বিরোধিতা গড়িয়া উঠিবার বিভিন্ন স্তর নহে, বরং যাহা দ্বারা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আনীত বিভিন্ন সময় নানা ধরনের বিরুদ্ধাচরণ দাওয়াতের সূচনাক্ষণ হইতেই শুরু হইয়াছিল। নেতৃবৃন্দের নিজেদের ব্যাপারে এবং তাহাদের মিত্রদের ব্যাপারে অর্পিত কাজ যতদূর সম্ভব দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একদিকে তাহারা তাহাদের গোত্র-উপগোত্রগুলিকে প্রস্তুত করিতেছিল অথবা তাহাদের পরিবারসমূহের কর্তাদের ও প্রধানদের সংগঠিত করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার গোত্রের বিরুদ্ধে এই গোত্র আবূ তালিবের নেতৃত্বে দৃঢ়ভাবে সকলেই (আবূ লাহাব ব্যতীত) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষা করিতেছিলেন। অন্যদিকে নেতৃবৃন্দ ইহার জন্যও গোত্র-উপগোত্রগুলিকে সংগঠিত করিতেছিল

যাহাতে যে সমস্ত গোত্র-উপগোত্রের সদস্য ইসলামে দাখিল হইয়াছে তাঁহাদের বিরুদ্ধে তাহারা রুখিয়া দাঁড়ায় এবং তাহা কেবল শাস্তি এবং নির্যাতনের জন্যই নহে, বরং তাহাদেরকে সমাজচ্যুত ও বহিষ্কৃত করিবার জন্য। আর এইভাবে তাঁহাদেরকে তাঁহাদের নিজ নিজ গোত্রের সংরক্ষণের চৌহদ্দী হইতে বহির্গত করিতে বদ্ধপরিকর হয়।

শেষোক্ত উপায়ে নেতৃবৃন্দ কিছুটা আদর্শিক পথে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাদের বিরোধিতা সংগঠিত করে। অর্থাৎ ইসলাম যে তাহাদের বাপ-দাদার ধর্মকে নসাৎ করিতেছে এই যুক্তি দাঁড় করাইয়া তাহারা ময়দানে নামে। ইহা করিতে গিয়া তাহারা যে পদ্ধতিকে সংরক্ষণ করিতে চাহিতেছিল প্রকৃতপক্ষে তাহাকেই ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। কেননা যখন লোকজনকে বুঝানো হইল যে, তাহাদের গোত্র, পরিবার, এমনকি সন্তানদের ক্ষেত্রে বিবেচনা দমিত করিয়া প্রতিরোধ গঠন করা হউক তখন তাহারা অনিবার্যভাবে অন্তরের অন্তস্থল হইতে তৎপর হইল। তখন তুলনামূলক অবস্থার নিরিখে দেখা গেল ইহার পক্ষে যেমন বেশ কিছু লোক রহিয়াছে আর বিপক্ষেও রহিয়াছে অনেক। বহু ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান ও ঘটনার মত ইহা মক্কাবাসীর বিরোধিতার বীজ ইহার বক্ষ গভীরে অঙ্কুরিত হইতেছিল যাহা ইহার নিজের মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল।

প্রিয়নবী ﷺ -এর দিকে প্রকাশ্যে মানুষকে আহ্বানের সূচনা করিবার প্রায় এক বৎসরেও কিছুটা পরে মক্কার কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ তাহাদের নিজেদের অবস্থানকে তাহাদের নিজেদের দলত্যাগীদের বিরুদ্ধে সুসংহত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগে। ইহার ফলে যে সমস্ত গোত্রের লোকজন ইসলামে ইতোমধ্যে দাখিল হইয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা স্ব-গোত্রের নেতৃবৃন্দের চক্ষু রাঙানির তোয়াক্কা না করিলেও নিজেদের নিরাপত্তার অভাব এত তীব্রভাবে অনুভব করেন যে, ইসলাম প্রচারের পঞ্চম বর্ষের প্রথমদিকে অনেকেই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে সেই বৎসরের মধ্যভাগে (প্রিয়নবী ﷺ-এর নির্দেশক্রমে) আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। অন্যদিকে তাহাদের মধ্যে এইরূপ ঐক্য সামগ্রিকভাবে বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিবের বিরুদ্ধে যৌথভাবে আন্দোলন পরিচালনা করিতে নেতৃবৃন্দকে প্ররোচিত করিয়া তোলে। অবশ্য তাহারা এই ব্যাপারে সফলতা লাভ করে। ইহাদের বিখ্যাত বয়কট এবং অবরোধ সৃষ্টির মাধ্যমে এই ঘটনা ঘটে ষষ্ঠ বর্ষের শেষের দিকে অথবা সপ্তম বর্ষের প্রারম্ভে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্বে বিরোধিতার মূল কারণসমূহ এবং ইহার রকমসমূহ ও কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা দরকার।

দুই ঃ বিরোধিতার কারণসমূহ

ইবন ইস্‌হাক উপরিউক্ত বর্ণনায়[৫] বস্তুত প্রিয়নবী ﷺ-এর ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মক্কার নেতাদের বিরোধিতার প্রধান কারণ সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহারা কা'বাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের সামাজিক, ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই কা'বা শরীফের কারণেই

মক্কা প্রকৃতপক্ষে আবরদেশের ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। মক্কার নেতারা তাহাদের কা'বার তত্ত্বাবধায়কের মর্যাদার কারণেই পৌরহিত্য ও ধর্মীয় নেতার মর্যাদা লাভ করিয়াছিল। এই ভূখণ্ডের সর্বত্র ছড়াইয়া ছিটাইয়া থাকা আরবীয় জাতি-উপজাতির মধ্যে তাহাদের আচার-আচরণের মাধ্যমে সামাজিক প্রতিষ্ঠা ব্যবহার করিয়া আরবের বাণিজ্যিক অভিজাত শ্রেণী হিসাবে আবির্ভূত হয়। মক্কা মুকাররমা এবং সন্নিহিত বিভিন্ন এলাকার মেলাসমূহ ও হাট-বাজার কা'বার কারণে জমজমাট হইয়া উঠিয়াছিল ও হজ্জসহ নানা ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিও এই জমজমাটের অবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

পারস্য ও বায়যানটাইন (প্রাচ্য রোম) সাম্রাজ্য দুইটির মধ্যে দীর্ঘকালীন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘাতের সুযোগ গ্রহণ করিয়া মক্কার কুরায়শ নেতৃবৃন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে সমগ্র ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্যে স্বত্বভোগ (Middle man) হিসাবে নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করিয়াছিল। তাহারা পূর্ব আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, চীন ও দূরপ্রাচ্য হইতে আমদানিকৃত পণ্যসামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহা সিরিয়ায় লইয়া যাইত। আর রোম সাম্রাজ্যের বণিকদের পাশ্চাত্য জগতের পণ্যসামগ্রী খরিদ করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব আরবের বন্দরগুলিতে লইয়া আসিত। সেখান হইতে ঐ সমস্ত পণ্যসামগ্রী এশিয়া ও আফ্রিকার বণিকগণ খরিদ করিয়া লইয়া যাইত।

এই সমস্ত লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবাদে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বাণিজ্য পথগুলিতে বসবাসরত আরব উপজাতিসমূহের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট বাণিজ্য সড়ক এলাকায় বসবাসরত অধিবাসীদের নিকট হইতে পণ্য সামগ্রী এবং কাফেলার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সহযোগিতা ও সমর্থন লাভের জন্য কখনও কখনও কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের নানা ধরনের উপহার সামগ্রী ও অর্থ-কড়ি প্রদান করিত। তাহাদের সমর্থন ও মিত্রতা বজায় রাখিবার নিশ্চিত দায়িত্ব গ্রহণের অঙ্গীকার প্রদানের কারণে তাহাদের কা'বা কেন্দ্রিক ধর্মীয় বন্ধন এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মর্যাদা ইহার (কা'বার) তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে সুদৃঢ় হয়।

সেই কারণে যখন তাহাদেরকে মূর্তিপূজা করিতে নিষেধ করা হইল তখন মক্কার নেতৃবৃন্দ ইহার মধ্যে তাহাদের মর্যাদার প্রতি এক বড় ধরনের আঘাত দেখিতে পাইল। কেননা তাহারাই ছিল পুরোহিত শ্রেণীর অন্তর্গত এবং তাহারাই ছিল কা'বার তত্ত্বাবধায়ক। ইহা তাহাদের বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক অবস্থানের প্রতিও ছিল এক বিরাট হুমকি। তাহারা উপলব্ধি করিল যে, যদি তাহারা প্রিয়নবী ﷺ-এর দাওয়াত কবুল করিয়া লয় তাহা হইলে তাহারা শুধু যে উপজাতি ও গোত্রসমূহের আনুগত্যই হারাইবে তাহা নহে, বরং তাহাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত গোত্রীয় বিদ্রোহের মুকাবিলা করিতে হইতে পারে, যাহার ফলে কা'বার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব অন্যদের কবজায় চলিয়া যাইতে পারে।

মক্কার নেতৃবৃন্দ সে কারণে আশঙ্কাগ্রস্ত হইয়া পড়িল যে, হয়ত তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি হইবে, তাহাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থানগত মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে, এমন কি তাহাদের মক্কায় বসবাস করা, মক্কার উপর কর্তৃত্ব করা আর সম্ভব হইবে না। সমগ্র আরবদেশের ধর্মীয় ও

বাণিজ্যিক কেন্দ্র মক্কা তাহাদের বেদখল হইয়া যাইবে। বস্তুত তাহারা তাহাদের এই আশঙ্কার কথা গোপন রাখে নাই। যখন আবূ লাহাব প্রিয়নবী ﷺ-এর প্রথম ভোজসভায় বলিল, বনূ হাশিম ও অন্যান্য কুরায়শ গোত্র আরবের সমস্ত গোত্র-উপগোত্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে মুকাবিলা করিবার অবস্থানে নাই, তখন সে বস্তুত মক্কার নেতৃবৃন্দের এই আশঙ্কার কথাই বলিয়াছিল। কুরআনে তাহাদের এই আশঙ্কার কথা সুস্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُوْا اِنْ نَّتَّبِعِ الْهُدٰى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ اَرْضِنَا .

"উহারা বলে, আমরা যদি তোমার সহিত সৎপথ অনুসরণ করি তবে আমাদেরকে দেশ হইতে উৎখাত করা হইবে" (২৮ ঃ ৫৭)।

তাহাদের এই আশঙ্কা যে ভিত্তিহীন ছিল কুরআন মজীদ তাহা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করে। কেননা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু কা'বার মর্যাদাকে আরও সমুন্নত করিয়া দিয়াছিলেন এবং ইহার মাধ্যমেই কুরায়শ গোত্রসমূহ তাহাদের মর্যাদা ভোগ করিতে পারিত। উপরিউক্ত ২৮ নম্বর সূরার ৫৭ নম্বর আয়াতের শেষাংশে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَّهُمْ حَرَمًا اٰمِنًا يُّجْبٰى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَىْءٍ رِّزْقًا مِّنْ لَّدُنَّا وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ .

"আমি কি উহাদেরকে এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করি নাই, যেখানে সর্বপ্রকার ফলমূল আমদানি হয় আমার দেওয়া রিযিকস্বরূপ? কিন্তু উহাদের অধিকাংশই তাহা জানে না।"

আমরা জানি, প্রিয়নবী ﷺ মক্কার নেতৃবৃন্দের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হওয়ার আশংকাকে তিরোহিত করিবার লক্ষ্যে তাহাদেরকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, যদি তাহারা সত্যকে গ্রহণ করিয়া লয় তাহা হইলে তাহারা তাহাদের মর্যাদাকে হারাইবে না, বরং সমগ্র আরবের উপর তাহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং তাহারাই হইবে পারস্য ও রোমান সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্তা।

তাহাদের বিরোধিতার আর একটি সমান গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিহিত ছিল তাহাদের জীবন যাপনের ধারায়। যুগ যুগ ধরিয়া আরব গোত্র-উপগোত্রসমূহ বিশেষ করিয়া তাহাদের নেতৃবৃন্দ (শায়খ) কতকগুলি লাগামছাড়া স্বাধীনতা এবং বেপরোয়া গোষ্ঠীগত প্রথা ও মূল্যবোধ ব্যতিরেকে অন্য কোন সুসংগত নিয়ম-কানুন ও দায়-দায়িত্বের ধার ধারিত না। তাহারা লাগামহীন স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতায় অভ্যস্ত ছিল। লাম্পট্য, ব্যভিচার, বলাৎকার, হত্যা, লুণ্ঠন, প্রতারণা এবং কাজে-কর্মে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে একেবারে বিবেক বর্জিত দরকষাকষি, দরিদ্র শ্রেণীর প্রতি অসদ্ব্যবহার, দুর্বল ও ইয়াতীমের প্রতি দুর্ব্যবহার, কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়া এবং এমনি আরও বহু অমানবিক ও জঘন্য কার্যাবলী ছিল তখনকার নিত্যদিনকার ঘটনা। গোত্রে গোত্রে প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলিত ছিল, কথায় কথায় খুনাখুনি ও যুদ্ধ লাগিয়াই থাকিত, গোত্রীয় প্রতিশোধের স্পৃহা ছাড়া এইগুলির প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা ছিল না।

এই সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ ﷺ সোচ্চার হইলেন। তিনি আরবদেরকে আহ্বান করিলেন একটি অতি উন্নত ও সংশোধিত জীবনের দিকে এবং একটি আলোকিত নূতন সমাজ ও সামাজিক বন্ধনের দিকে—যাহার ভিত্তি ছিল আসমানী আচরণ বিধি এবং পথনির্দেশক কিতাবের উপর। ইহা নির্দেশ করে ব্যক্তির প্রত্যেক ছোট ও বড় কর্মের দায়িত্ববোধের প্রতি, যাহারা পাপ কার্যে লিপ্ত হয় তাহাদের জন্য রহিয়াছে দণ্ডবিধি। আর তাহা শুধু এই দুনিয়াতেই নহে, বরং হাশরের দিনে আল্লাহ্র সম্মুখে হাজির হইয়া বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে। সেদিন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে জীবন্ত করিয়া উঠান হইবে। ইহা অতি গুরুত্ব সহকারে পথনির্দেশ করে যে, এই পার্থিব জীবনই শেষ জীবন নহে, এখানেই মানুষের অস্তিত্বের সমাপ্তি ঘটে না, বরং মৃত্যুর পরেও রহিয়াছে এক অনন্ত জীবন, যেখানে এই পার্থিব জীবনের কর্মের আলোকে সেই অনন্ত জীবনের ব্যক্তির অবস্থান কি হইবে তাহা নির্ধারিত হইবে।

ইসলামের শিক্ষা এইভাবে সুবিধাভোগী সমাজ ও সামাজিক বন্ধনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে যাহা গ্রহণ করা গোত্রীয় নেতাদের পক্ষে সহজ ছিল না। ইহাকে গ্রহণ করার অর্থ যুগ-যুগ পুরাতন ঐতিহ্যিক জীবনকে ত্যাগ করা। ইসলামের প্রতি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণের প্রধান কারণই ছিল একদিকে লাগামহীন স্বাধীনতার মেযাজ ও উচ্ছৃঙ্খলতা এবং অন্যদিকে আইনের শাসন নীতি দায়িত্ববোধসম্পন্ন শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতা—এই দুইয়ের মধ্যে সংঘাত। এই কারণ এবং পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে উল্লিখিত অন্যান্য কারণগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা সত্ত্বেও এবং আল্লাহ্ই যে মহান রব ইহা জানা সত্ত্বেও তাহারা জানিয়া শুনিয়াই মূর্তিপূজা ছাড়িয়া দিয়া আল্লাহ্র দেওয়া বিধান অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী ও জীবন নির্বাহ করিতে রাজি হইল না।

তাহাদের মনোভাবের একটি প্রকৃষ্ট নজীর হইতেছে, তাহাদের বিরোধিতার একটি বিশেষ পর্যায়ে আসিয়া তাহারা প্রিয়নবী ﷺ -এর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব মানিয়া লইতেও সম্মত হইয়াছিল, তাঁহাকে তাহাদের শাসক ও রাজা হিসাবে স্বীকৃতি দিতেও রাজি হইয়াছিল, কিন্তু ইসলাম ও আল-কিতাব মানিয়া লইতে রাজি ছিল না। তাহারা ভাবিয়াছিল শুধু প্রিয়নবী ﷺ-এর ব্যক্তিগত নেতৃত্ব মানিয়া লইলে তাহাদের ঐতিহ্যকে জীবনধারার পরিত্যাগ করিবার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হইবে না এবং বিষয়টির পরিসমাপ্তি ঘটিবে প্রিয়নবী ﷺ-এর জীবন পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যদি ইসলাম গ্রহণ করা হয় তাহা হইলে আসমানী প্রত্যাদিষ্ট কিতাবে যে সমস্ত আচরণবিধি রহিয়াছে তাহা চির বিদ্যমান থাকিবে এবং সেগুলি পালন করিতে বাধ্য থাকিতে হইবে। ইহা তাহাদের নিকট অন্য রকমের ব্যাপার হিসাবে দেখা দেয়। বিনা কারণে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এই কথা বলিত ঃ "আমরা এই কুরআনে কখনও বিশ্বাস করিব না, ইহার পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও নহে"।[৬] ইহাতে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, তাহাদের আপত্তি শুধু প্রিয়নবী ﷺ যাহা তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাতেই ছিল না, বরং যে কোন ধরনের লিখিত আচরণ বিধিতেও তাহাদের আপত্তি ছিল।

উপরোল্লিখিত কারণের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল, সমাজে নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের ক্ষেত্রে তাহাদের যে অবস্থানগত মর্যাদা তাহা হারাইবার ভয় তাহাদের মধ্যে দানা বাঁধিয়াছিল। তাহাদের অহংকার ও ঔদ্ধত্য তাহাদের মর্যাদা রক্ষায় প্রবল আকার ধারণ করে। গোত্রীয় ও উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে এমনভাবে উপস্থাপন করিত যে, তাহারাই নির্দেশ জারি করিবে এবং অন্য সকলে তাহাদিগকে অনুসরণ করিবে; এমনভাবে নয় যে, তাহারা অন্যের অনুসরণ করিবে।

তাহারা মনে করিত, ইসলামকে গ্রহণ করিলে তাহাদের সামাজিক মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার বস্তুত পরাজয় ঘটিবে এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব বিষয়ে আসমানী নিযুক্ত নেতা হিসাবে আল্লাহ্‌র রাসূলের প্রতি বাধ্যগত হওয়া অপরিহার্য হইয়া যাইবে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ পরিবর্তিত অবস্থা মানিয়া লওয়ার মধ্যে অসুবিধা দেখিতে লাগিল, বিশেষ করিয়া এমন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিতে হইবে যিনি লালিত-পালিত হইয়াছেন তাহাদের মধ্যেই, এখনও যিনি তারুণ্যের বয়স অতিক্রম করেন নাই এবং এযাবতকাল তিনি বিত্তবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন না। অবশ্য কুরায়শ নেতারা এক পর্যায়ে প্রিয়নবী ﷺ -কে তাহাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করিবারও প্রস্তাব রাখে.যে সম্পর্কে আগে উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সেই প্রস্তাবে এই শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, প্রিয়নবী ﷺ-কে দীন প্রচার হইতে বিরত থাকিতে হইবে এবং তাহাদের এই প্রস্তাবের মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তাহা হইতেছে, কৌশলে ইসলামের সমাজ পরিবর্তনের বৈপ্লবিক আহ্বান হইতে নিজেরদেরকে রক্ষা করা। বস্তুত প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা অনুধাবন করিয়াছিল যে, নবী ﷺ যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য, তবুও তাহাদের আত্মম্ভরিতা, লোকবল ও ঐতিহ্যিক সামাজিক মর্যাদা তাহাদেরকে উদ্ধত করিয়া তুলিয়াছিল এবং সত্যকে মানিয়া লইতে বাঁধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের এই ঔদ্ধত্য প্রসঙ্গে কুরআন মজীদে একাধিক উল্লেখ রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ "যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি উহার বিত্তশালীরা বলিয়াছে, তোমরা যাহাসহ প্রেরিত হইয়াছ আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করি। উহারা আরও বলিত, আমরা ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী। আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেওয়া হইবে না" (৩৪ ঃ ৩৪-৩৫)।[৭]

অন্য আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "যাহারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না তাহাদের অন্তর (সত্যকে জানা সত্ত্বেও) সত্যবিমুখ এবং তাহারা উদ্ধত" (১৬ ঃ ২২।[৮]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "দুর্ভোগ প্রত্যেক ঘোর মিথ্যাবাদী পাপীর, যে আল্লাহ্‌র আয়াতসমূহের তিলাওয়াত শোনে অথচ ঔদ্ধত্যের সহিত (কুফ্‌রীর উপর) অটল থাকে সে উহা শোনে নাই। উহাকে সংবাদ দাও মর্মন্তুদ শাস্তির" (৪৫ ঃ ৭-৮)। "যখন উহার নিকট আমার আয়াত তিলাওয়াত করা হয় তখন সে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে মুখ ফিরাইয়া লয়" (৩১ ঃ ৭)।[১০] আল্লাহ আরও বলেন ঃ "ইহারা দৃঢ়তার সহিত আল্লাহ্‌র শপথ করিয়া বলিত যে, ইহাদের নিকট কোন সতর্ককারী আসিলে ইহারা অন্য সকল সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের অধিকতর অনুসারী হইবে;

কিন্তু ইহাদের নিকট যখন সতর্ককারী আসিল তখন তাহা কেবল উহাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি করিল—পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য প্রকাশ ও কূট ষড়যন্ত্রের কারণে"।[১১]

কতিপয় নেতার মধ্যে বিরোধিতার প্রধান কারণ ছিল তাহাদের গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার মানসিকতা। বিশেষভাবে এই মানসিকতা বানূ মাখ্যূম-এর আবূ জাহ্লের মধ্যে লক্ষণীয়। প্রধানত কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন অধিকার ও শুল্কাদির ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য বনূ হাশিম (বনূ 'আব্দ মানাফ) ও বনূ মাখযূম-এর মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী কোন্দল বিদ্যমান ছিল। বনূ হাশিম হইতে আল্লাহ্র রাসূলের আবির্ভাব হওয়ায় আবূ জাহ্ল এই কোন্দলের আলোকে বিবেচনা করিতে থাকে এবং এই বিষয়টি সে গোপন রাখে নাই। বর্ণিত আছে যে, সে এবং অন্য দুইজন নেতা আবূ সুফ্য়ান ও শারীক ইব্ন আখনাস একদা রাত্রিবেলায় প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট হইতে কুরআন মজীদের তিলাওয়াত অতি গোপনে শুনিয়া যখন গৃহে ফিরিতেছিল তখন পথিমধ্যে শেষোক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ শারীক ইব্ন আখনাস আবূ জাহ্লের নিকট যাইয়া একান্তে সে যাহা শ্রবণ করিয়া আসিয়াছে সে সম্পর্কে তাহার অভিমত জানিতে চাহিল। সে (আবূ জাহ্ল) অবজ্ঞাসূচক ক্রোধের সহিত উত্তরে বলিল, আমি ইহা কি শুনিলাম? আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেছি বনূ 'আব্দ মানাফের সহিত মর্যাদা ও নেতৃত্বের জন্য। তাহারা জনগণকে খাওয়ায়, আমরাও জনগণকে খাওয়াই। তাহারা অন্যান্যদের সহায়তা করে পরিবহনের মাধ্যমে, আমরাও তাহা করি। তাহারা দান করে, আমরাও দান করি, এমনকি একটি ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় দুইটি ধাবমান ঘোড়ার ন্যায় কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সমান তালে চলিতেছি। এখন তাহারা বলে, আমাদের মধ্য হইতে একজন নবী আবির্ভূত হইয়াছেন–যাঁহার নিকট আসমান হইতে ওহী নাযিল হয়। এখন কেমন করিয়া আমরা ইহা পাইব? আমরা কখনও ইহাতে ঈমান আনিব না অথবা ইহাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইব না।[১২] প্রায় অনুরূপ গোত্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বী মানসিকতা বনূ উমায়্যার নেতাদের আচরণেও বিদ্যমান ছিল।

পর্যায়ক্রমে সর্বশেষ তবে কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, কারণ গোত্রীয় রক্ষণশীলতা এবং ঐতিহ্যপ্রীতি ছিল বিরুদ্ধাচরণের উপকরণ। নেতারা প্রায়শ তাহাদের বাপ-দাদার ধর্ম পালন টিকাইয়া রাখিবার জন্য আহ্বান জানাইত। প্রিয়নবী ﷺ যে এক আল্লাহ্তে ঈমান আনয়নের কথা বলিতেছেন, যে সমস্ত অনুশাসন পালন করিতে বলিতেছেন এবং দোযখের অগ্নি-শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করিয়া দিতেছেন এই সমস্তকে কাফির-মুশরিকরা ভ্রম অথবা মূর্খতাপূর্ণ বলিয়া বিদ্রূপ করিত। অথচ সাধারণ জনগণের মধ্যে এই অনুভূতি ব্যাপকভাবে ছিল যে, নেতৃবৃন্দ আল্লাহ্র রাসূলের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তাহাদেরকে ব্যবহার করিবার মতলবে আছে। কুরআন মজীদে বেশ কিছু আয়াতে এই আচরণের উল্লেখ রহিয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَا اِلاَّ رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُكُمْ (٣٥ : ٤٣) .

"ইহাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয় তখন ইহারা বলে, তোমাদের পূর্বপুরুষ যাহার ইবাদত করিত এই ব্যক্তিই তো তাহার ইবাদতে তোমাদেরকে বাধা দিতে চাহে" (৩৪ ঃ ৪৩)।

بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ . وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثٰرِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ (٤٣ : ٢٢-٢٣) .

"বরং উহারা বলে, আমরা তো আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি। এইভাবে যখনই আমি তোমার পূর্বে কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিয়াছি তখনই উহার সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিরা বলিত, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে পাইয়াছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি" (৪৩ ঃ ২২-২৩)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَاءَنَا (٣١:٢١).

"উহাদেরকে যখন বলা হয়, আল্লাহ যাহা নাযিল করিয়াছেন তাহা অনুসরণ কর তখন উহারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদিগকে যাহাতে পাইয়াছি তাহারাই অনুসরণ করিব" (৩১ ঃ ২১)।[১৩]

তিন ঃ তাৎক্ষণিক অভিযোগসমূহ এবং ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

(ক) উন্মাদনা এবং সৎপথ হইতে বিপথগামী হওয়ার অভিযোগ ঃ মক্কার কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতার প্রাথমিক পর্যায়ের কৌশলসমূহের অন্যতম ছিল প্রিয়নবী ﷺ-এর সুনাম হানির চেষ্টা করা এবং তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে এবং আচরণের ক্ষেত্রে সঠিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ইত্যাদি অপপ্রচার চালাইয়া জনসাধারণকে তাঁহার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠা। এই কারণে তাহারা নানা ধরনের আখ্যায় তাঁহাকে আখ্যায়িত করিত। যেমন– মাজনূন (উন্মাদ), জিন অথবা মন্দ শক্তির দ্বারা প্রভাবিত ও পাগল হইয়া গিয়াছে (অথবা বিকারগ্রস্ত) মাসহূর (যাদুগ্রস্ত অথবা সম্মোহিত) ইত্যাদি। এই সমস্ত শব্দ কম-বেশি আরবদের ধারণায় বিদ্যমান ছিল যে, সাধারণত ভূত-প্রেত বা অশুভ শক্তি দুষ্ট জিন-এর প্রভাবে

অথবা যাদুর সম্মোহনে এইরূপ হইয়া থাকে। এই সমস্ত অভিযোগের পাশাপাশি আরও অভিযোগ ছিল যে, প্রিয়নবী ﷺ আচরণের সঠিক ও ঐতিহ্যিক পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন এবং বিপথগামী হইয়াছেন। কুরআন মজীদে কাফির-মুশরিকদের উক্তিগুলি বিধৃত হইয়াছে এইভাবে ঃ

وَقَالُوْا يٰاَيُّهَا الَّذِىْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اِنَّكَ لَمَجْنُوْنٌ (١٥ : ٦).

"আর উহারা বলে, ওহে যাহার উপর আল-কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি নিশ্চয় উন্মাদ" (১৫ ঃ ৬)।

اِذْ يَقُوْلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَسْحُوْرًا (١٧ : ٤٧).

"আলোচনা কালে যালিমরা বলে, তোমরা তো এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির অনুসরণ করিতেছ" (১৭ ঃ ৪৭)।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهُ لَمَجْنُوْنٌ (٦٨ : ٥١).

"আর যখন কাফিররা আল-কুরআন শ্রবণ করে তখন উহারা যেন উহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়াইয়া ফেলিবে এবং বলে, অবশ্যই সে উন্মাদ" (৬৮ ঃ ৫১)।

এই শেষোক্ত আয়াতে সম্মিলিত কাফির-মুশরিকের প্রিয়নবী ﷺ-এর উপর উন্মাদ হওয়ার যে মিথ্যা দোষারোপ এবং তাহাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির উল্লেখ রহিয়াছে তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই সংক্রান্ত অভিযোগ তাঁহাকে বস্তুত উন্মাদ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করা অপেক্ষা তাহাদের বিস্ময় ও অগ্রাহ্যের ফলাফল অধিকতর। যাহা হউক, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে[১৪] কাফির-মুশরিকদের এই অভিযোগের উল্লেখ রহিয়াছে অস্বীকৃতি ও অভিযোগাদি খণ্ডনের মাধ্যমে এবং সেই সঙ্গে আল্লাহ্র রাসূলের মহান চরিত্র ও আচরণের দৃঢ় প্রত্যয়ের মাধ্যমে। অভিযোগগুলি ছিল সন্দেহাতীতভাবে অযৌক্তিক ও বানোয়াট এবং যে কারণে ঐ অভিযোগ স্পষ্টভাবে তাঁহার অন্তরের প্রগাঢ়তা দ্বারা এবং তাঁহার বাক্যাবলী ও প্রশংসনীয় কার্যাবলীর অটলতা দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়। আর ইহা তিনি করেন তাঁহার প্রচারকার্যের পূর্বে এবং পরে। যাহারাই তাহাকে জানিত বা তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছিল তাহাদের নিকট এইসব অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিবার কোন দীর্ঘ যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন ছিল না। এই কারণে কুরআন মজীদের অসত্য বলিয়া ঘোষণা সংক্ষিপ্ত এবং তীক্ষ্ণ। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوْا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَّ اِلاَّ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ (٧ : ١٨٤).

"তাহারা চিন্তা করে না যে, তাহাদের সহচর আদৌ উন্মাদ নহেন। তিনি তো এক স্পষ্ট সতর্ককারী" (৭ ঃ ১৮৪)।

اَمْ يَقُوْلُوْنَ بِهٖ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ (٢٣-٧٥).

"অথবা উহারা কি বলে যে, তিনি উন্মাদ? বস্তুত তিনি উহাদের নিকট সত্য আনিয়াছেন" (২৩ ঃ ৭৫)।[১৫]

একইভাবে কাফির-মুশরিকরা এই অভিযোগ আনয়ন করে যে, মহানবী ﷺ বিপথগামী হইয়াছেন। কুরআন মজীদ ঘোষণা করে ঃ

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى (٥٣ :٢).

"তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নহেন, বিপথগামীও নহেন" (৫৩ ঃ ২)।

اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (٦٨ :٧).

"নিশ্চয় তোমার রব সম্যক অবহিত আছেন যে, কে তাঁহার পথ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে এবং তিনি সম্যক জানেন কে সঠিক পথপ্রাপ্ত" (৬৮ ঃ ৭; ১৬ ঃ ১২৫)।[১৬]

قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلٰى نَفْسِىْ وَاِنِ اهْتَدَيْتُ فِيْمَا يُوْحِىْ اِلَىَّ رَبِّىْ .

"(হে রাসূল) বলুন, আমি বিভ্রান্ত হইলে বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই এবং যদি আমি সৎপথে থাকি তবে তাহা এইজন্য যে, আমার প্রতি আমার রব্ ওহী প্রেরণ করেন" (৩৪ ঃ ৫০)।

একাধিকবার কুরআন মজীদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই ধরনের উন্মাদ না ও বাতুলতার অভিযোগ করা হইয়াছিল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

كَذٰلِكَ مَا اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلاَّ قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ (٥١ :٥٢).

"এইভাবে উহাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল আসিয়াছে উহারা তাহাকে বলিয়াছে, তুমি তো এক যাদুকর, না হয় উন্মাদ" (৫১ ঃ ৫২)।[১৭]

(খ) যাদুকর, কবি ও গণক প্রভৃতি অভিযোগ আরোপ ঃ উল্লিখিত শেষের আয়াতে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রিয়নবী ﷺ -কে কাফিররা যাদুকরও বলিত। বশীকরণ মন্ত্র দ্বারা মোহিতকরণের (سحور) অভিযোগ পাল্টাইয়া যাদুকর (ساحر) অভিযোগ আনয়ন করা ছিল নিঃসন্দেহে আয়াতের আকর্ষণীয় শক্তি এবং মনোমুগ্ধকর ভাষা শৈলীর সৌন্দর্য যাহা তিনি প্রচার করিতেছিলেন। যখন তাঁহাকে যাদুকর (সাহির) অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইতেছিল তখন ইহার

একমাত্র যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল, তিনি ঐশীবাণীর যে মূল পাঠ তিলাওয়াত করিতেছিলেন সেগুলি। আর সেগুলিকে প্রায়শ তাহার শত্রুরা সিহর (ইন্দ্রজাল অথবা যাদু) বলিত। কাফির-মুশরিকদের এই অভিযোগের উল্লেখ করিয়া স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا اَنْ اَوْحَيْنَا اِلى رَجُلٍ مِّنْهُمْ.... قَالَ الْكَافِرُوْنَ اِنَّ هذَا لَسحِرٌ مُّبِيْنٌ (١٠-٢).

"মানুষের জন্য কি ইহা আশ্চর্যজনক যে, আমি তাহাদের মধ্য হইতেই একজনের নিকট ওহী প্রেরণ করিয়াছি?... (কিন্তু) কাফিররা বলে, এই ব্যক্তি নিশ্চিত এক প্রকাশ্য যাদুকর। (১০ ঃ ২)।

وَعَجِبُوْا اَنْ جَاءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكفِرُوْنَ هذَا سحِرٌ كَذَّابٌ (٣٨-٤).

"তাহারা ইহাতে অবাক হইয়া গেল যে, তাহাদের নিকট একজন সতর্ককারী আসিয়াছে তাহাদের মধ্য হইতে। আর কাফিররা বলিল, এই ব্যক্তি একজন যাদুকর, মিথ্যাবাদী" (৩৮ ঃ ৪)।

فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوْا اِنَّ هذَا لَسِحْرٌ مُّبِيْنٌ (١٠-٧٦).

"সুতরাং যখন তাহাদের নিকট আমার নিকট হইতে সত্য আসিল তাহারা বলিল, নিশ্চয় ইহা প্রকাশ্য যাদু" (১০ ঃ ৭৬)।

وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هذَا سِحْرٌ وَّاِنَّا بِهِ كَافِرُوْنَ (٤٣-٣٠).

"আর যখন তাহাদের নিকট সত্য আসিল তখন তাহারা বলিল, ইহা তো যাদু এবং ইহাকে আমরা প্রত্যাখ্যান করিতেছি" (৪৩ ঃ ৩০)।[১৮]

প্রিয়নবী (সা)-কে কবি বলিয়া অভিযুক্ত করিতেও তাহারা কুণ্ঠাবোধ করে নাই। এই সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَقُوْلُوْنَ اَئِنَّا لَتَارِكُوْا الِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ (٣٧-٣٦).

"এবং তাহারা বলিত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহ্দেরকে পরিত্যাগ করিব" (৩৭ ঃ ৩৬)?

وَمَا عَلَّمْنهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُ اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ (٣٦ : ٦٩).

"আমি তাহাকে কবিতা শিক্ষা দেই নাই এবং ইহা তাহার জন্য উপযুক্ত নহে। ইহা তো কেবল উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন" (৩৬ ঃ ৬৯)।

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلاَ مَجْنُوْنٍ . أَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُوْنِ . قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّىْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ (٥٢ : ٢٩-٣١).

"অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। তোমার রব-এর অনুগ্রহে তুমি গণকও নহ এবং উন্মাদও নহ। তবে তাহারা কি বলে যে, সে একজন কবি? আমরা তাহার মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি। বল, তোমরা অপেক্ষা করিতে থাক, আমিও তোমাদের সহিত অপেক্ষায় আছি" (৫২ ঃ ২৯-৩১)।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيْلاً مَّا تُؤْمِنُوْنَ . وَلاَ بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ . تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (٦٩ : ٤١-٤٣).

"আর ইহা কবির উক্তি নহে, তোমরা খুব কমই তাহা বিশ্বাস কর। আর ইহা গণকের উক্তিও নহে, তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ কর" (৬৯ ঃ ৪১-৪৩)।

কুরআন মজীদে কবিদের বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ করিয়া একজন নবীর সহিত তাহাদের পার্থক্য নির্ণীত হইয়াছে।[১৯]

(গ) ঠাট্টা-বিদ্রূপ, উপহাস ও ব্যঙ্গ

মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধবাদীদের আর একটি উপায় ছিল তাঁহার এবং মুসলিমদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা। তাহারা জনসমক্ষে উপহাস করিতে লাগিল এবং ইসলামের বিভিন্ন শিক্ষা সম্পর্কে শ্লেষাত্মক ও ঘৃণা উদ্রেককারী প্রচারণা চালাইতে লাগিল। বিশেষ করিয়া পুনরুত্থান, রোজ হাশরে বিচার এবং মৃত্যুর পরে পুনর্জীবন লাভের ধারণাকে তাহার অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। মহানবী ﷺ এখন মুসলিমগণকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকারীদের মধ্যে প্রধান যে সমস্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্র হইতে জানা যায় তাহারা হইতেছে ঃ[২০]

১. আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা (বনূ মাখযূমের)।

২. আল-আসওয়াদ ইব্নুল মুত্তালিব আবূ যাম'আ (বনূ আসাদের)।

৩. আল-আসওয়াদ ইব্ন 'আবদে ইয়াগূছ ইব্ন ওয়াহ্ব (বনূ যুহরা গোত্রীয়, এই লোকটি মহানবী ﷺ-এর মামাত ভাই)।

৪. আল-হারিছ ইব্ন কায়স (ইহাকে ইবনুল আনতালা অথবা আয়তালা নামেও ডাকা হইত। সে বনূ সাহ্মের)।

৫. আল'-আস ইব্ন আল-ওয়াইল (বনূ সাহ্মের)।

এই সমস্ত ব্যক্তি ছাড়াও আবূ লাহাব, আল-হাকাম ইব্ন আবিল আস এবং মালিক ইব্নুত তালাতিলা ইব্ন গাবশান প্রমুখের নামও বিদ্রূপকারীদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।[২১]

প্রথম পর্যায়ে সমাজে মহানবী ﷺ-এর সাধারণ অবস্থান কাফির-মুশরিকদের আক্রমণ ও উপহাসের সুযোগ আনিয়া দেয়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلاَّ هُزُوًا اَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلاً . اِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْ لاَ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلاً .

"(হে রাসূল) আর যখনই তাহারা তোমাকে দেখিতে পায় তখন তাহারা তোমাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করিয়া দেয় এবং বলে, এই কি সেই ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন? সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের হইতে বিভ্রান্ত করিয়াই ফেলিত, যদি না আমরা তাহাদেরকে কষিয়া ধরিয়া না থাকিতাম। তাহারা যখন নিজেদের চোখেই শাস্তি দেখিতে পাইবে তখন তাহারা টের পাইবে কে অধিক পথভ্রষ্ট" (২৫ ঃ ৪১-৪২)।

নূতন ইসলামে দাখিল হইয়াছেন এমন কিছু সাহাবী ছিলেন যাহাদের পার্থিব কোন লোভ-লালসা ছিল না, তাঁহারা সচরাচর মহানবী ﷺ-এর সাহচর্যে থাকিতেন, তাহাদিগকেও কাফিরদের উপহাসের শিকার হইতে হইয়াছিল। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ . وَاِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ . وَاِذَا انْقَلَبُوْا اِلٰى اَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ . وَاِذَا رَاَوْهُمْ قَالُوْا اِنَّ هٰؤُلاَءِ لَضَالُّوْنَ .

"যাহারা পাপে নিমজ্জিত (কাফির-মুশরিক) তাহারা যাহারা ঈমান আনিয়াছে তাহাদেরকে তাচ্ছিল্যের সহিত উপহাস করিত এবং যখন তাহারা মুমিনদের পাশ দিয়া যাইত তখন তাহারা পরস্পর চক্ষু টিপিয়া ইশারা করিত (অর্থাৎ ইঙ্গিত-ইশারায় বিদ্রূপ করিত)। যখন তাহারা তাহাদের নিজস্ব লোকজনের নিকট ফিরিয়া যাইত তখনও তাহারা হাসি-ঠাট্টায় মাতিয়া উঠিত। আর যখন তাহারা তাহাদিগকে দেখিত তখন বলিত, নিশ্চয় উহারা পথভ্রষ্ট (৮৩ ঃ ২৯-৩২)।[২২]

তাহাদের (কাফির-মুশরিকদের) ঠাট্টা-বিদ্রূপের সচরাচর বিষয় ছিল পুনরুত্থান, শেষ বিচারের ধারণা। তাহাদের ব্যাপারে কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "আর কাফিররা বলে (বিদ্রূপের সহিত), আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দিব, যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া যাইবে তখন আবার তোমরা নূতন করিয়া সৃষ্টি হইবে? হয় সে আল্লাহ্র উপর মিথ্যারোপ করিতেছে.অথবা তাহার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে" (৩৪ ঃ ৭-৮)।

মহান আল্লাহ আরও বলেন, "আর তাহারা বলিত, (ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে যে!) আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হইয়া যাইব, ইহার পরও কি আমরা পুনরায় জীবিত হইয়া উত্থিত হইব এবং আমাদের বৃদ্ধ পিতৃপুরুষও উত্থিত হইবে" (৫৬ ঃ ৪৭)।[২৪]

বর্ণিত আছে যে, উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ অথবা আল-আস ইব্‌ন ওয়াইল একদিন মহানবী -এর নিকট এক টুকরা গলিত হাড় লইয়া আসিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দুই হাতের মধ্যখানে রাখিয়া উহা রাসূলুল্লাহ -এর দিকে ছুড়িয়া মারিল এবং সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি বলিতে চাও যে, আল্লাহ ঐ হাড়টিকে পুনরায় জীবিত করিবেন এবং ইহার আসল অধিকারী যে ব্যক্তি ছিল সে আবার জীবিত হইয়া উঠিবে? মহানবী অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত জবাব দিলেন, হাঁ। এই ঘটনার প্রেক্ষাপটে সূরা ৩৬-এর ৭৭-৭৯ নম্বর আয়াত নাযিল হয় ঃ

اَوَلَمْ يَرَ الانْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَهُ مِنْ نُّطْفَةٍ فَاِذَا هُوَ خَصِيْمٌ مُّبِيْنٌ . وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِىَ خَلْقَهُ . قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ وَهِىَ رَمِيْمٌ . قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِىْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ (٣٦ : ٧٧-٧٩).

"মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাহাকে সৃষ্টি করিয়াছি শুক্রবিন্দু (نُطْفَةٌ) হইতে? অথচ পরে সে হইয়া পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী এবং সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলিয়া যায়। সে বলে, 'কে অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করিবে যখন উহা পচিয়া গলিয়া যাইবে? বল, 'উহার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করিবেন তিনিই যিনি ইহা প্রথমবার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত" (৩৬ ঃ ৭৭-৭৯)।[২৪]

কুরআন মজীদ আখিরাতে পুনরুত্থান এবং শেষ বিচার সম্পর্কে সত্যিকার ধারণা প্রদান করে। উপরিউক্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী এবং মিথ্যা আরোপকারী কাফির-মুশরিকদের তালিকাভুক্ত চতুর্থ ব্যক্তি আল-হারিছ ইব্‌ন কায়স বলিয়া বেড়াইত যে, মুহাম্মাদ বস্তুত মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের কথা বলিয়া নিজেও বিভ্রান্ত করিতেছে এবং তাঁহার সঙ্গী সাথীদেরকেও বিভ্রান্ত করিতেছে। বস্তুত তিনি বলিতে চাহিতেছেন যে, সব মানুষ ক্ষণিক কালের জন্য ধ্বংস হইয়া যায়।[২৫]

আল-'আস ইব্‌ন ওয়াইল নামক আর এক মুশরিক অধিকতর কদর্য উপহাস করিতে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারী খাব্বাব ইব্‌নুল আরাত (রা)-এর তরবারি কারখানা হইতে সে কিছু তরবারি খরীদ করে। যখন খাব্বার (রা) তাহার নিকট তরবারিগুলির মূল্য চাহিলেন তখন আল-'আস বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বলিল, মৃত্যুর পরে যখন আমরা দুইজনই পুনরুত্থিত হইব তখন সেই মূল্য দিয়া দিব। সে আরও বলিল যে, এই পার্থিব জীবনে সে যেমন ধন-সম্পদে অনেকটা সমৃদ্ধশালী, স্বাভাবিকভাবে আখিরাতেও সে এইরূপ সমৃদ্ধ অবস্থাতেই থাকিবে।[২৬]

বিদ্রূপকারীদের তালিকাভুক্ত ২ ও ৩ ক্রমিক সংখ্যার আসওয়াদ অর্থাৎ আল-আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব আবূ যামা'আহ (বনূ আসাদ বংশোদ্ভূত) এবং আল-আসওয়াদ ইব্ন 'আবদ ইয়াগূছ ইব্ন ওয়াহ্ব (বনূ যুহরা বংশোদ্ভূত) মুসলিমদের পাশ দিয়া যাইবার সময় তাহাদের সঙ্গী-সাথী কাফির মুশরিকদের বলিত, কাহাদের আছে এমন ক্ষুদ্র সাধ্য যে, তাহারা এমন জনশক্তির স্বপ্ন দেখে যাহারা রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্যের এবং তাহাদের বিশাল ধন-ভাণ্ডারের উত্তরাধিকারী হইবে।[২৭]

কাফির-মুশরিকদের এইসব ধরনের ব্যঙ্গ-উপহাস, ঠাট্টা-বিদ্রূপ বিশেষ করিয়া মিথ্যারোপ মহানবী ﷺ -এর মর্ম যন্ত্রণার কারণ হইত। কুরআন মজীদের বেশ কয়েকটি আয়াতে তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলা সান্ত্বনা দান করেন এবং ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দেন ঃ

وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هِجْرًا جَمِيْلاً . وَذَرْنِىْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ أُولِى النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلاً .

"লোকে যাহা বলে তাহাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে উহাদিগকে পরিহার করিয়া চল। ছাড়িয়া দাও আমাকে এবং বিলাস সামগ্রীর অধিকারী সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদিগকে। আর কিছু কালের জন্য উহাদিগকে অবকাশ দাও" (৭৩ ঃ ১০ -১১)।

انَّا كَفَيْنٰكَ الْمُسْتَهْزِئِيْنَ .

"আমি যথেষ্ট তোমার জন্য বিদ্রূপকারীদের বিরুদ্ধে" (১৫ ঃ ৯৫)।

قَدْ نَعْلَمُ انَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِىْ يَقُوْلُوْنَ فَانَّهُمْ لاَ يُكَذِّبُوْنَكَ وَلٰكِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِايٰتِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ .

"অবশ্য আমি জানি যে, তাহাছারা যাহা বলে তাহা তোমাকে নিশ্চয়ই কষ্ট দেয়; কিন্তু তাহারা তোমাকে তো মিথ্যাবাদী বলে না; বরং সীমালংঘনকারিগণ আল্লাহ্র আয়াতকে অস্বীকার করে" (৬ ঃ ৩৩)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আরও বলা হইল ঃ

وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوْا عَلَى مَا كُذِّبُوْا وَاُوْذُوْا حَتّٰى اَتٰهُمْ نَصْرُنَا وَلاَ مُبَدِّلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَّبَاِى الْمُرْسَلِيْنَ .

"(হে রাসূল!) তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকে অবশ্যই মিথ্যুক বলা হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদেরকে মিথ্যাবাদী বলা ও ক্লেশ দেওয়া সত্ত্বেও তাহারা ধৈর্য ধারণ করিয়াছিল। যে পর্যন্ত না আমার সাহায্য তাহাদের নিকট আসিয়াছে। আল্লাহ্‌র আদেশ কেহ পরিবর্তন করিতে পারে না, রাসূলগণের সম্পর্কে কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট আসিয়াছে" (৬ ঃ ৩৪)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ চূড়ান্ত সাফল্যের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে ইহার চেয়ে সুস্পষ্টতর প্রতিশ্রুতি কিছুই হইতে পারে না। ইতোপূর্বে এই সূরাতে মহানবী ﷺ -কে বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهْزِءُوْنَ.

"তোমার পূর্বেও অনেক রাসূলকেই ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে। তাহারা যাহা লইয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল পরিণামে তাহাই বিদ্রূপকারীদেরকে পরিবেষ্টন করিয়াছে" (৬ ঃ ১০)।

فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ (٣٦ ٧٦).

"অতএব, তাহাদের (কাফির-মুশরিকদের) কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয় আমি জানি তাহারা যাহা গোপন করে এবং যাহা ব্যক্ত করে" (৩৬ ঃ ৭৬)।[২৮]

অনুবাদ ঃ হাসান আবদুল কাইয়ূম

তথ্যনির্দেশিকা

১. আরও দেখুন ঃ কুরআন ৬ ঃ ১২৩; ১৪ ঃ ২১ এবং ৩৮ ঃ ৫-৭।

২. ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ২৬৪।

৩. পূর্বোক্ত বরাত।

৪. ইব্‌ন সা'দ, ১খ, পৃ. ২০০-২০১।

৫. উপরে দ্র. পৃ. ৬১০।

৬. ৩৪ ঃ ৩১; দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১৪খ., পৃ. ৩০২, সংশ্লিষ্ট আয়াত ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ . . . .

৭. আরবী পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَمَا اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِه كٰفِرُوْنَ . وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالاً وَّاَوْلاَدًا وَّمَا نَحْنُ مُعَذَّبِيْنَ (٣٤ : ٣٤-٣٥).

৮. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

...فَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالاٰخِرَةِ قُلُوْبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَّهُمْ مُسْتَكْبِرُوْنَ (١٦ : ٢٢).

৯. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَيْلٌ لِّكُلِّ اَفَّاكٍ اَثِيْمٍ يَسْمَعُ اٰيٰتِ اللّٰهِ تُتْلٰى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَاَنْ لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ (٤٥ : ٧-٨).

১০. আরবী পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا وَلّٰى مُسْتَكْبِرًا......(٣١ : ٧)

১১. আরবী পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ لَّيَكُوْنُنَّ اَهْدٰى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيْرٌ مَّا زَادَهُمْ اِلاَّ نُفُوْرًا . اُسْتِكْبَارًا فِى الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ (٣٥ : ٤٢-٤٣).

আরও দ্র. কুরআন মাজীদ ঃ ৩৪ঃ ৩১-৩৩ এবং ৪০ ঃ ৪৭-৪৮ (উপরিউক্ত পৃ. ৬০৯-৬১০), ৪০ ঃ ৫৬ এবং ৬ ঃ ১২৩, ৭ ঃ৩৬, ৩৯ ঃ ৫৯-৬০, ৪৫ ঃ ৩১ এবং ১০৪ ঃ ১-৩।

১২. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩১৫-৩১৬। বিভিন্ন সময় আবূ জাহলের অনুরূপ আরও ঔদ্ধত্যপূর্ণ মন্তব্যের কথা জানা যায়। দ্র. ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৩খ., পৃ. ২৪৫-২৪৭ এবং আত-তাবারী, তাফসীর, ১১খ., পৃ. ৩৩২-৩৩৩।

১৩. আরও দেখুন কুরআন ১৬ ঃ ৩৫ ও ৬ ঃ ১৪৮।

১৪. আরও দেখুন কুরআন ঃ ২৬ ঃ ২৭; ৩৭ ঃ ৩৬ ও ৪, ৪৪ ঃ ১৪।

১৫. অনুরূপ আরও দ্র. কুরআন ঃ ২৩ ঃ ২৫, ৩৪ ঃ ৮, ৩৪ ঃ ৪৬, ৫২ ঃ ২৯, ৬৮ ঃ ২ ও ৮১ ঃ ২২।

১৬. অনেকটা অনুরূপ দ্র. কুরআন ৬ ঃ ১১৭।

১৭. আরও দেখুন কুরআন ঃ ২৩ ঃ ২৫; ২৬ ঃ ২৭; ৫১ ঃ ৩৯।

১৮. আরও দেখুন কুরআন ঃ ১০ ঃ ৭৬, ১১ ঃ ১৭, ২১ ঃ ৫, ২৭ ঃ ১৩, ৩৪ ঃ৪৩, ৩৭ ঃ ১৫, ৪৬ ঃ ৭, ৫৪ ঃ ২, ১ ঃ ৬ এবং ৭৪ ঃ ২৪।

১৯. কুরআন ২৬ ঃ ২২৪-২২৬।

২০. দ্র. আত্-তাবারী, তাফসীর, ১৪খ., পৃ. ৬৯-৭০, ৭১-৭২।

২১. দ্র. সুবুলুল হুদা, ২খ, কায়রো, ১৩৯৪ হি. পৃ. ৬০৮ এবং আল-বালাযুরী, আনসাব আল-আশরাফ, ১খ., পৃ. ১৫৪।

২২. কুরআন ৩৪ ঃ ৭-৮ ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ. اَفْتَرى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِه جِنَّةٌ... (٣٤-٨-٧).

২৩. কুরআন ৫৬ ঃ ৪৭

وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ اَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ اَوَ اٰبَاؤُنَا الْاَوَّلُوْنَ (٥٦ : ٤٧).

২৪. উদাহরণস্বরূপ আত-তাবারী, তাফসীর, ২৩খ., পৃ. ৩০-৩১।

২৫. সুবুল আল-হুদা, পূ. স্থা., ৩খ., পৃ. ৬৯৬।

২৬. বুখারী, কিতাবুত তাফসীর, নং ৪৭৩২; কিতাবুল ইজারা, নং ২২৭৫।

২৭. আল-বালাযুরী, আনসাবুল আশরাফ, ১খ., পৃ. ১৩১-১৩২; সুবুলুল হুদা, পূ. স্থা., ২খ., পৃ. ৬০৮।

২৮. আরও দ্র. কুরআন, ১০ ঃ ৬৫, ১৬ ঃ ২৭, ২৭ ঃ ৭০।

ছাব্বিশতম অধ্যায়

সংগঠিত বিরোধিতা

এক ঃ নানা আপত্তি, যুক্তিতর্ক ও মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি

প্রিয়নবী ﷺ প্রকাশ্য জনসমাবেশে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মক্কার কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ আরও জোরদার বিরোধিতা করিবার হীন উদ্দেশ্য লইয়া নিজদিগকে সংগঠিত করে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বুঝিতে পারে যে, তাঁহাকে কেবল উন্মাদ, কবি কিম্বা যাদুকর বলিলে তাহাদের বিরোধিতা ফলপ্রসূ হইবে না। তাই তাহারা অধিকতর মারাত্মক মারাত্মক সব আপত্তি উত্থাপন এবং যুক্তি-তর্কের ফন্দি-ফিকির আঁটিতে থাকে।

আপত্তি উত্থাপন ও যুক্তিতর্ক

মক্কার কাফির-মুশরিকরা যে সমস্ত আপত্তি বারংবার উত্থাপন করিতেছিল সেগুলির মধ্যে তাহাদের প্রধান জিজ্ঞাসা ছিল, কিভাবে একজন মানুষ আল্লাহ্র রাসূল নিযুক্ত হইতে পারেন? আল্লাহ যদি একজন রাসূল প্রেরণ করিবার ইচ্ছা করিয়াই থাকেন তাহা হইলে কেন তিনি একজন ফেরেশতাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিলেন না? কিম্বা অন্ততপক্ষে সহকারী রাসূল হিসাবে একজন ফেরেশতাকে তাঁহার সহিত সম্পৃক্ত করিয়া দিলেন না অথবা একজন মানুষকে রাসূল নিযুক্ত করিয়া তাহার সহযোগী একজন ফেরেশতা কেন প্রেরণ করিলেন না? তাহারা ইহাও বলিতে লাগিল, যদি একজন মানুষই আল্লাহ্র রাসূল হইবেন তাহা হইলে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ -কে কেন আল্লাহ্র রাসূল করা হইবে? তিনি তো ইহার পূর্বে সমাজের কোন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন না, বরং তিনি তো স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লইয়া সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করিতেন। আর তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন, হাটে-বাজারে যাতায়াত করিতেন, রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করিতেন এবং অন্যান্য মানুষের মত পানাহার করিতেন, কেন এমন এক সাধারণ ব্যক্তি আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে মনোনীত হইবেন? তাঁহার বদলে মক্কা অথবা তাইফে কি এমন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল না যাহাকে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা যাইত?

কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দের এই সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপনের উদ্দেশ্য সত্যে উপনীত হওয়া ছিল না, বরং সাধারণ মানুষকে প্রিয়নবী ﷺ -এর অনুসরণ করা হইতে বিরত রাখিবার প্রচারণার তীক্ষ্ণ হাতিয়ার বানানোই উদ্দেশ্য ছিল। মক্কার নেতাদের এই সমস্ত আপত্তির উল্লেখ করিয়া কুরআন মজীদে বিস্তারিত বিবরণ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যেমন ইরশাদ হইয়াছে ঃ

(١) وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُوْلِ يَاْكُلُوا الطَّعَامَ وَيَمْشِيْ فِي الأَسْوَاقِ لَوْ لاَ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنَ مَعَهٗ نَذِيْرًا . اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنَ لَهٗ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظّٰلِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلاَّ رَجُلاً مَّسْحُوْرًا (٢٥ : ٧-٨).

(১) "আর উহারা (কাফির-মুশরিকরা) বলে, এ কেমন রাসূল যে আহার করে, হাটে-বাজারে চলাফেরা করে, তাহার নিকট কোন ফেরেশতা কেন অবতীর্ণ করা হইল না যে তাহার সহিত থাকিত সতর্ককারীরূপে? অথবা তাহাকে কেন পর্যাপ্ত ধনরাশি দেওয়া হইল না কিম্বা তাহাকে কোন বাগ-বাগিচাও দেওয়া হইল না, যাহা হইতে সে খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারে? সীমালংঘনকারীরা আরও বলে, তোমরা ত এক যাদুগ্রস্ত ব্যক্তিরই অনুসরণ করিতেছ" (২৫ ঃ ৭-৮)।

(٢) وَقَالَ الْمَلاَُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِلِقَاءِ الاٰخِرَةِ وَاَتْرَفْنٰهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مَا هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَاْكُلُ مِمَّا تَاْكُلُوْنَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوْنَ . وَلَئِنْ اَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ اِنَّكُمْ اِذًا لَّخٰسِرُوْنَ .

(২) "তাহার কওমের প্রধানগণ, যাহারা কুফ্‌রী করিয়াছিল ও আখিরাতের সাক্ষাতকারকে অস্বীকার করিয়াছিল এবং যাহাদেরকে আমি দিয়াছিলাম পার্থিব ভোগসম্ভার, তাহারা বলিয়াছিল, এতো তোমাদের মতই একজন মানুষ; তোমরা যাহা আহার কর সে তাহাই আহার করে এবং তোমরা যাহা পান কর সেও তাহাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদের মতই একজন মানুষের আনুগত্য কর তবে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে" (২৩ ঃ ৩৩-৩৪)।

(٣) وَاَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاْتُوْنَ السِّحْرَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُوْنَ (٢١ : ٣).

(৩) "সীমালঙ্ঘনকারীরা গোপনে পরামর্শ করে—এতো তোমাদের মত একজন মানুষই, তবুও কি তোমরা দেখিয়া শুনিয়া যাদুর কবলে পড়িবে" (২১ ঃ ৩)?

(٤) ءَاُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا (٣٨ : ٨).

(৪) "আমাদের মধ্য হইতে যিকর (কুরআন) কি নাযিল হইল তাহারই উপর" (৩ ঃ ৮)।

(٥) وَقَالُوْا لَوْ لاَ نُزِّلَ هٰذَا الْقُرْاٰنُ عَلٰى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْمٍ (٤٣ : ٣١).

(৫) "এবং তাহারা বলে, এই কুরআন কেন দুই শহরের (মক্কানগরী এবং তায়েফ) কোন এক প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর নাযিল করা হইল না" (৪৩ ঃ ৩১)।

(٦) وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهِ .

(৬) "মু'মিনদের সম্পর্কে বলে, যদি ইহা উত্তম হইত তবে তাহারা ইহার দিকে আমাদেরকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারিত না" (৪৬ ঃ ১১)।

এই সমস্ত আপত্তির জবাব কুরআন মজীদে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর বাণীতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। একজন মানুষ কি আল্লাহ্র রাসূল এই প্রশ্নের জবাবে বলা হইয়াছে, ইহা প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ -এর ক্ষেত্রেই কেবল কোন অভিনব ব্যাপার নহে, তাঁহার পূর্বেকার সকল নবী-রাসূলই মানুষ ছিলেন। তাঁহারাও পানাহার করিতেন, পারিবারিক জীবন নির্বাহ করিতেন, এমন কি জাগতিক ব্যাপারেও তাঁহারা নিজেদেরকে সম্পৃক্ত রাখিতেন। তাঁহাদের কেহই অমর (ফেরেশতা) ছিলেন না। এমনকি প্রত্যেক নবীর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল তাঁহার নিজ কওমের মধ্য হইতেই এবং তিনি তাহাদের মধ্যেই দীন প্রচার করিয়াছেন। তিনি কোনভাবেই অপরিচিত কেহ ছিলেন না, অজানা স্থান হইতেও তিনি আবির্ভূত হন নাই। কোন এক ফেরেশতাকে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হয় নাই, কাফিরদের এই প্রশ্নের ব্যাপারে উল্লেখ করা হইয়াছে, যদি পৃথিবীর বাসিন্দা ফেরেশতাগণ হইত, তাহাদের জীবন-যাপন এবং চলাফেরা যদি মানুষের মত হইত তাহা হইলে একজন ফেশেতাকে রাসূল হিসাবে প্রেরণ করা হইত। অধিকন্তু যদি একজন ফেরেশতাকে মানবজাতির কাছে রাসূল মনোনীত করিয়া পাঠান হইত তাহা হইলে তাহাকেও মানবের আকৃতিতে পাঠাইতে হইত এবং তাহাও কম বিভ্রান্তির সৃষ্টি করিত না। মক্কা অথবা তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে পাঠান হইল না কেন, এই প্রশ্নের ব্যাপারে বলা হইয়াছে যে, কাফির নেতাদের মধ্য হইতে হইলেও কেহই তাহার কথা বিশ্বাস করিত না; বরং এই ব্যাপারে তাহাদের আপত্তিগুলির কারণ ছিল শুধু আল্লাহ্র ওহীর ব্যাপারে তাহাদের সন্দেহ প্রবণতার অভিব্যক্তি। অধিকন্তু নবুওয়াত ও ওহী হইতেছে আল্লাহ্র খাস নিয়ামত। আল্লাহ্ যাহাকে অতিশয় ভালবাসেন তাহাকেই তিনি ইহা দান করেন। মক্কার কাফির-মুশরিকরা আল্লাহ্র নিয়ামতসমূহের অধিকারীও ছিল না, এমনকি এতই তাহারা নিজেরাই উদ্ধত ছিল যে, তাহাদের পছন্দ ও অপছন্দ অনুযায়ী নিজেদেরকে পরিচালিত করিত। কুরআন মজীদে এই সমস্ত উত্তর রহিয়াছে এইভাবে ঃ

(١) قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِّنَ الرُّسُلِ (٤٦ : ٩).

(১) "বল, আমি কোন নূতন রাসূল নহি" (৪৬ ঃ ৯)।

(٢) وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إلاَّ رِجَالاً نُّوحِىْ إِلَيْهِمْ فَسْئَلُوٓا أَهْلَ الذِّكْرِ إنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ . وَمَا جَعَلْنٰهُمْ جَسَدًا لاَّ يَأْكُلُوْنَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوْا خٰلِدِيْنَ (٢١ :٨-٧).

(২) "তোমার পূর্বে আমি ওহীসহ মানুষই পাঠাইয়াছিলাম। তোমরা যদি না জান (হে কাফির-মুশরিকরা!) তাহা হইলে সেই সম্পর্কে যাহারা জানে তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও এবং আমি তাহাদেরকে (নবী-রসূলগণকে) এমন দেহবিশিষ্ট করি নাই যে, তাহারা আহার্য গ্রহণ করিত না এবং তাহারা চিরকাল স্থায়ীও ছিল না" (২১ ঃ ৭-৮)। [১]

(٣) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلاَّ رِجَالاً نُّوحِىْ إِلَيْهِمْ مِّنْ أَهْلِ الْقُرٰى (١٢ : ١٠٩).

(৩) "তোমার পূর্বেও জনপদের অধিবাসীদের মধ্য হইতেই পুরুষগণকে প্রেরণ করিয়াছিলাম যাহাদের নিকট ওহী পাঠাইতাম" (১২ ঃ ১০৯)।

(٤) وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُّؤْمِنُوْا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى إلاَّ أَنْ قَالُوْا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلاً . قُلْ لَّوْ كَانَ فِى الْأَرْضِ مَلٰئِكَةٌ يَّمْشُوْنَ مُطْمَئِنِّيْنَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُوْلاً (١٧ : ٩٤-٩٥).

(৪) "আর যখন উহাদের (কাফির-মুশরিকদের) নিকট আসে সত্যপথের দিশা তখন লোকজনকে ঈমান আনা হইতে বিরত রাখে উহাদের এই উক্তি, 'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করিয়া পাঠাইয়াছেন'? বল, ফেরেশতাগণ যদি নিশ্চিত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিত তবে আমি আকাশ হইতে উহাদের নিকট অবশ্যই ফেরেশতা রাসূল করিয়া পাঠাইতাম" (১৭ ঃ ৯৪-৯৫)।

(٥) وَلَوْ جَعَلْنٰهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنٰهُ رَجُلاً وَّلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَّا يَلْبِسُوْنَ (٦ : ٩).

(৫) "আর আমি যদি কোন ফেরেশতাকে (মানুষের নিকট) রাসূল করিয়া পাঠাইতাম তবে তাহাকে মানুষের আকৃতিতেই পাঠাইতাম আর তাহাদেরকে সেই রকম বিভ্রমে ফেলিতাম যে রকম বিভ্রমে তাহারা এখন রহিয়াছে" (৬ ঃ ৯)।

(٦) أَهُمْ يَقْسِمُوْنَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتَهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ (٤٣ : ٣٢).

(৬) "তাহারা কি আপনার রব-এর রহমত বণ্টন করে? আমিই উহাদের মধ্যে উহাদের জীবিকা বণ্টন করি পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাহাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করাইয়া লইতে পারে; এবং উহারা যাহা জমা করে তাহা হইতে আপনার রব-এর রহমত উত্তম" (৪৩ ঃ ৩২)।

এই শেষোক্ত আয়াত কাফির-মুশরিকদের আপত্তির জবাবে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহার পূর্ববর্তী অর্থাৎ ৩১ নং আয়াতে কারীমায় কেন মক্কা অথবা তায়িফের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে নিয়োগ করা হইল না তাহার জবাবও রহিয়াছে।

কুরআন মজীদের বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধেও কাফির-মুশরিকরা আপত্তি উত্থাপন করে। প্রিয়নবী -কে কবি, কাহিন (গণক), সাহির (যাদুকর) বলা ছাড়াও তাহারা তাঁহাকে এইসব কথা বলিয়া অভিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিত যে, তিনি যে সমস্ত আয়াত বলিতেছেন তাহা বানোয়াট অথবা স্বরচিত। তাহারা এমনও অভিযোগ আনয়ন করে যে, তাঁহাকে কেহ শিখাইয়া দিতেছে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা নির্দেশিত হইয়া তিনি ঐসব কথা বলিতেছেন। তাহারা আরও বলিতে থাকে যে, কেহ হয়ত তাঁহাকে বলিয়া দিতেছে অথবা সেগুলি তাঁহার জন্য লিখিয়া দিতেছে যাহা তিনি মুখস্থ করিয়া ওহী হিসাবে প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদের এই সমস্ত আপত্তির ব্যাপারে আলোচনা করা হইয়াছে।[২]

পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, কাফির-মুশকিরদের বিভিন্ন আপত্তি ও অভিযোগ শুধ অসত্য এবং অসমর্থনীয়ই ছিল না, বরং সেগুলি সামঞ্জস্যহীন ও পরস্পরবিরোধী ছিল। কেননা প্রিয়নবী যদি উন্মাদই হইতেন তাহা হইলে কাফির-মুশরিকরা তাঁহাকে যে কবি অথবা গণক বলিয়া অভিযুক্ত করিত তাহা তিনি হইতেন না। যদি তিনি কবিই হইতেন তাহা হইলে তিনি গণক অথবা যাদুকর হইতেন না। কাফির-মুশরিকদের ঐসব মিথ্যা ও বানোয়াট উক্তি যে স্ববিরোধী তাহা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়। কারণ একজন পাগল বা গণকের পক্ষে কবি হওয়াটা সম্ভব নয়। আবার তাহারা যে বলিত প্রিয়নবী কুরআনের বাণীসমূহ জাল করিয়া বা নিজেই রচনা করিয়া বলিতেছেন– তাহাদের এই কথাগুলিও অযৌক্তিক প্রমাণিত হয়। তাহারা বাণীসমূহ লিখাইতেছে বা লিখিয়া দিতেছে আর তিনি তাহা বলিতেছেন তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। কাফির-মুশরিকদের উদ্দেশ্য প্রণোদিত বানোয়াট অভিযোগগুলি যদি সত্য হইত তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আল্লাহ্র রাসূল হওয়ার এবং আল্লাহ্র ওহী লাভ করিবার দাবি করা অসম্ভব ছিল। বস্তুত কাফির-মুশরিকদের স্ববিরোধী ও অসঙ্গত অভিযোগগুলির উল্লেখ করিয়া কুরআন মজীদে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (١٧ : ٤٨).

"দেখ, উহারা তোমাকে কি উপমা দেয়! উহারা পথভ্রষ্ট হইয়াছে, ফলে উহারা পথ পাইবে না" (১৭ ঃ ৪৮)।

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيجٍ (٥٠ : ٥).

"বরং উহাদের নিকট সত্য আসিবার পর উহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ফলে উহারা সংশয়ে দোদুল্যমান" (৫০ ঃ ৫)।

কাফির-মুশরিকদের নানা ধরনের আপত্তি এবং কুরআন মজীদে বিধৃত সেই সমস্ত আপত্তির জবাব প্রকৃষ্ট সত্যকে স্পষ্ট করিয়া দেয় যে, ওহীসমূহ নাযিল করা হয় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য যাহাতে তাহারা কালবিলম্ব না করিয়া প্রিয়নবী ﷺ -এর কাছে আসে। প্রকৃতপক্ষে এই সমস্ত ওহী নাযিল হওয়ার ফলে কাফির-মুশরিকদের বাধা সৃষ্টি এবং নানা প্রকারের অপপ্রচার স্বল্প সময়ের মধ্যেই অর্থহীন হইয়া পড়ে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রিয়নবী ﷺ -কে কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিবার কিম্বা সম্পর্ক বজায় রাখিবার নির্দেশ দেন এবং তাহাদের সকল আপত্তি অগ্রাহ্য করিতেও নির্দেশ দেন।

কুরায়শ নেতারা উপরিউক্ত আপত্তিগুলিই কেবল প্রচার করিতেছিল না, তাহারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট কতকগুলি প্রশ্নও উত্থাপন করিতে লাগিল এবং তাঁহার দাবির বিশুদ্ধতা যাচাইয়ের জন্য তাহাদের অপেক্ষা বেশি তথ্যাভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট যাইয়া অভিমত ও ধারণাদি সংগ্রহ করিতে লাগিল। বর্ণিত আছে যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ আন-নাদর ইব্‌ন আল-হারিছ এবং 'উকবা ইব্‌ন আবী মু'আয়াত নামক দুই ব্যক্তিকে মদীনায় ইয়াহূদী রাব্বীগণের নিকট পাঠাইল প্রিয়নবী ﷺ সম্পর্কে তাহাদের অভিমত জোগাড় করিবার জন্য।[৩]

এই দুই ব্যক্তি মদীনায় যাইয়া প্রিয়নবী ﷺ -এর বিবরণ এবং তাঁহার কর্মতৎপরতা ও প্রচার কার্যক্রমের বিশদ বর্ণনা তুলিয়া ধরিয়া তাঁহার সম্পর্কে তাহাদের মতামত জানিতে চাহিল। উত্তরে তাহারা (রাব্বীগণ) কুরায়শ প্রতিনিধিদেরকে পরামর্শ দিল, নবী ﷺ -কে তিনটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষা করিবে। সেই বিষয়গুলি হইতেছে ঃ একদল তরুণের অদ্ভূত কাহিনী (অর্থাৎ আসহাব আল-কাহ্‌ফ, গুহার অধিবাসী), বিশ্ব পর্যটক (অর্থাৎ যুলকারনায়ন) এবং আররূহ (অর্থাৎ জীবনশক্তি বা আত্মা)। তাহারা আরও বলিল, প্রিয়নবী ﷺ যদি এই প্রশ্নগুলির ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারেন তাহা হইলে তিনি সত্য নবী, আর যদি না পারেন তাহা হইলে তিনি ভণ্ড।

মক্কার ঐ দুই ব্যক্তি মক্কায় ফিরিয়া গিয়া নেতাদেরকে রাব্বীদের পরামর্শ সম্পর্কে জানাইল। তদনুসারে কুরায়শ নেতারা প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট যাইয়া ঐ তিনটি বিষয় সম্পর্কে জানিতে চাহিল। প্রিয়নবী ﷺ পরবর্তী দিবসে ঐ প্রশ্নগুলির জবাব দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতি প্রদানকালে তিনি ভুলক্রমে ইনশাআল্লাহ (যদি আল্লাহ চাহেন) বলেন নাই। ফলে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কোন ওহী তাঁহার নিকট নাযিল হইল না। ইহাতে তাঁহার

অন্তর দুঃখ ভারাক্রান্ত হইল, আর কুরায়শ নেতারা এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিতে ভুল করিল না। তাহারা তৎপর হইল এবং প্রিয়নবী ﷺ -এর প্রতি উপহাস করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল, তিনি তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াও তাহা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। শেষে দুই সপ্তাহ পর তাঁহার নিকট সূরা কাহ্ফ (সূরা নং ১৮) নাযিল হইল।

এই সূরাতে যে সমস্ত বিষয়ে কুরায়শ নেতারা প্রশ্ন করিয়াছিল সেইগুলির বিবরণ ও উত্তর রহিয়াছে। এই সূরার ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে কুরায়শ নেতাদের প্রশ্নের উত্তর দিবার প্রতিশ্রুতি প্রদানকালে ইনশাআল্লাহ বলিতে ভুলিয়া যাইবার জন্য প্রিয়নবী ﷺ -কে মৃদু তিরস্কারও করা হইয়াছে।[৪] উত্তরগুলি কাফির-মুশরিকদের নিকট সন্তোষজনক না হওয়ায় তাহারা পূর্বের মতই বিরোধিতা করা অব্যাহত রাখিল।

দুই ঃ মু'জিযা (অলৌকিক কার্যাবলী) প্রদর্শনের দাবি

কাফির-মুশরিকদের যুক্তি প্রদর্শনের সহিত একান্ত সম্পৃক্ত ছিল প্রিয়নবী ﷺ -এর নিকট তাহাদের মু'জিযা বা অলৌকিক কাজ প্রদর্শনের দাবি।[৫] কাফির-মুশরিকদের আপত্তিগুলির পাশাপাশি মু'জিযা প্রদর্শনের দাবিও আদতে সত্যকে উদ্ঘাটন করিবার উদ্দেশ্যে ছিল না, বরং তাহাদের ঐ সমস্ত আপত্তি কিম্বা দাবি-দাওয়ার মধ্যে প্রিয়নবী ﷺ কে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও পরাভূত করিবার বদ মতলব নিহিত ছিল। বিভিন্ন সময় তাহারা প্রিয়নবী ﷺ কে পূর্ববর্তী কয়েকজন নবীর মত নানা ধরনের মু'জিযা দেখাইবার জন্য বলিত। ইব্ন ইসহাক 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা)-র বরাত দিয়া একটি ঘটনা বর্ণনা করিযাছেন। একদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের পর রাবী'আর পুত্র 'উতবা ও শায়বা, আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব, আন-নাদর ইব্ন হারিছ, আবুল বখ্তারী ইব্ন হিশাম, আল-আসওয়াদ ইব্ন আল্-মুত্তালিব ইব্ন আসাদ, যাম'আ ইব্ন আসওয়াদ, আল-ওয়ালীদ ইব্ন আল-মুগীরা, আবূ জাহল, আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবী উমায়্যা, আল-'আস ইব্ন ওয়াইল, আল-হাজ্জাজের পুত্র নুবায়হ ও মুনাব্বিহ, উমায়্যা ইব্ন খালাফ প্রমুখ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কা'বার চত্বরে সমবেত হইয়া প্রিয়নবী ﷺ-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারাদি লইয়া একটি মীমাংসায় আসিবার উদ্দেশ্যে গমন করিল। প্রিয়নবী ﷺ তাহাদের আসিতে দেখিয়া ভাবিলেন, বোধ হয় কুরায়শ নেতারা ইসলামের বাণী শুনিবার আগ্রহ লইয়া আসিয়াছে। তিনি তাহাদের সম্মুখে আসা মাত্রই তাহারা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া প্রথমেই তিনি তাহাদের ধর্ম, দেব-দেবী এবং পূর্বপুরুষদের নিন্দা করিতেছেন—এই সমস্ত অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া বলিল, ইহার ফলে সমাজে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যশূন্যতার উপক্রম হইয়াছে। তারপর তাহারা তাঁহাকে বলিল যে, যদি তিনি এই সমস্ত কার্য সমাজে সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির জন্য ও পর্যাপ্ত ধন-সম্পদের জন্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহাকে এত ধন-সম্পদ দিতে প্রস্তুত রহিয়াছে যাহা পাইয়া তিনি মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হইবেন, তাহারা তাঁহাকে তাহাদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করিবে, এমনকি তাঁহাকে তাহাদের রাজার মসনদে অধিষ্ঠিত করিবে যদি তিনি

শুধু তাঁহার প্রচার কার্য পরিত্যাগ করেন। তাহারা ইহাও বলিল যে, যদি তিনি কোন মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে যত অর্থই লাগুক না কেন তাঁহার যথোপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাহারা তাহা ব্যয় করিবে। এই সমস্ত প্রস্তাব শুনিয়া প্রিয়নবী ﷺ অত্যন্ত শান্তভাবে বলিলেন যে, তাঁহার কোন ধন-সম্পদ এবং মান-মর্যাদা লাভের আদৌ আকাঙ্ক্ষা নাই কিম্বা তিনি আদৌ অসুস্থ নহেন। তিনি তো কেবল আল্লাহ্‌র রাসূল, তাঁহার নিকট আল্লাহ্‌র কিতাব নাযিল হইয়াছে তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতে যে, তাহারা যদি ভুল পথে অটল থাকে তাহা হইলে তাহাদের জন্য আল্লাহ্‌র শাস্তি নির্ধারিত রহিয়াছে। আর যদি তাহারা সংশোধিত জীবন (ইসলাম) গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহাদেরকে প্রতিদানের সুসংবাদ দিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। এই কথা বলিয়া তিনি আরও বলিলেন, ইহাই তাহাদের সৌভাগ্য বহিয়া আনিবে যদি তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী এবং তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করে। আর যদি না করে তাহা হইলে তাঁহার এবং তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত পর্যন্ত তিনি ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করিবেন।[৬]

এই উত্তর শুনিয়া কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে বলিল, যদি তিনি তাহাদের প্রস্তাবগুলি গ্রহণ না করেন তাহা হইলে তিনি অন্ততপক্ষে তাহাদের প্রতি যেন একটি অনুগ্রহ করেন। তাহারা বলিল যে, তাহাদের দেশের মত এত কঠিন কষ্টসাধ্য জীবন যাপনের দেশ আর কোথাও নাই। এখানে কোন সমতল ভূমি নাই এবং পানি নাই। যদি তিনি সত্যিকার রাসূলুল্লাহ হন তাহা হইলে তাঁহার রবকে বলিয়া উহার পাহাড়-পর্বতগুলি ভূমি হইতে সরাইয়া দিয়া সমতল মাঠ-ময়দানে পরিবর্তিত করিয়া দিন, সিরিয়া ও ইরাকে যেমন নদ-নদী ও ঝর্ণাধারা আছে তেমন এখানেও করিয়া দিন। তাহারা আরও বলিল যে, তিনি তাঁহার রব্‌কে বলিয়া তাহাদের মৃত পূর্বপুরুষদেরকে, বিশেষ করিয়া তাহাদের মহান শায়খ কুসায়্যি ইব্‌ন কিলাবকে পুনর্জীবিত করিয়া দিন। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে যেমন নবী ﷺ -কে যাচাই করিবার উদ্দেশ্য নিহিত ছিল তেমনি সত্যিকার আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে তাঁহার অবস্থান যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা দৃঢ় প্রত্যয় গ্রহণের উদ্দেশ্যও নিহিত ছিল।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কথাবার্তা শুনিয়া প্রিয়নবী ﷺ বলিলেন যে, তিনি তো ঐ সমস্ত কার্যাদি সম্পাদনের জন্য আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত হন নাই, বরং তাঁহার কাজ হইতেছে আল্লাহ্‌র বাণী তাহাদের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া। তিনি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিলেন, যদি তাহারা আল্লাহ্‌র প্রেরিত বাণীকে মানিয়া লয় তাহা হইলে তাহাদের জন্য উহা সৌভাগ্যের কারণ হইবে। আর যদি না মানে তাহা হইল তাঁহার এবং তাহাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত তিনি ধৈর্যের সহিত অপেক্ষা করিবেন।[৭]

অতঃপর কুরায়শ নেতৃবৃন্দ প্রিয়নবী ﷺ -কে বলিল যে, তাহারা যাহা চাহিয়াছে তিনি যদি তাহা করিতে না চাহেন তাহা হইলে অন্ততপক্ষে তাঁহার রব-এর নিকট নিজের অবস্থার উন্নতি এবং নিজের জীবন ও জীবিকার চাহিদা পূরণ করিয়া দিবার জন্য বলিতে পারেন। তাহাতে ইহা তো হইবে যে, তাঁহাকে জীবিকার অন্বেষণে সাধারণ মানুষের মত হাটে-বাজারে যাইতে হইবে না।

আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে তাঁহার মর্যাদা সুসংহত করিতে তিনি তো আল্লাহ্‌র নিকট ফল-ফলারির বাগিচা, সুরম্য রাজপ্রাসাদ, প্রচুর স্বর্ণ-রৌপ্যের ভাণ্ডার চাহিতে পারেন। উত্তরে প্রিয়নবী ﷺ বলিলেন যে, তিনি আদৌ আল্লাহ্‌র নিকট ঐ সমস্ত জিনিস চাহিবেন না। তিনি তো সেইজন্য প্রেরিত হন নাই। তিনি একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা মাত্র। যদি তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী মানিয়া লয় তাহা হইলে তাহা তাহাদের জন্য হইবে সৌভাগ্যজনক, আর যদি না মানে তাহা হইলে তিনি ধৈর্য সহকারে তাঁহার এবং তাহাদের মধ্যে সিদ্ধান্ত না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন।[৮]

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের একগুয়েমী বজায় রাখিবার লক্ষ্যে আবার প্রিয়নবী ﷺ -কে বলিল, তাহারা কখনও তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে না যতক্ষণ না তাহাদের উপর আকাশ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে। কেননা তিনি তো দাবি করিয়াছেন, আল্লাহ গযব বর্ষণের মাধ্যমে তাহা করিতে পারেন। ইহার উত্তরে প্রিয়নবী ﷺ বলিলেন যে, তাহা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। যদি তিনি তাহা করিবার ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি তাহাদের সহিত তাহাই করিবেন। এই উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, তাঁহার রব কি জানেন না যে, তাহারা তাঁহার সহিত বসিবে এবং তাঁহাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করা হইবে যাহা ইতোমধ্যে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছি এবং তাঁহার রব তো আগেভাগেই এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব জানাইয়া দিতে পারিতেন এবং যদি তাহারা তিনি যাহা বহন করিয়া আনিয়াছেন তাহা গ্রহণ না করে তখন তিনি কি করিবেন তাহা তো বলিয়া দিতে পারিতেন? তাহারা তাহাদের কথায় আরও কিছু কথা যোগ করিয়া বলিল যে, আসলে তাহারা আসিয়াছে একটা কথা জানিতে যে, আল-ইয়ামামার অধিবাসী আর-রাহমান নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে প্রণোদিত করিতেছে। তাহারা আরও বলিল যে, আর-রাহমানকে তাহারা কখনও বিশ্বাস করে না। তাহারা সবশেষে প্রিয়নবী ﷺ -কে বলিল, হে মুহাম্মাদ! এইজন্য আমরা তোমার সমস্ত ন্যায্য দাবি প্রতিহত করিয়াছি এবং তুমি আমাদের প্রতি যাহা কিছু করিয়াছ তাহার জন্য ততদিন তুমি আমাদিগকে ধ্বংস করিতেছ কিম্বা তোমাকে আমরা ধ্বংস করিতেছি ততদিন আমরা তোমাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কখনও ছাড়িয়া দিব না।[৯]

তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যে প্রিয়নবী ﷺ যেই দাঁড়াইয়াছেন তখনই প্রিয়নবী ﷺ -এর ফুফাতো ভাই এবং আব্দ আল-মুত্তালিবের কন্যা আতিকার পুত্র আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আবী উমাইয়্যা ইব্‌ন আল-মুগীরা দাঁড়াইয়া তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিল, হে মুহাম্মাদ! তোমার লোকজন তোমার নিকট কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রস্তাব রাখিল আর সেগুলিকে তুমি গ্রহণ করিলে না! পরবর্তীতে তাহারা তোমাকে কতকগুলি কাজ করিতে বলিল যদ্দ্বারা তাহারা তুমি যে দাবি কর তুমি আল্লাহ্‌র রাসূল তাহা নিশ্চিত হইতে পারিত, আল্লাহ্‌র সহিত তোমার সম্পর্কের অবস্থা যাচাই করিতে এবং তুমি যাহা বিশ্বাস কর ও অনুসরণ কর তাহা বুঝিতে পারিত—তুমি তাহা করিলে না। তারপরও তাহারা তোমার জন্য মূল্যবান কিছু পাওয়ার জন্য চাহিতে বলিল

যদ্দ্বারা তাহারা তোমার বৈশিষ্ট্য এবং তাহাদের উপর তোমার প্রাধান্য ও আল্লাহ্র সহিত তোমার মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্ক কতটুকু তাহা জানিতে চাহিয়াছিল। তুমি তাহাও করিলে না। অতঃপর তুমি তাহাদের উপর শাস্তি নিপতিত হওয়ার সম্ভাবনার ভয় দেখাইয়াছ তাহা তাহাদের উপর নিপতিত না করার জন্য বলিয়াছে, কিন্তু তুমি তাহাও কর নাই। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও তোমার উপর বিশ্বাস করিব না, যতক্ষণ না তুমি একটি মইয়ে চড়িয়া আসমানে আরোহণ কর। যখন আমি তাহা দেখিব এবং দেখিব যে, তুমি একখানি গোটা গোটা কিতাব ও চারজন ফেরেশতাসহ ফিরিয়া আসিয়াছ, সেই চারজন ফেরেশতা প্রত্যয়ন করিবে যে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহা সত্য, তখনও আমার মনে হয় আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতে পারিব না। এই সমস্ত মন্তব্য করিয়া 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী উমায়্যা তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল। প্রিয়নবী ﷺ বিষন্ন বদনে তাঁহার পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সত্যকে প্রত্যাখ্যান করায় এবং তাঁহার নিকট হইতে তাহাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তিনি বিষণ্ন ও মনোক্ষুণ্ন হইলেন।[১০]

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে কাফির-মুশরিকদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে উল্লেখ রহিয়াছে, বিশেষ করিয়া সূরা বনী ইসরাঈলের ৯০ হইতে ৯৩ নং আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالُواْ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوْعًا . اَوْ تَكُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الأَنْهرَ خِلٰلَهَا تَفْجِيْرًا . اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا اَوْ تَأْتِىَ بِاللهِ وَالْمَلٰئِكَةِ قَبِيْلاً . اَوْ يَكُوْنَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ زُخْرُفٍ اَوْ تَرْقٰى فِى السَّمَاءِ وَلَنْ نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّىْ هَلْ كُنْتُ اِلاَّ بَشَرًا رَّسُوْلاً .

"আর উহারা বলে, আমরা কখনও তোমাতে ঈমান আনিব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য ভূমি হইতে এক প্রস্রবণ উৎসারিত করিবে। অথবা তোমার খেজুরের ও আঙ্গুরের একটি বাগিচা হইবে যাহার ফাঁকে ফাঁকে তুমি অজস্র ধারায় প্রবাহিত করিয়া দিবে নদী-নালা। অথবা তুমি যেমন বলিয়া থাক, তদানুযায়ী আকাশকে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া আমাদের উপর ফেলিবে। অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাগণকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিবে, অথবা তোমার নিকট স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হইবে অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করিবে, কিন্তু তোমার আকাশ আরোহণে আমরা কখনও ঈমান আনিব না, যতক্ষণ তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ না করিবে যাহা আমরা পাঠ করিব। বল, পবিত্র মহান আমার রব; আমি তো কেবল একজন মানুষ, একজন রাসূল" (১৭ ঃ ৯০-৯৩)।

এই আয়াতসমূহ দ্বারা উপরে বর্ণিত বিবরণ ছাড়াই কাফির-মুশরিকদের দাবিগুলির স্বরূপ আমরা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারি। কাফির-মুশরিকদের দাবিগুলির উত্তর এখানে অধিকতর

উল্লেখযোগ্য। এখানে জোরালো ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রিয়নবী ﷺ মানুষের অতিরিক্ত কিছু নহেন, তাঁহাকে কেবল আল্লাহ্র বাণীসহ নিযুক্ত করা হইয়াছে, তিনি কোন আসমানী গুণাবলীর দাবি করেন নাই কিম্বা অতিপ্রাকৃত শক্তির দাবি করেন নাই। ইহা কাফির-মুশরিকদের আল্লাহ্র নবী বা আল্লাহর রাসূল সম্পর্কিত ধারণার অদ্ভূত প্রকৃতিও স্পষ্ট করিয়া দেয়।

উপরিউক্ত আয়াত আরও স্পষ্ট করিয়া দেয় যে, কাফির-মুশরিকরা দাবি করিয়াছিল যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাবির সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করুন। মক্কার কাফির-মুশরিকদের এইসব দাবির মত দাবি মূসা (আ)-এর কওমও করিয়াছিল। তাহারাও মূসা (আ)-কে বলিয়াছিল ঃ

لَنْ نُّؤْمِنَ لَكَ حَتّٰى نَرَى اللّٰهَ جَهْرَةً .

“আমরা আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষভাবে না দেখা পর্যন্ত তোমাকে কখনও বিশ্বাস করিব না” (২ ঃ ৫৫)।

এই ধরনের দাবির জবাব সূরা ৬-এর ১০৩ নম্বর আয়াতে এবং সূরা ৪২-এর ৫১ নম্বর আয়াতে রহিয়াছে যেখানে স্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হইয়াছে, এই জীবনে মানুষের পক্ষে আল্লাহ্কে দেখা সম্ভব নহে কিম্বা তাঁহার মুখামুখী হইয়া তাঁহার কথা শোনাও সম্ভব নহে।

রাসূল হিসাবে ফেরেশতাদের প্রেরণের যে দাবি কাফির-মুশরিকরা করিয়াছিল সেই সম্পর্কে ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।[১১]

‘আবদুল্লাহ্ ইব্ন ‘আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত একখানি হাদীছ এবং কুরআন মজীদের ১৭ নম্বর সূরার ৯০-৯৩ নম্বর আয়াত হইতে জানা যায় যে, কাফির-মুশরিকরা ইহাও দাবি করিয়াছিল যে, নবী ﷺ এবং ওহী সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ফেরেশতাগণকে হাজির করাইতে হইবে। তাহারা তাহাদের মৃত পূর্বপুরুষদের মৃত্যুর পরবর্তী জীবন এবং পুনরুজ্জীবনের সত্যতার সাক্ষ্য দিবার জন্য পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্যও দাবি উত্থাপিত করিয়াছিল, যে সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে কুরআন মজীদের ৪৪ নম্বর সূরার ৩৪-৩৬ নম্বর আয়াতে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَيَقُوْلُوْنَ . اِنْ هِيَ اِلَّا مَوْتَتُنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِيْنَ . فَاْتُوْا بِاٰبَائِنَا اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

“উহারা (কাফির মুশরিক) বলিয়াই থাকে, আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং আমরা আর উত্থিত হইব না। অতএব তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহা হইলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর”।

এই ধরনের সমস্ত দাবি প্রমাণ করিবার জন্য কিম্বা নিদর্শনসমূহ (আয়াত) উপস্থাপনের জন্য কুরআন মজীদ এবং তদনুযায়ী প্রিয়নবী ﷺ যথার্থ ও সঠিক জবাব প্রদান করিয়াছেন। বস্তুত কুরআন মজীদের মক্কী সূরাসমূহের অধিকাংশে এবং উল্লেখ্যযোগ্য সংখ্যক মাদানী অংশে রিসালাত, ওহী এবং বা'ছ (পুনরুত্থান ও মৃত্যুর পরের জীবন) সম্পর্কে কাফির-মুশরিকদের অস্বীকৃতি একদিকে বিধৃত হইয়াছে, অন্যদিকে ঐসব ব্যাপারের সমর্থনে এবং কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতার বিরুদ্ধে নিদর্শন ও সাক্ষ্য-প্রমাণ রহিয়াছে।

আমরা যদি কাফির-মুশকিরদের দাবিগুলির কুরআনী জবাবসমূহ বিশ্লেষণ করি তাহা হইলে নিম্নের তথ্যাদি উত্থিত হয় ঃ

প্রথমত, মু'জিযা প্রদর্শনের শক্তি ও ক্ষমতা যে একমাত্র আল্লাহ্‌র অধিকারে তাহা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যদি অতীতের কোন নবী কোন মু'জিযা প্রদর্শন করিয়া থাকেন তবে তাহা তিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে করিয়াছেন। সকল নবীই মানুষ ছিলেন। তাঁহাদের একান্ত নিজস্ব কোন অতি মানবীয় শক্তি ছিল না। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِىَ بِاٰيَةٍ اِلاَّ بِاِذْنِ اللّٰهِ .

"আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কোন নিদর্শন (মু'জিযা) উপস্থিত করা কোন রাসূলের কাজ নহে" (৪০ ঃ ৭৮; ১৩ ঃ ৩৮)।

قُلْ اِنَّمَا الاٰيٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَاِنَّمَا اَنَا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ .

"বল, নিদর্শন আল্লাহ্‌রই এখতিয়ারে। আমি তো একজন প্রকাশ্য সতর্ককারী মাত্র" (২৯ ঃ ৫০)।

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنَزِّلَ اٰيَةً وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ .

"বল, নিদর্শন নাযিল করিতে আল্লাহ অবশ্যই সক্ষম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই তাহা জানে না" (৬ ঃ ৩৭)।

পূর্ববর্তী কয়েকজন আম্বিয়ায়ে কিরামের পক্ষ হইতে প্রদর্শিত মু'জিযাসমূহের উদাহরণ এই সত্যকে আরও সুস্পষ্ট করে। এতদানুসারে নবী 'ঈসা (আ) কাদা মাটির তৈরী পাখিকে জীবন্ত করিয়া মু'জিযা প্রদর্শন করেন। একইভাবে অন্ধের দৃষ্টিদান, কুষ্ঠ রোগীর আরোগ্যদান ইত্যাদির মাধ্যমেও তিনি মু'জিযা প্রকাশ করেন। এইসব মু'জিযা তিনি যাহা উচ্চারণ করিয়া প্রদর্শন করেন তাহা হইতেছে আল্লাহ্‌র অনুমতিক্রমে (بِاِذْنِ اللّٰهِ)।[১২]

মূসা (আ)-এর ঘটনা আরও অধিকতর শিক্ষনীয়। তিনি তাঁহার লাঠিকে আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে নিক্ষেপ করেন। আল্লাহ বলিলেন, হে মূসা! 'তুমি ইহা নিক্ষেপ কর। অতঃপর মূসা (আ) উহা নিক্ষেপ করিলেন, সংগে সঙ্গে উহা সাপ হইয়া ছুটিতে লাগিল। তখন মূসা (আ) ভীত হইলেন এবং পিছনে সরিয়া গেলেন। তখন পুনরায় আল্লাহ নির্দেশ দিলেন, তুমি উহাকে ভয় করিও না। আমি ইহাকে পূর্বরূপে ফিরাইয়া দিব।[১৩]

অতএব যখন মক্কার কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ প্রিয়নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর কাছে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট মু'জিযা প্রদর্শনের দাবি উত্থাপন করিল তখন তিনি জানাইলেন যে, তিনি মানুষের অতিরিক্ত কিছু নহেন, বরং তিনি একজন রাসূল মাত্র। বস্তুত এইভাবে তিনি মু'জিযার উৎস ও প্রকৃতির উপর কেবল গুরুত্ব আরোপ করিলেন। তিনি কোন মু'জিযা প্রদর্শন করিতে কিন্তু অস্বীকৃতি জানান নাই। আর তাঁহার অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ কোন মু'জিযা প্রদর্শনের ক্ষমতা তাঁহার নিজের আওতায় ছিল না।

দ্বিতীয়ত, কাফির-মুশরিকরা অলৌকিক কার্যাবলী প্রদর্শনের দাবি করিয়াছিল। তাহারা সেই সব কাজ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাহাদের এই দাবির উদ্দেশ্য সত্যকে নির্ণয় করা ছিল না। ইহাতে কোন আন্তরিক ইচ্ছাও ছিল না; বরং তাহাদের দাবিসমূহের মধ্যে দুর্দমনীয় অবিশ্বাস এবং অসৎ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল যাহার মাধ্যমে তাহারা প্রিয়নবী ﷺ -কে অপদস্ত করিতে চাহিয়াছিল। এই কারণে তাহাদের দাবিগুলি যদি মানিয়াও লওয়া হইত, যদিও তাহারা যাদু প্রদর্শন বা এই ধরনের অন্যান্য মিথ্যা ওজর পরিহার করিত তবুও তাহারা ঈমান আনিত না। ঐ সমস্ত দাবি ছিল ছল-চাতুরী মাত্র। তাহাদের মনোভাবের সঠিক চিত্র কুরআন মজীদে উন্মোচিত হইয়াছে এইভাবেঃ

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِىْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ .

"(হে রাসূল!) আমি যদি তোমার প্রতি কাগজে লিখিত কিতাবও নাযিল করিতাম আর তাহারা যদি উহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিত তবুও কাফিররা বলিত, ইহা স্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই নহে" (৬ ঃ ৭)।

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ . لَقَالُوْٓا اِنَّمَا سُكِّرَتْ اَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُوْرُوْنَ .

"আমি যদি উহাদের জন্য আসমানের দুয়ার খুলিয়া দেই এবং উহারা সারাদিন উহাতে আরোহণ করিতে থাকে তবুও উহারা বলিবে, আমাদের দৃষ্টি সম্মোহিত করা হইয়াছে। শুধু এমনই না, বরং আমরা এক যাদুগ্রস্ত সম্প্রদায়" (১৫ ঃ ১৪-১৫)।

وَاِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِعْرَاضُهُمْ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِى الاَرْضِ اَوْ سُلَّمًا فِى السَّمَاءِ فَتَاْتِيَهُمْ بِايَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدٰى فَلاَ تَكُوْنَنَّ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ.

"তোমার নিকট যদি তাহাদের উপেক্ষা কষ্টকর হয় তবে পারিলে ভূগর্ভে সুরঙ্গ অথবা আকাশে সোপান অন্বেষণ কর এবং তাহাদের নিকট কোন নিদর্শন আন। আল্লাহ ইচ্ছা করিলে তাহাদের সকলকে অবশ্য সৎপথে একত্র করিতেন। সুতরাং তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত হইও না" (৬ ঃ ৩৫)।

وَاَقْسَمُوْا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ ايَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ اِنَّمَا الايٰتُ عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ اَنَّهَا اِذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُوْنَ .

"তাহারা আল্লাহ্‌র নামে কঠিন শপথ করিয়া বলে, তাহাদের নিকট যদি কোন নিদর্শন আসিত তবে অবশ্যই তাহারা ঈমান আনিত। বল, নিদর্শন তো আল্লাহ্‌রই এখতিয়ারভুক্ত। তাহাদের নিকট নিদর্শন আসিলেও তাহারা যে ঈমান আনিবে না ইহা কিভাবে তোমাদের বোধগম্য করা যাইবে" (৬ ঃ ১০৯)?

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَا اِلَيْهِمُ الْمَلٰئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلاً مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْا اِلاَّ اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ .

"আমি (আল্লাহ) তাহাদের নিকট ফেরেশতা প্রেরণ করিলেও এবং মৃতেরা তাহাদের সহিত কথা বলিলেও এবং সকল বস্তু তাহাদের সম্মুখে হাজির করিলেও যদি না আল্লাহ ইচ্ছা করেন তবে তাহারা ঈমান আনিবে না। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অজ্ঞ" (৬ ঃ ১১১)।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى بَلْ لِّلّٰهِ الاَمْرُ جَمِيْعًا .

"যদি কোন কুরআন এমন হইত যদ্দ্বারা পর্বতকে গতিশীল করা যাইত অথবা পৃথিবীকে বিদীর্ণ করা যাইত অথবা মৃতের সহিত কথা বলা যাইত (তবুও উহারা উহাতে বিশ্বাস করিত না), কিন্তু সমস্ত বিষয়ই আল্লা হ্‌র এখতিয়ারভুক্ত" (১৩ ঃ ৩১)।

তৃতীয়ত, কাফির-মুশরিকরা যে সমস্ত কার্যাবলী প্রদর্শনের জন্য নিজেদের খেয়াল-খুশী মত নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল তাহা তিনি মুকাবিলা করেন নাই ইহা কিন্তু নহে। তাহাদেরকে সঠিক এবং সন্দেহ দূর করিবার মত নিদর্শনসমূহ ও মু'জিযা প্রদর্শন যে করা হয় নাই উহাও কিন্তু নহে; বরং তাহাদেরকে তাবৎ মু'জিযা শর্ত সাপেক্ষে দেখান হইয়াছে। অবশ্য তাহারা বিশেষভাবে যে সমস্ত দাবি উত্থাপন করিয়াছিল সেগুলি ব্যতীত বুদ্ধিগত, বস্তুগত ও ঐতিহাসিক বহু মু'জিযা প্রদর্শন

করা হয়। বুদ্ধিগত নিদর্শন সম্পর্কে বলা হইয়াছে, কুরআন মজীদই যথেষ্ট কার্যকর মু'জিযা। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ يُتْلٰى عَلَيْهِمْ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَرَحْمَةً وَّذِكْرٰى لِقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ .

"ইহা কি উহাদের জন্য যথেষ্ট নহে যে, আমি আপনার প্রতি কুরআন নাযিল করিয়াছি যাহা উহাদের নিকট পাঠ করা হয়? ইহাতে অবশ্যই রহমত ও উপদেশ রহিয়াছে সেই কওমের জন্য যাহারা ঈমান আনে" (২৯ ঃ ৫১)।

বাস্তবিকই ঐ তিনটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কুরআন মজীদ এক স্থায়ী মু'জিযা। ইহা সর্বজন স্বীকৃত যে, কুরআন মজীদ এমন এক মহান ব্যক্তির নিকট নাযিল হয় যিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, কাফির-মুশরিকদের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যিনি এমন এক কিতাব গ্রন্থনায় সম্পূর্ণ অসমর্থ ছিলেন যে কারণে তাহারা কখনও কখনও এই বৈশিষ্ট্যকে 'প্রকাশ্য যাদু' (سِحْرٌ مُّبِيْنٌ) বলিয়া অভিহিত করিত এবং কখনও কখনও অভিযুক্ত করিত যে, তিনি অন্য কাহারও দ্বারা অনুপ্রাণিত অথবা নির্দেশিত হইতেন। এই দিক বিবেচনা করিলেও ইহা মু'জিযা। অন্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে, ইহাতে প্রকৃতির এমন সব তথ্য ও রহস্য বিধৃত রহিয়াছে যাহা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের নিকট স্পষ্ট হইয়া যায় এবং যাহাতে এমন সব বিষয় বর্ণিত হইয়াছে যাহা তখনকার জ্ঞান রাজ্যের কোন ব্যক্তিরই জানা ছিল না। অধিকন্তু কুরআন মজীদ একটি ভাষাবিদ্যাগত মু'জিযা, আর তাহা ইহার অনুকরণীয় গ্রন্থনা শৈলীর কারণে, বর্ণনা শৈলীর কারণে এবং ভাব ও ঘটনাবলী উপস্থাপন অনন্য সৌকর্যের কারণে। তাই তো আমরা লক্ষ্য করি, ইহার অনুরূপ কোন কিছু হাজির করিতে যে কোন ব্যক্তিকে বারবার অকারণে আহ্বান করে নাই।

বুদ্ধিগত মু'জিযা ছাড়াও ইহাতে বস্তুগত বা ভৌত মু'জিযাও রহিয়াছে। বিভিন্ন বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, মহানবী ﷺ বিভিন্ন সময়ে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর অনুমতি ও অনুমোদনক্রমে মু'জিযা প্রদর্শন করিয়াছেন। সেই সমস্ত মু'জিযা বস্তুগত মু'জিযার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মু'জিযা হইতেছে হাতের ইশারায় চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত করা যাহা বহু দর্শক অবলোকন করিয়াছিল। এই বিশেষ মু'জিযার উল্লেখ কুরআন মজীদে রহিয়াছে, সেই সঙ্গে ঘোর শত্রু কাফির-মুশরিকদের প্রতিক্রিয়ারও উল্লেখ রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ .

"কিয়ামত নিকটবর্তী হইয়াছে, আর চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। উহারা কোন নিদর্শন দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, ইহা তো চিরাচরিত যাদু" (৫৪ ঃ ১-২)।[৫৭]

চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার এই ঘটনা কোন যাদু ছিল না, বরং সেই সময়ে যাহারা ইহা দেখিয়াছিল সেই সমস্ত দর্শকের নিকট ইহা অবশ্য ক্ষণকালীন মাত্র ছিল। সেই কারণে কুরআন মজীদে বারংবার ধারাবাহিক মু'জিযা ও আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর সব নিদর্শন রহিয়াছে আমাদের চারিপার্শ্বে, তাহা রহিয়াছে প্রকৃতিতে, বিশ্ব চরাচরে, মানুষে এবং সৃষ্টি জগতের তাবৎ কিছুতে। এই সমস্ত নিদর্শনের উল্লেখ এমনভাবে করা হইয়াছে যাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই যে, ইহা শুধু মক্কার কাফির-মুশরিকদের দাবির উত্তর হিসাবেই উল্লিখিত হয় নাই, বরং তাহা সর্বযুগের সব মানুষের জন্য নিদর্শন ও মু'জিযা।

তাই চাঁদের প্রকাশ্য দুইটি সমান অংশে বিভক্ত হইয়া যাওয়া ছিল ক্ষণকালীন, একটি সরু পাতার আকৃতি হইতে ইহার একটি পূর্ণ বৃত্তের আকৃতিতে নির্দিষ্ট পর্যায়কালের মধ্য দিয়া নিয়মিত ও পুনরাবৃত্ত রূপান্তরণ এবং ইহার পৃথিবীর চারিদিকে চক্রপথে পরিক্রমণ বস্তুত কোন ক্ষণকালীন বৈশিষ্ট্য নহে এবং কম বিস্ময়করও নহে। সূর্য ও চন্দ্রের অস্তিত্বও আকস্মিক নহে। সমগ্র সৃষ্টি জগতের রব আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও কর্মের জন্য একটি নির্দিষ্ট নিয়ম সাপেক্ষে উহাদের সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাদের গতিপথের নির্দিষ্ট পরিক্রমণকাল তিনিই নির্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যাহা একমাত্র তিনিই জানেন। মানুষের বুদ্ধি ও সচেতনতা বারংবার পৃথিবীর ভৌত রূপ দেখিয়া উচ্ছসিত হয় এবং প্রকৃতির প্রতিটি বস্তুই যে আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর "নিদর্শন" তাহা জোরালোভাবে স্বীকার করে। কুরআন মজীদে এতদ্‌সংক্রান্ত বহু আয়াত রহিয়াছে। যেমন ঃ

وَمِنْ ايٰتِهٖ اَنْ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ اِذَا اَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُوْنَ . وَمِنْ ايٰتِهٖ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ . وَمِنْ ايٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ وَاخْتِلاَفُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ . وَمِنْ ايٰتِهٖ مَنَامُكُمْ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُوْنَ . وَمِنْ ايٰتِهٖ يُرِيْكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَّطَمَعًا وَّيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيٖ بِهِ الاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ . وَمِنْ ايٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ .

"তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদেরকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। তাহার পর তোমরা এখন মানুষ, সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছ (দূর-দূরান্তে ব্যাপক হারে)। এবং তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন তোমাদের সঙ্গিনীদেরকে (জোড়া) যাহাতে তোমরা উহাদের সহিত শান্তি

পাও এবং তোমাদের পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় উহার মধ্যে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শনসমূহ চিন্তাশীল কওমের জন্য। আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য। নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনসমূহ। আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে রাত্রিকালে ও দিবাভাগে তোমাদের নিদ্রা এবং তোমাদের অন্বেষণ তাঁহার অনুগ্রহ হইতে। নিশ্চয় উহাতে নিশ্চিত নিদর্শনসমূহ রহিয়াছে শ্রবণকারী কওমের জন্য। আর তাঁহার নিদর্শনাবলীর মধ্যে রহিয়াছে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুত প্রদর্শন করেন ভয় এবং ভরসাস্বরূপ এবং আকাশ হইতে পানি বর্ষণ করেন এবং তদ্দ্বারা ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন উহার মৃত্যুর পর; নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিদর্শনসমূহ বোধশক্তিসম্পন্ন কওমের জন্য। এবং তাঁহার নিদর্শনসমূহের মধ্যে রহিয়াছে যে, তাঁহার নির্দেশেই আকাশ ও পৃথিবীর স্থিতি; অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হইতে উঠিবার জন্য একবার আহ্বান করিবেন তখন তোমরা উঠিয়া আসিবে" (৩০ ঃ ২০-২৫)।

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ . يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ وَالنَّخِيْلَ وَالاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمُ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهِ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ . وَمَا ذَرَاَ لَكُمْ فِى الاَرْضِ مُخْتَلِفًا اَلْوَانُهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّذَّكَّرُوْنَ (١٦ : ١٠-١٣).

"তিনিই আকাশ হইতে বারি বর্ষণ করেন, তোমাদের জন্য উহাতে রহিয়াছে পানীয় এবং উহা হইতে জন্মায় গাছপালা যাহাতে তোমরা পশুচারণ করিয়া থাক। তিনি তোমাদের জন্য উহার দ্বারা জন্মান শস্য, যায়তূন, খেজুর বৃক্ষ, আঙ্গুর এবং সর্বপ্রকার ফল। নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিদর্শন চিন্তাশীল কওমের জন্য। তিনিই তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করিয়াছেন রজনী, দিবস, সূর্য ও চন্দ্রকে, আর নক্ষত্ররাজিও অধীন হইয়াছে তাঁহারই নির্দেশে। নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শনসমূহ বোধশক্তিসম্পন্ন কওমের জন্য। এবং তিনি বিবিধ প্রকার বস্তুও যাহা তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সৃষ্টি করিয়াছেন। নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন সেই কওমের জন্য যাহারা উপদেশ গ্রহণ করে" (১৬ ঃ ১০-১৩)।

وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الاَرْضُ الْمَيْتَةُ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَاْكُلُوْنَ . وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا مِنَ الْعُيُوْنِ . لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفَلاَ يَشْكُرُوْنَ . سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ

وَمِمَّا لاَ يَعْلَمُوْنَ . وَايَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ مُّظْلِمُوْنَ . وَالشَّمْسُ تَجْرِىْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ . وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ . لاَ الشَّمْسُ يَنْبَغِىْ لَهَا اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِىْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ . وَايَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ (٣٦ : ٣٣-٤١).

“তাহাদের জন্য একটি নিদর্শন মৃত পৃথিবী, যাহাকে আমি সঞ্জীবিত করি এবং উহা হইতে উৎপন্ন করি শস্য যাহা তাহারা আহার করে। উহাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং উহাতে উৎসারিত করি প্রস্রবণ, যাহাতে তাহারা আহার করিতে পারে উহার ফলমূল হইতে, অথচ তাহাদের হস্ত উহা সৃষ্টি করে নাই। তবুও কি তাহারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না? পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি গাছপালা ও মানুষ এবং তাহারা যাহাদেরকে জানে না তাহাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করিয়াছেন জোড়ায় জোড়ায়। তাহাদের জন্য আর এক নিদর্শন রাত্রি, উহা হইতে আমি দিবালোক অপসারিত করি, তখন উহারা অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। আর সূর্য ভ্রমণ করে উহার নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে। ইহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ। এবং চন্দ্রের জন্য আমি নির্দিষ্ট করিয়াছি বিভিন্ন মন্‌যিল, অবশেষে উহা শুষ্ক, বক্র ও পুরাতন খেজুর শাখার আকার ধারণ করে। সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া এবং রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা; এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ করে। তাহাদের জন্য এক নিদর্শন এই যে, আমি তাহাদের বংশধরগণকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ করাইয়াছিলাম” (৩৬ ঃ ৩৩-৪১)।

বিশ্বজগত এবং সৃষ্টির এই সমস্ত মু'জিযা ছাড়াও পূর্ব যমানার আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনার প্রতিও দৃষ্ট আকর্ষণ করা হইয়াছে এবং তাঁহাদের নিজ নিজ কওমের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার কারণে গযবে নিপতিত হওয়ার কথাও উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে তাহারা আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহ দেখিয়াও ঈমান না আনার ফলে তাহাদের যে পতন হইয়াছিল তাহারও উল্লেখ রহিয়াছে। তাহাদেরকে এইগুলি প্রদর্শন করা হইয়াছিল সুপ্রতিষ্ঠিত নিদর্শনাবলী হিসাবে। কারণ তাহাদের জ্ঞান ও স্মৃতিগুলি এতই উজ্জ্বল ও সুবিদিত ছিল এবং ঐ সমস্ত কওমের বিনাশ ও ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য এতই সুস্পষ্ট ও পরিচিত ছিল যে, কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারিত না। বিশেষভাবে এই সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করিতে যাইয়া আল্লাহ্‌র নবী হযরত মূসা (আ), হযরত নূহ (আ), হযরত হূদ (আ) ও হযরত লূত (আ) প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে এবং তাঁহাদের কওমসমূহের পাপাচার ও অবিশ্বাসের কারণে যে শাস্তি নামিয়া আসিয়াছিল তাহারও উল্লেখ করা হইয়াছে। ২৬ ঃ ৬০-৬৭ আয়াতসমূহে ফিরআওন ও তাহার অনুসারীরা কেমন করিয়া সত্যকে, এমনিক হযরত মূসা (আ)-কে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, যদিও হযরত মূসা (আ) তাহাদেরকে সন্দেহাতীত নিদর্শনসমূহ দেখাইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া তাহারা অবশেষে পানিতে নিমজ্জিত হইয়া ধ্বংস হইয়াছিল,

অন্যদিকে মূসা (আ) ও তাঁহার অনুসারিগণ দরিয়া পাড়ি দিয়া ফিরআওনের কবল হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কুরআন মজীদে এই বিবরণ দিয়া উপসংহারে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ .

"নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না" (২৬ ঃ ৬৭)।

হযরত নূহ (আ)-এর প্রসঙ্গ আনিয়া তাঁহার কওম নবীর আহ্বানে সাড়া না দিবার কারণে মহাপ্লাবনে ডুবিয়া মরিয়াছিল, কুরআন মজীদে সেই ঘটনা উল্লিখিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে যাঁহারা ঈমান আনিয়াছিলেন তাহারা সেই মহাপ্লাবনের সময় কিশ্‌তীতে আরোহণ করিয়া বাঁচিয়াছিলেন, এই সব বিবরণ সূরা ২৬ ঃ ১১৪-১১৯ আয়াতে বিধৃত হইয়াছে এবং ১২১ নং আয়াতে এই ঘটনা নিশ্চিত করিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ "নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না"।[১৬]

আবার হযরত হূদ (আ) ও তাঁহার কওমের প্রসঙ্গ আনিয়া 'আদ সম্প্রদায় ও তাহাদের সত্য প্রত্যাখ্যানের কারণে ধ্বংস হওয়ার বিবরণ তুলিয়া ধরিয়া ঐ একইভাবে সত্য প্রত্যাখ্যানের পরিণাম যে কি ভয়াবহ তাহার উল্লেখ করিয়া শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে ঃ "নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না"।[১৭]

একই ধরনের শিক্ষা প্রদান করা হইয়াছে আল্লাহ্‌র নবী হযরত সালিহ (আ) এবং তাঁহার কওমের ধ্বংসের প্রসঙ্গ আনিয়া। হযরত সালিহ (আ)-এর কওমের নাম ছামূদ (২৬ ঃ১৪১-১৫৯)।[১৮]

আল্লাহ্‌র নবী হযরত লূত (আ)-এর প্রসঙ্গ আনিয়া এবং তাঁহার কওমের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির কথা অতি গুরুত্ব সহকারে উল্লিখিত হইয়াছে। অতঃপর আগের মতই গুরুত্ব সহকারে উপসংহারে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "নিশ্চয় উহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন, কিন্তু উহাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করে না"।[১৯]

হযরত লূত (আ)-এর কওম যে স্থানটিতে ধ্বংস হইয়াছিল তাহা অদ্যপি মৃত সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে বিদ্যমান রহিয়াছে। কুরআন মজীদে সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ تَّرَكْنَا مِنْهَا اٰيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ .

"আর আমি বোধশক্তিসম্পন্ন কওমের জন্য উহাতে এক স্পষ্ট নিদর্শন রাখিয়াছি" (২৯ঃ৩৫)।[২০]

একইভাবে হযরত নূহ (আ)-এর সময়ের মহাপ্লাবন ও নূহের কিশতীর প্রসঙ্গ আনা হইয়াছে, যে মহাপ্লাবন ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং ইহা সর্বজনবিদিত। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ تَرَكْنٰهَا اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ .

"আর আমি ইহাকে রাখিয়া দিয়াছি এক নিদর্শনরূপে; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি?" (৫৪ ঃ ১৫)।

এই আয়াতে "তারাক্না" (تَرَكْنَا = আমি রাখিয়া দিয়াছি) শব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা উল্লিখিত কোন ঘটনার সহিত সম্পৃক্ত নিদর্শনসমূহের ধারাবাহিক ও স্থায়ী প্রকৃতিকে জোরালো করে। অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরামেরও উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন হযরত শু'আয়ব (আ) এবং মাদায়েনে তাঁহার কওমের উল্লেখ রহিয়াছে। হযরত শু'আয়ব (আ)-এর কওমকে বলা হইয়াছে আসহাবুল আয়কা (গহীন অরণ্যের অধিবাসী) এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে যে বাক্যখানি পুনরাবৃত্ত তাহা হইতেছে ঃ "নিশ্চয়ই উহাতে রহিয়াছে নিশ্চিত নিদর্শন"।[২১]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মক্কার কাফির-মুশরিকরা যখন কোন বিশেষ নিদর্শন মহানবী ﷺ -এর নিকট দেখিতে চাহিত তখন তিনি তাহাদেরকে কুরআন মজীদের আয়াত তিলাওয়াত করিয়া উল্লেখ করিতেন যে, আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ বিশ্বময় বিদ্যমান এবং তাহাদের পরিবেশেও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই বলার ভংগিতে বিচার্য বিষয় এড়াইয়া যাওয়ার কোন প্রবণতা ছিল না, কেননা আগা-গোড়া সুস্পষ্টভাবে তাহা বর্ণনা করা হইত। নিদর্শনসমূহ অথবা মুজিযাসমূহ প্রদর্শন সম্পূর্ণ আল্লাহ জাল্লা শানুহুর নিয়ন্ত্রণাধীন। আম্বিয়ায়ে কিরামের এই শক্তি ছিল না। আল্লাহ যাহাকে এই শক্তি দান করেন তাহার মাধ্যমে কোন মু'জিযা আল্লাহ্ জাহির করিয়া দেন।

বস্তুত পূর্ববর্তী কওমসমূহের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাসের ফলে তাহাদের উপর যে ধ্বংস নিপতিত হইয়াছিল সেই সমস্ত ঘটনার ঐতিহাসিক নিদর্শনসমূহের বিবরণ মক্কার কাফির-মুশরিকদের সামনে তুলিয়া ধরা হয়, যাহাতে তাহারা সত্য প্রত্যাখ্যান করিলে কি বিপর্যয়ে পড়িবে তাহা বুঝিতে পারে। তাহারা মাঝে মধ্যেই যে মু'জিযা দেখাইতে বলিত তাহা ইহার মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিল। আল্লাহ্র গযব ও সমুচিত শাস্তি কোনরূপ বিরাম ছাড়াই ঈমান না আনিলে তাহাদের উপর যে নিপতিত হইতে পারে তাহাও তাহারা বুঝিতে পারে। তাহা ছিল শুধু স্বভাবগত। কেননা নির্দিষ্ট নিদর্শনের জন্য দাবি করা একদিকে আল্লাহ্র শক্তির ব্যাপারে এক ধরনের চ্যালেঞ্জের শামিল ছিল, অন্যদিকে তাঁহার রসূলের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রশ্ন ছিল। এই কারণে যেহেতু কাফির-মুশরিকরা তাহাদের অবজ্ঞাপূর্ণ বিরোধিতা ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার ক্ষেত্রে তাহাদের চ্যালেঞ্জের পরে অটল থাকে সেই হেতু ঐ সমস্ত নিদর্শনের উল্লেখ করিয়া তাহার মুকাবিলা করা হয়। ইহার ফলে কোন বিকল্পের অবকাশ ছিল না, বরং হয় পুরস্কার অথবা শাস্তি অবশিষ্ট থাকে। ইহা ছিল একটি

পরিণাম যাহা আল্লাহ তাঁহার প্রজ্ঞা ও অনন্ত-অসীম করুণায় মক্কার কাফির-মুশরিকদের জন্য চাহেন নাই এবং যাহা আল্লাহ্র রাসূল তাঁহার দয়া ও বিবেচনায় তাঁহার কওমের জন্য চাহেন নাই। ইহার সার্বিক কারণ মক্কার কাফির-মুশরিকদের নিদর্শন প্রদর্শনের দাবি উত্থাপনের মুকাবিলা করিবার জন্য ছিল না, যদিও মহানবী ﷺ-এর মাধ্যমে সত্য সত্যই বহু মু'জিযা বিভাসিত হইয়াছে। এই কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে ১৭ ঃ ৫৯ নং আয়াতে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالايتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الاَوَّلُوْنَ وَاٰتَيْنَا ثَمُوْدَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالايتِ اِلاَّ تَخْوِيْفًا (١٧ : ٥٩).

"পূর্ববর্তীদের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করাই আমাকে নিদর্শন প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখে। আমি শিক্ষাপ্রদ নিদর্শনস্বরূপ ছামূদ জাতিকে উষ্ট্রী দিয়াছিলাম, অতঃপর তাহারা উহার প্রতি জুলুম করিয়াছিল। আমি কেবল ভীতি প্রদর্শনের জন্যই নিদর্শনসমূহ প্রেরণ করি" (১৭ ঃ ৫৯)।

এখানে ছামূদ জাতিকে যে শাস্তি দেওয়া হইয়াছিল তাহা নির্দিষ্ট করিয়া উল্লিখিত না হইলেও তাহাদেরকে যে শাস্তির যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল তাহা স্পষ্টত পরোক্ষভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ একই নীতি বিধৃত হইয়াছে হযরত ঈসা (আ)-এর কওম কর্তৃক আসমান হইতে খাদ্যপূর্ণ খাঞ্চা সরবরাহের দাবি উত্থাপনকালে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

قَالَ اللّٰهُ اِنِّىْ مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَّكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّىْ اُعَذِّبُه عَذَابًا لاَّ اُعَذِّبُهٗ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ (٥ : ١١٥).

"আল্লাহ বলিলেন, আমিই তোমাদের নিকট উহা প্রেরণ করিব। কিন্তু ইহার পর তোমাদের মধ্যে কেহ কুফ্‌রী করিলে আমি তাহাকে এমন শাস্তি দিব, যে শাস্তি বিশ্বজগতের অপর কাহাকেও দিব না" (৫ ঃ১১৫)।

এখানে আরও উল্লেখ্য যে, মহানবী ﷺ মক্কার কাফির মুশরিকদের মু'জিযা প্রদর্শন করিবার দাবিকে গ্রাহ্য না করিয়া তাহাদের দাবি অনুযায়ী আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের শর্তে তাহাদের আলাপ-আলোচনা চালু রাখায় আগ্রহী ছিলেন। ইহার ইঙ্গিত পূর্বোল্লিখিত ৬ ঃ ৩৫ নং আয়াতে রহিয়াছে।[২৩] এই আয়াতে বলা হইয়াছে যে, তিনি যদি চাহেন "ভূগর্ভে একটি সুড়ঙ্গ পথ" কিম্বা আকাশে একটি "সোপন" কাফির-মুশরিকদের দাবিকৃত নিদর্শন আনয়নের জন্য তাহাকে তাহা দেওয়া হইবে। এইরূপ আগ্রহের ইঙ্গিত সূরা ২৬ ঃ ৩-৪ আয়াতে রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلاَّ يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ . اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ (٢٦ : ٤-٣).

"উহারা মু'মিন হইতেছে না বলিয়া তুমি হয়ত মনোকষ্টে আত্মবিনাশী হইয়া পড়িবে। আমি ইচ্ছা করিলে আকাশ হইতে উহাদের নিকট একটি নিদর্শন প্রেরণ করিতাম, ফলে উহাদের গ্রীবা বিনত হইয়া পড়িত উহার প্রতি" (২৬ ঃ ৩-৪)।

মহানবী ﷺ মক্কাবাসীদের এমন এক মু'জিযা দেখাইয়া তাহাদেরকে পরিতৃপ্ত করিবেন যাহা তাহারা ধার্য করিয়া দিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে তিনি ইহা দেখিতে পছন্দ করিতেন না যে, পূর্ববর্তী কওমগুলির ভাগ্যে যেমনটা ঘটিয়াছিল তেমনটা তাঁহার আমলেও ঘটুক। ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় নিম্নোক্ত ঘটনার আলোকে। একদিন মক্কার কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ সমীপে আসিয়া বলিল যে, তিনি যদি সত্যি সত্যিই আল্লাহ্‌র রাসূল হইয়া থাকেন তাহা হইলে সাফা পর্বতকে স্বর্ণের পর্বতে পরিণত করিয়া দিন। তাহাদের এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দো'আ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মধ্যে জাগ্রত হয়। তখন আল্লাহ তাঁহাকে বলেন যে, তাহাদের কামনা মানিয়া লওয়া যাইতে পারে, তবে তাহারা যদি কামনা পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঈমান না আনে তখন আল্লাহ্‌র শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অচিরেই তাহাদের উপর নামিয়া আসিবে এবং তাহারা কোনরূপ ছাড় পাইবে না। তাঁহাকে বলা হয়, তিনি কি তাহাদেরকে ছাড় দেওয়া পছন্দ করেন, নাকি তাহাদের সংশোধিত হওয়া পছন্দ করেন? তিনি দ্বিতীয় বিকল্পটিই বাছিয়া লন।[২৪]

কেবল কাফির-মুশরিকদের বিভ্রান্তি হেতু তাহাদের জন্য এই ধরনের দয়া ও বিবেচনা গ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হইয়াছিল। কাফির-মুশরিকদের অবিশ্বাসের মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল এবং চরম মূর্খতার বশবর্তী হইয়া তাহারা মহানবী ﷺ তাহাদেরকে যে সতর্ক করিয়াছিলেন আল্লাহ্‌র সেই গযব ও শাস্তি তাহাদের উপর ত্বরিত নিপতিত হওয়ার জন্য জিদ্ ধরিয়াছিল। কুরআন মজীদে বারংবার কাফির-মুশকিরদের তরফ হইতে উত্থাপিত বিচারবুদ্ধিহীন দাবিসমূহের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদের ঐ সমস্ত দাবির জবাবও প্রদান করা হইয়াছে, সেই সঙ্গে মহানবী ﷺ -এর প্রতি নির্দেশনাও প্রদান করা হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا اَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَاْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ . يَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالْعَذَابِ وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌ بِالْكٰفِرِيْنَ . يَوْمَ يَغْشٰهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ وَيَقُوْلُ ذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٢٩ : ٥٣-٥٥).

"উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে। যদি নির্ধারিত কাল না থাকিত তবে শাস্তি তাহাদের উপর অবশ্যই আসিত। নিশ্চয় উহাদের উপর শাস্তি আসিবে আকস্মিকভাবে, উহাদের অজ্ঞাতসারে। উহারা তোমাকে শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে বলে। জাহান্নাম তো কাফিকরদেরকে পরিবেষ্টন করিবেই। সেই দিন শাস্তি উহাদেরকে আচ্ছন্ন করিবে ঊর্ধ্ব হইতে এবং নিম্ন দেশ হইতে এবং তিনি (আল্লাহ্) বলিবেন, তোমরা যাহা করিতে তাহা আস্বাদন কর" (২৯ঃ৫৩-৫৫)।

অন্য এক আয়াতে কারীমায় অনুরূপভাবে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

اَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُوْنَ . فَاِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاۤءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ . وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتّٰى حِيْنٍ . وَاَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ (٣٧ : ١٧٩-١٧٦).

"তাহা হইলে উহারা কি আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করিতে চাহে? তাহাদের আঙিনায় যখন শাস্তি নামিয়া আসিবে তখন সতর্কীকৃতদের প্রভাত হইবে কতই না মন্দ! অতএব কিছু কালের জন্য তুমি উহাদেরকে উপেক্ষা কর। তুমি উহাদেরকে পর্যবেক্ষণ কর, উহারা অচিরেই (পরিণাম) প্রত্যক্ষ করিবে" (৩৭ ঃ ১৭৬-১৭৯)।

আবও ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ اِلَيْهِمْ اَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاۤءَنَا فِيْ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُوْنَ (١٠ : ١١).

"আল্লাহ যদি মানুষের অকল্যাণ ত্বরান্বিত করিতেন, যেভাবে তাহারা তাহাদের কল্যাণ ত্বরান্বিত করিতে চাহে, তবে অবশ্যই তাহাদের মৃত্যু ঘটিত। সুতরাং যাহারা আমার সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না তাহাদেরকে আমি অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে দেই" (১০ঃ১১)।

এই বিষয়ে আরও অনেক আয়াত আছে।[৫] সেইগুলিতে একদিকে কাফির-মুশরিকদের মূর্খতাপূর্ণ অযৌক্তিক দাবিগুলির কথা তুলিয়া ধরা হইয়াছে এবং অন্যদিকে তাহাদের আচরণ বদলানোর জন্য যে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমা প্রদর্শন করা হইয়াছিল সে সমস্ত বিবরণও রহিয়াছে। চূড়ান্ত ফলাফল কেবল আসমানী প্রজ্ঞা স্পষ্ট করিয়া দেয় যাহাতে রহিয়াছে কাফির-মুশরিকদের দাবিসমূহের জবাব।

অনুবাদ ঃ হাসান আবদুল কাইয়্যূম

তথ্যনির্দেশিকা

১. কুরআন ১৩ ঃ ৩৮।

২. উপরে দ্র. পৃ. ২৬৫-২৭৪, ৬২১-৬২২।

৩. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৩০০-৩০৮। আরও দ্রষ্টব্য কুরতুবী, তাফসীর, ১০খ., পৃ. ৩৪৬ প.।

৪. দ্রষ্টব্য আত-তাবারী, তাফসীর, ১৫খ., পৃ. ২২৮; আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১০খ, পৃ. ৩৮০-৩৮৫।

৫. দৃষ্টান্তস্বরূপ কুরআন মজীদ ৬ ঃ ৩৭, ৬ ঃ ১২৪; ১৩ ঃ ৭ ও ২৯ ঃ ৫০।

৬. ইব্‌ন হিশাম, পৃ. ২৯৫-২৯৮; ইব্‌ন ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৯৭-১৯৯; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১খ., পৃ. ৪৯-৫১; তাফসীর, ৫খ., পৃ. ১১৫-১১৭।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত।

১০. পূর্বোক্ত বরাত।

১১. উপরে দেখুন, পৃ. ৬২৭-৬২৯।

১২. কুরআন, ৩ ঃ ৪৯।

১৩. কুরআন, ২০ ঃ ১৯-২১।

১৪. এই ঘটনা সম্পর্কে আরও বহু বর্ণনা রহিয়াছে। দ্র. বুখারী, সংখ্যা ৩৮৬৮-৩৮৭১ ও ৪৮৬৪-৬৮; মুসলিম, সংখ্যা ২৮০০-২৮০৩; ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৭ম খ., পৃঃ ৪৪৮-৪৫০ আস-সুয়ূতী, আদ-দুররুল মানসূর, ৫ম খ., পৃ. ৬৬৯-৬৭১।

১৫. কুরআন মজীদে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বহু আয়াত রহিয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দেখুন কুরআন ৬ ঃ ৯৫-৯৯, ৭ ঃ ৫৭-৫৮; ১০ ঃ ৬৭; ১৩ ঃ ২-৪; ১৬ ঃ ৬৫-৬৭, ৬৯, ৭৯; ১৭ ঃ ১২; ২৬ ঃ ৭-৮; ২৮ ঃ ৮৬; ২৯ ঃ ৪৪।

১৬. আরও দেখুন ২৮ ঃ ২৩-৩০, ২৯ ঃ ১৪-১৫ এবং ৫৪ ঃ ৯-১৫।

১৭. আরও দেখুন ২৯ ঃ ৩৮-৪০।

১৮. আরও দেখুন ২৭ ঃ ৪৫ - ৫২; ২৯ ঃ ৩৮।

১৯. ২৬ ঃ১৬০-১৭৫; আরও দ্র. ১৫ ঃ ৫৭-৭৫;২৭ ঃ৫৪ -৫৮, ২৯ ঃ৩১-৩৫; ৫১ ৩১-৩৭।

২০. আরও দেখুন ৫১ ঃ ৩৭ নং আয়াত যাহাতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَتَرَكْنَا فِيْهَا ايَةً لِّلَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ الْعَذَابَ الاَلِيْمَ .

"যাহারা মর্মন্তুদ শাস্তিকে ভয় করে আমি তাহাদের জন্য উহাতে রাখিয়াছি এক নিদর্শন"।

২১. কুরআন, ৫৪ ঃ ১৫।

২২. দ্র. ২৯ ঃ ৩৬ -৩৭; ২৬ ঃ ১৭৬-১৯১।

২৩. কুরআন, উপরে দ্র. পৃ. ৬৩৬-৬৩৭।

২৪. বিভিন্ন বর্ণনা দেখুন, ইব্‌ন কাছীর ,তাফসীর ৩খ., পৃ. ৪৭-৪৮ (১৭ ঃ ৫৯ আয়াতের ব্যাখ্যা)।

২৫. দ্র. ৬ ঃ ৫৮; ৮ ঃ ৩১-৩৩; ১৩ ঃ ৬, ২২ ঃ ৪৭ এবং ৩৮ ঃ ১৬-১৭।

সাতাশতম অধ্যায়

সংঘবদ্ধ বিরোধিতা

উপদেশদানের মাধ্যমে বিরত করিবার প্রয়াস, প্রলোভন, আক্রমণ ও নির্যাতন

নানা ধরনের আপত্তি, যুক্তিতর্ক ইত্যাদি মক্কার কুরায়শ নেতৃবৃন্দ প্রিয়নবী ﷺ-এর নিকট উত্থাপন করা ছাড়াও তাঁহার কর্ম ও মিশন নিষ্ক্রিয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তাহারা তাঁহার কথা না শুনিবার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে লাগিল। তাহারা তাঁহার কর্ম প্রয়াসের অগ্রগতি রোধ করার লক্ষ্যে তাঁহাকে প্রচুর ধন-সম্পদ ও নেতৃত্ব প্রদানের প্রস্তাব দিতেও কুণ্ঠাবোধ করিল না। তাঁহার সহিত একটি সমঝোতায় আসিবারও চেষ্টা চালাইল। একই সঙ্গে তাহারা ইসলামে যাঁহারা দাখিল হইলেন তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহাদের উপর অমানবিক নির্যাতন অব্যাহত রাখিল। এমনকি প্রিয়নবী ﷺ-এর আন্দোলনকে স্তব্ধ করিয়া দিবার লক্ষ্যে তাঁহাকে বিভিন্ন সময় হত্যা করারও বিভিন্ন চেষ্টা চালায়।

এক ঃ উপদেশদানের মাধ্যমে বিরত রাখার চেষ্টা

আল্লাহ্র নির্দেশে প্রিয়নবী ﷺ প্রকাশ্যে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া শুরু করিবার কিছু দিনের মধ্যে হজ্জ মওসুম আসিয়া পড়িল। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ হজ্জে আগমনকারিগণ যাহাতে প্রিয়নবী ﷺ -এর সংস্পর্শে আসিতে না পারে এবং তিনি সেই সময়ে তাহাদের সহিত কথাবার্তা বলিতে না পারেন, যাহা তিনি নিশ্চিতভাবে করিতেন, তাহার জন্য তাহারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ইহা ভালভাবেই বুঝিয়াছিল যে, তাহারা মহানবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে উন্মাদ, উন্মত্ত, কবি, যাদুকর ইত্যাদি যে সমস্ত অপবাদ আরোপ করিয়াছিল তাহা ডাহা বানোয়াট, অসত্য এবং তাহারা ঐ সমস্ত অভিযোগ তৈরি করিয়াছিল শুধু তাঁহার বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে। ঐ সমস্ত অভিযোগ যে অবান্তর ও অসঙ্গত সে ব্যাপারে তাহারা সতর্ক ও সচেতন ছিল। এই কারণে তাহারা কিছু নির্দিষ্ট ও চাতুর্যপূর্ণ অভিযোগ প্রিয়নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে আনয়ন করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করিল। তাহারা মনে করিল, এমন সব অভিযোগ খাড়া করিতে হইবে যাহা সমগ্র আরব হইতে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ ও তীর্থযাত্রীদের নিকট বোধগম্য হয়। সুতরাং কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দের একটি সভায় আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা বলিল, আমরা যে প্রচারণা করিব তাহার বিষয় ও ভাষা যেন একই ধরনের হয়। যদি সেগুলি একরূপ না হয় তাহা হইলে

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে প্রচারণা করিতে যাইয়া বিফল হইতে হইবে। কারণ তাঁহার সম্পর্কে আমাদের বিভিন্ন জনের নিকট হইতে বিভিন্ন রকম কথা শুনিয়া তাহারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া নিরপেক্ষ হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া একজন প্রস্তাব করিল, মহানবী ﷺ-কে গণক হিসাবে প্রচারণা চালানো হউক। তাহার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আল-ওয়ালীদ বলিল, আল্লাহ্র কসম! তিনি গণক নহেন। আমরা তো বহু গণক দেখিয়াছি এবং অনেক গণকের কথা শুনিয়াছি, মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথাবার্তা তো তাহাদের মত নহে। এমনিভাবে কেহ বলিল, তাঁহাকে একজন উন্মাদ হিসাবে প্রচার করা হউক, কেহ বলিল, কবি ইত্যাদি। কিন্তু বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কোনটাই ধোপে টিকিল না। শেষে আল-ওয়ালীদ পরামর্শ দিল, যাহা যুক্তিগ্রাহ্য হইয়া বিবেচ্য হইতে পারে তাহা হইতেছে তাঁহাকে একজন যাদুকর বলিয়া চিহ্নিত করা। কারণ তাঁহার বাক্যে সমাজে বিবোধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং পিতা-মাতা ও তাহাদের সন্তানদের মধ্যে, স্বামীদের এবং তাহাদের স্ত্রীদের মধ্যে, মানুষে মানুষে এবং আত্মীয়ে-আত্মীয়ে বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই এই পরিকল্পনায় সম্মতি জানাইল। ইহার কিছু দিন পর হজ্জ মওসুম আসিয়া গেল। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের লোকজন মক্কা নগরীতে প্রবেশের বিভিন্ন পথের মুখে অবস্থান লইল এবং তাহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাহারা একাকী বা দলে দলে ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল তাহারা তাহাদেরকে মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে সতর্ক করিয়া দিতে লাগিল, তাঁহার সংস্পর্শে না যাওয়ার জন্য বলিল এবং তিনি যে সমস্ত কথাবার্তা বলেন তাহা আমলে না আনিবার জন্য পরামর্শ প্রদান করিল।[১]

মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের, বিশেষ করিয়া আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার পরিকল্পনা উপরিউক্ত ঘটনার সূত্রে কুরআন মজীদের সূরা (৭৪) মুদ্দাছ্ছির-এর ১১ নম্বর আয়াত হইতে ২৭ নম্বর আয়াত পর্যন্ত নাযিল হইয়াছে বলিয়া রিওয়ায়াত আছে।[২]

কুরায়শ নেতৃবৃন্দের এই কৌশল ইসলামের বিস্তৃতিতে বাঁধা সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়; বরং কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সব কলা-কৌশল পরোক্ষভাবে ইসলামের বিস্তৃতিতে সহায়ক হয়। ইব্ন ইসহাক বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, ঐ বৎসর হজ্জ মওসুম শেষ হইয়া গেল এবং আরবরা বাড়িতে ফিরিয়া গেলে মহানবী ﷺ -এর আবির্ভাব এবং তাঁহার বাণীর ধারণা আরবদেশের প্রতিটি এলাকায় যাইয়া পৌঁছিল।[৩]

উপরিউক্ত পরিকল্পনা কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বিশেষভাবে হজ্জ মওসুমের জন্য গ্রহণ করিলেও তাহারা তাহাদের অন্যান্য অভিযোগগুলি উত্থাপন হইতে সম্পূর্ণভাবে বিরত হয় নাই। তাহারা মহানবী ﷺ-এর উপদেশ শোনা, বিশেষ করিয়া তিলাওয়াতে কুরআন শ্রবণ করা হইতে মক্কাবাসীদের নিবৃত্ত করিতে অবিরাম চেষ্টা অব্যাহত রাখে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করিল, কুরআন মজীদের আয়াতে এমন এক আকর্ষণীয় শক্তি রহিয়াছে যাহা শ্রবণ করিলে শ্রবণকারীকে এক মোহনীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত করিয়া তোলে। যখন মহানবী ﷺ অন্যদেরকে শুনাইবার জন্য

কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন তখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এবং তাহাদের দালালরা এমনভাবে শোরগোল ও হৈচৈ শুরু করিয়া দিত যাহাতে তিলাওয়াতের প্রভাব তাহাদের উপর না পড়িতে পারে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কেবল এই কাজ করিবার জন্য কিছু লোক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সমস্ত লোক বিভিন্ন স্থানে মহানবী ﷺ-এর পিছনে লাগিয়া থাকিয়া তিনি যেখানেই কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন সেখানেই তাহারা শোরগোল সৃষ্টি করিয়া বাঁধার সৃষ্টি করিত। এমনকি তাহারা এইজন্য তাঁহার ডান ও বাম দিক হইতে কখনও কখনও ঘেরাও করিয়া নানা ধরনের আপত্তিকর ধ্বনি তুলিত। কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে অবিশ্বাসীদের এই সমস্ত কৌশলের উল্লেখ রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لاَ تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَالْغَوْا فِيْهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُوْنَ (٤١:٢٦).

"আর কাফিররা বলে, তোমরা এই কুরআন শ্রবণ করিও না এবং উহাতে (আবৃত্তিকালে) শোরগোল সৃষ্টি কর যাহাতে তোমরা জয়ী হইতে পার" (৪১ ঃ ২৬)।[৪]

فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ . عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ .

"কাফিরদের হইল কি যে, উহারা তোমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে (পাগলের মত) ডান দিক হইতে ও বাম দিক হইতে দলে দলে" (৭০ ঃ ৩৬-৩৭)।[৫]

মহানবী ﷺ একাকী যখন কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন তখন কাফির-মুশরিকরা তাঁহাকে একাকী থাকিতে দিত না, এমনকি গৃহে (কিম্বা দারুল আরকামে) সালাতে তিলাওয়াতকালেও। যদি গৃহের বাহির হইতে তাহারা এই ধরনের তিলাওয়াত শুনিত তাহারা সেখানে তড়িঘড়ি করিয়া সমবেত হইত এবং শোরগোল শুরু করিয়া দিত যাহাতে তিলাওয়াতের আওয়াজ অন্য কাহারও কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতে না পারে।[৬] কাফির-মুশরিকদের এই ধরনের আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ ঃ ১১০ আয়াত নাযিল হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত আছে। মহানবী ﷺ -কে সম্বোধন করিয়া ইরশাদ হইয়াছে ঃ

. وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلاً (١٧ : ١١٥).

"তোমার সালাতের স্বর উচ্চ করিও না এবং অতিশয় ক্ষীণও করি না; এই দুইয়ের মধ্য পথ অবলম্বন কর?" (১৭ ঃ ১১০)।[৭]

এমনকি লোকজনকে কুরআন মজীদ শ্রবণ করা হইতে নিবৃত্ত করিবার এই ধরনের প্রয়াস পাওয়ার পরও যদি কেহ এই ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু হইত এবং নেতৃবৃন্দের নিকট ইহার অন্তর্নিহিত অর্থ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইত তখন কাফির নেতৃবৃন্দ ইহার অত্যন্ত মন্দ ও বিপরীত ব্যাখ্যা করিত এবং কথার মারপ্যাঁচে ফেলিয়া ইহার এমন বিকৃত অর্থ করিত যাহাতে ইহার প্রতি অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির কোনরূপ আগ্রহ না থাকে। কখনও কখনও তাহারা ওহীর বিবরণ সম্পর্কে

বলিত, ইহা প্রাচীন সব কাহিনী আর উপাখ্যান বৈ আর কিছু নহে (لَاَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ)। কুরআন মজীদে কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দের এই সমস্ত আচরণের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, তাহারা এইরূপ করিলে যে পাপ হইবে তাহার জন্য দায়দায়িত্ব তাহাদিগকে বহন করিতে হইবে, এমনকি অংশত হইলেও তাহারা যাহাদিগকে মিথ্যা কথা বলিয়া পথভ্রষ্ট করিয়াছে তাহাদের পাপের দায়ভার তাহাদেরই। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ مَّاذَا اَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوْآ اَسَاطِيْرُ الاَوَّلِيْنَ ، لِيَحْمِلُوْآ اَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَّوْمَ الْقِيمَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّوْنَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ .

"যখন উহাদেরকে বলা হয়, তোমাদের রব কি নাযিল করিয়াছেন? তখন উহারা বলে, পূর্ববর্তীদের উপকথা। ফলে কিয়ামত দিবসে উহারা বহন করিবে উহাদের পাপভার পূর্ণ মাত্রায় এবং পাপভার তাহাদেরও যাহাদেরকে উহারা অজ্ঞতাহেতু বিভ্রান্ত করিয়াছে" (১৬ ঃ ২৪-২৫)।[৮]

اِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِىْ ايتِنَا لاَ يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا اَفَمَنْ يُّلْقى فِى النَّارِ خَيْرٌ اَمْ مَّنْ يَّاْتِىْ امِنًا يَّوْمَ الْقِيمَةِ اِعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٤١ : ٤٠).

"যাহারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে নিশ্চয় তাহারা আমার অগোচর নহে। শ্রেষ্ঠ কে যে ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে সে, না যে কিয়ামতের দিন নিরাপদ থাকিবে সে? তোমাদের যাহা ইচ্ছা কর; তোমরা যাহা কর তিনি তাহার সম্যক দ্রষ্টা" (৪১ ঃ ৪০)।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ আন-নাদর ইব্ন হারিছ-এর পরামর্শক্রমে জনগণকে মহানবী ﷺ-এর সংস্পর্শ হইতে দূরে রাখিবার অন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে বলিয়াছিল, মহানবী ﷺ-কে কবি, উন্মাদ, যাদুকর ইত্যাদি বলিয়া অভিহিত করিবার তাহাদের কৌশলাদি ত্রুটিপূর্ণ, অযৌক্তিক ও আত্মঘাতী। কারণ তিনি ত কবি, উন্মাদ কিংবা যাদুকর কোনটাই নহেন। আন-নাদর কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে বলিল, একটি বাস্তবসম্মত বিনোদন কর্মসূচী জনগণের জন্য গ্রহণ করিতে হইবে—যাহাতে থাকিতে হইবে পারস্যের রুস্তম এবং ইসফানদিয়ার প্রমুখের মত মহাবীরদের কিস্সা-কাহিনী, উপাখ্যান প্রভৃতি। কুরায়শ নেতারা এই পরামর্শ গ্রহণ করিল এবং আন-নাদরকে এই কাজ সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব অর্পণ করিল। তদনুযায়ী সে ঐ সমস্ত কিস্সা-কাহিনী, উপাখ্যান সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিল এবং লোকজনকে সরাইয়া আনিবার জন্য সেগুলিকে কবিতার ছন্দে শোনাইত। কোন স্থানে মহানবী ﷺ কোন সমাবেশে বক্তব্য শেষ করিলে কিংবা কুরআন মজীদ আবৃত্তি করিয়া শুনানো শেষ করিলেন তৎক্ষণাৎ সেখানে আন-নাদর দণ্ডায়মান হইয়া সমবেত লোকজনের সামনে দেহ হেলাইয়া-দুলাইয়া ঐ সমস্ত কিস্সা-কাহিনী ছন্দের তালে তালে আওড়াইত এবং শেষ করিত লোকজনকে এই কথা বলিয়া

যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর কথাবার্তা অপেক্ষা তাহার এই সমস্ত কাহিনী কাব্যগুলি কি অধিকতর সুন্দর ও আকর্ষণীয় নহে?[৯]

আরও জানা যায় যে, আন-নাদর এই কাজে কিছু তরুণ, নর্তকী ও গায়িকাকে নিযুক্ত করে জনগণকে আকৃষ্ট করিবার লক্ষ্যে যাহাতে তাহারা মহানবী ﷺ-এর ইসলামের প্রতি আহ্বান না শোনে এবং কুরআন মজীদের তিলাওয়াতে কর্ণপাত না করে।

দুই ঃ প্রলোভন এবং সমঝোতার চেষ্টা

একদিকে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ নানা ধরনের উপদেশ প্রদান ইত্যাদি কৌশলের মাধ্যমে জনগণকে মহানবী ﷺ-এর কথা না শুনিবার জন্য প্রলুব্ধ করিতে লাগিল, অন্যদিকে তাহারা মহানবী ﷺ-কে তাঁহার সত্য দীন প্রচারের পথ রুদ্ধ করিবার প্রক্রিয়া হিসাবে তাঁহাকে ধন-সম্পদ, মান-মর্যাদা ও নেতৃত্বদানের লোভ দেখাইতে লাগিল। এই প্রচেষ্টা কাফির-মুশরিকবৃন্দ তখনই চালাইতে লাগিল যখন তাহারা দেখিল যে, শত্রুতা ও বিরোধিতার কোন কৌশল প্রয়োগ করিয়া মহানবী ﷺ-কে নিবৃত্ত করা যাইতেছে না, বরং দিন দিন তাঁহার আহ্বানে লোকজন ধীরে ধীরে ইসলামে দাখিলই হইতেছে এবং ইসলাম প্রচারের ভিত্তি ও শক্তি দৃঢ় হইতেছে। উহার গতি আর মন্থর থাকিতেছে না, বরং তাহা অটল হইয়া দ্রুত প্রসারিত হইতেছে।

তাহাদের কৌশলী তৎপরতার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হইতেছে বিভিন্ন মু'জিযা প্রদর্শনের প্রস্তাব উত্থাপন যাহা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।[১০]

ইব্ন ইস্হাক তাহাদের দ্বারা গৃহীত এই ধরনের উদ্যোগের বিবরণ তুলিয়া ধরিতে যাইয়া বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত হামযা (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলে তাহারা দেখিল, মহানবী ﷺ-এর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতছে।[১১]

একদিন মহানবী ﷺ কা'বা চত্বরে একাকী বসা ছিলেন। 'উতবা ইব্ন রাবী'আ এবং অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দও চত্বরের অন্য প্রান্তে অবস্থিত তাহাদের সমাবেশের জায়গাটিতে বসা ছিল। তাহারা মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে একান্তভাবে কথা বলিবার সুযোগ পাইল। 'উতবা কুরায়শ নেতাদের কাছে প্রস্তাব করিল যে, যদি তাহারা তাহাকে অনুমতি দেয় তাহা হইলে সে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাইয়া আপস-মীমাংসার কিছু প্রস্তাব পেশ করিত। সে আরও বলিল , তিনি হয়ত তাহার দ্বারা পেশকৃত প্রস্তাবের কিছু কিছু গ্রহণ করিবেন এবং যাহার ফলে তিনি হয়ত তাঁহার প্রচারকার্য হইতে বিরত হইবেন।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ 'উতবার প্রস্তাবে সম্মত হইল এবং তাহাকে মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে আপোস-মীমাংসা লক্ষ্যে মধ্যস্থতা করিবার ক্ষমতা প্রদান করিল। মহানবী ﷺ সমীপে কি কি ধরনের প্রস্তাব উত্থাপন করিবে তাহা লইয়াও তাহারা বোঝাপড়া ও আলাপ-আলোচনা করিয়া

সকলেই ঐকমত্যে পৌছিল। তদনুসারে 'উতবা মহানবী -এর নিকট যাইয়া অত্যন্ত আন্তরিকতার সহিত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, বংশীয় মর্যাদার কারণেই সমাজে তাঁহার একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান রহিয়াছে। কিন্তু তিনি সমাজকে খুবই আন্দোলিত করিয়া তুলিয়াছেন এবং তাঁহার কার্যকলাপের দ্বারা তিনি সমাজে মতদ্বৈতার সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্য আর একবারের মত এইবারও 'উতবা তাঁহাকে এক পর্যায়ে বলে, যদি তাঁহার অঢেল ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্য থাকে কিংবা নেতা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে তিনি যত ধন-সম্পদ চাহিবেন তাহারা তাহা দিবে এবং তাহারা তাঁহাকে তাহাদের নেতা হিসাবেও গ্রহণ করিবে, এমনকি তাঁহাকে তাহাদের রাজা করিবে এবং তাঁহার সম্মতি ও অনুমোদন ছাড়া কোন ব্যাপারে তাহারা কোন লেন-দেন, কাজ-কারবার সম্পাদন করিবে না। অপরদিকে যদি তিনি কোন অপশক্তির প্রতি মোহাবিষ্ট হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাহা হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা-তদবীর করিবে; তাঁহার সেই আরোগ্য লাভের জন্য যত ব্যয় হইবে তাহা তাহারা বহন করিবে।

উতবার ঐসব কথা বলা শেষ হইলে মহানবী -তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কি আর কিছু বলিবার আছে? সে উত্তরে বলিল, আমার যাহা কিছু বলিবার ছিল তাহা বলা হইয়া গিয়াছে। তখন মহানবী বলিলেন ঃ আমি এখন যাহা তিলাওয়াত করিব তাহা তুমি মনোযোগ সহকারে শোন। এই বলিয়া তিনি সূরা (৪১) হা-মীম আস-সাজদা তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। উতবা গভীর মনোযোগ সহকারে তিলাওয়াত শুনিতে লাগিল, এমনকি সে একদম আত্মহারা অবস্থায় উপনীত হইল। তিলাওয়াত শেষে মহানবী সিজ্দা করিলেন। কারণ এই সূরার ৩৮ নম্বর আয়াত তিলাওয়াতশেষে সিজদা করিতে হয়। সিজদা হইতে মস্তক মুবারক উত্তোলন করিয়া তিনি বলিলেন ঃ উতবা! তুমি যে সমস্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছ উহার জবাব কি তুমি পাইয়াছ?

উতবা অত্যন্ত চিন্তিত মেযাজে সেই স্থান ত্যাগ করিল। সে যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দের কাছে গেল তখন তাহারা দেখিতে পাইল, এই উতবা আর সেই উতবা নয়, বরং সে এখন এক বদলে যাওয়া মানুষ। সে যে চেহারা লইয়া হযরত মুহাম্মাদ -এর নিকট গিয়াছিল কিন্তু ফিরিয়া আসিতেছে অন্য রকম হইয়া।

উতবা তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি! তোমার কি হইয়াছে? অত্যন্ত শান্তভাবে উত্তরে 'উতবা বলিল, সে একটু আগে হযরত মুহাম্মাদ -এর নিকট হইতে যাহা শুনিয়াছে তাহা সে জীবনে কখনও শোনে নাই। আল্লাহ্‌র কসম দিয়া 'উতবা বলিতে লাগিল, হে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ! ইহা কোন কবিতা নহে। তোমরা আমার কথা শোন এবং আমার উপদেশ গ্রহণ কর। তিনি যাহা প্রচার করিতেছেন, সে ব্যাপারে তোমরা হস্তক্ষেপ করিও না। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তাঁহার নিকট হইতে যে কালাম শুনিয়াছি তাহা এক মহাবাণীতে

পরিপূর্ণ। এতদসত্ত্বেও যদি 'আরবরা তাঁহার উপর কর্তৃত্ব করে তাহা হইলে তোমাদের চেষ্টা ব্যতিরেকে তোমাদের কাজ সফল হইয়া যাইবে। আর যদি কোন কিছুর উপর প্রভাব না খাটাইয়া যদি তোমরা তাঁহার বিধান ও আদর্শ গ্রহণ কর তাহা হইলে তোমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এবং তাঁহারই কারণে সুখের জীবন লাভ করিতে পারিবে।

এই কথা শুনিয়া কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বলিয়া উঠিল, ওহে আল-ওয়ালীদের পিতা! নিশ্চয় তুমি তাঁহার কালামের প্রভাবে মোহগ্রস্ত হইয়াছ। 'উতবা উত্তরে বলিল যে, সে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে; এখন তাহারা যাহা ভাল মনে করে করিবে, ইহা তাহাদের ব্যাপার।[১২]

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বারংবার যে একই ধরনের প্রস্তাব মহানবী ﷺ-এর নিকট পেশ করিয়াছিল তাহার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হইতেছে ঃ তাহারা আবূ তালিবের নিকটও একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিয়াছিল। ইহা হইতেছে সেই বিষয়ের সহিত সম্পৃক্ত ঘটনা যখন আবূ তালিব কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যে প্রস্তাবগুলি দিয়াছিল তাহা মহানবী ﷺ-কে অবহিত করায় তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তিনি কোন অবস্থাতেই তাঁহার উপর আল্লাহ যে দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছেন তাহা হইতে বিচ্যুত হইবেন না, বরং তিনি তাঁহার প্রচার কার্য অব্যাহত রাখিবেন। তাঁহার জবাবের ধরন দেখিয়া কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যে তাহাদের সম্মিলিত হুমকি এবং চূড়ান্ত প্রস্তাব সেই সময় পেশ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, এমন কি তাহারা মহানবী ﷺ-কে ধন-সম্পদ ও মর্যাদার প্রলোভনও দেখাইয়াছিল এই বলিয়া যে, যদি তিনি শুধু তাঁহার কাজ করা হইতে নিবৃত্ত থাকেন তাহা হইলে ঐ সমস্ত কিছু তাঁহাকে দেওয়া হইবে।[১৩]

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সেখানেই ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা মহানবী ﷺ-কে তাঁহার প্রচার কার্য হইতে ফিরাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে প্রয়াস অব্যাহত রাখিল। তাই তাহারা ঈমান ও ইবাদতের ক্ষেত্রে একটি আপোসমূলক ফরমূলা প্রদানের মাধ্যমে তাঁহার মিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করিল। বর্ণিত আছে যে, কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ একটি প্রস্তাব লইয়া মহানবী ﷺ-এর দরবারে হাজির হইয়া বলিল যে, তাহারা তাহাদের বিরোধিতায় ক্ষান্তি দিবে যদি মহানবী ﷺ এবং তাঁহার অনুসারিগণ শুধু তাহাদের দেব-দেবীদের বেলায় কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করেন এবং তিনি যে ঈমানের বিধান প্রচার করিতেছেন উহার সহিত উহাদের দেব-দেবীর জন্যও কিছু মর্যাদা নির্ধারণ করিয়া দেন। তাহারা এই প্রস্তাবও উত্থাপন করিল যে, তাহারা এক বৎসর আল্লাহ্র ইবাদত করিতে রাজী আছে যদি মহানবী ﷺ পরবর্তী বৎসর তাহাদের বিগ্রহগুলির আরাধনা করিতে রাজি হন। সেই সঙ্গে তাহারা ইহাও বলিল যে, এই সমঝোতায় সুবিধা হইতেছে যে, যদি আল্লাহ্র ইবাদত করাতে কোন কল্যাণ থাকে তাহা দ্বারা তাহারা লাভবান হইবে, অন্যদিকে বিগ্রহদের আরাধনা করায় যাহা কিছু মঙ্গল সাধিত হইবে তাহা মহানবী ﷺ এবং তাঁহার অনুসারিগণের উপর বর্তাইবে। মহানবী ﷺ এই অবান্তর প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করিয়া

দিলেন। কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দের এই কূটকৌশলপূর্ণ প্রস্তাবের সূত্র ধরিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহু মহানবী ﷺ-কে উদ্দেশ্য করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

قُلْ يَاَيُّهَا الْكفِرُوْنَ . لاَ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ . وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ . وَلاَ اَنَا عَابِدٌ
مَّا عَبَدْتُّمْ . وَلاَ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا اَعْبُدُ . لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِىَ دِيْنِ .

“বল, হে কাফিররা! আমি তাহার ‘ইবাদত করি না যাহার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তাঁহার ইবাদতকারী নহ যাঁহার ‘ইবাদত আমি করি, এবং আমি ‘ইবাদতকারী নহি তাহার যাহার আরাধনা তোমরা করিয়া আসিতেছ এবং তোমরাও তাঁহার ‘ইবাদতকারী নহ যাঁহার ইবাদত আমি করি। তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার দীন আমার” (১০৯)।[১৪]

অন্য এক পর্যায়ে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হইয়া ঐ একই ধরনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া তাহাদের দেব-দেবীদের ব্যাপারে কিছু ছাড় দিবার জন্য আরজী পেশ করিল। একটি বর্ণনা হইতে জানা যায়, তাহারা এক রাত্রে মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হইল এবং সকাল পর্যন্ত তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনা করিল। তাহারা অত্যন্ত নমনীয় ছিল এবং মহানবী ﷺ-কে তাহারা তাহাদের নেতা হিসাবে সম্বোধন করিতেছিল। তাহারা তাঁহাকে তাহাদের দেব-দেবীদের ব্যাপারে সমঝোতায় আসার জন্য তাঁহার সুবিবেচনা কামনা করিতেছিল যাহাতে তাহাদের মুখও রক্ষা হয় আবার তাঁহার অনুসরণ করিতেও কোনরূপ ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয়। অন্য এক বর্ণনা হইতে জানা যায়, এই ব্যাপারে মুশরিক সরদার উমায়্যা ইব্ন খালাফ এবং আবূ জাহ্ল প্রমুখ অন্যান্য নেতাদের সহিত উপস্থিত থাকিয়া মহানবী ﷺ-কে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কুরআন মজীদে সূরা (১৭) বনী ইসরাঈলের ৭২-৭৩ আয়াতে এই ঘটনার পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে এবং আল্লাহ তাঁহার রাসূলকে কিভাবে কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দের বদ মতলবের খপ্পর হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে সম্পর্কে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهٗ وَاِذًا لاَّتَّخَذُوْكَ
خَلِيْلاً . وَلَوْ لاَ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً . اِذًا لاَّذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ
وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا . وَاِنْ كَادُوْا لَيَسْتَفِزُّوْنَكَ مِنَ الْاَرْضِ
لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَاِذًا لاَّ يَلْبَثُوْنَ خِلٰفَكَ اِلاَّ قَلِيْلاً (١٧ : ٧٣-٧٦).

“আমি তোমার প্রতি যাহা প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে উহারা পদস্খলন ঘটাইবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করিয়াছিল যাহাতে তুমি আমার সম্বন্ধে উহার বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন কর; তবেই উহারা অবশ্যই তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত। আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখিলে তুমি উহাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতে; তাহা হইলে অবশ্যই তোমাকে ইহজীবনে দ্বিগুণ ও

পরজীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদন করাইতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতে না। উহারা তোমাকে দেশ হইতে উৎখাত করিবার চূড়ান্ত চেষ্টা করিয়াছিল তোমাকে সেখান হইতে বহিষ্কার করিবার জন্য। তাহা হইলে তোমার পর উহারাও সেখানে অল্পকাল টিকিয়া থাকিত" (১৭ ঃ ৭৩-৭৬)।

এই সমস্ত আয়াত হইতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, মহানবী ﷺ কাফির-মুশরিকদের সহিত আপোস-মীমাংসা করিতে এক চুল পরিমাণও অগ্রসর হন নাই। কেননা আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু তাঁহার অন্তরকে শক্তিশালী করিবার মাধ্যমে এবং ঈমান ও নীতিসমূহে অটল থাকিবার শক্তিদানের মাধ্যমে এই ধরনের ফাঁদ হইতে তাঁহাকে হেফাযত করিয়াছেন। এমনকি এই আয়াতের যতই বিরূপ ব্যাখ্যা করা হউক না কেন ইহা হইতে কাফির-মুশরিকদের চতুর মনোভাবের মুকাবিলায় মহানবী ﷺ-এর মানসিক সুদৃঢ় অবস্থার কথা প্রকাশ পায়; বরং বিপরীতক্রমে ইহাতে ইহা প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তিনি কোনরূপ আপোস-মীমাংসার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন নাই। কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে ঈমান ও নীতির ব্যাপারে কোনরূপ আপোস-সমঝোতায় যাওয়াটাও যে দোষের তাহাও ৭৬ নম্বর আয়াতে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা মহানবী ﷺ-এর জন্য যেমন সতর্কতামূলক নির্দেশ ছিল তেমনি এই নির্দেশ মু'মিনদের জন্যও প্রযোজ্য। এইরূপ আপোস-মীমাংসায় যাওয়াটা যে আল্লাহ অনুমোদন করেন না তাহাও এখানে উল্লিখিত হইয়াছে।

উপরে উল্লিখিত সুস্পষ্ট দৃষ্টান্তসমূহ এবং কুরআন মজীদ ও সাধারণ বর্ণনাদি হইতেও প্রতীয়মান হয় যে, মক্কার কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ সব সময়ই আপোস উদ্যোগ গ্রহণ করিত এবং নানা ধরনের প্রস্তাব পেশ করিত। তাহাদের জন্য এরূপ করা স্বাভাবিক ছিল। কেননা তাহাদের মর্যাদা এবং কায়েমী স্বার্থের ক্ষেত্রে এই নূতন বাণী হুমকিস্বরূপ ছিল এবং সেই কারণে তাহারা তাহা প্রতিহত করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিল। অন্যদিকে মহানবী ﷺ আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন আল্লাহ্র বাণী ঘোষণা করিতে এবং জনগণকে সতর্ক করিয়া দিতে। কাফির-মুশরিকদের সহিত আপোস করিবার কোনরূপ অবকাশই ছিল না। আল্লাহ জাল্লা শানুহু পূর্বাহ্নেই যথাযথ সতর্কবাণী প্রদান এবং নির্দেশনা প্রদান করিয়া দেন, সেই সঙ্গে কাফির-মুশরিকদের ছলাকলা তাঁহাকে জানাইয়া দিয়া আসন্ন সংকট ও কষ্টের মুকাবিলা যে তাঁহাকে করিতে হইবে তাহাও অবহিত করেন। ইসলাম প্রচারের সূচনাতেই আল্লাহ তাঁহার প্রতি ওহী নাযিল করিয়া ইরশাদ করেন ঃ

وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ .

"এবং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ কর" (৭৪ ঃ ৭)।

প্রাথমিক কালে নাযিলকৃত অন্য এক ওহীর মাধ্যমে তাঁহাকে সতর্ক করিযা দিয়া আল্লাহ জাল্লা শানুহু ইরশাদ করেন ঃ

وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ . وَلاَ تُطِعْ كُلَّ حَلاَّفٍ مَّهِيْنٍ . هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ .

"উহারা চায়, তুমি নমনীয় হও, তাহা হইলে উহারাও নমনীয় হইবে। আর তুমি অনুসরণ করিও না তাহার—যে কথায় কথায় হলফ করে, যে লাঞ্ছিত, পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগাইয়া বেড়ায়" (৬৮ ঃ ৯-১১)।

কুরআন মজীদের ভাষ্যকারদের মতে এখানে আবূ জাহ্লের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য কুরায়শ নেতার ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। এখানে আরও লক্ষণীয় যে, এই আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ একটা আপোস-মীমাংসায় আসিতে উদ্গ্রীব ছিল। অধিকন্তু ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাহারা সেই মনোভাব প্রদর্শনে আন্তরিক ছিল না। কেননা তাহাদের কেহ কেহ আপোসের আশ্বাস দিয়াও অন্যদিকে মহানবী ﷺ-এর নিন্দা করিত এবং মিথ্যা অপবাদ রটনা করিত। এই সমস্ত আয়াত ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি আয়াত রহিয়াছে যেগুলিতে গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ-এর নিকট যাহা কিছু নাযিল হইয়াছে তাহার সবই আল্লাহ্র নিকট হইতে নাযিল করা হইয়াছে। তিনি যদি কোনরূপ মিথ্যা বাণী শোনান তাহা হইলে তাঁহাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করিতে হইবে। কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيْلِ . لأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ . ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .(٦٩:٤٤-٤٦)

"সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইতে চেষ্টা করিত, আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার জীবন ধমনী" (৬৯ ঃ ৪৪-৪৬)।

কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতা, হয়রানী, এমনকি দারুণ নির্যাতনকে পরিহারের উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ ঈমান ও ইবাদত (তাওহীদ)-এর ব্যাপারে তাহাদের সঙ্গে আপোস করিবার কোন অভিপ্রায় আদৌ তাঁহার যে ছিল না তাহা প্রতিভাত হয়। ইহার বিপরীত অর্থ করাটা অযৌক্তিক।

তিন ঃ সহিংস আক্রমণ ও নির্যাতন

উৎসগ্রন্থসমূহ হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, উপরে উল্লিখিত পদ্ধতি অবলম্বনের পাশাপাশি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমেও কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ-কে ইসলাম প্রচার করা হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রয়াস প্রায়। তদুপরি নও মুসলিমগণকে ইসলাম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিতেও শক্তি প্রয়োগ করে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ ও মুসলমানগণের নূতন কায়দায় কা'বা শরীফের সন্নিকটে এবং প্রকাশ্য স্থানে ইবাদতের বিরোধিতা করে। যদি তাঁহারা তাহা প্রকাশ্যে করিবার প্রয়াস পাইতেন তাহা হইলে কাফির-মুশরিককরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিত এবং প্রবল

আঘাত হানিয়া জর্জরিত করিবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিত। এই ধরনের চরম বিরোধিতা ও আক্রমণের কারণে মুসলমানগণ উপত্যকার নির্জন স্থানে সালাত আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও কাফির-মুশরিকরা যেখানেই মুসলমাগণকে 'ইবাদতে রত দেখিতে পাইত তাহাদের উপর আক্রমণ চালাইত। এই ধরনের মারাত্মক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দারুল আরকামকে মুসলমানগণ তাঁহাদের সমাবেশ এবং সালাতের স্থান হিসাবে শত বাধা সত্ত্বেও নির্ধারিত করেন। এইসব বিরোধিতার মুখ্য নেতৃত্ব দেয় আবূ জাহল। আবূ জাহলের এই ভূমিকা উল্লেখ করিয়া কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

أَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى . عَبْدًا اِذَا صَلّٰى (٩٦ : ١٠-٩).

"তুমি কি উহাকে দেখিয়াছ, যে বাধা দেয় এক আল্লাহর বান্দাকে যখন সে সালাত আদায় করে" (৯৬ ঃ ৯-১০)?

এখানে আল্লাহ্র বান্দা উল্লেখ করিয়া সুস্পষ্টভাবে মহানবী ﷺ-কে বুঝানো হইয়াছে যখন তাঁহার প্রতিপক্ষ, যেমনটি এই সূরার অন্যান্য আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে, নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সম্পদের অধিকারী ও অনুসারীদের সংখ্যাধিক্যের অধিকারী মনে করিত। সূরা (৯৬) 'আলাকের ১৭ নম্বর আয়াত فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ -এর এই 'নাদিয়া'-এর অর্থ হচ্ছে 'পার্শ্বচর' অর্থাৎ হয় তাহার অনুসারিগণ অথবা অতি পরিচিত দারুন নাদ্ওয়া অর্থাৎ কুরায়শ মুরব্বীদের পরিষদ যাহা জনসাধারণের বিষয়াদি লইয়া কা'বা চত্বরের একটি নির্ধারিত স্থানে বসিত। বিশেষভাবে জানা যায়, কুরআনের উক্ত বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে আবূ জাহ্লের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এই বর্ণনাও রহিয়াছে যে, সে মহানবী ﷺ যাহাতে কা'বা চত্বরে সালাত আদায় করিতে না পারেন সেজন্য বিভিন্ন সময় প্রচেষ্টা চালাইয়াছে, তাঁহাকে আঘাত করিবারও চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু প্রতিটি সময়ে ফেরেশতাগণের দ্বারা প্রচণ্ডভাবে বাঁধাগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছে।[১৫] এই ধরনের চেষ্টা কাফিরদের মধ্য হইতে অন্যরাও করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে কুরআন মজীদের অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ يَدْعُوْهُ كَادُوْا يَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِ لِبَدًا (٧٢ : ١٩).

"আরও এই যে, যখন আল্লাহ্র বান্দা তাঁহাকে ডাকিবার জন্য দণ্ডায়মান হইল, তখন তাহারা তাহার নিকট ভীড় জমাইল" (৭২ ঃ ১৯)।[১৬]

ইহাদের মধ্যে অন্যতম হইতেছে 'উকবা ইব্ন আবূ মু'আয়ত। একদিন মহানবী ﷺ কা'বা শরীফের নিকটে সালাত আদায় করিতেছিলেন। এমন সময় আবূ জাহ্ল এবং অন্যান্য কুরায়শ নেতাদের উস্কানি পাইয়া যবাহকৃত মাদী উটের নাড়িভূঁড়ি ও বর্জ্যাদি সিজদারত মহানবী ﷺ -এর পিঠের উপর ছুড়িয়া মারিল। নরাধম কুরায়শ নেতারা এই বীভৎস ও দুষ্টামীপূর্ণ দৃশ্য দেখিতে পাইয়া হাসিতে ফাটিয়া পড়িল। এমতাবস্থায় কেবল তাঁহার ছোট কন্যা হযরত ফাতিমা

(রা) আসিয়া পৃষ্ঠের উপর হইতে নাড়িভূঁড়ি ও আবর্জনাসমূহ সরাইয়া দিলে তিনি সিজদা হইতে মাথা তুলিলেন।[১৭]

যদিও মহানবী ﷺ কাফির-মুশকিরদের শত্রুতার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিলেন তবুও যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহারাও শাস্তি ও নির্যাতনের খপ্পর হইতে রক্ষা পান নাই। যখনই কাফির-মুশরিকরা জানিতে পারিত, অমুক ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা তাঁহার উপর নানা ধরনের আক্রমণ করিয়া নির্যাতন চালাইত, তাঁহাকে অবরোধ করিত, তাঁহাকে অবরোধ করিয়া তাঁহার নিকট পানি ও খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিত যাহাতে তিনি বাধ্য হইয়া ইসলাম ত্যাগ করিয়া পুরাতন ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়া আসেন। আর এক তথ্য হইতে জানা যায়, কোন ব্যক্তি পরিবার ও পুরাতন বিশ্বাসকে ত্যাগ করিয়া ইসলামে দাখিল হইলে আবূ জাহ্ল তাঁহার নিকট যাইয়া বাপ-দাদার ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করার জন্য তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিত। তাঁহার ব্যবসা-বাণিজ্য ধ্বংস করিয়া দিবে বলিয়া হুমকি দিত, তাঁহাকে বয়কট করিবে এবং তাঁহার সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিয়া দিবার তাবৎ পন্থা অবলম্বন করিবে।[১৮]

স্বভাবতই ইসলাম গ্রহণকারীর নিজের গোত্র এবং পরিবার তাঁহাকে শাস্তি প্রদানে ও হয়রানি করায় মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হইত। আবূ বাক্র (রা), তালহা (রা) ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা) প্রমুখের উপর হামলা ও হয়রানি করিবার বিবরণ ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে।[১৯]

এমনি আরো অনেক হয়রানি ও নির্যাতনমূলক ঘটনা রহিয়াছে। প্রতিটি ঘটনাতেই লক্ষ্য করা যায়, যাহারা ইসলামে দাখিল হইতেন কাফির-মুশরিকরা তাঁহাদের সহিত একই ধরনের আচরণ করিত। আয-যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার চাচা তাঁহাকে আটক করিয়া তাঁহার শরীর মাদুর দ্বারা জড়াইয়া দিয়া মাটিতে চক্রাকারে গড়াগড়ি দেওয়ায় এবং অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন চালায় এবং ভীষণ উত্তাপে ধোঁয়ার মধ্যে শায়িত করিয়া নূতন দীন পরিত্যাগে বাধ্য করিতে চেষ্টা করে। তিনি সকল প্রকারের নির্যাতন সহ্য করেন, কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করেন নাই।[২০]

হযরত উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা) ইসলাম গ্রহণ করিলে তাঁহার চাচা আল-হাকাম[২১] তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখে এবং ইসলাম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত ভীষণ শাস্তি প্রদানের হুমকি দিতে থাকে। তিনি দীর্ঘ সময় ধরিয়া সেই নির্যাতন সহ্য করিতে থাকেন, তবুও ইসলাম ত্যাগ করেন নাই।[২২]

মুস'আব ইব্ন 'উমায়র ইসলামে দাখিল হইলে তাঁহার চাচাতো ভাই উছমান ইব্ন তালহা ভীষণ নির্যাতন চালায়। মুস'আবকেও আটকাইয়া রাখা হয় এবং তাঁহার আত্মীয়-স্বজনদের দ্বারা তিনি অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকেন। শেষমেষ তিনি নিজেকে মুক্ত করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম দলের সঙ্গে তথায় হিজরত করেন।[২৩]

খালিদ ইব্ন সা'ঈদ ইবনুল 'আস ইসলাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার পিতার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহার পিতার নাম আবূ উহায়হা। সে তাঁহাকে পাকড়াও করিয়া প্রহারে প্রহারে জর্জরিত করিতে থাকে এবং ইসলাম ত্যাগ করিয়া বাপ-দাদার ধর্মবিশ্বাসে ফিরিয়া আসিতে বলে। তাঁহাকে বেশ কয়েক দিন একটি কক্ষে বন্দী করিয়া রাখা হয়। এই সময় তাঁহাকে কোনরূপ পানাহার করিতে দেওয়া হয় নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন নাই। শেষ পর্যন্ত তাঁহার পিতা তাঁহাকে ত্যাজ্য করিয়া দিয়া বাড়ি হইতে বহিষ্কার করে। তিনিও আবিসিনিয়ায় গমনকারী প্রথম দলের সহিত হিজরত করেন।[২৪]

এমনকি যে উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) ইসলাম গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে একজন অগ্নিপুরুষ হিসাবে কাফির-মুশরিকদের নিকট বিবেচিত হইতেন তিনিও যখন ইসলাম গ্রহণ করিলেন কাফির-মুশরিকরা তখন তাঁহাকেও নিষ্কৃতি দেয় নাই। ইতোপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে[২৫] যে, তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খল জনতার নিগ্রহ ও নির্যাতন এড়াইবার জন্য স্থান হইতে স্থানান্তরের লুকাইয়া বেড়াইতে হইত। আল-'আস ইব্ন ওয়াইল তাঁহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলে তিনি নিরাপদে চলাফেরার নিশ্চয়তা খুঁজিয়া পান।[২৬] বস্তুত অবস্থা দৃষ্টে ইহাই সত্য যে, এইভাবে বিভিন্ন গোত্রের লোক দ্বারা উমার (রা) নিরাপত্তা লাভ করায় স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, তাহার নিজের গোত্র তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল।[২৭]

সাধারণত ইসলামে যিনিই দাখিল হইতেন তাঁহার পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার উপর সর্ব প্রকারের চাপ সৃষ্টি করিত, তাঁহাকে মারধর করিত এবং তাঁহার উপর নিযার্তনও করিত যাহাতে তিনি ইসলাম ত্যাগ করেন। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করায় তিনি মানসিক ও নৈতিক চাপেরও মুখামুখি হইতেন। কাফির-মুশরিকদের এই সমস্ত চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ছিল যাহাতে তিনি পিতা-মাতা ও রক্ষণশীলতার আনুগত্য করিয়া পূর্বপুরুষদের ধর্মবিশ্বাস ও ঐতিহ্য অব্যাহত রাখেন। কাফির-মুশরিকদের ইহা অবশ্য একটি সচরাচর ও শক্ত অভিযোগ ছিল যে, মহানবী ﷺ তাহাদের পূর্বপুরুষদের মর্যাদাহানি করিতেছেন, তাহাদের বাপ-দাদাদের ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করিতেছেন, পুত্র-কন্যাদের প্রলুব্ধ করিয়া তিনি তাহাদের পিতা-মাতা হইতে বিচ্ছিন্ন করার মাধ্যমে পরিবারকে ভাঙ্গিয়া দিতেছেন।

বস্তুত হযরত সা'দ ইব্ন আবী ওয়াক্কাস (রা)-এর ইসলামে দাখিল হওয়ার প্রেক্ষিতে এই বিষয়টি প্রকট আকার ধারণ করে। পুত্র ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁহার মাতা হামনা বিন্ত সুফ্য়ান ইব্ন উমায়্যা (আবূ সুফয়ানের ভাতিজী) অনশন ধর্মঘট পালন করে। সে শপথ গ্রহণ করে, যতক্ষণ না তাহার পুত্র সা'দ হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ না করিবে ততক্ষণ সে কোন প্রকার খাদ্যও গ্রহণ করিবে না, পানিও পান করিবে না। এই অনশন ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ছিল, তাহার পুত্র সা'দকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া যে, সব ধর্মেই তাকিদ রহিয়াছে সন্তানের মুখ্য কর্তব্য

হইতেছে পিতা-মাতার সেবা করা এবং আনুগত্য করা। এই পরিস্থিতি সা'দ (রা)-কে এতই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলিয়া দিল যে, তিনি মহানবী ﷺ-এর দরবারে সমস্যাটি পেশ করিলেন। এই ব্যাপারে আল্লাহ্র নির্দেশ নাযিল হইল যাহা কুরআন মজীদের ২৯ সূরার ৮ আয়াতে রহিয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَوَصَّيْنَا الانْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَانْ جَاهَدَكَ لِتُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا اِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٢٩ : ٨).

"আর আমি মানুষকে নির্দেশ দিয়াছি তাহার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে। তবে তাহারা যদি তোমার উপর বল প্রয়োগ করে আমার সহিত এমন কিছু শরীক করিতে যাহার সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নাই, তুমি তাহাদেরকে মানিও না। আমার নিকটই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর আমি তোমাদেরকে জানাইয়া দিব তোমরা কি করিতেছিলে" (২৯ ঃ ৮)।[২৮]

বস্তুত মক্কা মুকাররমায় যত লোক ইসলাম গ্রহণ করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই শাস্তি ও কঠোর যন্ত্রণা ভোগ হইতে রেহাই পান নাই। এই পরিস্থিতির কারণে মুসলমানগণকে দারুণ জুলুম-নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়া অতিবাহিত করিতে হয়, এমনকি সেই গোপনে ইসলাম প্রচারকালেও তাঁহাদের এই পরিস্থিতির মুকাবিলা করিতে হয়। সমস্ত মক্কী জীবনে বস্তুত এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল। এমনকি তাঁহারা যে বাপ-দাদার ধর্মবিশ্বাস ত্যাগ করিয়া আল্লাহ্র মনোনীত দীনে দাখিল হইয়াছে তাহা গোপন রাখিয়া অতি গোপনে সালাত আদায় করিয়াও নির্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছে। কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নূতন বিশ্বাসের প্রতি কঠিন বিরোধিতা ও শত্রুতা এতই পরিচিতি লাভ করে যে, দূর-দূরান্তর হইতে বিভিন্ন গোত্রের লোকজন গোপনে মহানবী ﷺ -এর সহিত যোগাযোগ করিতে আসিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহ ইসলাম গ্রহণ করিলে মহানবী ﷺ তাঁহাকে স্বভাবতই পরামর্শ দিতেন মক্কায় প্রকাশ্যে তাহা ঘোষণা না করিতে। কতিপয় প্রাণবন্ত ও সাহসী ব্যক্তি, যেমন হযরত আবূ যার আল-গিফারী (রা) এই সতর্কতামূলক উপদেশের প্রতি মনোযোগী না হওয়ার কারণে তাঁহাকে ভীষণ নির্যাতন সহ্য করিতে হয়, এমনকি তাঁহাকে কাফির-মুশরিকরা এমনভাবে প্রহার করে যে, তিনি প্রায় মৃত্যুর মুখামুখি হন।[২৯]

বিদেশ হইতে মক্কায় আসিয়া বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল যাহাদের মধ্যে ছিল ক্রীতদাস ও বিদেশী ব্যক্তিবর্গ। তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার আশংকায় আতংকিত ছিল। তাহারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগর ছিল। ক্রীতদাসগণ তাহাদের কাফির-মুশরিক মনিবের দয়ায় জীবন নির্বাহ করিত এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কারিগরগণ তেমন কোন ভাল অবস্থায় ছিল না। এই কারণে ইসলাম গ্রহণের পরপরই তাহারা তাহাদের রক্ষকগণ (হালীফ) কর্তৃক ক্রীতদাসদের মতই দারুণ জুলুম-নির্যাতন ও দুর্ব্যবহারের শিকার হইয়াছিল। জানা যায় যে, তাহাদের অনেককেই

বয়কটের মুকাবিলা করিতে হইয়াছিল, এমনকি ব্যবসা-বাণিজ্য হারাইতে হইয়াছিল। অনেককে পেশাচ্যুতও হইতে হইয়াছিল।

জানা যায়, ইসলামে দাখিল হওয়ার কারণে তাহাদের অনেককেই অন্ন, বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, যে কারণে মহানবী ﷺ-কে তাহাদের দুই-একজনের জন্য ভালভাবে জীবন নির্বাহের লক্ষ্যে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।[৩০] এতদসত্ত্বেও তাহাদের অনেকেই জুলুম-নির্যাতন ও যন্ত্রণা ভোগ করা হইতে রেহাই পায় নাই। এমন অনেক মর্মবিদারক অত্যাচারের বিবরণ রহিয়াছে যাহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, তাহাদের অনেকের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হইয়াছিল। সেই সমস্ত অমানবিক ঘটনার কিছু বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

হযরত খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা)-এর ঘটনা এখানে উল্লেখযোগ্য। মূলত তিনি ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। তিনি রাবী'আ উপজাতিদের দ্বারা ধৃত হইয়া বনূ যুহ্রার মিত্র (হালীফ) বনূ খুযা'আর একটি পরিবারের নিকট ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রিত হন। তিনি পেশায় ছিলেন তরবারি নির্মাতা। ইসলামে দাখিল হওয়ার কারণে তাঁহার পেশা ও ব্যবসা ধ্বংস হইয়া যায়। কাফির-মুশরিকরা তাঁহার উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। একদিন তাঁহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া জ্বলন্ত কয়লার পাটাতনের উপর রাখা হয়। ইহার ফলে তাঁহার পিঠ মারাত্মকভাবে অগ্নিদগ্ধ হয় এবং তাহাতে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। হযরত উমার (রা)-এর খিলাফতকালে খাব্বাব (রা) একদিন তাঁহার পৃষ্ঠদেশের সেই ক্ষতগুলির দাগ দেখান।[৩১]

হযরত 'আম্মার (রা) ও তাঁহার পরিবারের উপর যে নির্যাতন চালান হয় তাহাও কম হৃদয়বিদারক নহে। 'আম্মার (রা)-এর পিতা ইয়াসির ইব্ন 'আমের ইয়ামান হইতে মক্কা মুকাররমায় আসিয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন। তিনি বনূ মাখযূম (আবূ জাহ্লের চাচা)-এর আবূ হুযায়ফা ইবনুল মুগীরার মিত্র হিসাবে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। আবূ হুযায়ফা তাঁহার ক্রীতদাসী সুমায়্যাকে ইয়াসিরের সহিত বিবাহ দেন। তাঁহাদের দুই পুত্রের একজনের নাম ছিল আম্মার (রা) এবং অন্যজনের নাম ছিল আবদুল্লাহ। ইসলামের আবির্ভাবকালে আবূ হুযায়ফার ওফাত হয়। হযরত 'আম্মার (রা), তাঁহার পিতা-মাতা এবং তাঁহার ভ্রাতা আবদুল্লাহ্ ইসলামের সূচনাকালেই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে বনূ মাখযূম কর্তৃক, বিশেষ করিয়া আবূ জাহল দ্বারা তাঁহারা ভীষণভাবে নির্যাতিত হন। মধ্য গ্রীষ্মের দিবসসমূহে প্রায়শ তাঁহাদিগকে উত্তপ্ত বালুকার উপর শোয়াইয়া নির্যাতন করা হইত। কখনও কখনও মহানবী ﷺ তাঁহাদের নিকট দিয়া যাওয়ার সময় ঐরূপ নির্যাতিত হইতে দেখিয়া বলিতেন ঃ কষ্ট হইলেও ধৈর্য ধারণ কর। আখিরাতে তোমরা নিশ্চিত জান্নাত লাভ করিবে। ইয়াসির, তাঁহার স্ত্রী সুমায়্যা ও আবদুল্লাহ্ (রা)-এর উপর আবূ জাহ্ল অত্যাচার চালাইয়া হত্যা করে। কেবল আম্মার (রা) এই অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করিয়া বাঁচিয়া থাকেন।[৩২]

অন্য যাঁহারা এইরূপ অসহনীয় নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হইলেন ঃ হযরত সুহায়ব ইব্ন সিনান (রা), ফুকায়হা (রা) এবং আমের ইব্ন ফুহায়রা (রা)।[৩৩] হযরত বিলাল (রা)–এর ঘটনা সর্বজনবিদিত। হযরত বিলাল ইব্ন রাবাহ (রা) ছিলেন নরাধম কাফির নেতা উমায়্যা ইব্ন খালাফের ক্রীতদাস। তিনি প্রাথমিক কালে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। তাঁহার ইসলাম গ্রহণ করার কারণে উমায়্যা ইব্ন খালাফ তাঁহার উপর নৃশংস নির্যাতন চালাইত। প্রচণ্ড গ্রীষ্মের দুপুর বেলায় মক্কার পাথুরে যমীন রৌদ্রের তাপে উত্তপ্ত হইয়া গেলে প্রায়শ সে হযরত বিলাল (রা)-কে খালি গায়ে তাহার উপর শোয়াইয়া তাঁহার বুকের উপর উত্তপ্ত ভারি প্রস্তরখণ্ড চাপাইয়া দিয়া হযরত মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহিত সম্পর্কচ্ছেদ না করা পর্যন্ত এইরূপ শাস্তি অব্যাহত রাখিবে বলিয়া শাসাইত। তিনি মৃতবৎ হইয়া পড়িতেন, তবুও তাঁহার মুখ দিয়া উচ্চারিত হইত আহাদ, আহাদ (এক, অদ্বিতীয়)। এই উচ্চারণের মধ্য দিয়া তিনি পৌত্তলিকতায় ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃতি ঘোষণা করিতেন। কখনও কখনও নরাধম উমায়্যা তাঁহাকে রশি দ্বারা বাঁধিয়া রাস্তার দুষ্ট ছেলে-মেয়েদের হাতে তুলিয়া দিত। তাহারা তাঁহাকে হেঁচড়াইয়া টানিয়া রাস্তায় ঘুরিতে থাকিত।

একদিন হযরত আবূ বাক্র (রা) এই করুণ দৃশ্য অবলোকন করিয়া উমায়্যাকে বলিলেন, এই বেচারার ব্যাপারে তোমার কি আদৌ আল্লাহ্র ভয় হয় না? 'উমায়্যা প্রতিবাদের স্বরে হযরত আবূ বাক্র (রা)-কে বলিল যে, তিনি বস্তুত এই লোকটির নির্যাতনের মূল কারণ এবং সেইহেতু এই অসহায় বেচারাকে উদ্ধার করা তাঁহারই কর্তব্য। ইহা শুনিয়া হযরত আবূ বাক্র (রা) বিলালের বিনিময়ে তাঁহার কৃষ্ণকায় শক্তিশালী বাপ-দাদার ধর্মে বিশ্বাসী ক্রীতদাস গ্রহণ করার প্রস্তাব দেন। 'উমাইয়া এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। হযরত আবূ বাক্র (রা) বিলাল (রা)-কে গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহাকে আযাদ করিয়া দিলেন।[৩২]

এইভাবে হযরত আবূ বাক্র (রা) প্রায় অর্ধ ডজন অন্যান্য ক্রীতদাস এবং অসহায় মানুষকে তাহাদের মনিবদের জুলুম-নির্যাতন হইতে নিজের অর্থব্যয় করিয়া উদ্ধার করেন এবং তাহাদেরকে আযাদ করিয়া দেন। বিভিন্ন সূত্র হইতে যেই সকল উদ্ধারকৃত ব্যক্তিদের নাম জানা যায় তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন ঃ[৩৫]

(১) হামামা (হযরত বিলালের মাতা)[৩৬]

(২) আমের ইব্ন ফুহায়রা, তুফায়ল ইব্ন আল-হারিছের ক্রীতদাস।[৩৭]

(৩) আবূ ফুকায়হা, বনূ আব্দ আবুদ-দার-এর এক ক্রীতদাস।[৩৮]

(৪) লূবায়বার লুবায়না। তাঁহার সম্পর্কে ইব্ন হিশাম উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি বনূ মু'আম্মাল গোত্রের ক্রীতদাসী ছিলেন এবং বলিয়াছেন যে, 'উমার (রা) তখনও পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ না করায় তাঁহার উপর অকথ্য নির্যাতন চালাইতেন।[৩৯]

(৫) নাহ্‌দিয়া ও তাঁহার কন্যা ছিলেন বনূ 'আবদুদ-দারের এক নারীর ক্রীতদাসী। সে তাঁহাদের উপর ভীষণ নির্যাতন চালাইত।[৪০]

(৬) যান্‌নীরা (আর-রুমিয়া) ছিলেন বনূ 'আদিয়্যির এক ব্যক্তির ক্রীতদাসী। সেই ব্যক্তি তাঁহার উপর অত্যাচার করিত। তখনও হযরত 'উমার ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। তিনিও তাঁহার উপর নির্যাতন চালাইতেন। অন্য এক বিবরণ হইতে জানা যায়, যান্‌নীরা বনূ মাখযূমের জনৈক ব্যক্তির ক্রীতদাসী ছিলেন, আর আবূ জাহ্‌ল ছিল তাঁহার নিগ্রহকারী।[৪১]

(৭) উম্ম 'উবায়স (অথবা উনায়স বা উমায়স) ছিলেন বনূ যুহরার এক সদস্যের ক্রীতদাসী। আল-আসওয়াদ ইব্‌ন ইয়াগূছ তাঁহার উপর নির্যাতন চালাইত।[৪২]

হযরত আবূ বাক্‌র (রা)-এর এই ধরনের উদারতা দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিতেন যে, তিনি যদি স্ত্রীলোক ও দুর্বলদের আযাদ করার জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় না করিয়া শক্ত-সামর্থ্যবান ও বলিষ্ঠ ব্যক্তিদের আযাদ করায় অর্থ ব্যয় করেন তাহা হইলে তাহারা তাঁহার বাহুবল হইত এবং তাহার বিরোধীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করিত। এই কথা শুনিয়া হযরত আবূ বাক্‌র (রা) বলিলেন, কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তিনি তাহা করিয়াছেন। কুরআন মজীদের সূরা ৯২-এর ১৭ থেকে ২০ নং আয়াতে হযরত আবূ বাক্‌র (রা)–এর এই সমস্ত কর্মের উল্লেখ রহিয়াছে।[৪৩]

চার ঃ বনূ হাশিমের উপর চাপ প্রয়োগ

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ-কে প্রচার কার্য হইতে নিবৃত্ত করিয়া দিবার জন্য প্রচণ্ড সব প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিত। কিন্তু এখানে তাহাদের সামাজিক নিয়মবদ্ধ রীতিনীতি বাধা হইয়া দাঁড়ায়। গোত্রগুলি যেহেতু তাহাদের নিজেদের ব্যাপারের ক্ষেত্রে কম-বেশি স্বাধীন ছিল এবং গোত্রীয় সম্প্রীতি ও স্বার্থ অন্যান্য সব কারণকে নাকচ করিয়া দেয়, সেইহেতু তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যে গোত্রের গোষ্ঠীর বা পরিবারের কেহ ইসলাম গ্রহণ করে, তাহা শাস্তি প্রদান করিবে তাহার নিজের গোত্র বা পরিবারের কেহ অথবা তাহার মিত্রের ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট মিত্র পরিবার। এই সাধারণ নীতির ক্ষেত্রে যদি কোন ব্যতিক্রম ঘটিত তাহা হইলে তাহা ঘটিত সংশ্লিষ্ট গোত্রের সন্দেহাতীত অনুমোদনের কিংবা সমর্থনের মাধ্যমে। এই অবস্থার একটি ফল হইতেছে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মূল লক্ষ্য মহানবী ﷺ থাকিলেও তাঁহার নিজ গোত্রের অনুমোদন ও সহযোগিতা ব্যতিরেকে তাহারা তাঁহাকে প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয় নাই। মহানবী ﷺ-এর নিজ গোত্র ছিল বনূ হাশিম (এবং বনূ মুত্তালিব)। বনূ হাশিম প্রায় সম্পূর্ণভাবে মহানবী ﷺ-এর মতের প্রতি ঝুঁকিয়া না পড়িলেও তাহারা ইহা চাহিত না যে, তাঁহার উপর কোন দৈহিক নির্যাতন কেহ করুক। এই ধরনের নির্যাতনের ক্ষতিসাধনের ব্যাপারে তাহারা ঘোর বিরোধী ছিল। এই ব্যাপারে কেবল আবূ লাহাব ছিল ব্যতিক্রম। যে কারণে কাফির-মুশরিকরা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-কে স্তব্ধ করিতে চাহিলেও তাহা

করিতে পারিত। ইহা করিতে চাহিলে তাহাদের বনূ হাশিমের মতামতের প্রয়োজন হইত, নতুবা তাহাদের সরাসরি বনূ হাশিমের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতে এবং যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িতে প্রস্তুত থাকিতে হইত।

স্বভাবতই কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বনূ হাশিমকে তাহাদের দলে ভিড়াইবার চেষ্টায় মাতিয়া উঠিল এবং বারংবার ইহার নেতা, মহানবী ﷺ-এর চাচা ও অভিভাবক আবূ তালিবকে এই ব্যাপারে বুঝাইবার চেষ্টা করিল। জানা যায়, অন্ততপক্ষে তিনটি বার এইজন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দের তিনটি প্রতিনিধিদল আবূ তালিবের কাছে যাইয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে। এই সমস্ত প্রতিনিধিকে আপাতদৃষ্টে শান্তিপ্রিয় বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে। বনূ হাশিমকে সংঘবদ্ধ করা এবং তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আন্দোলন পরিচালনা করিতে প্ররোচিত করা। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বনূ হাশিমকে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে মহানবী ﷺ-কে ইসলাম প্রচারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে আবূ তালিবকে রাজি করানো অথবা বনূ হাশিম হইতে সম্মতি আদায় করা যে, তাহারা বল প্রয়োগের মাধ্যমে অথবা প্রয়োজন হইলে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ইসলাম প্রচারের পথ চিরতরে স্তব্ধ করিয়া দিবে।

প্রথম প্রতিনিধিদল সম্পর্কে ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সব বিরোধিতা ও আপত্তি সত্ত্বেও মহানবী ﷺ প্রচারকার্য অব্যাহত রাখিয়াছেন তখন তাহারা তাঁহার চাচা আবূ তালিবের নিকট একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধি দলে ছিল উতবা ইব্ন রাবী'আ, তাহার ভ্রাতা শায়বা ইব্ন রাবী'আ, আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হার্ব, আবূ বাখতারী, আল-আসওয়াদ ইব্ন আল-মুত্তালিব, আবূ জাহ্ল, আল-ওয়ালীদ ইব্ন আল-মুগীরা, নুবায়হ ইবনুল হাজ্জাজ, তাহার ভ্রাতা মুনাব্বিহ্ ইব্ন আল-হাজ্জাজ, আল-'আস ইব্ন ওয়াইল এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন। তাহারা আবূ তালিবের নিকট উপস্থিত হইয়া জোরালো অভিযোগ আনয়ন করিল যে, তাঁহার ভাতিজা তাহাদের দেব-দেবীগুলির বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইতেছেন, তাহাদের ধর্মকে বাতিল বলিয়া প্রচার করিতেছেন, তাহাদের মান-মর্যাদা ও জ্ঞান-বুদ্ধিকে ধূলিসাৎ করিয়া দিতেছেন এবং তাহাদের পূর্বপুরুষগণকে পথভ্রষ্ট ও জাহান্নামী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন। তাহারা সমস্বরে আবূ তালিবকে অনুরোধ করিল, হয় তিনি তাঁহার ভাতিজাকে প্রচারকার্য হইতে নিবৃত্ত করিবেন অথবা তিনি যেন তাঁহার এবং তাহাদের মধ্যখানে না আসেন। তাহারা আবূ তালিবকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দিল যে, আবূ তালিব এবং তাহারা একই ধর্মের অনুসারী। অতএব তিনি ভাতিজার বিরুদ্ধে যাওয়ার কারণে যদি কোন অসুবিধায় পড়েন তাহারা তাঁহার পার্শ্বে থাকিয়া তাহা মুকাবিলা করিবে। আবূ তালিব ধৈর্যসহকারে তাহাদের বক্তব্য শুনিলেন এবং অত্যন্ত নরম ও মিষ্টবাক্য দ্বারা তাহাদেরকে সান্ত্বনা দান করিলেন। কিন্তু তিনি কি করিবেন তাঁহার কোন নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করিলেন না। অতঃপর কুরায়শ নেতৃবৃন্দ প্রস্থান করিল।[৪৪]

ইহার পরও আবূ তালিব মহানবী ﷺ-কে প্রচারকার্য হইতে বিরত করিবার কোনরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করিলেন না এবং মহানবী ﷺ-ও প্রচারকার্য অব্যাহত রাখিলেন। ইহা দেখিয়া কুরায়শ নেতৃবৃন্দ আবূ তালিবের নিকট দ্বিতীয় প্রতিনিধিদল প্রেরণ করিল। এই দল প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল আবূ তালিবকে একটি চরমপত্র শুনাইয়া দেওয়া। তাহারা আবূ তালিবকে বলিয়াছিল যে, তাঁহার বয়সের কারণে, তাঁহার মহত্ত্ব ও মহান মর্যাদার কারণে মক্কী সমাজে তাঁহার রহিয়াছে অতি সম্মানজনক প্রতিষ্ঠা। সেই কারণেই তাহারা তাঁহাকে তাঁহার ভাতিজাকে নিবৃত্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে তিনি কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেন নাই। তাহারা মহানবী ﷺ-এর এই কর্মতৎপরতাকে কোন অবস্থাতেই আর সহ্য করিবে না এবং তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করিবে, এমনকি আবূ তালিব ও বনূ হাশিমের বিরুদ্ধেও লড়াইয়ে অবতীর্ণ হইবে যতক্ষণ না উভয় পক্ষের মধ্যে একপক্ষ পরাজিত হয়। এই চূড়ান্ত হুমকি প্রদান করিয়া কুরায়শ নেতৃবৃন্দ প্রস্থান করিল।[৪৫]

নিঃসন্দেহে এই পরিস্থিতি আবূ তালিবের জন্য ছিল অত্যন্ত জটিল ও সংকটের। একদিকে তিনি ইহা দেখিতে চাহিতেছিলেন না যে, কুরায়শ গোত্রগুলি সম্মিলিত হইয়া তাঁহার ও বনূ হাশিমের শত্রুতে পরিণত হউক। অন্যদিকে তিনি তাঁহার ভাতিজাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার শত্রুদের হাতে তুলিয়া দিতেও রাজি হইতে পরিতেছিলেন না। এমন বিষয়ে মানসিক টানাপড়েন অবস্থায় পড়িয়া তিনি মহানবী ﷺ-কে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যে চূড়ান্ত হুমকি দিয়া গিয়াছে তাহা বলিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন, তিনি যেন তাঁহার (আবূ তালিবের) স্কন্ধে এমন বোঝা চাপাইয়া না দেন যাহা বহন করা তাঁহার জন্য অসম্ভব হইয়া যায়।

মহানবী ﷺ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিলেন যে, কুরায়শ নেতাদের প্রবল চাপ ও চূড়ান্ত হুমকি তাঁহার চাচাকে দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছে এবং তিনি হয়ত তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন। সেই হেতু তিনি তাঁহার চাচাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রচারকার্য ছাড়িয়া দিবেন না, বরং তিনি তাঁহার প্রচারকার্য চালাইয়া যাইবেন যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁহাকে সাফল্য দান করেন অথবা তিনি ইহা অব্যাহত রাখিয়া নিজে ধ্বংস হইয়া যান। এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তিনি আবেগ তাড়িত হইয়া পড়েন, তাঁহার চক্ষু মুবারক অশ্রুসিক্ত হইয়া যায় এবং তিনি কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হন।

তাঁহার এই অবস্থা ও দৃঢ় সংকল্প আবূ তালিবের অন্তরে স্নেহের আবেগে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তিনি মহানবী ﷺ-কে ফিরাইয়া আনেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন আর তিনি যাহা করিতেছেন তাহা চালাইয়া যাইতে বলেন। তিনি (আবূ তালিব) তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন না, তাঁহাকে কখনও তাঁহার শত্রুদের হাতে ছাড়িয়া দিবেন না।[৪৬]

আবূ তালিবের নিকট কুরায়শের এই দ্বিতীয় প্রতিনিধিদলের আগমনের দরুন তাঁহার সংকটাবস্থা ও মনোভাবে যে দুশ্চিন্তার উদ্রেক হইয়াছিল তাহাতে একদিকে যেমন যথাযথ মুক্তি আনয়ন করে এবং অন্যদিকে মহানবী ﷺ তাঁহার প্রচার কার্য অব্যাহত রাখিবার যে দৃঢ় সংকল্প করিয়াছিল তাহার বিরোধী সমস্ত কলহ লাঘব হয়। পূর্বোক্ত প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়া মহানবী ﷺ তাঁহার চাচাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সম্ভবত তাহাদের চূড়ান্ত হুমকি দ্বারা তাঁহাকে ধন-সম্পদ ও পদমর্যাদার দিবার যে প্রস্তাব দিয়াছিল তাহা পুনরায় দিতে চাহিতেছে শুধু যদি তিনি তাহার প্রচারকার্যকে ছাড়িয়া দেন।

পাঁচ : মহানবী ﷺ-কে হত্যা প্রচেষ্টা

কোনরূপ খুনাখুনি এবং গোত্রে গোত্রে সংঘর্ষ এড়াইয়া মহানবী ﷺ-এর নিকট হইতে অব্যাহতি পাইবার লক্ষ্যে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এক নূতন মতলব আঁটিল। এই ক্ষেত্রে তাহারা বহুল পরিচিত গোত্রীয় ন্যায়বিচারের নিয়ম (ব্যক্তির পরিবর্তে ব্যক্তির নীতি) অনুসারে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের মধ্য হইতে একজন অতিসুন্দর সুঠাম যুবককে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারের নিকট হস্তান্তর করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল, যাহাতে তাহারা মহানবী ﷺ-কে নিজেদের কব্জায় পাইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। তদনুযায়ী একদিন তাহারা 'উমারা ইব্ন আল-ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরাকে সঙ্গে লইয়া যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, এই যুবক কুরায়শ তরুণদের মধ্যে দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং প্রচণ্ড শক্তিধর বলিয়া গণ্য হইত। ইহা ছাড়াও যুবকটি কুরায়শের অন্যতম প্রধান নেতার পুত্র ছিল। তাহারা 'উমারাকে সঙ্গে লইয়া আবূ তালিবের নিকট যাইয়া তাহাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করিতে বলিল, তাহার সাহায্য-সহযোগিতা ও বুদ্ধিমত্তা হইতে ফায়দা হাসিলের কথা বলিল এবং তাহাদের বদলে মহানবী ﷺ-কে তাহাদের হাতে তুলিয়া দিতে বলিল। ইহা হইলে তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিবে এবং সমস্ত সমস্যার ইতি টানিতে পারিবে।

তাহারা আবূ তালিবকে ইহাও বলিল যে, তাঁহার ভাতিজা শুধু তাঁহার ধর্মমতের বিরুদ্ধেই কাজ করিতেছেন না, তিনি তাঁহার পূর্বপুরুষগণেরও ধর্মমতেরও বিরোধিতা করিতেছেন। ইহা ছাড়াও তিনি জনগণের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিতেছেন এবং তাহাদের ধর্মের কারণে তাহাদিগকে বোকা বানাইতেছেন। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের প্রস্তাব উত্থাপন সমাপ্ত করিলে অবজ্ঞা মিশ্রিত ক্রোধের সহিত আবূ তালিব উত্তরে বলিলেন, তোমরা অত্যন্ত জঘন্য ও অন্যায় প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছ। তোমরা তোমাদের পুত্রকে খাওয়াইবার এবং লালন-পালন করিবার প্রস্তাব আমার জন্য লইয়া আসিয়াছ এবং উহার বদলে আমার পুত্রকে তোমাদের কাছে তুলিয়া দিতে বলিতেছ যাহাতে তোমরা তাহাকে হত্যা করিতে পার। আল্লাহ্র কসম! আমি কখনও সম্মত হইব না।

আবূ তালিবের এই কড়া জবাব শুনিয়া কুরায়শ নেতৃবৃন্দের অন্যতম মুত'ইম ইব্ন 'আদী ইব্ন নাওফাল হযরত আবূ তালিবের ক্রোধ প্রশমিত করিয়া তাঁহাকে রাজি করাইবার লক্ষ্যে বলিল, ইহাতে কেবল একটি মানুষের বদলে আর একজন মানুষকে প্রদান করিবার প্রস্তাব ছিল এবং

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কেবল চেষ্টা করিতেছে তাঁহাকে এমন এক পরিস্থিতি হইতে মুক্ত করিতে যাহা তিনি নিজেও পছন্দ করেন না। কিন্তু এখন প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি কোন যুক্তিযুক্ত প্রস্তাব মানিয়া লইতে রাজি নহেন। আবূ তালিব অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত এই যুক্তি প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং স্পষ্ট ভাষায় তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তাহারা যাহা ইচ্ছা করুক, তবুও কোন অবস্থাতেই মহানবী ﷺ-কে তাহাদের নিকট সমর্পণ করিবেন না।[৪৫৭]

এখানে উল্লেখ্য যে, একটি জীবনের বদলে আর একটি জীবন প্রদান করা ও গ্রহণ করা অবশ্য স্বীকৃত একটি গোত্রীয় ন্যায়বিচার ব্যবস্থা ছিল এবং সেই অনুসারে দীর্ঘদিনে পুরুষানুক্রমিক বিবাদ এড়াইয়া চলা সম্ভবত হইত। কিন্তু কুরায়শ নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব সেই বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। তাহাদের প্রস্তাব যে অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল কেবল তাহাই নহে, বরং ইহা বিধানের প্রয়োজনীয় শর্তাবলীরও পরিপন্থী ছিল। তাহারা নিজেদের যে লোকটিকে দেওয়ার প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল তাহাকে কিন্তু হত্যা করিবার কথা বলে নাই, বরং তাহাকে আবূ তালিব দত্তকপুত্র হিসাবে গ্রহণ করিবেন– প্রস্তাবে তাহাই বলা হয়। অথচ তাহারা মহানবী ﷺ-কে পুত্র হিসাবে দত্তক লইতে আসে নাই বরং তাঁহাকে প্রয়োজনবোধে হত্যা করিবে এই প্রকাশ্য ঘোষণা সহকারে আসিয়াছে। এই কারণেই আবূ তালিব বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের এই প্রস্তাব অন্যায়, তাহা অত্যন্ত সঠিক উত্তর ছিল।

তিনটি অর্থবহ বৈশিষ্ট্যের কারণে এই ঘটনা গুরুত্ব বহন করে। (এক) ইহা কুরায়শ নেতৃবৃন্দের শত্রুতা এবং মহানবী ﷺ-কে হত্যা করিবার দৃঢ় মনোভাব ফাঁস করিয়া দেয়। ইহা আরও সুস্পষ্ট করিয়া দেয় যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের অভিপ্রায়ের কোন কিছু গোপন রাখিত না। তাহারা তাহাদের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা আল-ওয়ালীদ ইবন আল-মুগীরার পুত্রকে বদল করিবার যে কৌশলী প্রস্তাব উথাপন করে তাহা তাহাদের এই দৃঢ় সংকল্পের মারাত্মক অভিসন্ধিকেই তুলিয়া ধরে। (দুই) এই ঘটনা মহানবী ﷺ এবং বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে অন্যান্য সমস্ত গোত্রের জোট যে ক্রমবৃদ্ধি পাইতেছে তাহা স্পষ্ট করিয়া দেয়। (তিন) ইহা সমানভাবে আবূ তালিব ও সমগ্র বনূ হাশিমের মহানবী ﷺ-কে অন্যান্য সমস্ত গোত্রের জোটবদ্ধ শত্রুতা ও আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার ও তাহাদের দ্বারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবার দৃঢ় সংকল্প সুস্পষ্ট করিয়া দেয়। ইবন ইসহাক বর্ণিত তথ্য হইতে জানা যায় যে, অতঃপর পরিস্থিতি চাপা উত্তেজনায় পর্যবসিত হয় এবং উভয় পক্ষ প্রত্যক্ষভাবে সংঘর্ষ ও যুদ্ধাবস্থায় মুখোমুখী হয়।[৪৮]

বস্তুত ইবন ইসহাক দুইটি সুনির্দিষ্ট বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়াছেন যাহা এই ঘটনার পরে সংঘটিত হয়। একদিকে কুরায়শ গোত্র-উপগোত্র এখন সবাই এবং প্রত্যেকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে এবং সংশ্লিষ্ট কোন গোত্রের মধ্য হইতে মহানবী ﷺ-এর অনুসারী হইলে তাহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ায় এবং তাঁহাদিগকে ইসলাম ত্যাগ করিয়া তাহাদের পূর্ব ধর্মবিশ্বাসে ফিরাইয়া আনিবার লক্ষ্যে জুলম-নির্যাতনের নিদারুণ অভিযান শুরু করে।[৪৯]

পরবর্তী ঘটনা[৫০] হইতে আরও জানা যায় যে, এই সমস্ত গোত্রের মধ্য হইতে যাহারা ইসলামে দাখিল হন তাঁহাদিগকে সংশ্লিষ্ট গোত্র ত্যাজ্য ঘোষণা করে এবং তাঁহাদের নিরাপত্তার জন্য তাহারা যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও প্রত্যাহার করিয়া লয়। ফলে গোত্রের নিরাপত্তা বেষ্টনী হইতে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় যে কেহ তাহাদের আক্রমণ করিতে পারিত এবং হত্যাও করিতে পারিত। অন্যদিকে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে কুরায়শ গোত্রগুলির অপতৎপরতা ও সংঘবদ্ধ আন্দোলন অবলোকন করিয়া আবূ তালিব বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের লোকজনদের সমবেত করিয়া তাহাদিগকে সামগ্রিক পরিস্থিতি অবহিত করিলেন এবং অন্যান্য গোত্রের বিরোধিতা ও শত্রুতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হইয়া মহানবী ﷺ-এর উপর যে কোন ধরনের আঘাত আসুক না কেন তাহা প্রতিহত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করার আহ্বান জানাইলেন। আবূ লাহাব ব্যতীত বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সকলেই এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছিল। ইহাতে আবূ তালিবের সহিত উপস্থিত সকলের সংহতি প্রমাণ করে এবং সকলে একবাক্যে সকল প্রকারের বিবাদ-কলহের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়া মহানবী ﷺ-কে হেফাজত করিবার শপথ গ্রহণ করে।[৫১]

যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ -এর সহিত প্রকাশ্যে শত্রুতা শুরু করিল তখন বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের লোকজন একইভাবে তাঁহাকে হেফাজত করিবার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করিতে লাগিল। কাফির-মুশরিকরা তাঁহার জীবনের উপর হুমকি পর্যন্ত দেওয়া অব্যাহত রাখিল। এক বর্ণনা হইতে জানা যায়, শত্রুপক্ষীয় বিভিন্ন ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে হত্যা করিবার জন্য অন্ততপক্ষে তিনবার আক্রমণ করে। এই সমস্ত অতর্কিত পিছন দিক হইতে আক্রমণের একটি ঘটনা পূর্বোল্লিখিত ঘটনার পরের ঘটনা। অন্য দুইটি ঘটনা আরও পূর্বে সংঘটিত হয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ইহা সুস্পষ্ট যে, এই সমস্ত আক্রমণ ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা পরিচালিত হইলেও প্রতিটি আক্রমণের ব্যাপারে সামগ্রিকভাবে কুরায়শ নেতাদের প্ররোচনা ও উৎসাহ অথবা নিযুক্তি যে সক্রিয় ছিল তাহা প্রশ্নাতীত।

প্রাথমিক দুইটি আক্রমণ ঘটনার একটি সংঘটিত হইয়াছিল আবূ জাহল কর্তৃক সেই সময়ে যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ-কে ধন-সম্পদ ও মান-মর্যাদা প্রদানের প্রলোভন দেখায়। কিন্তু তাহারা ইহাতে ব্যর্থ হইলে আবূ জাহল ঐ আক্রমণ করে। বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ তাহাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া যখন কা'বা শরীফের চত্বর হইতে প্রস্থান করেন তখন আবূ জাহল অন্যান্য নেতাদের বলে যে, সে কোন অবস্থাতেই মুহাম্মাদ ﷺ-এর কর্মৎপরতা এবং কা'বা শরীফে তাঁহার ইবাদত করাকে সহ্য করিবে না।

আবূ জাহল তাহাদিগকে অবহিত করে যে, সে মহানবী ﷺ-কে খুন করিবার স্থির সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। সে আরও বলিল যে, সে তাহার সাধ্যমত ভারী একটি প্রস্তর খণ্ড লইয়া কা'বা চত্বরে যাইবে এবং যখন মহানবী ﷺ কা'বা চত্বরে আসিয়া 'ইবাদতে রত হইবেন এবং তিনি

সিজদায় গেলে সে ঐ প্রস্তরখণ্ড দ্বারা আঘাত করিয়া তাঁহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে। অতঃপর আবূ জাহল আরও বলিল যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে এই ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া হইল যে, তাঁহারা ইচ্ছা করিলে তাহাকে রক্ষা করিতে পারে অথবা তাহাকে বনূ হাশিমের নিকট সমর্পণ করিতে পারে, এই ব্যাপারে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে। কিন্তু সে ইহা করিবেই।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ আবূ জাহলকে নিশ্চয়তা প্রদান করিল যে, তাহারা কখনও তাহাকে বনূ হাশিমের নিকট সমর্পণ করিবে না। সুতরাং সে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে তাহা বাস্তবায়ন করিতে অগ্রসর হইতে পারে। এইরূপে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের উৎসাহ ও নিশ্চিত সমর্থন প্রাপ্ত হইয়া আবূ জাহল সত্য সত্যই একখানি ভারী প্রস্তর খণ্ড লইয়া পরবর্তী দিবসে কা'বা শরীফের নিকট যাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। অন্যান্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দও কা'বা চত্বরে তাহাদের নিত্য দিনের সমাবেশ স্থলে যাইয়া আবূ জাহল কি করে তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

মহানবী ﷺ নিত্য দিনের ন্যায় কা'বা শরীফে আসিয়া ইবাদতে মশগুল হইলেন। তিনি সিজদায় গেলে আবূ জাহল প্রস্তরখণ্ড দ্বারা তাঁহার মস্তকে আঘাত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু যেই সে মহানবী ﷺ-এর সন্নিকটে পৌঁছল অমনি ভয়ে চিৎকার করিয়া দ্রুত পিছনে সরিয়া গেল, তাহার মুখাবয়ব সম্পূর্ণ রক্তশূন্য ও ম্লান হইয়া গেল এবং তাহার হস্তদ্বয় কাঁপিতে লাগিল আর প্রস্তরখণ্ড হাত হইতে মাটিতে পড়িয়া গেল।

এই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখিয়া কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দ্রুত আবূ জাহলের নিকট যাইয়া তাহার কি হইয়াছে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। আবূ জাহল তাহাদেরকে বলিল যে, সে যেই মহানবী ﷺ-এর একদম নিকটে যাইয়া পৌঁছিয়াছে অমনি সে সেখানে একটি প্রকাণ্ড উটকে তাহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল এবং সেই ভয়ঙ্কর উটটি তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়া তাহাকে গিলিবার জন্য ধাওয়া করিল। আল্লাহ্‌র কসম খাইয়া আবূ জাহল কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে আরও বলিল, আমি কখনও এমন ধরনের বিশাল ঘাড়বিশিষ্ট দৈত্যবৎ ভয়ঙ্কর উট দেখি নাই। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, এই ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলিয়াছেন, তিনি ছিলেন ফেরেশতা জিব্‌রীল (আ)। তিনি এইরূপে ভয় দেখাইয়া আবূ জাহলকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। আর যদি সে আরও অগ্রসর হইত তাহা হইলে তিনি তাহাকে পাকড়াও করিতেন এবং টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিড়িয়া ফেলিতেন।[৫২]

দ্বিতীয় আক্রমণের চেষ্টা করিয়াছিল 'উকবা ইবন আবী মু'আয়ত। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ[৫৩] হইতে জানা যায়, পরবর্তী দিনগুলিতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা ও বিক্ষোভ চলিতে থাকে। একদিন তাহারা কা'বা শরীফের চত্বরে জমায়েত হইয়া মহানবী ﷺ-এর ব্যাপারে আলোচনায় মিলিত হয়। তাহারা তাঁহার সম্পর্কে বলিতে থাকে যে, তিনি তাহাদেরকে বেওকুফ বানাইয়া চলিতেছেন, তাহাদের পূর্বপুরুষদের উপর দোষারোপ করিতেছেন, তাহাদের ধর্মবিশ্বাসকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, তাহাদের সমাজের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি

করিতেছেন, তাহাদের দেব-দেবীকে তীব্রভাবে নিন্দাবাদ করিতেছেন। তাহারা বলিল, তাহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া ঐ সমস্ত ব্যাপার সহ্য করিয়া আসিতেছে।

তাহাদের এই সমস্ত আলাপ-আলোচনা চলাকালে মহানবী ﷺ সেখানে উপস্থিত হইয়া কা'বা শরীফের নিকট গেলেন এবং ইহার এক কোণকে (হাজরে আসওয়াদে) চুম্বন করিলেন, অতঃপর কা'বা শরীফ তাওয়াফ শুরু করিলেন। প্রথম চক্করকালে তিনি যখন তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তাহারা অত্যন্ত মন্দ ভাষায় তাঁহাকে গালমন্দ করিতে লাগিল। তাহারা এমন বিশ্রী ভাষায় তাঁহাকে গালি দিতেছিল যে, তাহা শুনিয়া তাঁহার চেহারা মুবারকে বিরক্তির সুস্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হইতেছিল। তিনি যখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় চক্কর দিতেছিলেন এবং তাহাদের পার্শ্ব দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখনও তাহারা একইভাবে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিল। এক পর্যায় তাঁহার এবং তাহাদের মধ্যে এক বাগ্‌বিতণ্ডার সূত্রপাত ঘটিল। তারপর তিনি সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

পরবর্তী দিবসে একইভাবে কা'বা চত্বরে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সমবেত হইয়া তাঁহার ব্যাপারে আলাপ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে গালমন্দ করিতে লাগিল। এমন সময় নিত্যদিনের ন্যায় সেখানে মহানবী ﷺ উপস্থিত হইলে তাহারা সম্মিলিতভাবে তাঁহার উপর চড়াও হইয়া তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া বলিতে লাগিল––তিনি কি তাহাদের দেব-দেবী সম্পর্কে অমুক অমুক মন্তব্য করিয়াছেন? তিনি তাহাদের জিজ্ঞাসায় হাঁ-সূচক জবাব দিলেন। তাঁহার এই জবাব শুনিয়া অন্যতম কুরায়শ নেতা 'উকবা ইব্‌ন আবী মু'আয়ত তৎক্ষণাৎ তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাঁহার পিরহান দ্বারা তাঁহার গলা এমন শক্ত করিয়া বাঁধিল যে, তাঁহার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। তিনি মৃতপ্রায় অবস্থায় পৌছিলেন। এমন সময় সেখানে হযরত আবূ বাক্‌র (রা) আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং প্রবল বেগে ধাক্কা দিয়া উকবাকে কুপোকাৎ করিয়া তাহার খপ্পর হইতে মহানবী ﷺ-কে উদ্ধার করিলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে উচ্চস্বরে বলিলেন, তোমরা কি একজন মানুষকে এইজন্য মারিতে উদ্যত হইয়াছ যিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমার রব? বর্ণনাকারী এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া আরও বলেন, রাসূল ﷺ-এর প্রতি কুরায়শদের যত নির্যাতন করিতে তিনি দেখিয়াছেন সেইগুলির মধ্যে উহাই ছিল অত্যন্ত মারাত্মক।[৫৪]

তৃতীয় আক্রমণের ঘটনা ঘটিয়াছিল 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ইসলামে দাখিল হইবার পূর্বক্ষণে। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি[৫৫] তিনি কিভাবে তাঁহার তরবারি হাতে লইয়া মহানবী ﷺ-কে হত্যা করিবার উদ্দেশ্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া রওয়ানা হইয়াছিলেন। ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন, এই যৎপরোনাস্তি দুরভিসন্ধিপূর্ণ জঘন্য কাজটি করিবার জন্য হযরত 'উমার (রা)-কে নিয়োগ করিয়াছিল কুরায়শ নেতৃবৃন্দ।[৫৬] অবশ্য এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং পরিণামে হযরত 'উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন।

এই ঘটনা সংঘটিত হয় মহানবী ﷺ-এর ইসলাম প্রচারের পঞ্চম বর্ষে অথবা ষষ্ঠ বর্ষের প্রথম দিকে। হযরত 'উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরও মহানবী ﷺ-এর জীবনের উপর হুমকি আসা অব্যাহত রহিল। বস্তুত মহানবী ﷺ-এর মক্কী জীবনের অবশিষ্ট সময়েও মক্কার বিরোধিতাকারীদের নিবিষ্ট লক্ষ্য ছিল তাঁহাকে ছলেবলে কৌশলে দমন করা, যাহার প্রমাণ পাওয়া যায়[৫৭] বনূ হাশিমকে সর্বাত্মকভাবে বয়কট করার মধ্যে যাহা প্রায় তিন বৎসরকাল স্থায়ী ছিল। এই বয়কটের উদ্দেশ্য ছিল মহানবী ﷺ-কে হেফাজত করা হইতে বনূ হাশিমকে বলপ্রয়োগ পূর্বক বিরত করা এবং তাঁহাকে কুরায়শ নেতাদের নিকট সমর্পণ করিতে বাধ্য করা। তাঁহাকে হত্যা করার কুরায়শ নেতৃবৃন্দের শেষ উদ্যোগ ছিল তাঁহার মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের প্রাক্কালে।[৫৮] কুরআন মজীদে এই সমস্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ (٨ : ٣٠).

"স্মরণ কর, যখন কাফিররা তোমাকে বন্দী করিবার জন্য কিংবা হত্যা অথবা নির্বাসিত করিবার জন্য তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে এবং তাহারা ফন্দি আঁটে এবং আল্লাহও কৌশল করেন। আর আল্লাহই সর্বোত্তম কৌশলী" (৮ ঃ ৩০)।

অনুবাদ ঃ হাসান আবদুল কাইয়্যুম

তথ্যনির্দেশিকা

১. ইবন হিশাম, পৃ. ২৭০-২৭১; ইবন ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী, পৃ. ১৫০-১৫২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭১, আরও দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর ৯ খ., পৃ. ৭০-৭৭।

৩. ইবন হিশাম, পৃ. ২৭২, ইবন ইসহাকের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ ঃ

وصدرت العرب من ذلك الموسم بامر رسول الله ﷺ فانتشر ذكره فى بلاد العرب كلها.

৪. আরও দেখুন আত-তাবারী, তাফসীর, ২৪ খ., পৃ. ১১২-১১৩ এবং ইবন কাছীর, তাফসীর, ৭ খ., পৃ. ১৬২-১৬৩।

৫. আরও দেখুন আত-তাবারী, তাফসীর ২৪ খ., পৃ. ৮৪-৮৫; আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১৮ খ., পৃ. ২৯২-২৯৪ এবং ইবন কাছীর, তাফসীর, ৮ খ., পৃ. ২৫৫-২৫৬।

৬. মুসনাদ, ১ খ., পৃ. ২৩, ২১৫; বুখারী, ৭৪৯০; মুসলিম, নং ৪৪৬।

৭. প্রাগুক্ত, আরও দেখুন ইবন কাছীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১২৬-১২৭; আত-তাবারী, তাফসীর, ১৫ খ. পৃ. ১৮৪-১৮৫।

৮. আরও দেখুন কুরআন, ৬ ঃ ২৫; ৮ ঃ ৩১; ২৩ঃ ৮৩; ২৫ ঃ ৫; ২৭ ঃ ৬৮; ৪৬ ঃ ১৭; ৬৮ ঃ ১৫ এবং ৮৩ ঃ ১৩।

৯. ইবন হিশাম, পৃ. ২২৯-৩০০; আরও দেখুন আল-কুরতুবী, তাফসীর, খ., ১৪, পৃ. ৫২।

১০. পূর্বোক্ত পৃ. ৬৩১-৬৩৭।

১১. ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩১৩।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩-৩১৪।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৫৯।

১৪. ইবন কাছীর, তাফসীর ৮খ., পৃ. ৫২৭; আশ-শাওকানী, তাফসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৫০৬; আল-ওয়াহিদী, আসবাব (সম্পা. সায়্যিদ আহমাদ সাকী), দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০৪/১৯৮৪, পৃ. ৫০৫;ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩৮৮)।

১৫. দ্র. ইবন হিশাম, ১ম খ., (সম্পা. তাদমুরী), পৃ. ৩২৮।

১৬. ইবন কাছীর, তাফসীর, ৮ খ., পৃ. ৪৬০-৪৬১।

১৭. বুখারী, ৩৮৫৪; আয-যাহাবী, আস-সীরাত, পৃ. ২১৬।

১৮. ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩২০।

১৯. Supra, পৃ. ৫১৭-৫১৮।

২০. আল-ইসাবা, ১ম খ., পৃষ্ঠা ৫৪৫, নং ২৭৮৯।

২১. উমায়্যা খলীফা মারওয়ানের পিতা।

২২. ইবন সা'দ, ৩ খ., ২-৫৫।

২৩. ইবন সা'দ, ১ম খ., পৃ. ২০৪।

২৪. প্রাগুক্ত।

২৫. Supra, পৃ. ৫৩৩-৫৩৪।

২৬. বুখারী, ৩৮৬৪-৬৫।

২৭. নিম্নে দ্র. পৃ. ৬৬৭-৮।

২৮. দ্র. ইবন কাছীর, তাফসীর, ৬খ., পৃ. ২৭৫ (২৯ঃ৮-এর ভাষ্য); আল-যামাখশারী, আল-কাশ্শাফ ৩ খ., পৃ. ১৮৪-১৮৫। মতান্তরে এই আয়াত নাযিল হয় 'আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবীআ আল-মাখযূমীর সহিত সম্পৃক্ত একই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতে।

২৯. Supra, পৃ. ৫৩৭-৫৩৮।

৩০. Supra পৃ. ৫৩৩।

৩১. ইব্ন সা'দ, খ. ৩, পৃ. ১৬৪-১৬৫।

৩২. ইব্ন হিশাম, পৃ. ৩১৯-৩২০; আয-সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৯২, ইব্ন সা'দ, ৩য় খ., পৃ. ২৩৩, ২৪৬-২৪৯।

৩৩. প্রাগুক্ত, ৩য় খ., পৃ. ২২৭-২০৩ ও ২৪৮।

৩৪. ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, ৩১৭-৩১৮; ইব্ন সা'দ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৩২-২৩৩।

৩৫. প্রাগুক্ত, আরও দ্র. ইব্ন ইসহাক, আষ-সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১২১।

৩৬. আল-ইসাবা, ৫ম খ., পৃ. ১৮১৩, নং ৩৩০১।

৩৭. ইব্ন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩১৮।

৩৮. উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৪৮, নং ৬১৪২।

৩৯. ইব্ন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩১৯।

৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮-৩১৯।

৪১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৮, উসদুল গাবা, ৫ম খ., ৪৬২।

৪২. প্রাগুক্ত, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৬০১; ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩১৮।

৪৩. ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩১৯, ইব্ন ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৯৩-১৯৪; তাফসীর কুরতুবী, ২০ খ., পৃ. ৮৮-৮৯।

৪৪. ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ ২৬৪-২৬৫।

৪৫. পৃ. ২৮৪।

৪৬. প্রাগুক্ত।

৪৭. ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ২৮৫-২৮৬।

৪৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৭।

৪৯. প্রাগুক্ত।

৫০. নিচে দ্র. পৃ. ৬৬৭-৬৬৮।

৫১. ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ২৮৭।

৫২. ইবন হিশাম, পৃ. ৩১৯-৩২০।

৫৩. এই ঘটনার বর্ণনাকারী হযরত আমর ইবনুল 'আস (ইবন ওয়াইল) (রা), যিনি স্বচক্ষে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

৫৪. ইবন হিশাম, ১ম খ., পৃ. ৩০৯-৩১০; বুখারী, সংখ্যা ৩৮৫৬; ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., পৃ. ৭৭, ৪০ ঃ ২৮ আয়াতের ভাষ্য)।

৫৫. উপরে দ্র. পৃ. ৫৩২-৫৩৩।

৫৬. ইবন ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, পৃ. ১৮১।

৫৭. Infra অধ্যায় ৩৩, ১ম ভাগ।

৫৮. নিচে দ্র. পৃ. ৮৬৮-৮৭১।

আটাশতম অধ্যায়

আবিসিনিয়ায় হিজরত

এক ঃ পটভূমি

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসলাম প্রচারের পঞ্চম বর্ষের প্রারম্ভে কতকগুলি বিষয় স্পষ্ট হইয়া যায়। (এক) বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব ব্যতীত বিরোধী নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণের বিরুদ্ধে মক্কার সমস্ত গোত্র ও উপগোত্রকে ঐক্যবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। (দুই) যে সমস্ত নিঃস্ব ও দুর্বল ব্যক্তি ইসলামে দাখিল হইয়াছিলেন তাঁহাদের উপর নানা রকম হয়রানী ও নির্যাতন চালাইয়াও তাঁহাদিগকে দমন করিতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটি সমঝোতায় আসিতে রাজী করাইতে অপরাগ হওয়ায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে হত্যা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা গোত্রীয় ন্যায়বিচার হিসাবে প্রচলিত ও পরিগণিত নীতি অনুযায়ী একজন তরুণকে আবূ তালিবের নিকট অর্পণ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাহার বদলে তাহাদের নিকট সমর্পণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াও সফলকাম না হওয়ায় কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। (তিন) এদিকে হাশিম ও বনূ মুত্তালিব রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রক্ষা করিবার জন্য আবূ তালিবের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ঐক্যবদ্ধ হয়।

(চার) বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের এই দ্রুত উদ্যোগের প্রেক্ষিতে ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া যায় যে, এই ঐক্যবদ্ধ মনোভাবের বিরুদ্ধে শত্রুপক্ষের যৌথ বাহিনী সরাসরি আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই। কারণ স্পষ্টতই দ্রুত বিজয়লাভ বা বিরোধের সমাপ্তি দৃশমান ছিল না। ইহার কারণ এই ছিল যে, বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব একাকী অন্যান্য সকল গোত্রের সমকক্ষ ছিল।

(পাঁচ) শেষোক্ত বাস্তবতার কারণে শত্রুপক্ষ যৌথভাবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ইসলামের অগ্রযাত্রা রুদ্ধ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে ইহাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করিতে হইবে। তাই প্রত্যেক গোত্রকে স্ব স্ব গোত্রীয় সদস্যদের নবদীক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সহিত আরও কঠোর আচরণ করিতে হইবে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বেও প্রত্যেক গোত্রই তাহাদের গোত্রীয় সদস্যদের মধ্যে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাহাদিগকে কঠোর শাস্তি দিয়াও কোন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু নূতন কর্মপন্থা এতোই কঠোর ছিল যে, শত্রু জোটের প্রত্যেক গোত্র ভিন্ন মতাবলম্বী তথা ইসলাম গ্রহণকারীদেরকে নিরাপত্তা প্রদান ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে, তাহাদিগকে সমাজচ্যুত করে এবং নিরাপত্তার বেষ্টনী হইতে বাহির করিয়া দেয়। এই ব্যবস্থা মুসলমানদের জন্য গুরুত্বর অবস্থার সৃষ্টি করে, বিশেষ করিয়া যাঁহারা বিত্তশালী ও সম্মানিত পরিবারের ছিলেন তাহাদের জন্য। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে তাঁহারা ছিন্নমূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়া গেলেন। কারণ তাঁহাদের জন্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অব্যাহত রহিল না, যাহার ফলে যে কোনো মুহূর্তে নির্বিঘ্নে যে কোনো ব্যক্তির হাতে নিগৃহীত অথবা নিহত হইবার আশংকা প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের অবস্থা আধুনিক কালের রাষ্ট্রবিহীন ব্যক্তির অবস্থার ন্যায় হইয়া গেল। এই অবস্থায় নিজ সমাজে বসবাস করাটা তাঁহাদের জন্য কেবল যে সংকটজনকই হইল তাহা নহে, বরং একান্তই অসম্ভব হইয়া পড়িল। এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়, সম্মানিত বিত্তশালী পরিবারসমূহের যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন প্রধানত তাঁহাদের ক্ষেত্রে এই কঠোর নীতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়, যখন যে সমস্ত অতি দরিদ্র ও সহায়হীন ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হইতে কিছুটা বিরত থাকা হয়। ইহার কারণে ধনিক শ্রেণী হইতে ইসলাম গ্রহণকারীরা আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিলেন।

বিরোধিতার এই নূতন প্রক্রিয়া প্রায় সেই সময়েই কার্যকর করিল যাহার ফলে পরিস্থিতি এমন হইয়া উঠিল যে, হযরত আবূ বাক্র (রা)-কেও মক্কায় অবস্থান করিবার খাতিরে একজন অকুরায়শ প্রধানের (ইবনুদ দাগিনা) হিফাজতে থাকিতে হয়।[১] সদ্য ইসলাম গ্রহণকারী হযরত উমার (রা)-কেও মক্কায় সাধারণ জনতার দ্বারা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হওয়া ও অতর্কিত আক্রমণ হইতে নিরাপত্তা লাভের জন্য একটি গোত্র বনূ সাহমের শক্তিশালী ব্যক্তি আল-আস ইবনুল ওয়াইল-এর হিফাযতে থাকিতে হয়।[২] কিছু দিনের মধ্যে আবিসিনিয়ায় যাঁহারা হিজরত করিয়া গিয়াছিলেন তাঁহারা মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাদের প্রত্যেকেই অন্য কোন গোত্রের কাহারও হিফাযত গ্রহণ করিতে হইয়াছে, যদিও তাঁহাদের সকলেই সম্মানিত পরিবারের ও গোত্রের লোক ছিলেন।[৩] এই সমস্ত ঘটনার পূর্বে অন্য গোত্রের কোন ব্যক্তির হিফাযত গ্রহণের কোন কোন ঘটনার কথা শোনা যায় না।

এই অবস্থাই ছিল অবিসিনিযায় হিজরতের প্রেক্ষাপট। ইব্ন ইসহাক সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখিলেন যে, তিনি তাঁহার নিজের গোত্র কর্তৃক তাঁহার নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিশ্চয়তা লাভ করেন অথচ তাঁহার অনুসারিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গোত্র কর্তৃক ত্যাজ্য হইয়াছেন এবং নির্যাতিত হইতেছেন এবং তিনি নিজেও মুসলমানগণকে সাহায্য করিতে পারিতেছেন না, ইহা অনুধাবন করিয়া তিনি তাহাদিগকে অবিসিনিয়ায় হিজরত করিবার জন্য সংকেত দান করিলেন।[৪] বস্তুত মুসলমানগণকে তাঁহাদের ঈমানের খাতিরে অন্য দেশে হিজরত

করিবার নির্দেশনামূলক বিভিন্ন ওহী লাভ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর এই সময় একটি গুরুত্বপূর্ণ ওহী নাযিল হয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

يعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ اَرْضِىْ وَاسِعَةٌ فَاِيَّاىَ فَاعْبُدُوْنِ . كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ . وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا نِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ . الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ . وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ .

"হে আমার বান্দাগণ যাহারা ঈমান আনিয়াছ! নিশ্চয়ই আমার পৃথিবী প্রশস্ত, সুতরাং তোমরা আমারই 'ইবাদত কর। প্রত্যেকটি জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণকারি, অতঃপর তোমরা আমারই নিকট ফিরিয়া আসিবে। যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আমি অবশ্যই তাহাদের বসবাসের জন্য সুউচ্চ প্রাসাদ দান করিব জান্নাতে, যাহার পাদদেশে প্রবাহিত ঝর্ণাধারা, সেখানে তাহারা থাকিবে চিরকাল; কত উত্তম সেই পুরস্কার সেই সকল সৎকর্মশীলদের জন্য যাহারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাহাদের রব্-এর উপর ভরসা করে। কত যে জীবজন্তু আছে যাহারা নিজেদের জীবিকা মওজুদ রাখে না, আল্লাহ্ই রিযিক দান করেন উহাদিগকে ও তোমাদিগকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ" (২৯ ঃ ৫৬-৬০)।

এই আয়াতসমূহে জোরালো ভাষায় বলা হইয়াছে যে, কোন অবস্থাতেই তাওহীদের ব্যাপারে মুসলমানগণ আপোস করিবেন না এবং যত প্রকারের ঝুঁকিই আসুক, যে কোন মূল্যে একমাত্র আল্লাহ্র ইবাদত করা তাঁহারা অব্যাহত রাখিবেন, এইজন্য প্রয়োজনবোধে তাহারা জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া অন্য কোন দেশে হিজরত করিবেন। কেননা আল্লাহ তা'আলার দুনিয়া সুবিস্তৃত। এক আল্লাহতে ঈমানে অটল থাকিবার জন্য তাহারা তাহাদের জীবনের উপর কোন ঝুঁকি আসিলে তাহার কোন তোয়াক্কাও তাহারা করিবেন না। কেননা একদিন তো প্রত্যেক মানুষেরই মৃত্যু হইবে এবং শেষ পর্যন্ত প্রত্যেককেই তাহার রব-এর নিকট প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। তাহারা নিজ ঘর-বাড়ী ও গৃহের স্বাচ্ছন্দ্যের মোহে কোন অবস্থাতেই সত্য পথ অনুসরণ করা হইতে বিরত হইবেন না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা আখিরাতে তাহাদের পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অপেক্ষা অনেক অনেক বেশী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ প্রতিদান প্রদান করিবেন, যাহা চিরস্থায়ী হইবে। ভিন্ন দেশে যাইয়া জীবন যাপনে যতই কষ্ট হউক তাহার জন্য মুসলমানগণ কোনরূপ পরিতাপ করিবেন না। কেননা পৃথিবীতে এমন অনেক সৃষ্ট জীব আছে যাহারা নিজেদের খাদ্যভাণ্ডার তাহাদের সঙ্গে রাখে না। আল্লাহ্ তা'আলাই উহাদের জন্য জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় বস্তুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, যেমন মানুষের জন্য করিয়াছেন।[৫]

মুসলমানগণের হিজরতের ব্যাপারে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য আরও ওহী নাযিল হয়। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হইতেছে সূরা মারয়াম (১৯ নং) যদ্দ্বারা মুসলমানগণকে আল্লাহর নবী

হযরত ‘ঈসা (আ) এবং তাঁহার কার্যক্রমের ঐতিহাসিক কাহিনীর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। অন্য এক ওহীর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে আহলে কিতাব জনগণের সহিত কিরূপ আচরণ করিতে হইবে সেই সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও কার্যকর উপদেশ প্রদান করা হয়।[৬] রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধরনের নির্দেশনাসমূহ প্রাপ্ত হইয়া অন্য দেশে মুসলিমগণের হিজরত করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করিলেন এবং তিনি তাঁহার অনুসারীদেরকে এ সম্পর্কে বলিলেন। তিনি তাহাদের নির্দেশ দিলেন যে, আবিসিনিয়ার একজন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ্ আছেন এবং তাঁহার অধীনে কেহ নীতিবিরুদ্ধ কোন কিছু করিতে পারে না। তিনি আরও বলিলেন যে, মুসলমানগণ সেখানে যাইয়া বসবাস করিতে পারে যতদিন না আল্লাহ্ তাহাদের জন্য আরও কোন ভালো মুক্ত অঞ্চলের ব্যবস্থা করিয়া দেন।[৭]

দুই ঃ আবিসিনিয়ায় (হিজরত) কেন?

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, আবিসিনিয়াকে হিজরতের জন্য বাছিয়া লওয়ার কারণ ছিল তদানীন্তন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, বিশেষত বায়যানটাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের অবস্থা। আরবদেশের উত্তর অঞ্চলীয় এই দুই পরাশক্তি প্রতিবেশী সেই যুগে দীর্ঘ কাল ধরিয়া পরস্পর মারাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসলামের দিকে আহ্বান করিবার প্রায় সাত বৎসর পূর্বে ৬০৩ খৃস্টাব্দে ফোরিয়াস কর্তৃক বায়যানটাইন সিংহাসন জবরদখল হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নৃশংস শাসক, যে কারণে তাহার এই নির্মম শাসনের কবল হইতে সকল শ্রেণীর মানুষ মুক্তি চাহিতেছিল। এই মোক্ষম মওকা পাইয়া পারস্য সম্রাট খুসরাও পারভেয বায়যানটাইন শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং বারংবার পরাজিত হইয়াও অবশেষে তাহার সেনাবাহিনী সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হইল। ৬১৪ খৃস্টাব্দে পারভেয জেরুসালেম দখল করিয়া লইলেন। মক্কার কাফির-মুশরিকরা পারস্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। তাহারা পারভেযের বিজয় লাভের খবর শুনিয়া আনন্দ-উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। তাহারা মুসলমানগণকে এই বলিয়া টিটকারী দিতে লাগিল যে, যেমন করিয়া পারস্যের আহরুমাযদা (ভালোর দেবতা) ও আহরুমান (মন্দের দেবতা)-এর ভক্তেরা খৃস্টান শক্তিকে পরাজিত করিয়াছে তেমন করিয়া আল-লাত ও আল-‘উয্‌যার ভক্তরা মুসলমানগণকে পরাভূত করিবে।[৮] ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে (৩১ নং) সূরা রূম-এর প্রথম কয়েকখানি আয়াত নাযিল হয় ঃ

الـم . غُلِبَتِ الرُّوْمُ . فِيْ اَدْنَى الاَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ . فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ لِلّٰهِ الاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ . بِنَصْرِ اللّٰهِ يَنْصُرُ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ .

“আলিফ-লাম-মীম। রোমকগণ (বায়যানটীয়গণ) পরাজিত হইয়াছে নিকটবর্তী অঞ্চলে, কিন্তু উহারা উহাদের এই পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হইবে দশ বৎসরের কম সময়ের মধ্যেই।

পূর্বের ও পরের ফয়সালা আল্লাহ্রই। আর সেই দিন মুমিনগণ হর্ষোৎফুল্ল হইবে আল্লাহ্র সাহায্যে। তিনি যাহাকে ইচ্ছা সাহায্য করেন এবং তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু" (৩০ ঃ ১-৫)।

এই আয়াতসমূহে বায়যানটীয় ও পারসিকদের মধ্যে সম্পর্কের অবস্থা এবং মক্কার মুমিনগণ ও কাফিরদের সম্পর্কের অবস্থাসহ তদানীন্তন পারিপার্শ্বিক অবস্থা পরিস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই ভবিষদ্বাণীও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, দশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে রোমকগণ (বায়যানটীয়গণ) পারসিকদের পরাজিত করিবে এবং একই সময়ে মুসলমানগণও আল্লাহ্র রহমতে বিজয় অর্জন করিবে। ঠিক ভবিষ্যদ্বাণীতে নির্ধারিত সময় কালের মধ্যেই তাহা সত্যে পরিণত হইল। কেননা ৬২৪ খৃষ্টাব্দে রোমকগণ তাহাদের নূতন সম্রাট হিরাক্লিয়াসের অধীনে পারসিকদের চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিল এবং এই ৬২৪ খৃষ্টাব্দেই মুসলমানগণ বদর প্রান্তরে কাফির-মুশরিকদের পরাজিত করিয়া তাহাদের প্রথম মহাবিজয় অর্জন করিলেন। কিন্তু মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পূর্বে এমন মহাবিজয়ের চেতনা মুসলমানগণের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। রোমকগণও ইতোপূর্বে তাহাদের বিজয়ের কথা উপলব্ধি করে নাই। উপর্যুপরি মুসলিমগণের মধ্যে তখনও উত্তরাঞ্চলে নিরাপদ ও ঝঞ্ঝাটমুক্ত আশ্রয় গ্রহণের চিন্তা-ভাবনার উদ্রেক হয় নাই। এই কারণে তাহারা দক্ষিণে অবস্থিত একমাত্র অপৌত্তলিক দেশের দিকে মনোনিবেশ করিলেন। এই দেশটির নাম আবিসিনিয়া। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দেশটির সহিত কুরায়শের, বিশেষ করিয়া বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

তিন ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী প্রথম দল

নবূওয়াতের পঞ্চম বর্ষের রজব মাস মুতাবিক ৬১৫ খৃষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নির্দেশ অনুযায়ী ৪ জন মহিলাসহ ১৫ অথবা ১৬ জনের প্রথম দলটি মক্কা হইতে চুপিসারে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়া আবিসিনিয়ায় চলিয়া গেলেন। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের আটক করিবার জন্য যথাসাধ্য অনুসরণ করিয়াও ব্যর্থ হইল। মুসলিম হিজরতকারী এই দলটি ভাগ্যক্রমে শু'আয়বা (আধুনিক মোছা) বন্দরে যাইয়া একটি কিশ্‌তী পাইয়া গেলেন। তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনকারী শত্রুদের সেখানে উপস্থিত হইবার পূর্বক্ষণেই তাহারা আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমাইলেন। ইব্ন ইসহাক প্রদত্ত তালিকা অনুযায়ী আবিসিনিয়ায় প্রথম যে দলটি হিজরত করেন সেই দলে ছিলেন ঃ[৯]

১. 'উছমান ইবন আফ্ফান (রা) (বনূ উমায়্যা);

২. রুকায়্যা বিন্ত হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ (যিনি হযরত উছমান (রা)-এর স্ত্রী এবং বনূ হাশিম গোত্রীয়);

৩. আবূ হুযায়ফা ইবন উত্বা ইব্ন রাবী'আ (রা) (বনূ আব্দ শাম্স ইব্ন আব্দ মানাফ);

৪. সাহ্লা বিন্ত সুহায়ল ইব্ন আমর (রা), হুযায়ফা (রা)-এর স্ত্রী (আমের ইবনুল লুআয়্যি গোত্রীয়);

৫. আয-যুবায়র ইবনুল আওওয়াম (রা) (বনূ আসাদ ইব্ন 'আব্দিল 'উয্যা ইব্ন কুসায়্যি, খাদীজা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফাত ভাই।

৬. মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা) (আবদুদ দার ইব্ন কুসায়্যি গোত্রের);

৭. আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (রা) (যুহ্রা ইব্ন কিলাব গোত্রের);

৮. আবূ সালামা ইব্ন 'আবদুল-আসাদ (রা) (মাখযূম গোত্রের);

৯. উম্মু সালামা (রা) (উপরিউক্ত সাহাবীর স্ত্রী, মাখযূম গোত্রের);

১০. 'উছমান ইব্ন মায'উন (জুমাহ গোত্রের, উম্মুল মু'মিনীন হাফসা (রা)-এর মামা);

১১. আমের ইব্ন রবী'আ আল-'আনাযী (রা) ('আদী গোত্রের মিত্র);

১২. লায়লা বিনত আবী হাছমা (উপরিউক্ত সাহাবীর স্ত্রী 'আদী গোত্রের);

১৩. হযরত আবূ সাবরা ইব্ন 'আবী রুহ্ম (রা) (আমের ইব্ন লু'আয়্যি গোত্রের);

১৪. হযরত সুহায়ল ইব্ন বায়দা (রা) (হারিছ ইব্ন ফিহ্র গোত্রের);

ইব্ন সা'দ ও আত্-তাবারী আরও দুইটি নাম যোগ করিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন ঃ

১৫. হাতিব ইব্ন 'আমর ইব্ন আবদ শামস (রা);

১৬. 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) (যাহ্রা গোত্রের মিত্র)।[১০]

ইবন ইসহাক আরও বলেন, পরবর্তীতে হযরত জা'ফার ইব্ন 'আবী তালিব (রা) এই দলে যোগদান করেন।[১১]

আবিসিনিয়ায় প্রথম হিজরতকারিগণের উপরিউক্ত তালিকা পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোত্র ও পরিবারের সন্তান। তাঁহাদের সংখ্যা এবং এই দলে অন্তর্ভুক্ত কয়েকজনের স্ত্রী দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা আবিসিনিয়ায় কেবল কিম্বা প্রাথমিকভাবে কূটনৈতিক কারণে গমন করেন নাই, অবশ্য সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা আবিসিনিয়ার বাদশাহ্র দরবারে কিম্বা তাঁহার সন্নিকটেই অবস্থান করিয়াছেন। ইহাই স্বাভাবিক ছিল যে, তাহারা সেখানে গিয়াছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। সুতরাং আবিসিনিয়ার ভূমিতে তাহাদের অবতরণের পরে প্রথম পর্যায়েই তাহারা সেখানকার বাদশাহ্র দরবারের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। এই হিজরতকারী দলের কাহারো কাহারো বর্ণনা হইতে জানা যায়, তাহারা সেখানে শান্তির সহিত বসবাসেরই কেবল অনুমতি লাভ করেন নাই, বরং তাঁহারা অবাধে ইবাদত-বন্দেগী করিবার সুযোগও লাভ করেন। এমনকি তাহারা কোনরূপ কথা দ্বারা কিম্বা কর্ম দ্বারা কোন পর্যায়েই অপদস্তও হন নাই।

চার ঃ হিজরতকারিগণের সাময়িক প্রত্যাবর্তন

হিজরতকারিগণ শান্তিপূর্ণভাবে কয়েক মাস আবিসিনিয়ায় অবস্থান করেন। শেষ পর্যায়ে তাঁহাদের নিকট একটি গুজব পৌঁছিল যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে যে শত্রুতা ছিল উহার অবসান ঘটিয়াছে। কি কারণে এইরূপ গুজব রটনা করা হইয়াছিল সে সম্পর্কে পরবর্তীতে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করা হইবে।[১২]

এই গুজবের ভিত্তিতে সকল হিজরতকারী অথবা অধিকাংশ হিজরতকারী একই বৎসরের শওয়াল মাসে আবিসিনিয়া ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসেন। ইব্ন সা'দের বর্ণনা হইতে জানা যায়, সমস্ত হিজরতকারীই মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।[১৩] কিন্তু ইব্ন ইসহাক বলেন, হিজরতকারিগণের কয়েকজন আবিসিনিয়ায় থাকিয়া যান।[১৪] প্রত্যাবর্তনকারিগণ মক্কা নগরীর উপকণ্ঠে পৌঁছিয়া খোঁজ-খবর লইয়া বনূ কিনানার জনৈক ব্যক্তির নিকট হইতে জানিতে পারিলেন, যে গুজব রটিয়াছে তাহা সত্য নহে।[১৫] ইহাতে তাঁহারা মক্কায় প্রবেশের ব্যাপারে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, অতঃপর মক্কায় প্রবেশের সিদ্ধান্ত করিলেন। এইজন্য তাঁহাদের প্রত্যেকেই মক্কায় যথাযথ নিরাপত্তা লাভ করিবার পর মক্কায় প্রবেশ করেন। বর্ণিত আছে যে, কেবল আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) মক্কা নগরীতে নিরাপত্তা বিধানের জন্য কোন ব্যক্তির নিশ্চয়তা প্রদান ছাড়াই প্রবেশ করিলেন এবং মক্কা নগরীতে কিছু সময় অবস্থান করিয়া আবার আবিসিনিয়ায় চলিয়া গেলেন।[১৬] প্রত্যাবর্তনকারিগণের নামের তালিকা ও তাহাদের নিরাপত্তা প্রদানকারিগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ

১. 'উছমান ইব্ন 'আফফান (রা)	আবূ 'উহায়হা সা'দ ইবনুল আস
২. আবূ হুযায়ফা ইব্ন উতবা ইব্ন রবী'আ (রা)	উমায়্যা ইব্ন খালাফ
৩. আয-যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা)	যামআ ইবনুল আসওয়াদ
৪. মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা)	আন-নাদর ইবনুল হারিছ ইব্ন খালাদা কিম্বা আবূ 'আযীয ইব্ন 'উমায়র
৫. আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা)	আসওয়াদ ইব্ন ইয়াগূছ
৬. 'আমের ইব্ন রবী'আ (রা)	আল-আস ইব্ন ওয়াইল
৭. আবূ সাব্রা ইব্ন আবী রুহম (রা)	আখনাস ইব্ন শারীক (শুরায়ক)
৮. হাতিব ইব্ন আমর (রা)	হুওয়ায়রিছ ইব্ন 'আবদুল 'উয্যা
৯. সুহায়ল ইব্ন বায়দা[১৭]	
১০. 'উছমান ইব্ন মায'উন (রা)	আল-ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা
১১. আবূ সালামা (রা)	আবূ তালিব

'উছমান ইব্ন মাযউন (রা) (ক্রমিক ১০) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, আল-ওয়ালীদের আশ্রয়ে তিনি যখন শান্তিতে বসবাস করিতেছিলেন তখন তিনি অবলোকন করিলেন যে, অন্য মুসলমানগণ জুলুম-নির্যাতনের মধ্যে রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার আচরণে তিনি দারুণ লজ্জিত হইলেন। তাই তিনি কা'বা চত্বরে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের এক জমায়েতে প্রকাশ্যে আল-ওয়ালীদের নিরাপত্তা বন্ধন ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করিলেন। এই ঘোষণা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল-ওয়ালীদের গোত্রের এক লোক 'উছমান ইব্ন মায'উন (রা)-কে সহসা আঘাত করিতে উদ্যত হইলে 'উছমান ইব্ন মাযউন (রা)-এর একজন সমর্থক তাহা প্রতিহত করিয়া তাহাকে প্রচণ্ড এক ঘুষি মারিয়া দিল।[১৮] ইহার ফলে এই বিতণ্ডা আর অগ্রসর হইতে পারিল না।

আবূ সালামা (রা)-এর ব্যাপারে জানা যায় যে, আবূ তালিবের আশ্রয়ে তাঁহার অবস্থানকে তাঁহার নিজ গোত্র বনূ মাখযুম সহ্য করিতে পারিল না, তাহারা প্রতিবাদ মুখর হইয়া উঠিল। তাহারা আবূ তালিবের উদ্দেশ্যে বলিতে লাগিল যে, তাঁহার ভাতিজা (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ)-এর নিরাপত্তা বিধানের অধিকার তাঁহার রহিয়াছে কিন্তু বনূ মাখযুমের কোন ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধানের অধিকার তাঁহার নাই। আবূ তালিব দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁহার এই কর্মের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করিয়া বলিলেন যে, যদি তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের নিরাপত্তার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন তাহা হইলে ন্যায়বিচারের খাতিরেই তিনি তাঁহার ভাগিনার ক্ষেত্রেও তাহা করিতে পারেন। এখানে উল্লেখ্য যে, আবূ সালামার আম্মা বাররা বিন্ত 'আবদুল মুত্তালিব ছিলেন আবূ তালিবের ভগ্নি (এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ফুফু)। এই ব্যাপার লইয়া বনূ মাখ্যূমের নেতৃবৃন্দ আবূ তালিবের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইবার মতলব আঁটে। কিন্তু সেই সময় 'আবূ লাহাব মধ্যস্থতা করিতে আগাইয়া আসে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সমর্থনে আবূ তালিব যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার পক্ষে আসিয়া দাঁড়ানোর দৃষ্টান্ত আবূ লাহাবের জীবনে ইহাই একমাত্র ঘটনা। আবূ লাহাব স্পষ্ট ভাষায় বনূ মাখ্যূমের নেতৃবৃন্দকে বলিল, তাহারা শায়খ আবূ তালিবকে অপদস্ত করিবার ক্ষেত্রে বেশী ঔদ্ধত্যপনা করিতেছে এবং তাহারা যদি আরো বাড়াবাড়ি করে তাহা হইলে সে (আবূ লাহাব) অবশ্যই শায়খ আবূ তালিবের পার্শ্বে দাঁড়াইবে। আবূ লাহাব তাহার গোত্র সমেত তাহার সমস্ত শক্তি এই ব্যাপারে প্রয়োগের হুমকি দিলে বনূ মাখ্যূমের লোকজন ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া আবূ লাহাবকে শান্ত করিল এবং শত্রুতা নিবৃত্ত হইল।[১৯]

এখানে উল্লেখ্য যে, মুসলিম বিরোধী যে সমস্ত গোত্র জোটবদ্ধ হইয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে যে সমস্ত ব্যক্তি মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধায়ক হিসাবে কাজ করিতেছিল তাহারা উপরিউক্ত ঘটনার পর কিছুটা আশ্বস্ত হইল। কি যে উদ্দেশ্য এই ধরনের দ্বৈত ভূমিকায় ছিল তাহা কেবল অনুমান করা যাইতে পারে—সম্ভবত বিরোধী নেতৃবৃন্দ তাহাদের নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের ফেরত পাওয়ার জন্য আগ্রহী হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রত্যেক গোত্র তাহাদের সদস্যদের মধ্যে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছিল তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে যেমন উদগ্রীব ছিল তেমনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে নীতি গ্রহণ করিয়াছিল তাহাও বজায়

রাখিয়াছিল। এই কারণে অন্য গোত্রের নেতার পুত্র অথবা আত্মীয়কে নিরাপত্তা বিধানকারী হিসাবে কোন নেতাকে আগাইয়া আসার ক্ষেত্রে পরোক্ষ উপায় অবলম্বন করিয়া এড়াইয়া যাওয়ায় অসুবিধা ছিল। এই ধারণা প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয় উমায়্যা ইব্‌ন খালাফের আশ্রয়ে থাকা উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আর পুত্র (আবূ হুযায়ফা)-এর ব্যাপারে। পক্ষান্তরে নেতৃবৃন্দ সম্ভবত প্রমাণ করিতে চাহিতেছিল যে, তাহাদের শত্রুতা হইতেছে প্রধানত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে। তাহাদের তো কোন শত্রুতা নাই যাহারা ইসলামে দাখিল হইতেছে তাহাদের সঙ্গে, বরং তাহাদেরকে কৌশলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গ হইতে দূরে সরাইয়া আনিয়া তাহাদেরকে দুর্বল করিয়া দিতে হইবে। কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ সুদূরপ্রসারী দুরভিসন্দি আঁটিয়া কর্মতৎপর হয় তাহাদের করায়ত্ত প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানগণকে কেন্দ্র করিয়া। তাহারা তাহাদের উপর দীন ইসলামকে অস্বীকার করিয়া বাপ-দাদার ধর্মে ফিরিয়া আসিবার জন্য জোর চাপ সৃষ্টি করে। যাহাই ঘটুক না কেন, তাহাদের অন্য গোত্রের ইসলামে দাখিল হওয়া ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা বিধান করার প্রয়াস ছিল 'আবূ তালিবের অন্য গোত্রের সদস্যকে নিরাপত্তা দানের আপত্তি করার সহিত বৈসাদৃশ্য। সে যাহাই হউক, বস্তুত বনূ হাশিম, বিশেষ করিয়া আবূ তালিব কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিরাপত্তা বিধানেই ব্যাপৃত ছিলেন না, বরং বনূ মাখযূমের এক সদস্য আবূ সালামাকেও আশ্রয় দিয়াছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, তাহার দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক উভয় দিক দিয়াই অন্যান্য কুরায়শ গোত্রসমূহের সম্মিলিত বিরোধিতার মুকাবিলা করিতে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

পাঁচ ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতের দ্বিতীয় পর্যায়

পরিস্থিতি এমন অবস্থায় উপনীত হইল যে, মুসলমানদের বেশী দিন মক্কায় অবস্থান করা নিরাপদ রহিল না। নূতন করিয়া মক্কার কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ নিরীহ শ্রেণীর মধ্যে যাহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের উপর নিদারুণ অত্যাচার-নির্যাতন করিতে শুরু করিল। ইহা দেখিয়া পূর্বোল্লিখিত 'উছমান ইব্‌ন মায'উন (রা) কাফির-মুশরিক নেতার নিরাপদ আশ্রয়ে থাকায় নিজেকে অপরাধী মনে করিতে লাগিলেন। যখন মক্কার পরিস্থিতি মুসলমানগণের জন্য ক্রমাবনতির দিকে যাইতে লাগিল তখন আবিসিনিয়ায় হিজরতের দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা হইল। এই পর্যায়ে তাহারা দলবদ্ধভাবে না যাইয়া একে একে ভিন্ন ভিন্ন সময় মক্কা ত্যাগ করিয়া আবিসিনিয়ায় যাইতে লাগিলেন। তবে সেখানে তাহারা পথিমধ্যে একত্র হইয়া এক এক দলে আবিসিনিয়ায় পৌছিলেন।

ইব্‌ন সা'দ বর্ণিত তথ্যে জানা যায়, সর্বমোট ৮০ জন পুরুষ এবং ১৮ জন মহিলা (১১ জন কুরায়শী এবং ৭ জন অকুরায়শী) শেষ পর্যন্ত আবিসিনিয়ায় আশ্রয় লাভ করেন। ইব্‌ন সা'দ আরও বলেন, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মধ্যে হযরত 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির (রা)-ও ছিলেন। অবশ্য এই ব্যাপারে ইব্‌ন ইস্‌হাক ও ওয়াকিদী প্রমুখ ঐতিহাসিক দ্বিমত পোষণ করিয়াছেন। একইভাবে হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)-এর ব্যাপারেও ভিন্নমত পোষণ করা হইয়াছে। কোন কোন

তথ্য হইতে জানা যায়, হযরত আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা)ও আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার নিজের দেওয়া বর্ণনা হইতে জানা যায়, তিনি তাঁহার গোত্রের ৫২ অথবা ৫৫ জন মুসলমানকে সঙ্গে করিয়া ইয়ামান হইতে নৌকাযোগে রওয়ানা হইয়াছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য। কিন্তু সেই নৌকা লোহিত সাগর দিয়া যাওয়ার কালে ঝড়ের কবলে পড়িতে হয় এবং প্রচণ্ড ঝড়ের তোড়ে আবিসিনিয়ায় আসিয়া উপনীত হয়। আবিসিনিয়ায় আসিয়া তিনি জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) ও অন্যান্য মুহাজিরগণের সহিত মিলিত হন এবং খায়বার বিজয়ের পর তাঁহারা মদীনা মুনাওয়ারায় প্রত্যাবর্তন করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবারে হাজির হন।[২০] 'উছমান ইব্ন 'আফ্ফান (রা) রুকায়্যা বিনত রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ হুযায়ফা (রা) এবং তাঁহার স্ত্রী সাহলা বিনত সুহায়ল ইব্ন আমর (রা) প্রমুখ সম্পর্কে আত্-তাবারী বর্ণনা করেন যে, তাঁহারা মক্কায় অবস্থান করেন।[২১] কিন্তু এই বিবরণ সঠিক নহে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

ইব্ন ইসহাক কেবল দ্বিতীয় পর্যায়ে যাঁহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন তাঁহাদেরই উল্লেখ করেন নাই, বরং তিনি ৩৩ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলার তালিকাও প্রদান করিয়াছেন। এই পুরুষ ও মহিলার ৪১ জনের দলটি মক্কা মুকাররামায় ফিরিয়া আসেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করিবার অল্প কিছুদিন পূর্বে।[২২]

মক্কার পরিস্থিতি মুসলমানগণের জন্য বস্তুত এমন সংকটজনক হইয়া উঠে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতিক্রমে আবূ বাকর সিদ্দীক (রা)-কেও আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশে রওনা হইতে হয়। তিনি মক্কা হইতে ইয়ামানের দিকে পাঁচ দিনের দূরত্বে অবস্থিত বার্ক আল-গিমাদ উপকূলে পৌঁছিয়া কা'বা গোত্রের প্রধান ইবনুদ দাগিনা এবং আল-আহাবীশের[২১] নেতার সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা)-এর নিকট তাঁহার গন্তব্য সম্পর্কে জানিতে চাহিলেন। হযরত আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) বলিলেন যে, তিনি তাঁহার জনগণের দ্বারা এতই নির্যাতিত হইয়াছেন যে, সেখানে জীবন দুর্বিসহ হইয়া পড়িয়াছে এবং বস্তুত তাঁহাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করা হইয়াছে, যে কারণে তিনি অন্য দেশে হিজরত করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া ইবনুদ দাগিনা বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আবূ বাক্র (রা)-এর মত একজন সুশীল, উদার, মহৎ ও সৎ স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির তাঁহার লোকজনের দ্বারা নিগৃহীত হওয়া আদৌ সমীচীন হয় নাই। সমাজের এমন এক অলংকারকে দেশত্যাগে বাধ্য করাটাও তাহাদের উচিত হয় নাই। ইবনুদ দাগিনা এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি আবূ বাক্র (রা)-কে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং তাঁহার নিরাপত্তা দানের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করিলেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) ইবনুদ দাগিনাকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। মক্কায় আসিয়া ইবনুদ দাগিনা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি আবূ বাক্র (রা)-এর নিরাপত্তা দানের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং সকলকে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, কেহ যদি আবূ বাক্র (রা)-এর কোনরূপ ক্ষতি করে তাহা হইলে তাহা বরদাশত করা হইবে না। আল-আহাবীশ নেতা কর্তৃক এই নিরাপত্তা দানের ঘোষণাকে অবজ্ঞা

করিবার মত সাহস কুরায়শ নেতৃবৃন্দের ছিল না। তবে তাহারা শর্ত আরোপ করিল যে, আবূ বাক্র তাঁহার নিজ গৃহেই কেবল 'ইবাদত করিতে পারিবেন এবং প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করিতে পারিবেন না। তাহারা আরও বলিল যে, প্রকাশ্যে ইবাদত করিলে এবং কুরআন তিলাওয়াত করিলে তাহাদের সন্তান ও স্ত্রীলোকেরা নূতন দীন (ইসলাম)-এর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িবে। ইব্নুদ দাগিনা ও আবূ বাক্র (রা) উভয়ই শর্তটি মানিয়া লইলেন। হযরত আবূ বাক্র (রা) তাঁহার বাড়ীর সীমানার অভ্যন্তরেই কয়েকদিনের মধ্যেই একটি মসজিদ নির্মাণ করিলেন এবং সেখানে নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী ও কুর'আন তিলাওয়াত করিতে লাগিলেন। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ হযরত আবূ বাক্র (রা)-এর এই কাজে আপত্তি উপস্থাপন করিল এবং বিষয়টি আল-আহাবীশ নেতাকে জানাইল। ইতোমধ্যে পরিস্থিতি কিছুটা বদলাইয়া গেল এবং আবূ বাক্র (রা) ইবনুদ দাগিনার নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিলেন।[২৪]

ইবন ইসহাক যাঁহারা আবিসিনিয়ায় দ্বিতীয় পর্যায় হিজরত করিয়াছিলেন মোটের উপর তাঁহাদের একটি বিস্তারিত তালিকা প্রদান করিয়াছেন।[২৫] এই তালিকা হইতে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, মক্কায় এমন কোন গোত্র বা পরিবার ছিল না যাহারা কম-বেশী হিজরত দ্বারা প্রভাবিত হয় নাই এবং যাহাদের পুত্র-কন্যাগণ, ভাগিনা-ভাতিজা, ভাগ্নী-ভাতিজী, জামাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ছিল না, যাহারা তাহাদের বিবেকের তাড়নায় গৃহ ত্যাগ করেন নাই। এমনকি বিশিষ্ট বিরোধী নেতৃবৃন্দও অত্যন্ত নিকটজনদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হন। যেমন আবূ জাহলের ভাই সালামা ইব্ন হিশাম, চাচাতো ভাই ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতা 'আয়াশ ইব্ন আবী রবী'আ, চাচাতো বোন উম্মু সালামা, আবূ সুফ্য়ানের কন্যা উম্মু হাবীবা, 'উতবা ইব্ন রবী'আর পুত্র আবূ হুযায়ফা এবং সুহায়ল ইব্ন 'আমরের ভাই, পুত্র-কন্যাগণ ও জামাতা প্রমুখ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের দলভুক্ত ছিলেন। অন্যান্য বিরোধী নেতৃবৃন্দও একইভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

ছয় ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতকারিগণকে শায়েস্তা করিবার লক্ষ্যে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কুরায়শ প্রতিনিধি দলের তথায় গমন

স্বভাবতই পরিস্থিতি কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যে গভীরভাবে রেখাপাত করিল। তখন কিছু সংখ্যকের মধ্যে মুসলমানগণ ও ইসলামের প্রতি শত্রুতা ও কঠোর মনোভাব চরম আকার ধারণ করিল। অন্যদিকে অন্যান্য কিছু ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিল ভিন্ন পন্থায় এবং মোটের উপর নূতন দীন (ইসলাম)-এর ব্যবহারে তাহাদের মনোভাব কিছুটা নমনীয় হইয়া উঠিল। অবশ্য একটা ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য পোষণ করিল যে, আবিসিনিয়ায় যাঁহারা হিজরত করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগকে আবিসিনিয়া হইতে ফিরাইয়া আনিতে সর্বাত্মক উদ্যোগ লওয়া জরুরী। ইব্ন ইসহাক উল্লেখ করিয়াছেন, শত্রু নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে কঠিন শাস্তি দিবার মতলব ব্যক্ত করে যাহাতে তাঁহারা নূতন দীন (ইসলাম) পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।[২৬]

এই ব্যাপারে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের উদ্যোগসমূহ, বিশেষত আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট তাহাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার তৎপরতাসমূহ সম্পর্কে অধিক তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামা (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'ঊদ (রা), আবূ মুসা আল-আশ'আরী (রা) এবং হযরত জা'ফার ইব্ন আবূ তালিব (রা) প্রমুখ হইতে বর্ণিত আছে। তাঁহারা সকলেই আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের দলভুক্ত ছিলেন এবং আবিসিনিয়ার সম্রাটের দরবারে তাঁহাদের মুখপাত্র ছিলেন। এই সমস্ত বিবরণ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে একে অপরের সত্যায়ন করে। তবে বিবরণের কতিপয় ক্ষেত্রে সামান্য কিছু হেরফের পরিলক্ষিত হয়। হযরত 'উম্মু সালামা (রা) হইতে বর্ণিত বিবরণের সংক্ষিপ্তসার নিম্নে প্রদত্ত হইল।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাহারা বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ কূটনীতিক আবূ জাহলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবী রবী'আ এবং আমর ইবনুল 'আস ইব্ন ওয়াইল (সাহ্ম গোত্রীয়)-কে আবিসিনিয়ার সম্রাটের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাহাদের সঙ্গে মূল্যবান ও আকর্ষণীয় উপঢৌকন দেওয়া হয় সম্রাট ও তাঁহার দরবারের সভাসদবর্গকে দেওয়ার জন্য। এই দুইজন কুরায়শ কূটনীতিক আবিসিনিয়ায় পৌঁছিয়া প্রথমে প্রধান প্রধান সভাসদ ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের সহিত সাক্ষাত করিয়া উপঢৌনসমূহ প্রদান করে। এইভাবে তাহারা সভাসদবর্গ ও কর্মকর্তাদের সর্বাত্মক সমর্থন লাভ করিবার জন্য সম্মতি আদায় করে। তাহারা কুরায়শ নেতৃবৃন্দের আবেদন অনুযায়ী হিজরতকারীদিগকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিয়া দিবার জন্য সম্রাটকে রাজী করাইবার ব্যাপারে সমর্থন দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। সভাসদবর্গ ও কর্মকর্তাদিগকে দলে ভিড়াইয়া কুরায়শ কূটনীতিকদ্বয় সম্রাট নেগাস (নাজাশী)-এর দরবারে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাত করে এবং উপঢৌকনাদি পেশ করিবার পর সম্রাটের নিকট আরজী পেশ করে যে, তাহাদের কওমের কতিপয় মূর্খ ও অবাধ্য তরুণ দেশ হইতে পালাইয়া আসিয়াছে এবং এই দেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা তাহাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এমন এক ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে যাহা নেগাস (নাজাশী) এবং তাহার জনগণ যে ধর্মাবলম্বী তাহাও নহে কিম্বা পৃথিবীর পরিচিত কোন ধর্ম নহে, বরং তাহারা তাহাদের নিজস্ব একটি ধর্ম তৈয়ার করিয়া লইয়াছে।

কূটনীতিকদ্বয়ের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সভাসদবর্গ সমস্বরে পূর্বাহ্নে গৃহীত ব্যবস্থা অনুযায়ী আশ্রয় গ্রহণকারিগণকে প্রত্যর্পণের সমর্থন জানাইল। তাহাদের এই সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও বলিল যে, পালাইয়া আসা লোকজন সম্পর্কে তাহাদের নিজেদের লোকজনই উত্তমভাবে অবহিত এবং এই ধরনের ব্যক্তিগণকে আমাদের দেশে প্রশ্রয় ও আশ্রয় দেওয়া সমীচিন হইবে না।

সম্রাট নেগাস (নাজ্জাশী) তাঁহার সভাসদবর্গের কথার সহিত দ্বিমত পোষণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, যাহারা নিজেদের দেশ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছে এবং এই রাজত্বে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে সর্বপ্রথম তাহাদের অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া বলিবার জন্য সুযোগ দেওয়া

উচিত এবং তাহাদের ব্যাপারটি তাহাদের জানানো সমীচীন। সেই অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট দিনে হিজরতকারীদের সম্রাটের দরবারে হাজির হইবার জন্য সমন জারী করা হইল। সম্রাটের সমন পাইয়া হিজরতকারিগণ নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করিয়া সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত লইলেন যে, তাঁহারা সম্রাটের দরবারে নির্দিষ্ট তারিখে উপস্থিত হইয়া নির্দ্বিধায় সম্রাটকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষাগুলি তুলিয়া ধরিবেন, তাহাতে নেগাস (নাজাশী) তাঁহার ভূখণ্ডে তাহাদিগকে অবস্থান করিতে অনুমতি দিন অথবা না দিন তাহাতে কিছু আসে যায় না।

মুসলমানগণ নির্দিষ্ট দিনে দরবারে হাজির হইলে সম্রাট নেগাস তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কেন তাহাদের বাপ-দাদার ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং তাহার বদলে অন্য ধর্ম গ্রহণ না করিয়া একটি নূতন ধর্ম বানাইয়া নিজেরা সেই নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, আর সেই নূতন ধর্মটাই বা কি? মুসলমানগণের তরফ হইতে হযরত জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) দরবারে কথা বলিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রচার কার্য চালানোর পূর্বেকার আরবের সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা তুলিয়া ধরিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রধান শিক্ষাগুলি বিবৃত করিলেন। তিনি মক্কায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক মুসলমানগণকে নিত্যদিন কিভাবে জুলুম-নির্যাতনের শিকার হইতে হইতেছে তাহারও বিবরণ প্রদান করিলেন। তিনি তাহার বক্তব্য শেষ করিলেন এই বলিয়া, যে সমস্ত মজলুম মানুষের অন্য দেশে যাওয়া ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না তাহারা মহামতি নেগাসের (নাজাশী) রাজ্যে শরণার্থী হইয়াছে। কারণ তাহাদের দৃঢ় আস্থা আছে যে, সেখানে তাহারা কোন অবিচারের সম্মুখীন হইবে না।

আবিসিনিয়ার সম্রাট জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর বক্তব্যে মুগ্ধ-বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যে সমস্ত ওহী নাযিল করিয়াছেন তাহা হইতে কিয়দংশ আবৃত্তি করিয়া শুনাইতে বলিলেন। জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) তখন (১৯ নম্বর) সূরা মারয়াম-এর প্রথম অংশ তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন। নেগাস (নাজাশী) তিলাওয়াত শুনিয়া এতই মুগ্ধ হইয়া গেলেন যে, তাঁহার দুই চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িয়া তাঁহার গণ্ডদেশ সিক্ত হইয়া গেল। তাঁহার দরবারের সভাসদদিগের অনেকেই আপ্লুত হইয়া গেলেন। তিলাওয়াত করা শেষ হইয়া গেলে নেগাস মন্তব্য করিলেন, যে উৎস হইতে জেসাস ('ঈসা) উদ্ভূত হইয়াছিলেন ইহা তো সেই একই উৎস। তিনি ইহাও বলিলেন, এই সব হিজরতকারীদেরকে আমি তাঁহাদের দেশের লোকদের নিকট সমর্পণ করিব না।

উম্মু সালামা (রা) আরও বলেন, কুরায়শ প্রতিনিধিদ্বয়ের মধ্যে 'আবদুল্লাহ মুসলমানদের প্রতি কিছুটা নমনীয় হইলেও 'আমর ইবনুল 'আস তাহার মনোভাবে আপোষহীন রহিল বরং সে ইহা করিতে তাহার সংকল্পে অটল ছিল। সে পরবর্তী দিবসে নেগাসের দরবারে হাযির হইয়া সম্রাটের নিকট মুসলমানদিগকে জেসাস সম্পর্কে তাহাদের অভিমত কি তাহা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আবেদন করিল। সেই সঙ্গে 'আমর ইবনুল 'আস ইহাও বলিল যে, জেসাস সম্পর্কে মুসলমানরা যে অভিমত পোষণ করে তাহা অত্যন্ত আপত্তিকর।

ইতোমধ্যে মুসলমানগণ 'আমর ইবনুল 'আস-এর অভিসন্ধি অবহিত হইয়াছিলেন।[২৭] মুসলমানগণ নিজেদের মধ্যে এই ব্যাপারে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, যাহা সত্য তাহাই সম্রাটের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইবে এবং নির্ভয়ে জেসাস সম্পর্কে আল্লাহ্র কালাম ও রসূলের শিক্ষা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হইবে। সম্রাটের দরবারে তাঁহাদিগকে উপস্থিত হইবার জন্য আবার ডাক আসিলে তাঁহারা সেখানে হাযির হইলেন। সম্রাট তাঁহাদিগকে জেসাসের ব্যাপারে তাঁহাদের কী বিশ্বাস সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা) নিঃসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, তিনি (জেসাস) ছিলেন আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁহার রূহ ও কালাম যা কুমারী মেরী (মারয়াম)-এর গর্ভে তাঁহার নিকট হইতে প্রদান করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া সম্রাট নেগাস মন্তব্য করিলেন, নিশ্চয় ঈসা (আ) তাহা অপেক্ষা অধিক আর কিছু ছিলেন না। দরবারের সভাসদবর্গ এই অভিমতের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপনের চেষ্টা করিলে সম্রাট তাহা নাকচ করিয়া দিলেন। তারপর তিনি কুরায়শ নেতারা যে সমস্ত উপঢৌকন দিয়াছিল তাহা তাহাদের প্রতিনিধিদের নিকট ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিলেন, কুরায়শ প্রতিনিধিদিগকে তাঁহার দরবার হইতে বহিষ্কার করিলেন এবং তাঁহার দেশে মুসলমানগণকে কোন মহল হইতে কোনরূপ উত্যক্ত হওয়ার আশংকা না করিয়া নির্বিঘ্নে তাঁহার দেশে অবস্থান করিবার অনুমতি দিলেন।[২৮]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছ হইতে জানা যায়, হযরত জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)-এর কথা এবং কুরআন শরীফের তিলাওয়াত শুনিয়া বিমুগ্ধচিত্তে তিনি ইসলামে ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এ ঈমান আনয়ন করিলেন। তারপর তিনি বলিলেন, বাইবেলে যে প্রতিশ্রুত নবীর কথা বলা হইয়াছে এবং জেসাস যে নবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া গিয়াছেন ইনিই সেই নবী। নাজাশী আরও বলিলেন, তিনি যদি মক্কায় রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অধিপত্য বিস্তার না কারিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি মক্কায় যাইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অপেক্ষা করিবেন। হযরত জা'ফার (রা) একই ধরনের বর্ণনা করিয়া তাহার সহিত আরও যোগ করিয়াছেন, উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া নাজাশী কুরায়শ প্রতিনিধিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়া আসিয়াছেন তাহারা কি তাহাদের ক্রীতদাস এবং তাঁহারা কি কুরায়শের নিকট হইতে কোন অর্থ সম্পদ কর্জ করিয়াছেন? এই দুইটি প্রশ্নের উত্তরেই তাঁহারা না বলিল। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে নাজাশী তাহাদিগকে বলিলেন, মুসলমানদিগকে এখানে রাখিয়া তোমরা তোমাদের দেশে ফিরিয়া যাও। নাজাশী যে ঈমান আনিয়াছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এই বর্ণনা হইতে ও আর তাহা হইতেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর ইন্তিকালের খবর পাইয়া তাঁহার জন্য দু'আ করিয়াছিলেন।[২৯]

সাত ঃ গুরুত্ব ও পরিণতি

আবিসিনিয়ায় হিজরত ও ইহার পরিণতি সুদূরপ্রসারী এবং অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসূ ছিল। যৌবনদীপ্ত পুরুষ ও নারিগণের আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রত্যয় কুরায়শ সমাজে যেমন প্রভাব ফেলে

তেমনি তাঁহাদের ঈমানের তাকীদে মাতৃভূমি ত্যাগ করা, গৃহ ত্যাগ করা, বাড়ি হইতে চলিয়া যাওয়া এবং আত্মীয়-স্বজনদের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া নির্বাসিত জীবন গ্রহণ করা প্রভৃতি কাফির-মুশরিক কুরায়শ নেতৃবৃন্দের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের আত্মসমর্পণ করাইতে ও ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাহাদের মধ্যে পরজয়ের গ্লানি প্রবল হয়। তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারে যে, তাহাদের এবং তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে ইসলামের ঈমান লইয়া যে বিরোধ তাহা চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয়। মক্কায় কাফির-মুশরিক জেদী নেতৃবৃন্দ তখনও বুঝিতে পারে নাই যে, তাহাদের নির্যাতনমূলক অনুচিত নীতি এবং তাহারা যে তাহাদের অন্ধকারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের খাতিরে অন্ধকার পথে হাঁটিতেছে তাহা তাহাদিগকে কোথায় লইয়া যাইবে। তাহাদের (কাফির-মুশরিক কুরায়শ নেতৃবৃন্দের) প্রথম পরাজয় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের মধ্য দিয়া।

আবিসিনিয়ায় হিজরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানদের স্থানীয় নগরী ও স্থানীয় ভূখণ্ডে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিবার কার্যক্রম সূচিত করে। যাঁহারা আবিসিনিয়ার হিজরত করিয়াছিলেন তাঁহারা পলাতকও ছিলেন না অথবা শরণার্থীও ছিলেন না। সাধারণত পলাতক ও শরণার্থী বলিতে যাহা বুঝায় তাঁহারা দুইটির কোনটিই ছিলেন না। তাঁহারা অবশ্য তাঁহাদের তাবৎ আত্মীয়-স্বজন ও বিষয়-সম্পত্তি ছাড়িয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু বহন করিয়া আনিয়াছিলেন আল্লাহ্র রাসূলের বাণী ও চিন্তাধারা যাহা তাঁহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, যাহা তাঁহাদের ভিতরে ও বাহিরে এমন আলো প্রজ্জ্বলিত করিয়াছে যাহা তাঁহাদিগকে অজানার দিকে অগ্রসর হইবার শক্তি যোগাইয়াছে। তাঁহারাই ছিলেন বিদেশে ইসলামের সর্বপ্রথম প্রচারক দল। বস্তুত আবিসিনিয়ায় হিজরত করা ছিল বিশ্বজনীন দীন হিসাবে ইসলামের সূচনা।

হিজরতকারীদের এই নূতন অবস্থান স্থলের কর্মতৎপরতার প্রভাব কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মক্কার বিত্তবান বণিক পরিবারভুক্ত এবং বিভিন্ন গোত্রের এই প্রায় এক শত সদস্যবিশিষ্ট দল আবিসিনিয়ার ওয়াকিফহাল জ্ঞানী-গুণী মহলের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। আবিসিনিয়ার এই ওয়াকিফহাল মহলের অন্তর উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এইজন্য যে, মক্কার ঐ সমস্ত অভিজাত ব্যক্তিবর্গ শুধু নূতন ধর্মের খাতিরে তাঁহাদের ঘর-বাড়ি সহায়-সম্পতি, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া বিদেশ বিভূঁইয়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাই তাহারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে, ইহার প্রতি আশ্রয় দানকারী জনগণের মধ্যে কৌতূহল দিনে দিনে প্রবল হইয়া উঠে।

মক্কার কুরায়শ প্রতিনিধি দল আবিসিনিয়া হইতে চলিয়া যাওয়ার পরও আবিসিনিয়ার মানুষের ইসলামের প্রতি আগ্রহের অবসান ঘটে নাই, বরং তাহাদের দেশে অবস্থানরত হিজরতকারীদের ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল। মুখে মুখে ফিরিতে লাগিল হিজরতকারিগণ যে চিন্তাধারা ও শিক্ষা বহন করিয়া আনিয়াছেন সে সম্পর্কেও। পার্থিব দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে আবিসিনিয়ার মানুষের অন্তরে নাড়া দিল এই বিষয়টি যে, হিজরতকারিগণ

সব কিছু ফেলিয়া রাখিয়া সত্য-সুন্দরের প্রচারের জন্য তাহাদের দেশে আসিয়াছেন। তাঁহাদের এই ত্যাগের কথা আবিসিনিয়ার মানুষের অন্তর হইতে অন্তরে অনুরণিত হইতে লাগিল, বিশেষ করিয়া আবিসিনিয়ার বুদ্ধিজীবী ও ধর্মানুরাগী মহলের অন্তরে বিপুলভাবে সাড়া জাগাইল। ফলে বিষয়টি সরেজমীনে অবহিত হইবার লক্ষ্যে ২০ সদস্যবিশিষ্ট এক খৃস্টান প্রতিনিধি দল মক্কায় আসিল। জানা যায় যে, এই প্রতিনিধি দল মক্কায় পৌঁছিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করিয়া নূতন বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদিগকে ইসলাম সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়া জ্ঞান দান করেন এবং কুরআন মজীদের কয়েকখানি আয়াত তাহাদিগকে তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন এবং তাহারা যাহা যাহা প্রশ্ন করিল তাহার জবাব দিয়া তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইলেন। ইসলাম যে আল্লাহ্‌র মনোনীত দীন এই ব্যাপারে এই খৃস্টান প্রতিনিধি দল নিশ্চিত হইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট বায়'আত হইয়া ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

আরও জানা যায় যে, এই প্রতিনিধি দল ইসলাম গ্রহণ করিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দরবার হইতে বিদায় লইয়া স্বদেশাভিমুখে যাইবার পথে আবূ জাহ্‌ল্ ও তাহার কতিপয় সঙ্গী-সাথীরা তাঁহাদিগকে পথিমধ্যে বাধা দিয়া তাহাদিগকে এই বলিয়া ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে যে, তোমাদিগকে তোমাদের দেশের মানুষ মক্কায় পাঠাইয়াছিল প্রকৃত সত্য উদঘাটনের জন্য। অথচ তোমরা প্রকৃত ঘটনা তোমাদের দেশের মানুষের কাছে জানাইবার জন্য ফেরত না যাইয়া তোমরা নিজেদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করিয়া নূতন দীন গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া চলিয়াছ। আবিসিনিয়ার এই খৃস্টান প্রতিনিধি দল আবূ জাহ্‌লের এই কথার উত্তরে অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন, তাঁহারা মক্কায় আসিয়াছিলেন সত্য উদঘাটনের জন্য, তাঁহারা এখানে অজ্ঞতা ও অসত্যকে উদঘাটনের জন্য আসেন নাই। তাই তাঁহারা যাহা সত্য তাহা লইয়াই দেশে ফিরিতেছেন।[৩০] জানা যায় যে, কুরআন মজীদের ২৮ ঃ ৫২-৫৩ আয়াত এই দেশের প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।[৩১]

আবিসিনিয়ার হিজরতকারিগণ দীর্ঘকাল শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় হিজরত করার পূর্বে বিভিন্ন সময় তাহাদের প্রায় ৪০ জন মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। অন্যান্য সাহাবী আবিসিনিয়ায় দীর্ঘ দিন ধরিয়া অবস্থান করেন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত মিলিত হন খায়বার বিজয়ের পরে। মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের পূর্বে যাঁহারা মক্কা মুকাররামায় প্রত্যাবর্তন করেন তাঁহারা হইলেন ঃ

১. 'উছমান ইব্‌ন 'আফ্‌ফান (রা)

২. রুকায়্যা বিন্‌ত রাসূলুল্লাহ (হযরত উছমানের স্ত্রী)

৩. আবূ হুযায়ফা ইব্‌ন 'উত্‌বা ইব্‌ন রবী'আ (রা)

৪. সাহ্‌লা বিন্‌ত সুহায়ল ইব্‌ন 'উমার (আবূ হুযায়ফার স্ত্রী)

৫. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহ্‌শ (রা)

৬. 'উত্‌বা ইব্‌ন গাযওয়ান (রা)

৭. আয-যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম (রা)

৮. মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (রা)

৯. সুওয়বিত ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হারমালা (রা)

১০. তুলায়ব ইব্‌ন 'উমায়র (রা)

১১. 'আবদুর রহমান ইব্‌ন 'আওফ (রা)

১২. মিকদাদ ইব্‌ন আমর (রা)

১৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা)

১৪. আবূ সালামা (রা)

১৫. উম্মু সালামা (আবূ সালামার স্ত্রী)

১৬. শাম্‌মাস ইব্‌ন 'উছমান (রা)

১৭. সালামা ইব্‌ন হিশাম (রা)

১৮. 'আইশা বিনত আবী রবী'আ (রা)

১৯. মু'আত্তিব ইব্‌ন আওফ (রা)

২০. 'উছমান ইব্‌ন মায'উন (রা)

২১. আস-সাইব ইব্‌ন 'উছমান ইব্‌ন মায'উন (রা),

২২. কুদামা ইব্‌ন মায্'উন ('উছমান ইব্‌ন মায'উনের ভাই)

২৩. 'আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মায'উন (রা)

২৪. খুনায়ছ ইব্‌ন হুযায়ফা (রা)

২৫. হিশাম ইবনুল 'আস ইব্‌ন ওয়াইল (রা)

২৬. 'আমের ইব্‌ন রবী'আ (রা)

২৭. লায়লা বিন্‌ত আবী হাছমা (উপরিউক্ত জনের স্ত্রী)

২৮. আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাখরামা (রা)

২৯. 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (রা)

৩০. আবু সাব্‌রা ইব্‌ন আবী রুহ্‌ম (রা)

৩১. উম্মু কুলছূম বিনত সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (উপরিউক্তজনের স্ত্রী এবং ২৯ ক্রমিকের বোন)

৩২. সাকরান ইব্‌ন 'আমর (রা)

৩৩. সাওদা বিন্‌ত যাম'আ (রা)

৩৪. সা'দ ইব্‌ন খাওলা (রা)

৩৫. 'আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)

৩৬. 'আমর ইবনুল হারিছ (রা)

৩৭. সুহায়ল ইব্‌ন বায়দা (রা)

৩৮. 'আমর ইব্‌ন আবী সারহ' (রা)

উপরিউক্ত সাহাবীগণের মধ্যে সাকরান ইব্‌ন 'আমর (রা) (৩২ নম্বর) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করার পূর্বেই ইন্তিকাল করেন এবং সালামা ইব্‌ন হিশাম (রা) (১৭ নম্বর) এবং হিশাম ইবনুল আস (রা) (২৫ নম্বর)-কে মক্কার কাফির-মুশরিকরা আটক করিয়া রাখায় তাঁহারা মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত করিতে পারেন নাই। অন্যদিকে আইশা বিন্‌ত আবী রবী'আ (রা) (১৮ নম্বর) মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়া তাঁহার বৈপিত্রেয় ভ্রাতা আবূ জাহল কর্তৃক প্রত্যানীত হন। হযরত হারিছ ইব্‌ন হিশাম নামক আর একজন মক্কায় প্রত্যানীত হন। 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর (রা)-কে (২৯ নম্বর) গৃহবন্দী হইয়া তাঁহার পিতা কর্তৃক মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হন। 'আবদুল্লাহর পিতা সুহায়ল ইব্‌ন 'আমর বাহ্যিকভাবে পূর্ব ঘোষিত ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কাফির-মুশরিকদের সহিত মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর অভিযানে আসিলেও বদর যুদ্ধ চলাকালে এক পর্যায়ে সুযোগ বুঝিয়া মুসলিম বাহিনীতে যোগদান করেন এবং কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়েন। বাদবাকী যে সমস্ত পুরুষ হিজরতকারী আবিসিনিয়া হইতে ফেরত আসিয়া মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন তাহারা সকলেই বদর যুদ্ধে শরীক হন।

অনুবাদ ঃ হাসান আবদুল কাইয়ূম

তথ্যনির্দেশিকা

১. পরে দেখুন পৃ. ৬৭৫–৬৭৬।

২. উপরে দ্র.পৃ. ৫৩৪।

৩. নিম্নে দ্র. পৃ. ৬৭২–৬৭৩।

৪. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩২১।

৫. দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর, ২১খ., পৃ. ১০-১১।

৬. দ্র. সূরা ২৯ ঃ ৪৬।

৭. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩২১–৩২২।

৮. দ্র. মুসনাদ, ১খ., পৃ. ২৭৬, ৩০৪; তিরমিযী (তুহফাত আল–আহওয়াযী), পৃ. ৫১-৫৪), সংখ্যা ৩২৪৫–৩২৪৬); ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৬খ পৃ. ৩০৪; শাওকানী, তাফসীর, খ৪, পৃ. ২১৪।

৯. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩২২-৩২৩।

১০. ইব্ন সা'দ ১খ., পৃ. ২০৪; তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ, ৩৩০(১/১১৮৩)।

১১. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩২৩।

১২. নিম্নে দ্রষ্টব্য ২৯ অধ্যায়।

১৩. ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ২০৬।

১৪. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৬৪।

১৫. ইব্ন সা'দ, ১খ., পৃ. ২০৬।

১৬. প্রাগুক্ত।

১৭. জানা যায় যে, তিনি কিছু দিনের জন্য গোপনে মক্কায় অবস্থান করিয়া আবিসিনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৭০।

১৯. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৭১।

২০. বুখারী, ক্রমিক ৪২৩০।

২১. আত-তাবারী, তারীখ, ২খ., পৃ. ৩৪০ (১/১১৯৪)।

২২. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ, ৩২৪, ৩৭৯।

২৩. আল-আহাবীশ নামকরণ করা হয় বনূ হারিছ ইব্ন 'আবদ মানাত ইব্ন কিনানা ইবনুল হূন ইব্ন খুযামা ইব্ন মুদরিকা এবং ইবনুল মুসতালিক। তাহারা মক্কার নিকটবর্তী আল-'আহবাশ নামক উপত্যকাবাসীদের মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় এই নামে অভিহিত হয়।

২৪. বুখারী, ক্রমিক ৩৯০৫; ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৭২-৩৭৪।

২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৩-৩৩০।

২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।, ইব্ন ইসহাক বলেন ঃ يردهم عليهم ليفتنوهم فى دينهم .

২৭. সম্ভবত 'আবদুল্লাহ মুসলমানগণকে আমর ইব্নুল 'আস-এর পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে আভাস দিয়াছিল অথবা এ সম্পর্কে অন্য কোন সূত্র হইতে আভাস পাওয়াটাও অস্বাভাবিক ছিল না।

২৮. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৩৩-৩৩৮।

২৯. বুখারী, ক্রমিক ৩৮৭৭-৩৮৮১।

৩০. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৩৯১-৩৯২।

৩১. এই ঘটনা বিস্তারিত জানিবার জন্য দেখুন ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৬খ., পৃ. ২৫৪। এই প্রতিনিধি দলের সদস্য সংখ্যা ৭০ জন ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে।

ঊনত্রিশতম অধ্যায়

"শয়তানী পংক্তিমালার" জাল কাহিনী

এক ঃ কাহিনীর সারসংক্ষেপ

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে আপোষরফার গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের প্রথম দলের অধিকাংশই সাময়িকভাবে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। এই গুজবের কারণ সম্পর্কে আত-তাবারী, আল-ওয়াকিদী এবং অন্যান্য আরও কয়েকজন ঐতিহাসিক ডজনখানিকের অধিক বর্ণনাকারীর বিভিন্ন প্রকারের বিবরণ বিভিন্ন সূত্র হইতে তুলিয়া ধরিয়াছেন।[১] এই গুজবের কারণ ছিল, মক্কার কুরায়শ নেতৃবৃন্দের ক্রমবর্ধমান শত্রুতা ও বিরোধিতার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তাহাদের দেব-দেবীর নিন্দামূলক কোন ওহী নাযিল না হওয়া উত্তম। তাহা হইলে তাহারা নমনীয় হইয়া যাইবে এবং শত্রুতা হইতে বিরত থাকিবে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফ চত্বরে যাইয়া মু'মিন ও মুশরিকদের এক সমাবেশে সূরা আন-নাজ্‌ম (নম্বর ৫৩) তিলাওয়াত করেন। জানা যায়, এই সূরাখানি ঐ সময় নাযিল হয়। এই সূরা তিলাওয়াতকালে তিনি যখন ১৯-২০ আয়াত দুইখানি তিলাওয়াত করেন, যাহাতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ তোমরা কি ভাবিয়া দেখিয়াছ 'লাত' ও 'উয্‌যা সম্বন্ধে এবং তৃতীয় আরেকটি 'মানাত' সম্বন্ধে? (أَفَرَأَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى) তখন এই তিলাওয়াতের মধ্যে শয়তান শ্লোক প্রক্ষেপণ করিল, আর তাহা হইতেছে ঃ যারা মরালের মত উল্লাসে ডানা ঝাপটায় নিশ্চয় তাদের ওকালতি গ্রহণের আশা করা যায়।

تِلْكَ الْغَرَانِقَةُ الْعُلٰى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجٰى/لَتُرْتَجٰى.

রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাটি তিলাওয়াত সমাপ্ত করিলেন এবং সূরার শেষ আয়াতে সিজদার নির্দেশ থাকায় তিনি সিজদা করিলেন। তাঁহার দেখাদেখি বৃদ্ধ কুরায়শ নেতা (উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ অথবা আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কিম্বা আবূ উমায়্যা) ব্যতীত মু'মিন ও মুশরিক সকলেই সিজদা

করিলেন। বৃদ্ধ কুরায়শ নেতা সিজদাঅবনত না হইয়া এক মুষ্টি মাটি তুলিয়া লইয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল যে, ইহাই তাহার জন্য যথেষ্ট। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বলিতে লাগিল, মহানবী ﷺ আল্লাহ্‌র নিকট সুপারিশকারী হিসাবে আমাদের দেব-দেবীদের অবস্থানের স্বীকৃতি দিয়াছেন, তাই তাঁহার সহিত ঝগড়া-বিবাদ করিবার কোন ব্যাপারই থাকে না। পরে সন্ধ্যা বেলায়, কোন কোন বর্ণনায় সময় নির্দিষ্ট করা হয় নাই, ফেরেশতা জিবরীল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট অবতরণ করিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন সেই সূরাখানি তিলাওয়াত করিয়া শুনাইবার জন্য। তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ শয়তানের শ্লোকগুলি আবৃত্তি করিলে জিবরীল (আ) বাধা দিয়া বলিলেন, এই পদাবলী তাঁহার নিকট যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে উহার অন্তর্ভুক্ত নহে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভীষণ দুঃখিত হইলেন এবং আল্লাহ্‌র গযবের আশংকা করিলেন। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে আলাদা দুইখানি আয়াত নাযিল হয়। তাহা হইতেছে ১৭ ঃ ৭৩-৭৫ এবং ২২ ঃ ৫২।[২]

রাসূলুল্লাহ ﷺ পুনরায় আশ্বস্ত হইলেন এবং শয়তানের শ্লোকসমূহ বাতিল বলিয়া গণ্য হইল। কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ক্রোধান্বিত হইয়া তাহাদের শত্রুতা এবং বিরোধিতা পুনরায় প্রচণ্ডতার সহিত শুরু করিয়া দিল। ইতোমধ্যে তাহাদের বশ্যতা স্বীকার এবং ঘটনার খবর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহিত তাহাদের মীমাংসা হইয়া গিয়াছে এই আকারে আবিসিনিয়ায় পৌঁছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথিত নমনীয়তা প্রসঙ্গ আনিয়া নিম্নের দুইখানি আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَاِنْ كَادُوْا لَيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِىْ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لِتَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَاِذًا لاَّتَّخَذُوْكَ خَلِيْلاً . وَلَوْ لاَ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً . اِذًا لاَّذَقْنٰكَ ضِعْفَ الْحَيٰوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا .

"(হে রাসূল) আমি আপনার প্রতি যে প্রত্যাদেশ করিয়াছি তাহা হইতে উহারা পদস্খলন ঘটাইবার চেষ্টা প্রায় চূড়ান্ত করিয়াছিল যাহাতে আপনি আমার সম্বন্ধে উহার (প্রত্যাদেশের) বিপরীত মিথ্যা উদ্ভাবন করেন, তবেই উহারা অবশ্যই আপনাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিত। আমি আপনাকে অবিচলিত না রাখিলে আপনি উহাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকিয়া পড়িতেন, তাহা হইলে অবশ্যই আপনাকে পার্থিব জীবনে দ্বিগুণ এবং মৃত্যুর পরে দ্বিগুণ (শাস্তি) আস্বাদন করাইতাম। তখন আমার বিরুদ্ধে আপনার জন্য কোন সাহায্যকারী পাইতেন না" (১৭ ঃ ৭৩-৭৫)।

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلاَ نَبِىٍّ اِلاَّ اِذَا تَمَنّٰى اَلْقَى الشَّيْطَانُ فِىْ اُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللّٰهُ مَا يُلْقِىْ الشَّيْطٰنُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللّٰهُ اٰيٰتِهِ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ .

"(হে রাসূল) আমি আপনার পূর্বে যে সমস্ত রসূল কিম্বা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে তখনই শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। শয়তান

যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়" (২২ঃ ৫২)।

এইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ দৃঢ় প্রত্যয়ী হইলেন। ইতোমধ্যে আবিসিনিয়ায় গুজব রটিয়া যায় যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে এবং মুসলমানদের প্রতি তাহাদের শত্রুতার অবসান ঘটিয়াছে।

দুই ঃ মিথ্যা কাহিনী সম্পর্কে কুরআনের প্রমাণ

কাহিনী এতোই সুস্পষ্টভাবে অসম্ভব ও অসত্য যে, ইহা অবাস্তব হওয়ায় সরাসরি প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত ছিল এবং ইতিহাসবেত্তা ও মুহাদ্দিছগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ না হওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তাহাদের কেহ কেহ ইহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, অন্যথায় স্বয়ং "কাহিনীর স্পষ্ট অবিশ্বাসযোগ্য বৈশিষ্ট্য" এই কাহিনীর বিশুদ্ধতার ভিত্তিরূপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

যেমন ইমাম ফখরুদ্দীন আর-রাযী যথার্থভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যে সমস্ত ভাষ্যকার এই কাহিনীটি পর্যালোচনা করিয়াছেন তাহারা ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন একটি বানোয়াট কাহিনী হিসাবে। কারণ কুরআন মজীদে ইহার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায় না, হাদীছ শরীফেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায় না।

এই কাহিনীর বিরুদ্ধে কুরআনে সাক্ষ্য হইতেছে তিন ধরনের ঃ (এক) কুরআন মজীদে অনেকগুলি বিবরণ আছে যাহাতে দেখা যায়, শয়তান কিম্বা অন্য যে কেহ ওহী নাযিল কালে তাঁহাকে বাধা দিতে পারে না। ইহা ছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফির-মুশরিক নেতাদের সহিত কখনও কোনরূপ আপোষের আগ্রহ পোষণ করেন নাই। (দুই) উল্লিখিত আয়াত নাযিলের প্রেক্ষাপটে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদৌ উদ্ভূত পরিস্থিতির ব্যাপারে কোন কিছু নিশ্চিত করেন নাই, এমনকি কাফির-মুশরিক নেতাদের সহিত একটুও আপোষের চেষ্টা করেন নাই। (তিন) সূরা নাজ্‌ম (৫৩ নম্বর সূরা) নাযিলের প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট হইয়া যায় যে, ঐ কাহিনী প্রক্ষিপ্ত। কাহিনীটি ইহার মূল চেতনা ও অন্তর্নিহিত অর্থের পরিপন্থী। নিম্নে উল্লিখিত আয়াতসমূহ ঐ কাহিনীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে ঃ

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ . لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ .

(ক) "তিনি (নবী) যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেন, আমি অবশ্যই তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিতাম এবং কাটিয়া দিতাম তাহার অন্তরের শিরা" (৬৯ঃ ৪৪-৪৬)।[৩]

قُلْ مَا يَكُوْنُ لِىْ اَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاىِٔ نَفْسِىْ اِنْ اَتَّبِعُ اِلاَّ مَا يُوْحٰى اِلَىَّ .

(খ) "বলুন, নিজ হইতে ইহা পাল্টানো আমার কাজ নহে। আমার প্রতি যাহা ওহী হয়, আমি কেবল আহারই অনুসরণ করি" (১০ ঃ ১৫)।

لاَ يَاْتِيْهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ .

(গ) "কোন মিথ্যা ইহাতে অনুপ্রবেশ করিতে পারে না—অগ্র হইতেও নহে, পশ্চাত হইতেও নহে। ইহা প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ আল্লাহর নিকট হইতে অবতীর্ণ" (৪১ ঃ ৪২)।

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ .

(ঘ) "আমিই কুরআন নাযিল করিয়াছি এবং অবশ্য আমিই উহার হিফাজতকারী (কোন হস্তক্ষেপ হইতে)" (১৫ ঃ ৯)।

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً .

(ঙ) "এইভাবেই (আমি ইহা নাযিল করিয়াছি) আপনার অন্তরকে সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং তাহা ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করিয়াছি" (২৫ ঃ ৩২)।

এইভাবে বারংবার কুরআন মজীদে ইরশাদ হইয়াছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা এই কুরআন মজীদকে প্রত্যক্ষভাবে কিংবা পরোক্ষভাবে যে কোন প্রকারের পরিবর্তন করিবার সম্ভাব্য প্রয়াস হইতে হিফাজত করিয়াছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহাতে কোনভাবেই পরিবর্তন বা কোন কিছু সংযোজন করিতে পারেন না। তিনি যদি এইরূপ করিতেন তাহা হইলে আল্লাহ্ তা'আলার কঠিন শাস্তি অপ্রতিরোধ্যভাবে পতিত হইত। এই সুস্পষ্ট এবং নিশ্চিত আনুপূর্বিক বিবরণ যাহা প্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ যে স্বেচ্ছায় কোনভাবেই শয়তান দ্বারা প্রতারিত হইতে পারেন না তাহা প্রমাণ করে এবং ওহী পরিবর্তনের ঐরূপ কাহিনী যে সম্পূর্ণভাবে বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তাহাও প্রমাণ করে। শুধু তাহাই নহে, অভিযোগে বর্ণিত অন্যায়ভাবে সন্নিবেশিত অংশ কুরআন মজীদের মৌলিক শিক্ষাকে লংঘন করিয়াছে অর্থাৎ তওহীদের পরিপন্থী এবং ইহা শিরক। শিরক সম্পর্কে কুরআন মজীদে অন্যত্র ইরশাদ হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা কোন অবস্থাতেই শিরক-এর গুনাহ ক্ষমা করিবেন না।

যেহেতু কল্পিত কাহিনীটি কুরআন মজীদের সুনির্দিষ্ট বিবরণসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত এবং সমগ্র মূল পাঠ সম্বলিত কাহিনীর মর্ম ও অন্তর্নিহিত অর্থও কুরআন মজীদের সুনির্দিষ্ট বিবরণসমূহের সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং এই কাহিনী সম্পূর্ণভাবে মূল্যহীন এবং বিশ্বাসের অযোগ্য। ইহা কেবল মুসলমানের দৃষ্টিতেই অবিশ্বাসযোগ্য নহে, বরং বিশ্বস্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও বিশ্বাসের অযোগ্য।

কেননা যে কোন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে কুরআন মজীদই হইতেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন ও শিক্ষাসমূহের বুনিয়াদী ও অত্যন্ত সমসাময়িক তথ্যাদির উৎস। এই কারণে অন্য কোন উৎসের তথ্য অথবা বর্ণনা, এমনকি যে সমস্ত বর্ণনা (তাহা হাদীছ শরীফেরই হউক) যদি বুনিয়াদী উৎসের বিপরীত হয় তাহা হইলে তাহা কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাইবে না এবং তাহা বাতিল ও রহিত বলিয়া গণ্য হইবে।

দ্বিতীয়ত, ১৭ ঃ ৭৩-৭৪ এবং ২২ ঃ ৫২ কুরআন মজীদের এই দুইখানি সূরার আয়াতসমূহের ব্যাপারে কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ যে গল্প ফাঁদিয়া বসিয়াছিল তাহার জবাবে নাযিল হয় এবং ইহার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সতর্ক করা হইয়াছে অথবা সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে। স্পষ্ট হইয়া যাইবে যে, তাহাদের উক্তিগুলিতে কোন যৌক্তিকতা নাই; বরং তাহার বিপরীত। ১৭ ঃ ৭৩–৭৪ নম্বর আয়াতে দেখা যায়, কাফির-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে একটা আপোষ-মীমাংসায় আসিবার জন্য প্ররোচিত করিতে চাহিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহা কখনও চাহেন নাই। এই আয়াতে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরকে এমন অবিচলিত ও সুদৃঢ় করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে তিনি কাফির-মুশরিকদের যে কোন ধরনের প্রয়াসকে নস্যাৎ করিয়া দিতে পারেন এবং আল্লাহ্ তা'আলা এই কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অন্তরকে সুদৃঢ় করিয়া দেন যাহাতে তিনি কাফির-মুশরিকদের কোন প্রস্তাবের প্রতি কোন অবস্থাতেই নমনীয় না হইয়া পড়েন ও সেইদিকে একটুও ঝুঁকিয়া না পড়েন।

এইখানে যাহার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে তাহা এইজন্য নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মধ্যে আপোষ-মীমাংসার প্রতি সামান্যতম ঝোঁক ছিল, বরং একদিকে ইহা কাফির-মুশরিকদের প্রয়াসের তীব্রতা প্রমাণ করে এবং অন্যদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার বিশেষ রহমত ছিল যাহাতে তিনি কাফির-মুশরিকদের কঠোর প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করিতে পারেন। নিঃসন্দেহে বলা যায়, আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত থাকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাফির-মুশরিকদের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকও ছিল না। এই আয়াতের শেষে স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সামান্যতমও বিচ্যুৎ হন নাই। যদি হইতেন তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে দুনিয়ার জীবনে দ্বিগুণ ও আখিরাতের জীবনে দ্বিগুণ শাস্তি আস্বাদনের কথা বলা হয়। ইহা পর্যালোচনা করিলে কতকগুলি প্রতিপাদ্য বিষয় প্রস্ফুটিত হয়।

(ক) আয়াতে বলা হইয়াছে, কাফির-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আপোষ-মীমাংসায় আনিবার জন্য জোর চেষ্টা চালায়। বানোয়াট গল্পে বলা হয় যে, কাফির-মুশরিকদের বিরোধিতার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ আপোষ-মীমাংসায় আগ্রহী ছিলেন।

(খ) আয়াতে বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে অবিচলিত করিয়া দেন যাহাতে কাফির-মুশরিকদের যে কোন প্রবল প্রচেষ্টার মুখে তিনি অটল থাকেন এবং তাহাদের দিকে কোন অবস্থাতেই সামান্যতম ঝুঁকিয়া না পড়েন। বানোয়াট কাহিনীটিতে বলা হয়

যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার প্রতি কেবল একটু ঝুঁকিয়াই পড়িয়া ছিলেন না, বরং কুরআন মজীদের মৌলিক শিক্ষাকে উপেক্ষা ও ত্যাগ করিয়া তাহাদের সহিত আপস-মীমাংসায় আসিয়াছিলেন।

(গ) আয়াতে বলা হইয়াছে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফির-মুশরিকদের প্রস্তাবগুলির প্রতি সামান্যতম ঝুঁকিয়া পড়িতেনই তাহা হইলে তাঁহাকে আল্লাহ্‌র দ্বিগুণ শাস্তি ভোগ করিতে হইত। তৎসত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁহার প্রতি মেহেরবানী করিয়া ওহীর বক্তব্যে অযৌক্তিকভাবে প্রক্ষিপ্ত অংশ অলক্ষ্যে রদ করিয়া দেন এবং তাঁহার প্রতি আরোপিত মিথ্যা অভিযোগের ফাঁদের জন্য দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার অনুশোচনার খাতিরে সান্ত্বনা প্রদান করেন। কুরআনের অন্য বর্ণনাতেও দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি ওহীর বক্তব্যে নিজ হইতে কিছু সংযোজন করিতেন অথবা বিয়োযোজন করিতেন তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনিবার্যভাবে ও অপ্রতিরোধ্যভাবে শাস্তির সম্মুখীন করিতেন।

১৭ ঃ ৭৩–৭৪ আয়াতও বানোয়াট কাহিনীর প্রবক্তাদের ব্যাখার সাথে সাংঘর্ষিক। তাহারা ঘটনার সমর্থনে ২২ঃ ৫২ আয়াতের যে ব্যাখ্যা দিয়াছিল তাহার সহিত অন্যান্য আয়াতের দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। উক্ত আয়াতে 'তামান্না' শব্দের ব্যবহারের উল্লেখ করিয়া তাহারা এই ব্যাখ্যা ব্যক্ত করিত যে, ইহার অর্থ তিনি পাঠ করেন অথবা আবৃত্তি করেন এবং তারপর তাহারা ইহা বলিত যে, মুহাম্মাদ ﷺ-এর পূর্বে কোন নবীই আল্লাহর ওহীতে তাহার নিজ চিন্তার অথবা বাক্যের ভিতর শয়তানের কিছু প্রক্ষেপণ করা ব্যতিরেকে আবৃত্তি করেন নাই। শয়তান কৌশলে প্রক্ষেপণ করিতে সমর্থ হইত। আসমানী ওহীর ধারণার ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা যেমন অত্যন্ত অযৌক্তিক, ঘৃণ্য ও বিধ্বংসী অপচেষ্টা তেমনি ইহা অচিন্তনীয়। এখানে আমরা এখন কুরআন মজীদের আয়াতের এই ব্যাখ্যার ত্রুটি ও অযৌক্তিকতা তুলিয়া ধরিব। এখানে কেবল উল্লেখ্য যে, যাহারা আয়াতের ঐ ব্যাখ্যা করিয়াছিল তাহারা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হইয়াছে যে, তাহাদের ব্যাখ্যা ১৭ ঃ ৭৩-৭৪ আয়াতের শেষ বিবরণের এবং কুরআন মজীদের অন্যান্য বিবরণেও সুস্পষ্ট বিপরীত। কুরআন মজীদের অন্যান্য বিবরণে আল্লাহ্‌র কোন ওহীতে সামান্যতম সংযোজন বা বিয়োজনকে আল্লাহ তা'আলা সন্দেহাতীতভাবে এবং পুরাদস্তর কঠিন শাস্তির দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করিয়াছেন।

এই কল্পকাহিনী প্রচারের বিরুদ্ধে আল্লাহ যে শাস্তির ঘোষণা করিয়াছেন তাহা যথেষ্ট তাহাদের কণ্ঠ রোধ করিবার জন্য। তাহারা তাহা উপলব্ধি করিতেও ব্যর্থ হয়। আল্লাহ্‌র বিশেষ রহমতের জন্য ব্যাকুলতার কারণে তাহার কথিত বিভ্রান্তির সহিত অন্যান্য নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে বিভ্রান্তির অভিযোগ আরোপ করিতে তাহারা দ্বিধা করে নাই।

'তামান্না' শব্দের ব্যাখ্যায় যে তিনি পাঠ করেন বা "আবৃত্তি করেন" এই অর্থ করা হইয়াছিল তাহা মারাত্মক ভুল। যাহারা এই অদ্ভুত ব্যাখ্যা আনয়ন করিয়াছিল তাহা হাস্‌সান ইব্‌ন ছাবিত হইতে বর্ণিত বলিয়া সাধারণত উল্লেখ করা হয়। সেখানে যে অভিব্যক্তি করা হইয়াছে তাহা "পাঠ"

অর্থ বহন করে। আরও বলা হইয়াছে, যে বিবরণ উক্ত আয়াতে রহিয়াছে তাহা হইতেছে আল্লাহ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন (অথবা সক্ষম করিয়া দেন)। ইহা হইতে বুঝা যায়, এখানে পরোক্ষভাব আয়াতসমূহ পাঠ করিতে নির্দেশ দান করা হইয়াছে, কিন্তু দুইটি যুক্তির কোনটিই চূড়ান্ত নহে। হাসসান ইব্ন ছাবিত-এর কবিতা ও ইতিহাসবেত্তাদের প্রচুর রচনাবলীতে দেখা গেলেও সেগুলি বস্তুত সমকালীন উপাদান নহে, বরং তাহার অধিকাংশই কবিতার স্তবক রচিত হয় অন্য কোন গ্রন্থকারের নির্দেশে এবং তাহারা সেইগুলিকে তাহাদের রচনাবলীতে সন্নিবেশিত করেন। সমসাময়িক কবিগণ ঐগুলি চয়ন করেন। অতঃপর "তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন" ইত্যাদি ভাবও অধিকতর যথার্থভাবে গ্রহণ করা যায় যে, আল্লাহ তাঁহার আয়াতসমূহ প্রতিষ্ঠিত রাখেন। ২২ ঃ ৫২ নম্বর আয়াতে তামান্না শব্দের অর্থ করিবার উত্তম দিশারী হইতেছে কুরআন মজীদের অন্যত্র ব্যবহৃত অনুরূপ উক্তি বা শব্দাবলীর শব্দমূল। কুরআন মজীদের প্রায় ১৪টি স্থানে একই ধরনের শব্দ রহিয়াছে। সূরা নাজমের শুরুতে এই ভাবের শব্দ রহিয়াছে। কুরআন মজীদের এই ধরনের ভাবসম্পন্ন আয়াত নিম্নরূপ ঃ

(১) اَمْ لِلاِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى .

"মানুষ যাহা চাহে তাহা কি সে পায়" (৫৩ ঃ ২৪)?

(২) وَّلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ.

"(শয়তান বলে) আমি তাহাদেরকে পথভ্রষ্ট করিবই, তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করিবই" (৪ ঃ ১১৯)।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلاَّ غُرُوْرًا .

"সে তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাহাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনা মাত্র" (৪ ঃ ১২০)।

(৪) لَيْسَ بِاَمَانِيِّكُمْ وَلاَ اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتٰبِ .

"তোমাদের খেয়ালখুশী ও কিতাবীদের খেয়াল-খুশী অনুসারে কাজ হইবে না" (৪ ঃ ১২৩)।

(৫) وَاَصْبَحَ الَّذِيْنَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالاَمْسِ يَقُوْلُوْنَ .

"আর পূর্বদিন যাহারা তাহার মত হইবার কামনা করিয়াছিল তাহারা বলিতে লাগিল" (২৮ঃ৮২)।

(৬) وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ .

"আর তোমরা তো মৃত্যুর কামনা করিতে পূর্বেই" (৩ ঃ ১৪৩)।

(৭) وَلاَ تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ .

"আর যদ্দ্বারা আল্লাহ্ তোমাদের কাহাকেও কাহারও উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তোমরা তাহার লালসা করিও না" (৪ ঃ ৩২)।

(৮ ও ৯) فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ .

"অতএব তোমরা মৃত্যু কামনা কর যদি তোমরা সত্যবাদী হও" (২ঃ ৯৪; ৬২ ঃ ৬)।

وَلاَ يَتَمَنَّوْنَهٗ اَبَدًا .

"তাহারা কখনও মৃত্যু কামনা করিবে না" (৬২ ঃ ৭)।

(১১) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا .

"কিন্তু তাহারা কখনও উহা কামনা করিবে না" (২ ঃ ৯৫)।

(১২) وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ .

"এবং তাহারা বলে, ইয়াহূদী বা খৃস্টান ছাড়া অন্য কেহ জান্নাতে প্রবেশ করিবে না। ইহা তাহাদের মিথ্যা আশা" (২ ঃ ১১১)।

(১৩) وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الاَمَانِيُّ .

"তোমরা সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলে এবং অলীক আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল" (৫৭ ঃ ১৪)।

(১৪) وَمِنْهُمْ اُمِّيُّوْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ الْكِتٰبَ اِلاَّ اَمَانِيَّ وَاِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ .

"তাহাদের মধ্যে এমন কতক নিরক্ষর লোক আছে যাহাদের মিথ্যা আশা ব্যতীত কিতাব সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে" (২ ঃ ৭৮)।

এই সমস্ত নজীরে তামান্না, 'উমনিয়া ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে—কামনা করা, আকুল আকাঙ্ক্ষা, অমূলক ধারণা বা খেয়াল, অসার কল্পনা, অভিপ্রায় ইত্যাদি অর্থে। মূল পাঠে ব্যবহৃত এই সমস্ত শব্দের কোনটিরই অর্থ পাঠ করা কিম্বা আবৃত্তি করা ধরিলে তাহা যথার্থ হয় না। কোন কোন ভাষ্যকার অবশ্য ধারণা করেন যে, উল্লিখিত শেষ নজীরে (নম্বর ১৪) আমানিয়্যা শব্দের অর্থ পাঠ করা কিম্বা আবৃত্তি করা হইতে পারে। কিন্তু ধারণাপ্রসূত এই অর্থ এই আয়াত দ্বারাই অগ্রাহ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়। কেননা এই আয়াতের উপসংহারে বলা হইয়াছে, তাহারা শুধু অমূলক ধারণা পোষণ করে। এই বর্ণনার মাধ্যমেই ইহার ভাব, ব্যাখ্যা ও বিশদ বিবরণ স্পষ্ট হইয়া যায়। তাই ২২ ঃ ৫২ নম্বর আয়াতে যে তামান্না শব্দ রহিয়াছে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এই শব্দের

অনুরূপ শব্দের আলোকে পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহার অর্থ "পাঠ করা" কিম্বা "আবৃত্তি করা" করিলে তাহা ভুল হইবে।

উপরিউক্ত বক্তব্যের অর্থ এই নহে যে, একই শব্দ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা যায় না। তবে কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় এই শব্দটি একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সেই রকম কুরআন মজীদের ২২ ঃ ৫২ নম্বর আয়াতে ব্যবহৃত উল্লিখিত শব্দটি ইহার স্বাভাবিক অর্থই বহন করে। এখানে উহার ভাবার্থ "পাঠ করা" কিম্বা "আবৃত্তি করা" গ্রহণ করা ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্ব উভয় দিক দিয়া স্বাভাবিক অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত হইবে। কেননা এই বিপরীত অর্থ গ্রহণ করিলে উহার অর্থ দাঁড়াইবে যে, পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ আল্লাহ তা'আলা আদৌ যাহা নাযিল করেন নাই শয়তানের প্ররোচনায় তাহা উচ্চারণ করিয়াছিলেন, অথচ নবী-রসূলগণ কখনও আল্লাহ্‌র নামে শয়তানের বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, করিতে পারেনও না।

আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত ওহীতে কিছু সংযোজন করিবার সাধ্য শয়তানের নাই। কুরআন মজীদেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষিত হইয়াছে যে, আল্লাহ্ নিজেই তাঁহার ওহীকে নাযিলকালে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন ধরনের হস্তক্ষেপ হইতে হেফাজত করেন। পূর্ববর্তী নবী-রসূলগণের নিকট ওহী নাযিলের ক্ষেত্রেও ইহা প্রযোজ্য। কাফির-মুশরিকরা পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের ইতিহাস ম্লান করিতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও প্রমাণাদির কোন ধার না ধারিয়া এবং মুহাম্মাদ ﷺ-কে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলিবার বদ মতলব আঁটিয়া একটি অসত্য কাহিনী ফাঁদিয়াছিল যাহাতে আল্লাহ্‌র ওহীর প্রকৃতি নস্যাৎ হইয়া যায়। উক্ত আয়াত পর্যালোচনা করিলেই প্রকৃত ইতিহাস স্পষ্ট হইয়া যায়।

ইহা সর্বজনবিদিত যে, প্রত্যেক যুগে ও স্থানে আল্লাহ্‌র কোন মনোনীত বান্দা মানবতার কল্যাণে আল্লাহর বাণী প্রচার শুরু করিলে শয়তান ও তাহার চেলা-চামুণ্ডারা অন্তরায় সৃষ্টি করিত, বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করিয়া বিভ্রান্তির বিষবাষ্প ছড়াইত অথবা ব্যর্থ করিয়া দিবার অপচেষ্টা চালাইত। কিন্তু সত্য ও আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা বিজয়ী হইয়াছে। ইতিহাসের সার্বজনীন সত্যই উল্লিখিত আয়াতে বিধৃত হইয়াছে।[৪]

সংশ্লিষ্ট আয়াতের প্রাসঙ্গিক অংশ হইতে ইহার স্বাভাবিক ও একমাত্র অর্থ স্পষ্ট হইয়া যায়। ৪৯ হইতে ৫২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "(হে রাসূল) আপনি বলুন, হে মানুষ! আমি ত তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী। সুতরাং যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাহাদের জন্য আছে ক্ষমা ও সম্মানজনক জীবিকা। আর যাহারা আমার (আল্লাহ্‌র) আয়াতকে ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করে তাহারাই হইবে জাহান্নামের বাসিন্দা। আমি (আল্লাহ্) আপনার পূর্বে যে সকল রাসূল কিংবা নবী প্রেরণ করিয়াছি তাহাদের কেহ যখনই কিছু আকাঙ্ক্ষা করিয়াছেন, তখনই শয়তান তাহার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে। কিন্তু শয়তান যাহা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ্ তাহা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁহার আয়াতসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়"।

এখানে উল্লিখিত সমগ্র আলোচনা করা হইয়াছে সতর্ককারী হিসাবে মহানবী ﷺ-এর ভূমিকা সম্পর্কে এবং সত্যের প্রতিপক্ষ হিসাবে শয়তানের ভূমিকা সম্পর্কে এবং বলা হইয়াছে, চূড়ান্ত পর্যায়ে সত্যেরই সফলতা আসে। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, সূরা হজ্জের ৫১ নম্বর আয়াতে শয়তানী শক্তির অবশ্যম্ভাবী ব্যর্থ হইবার ও জাহান্নামের বাসিন্দা হইবার ঘোষণা দেওয়া হইয়াছে। আর ৫২ নম্বর আয়াতের উপসংহারে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে, আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় অর্থাৎ আল্লাহ শয়তান ও উহার চেলা-চামুণ্ডাদের সমস্ত পরিকল্পনা ও অপচেষ্টা সম্পর্কে সম্যক অবহিত। তাই ইহা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাঁহার নবী ও রাসূলগণের প্রতি যে সমস্ত ওহী প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহাতে কোন অবস্থাতেই শয়তান কোনরূপ প্রক্ষেপণ করিতে পারে নাই। আয়াতে বিধৃত 'তামান্না' শব্দের ব্যাখ্যা "পাঠ করা" অথবা 'আবৃত্তি করা' অর্থে করিলে তাহা সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক হইবে।

যাহারা সূরা হজ্জের ৫২ নম্বর আয়াতের অর্থ "পাঠ করা" অথবা "আবৃত্তি করা" করিবার প্রয়াস পাইয়াছিল হয় তাহারা অনুমান সাপেক্ষে অথবা পূর্বেই কৃত ধারণা সাপেক্ষে ঐ অর্থ করিয়াছিল। কেহ কেহ ধারণা করেন যে, শয়তানের পদাবলীর কাহিনী সত্য। তাহারা এই কাহিনীর দোষ-গুণ পরীক্ষা না করিয়াই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই ধারণা পোষণ করেন এবং তামান্নার অর্থ "পাঠ করা" অথবা "আবৃত্তি করা"-এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং সূরা হজ্জের সংশ্লিষ্ট ৫২ নম্বর আয়াত সূরা হজ্জের সঠিকত্বের প্রমাণ হিসাবে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপস্থাপিত করেন। ইহা একটি বৃত্তাকারে আবর্তিত যুক্তি (Argument in a circle) এবং একটি অনুমানের উপর আর একটি অনুমান স্থাপন করা মাত্র।

অন্যদিকে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যাহারা তাহাদের মনোযোগ প্রাথমিকভাবে স্থির করেন নাস্খ (রহিতকরণ) বিষয়ের উপর এবং আয়াতের শুরুর সেই দৃষ্টিকোণ দিয়া পর্যালোচনা করেন। তাহারা শব্দের এই ধরনের কষ্টকল্পিত অর্থ প্রকাশ ও পরিণতির দিকে খুব কমই নজর দেন। নাস্খ বিষয়ের যে সমস্ত প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে সেই সম্পর্কে এখানে আলোচনার অবতারণা করেন না। তবে ইহাই তুলিয়া ধরা যথেষ্ট হইবে যে, শয়তানের পদাবলীর কাহিনীর আশ্রয় গ্রহণ করা কিম্বা নাস্খ বিষয়ের ব্যাখ্যা কিম্বা স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে তামান্নার অর্থ সংকোচন করার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই।

যাহা হউক পরিশেষে বলা যায়, যাহারা কুরআন মজীদের ১৭ ঃ ৭৩-৭৫ এবং ২২ ঃ ৫২ নম্বর আয়াতকে ঐ কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করিয়াছেন তাহারা আদতে ঘটনার ইতিহাস, বিশেষ করিয়া ঐ আয়াতসমূহের নাযিলের তারিখ উপেক্ষা করিয়াছেন।[৫] ইহা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, আবিসিনিয়ায় হিজরতের ঘটনা ঘটিয়াছিল ইসলামের প্রচার শুরু হওয়ার পঞ্চম বর্ষের রজব মাসে এবং সাময়িকভাবে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারিগণ সেই বৎসরই মক্কা মুকাররমায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন শাওয়াল মাসে। যদি হিজরতকারিগণের সাময়িকভাবে প্রত্যাবর্তনের সহিত ঐ কাহিনী সংযুক্ত করা

হয় তাহা হইলে কাহিনীতে যে ঘটনা বিবৃত হইয়াছে তাহা অবশ্যই ঘটার কথা শাওয়াল মাসের পূর্বেই অর্থাৎ সেই বৎসর রামাদান মাসে। এখন সূরা ইসরা (বনী ইসরাঈল) এবং সূরা হজ্জের আলোচ্য আয়াতসমূহ নাযিল হইয়াছিল ঐ ঘটনার বহু পরে। প্রথমখানি নাযিল হইয়াছিল 'ইসরা এবং মি'রাজ-এর ঘটনা উপলক্ষে। অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা ইসরা এবং মি'রাজের ঘটনা ঘটে ইসলাম প্রচারের একাদশ অথবা দ্বাদশ বর্ষে এবং সূরা হজ্জের অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি দ্বারা দেখা যায় যে, এই সূরা নাযিল হয় মদীনা মুনাওয়ারায়। সম্ভবত এই সূরা হিজরতের প্রথম বর্ষেই নাযিল হয়। ইহার অর্থ দাঁড়ায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে অভিযোগে বর্ণিত কার্যের অগ্রাহ্যতা প্রতিপন্ন হয় ঘটনা ঘটিবার পাঁচ বৎসর পরে। অন্যদিকে এতদসত্ত্বেও তাঁহার জন্য এক ধরনের সান্ত্বনা দেওয়া হয় আরও দুই বৎসর পর এবং অভিযোগে বর্ণিত প্রক্ষিপ্ত অংশ বাতিল বলিয়া ঘোষিত হয়। কোন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এই ধরনের অযৌক্তিক ব্যাখ্যা গ্রহণ করিতে পারে না।

অন্যভাবে যদি ইহা ধরিয়া লওয়া হয় যে, আলোচ্য আয়াতসমূহের প্রতিটি দুইটি সূরার অন্যান্য আয়াতের সাথে নাযিল না হইয়া আলাদাভাবে নাযিল হইয়াছে এবং ইহা ঘটনা ঘটার খুব বেশী পরে নাযিল হয় নাই, তখন বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব খুঁজিতে হইবে। প্রশ্নগুলি হইতেছে ঃ

(ক) কেন আলোচ্য আয়াত সূরা নজমে অথবা অন্য কোন সূরা বা সূরাসমূহে অন্তর্ভুক্ত হইল না যাহা নাযিল হয় অব্যবহিত পরে এবং সূরা ইস্‌রা ও সূরা হজ্জ নাযিলের পূর্বে?

(খ) আয়াত দুইটি কেমন করিয়া দীর্ঘ সময়ের জন্য অন্য কোন সূরা বা সূরাসমূহে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া আলাদাভাবে রাখা হইয়াছিল?

(গ) সূরা ইস্‌রা ও সূরা হজ্জে অন্তর্ভুক্ত করিবার কি কারণ ও কি উপলক্ষ্য ছিল?

আসল ঘটনা হইতেছে, অতিরঞ্জিত বর্ণনাকারীরা বা কল্পিত কাহিনী কথকরা এই বানোয়াট কাহিনীতে গায়ের জোরে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঐ আয়াতসমূহ জুড়িয়া দিয়াছে। বস্তুত ইহার সঠিক অর্থ এবং আয়াতসমূহ নাযিলের উদ্দেশ্য ঐ গল্প বহন করে না অর্থাৎ ঐ গল্পের সঙ্গে আলোচ্য আয়াতের আদৌ কোন সংশ্রব নাই।

তৃতীয়ত, সূরা নাজমের ভিতরে যে ঘটনার উল্লেখ রহিয়াছে তাহা ঐ কাহিনী মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য প্রমাণ স্বরূপ। এখানে লক্ষণীয় যে, সূরার শুরুতেই জোরালো ভাষায় উল্লেখ করা হইয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন ভুল-ভ্রান্তি করিতে পারেন না এবং ইহার ৩-৪ নম্বর আয়াতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ইরশাদ হইয়াছে ঃ "এবং তিনি (রাসূল) কোন মনগড়া কথা বলেন না। ইহা তো ওহী যাহা তাঁহার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"।

এই সূরা নাজমেরই ২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হইয়াছে ঃ "তোমাদের সঙ্গী (রাসূল) বিভ্রান্ত নহেন, বিপথগামীও নহেন"। এই সুস্পষ্ট বর্ণনা গল্পে ফাঁদা অভিযোগের অসারতা ও ভিত্তিহীনতার

এক বলিষ্ঠ প্রমাণ। এতদসত্ত্বেও কল্পিত কাহিনীর কিছু বর্ণনায় বলা হইয়াছে, "শয়তানের পদাবলী" এই সূরার ২০ নম্বর আয়াতের পরে ঢোকানো ছিল এবং পরবর্তীতে তাহা বাদ দেয়া হইয়াছে। অন্য বর্ণনায় স্পষ্ট করিয়া না হইলেও এমনতর বর্ণনা দেওয়া হয়, যাহাতে বোঝা যায়, "শয়তানের পদাবলী" বাদ দিয়া সেখানে ২১-২৩ আয়াত সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। সমস্ত বর্ণনায় ঐকমত্য পোষণ করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ গোটা সূরাখানি তিলাওয়াত করেন অনুষ্ঠানকালে এবং তিলাওয়াতশেষে তিনি সিজদা করেন। বস্তুত এই সূরার শেষ আয়াতে সিজ্‌দার হুকুম রহিয়াছে। এখন আমরা দুইভাবে এই সূরা পর্যালোচনা করিতে পারি অর্থাৎ অভিযোগে বর্ণিত "শয়তানের পদাবলী"কে ২১-২৩ আয়াত যেখানে আছে সেখানে রাখিয়া শুধু ২০ নম্বর আয়াতের পরে অভিযোগে বর্ণিত "শয়তানের পদাবলী" ঢুকাইয়া অথবা ২১-২৩ নম্বর আয়াত সরাইয়া তদ্‌স্থলে উহা বসাইয়া।

উভয় ক্ষেত্রেই ইহা বেমানান দেখা যাইবে এবং কল্পিত কাহিনী যে অযৌক্তিক তাহা প্রমাণিত হইয়া যাইবে। এইভাবে আমরা যদি সোজা ২১-২৩ আয়াত না সরাইয়া "শয়তানের পদাবলী" বসাইয়া দেই তাহা হইলে তাহা এক অযৌক্তিক, অসামঞ্জস্য ও অবান্তর বিবরণে পরিণত হইবে এবং পাঠ হইবে এইরূপ ঃ তোমরা কি দেখিয়াছ আল-লাত ও আল-উয্‌যা এবং অন্য তৃতীয় মানাত-কে? উহারা উন্নত মরাল, যাহার মধ্যস্থতা গ্রহণীয়। এইগুলি কতিপয় নাম বৈ কিছু নহে যাহা তোমরা কল্পনা করো... তোমরা এবং তোমাদের পূর্বপুরুষগণ..... ইহার জন্য আল্লাহ কোন কর্তৃত্ব প্রদান করেন নাই........ " ইত্যাদি। এই আকারে উহার সারমর্ম গ্রহণ করিলে দেখা যায়, উহাতে রহিয়াছে দেব-দেবীদেরকে অস্বীকার করিবার জোরালো ঘোষণা এবং পাশাপাশি দৃষ্টি আকর্ষক অসামঞ্জস্যতা ও অসঙ্গতি।

অন্যদিকে যদি শয়তানী পদাবলী যেমন আছে তেমন রাখিয়া এবং সূরা নাজ্‌মের ২১-২৩ আয়াত বাহির করিয়া আনা হয়, তাহা হইলেও দেব-দেবীর নিন্দা ও মধ্যস্থতা না থাকার বিষয়টি প্রবল থাকিয়া যায়। ২০ নম্বর আয়াতের শুরুতে রহিয়াছে, "এবং মানাত অন্য তৃতীয়?" 'আল-উখ্‌রা' একটি নিন্দাসূচক বক্তব্য।[৬] এই শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে বিদ্রূপ ও ঘৃণা প্রকাশার্থে এবং উপহাসমূলকভাবে। দেব-দেবীর অপমানকর বর্ণনার পর ইহা বলা বেমানান হইবে যে, সে একটি উচ্চ স্থানীয় এবং মধ্যস্থতাকারিনী বিগ্রহ। এই সমস্ত আয়াত ছাড়াও আমরা যদি ২৪ নম্বর আয়াত এবং উহার পরবর্তী আয়াতসমূহ পর্যালোচনা করি তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, তাহাতে কাফির-মুশরিকদের ওকালতি প্রবণতার আপোষহীন আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বিদ্যমান রহিয়াছে। ২৪ নম্বর আয়াতে জেরা আকারে ইরশাদ হইয়াছে ঃ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى "মানুষ যাহা চাহে তাহাই কি সে পায়?" অর্থাৎ ইহা একটি ব্যর্থ কামনা যাহা তাহার কোন উপকারেই আসিবে না।[৭] দেব-দেবীর অসারতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে যে সমস্ত কথা বলা হইয়াছে তাহাকেই জোরালো করা হইয়াছে কেবল এই আয়াতে।

একইভাবে ২৫ নম্বর আয়াতে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, বস্তুত ইহকাল ও পরকাল আল্লাহ্‌রই অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোন দেব-দেবী বা অন্য কাহারো নিকট কোনরূপ সাহায্য কামনা করা মানুষের উচিত নহে। একই বিষয়বস্তু প্রসারিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে ২৬ নম্বর আয়াতে যাহা একদিকে ঐ বিষয়বস্তুকে সুদৃঢ় করে, অন্যদিকে কাফির-মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে যে আল্লাহ্‌র কন্যা (না'উযুবিল্লাহ্ মিন যালিক) বলিত এবং উপরে উল্লিখিত লাত, উয্‌যা ও মানাত যে ঐ সমস্ত ফেরেশতাদের প্রতিনিধিস্বরূপ বলিয়া প্রচার করিত এই সমস্ত ধারণা যে স্বকপোলকল্পিত এবং আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঐ সকল ফেরেশতার সুপারিশ করিবার কোনই শক্তি নাই তাহা গুরুত্ব সহকারে বিধৃত হইয়াছে।[৮] কাফির-মুশরিক নেতারা যে আপোষ-মীমাংসার কথা বলিতেছিল তাহা ছলনা বৈ কিছু নহে। তাই তাহাদের মনোভাব ঘোষিত হইয়াছে ২৯ নম্বর আয়াতে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুস্পষ্টভাবে উহাদেরকে উপেক্ষা ও পরিহার করিয়া চলিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ইরশাদ হইয়াছে ঃ

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلاَّ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا .

"অতএব যে আমার স্মরণে বিমুখ আপনি তাহাকে উপেক্ষা করিয়া চলুন। সে তো কেবল পার্থিব জীবনই কামনা করে"।

এই বিষয়বস্তু পরবর্তী আয়াতসমূহেও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ৩১ নম্বর আয়াতে ব্যক্তির দায়িত্বের মূলনীতি কেমন হওয়া উচিত তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

পরিশেষে ৩৩-৪০ নম্বর আয়াতসমূহে এক কাফির-মুশরিক নেতার আচরণ পরোক্ষভাবে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। বহু ভাষ্যকারের মতে সেই কাফির নেতা হইতেছে আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন আল-মুগীরা।[৯] ইরশাদ হইয়াছে ঃ "(হে রাসূল), আপনি কি দেখিয়াছেন সেই ব্যক্তিকে যে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং দান করে সামান্যই, পরে বন্ধ করিয়া দেয়" ইত্যাদি। সুপারিশের ব্যাপারে কাফির-মুশরিকদের অলীক ধারণা নাকচ করিয়া ব্যক্তির দায়িত্বের মূলনীতি ব্যক্ত হইয়াছে এইভাবে উহা এই যে, "কোন বহনকারী অপরের বোঝা বহন করিবে না। আরও এই যে, মানুষ তাহাই পায় যাহা সে করে। আরও এই যে, তাহার কর্ম অচিরেই দেখানো হইবে"।[১০]

সূরা নাজ্‌মের ১৯ নম্বর আয়াত হইতে ৪২ নম্বর আয়াতে, এমনকি এই সূরার সমাপ্তি পর্যন্ত যে সমস্ত বিবরণ রহিয়াছে সেইগুলির বিষয়বস্তু ও অনুক্রম উভয়ের মধ্যে সংগতি ও ধারাবাহিকতা বজায় রহিয়াছে। লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, সুপারিশের অকার্যকারিতা সম্পর্কে কাহারও দ্বারা কোনরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই, স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত দায়িত্বের মূলনীতির উপর কোন শিথিলতা প্রদর্শন করা হয় নাই, কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দের আচরণের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার প্রতি কোনরূপ নমনীয়তা প্রদর্শিত হয় নাই এবং তাহাদের মেযাজ ও মনোভাবের প্রতি কোনরূপ আপোষকামিতা দেখানো হয় নাই। শয়তানী পদাবলীর সন্নিবিষ্ট প্রক্ষিপ্ত অংশের অব্যবহিত পরের ২০ নম্বর আয়াত এবং ২১ হইতে ২৩ নম্বর আয়াত বাদ দিলে কেবল ইহার অনুক্রমে ব্যাঘাত হইবে এবং বেমানান লাগিবে,

কিন্তু মূল বিষয়বস্তুর প্রেরণা বিনষ্ট হইবে না। বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি সম্পূর্ণ সূরা নাজ্ম তিলাওয়াত করিয়া পুংখানুপুংখ পর্যালোচনা করিলে উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, কাফির-মুশরিক নেতারা একেবারে বোকার হদ্দ ছিল না, যে কারণে সূরার শেষ অংশ শোনার পর তাহাদের অন্তরে এই ধারণার উদ্রেক হইয়াছে যে, নবী করীম ﷺ তাহাদের মতামতকে মানিয়া লইয়াছেন এবং সেই কারণেই তাহারা মনে করিয়াছিল যে, বস্তুগত দিক দিয়া তাঁহার এবং তাহাদের মধ্যে কোন অমতের কারণ নাই। কাহিনীর উৎস ও উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন সূরার অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদি ইহা গ্রহণে সোজা অস্বীকৃতি জানায়। এই সূরার যে কোন পাঠক দেখিতে পারে যে, কাহিনীটি অস্বাভাবিকভাবে ইহাতে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

তিন ঃ সঠিকত্বের পরীক্ষায় বর্ণনাগুলি ব্যর্থ

কাহিনীর বিরুদ্ধে কুরআনের প্রমাণাদি চূড়ান্ত। তাহা ছাড়াও বর্ণনাগুলি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পরীক্ষা করিলেই কাহিনীর আচমকা সৌন্দর্যের স্বরূপ ফাঁস হইয়া যাইবে। প্রায় ডজনখানিক ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিবরণ এই কাহিনীতে রহিয়াছে। এই ভিন্ন ভিন্ন বিবরণের প্রতিটির আবার দুইটি অথবা ততোধিক বর্ণনাকারীদের (ইসনাদ) বিভিন্ন পরম্পরা রহিয়াছে। এই ইসনাদগুলি প্রাচীন ও আধুনিক বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ[১১] পুংখানুপুংখ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সকলেই ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন যে, প্রতিটি বিবরণই প্রয়োগগতভাবে মুরসাল, অর্থাৎ ইহার ইসনাদ মহানবী ﷺ-এর পর হইতে দ্বিতীয় স্তর (তাবি'উন)-এর উর্ধ্বে যায় নাই। শুধু একটি মাত্র বিবরণ আসিয়াছে সাঈদ ইব্ন জুবায়রের মাধ্যমে যাহা অনুসৃত হইয়াছে 'আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা) হইতে।[১২]

কিন্তু কাযী 'ইয়ায ('আয়ায) উল্লেখ করেন যে, এই বিবরণের মূল বর্ণনাকারী (রাবী) শু'বা বলেন, তিনি কেবল অনুমান করিয়া বলিয়াছেন যে, এই বিবরণ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) হইতে বর্ণিত।[১৩] এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উল্লিখিত ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী ইব্ন 'আব্বাস (রা) নহেন। কারণ তিনি জন্মগ্রহণ করেন হিজরতের মাত্র তিন বৎসর পূর্বে অর্থাৎ উল্লিখিত ঘটনার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে। এই বিবরণের আরেকজন বর্ণনাকারী ইব্নুল কাল্বী অবিশ্বস্ত বর্ণনাকারী হিসাবে পরিচিত। একইভাবে আরেকজন বর্ণনাকারী আল-মুত্তালিব ইব্ন আবদুল্লাহ একই রকমের অনির্ভরযোগ্য।[১৪] এমনকি ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী' যিনি অন্য বিষয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সূত্র হইতে বর্ণিত ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিলেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ইহাকে মুরসাল বলিয়াছেন।[১৫]

এইভাবে কাহিনীটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পর দ্বিতীয় স্তর (তাবি'উন) পর্যন্ত পৌঁছে এবং তখনই ইহার প্রচলন ঘটে। এই কাহিনীর বর্ণনাকারী কেহই সমসাময়িক নহেন এবং কেহই ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী নহেন। ইহা ছাড়া কেহই ইহা কোন সাহাবীর নিকট হইতে শোনেন নাই, যদি কেহ শুনিয়া থাকিতেন তাহা হইলে তাহার নাম উল্লেখ করা হইল না কেন। ইহা ছাড়াও বর্ণনা মুরসাল হওয়া সত্ত্বেও সমগ্র বিবরণ সনদের রাবীগণ দুর্বল (য'ঈফ), বিশ্বস্ত (ছিকা)

নহেন, কিম্বা অজ্ঞাত (মাজহুল) হিসাবে বিবেচিত। বিভিন্ন বর্ণনায় বর্ণনাকারীগণের পরম্পরায় ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।[১৬]

বর্ণনার মূল পাঠের প্রতিটি বিবরণের মূল উপাদান ও সূত্র এবং বিষয়বস্তু একটি আর একটি হইতে ভিন্ন। পুংখানুপুংখ বিবরণের কথাটি বাদ দিলেও তাহাতে গুরুতর বৈপরীত্য ও অমিল রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই বৈপরীত্য ও অমিল চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রকট। যেমন ঃ (১) ঘটনার উপলক্ষ, (২) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথিত কর্মের প্রকৃতি, (৩) তথাকথিত শয়তানী পদাবলীর শব্দচয়ন, এবং (৪) সেগুলির প্রভাব অথবা পরিণাম।

ঘটনার উপলক্ষ সম্পর্কে কোন কোন বর্ণনায় রহিয়াছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার বেশ কিছু সাহাবায়ে কিরামসহ কা'বা শরীফের চত্বরে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে অনেক কাফির-মুশরিক এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিল। সেখানে ইবাদতরত থাকা অবস্থায় সূরা নাজ্ম নাযিল হয়। অন্যান্য বর্ণনা হইতে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা চত্বরে সমবেত কাফির-মুশরিকদের সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন, এমন সময় সূরাখানি নাযিল হয়। আবার কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায়, সূরাখানি আগেই নাযিল হইয়াছিল। কাফির-মুশরিকদের কাছে খবর পৌঁছিল যে, একখানি সূরা নাযিল হইয়াছে যাহাতে তাহাদের দেব-দেবীর উল্লেখ আছে। তাহা শুনিবার জন্য তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট জানিবার আগ্রহ লইয়া ছুটিয়া আসিল। তিনি তাহাদিগকে উহা তিলাওয়াত করিয়া শুনাইলেন এবং এই ঘটনা কালে উচ্চারিত হইল " শয়তানী পদাবলী"।

অন্য আরও বর্ণনা হইতে জানা যায়, কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সর্বদা ইসলামে দাখিল হওয়া দরিদ্র ও অগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতে দেখিয়া বলিল, তিনি যদি তাহাদের দেবীর ব্যাপারে কিছুটা ছাড় দেন তাহা হইলে সমাজের নেতৃবৃন্দ তাহার সহিত বৈঠক করিবে এবং ইহার ফলে বহিরাগত সাক্ষাতপ্রার্থী, যাহারা তাঁহার নিকট তাঁহার দাওয়াত সম্পর্কে খোঁজখবর লইতে আসে তাহারা দাওয়াতে আকৃষ্ট হইবে এবং তাঁহাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরাখানি কাফির-মুশরিকদের সামনে তিলওয়াত করিলেন এবং শয়তানী পদাবলী সূরার ১৯ নম্বর আয়াতের পরে উচ্চারণ করিলেন।

তথাকথিত শয়তানী পদাবলীর আবৃত্তির ক্ষেত্রে কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায়, শয়তান ঐগুলি সূরা নাজ্ম নাযিল কালে প্রক্ষেপণ করে এবং ইহা জিবরাঈল (আ) দ্বারা আনীত ভাবিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহা গ্রহণ করেন। অন্য বর্ণনায় জানা যায়, মহানবী ﷺ তাহা স্বইচ্ছায় উচ্চারণ করেন কাফির-মুশরিক নেতৃবৃন্দের তাঁহার প্রতি মনোভাবকে নমনীয় করিবার উদ্দেশ্যে। অন্যদিকে অন্য সব বর্ণনা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বলে যে, তিনি ভুলক্রমে উহা উচ্চারণ করেন। তবুও আরও কিছু বর্ণনায় বলা হইয়াছে, তিনি উহা উচ্চারণ করেন ইচ্ছাকৃতভাবে, কিন্তু অস্বীকৃতি জ্ঞাপক জিজ্ঞাসার বৈশিষ্টমণ্ডিত করে।

আরও কোন কোন বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ উহা উচ্চারণ করেন কোন কারণ উপস্থাপন ছাড়াই বা শয়তানের প্রভাবের উল্লেখ না করিয়াই। আরও বলা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ-এর কণ্ঠ নকল করিয়া শয়তানই উহা উচ্চারণ করে, কিন্তু শ্রোতারা ভুলক্রমে তাহাকে মনে করে যে, উহা প্রিয় নবী ﷺ -এর কণ্ঠস্বর। আবার কাহারও কাহারও মতে উহা নবী ﷺ-এর কণ্ঠস্বরও ছিল না, শয়তানেরও ছিল না। কাফির-মুশরিকদের মধ্য হইতে কেহ অভিযোগে বর্ণিত পংক্তিগুলি উচ্চারণ করে, যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সূরার ১৯ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করা শেষ করেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, শয়তানী পদাবলীতে যে সমস্ত শব্দের ব্যবহার রহিয়াছে বিভিন্ন বর্ণনায় তাহার বিভিন্নতা রহিয়াছে। যেমন মাওলানা সায়্যিদ মওদূদী বলেন, বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই বিভিন্নতা অন্তত ১৫টি ক্ষেত্রে প্রকটভাবে পরিলক্ষিত হয়।[১৭]

পরিশেষে অব্যবহিত প্রভাবের ব্যাপারে অথবা প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে অধিকাংশ বর্ণনায় বলা হইয়াছে যে, কাফির-মুশরিকরা দারুন খুশী হয় এবং তাহারাও সূরাখানি তিলাওয়াতশেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সিজদা করে। কিন্তু কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন, আল-ওয়ালীদ ইব্‌ন মুগীরা কিম্বা আবূ উহায়হা সিজদায় না যাইয়া এক মুষ্টি কঙ্কর (অথবা পাথর) উঠাইয়া তাহা নিজ কপালে ঠেকায়। অবশ্য অন্যান্য বর্ণনায় এই প্রসঙ্গটি উহ্য রহিয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত নেতার লক্ষণীয় কার্যকলাপের উল্লেখ রহিয়াছে। মুসলমানগণ তাহাদের অভ্যাসমত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সিজদায় যান।

অন্য একটি বর্ণনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হইতেছে, কাফির-মুশরিকরা তথাকথিত শয়তানী পদাবলী শুনিতে পাইলেও মুসলমানগণ আদৌ উহা শুনেন নাই। এই পদাবলী রাসূলুল্লাহ ﷺ যে উচ্চারণ করিয়াছেন বলিয়া রটনা হয় তাহা শুনিয়া মুমিনগণের কেহই কোনরূপ আপত্তি তোলেন নাই কিম্বা অস্বস্তি ব্যক্ত করেন নাই। এমনকি পরবর্তীতেও ইহা তথাকথিত রহিয়া যাওয়ায়ও কেহই আপত্তি করে নাই। বর্ণনাসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রমাণাদির নেতিবাচক দিকগুলি আরও গুরুত্বের দাবি রাখে। কারণ যদি এই ধরনের একটি অস্বাভাবিক ঘটনা আপোষ-মীমাংসার স্তবক সম্বলিত পদাবলী দ্বারা প্রচলিত থাকে তাহা বিভ্রান্তিকর হইয়া দাঁড়াইত, অথচ ঘটনাটি অসত্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণের কেহ কেহ ইহার বর্ণনা প্রদান করেন। এই সূরা নাজমেই মি'রাজ ও 'ইসরা'-এর যে ঘটনা রহিয়াছে তাহার আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করিলে শয়তানী পদাবলীর অসারতা প্রমাণিত হয় এবং সন্দেহের অবসান ঘটে।

সংক্ষেপে বলা যায়, বর্ণনাসমূহে ঘটনার উপলক্ষ সম্পর্কে যে বিভিন্নতা ও বিচ্যুতি রহিয়াছে তাহা বলিয়া দেয় যে, ইহাতে যে শব্দাবলী ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহিত সম্পৃক্ত নহে। এখানে লক্ষণীয় যে, কোন প্রত্যক্ষদর্শী বা সাহাবী কর্তৃক ঘটনাটি বিবৃত হয় নাই, বরং তাবি'ঈ যুগে আসিয়া ইহার উদ্ভব ঘটে। বর্ণনাগুলির এই মুরসাল ধরনের বাহিরেও ঐগুলির

ইসনাদ অথবা বর্ণনাকারীদের বর্ণনা—পরম্পরা আদৌ নিখুঁত নহে। তাহা ছাড়াও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসনাদ একেবারেই দুর্বল অথবা অনির্ভরযোগ্য কিম্বা বিচ্ছিন্ন। নানা পথে (তুরুক), নানাভাবে বিবৃত এই ঘটনা কখনও কখনও কিছুটা শক্তিশালী হইয়া উঠিলেও বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা- নিরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, নানা খাতে প্রবাহিত এই ঘটনার ইসনাদ এত দুর্বল যে, তাহা গ্রহণযোগ্য নহে।[১৮] এইসব কারণেই ইহা যে পরবর্তী কালে সংযোজিত হইয়াছে তাহা বলা যায়। ইহা ছাড়াও কুরআন মজীদের প্রমাণাদির সহিত ইহার জ্বলন্ত দ্বন্দ্বই এই কাহিনীকে নস্যাৎ করিবার জন্য যথেষ্ট। কুরআন মজীদের প্রমাণাদি ইতোপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে।

চার ঃ আলোচ্য কাহিনীর উৎপত্তি ও রটনা

এই কাহিনীর বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে অমিল ও তারতম্য সৃষ্টি করিয়া দেয় যে, কল্পনাপ্রসূত অলীক এই কাহিনী তৈরী করা হইয়াছে। সূরা নাজ্‌মের শেষ আয়াতে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদা করিবার হুকুম রহিয়াছে, যেজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ এই সূরাখানি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করিয়া সিজদায় যান এবং তাহার সহিত যাহারা ছিলেন সকলেই সিজদা করেন। দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী ইহা সত্যায়ন করিয়াছেন। সেই দুইজন চাক্ষুষ সাক্ষীর একজন আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) এবং আবদুল মুত্তালিব ইব্‌ন আবী ওয়াদায়া।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) বলেন, মুমিন ও কাফির-মুশরিকদের জমায়েতে রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বা শরীফ চত্বরে সর্বপ্রথম যে সূরাটি তিলাওয়াত করিয়াছিলেন তাহা হইতেছে সূরা নাজ্‌ম। উক্ত তিলাওয়াতশেষে তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের সামনে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে সিজদা করেন, তাহার দেখাদেখি মুমিনগণ ও কাফির-মুশরিকরাও সেজদা করে। ইব্‌ন মাস'উদ (রা) আরো বলেন, তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, উমায়্যা ইবন্ খালাফ সিজদায় না যাইয়া এক মুষ্টি ধূলি উঠাইয়া তাহার কপালে ঠেকাইল।[১৯] ইবন্ মাস'উদ (রা) প্রদত্ত এই তথ্যের সহিত ঐকমত্য পোষণ করিয়াছেন ইকরিমা। ইকরিমা প্রত্যক্ষদর্শী না হইলেও তিনি একই কাহিনী ইব্‌ন 'আব্বাস হইতে বর্ণনা করিয়াছেন।[২০] আর একজন চাক্ষুষ সাক্ষী 'আবদুল মুত্তালিব একই বিবরণ দিয়াছেন এবং তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তিনি ঐ সময় সিজদা করেন নাই। তখনও তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন নাই। ইসলাম গ্রহণ করার পর তাঁহার সেই ত্রুটির প্রতিকার তিনি এইভাবে করেন যে, যখনই তিনি এই সূরা তিলাওয়াত করেন তখনই তিলাওয়াতশেষে সিজদা করিতে তিনি ভুলিতেন না।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তাহারা ঘুর্ণাক্ষরেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফির-মুশরিকদের সহিত আপোষ করিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা বলেন নাই, এমনকি সূরা নাজ্‌ম নাযিলকালে শয়তানী পদাবলীর প্রক্ষেপণের কথাও বলা হয় নাই। কাফির-মুশরিকরা ঐ সময় যে সিজদা করিয়াছিল তাহা বলা আছে। অবশ্য তখন এমন প্রশ্নও উত্থাপিত হয় যে, আপোষ না করিলে কেন তাহারা সিজদা করিবে? বলা প্রয়োজন, কাফিরদের কার্যকলাপ ব্যাখ্যা করিবার জন্য

রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফির-মুশরিকদের সহিত আপোষ-মীমাংসা করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, এমনটি ধারণা করিবার আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। তখনকার পরিস্থিতির মধ্যেই ব্যাখ্যা নিহিত রহিয়াছে। ইহা সর্বজনবিদিত যে, মহানবী ﷺ এবং মুসলমানগণ প্রকাশ্যে জমায়াতবদ্ধভাবে ইবাদত কিম্বা কা'বা চত্বরে কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করিতে পারিতেন না। এখানে উল্লেখ্য যে, উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন অধিকাংশের মতে আবিসিনিয়ায় মুসলমানদের প্রথম দলের হিজরতের পরে। অবশ্য কোন কোন বর্ণনা হইতে জানা যায়, 'উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন ইসলাম প্রচারের ৬ষ্ঠ বর্ষে। তবে অন্যান্য বর্ণনাদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে, আরও পূর্বে হযরত 'উমার (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং ঘটনাদৃষ্টে ইহাই বাস্তব যে, ৫ম বর্ষের শাওয়াল মাসে আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের মক্কায় সাময়িক প্রত্যাবর্তনের ঘটনা ঘটে কাফির-মুশরিকদের সিজদার ঘটনা এবং ইহার ফলে উদ্ভূত গুজবের পরিপ্রেক্ষিতে।

তাই আমরা নিশ্চিতভাবে ধরিয়ে লইতে পারি যে, 'উমার (রা)-এর ইসলামে দাখিল হওয়ার ঘটনা ঘটে আবিসিনিয়ায় হিজরতের পরপরই, সম্ভবত সেই বৎসরের শা'বান অথবা রমযান মাসে। হযরত উমার (রা)-এর ইসলামে দাখিল হওয়াটা ছিল ইসলামের এক বিরাট বিজয়। আর কাফির-মুশরিক নেতাদের মধ্যে ইহা বহিয়া আনে বড় ধরনের হতাশা। আর এই হতাশা চরম আকার ধারণ করে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের বিদেশে হিজরত করিয়া যাওয়ার ঘটনায়।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দ শংকিত হইয়া পড়িল যে, মুসলমানদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের ফলে সেই দেশে তাহাদের (কুরায়শ নেতাদের) ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইবে। এই সমস্ত পরিস্থিতিতে কাফির-মুশরিকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত আপোষ করিবার আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং এই অবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীগণের মক্কায় ফিরিয়া আসিতে প্ররোচিত করে। এখানে লক্ষণীয় যে, কুরাআন মজীদের প্রমাণাদি এবং বর্ণনাসমূহ উভয় দিক হইতে দেখা যায় যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দই আপোষ করিবার জন্য উদগ্রীব হইয়াছিল সেক্ষেত্রে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিশ্চুপ ছিলেন। কাফির-মুশরিকরাই এই ব্যাপারে জোর উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মানসিক অবস্থা যখন এমনই ছিল তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণ 'উমার (রা)-এর ইসলামে দাখিল হওয়ার ফলে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং কা'বা শরীফের চত্বরে যাইয়া সেখানে সালাতে রত হন অথবা স্বতন্ত্রভাবে সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করেন।

দ্বিতীয়ত, পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, তথাকথিত শয়তানী পদাবলী উপরিউক্ত ঘটনার সময় নূতনভাবে রচিত হয় নাই। ইহা মূলত অতি প্রাচীন শ্লোক যাহা কুরায়শ মুশরিকরা কা'বা প্রদক্ষিণকালে তাহাদের দেব-দেবীর প্রশংসায় পাঠ করিত।[২১] ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, যখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ কিম্বা মুসলমানগণ জনসমক্ষে কুরআন মজীদ তিলাওয়াত করিতেন তখন কাফির-মুশরিকরা হৈ-চৈ করিয়া শোরগোলের সৃষ্টি করিত। সুতরাং ইহাই স্বাভাবিক ছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াত করিতেছিলেন এবং ইহার মধ্যে আল-লাত ও

আল-উয্যার নাম নিন্দাসূচকভাবে উচ্চারিত হওয়াকালে কিছু কাফির-মুশরিক বাধা দিতে থাকে এবং উচ্চৈস্বরে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া প্রতিবাদ করিতে থাকে। ইহাতে সহজেই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কাহিনীতে বিধৃত কোন শয়তানী পদাবলী উচ্চারণ করেন নাই, বরং উহা উচ্চারণ করিয়াছিল শয়তান কিম্বা কিছু মুশরিক নেতৃবর্গ। এমনকি ঐ সময় যে 'উরওয়া ইবনুয যুবায়র (রা) কর্তৃক কথিত বর্ণনায় আছে যে, ইহা প্রথমে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল শয়তানের দ্বারা এবং তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যবান মুবারক দ্বারা নহে। পরবর্তী কালের মুসলমানগণ শয়তান যাহা প্রক্ষেপণ করিয়াছিল মহানবী ﷺ-এর যবান মুবারকে তাহা তাহারা যে শুনিয়াছে এমন কোন তথ্যও বর্ণিত হয় নাই।

لَمْ يَكُنِ الْمُسْلِمُوْنَ سَمِعُوا الَّذِىْ اَلْقَى الشَّيْطَانُ عَلى السنة الْمُشْرِكِيْنَ .[২২]

"শয়তান মুশরিকদের যবানে যাহা ঢালিয়া দিয়াছিল তাহা মুসলমানগণ শুনে নাই"।

অনুরূপ তথ্য বর্ণিত হইয়াছে ইব্ন শিহাব আয-যুহরী কর্তৃক। তিনি বলেন ঃ "শয়তান যাহা কাফির-মুশরিকদের কর্ণে নিক্ষেপ করিয়াছিল তাহা মুসলমানগণ শোনেন নাই"।[২৩]

لَمْ يَكُنِ الْمَسْلِمُوْنَ سَمِعُوا الَّذِىْ اَلْقَى الشَّيْطَانَ فِىْ مَسَامِعِ الْمُشْرِكِيْنَ

ইব্ন তায়মিয়া যথার্থই বলিয়াছেন, ঐ শ্লোক শয়তান নিক্ষেপ করিয়াছিল কাফির-মুশরিকদের শ্রবণে।[২৪]

কাফির-মুশরিকরা যে সিজদা করিয়াছিল তাহা ছিল এক ধরনের প্রতিবাদসুলভ ইশারা এবং (উপস্থিত সকলকে) তাহাদের দেবীদের নামে সিজদা করার মধ্য দিয়া বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলার প্রয়াস মাত্র। কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের সুমধুর আবেগ শ্রোতাকে মোহিত করে । যে কারণে উতবা ইব্ন রবী'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট হইতে কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত শুনিয়া এতোই মুগ্ধ হইয়াছিল যে, অন্যান্য কুরায়শ নেতারা বলাবলি করিতেছিল, উতবার উপর যাদুমন্ত্র ক্রিয়াশীল হইয়াছে।[২৫]

কুরআন মাজীদের এই মোহিনী শক্তির কারণে কাফির-মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে যাদুকর (সাহির) এবং কুরআন মাজীদকে যাদু (সিহ্র) হিসাবে অভিহিত করিত। এই কারণেই কাফির-মুশরিকরা ইবনুদ দাগিনার সহিত চুক্তি করে যে, আবূ বাক্র সিদ্দীক (রা) মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবে শুধু এই শর্তে যে, আবূ বাক্র যদি 'ইবাদত করে তাহা হইলে তাহার গৃহাভ্যন্তরে করিতে হইবে এবং জনসমক্ষে উচ্চৈস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করিয়া তাহাদের শিশুদিগকে ও স্ত্রীলোকদিগকে আকৃষ্ট করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে।[২৬]

যাহাই ঘটুক না কেন, যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ সিজদা করিল কিম্বা সিজদার ভান করিল তখন তাহাদের অনুসারীরা অবশ্য এই কর্মের ব্যাখ্যা চাহিয়া চাপ সৃষ্টি করিল। তখন তাহাদের ব্যাখ্যা

হিসাবে কেবল ইহাই বলার ছিল, আমরা উহা করিয়াছি এইজন্য যে, আমরা মুহাম্মাদ ﷺ -এর নিকট হইতে দেবীদের প্রশংসাসূচক বর্ণনামূলক বাক্য শুনিয়াছি। এই উপলক্ষকে তাহারা দেশের বাহিরে গুজব আকারে রটনা করিয়া দেয়, বিশেষ করিয়া এই গুজব রটায় আবিসিনিয়াতে। গুজব রটিয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহিত কাফির-মুশরিকদের আপোষ হইয়াছে। এই গুজব শুনিয়াই আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীরা মক্কায় ফিরিয়া আসিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। ইহা নিশ্চিত যে, গোপনে গোপনে গুজবটি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল অথবা উরওয়া ইবনুয যুবায়র ও ইব্‌ন শিহাব এই দুই বর্ণনাকারী যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতেছেঃ ইহা আবিসিনিয়া পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে শয়তানের দ্বারা (وَأَظْهَرَهَا الشَّيْطَانُ حَتَّى بَلَغَتِ الْحَبَشَةُ/أَرْضَ الْحَبَشَة)। কাহিনীর রটনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ ভুলক্রমেও যদি শ্লোক উচ্চারণ করিতেন এবং ইহা তাহার পর বুঝিতেন ও প্রত্যাহার করিতেন অথবা কুরায়শ নেতাগণ কৌশলে যে রটনা চালাইতেছিল তাহা তিনি জানিতেন তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ঐ রটনায় কর্ণপাত না করিবার জন্য দূত পাঠাইয়া আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেন।

কা'বা চত্বরে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সূরা নাজ্‌ম তিলাওয়াতের সময় সেখানে উপস্থিত মুসলমান ও কাফিরদের সিজদায় যাওয়া এবং আপোষের গুজব শুনিয়া কিছু হিজরতকারীর মক্কায় ফিরিয়া আসা প্রভৃতি ঘটনাই সত্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফির মুশরিকদের সহিত আপোষ করিয়াছেন এই গুজব রটায় কাফির-মুশরিক নেতারাই। পরবর্তী কালে বিশেষ করিয়া তাবি'ঈ যুগে প্রকৃত ঘটনা এবং ভিত্তিহীন গুজব মিশ্রিত হইয়া কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকর ইহার উল্লেখ করিয়া সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেন এবং কাহিনীটির যে অংশ সত্য প্রবণ তাহা সঞ্চালনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জীবন ও কর্মসমূহের সহিত সম্পৃক্ত ঘটনা বহাল থাকে এবং প্রক্ষিপ্ত অলীক কাহিনী সুস্পষ্ট হইয়া যায়। ইহার ফলে পাঠকগণ নিজেরাই কোনটি সত্য ও কোনটি সত্য নহে তাহা বাহির করিতে পারেন। প্রধানত যে সমস্ত ভাষ্যকার ও পণ্ডিত এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের উদ্দেশ্য হইতেছে "প্রমাণসমূহ" এবং নাস্‌খ (রদ, প্রত্যাহার, বাতিল, প্রতিস্থাপন?)-এর বিষয়কে বিশদ করিবার জন্য।[২৭] যে কারণে তাঁহারা সূরা নাজ্‌মের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এই কাহিনী সম্পৃক্ত করেন নাই, বরং ২২ঃ৫২ আয়াতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ইহাকে সম্পৃক্ত করিয়াছেন। একই কারণে তাহাদের কেহ কেহ কাহিনীটিকে সম্পৃক্ত করিয়াছেন ১৭ ঃ ৭৩ আয়াতের ব্যাখ্যায়। নাস্‌খের ব্যাপারে তাহাদের বর্ণনার মূল্যায়ন যাহাই হউক না কেন পূর্বেই উল্লিখিত বিষয়টি এখানে সুস্পষ্ট যে, তাহাদের এই আয়াতসমূহের সহিত সম্পৃক্ত করাটা কালের সহিত সংগতিপূর্ণ নহে এবং স্পষ্ট অর্থ ও কাহিনীর অন্তর্নিহিত অর্থ রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আপোষের কাহিনী এবং তাঁহার শয়তানী পদাবলী উচ্চারণ সম্পর্কিত কাহিনীর সহিত সাংঘর্ষিক ও বানোয়াট।

অনুবাদ ঃ হাসান আবদুল কাইয়্যূম

তথ্যনির্দেশিকা

১. দ্র. আত-তাবারী, তাফসীর, ১৭খ, পৃ. ১৮৬-১৯০ যাহাতে অধিকাংশ তথ্য তুলিয়া ধরা হইয়াছে।

২. কাহারো কাহারো মতে শুধু ২২ ঃ ৫২ আয়াত নাযিল হয়।

৩. উপরেও দ্র. পৃ. ৪৩৬-৪৩৯।

৪. দ্র. আবূ হায়্যান (মুহাম্মাদ ইব্‌ন ইউসুফ) আল-আন্দালুসী, তাফসীর আল-বাহ্‌রুল মুহীত, ৬খ., ২য় সংস্করণ, দারুল ফিকর, বৈরূত ১৩৯৮। ১৯৮৭/পৃ. ৩৮১-৩৮২। তিনি লিখিয়াছেন ঃ

لما ذكر تعالى انه يدفع عن الذين امنوا وانه تعالى اذن للمؤمنين فى القتال وانهم كانوا اخرجوا من ديارهم وذكر مسالة رسوله ﷺ تكذيب من تقدم من الامم لانبيائهم وما ال اليه امرهم من الاهلاك إثر التكذيب وبعد الامهال وامره ان ينادى الناس ويخبرهم انه نذير لهم بعد ان استعجلوا بالعذاب وانه ليس له تقديم العذاب ولا تاخيره ذكر له تعالى مسالة ثانية باعتبار من مضى من الرسل والانبياء وهو انهم كانوا حريصين على ايمان قومهم مطمئنين بذلك مثابرين عليه وانه ما منهم احدا الا وكان الشيطان يراغمه بتزيين الكفر لقومه وبث ذلك اليهم وإلقائهم فى نفوسهم كما انه ﷺ كان من احرص الناس على هدى قومه وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحارث يلقون لقومه والوافدين عليه فسها يثطون بها من الاسلام ولذلك جاء قبل هذه الاية (والذين سعوا فى اياتنا معاجزين) وسعيهم بالقاء الشبه فى قلوب من استمالوه وسب ذلك الى الشيطان لانه هو الغوى والمحرك شياطين الانس للاغواء كما قال (لاغوينهم) وقيل ان الشيطان هنا جنس يراد به شياطين الانس والضمير فى امنيته عائد على الشيطان اى فى امنية نفسه اى بسبب امنية نفسه ومفعول القى محذوف لفهم المعنى وهو الشر والكفر ومخالفة ذلك الرسول او النبى ان الشيطان ليس يلقى الخير ومعنى (فينسخ الله ما يلقى الشيطان) اى يزيل تلك الشبه شيئا فشيئا حتى يعلم الناس كما قال تعالى (ورايت الناس يدخلون فى دين الله افواجا) (او يحكم الله اياته) اى معجزاته انه يظهرها محكمة لا دنس فيها ليجعل ما يلقى الشيطان من تلك الشبه وزخارف القول فتنة لمريض القلب ولقاسيته وليعلم من ادنى العلم ان ما تمنى الرسول والنبى من هداية قومه وايمانهم من الحق وهذه الاية ليس فيها اسناد شيئ الى الرسول ﷺ انما تصمت حالة من كان قبله من الرسل والانبياء اذا تمنوا.........) .

৫. এই আলোচ্য বিষয় উত্থাপন করিয়াছেন কতিপয় মশহুর পণ্ডিতজন এবং অন্তত দুই প্রাচ্যবিদ। দ্র. মুহাম্মাদ আলী, Holy Quran (Translation and commentary), প্রথম সংস্কারণ ১৯১৭ খৃ., টীকা ১০০১, পৃ. ১৫৮; এম. আকরাম খান, মুস্তফা চরিত (বাংলা), প্রথম সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৯৫ খৃ., পৃ. ৩৮৯-৩৯০; আবুল আলা মওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে আলম, ২খ., লাহোর ১৯৭৮ খৃ., পৃ. ৫৭৪-৫৭৫।

৬. দ্র. উদাহরণস্বরূপ আল-বায়দাবী, তাফসীর, ২খ, পৃ. ৪৪০।

৭. প্রাগুক্ত।

৮. প্রাগুক্ত।

৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪২।

১০. ৫৩ ঃ ৩৮-৪০।

১১. নাসির আদ-দীন আল-বানী, নাসাল মাজানীক লী নাস্ফ কিসসাতিল গারানীক, দামেস্ক ১৯৫২ খৃ., পৃ. ৪-১৮; আলী ইব্ন হাসান ইবন আলী ইব্ন 'আবদুল হামীদ কর্তৃক অতি সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ ঃ দালাইল তাহকীক লি-ইবতাল কিসসাত আল-গারানীক, জিদ্দা ১৪১২/১৯৯২।

১২. আত-তাবারী, তাফসীর, ১৭ খ., ১২০।

১৩. কাযী আয়ায, আশ-শিফা, ২খ, পৃ. ১১৮; নাসেরুদ্দীন আল-আলবানী কর্তৃকও উদ্ধৃত, পূ.গ্র., পৃ. ৫-৬।

১৪. আয-যাহাবী, মীযান, ২খ, পৃ. ৪৮২।

১৫. দ্র. আল-আলবানী, পূ. গ্র., পৃ. ৫-৬।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-১৮, উপসংহারে বলা হইয়াছে ঃ

وَتِلْكَ هِيَ رِوَايَاتُ الْقِصَّةِ وَهِيَ كُلُّهَا كَمَا رَأَيْتُ مَعَلَّةٌ بِالاِرْسَالِ وَالضُّعْفِ وَالْجِهَالَةِ وَلَيْسَ فِيْهَا مَا يُصْلِحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ .

১৭. সায়্যিদ মওদূদী, প্রাগুক্ত, ২খ, পৃ. ৫৭২।

১৮. আল-আলবানী, পূ. গ্র., পৃ. ৬-৯।

১৯. সহীহ ইব্ন খুযায়মা (সম্পা. এম. আজমী, নম্বর ৫৫৩, পৃ. ২৭৮)।

২০. বুখারী, হাদীছ নং ১০৭১, পৃ. ৪৮২৬।

২১. ইবনুল কালবী, কিতাবুল আসনাম, সম্পা. আহমাদ যাকী পাশা, পৃ..১৯; ইয়াকূত, মু'জামুল বুলদান, ৪খ., পৃ. ১১৬।

২২. আত-তাবারী, মাজমা ইত্যাদি, ৬খ, পৃ. ৩২-৩৪, খ ৮, পৃ. ৭০-৭২, আরও উদ্ধৃত হইয়াছে আল-আলবানীতে, পূ.গ্র., পৃ. ১২-১৩।

২৩. ইব্ন কাছীর, তাফসীর।

২৪. ইব্ন তায়মিয়্যা, মাজমূ'উল ফাতাওয়া, ২খ, পৃ. ২৮২।

২৫. উপরে দ্র. পৃ. ৬৪৮-৬৪৯।

২৬. ইব্ন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৭১।

২৭. এই বিশ্লেষণ অত্যন্ত জোরালো ভাষায় তুলিয়া ধরিয়াছেন J. Burton তাহার রচিত Those Are The High-Flying cranes প্রবন্ধে, Journal of Samitic Studies, ১৫খ, সংখ্যা ২, ১৯৭০ খৃ., পৃ. ২৪৬-২৬৫। বারটনের উপসংহারের প্রধান মন্তব্য হইতেছে, শয়তানী পদাবলী সম্পর্কিত কাহিনীর বিবরণসমূহ পরবর্তী কালের সংযোজন।

ত্রিংশতম অধ্যায়

বিরোধিতা ও বিপর্যয়ের চূড়ান্ত পর্যায়

এক ঃ বনূ হাশিমকে বয়কট ও তাহাদের বিরুদ্ধে অবরোধ

হিজরতকারিগণকে ফিরিয়া পাইতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নিরাপদ আশ্রয়প্রাপ্তি এবং তাহাদের প্রতি আবিসিনিয়ার শাসকের সন্দেহাতীতভাবে আন্তরিকতাপূর্ণ মনোভাব কুরায়শ নেতৃবৃন্দের অন্তর্জ্বালা বৃদ্ধি করিল। তাহাদের ক্রোধ ও অসহিষ্ণুতা মক্কা ভূমিতে ইসলামের মন্থর কিন্তু বিরামহীন অগ্রগতিতে, বিশেষভাবে প্রায় ঐ সময়ে 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র ইসলাম গ্রহণ এবং সাধারণভাবে সকল গোত্রের মধ্যে ইসলামের সংবাদ প্রসার লাভ করার ফলে তীব্রতর হইল।[১] এই কারণে মক্কার নেতৃবৃন্দ ইসলামের প্রচারককে সমূলে উৎখাত করিয়া এই ধর্মবিশ্বাসটির প্রচার বন্ধ করার জন্য উদ্যোগী হইয়া একটি স্থূল ও ঐতিহাসিকভাবে ব্যর্থ কৌশল অবলম্বনের প্রতি মনোযোগী হইল।[২] ইসলাম এবং মহানবী ﷺ -এর বিরোধিতা করা প্রসঙ্গে সবগুলি গোত্র জোটবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও তাহারা স্পষ্টত বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে (বনূ মুত্তালিবসহ) সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার অবস্থানে ছিল না, যাঁহারা মহানবী ﷺ -কে যে কোন বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য দৃঢ়ভাবে অটল ছিলেন। একটি বিকল্প উপায় হিসাবে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ একটি বিশেষ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে মহানবী ﷺ-কে রক্ষা করার জন্য বনূ হাশিমকে তাঁহাদের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই পন্থাটি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে "যুদ্ধ ব্যতিরেকে জবরদস্তিমূলক পদ্ধতি" নামে পরিচিত। যেমন বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে বয়কট ও অবরোধের নীতি অনুসরণ করা। তাহারা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সঙ্গে সকল প্রকার সামাজিক ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার অঙ্গীকার সম্বলিত সামাজিক বয়কট নীতি সংক্রান্ত একটি দলীল সম্পাদন করে। এ দলীলে আন্তঃগোত্র বিবাহ এবং যে কোন প্রকার সামাজিক কার্যক্রমে তাঁহাদের অংশগ্রহণের উপর নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহারা তাঁহাদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক লেনদেনও বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে– তাহারা তাঁহাদের নিকট কিছু বিক্রয়ও করিবে না বা তাঁহাদের নিকট হইতে কিছু ক্রয়ও করিবে না।

সকল গোত্রের নেতৃবৃন্দ এই দলীলের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর দান করে এবং ইহাতে বাধ্যবাধকতাপূর্ণ ক্ষমতা ও চরম গুরুত্ব আরোপ করার জন্য তাহারা তাহাদের দেব-দেবিগণকে সাক্ষী করে এবং কা'বার অভ্যন্তরে দলীলটি ঝুলাইয়া রাখে।[৩] শুধু তাহাই নয়,

তাহারা সামাজিকভাবে বর্জন করার নীতির প্রতি বাহিরের গোত্রগুলির সংশ্লিষ্টতা অর্জন করার জন্য প্রচেষ্টা চালায়। বিশেষভাবে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এই উদ্দেশ্যে শক্তিশালী বনূ কিনানার সাথেও একটি চুক্তি সম্পাদন করে।[৪]

এইরূপে সামাজিকভাবে বয়কট নীতির দুইটি সুস্পষ্ট দিক ছিল সামাজিকভাবে একঘরে করিয়া রাখা ও অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা। ধর্ম প্রচারের সপ্তম বৎসরের প্রারম্ভে ইহা কার্যকর করা হয়।[৫]

বনূ হাশিম (বনূ মুত্তালিবসহ) তাহাদের দিক হইতে পরিস্থিতি মুকাবিলা করার মত ক্ষমতা অর্জন করে এবং উপেক্ষা ও বীরত্ব সহকারে তাহাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে। তাহারা অন্যান্য সকল গোত্রের বিরুদ্ধে, যতদিন না তাহারা তাহাদের মত পরিবর্তন করে, প্রতি অসহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে। তাহাদের নেতা আবূ তালিবের পরামর্শক্রমে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সকল সদস্য শহরের বিভিন্ন আবাসিক এলাকা হইতে সরিয়া আসে এবং প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত আবূ তালিবের গিরি সঙ্কট (শি'ব আবূ তালিব) -এ সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে।[৬]

তাহাদের দ্বারা অবলম্বিত কৌশলটি মহানবী ﷺ-এর জন্য নিরাপত্তার চিন্তা-ভাবনা দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কারণ কুরায়শগণ বনূ হাশিমের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে সাহস না পাইলেও উভয় পক্ষের নেতবৃন্দের নিকট একথা সুস্পষ্ট ছিল যে, সামাজিকভাবে বয়কট করার নীতি গ্রহণ করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মহানবী ﷺ-কে তাহারা যাহাতে হত্যা করিতে পারে সেজন্য তাঁহাকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিতে অপর পক্ষকে বাধ্য করা। এভাবে তাহাদের প্ররোচনায় অন্য উপায়ে গোপনভাবে তাঁহার প্রাণনাশের বাস্তব আশঙ্কাও ছিল।

বনূ হাশিম কর্তৃক গৃহীত প্রতিরক্ষামূলক অবস্থান তাহাদিগকে একটি অবরুদ্ধ সম্প্রদায়ের অবস্থায় ফেলিয়াছিল এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দের জন্য অর্থনৈতিক অবরোধ কার্যকর করা তুলনামূলকভাবে সহজতর করিয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, সামাজিকভাবে বয়কট ও অবরোধ ছিল আরবদের গোত্রীয় এবং মক্কা শহরের ইতিহাসে অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। মহানবী ﷺ এবং তাঁহার বাণীকে কেন্দ্র করিয়া মক্কার কুরায়শদের গোত্রীয় সংহতির মুখোশে ফাটল এবং শত্রুভাবাপন্ন দুইটি শিবিরে শহরটির বিভাজন এই সময়ে সব আরব গোত্রের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল।

যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপকভাবে এটাও স্পষ্ট হইয়া যায় যে, কুরায়শ নেতাগণ এখন প্রাচীন ধর্মের পক্ষ সমর্থন করিলেও ইহারাই এক সময়ে সগোত্রীয়গণকে রক্ষা করা এবং এক বংশজাতদের যত্ন লওয়ার প্রাচীন ও দীর্ঘ প্রচলিত রীতির প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিল। বিপরীতক্রমে বনূ হাশিম গোত্রের সদস্যদের আচার-ব্যবহার মহানবী ﷺ-কে সমর্থন জ্ঞাপন করিলেও ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ এবং গোত্রীয় সদস্যগণকে সুরক্ষা প্রদান ও জ্ঞাতিবর্গের তত্ত্বাবধান

করার প্রাচীন রীতির পক্ষে যথাযথভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কারণ মহানবী ﷺ-কে সমর্থন জানাইলেও তাহারা তাহাদের ব্যর্থ তৎপরতাকে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস হইতে স্বতন্ত্র রাখিত এবং প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসকে পরিত্যাগ করে নাই। শুধু আবূ লাহাব ছিল সেই ব্যক্তি যে তাহার গোত্রের এই সাধারণ নীতির বিরুদ্ধাচারণ করে এবং প্রকাশ্যভাবে মহানবী ﷺ -এর শত্রুদের পক্ষ অবলম্বন করে।

বর্জন ও অবরোধ দুই বৎসরের অধিক কাল অব্যাহত ছিল।[৭] এই সময়ে অবরুদ্ধ লোকজন অপরিসীম কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, বিশেষভাবে পানি ও আহার্যের সরবরাহের অভাবে। কারণ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ বনূ হাশিমের নিকট যাহাতে কোন প্রকার আহার্য ও জীবন রক্ষাকারী অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য না পৌছে সেজন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিত এবং ভুক্তভোগীদের কিছু সংখকের বর্ণনানুসারে তাহাদিগকে একাদিক্রমে কয়েক দিন অনাহারে থাকিতে এবং খাদ্যের অভাবে কখনও কখনও তাহাদিগকে বৃক্ষপত্র ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ কররিতে হইত।[৮] মহানবী ﷺ-এর জনৈক সাহাবী বর্ণনা করেন, একদিন তিনি কোন পশুর শুষ্ক চর্ম সিদ্ধ করেন এবং তাঁহার জীবন রক্ষার জন্য তাহা ভক্ষণ করেন।[৯] অনাহারক্লিষ্ট শিশুদের ক্রন্দনধ্বনি উপত্যকার বর্হিদেশ হইতে শ্রুত হইতে।[১০] কিন্তু এত কষ্ট সত্ত্বেও বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের সদস্যগণ মহানবী ﷺ-কে রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্পে অটল এবং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত অবস্থানে তাঁহারা অবিচল থাকেন।

কয়েকটি বিষয় কুরায়শ নেতাদের বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল এবং শুধু তাহাদের বর্জন নীতিকে নয়, তাহাদের জোটকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিবার হুমকির সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রথমতঃ কুরায়শ কার্যপদ্ধতির নিষ্ঠুরতা। বনূ হাশিমের দুঃখ-দুর্দশা, যাহারা জোটবদ্ধ গোত্রসমূহের বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করেন নাই এবং যাহারা এমনকি তাহাদের শত্রুর দৃষ্টিতে তাহাদের গোত্রের সদস্যদের সমর্থন ও সুরক্ষা দেওয়ার শুধু প্রাচীনতর কারণে সম্মানিত ও বৈধ কর্তব্য পালন করিতেছিলেন। ইহা অনেকের মনে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির উদ্রেক করে। যাহারা ক্রমে ক্রমে বর্জন নীতির প্রতি তাহাদের সমর্থনের ক্ষেত্রে কম আগ্রহী হইয়া পড়ে, বিশেষভাবে উপত্যকার বর্হিদেশ হইতে অনশন পীড়িত শিশুদের হৃদয়বিদারক ক্রন্দনধ্বনি শ্রুত হইবার সময়।

দ্বিতীয়ত, মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে তাহাদের অন্ধসুলভ শত্রুতা সত্ত্বেও কুরায়শ গোত্রসমূহ পবিত্র মাসগুলি সম্পর্কিত সুপ্রাচীন বিধানকে উড়াইয়া দিতে পারে নাই, বিশেষভাবে যুলহিজ্জা মাস সম্পর্কে, যে সময়ে একজন অন্য একজনের বিরুদ্ধে শত্রুতা স্থগিত রাখিতে বাধ্য ছিল। তাহারা এই বিধানটিও সম্ভবত লঙ্ঘন করিতে পারিত যদি উহা শুধু মক্কার কুরায়শদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকিত, কিন্তু ইহা আরবের সকল গোত্র কর্তৃক সার্বজনীনভাবে সম্পর্কিত একটি বিধান ছিল। সুতরাং কুরায়শগণ নিজেরাও বিধানটি লঙ্ঘন করিতে পারে নাই বা তাহারা অন্যান্য আরবগোত্রগুলিকেও বিধানটি লঙ্ঘন করার জন্য প্ররোচিত করিতে পারে নাই। ফলে পবিত্র

মাসগুলিতে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব তাহাদের গিরিসংকট হইতে বাহিরে আসিতে পারিতেন এবং এমনকি মহানবী ﷺ মক্কা ও মিনায় হজ্জ পালন করার জন্য আগত গোত্রসমূহের সঙ্গে সাক্ষাত করিতে ও তাহাদের নিকট ধর্ম প্রচার করিতে পারিতেন।[১১] সন্দেহ নাই যে, দুই গোত্রের সদস্যগণ বৎসরের অবশিষ্ট মাসগুলির জন্য যতটা অধিক পরিমাণ সম্ভব প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করার জন্য পবিত্র মৌসুমের সুযোগ গ্রহণ করিতেন।

তৃতীয়ত, বনূ মাখযূমসহ যাহারা মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতায় সর্বাগ্রে ছিল, বনূ হাশিম ও জোটবদ্ধ গোত্রসমূহের অনেকগুলির মধ্যে রক্ত ও বৈবাহিক সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধন ছিল। সময় অতিবাহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের আচরণে বনূ হাশিমের এই ধরনের জ্ঞাতিদের অনেকের বিবেক আহত হইল, বিশেষভাবে কাহারও জ্ঞাতিগণকে সমর্থন ও সাহায্য করার আর একটি প্রাচীন রীতি (সিলাতুর রাহিম) তাহাদের দ্বারা লঙ্ঘিত হওয়ার কারণে। এই ধরনের আত্মীয়-স্বজন লক্ষ্য করিলেন যে, ঐতিহ্যবাহী কর্তব্যসাধন করা হইতে বিরত থাকিয়া তাহারা ইহার বিপরীত কর্ম করিতেছে। যেমন তাহারা তাহাদের নিকট আত্মীয়-স্বজনদের ধ্বংস সাধন করিতেছে। অতএব মুহূর্তের উত্তেজনায় তাহারা বর্জন নীতি গ্রহণের সিদ্ধান্তে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেও প্রায় প্রথম হইতেই তাহাদের অনেকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে ইহার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করিতেছিল। তাহাদের অনেকে গিরিসঙ্কটে তাহাদের অবরুদ্ধ আত্মীয়-স্বজনগণকে খাদ্যসম্ভার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গোপনে সরবরাহ করার উপায়ও অবলম্বন করে। ইহা প্রামাণ্যভাবে বর্ণিত আছে যে, বনূ আসাদের হাকীম ইব্ন হিযাম, খাদীজা (রা)-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ও বনূ 'আমেরের হিশাম ইব্ন 'আমর, তাঁহার অন্যতম আত্মীয়দের একজন গিরিসঙ্কটে তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের নিকট খাদ্যসামগ্রী প্রেরণ করিতেন।

একদা হাকীম এইভাবে শস্যের বস্তা সেখানে বহন করিয়া লইয়া যাইবার সময় আবূ জাহ্ল কর্তৃক দৃষ্ট হন। সে তাহাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি এইগুলি গিরিসঙ্কটে তাহার ফুফুর নিকট লইয়া যাইতেছেন বলায় তাঁহাকে আবূ জাহ্ল বাধা দেয়। একটি বাদানুবাদ আরম্ভ হয় যাহার ধারাবাহিকতায় আবুল বাখতারী ইবন হিশাম (তিনিও ছিলেন বনূ আসাদ গোত্রের) তথায় আগমন করেন। তিনি হাকীমকে সমর্থন করেন যাহার ফলে তিনি আবু জাহ্ল কর্তৃক তিরস্কৃত হন। বচসাটি উত্তপ্ত হইয়া একটি হট্টগোলে রূপান্তরিত হয়, যাহার ফলে আবূ বাখতারী একটি হাড়ের খণ্ড দিয়া আবূ জাহ্লকে আঘাত করিয়া আহত করেন। আবূ জাহ্ল এই অপমান নীরবে সহ্য করে।

ইব্ন ইসহাক বলেন, ঘটনাটি হামযা ইব্ন আবদুল মুত্তালিব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং আবূ জাহ্ল তাহা উপলব্ধি করিয়া ইহার প্রতি কম গুরুত্ব আরোপ করে এই কারণে যে, ঘটনাটি মহানবী ﷺ জ্ঞাত হউন তাহা সে চায় নাই।[১২] সম্ভবত একটি আরও অধিক বাস্তবসম্মত কারণ এই ছিল যে, আবূ জাহ্ল অনুমান করিয়াছিল, যদি সে বিষয়টি লইয়া বেশি বাড়াবাড়ি করে তবে ইহা জোটের মধ্যে প্রকাশ্য ভাঙ্গন সৃষ্টি করিবে।

অন্য একটি বিবরণে দেখা যায় যে, গিরিসঙ্কটে খাদ্যসামগ্রী সরবরাহ করার জন্য হিশাম ইব্‌ন আমরের পদ্ধতিটি অধিকতর পরিমাণে উদ্ভাবনীমূলক ছিল। তিনি মালপত্রসমূহ একটি উটের পৃষ্ঠে বোঝাই করিয়া উটটিকে গিরিসঙ্কটের দিকে হাঁকাইয়া দিতেন এবং সেখানে বানূ হাশিমের লোকজন উটের পৃষ্ঠদেশ হইতে মালপত্রাদি খালাস করিয়া উটটিকে গিরিসঙ্কটের বর্হিদেশে তাড়াইয়া দিতেন। হিশাম অনুরূপভাবে কার্য সম্পাদনকালে কয়েকজন কুরায়শ নেতা কর্তৃক সনাক্ত ও ধৃত হন যাহারা তাহাকে শাস্তি প্রদানের ভীতি প্রদর্শন করে। কিন্তু খুব কৌতূহলের বিষয় যে, ইহাও বর্ণিত আছে যে, আবূ সুফ্য়ান হিশামের অপরাধ মার্জনা করার জন্য সুপারিশ করেন। কারণ সর্বোপরি তিনি সিলাতুরর রাহিমের কর্তব্য পালন করিতেছিলেন।[১৩] ঘটনাটি কুরায়শদের নিষ্ঠুরতা কিভাবে উল্টা ফল লইয়া আসে তাহাদের নিজেদের দলের কিংবা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ বর্জন নীতিকে একটি অন্যান্য পন্থা হিসাবে বিবেচনা করে, যাহা সিলাতুর রাহিমের সর্বজন স্বীকৃত সুপ্রাচীন কর্তব্যের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ, ইহা তাহার একটি দৃষ্টান্ত।

কুরায়শদের বিরুদ্ধে চতুর্থ কারণ এই ছিল যে, তাহারা মক্কার ব্যবসায়ীদিগকে যতদূর সম্ভব সংশ্লিষ্ট করিয়া বনূ হাশিমের উপর বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করিলেও মক্কার বাহিরের সকল গোত্রের ব্যবসায়িগণকে, যাহারা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে মক্কায় আসিত, এই বয়কট মানিয়া চলিতে বাধ্য করিতে পারে নাই। এ পরিস্থিতিতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ যে কৌশলটি প্রয়োগ করিয়াছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় তাহা ছিল ঐসব বিদেশী ব্যবসায়িগণকে শুধু কুরায়শ ব্যবসায়ীদের নিকট উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে অনুপ্রাণিত করা বা বনূ হাশিমের মধ্য হইতে কোন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক মূল্য প্রদানে রাজি হইয়া ক্রয় করা। স্পষ্টত বাণিজ্যিকভাবে বর্জনের কোন পন্থাই এ ধরনের একটি আত্মঘাতী পদ্ধতির মাধ্যমে কার্যকরভাবে বজায় রাখা সম্ভব ছিল না বা কুরায়শ নেতাগণ নিজেরাও দীর্ঘকাল পর্যন্ত এই অবস্থা সহ্য করিতে পারিতেছিল না।

সুতরাং বর্জন পদ্ধতির প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত হইলে ইহার বিরুদ্ধে অনিবার্য প্রতিক্রিয়া ও বিরোধিতা শুরু হইল। যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণভাবে এই পর্যায়েও তিনি ছিলেন বনূ আমের গোত্রের একই ব্যক্তি হিশাম ইবন আমর যাহাকে বর্জন নীতির বিরুদ্ধে দল গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করিতে দেখা যায়।[১৪] তিনি সর্বপ্রথম আবূ তালিবের ভগ্নী আতিকা বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিবের পুত্র, বনূ মাখযূমের একজন নেতা যুহায়র ইবন আবী উমায়্যার নিকট গমন করেন এবং বলেন, সুখে বাস করা এবং জীবনের সকল সুবিধা ভোগ করা আপনাকে মানায় না। কারণ তিনি নিজেই তাহার মাতুল বংশের আত্মীয়দের ধ্বংস সাধনকারী পক্ষের একজন সদস্য। যুহায়র এই মর্মে উত্তর দিলেন, এই ব্যাপারে তিনি অসহায় এবং যদি তাহাকে সমর্থন করার কোন ব্যক্তি থাকিত তবে এই অমানবিক বর্জন নীতির কষ্ট তিনি একদিনের জন্যও ভোগ করিতেন না। হিশাম উত্তর দিলেন, তিনি ঐ বিষয়টির জন্য কাজ করিতে সম্মত আছেন। যুহায়র তাহাকে আরও কয়েকজনের সমর্থন আদায় করিতে বলিলেন। এভাবে যুহায়রের মনোভাব ও কথায় উৎসাহিত হইয়া হিশাম একের পর

এক বনূ নাওফালের মুত'ইম ইবন 'আদী, আবুল বাখতারী, আল-'আস ইব্ন হাশিম এবং যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিবের সঙ্গে, উভয়ে ছিলেন বনূ আসাদ গোত্রীয়, যোগাযোগ করেন এবং তাহাদিগকে বর্জন নীতি অবসান ঘটানোর প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করান। এই পাঁচ ব্যক্তি তখন তাঁহাদের কাজের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার জন্য এক রাত্রে মিলিত হন।[১৫]

পরদিন প্রত্যুষে তাঁহারা কা'বা প্রাঙ্গণে গমন করেন, যেখানে কুরায়শ নেতাগণ সমবেত হইয়াছিল এবং তাঁহারা সমাবেশের বিভিন্ন স্থানে আসন গ্রহণ করেন। পরিকল্পনা অনুসারে মাখযূমী নেতা যুহায়র ইব্ন আবী উমায়্যা প্রথমে কা'বার চারিপার্শ্বে সাতবার তাওয়াফ করেন এবং এই বলিয়া কুরায়শ নেতাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান করেন যে, তাহাদের কোন অপরাধ না থাকা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ধ্বংস করার জন্য বল প্রয়োগে তাহাদের নিজেদের গোত্রের বা আত্মীয়দের কোন একজনকে বাধ্য করা তাহাদের জন্য যথাযথ হইতেছে না। তিনি বলেন, অন্যায় বর্জন নীতি পরিত্যক্ত এবং দলীল বাতিল না হওয়া পর্যন্ত তিনি থামিবেন না। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবূ জাহ্ল্ কর্তৃক বাধ্যপ্রাপ্ত হন। সে উল্লেখ করে যে, বর্জননীতির দলীলে সবগুলি গোত্রের সম্মতি সহকারে সম্পাদিত হইয়াছে এবং ইহাকে কোনভাবেই অকার্যকর করা যাইতে পারে না। আবূ জাহ্ল তাহার কথা শেষ করিতে না করিতেই সমাবেশের অপরাংশ হইতে যাম'আ যুহায়রকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিয়া এবং এই কথা বলিয়া তাহার বিরোধিতা করিলেন যে, এমন কি এই অন্যায় দলীলটি সম্পাদিত হইবার সময় হইতেই তিনি (যাম'আ) ইহার পক্ষে ছিলেন না। যুগপৎভাবে সমাবেশের অন্য অংশ হইতে আবুল বাখতারী দাঁড়াইলেন এবং বর্জন দলীলের বাতিলকরণ দাবি করিলেন। তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই মুত'ইম ইব্ন 'আদী বাদানুবাদে যোগদান করেন এবং আল্লাহ্র শপথ করিয়া বলেন, বর্জন নীতি ও ইহার দলীল সম্পর্কে তাহার কিছুই করণীয় থাকিবে না। বর্জন নীতির অবসান ঘটাইবার পক্ষে সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া আবূ জাহ্ল মন্তব্য করিল, ইহা একটি পূর্ব পরিকল্পিত চক্রান্ত যাহা বাস্তবায়িত করার জন্য নেতৃবৃন্দ গোপনভাবে ষড়যন্ত্র করিয়াছে।[১৬]

বর্জন নীতির পরিসমাপ্তি একটি অলৌকিক ঘটনা উদঘাটিত করে। প্রামাণ্য সূত্রে বর্ণিত আছে, মহানবী ﷺ আল্লাহ্র মাধ্যমে অবগত হন যে, বর্জন নীতি সংক্রান্ত দলীলের অন্যান্য ধারাসমূহ কীটেরা ভক্ষণ করিয়াছে এবং ইহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার পিতৃব্য আবূ তালিবকে বিষয়টি অবগত করান এবং তাঁহাকে অনুরোধ করেন যেন তিনি এ সম্পর্কে জানাইবার জন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দের নিকট গমন করেন এবং তাহাদিগকে বনূ হাশিমের শত্রুতার অবসান ঘটাইতে অনুরোধ করেন। তদনুসারে আবূ তালিব, যিনি নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কখনও মিথ্যা কথা বলেন না, তাঁহার লোকজনের কিছু সংখ্যককে সঙ্গে লইলেন এবং কুরায়শ নেতাদের নিকট গেলেন। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ও তাহার সঙ্গীগণ ঠিক সেই সময়ে কা'বার উপস্থিত হন যখন কুরায়শ নেতাগণ বর্জন দলীলের ভাগ্য সম্পর্কে উপরিউক্ত আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ঘটনাস্থলে

আবূ তালিবের আগমন স্বাভাবিকভাবেই সমাবেশের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যাহারা যথার্থই অনুমান করে যে, তিনি অতি জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলার জন্য আসিয়াছেন।

আবূ তালিব মহানবী ﷺ তাহাকে যাহা জানাইয়াছিলেন তাহা তাহাদিগকে জানাইলেন এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে দেখানোর উদ্দেশ্যে বর্জন দলীল আনার জন্য অনুরোধ জানাইয়া বলিলেন, মহানবী ﷺ তাহাকে যাহা বলিয়াছেন যদি তাহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহারা বর্জন নীতি প্রত্যাহার করিবে এবং তাহাদের আত্মীয়দের ক্ষতিসাধন করা হইতে বিরত থাকিবে। কিন্তু যদি অন্য রকম হয় তবে তিনি মহানবী ﷺ-কে সুরক্ষা দেওয়া বন্ধ করিবেন যাঁহাকে তাহারা হয় হত্যা করা না হয় বাঁচাইয়া রাখা যাহা ইচ্ছা করিতে পারিবে।[১৭]

তৎক্ষণাৎ কুরায়শ নেতৃবৃন্দ দলীলখানা আনয়ন করে এবং পরম বিস্ময় ও হতাশার সঙ্গে দেখিতে পায় যে, মহানবী ﷺ আবূ তালিবকে যাহা অবগত করাইয়াছিলেন তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তাহাদের হতাশা পরিপূর্ণ হইল এবং সমাবেশের মতামত অবিলম্বে বর্জন নীতি অবসানের স্বপক্ষে চলিয়া গেল। মুত'ইম ইব্ন আদী এবং তাহার সহযোগীরা তৎক্ষণাৎ তাহাদের অনুগামিগণসহ আবূ তালিব গিরিসঙ্কটে গমন করে এবং বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবকে উহার বাহিরে আসিতে এবং তাহাদের নিজ নিজ আবাসে যাইয়া বসবাস করিতে আহ্বান করে। অভিজ্ঞ লেখকমণ্ডলীর মতানুসারে এভাবে ধর্ম প্রচারের দশম বৎসরে বয়কটের অবসান ঘটে।

দুই ঃ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার অলৌকিক ঘটনা

বর্জন নীতির দলীলের অলৌকিকতাপূর্ণ বিলুপ্তির পূর্বে অন্য একটি মহা অলৌকিক ঘটনা ঘটে। ইহা ছিল চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত করার ঘটনা। উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, বর্জননীতি ও অবরোধ সত্ত্বেও বনূ হাশিম এবং মহানবী ﷺ পবিত্র মাসসমূহে তাঁহাদের উপত্যকার বাহিরে আসিতে পারিতেন এবং বাস্তবেও আসিতেন। বর্জন নীতির দ্বিতীয় বৎসর এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে। মহানবী ﷺ তাঁহার সঙ্গী-সাথিগণসহ মিনায় অবস্থান করিতেছিলেন। রাত্রিটি ছিল পূর্ণিমার রাত। সূর্যাস্তের সামান্য পরে মহানবী ﷺ লক্ষ্য করিলেন যে, আকস্মিকভাবে পূর্ণচন্দ্র সমান দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পূর্ণ দিগন্তে তাহাদের সম্মুখবর্তী পাহাড়ের দুই পার্শ্বে দূরে দূরে দৃশ্যমান হইল। তিনি তাঁহার সঙ্গীদিগকে এই দৃশ্য দেখিতে এবং ইহার সাক্ষী থাকিতে বলিলেন। তাঁহারা দেখিলেন। এই দৃশ্য এক পলক কাল স্থায়ী ছিল। মিনায় উপস্থিত অবিশ্বাসীদের অনেকেও এই অস্বাভাবিক ও অলৌকিক দৃশ্যটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।[১৮] তাফসীরকারকদের অধিকাংশের মতে, ঘটনাটি কুরআন মজীদের ৫৪ ঃ ২ আয়াতে উল্লিখিত হইয়াছে যাহার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ . وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ .

"কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হইয়াছে। তাহারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং বলে, এটি চিরাগত জাদু" (৫৪ ঃ ১-২)।

উপরিউক্ত সূরার প্রথম 'আয়াতে চন্দ্র সম্পর্কে ব্যবহৃত 'ইনশাককা' (انْشَقَّ) ক্রিয়ার অতীত কাল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, ঘটনাটি, যাহার সম্পর্কে ইহা বলিতেছে, প্রকৃতই ঘটিয়াছিল। অবশ্য কুরআনে বহু সংখ্যক অনুচ্ছেদ রহিয়াছে যেখানে ভবিষ্যত ঘটনাবলীকে ক্রিয়ার অতীত কাল ব্যবহার করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বিশেষভাবে এরূপ হইতে পারে, কারণ রোজ কিয়ামত আগমনের পূর্বে সৌরজগতে বিপর্যয় ঘটা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হইয়াছে।[১৯] উহার ভিত্তিতে কেহ একথা ভাবিতে পারে যে, অনুচ্ছেদ ৫৪ ঃ ১-২ ভবিষ্যদ্বাণী সংক্রান্ত প্রকৃতির এবং কখনও ঘটে নাই এমন একটি ঘটনার বর্ণনা দিতেছে। কিন্তু আলোচ্য অনুচ্ছেদটি কমপক্ষে তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বতন্ত্র।

প্রথমত, ঐসব অনুচ্ছেদে একের অধিক বস্তু সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেমন সূর্য ও চন্দ্র বা আকাশসমূহ, নক্ষত্রমণ্ডলী, সূর্য ও চন্দ্র, অথবা সূর্য, পৃথিবী, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি। বর্তমান উদাহরণে বিশেষভাবে চন্দ্রকে এককভাবে উল্লেখ করার জন্য উল্লেখ করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়ত, ঐসব অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত ক্রিয়াপদসমূহের পূর্বে প্রায় অনিবার্যভাবে ইযা (اِذَا) অভিব্যক্তি বসিয়া নিঃসন্দেহরূপে ইঙ্গিত প্রদান করিতেছে যে, ঐগুলি ভবিষ্যতকাল নির্দেশক।

তৃতীয়ত, আলোচ্য অনুচ্ছেদে ইহার দ্বিতীয় 'আয়াহ' ('সঙ্কেত') এবং দৃশ্য দেখার পর অবিশ্বাসীদের কৃত মন্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করিতেছে যাহা স্পষ্টরূপে দেখায় যে, বর্ণিত ঘটনাটি ঘটিয়াছিল এবং অবিশ্বাসীরা, যদিও ইহা তাহারা নিজেরা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, ইহাকে চিরাগত 'জাদু' হিসাবে আখ্যায়িত করিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে মহানবী ﷺ-এর সাহাবীগণের কিছু সংখ্যক যেমন আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ, হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান এবং জুবায়র ইবন মুত'ইম (রা) ঘটনাটির প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং তাঁহারা দ্ব্যর্থহীনভাবে ইহার প্রত্যয়ন করিয়াছেন। আনাস ইব্ন মালিক এবং আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর ন্যায় অন্যান্য সাহাবী, যদিও তাঁহারা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করেন নাই, সমান গুরুত্ব সহকারে প্রত্যয়ন করেন। তাঁহারা অবশ্যই তাহাদের সমসাময়িক ব্যক্তিদের নিকট ঘটনাটির বিবরণ শুনিয়া থাকিবেন যাহারা ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বিবরণীসমূহ হইতে ইহা পরিষ্কার যে, ঐ সময়ে মিনায় উপস্থিত অবিশ্বাসীদের কিছু সংখ্যক লোকও ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু তাহারা মন্তব্য করে যে, ইহা ছিল মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রদর্শিত একটি জাদু।[২০] তাহাদের কিছু সংখ্যক তাহাদের স্বদেশবাসীর সহিত ভিন্নমত পোষণ করিয়া উল্লেখ করেন যে, যাহারা মিনায় উপস্থিত ছিল তাহাদের উপর মহানবী ﷺ-এর জাদু প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল না তাহাদের উপর তো জাদুর প্রভাব বিস্তার করে নাই এবং এরূপ ঘটনা ঘটে যে, মিনা হইতে দূরবর্তী স্থান হইতে কিছু সংখ্যক লোক সেখানে আগমন করে এবং একইভাবে বর্ণনা করে যে, তাহারা সেই অলৌকিক ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করিয়াছে।[২১] আলোচ্য

অনুচ্ছেদটির দ্বিতীয় আয়াত স্পষ্টভাবে ঘটনাটিকে যাহারা বিশ্বাস করে না তাহাদের মন্তব্যসমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

আনাস ইব্ন মালিক (রা) কর্তৃক প্রদত্ত বিবরণে উল্লেখ আছে যে, ঘটনাটি ছিল মহানবী ﷺ -এর নবুওয়তের দাবির সত্যতা প্রমাণের জন্য অবিশ্বাসীদের দাবিকৃত "প্রমাণ"-এর প্রেক্ষিতে প্রদর্শিত মু'জিযা।[২২] কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ হইতে ইহা প্রতীয়মান হয় না যে, অবিশ্বাসীদের দাবির প্রেক্ষিতে মহানবী ﷺ কর্তৃক ইহা প্রদর্শিত হইয়াছিল। কুরআন হইতে উপরোল্লিখিত অনুচ্ছেদটিও সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে যে, ঘটনাটি আল্লাহ্র ক্ষমতা এবং রোজ কিয়ামতের অনিবার্যতা ও সময়ের বিচারে সন্নিকটবর্তীর চিহ্ন। অবস্থানগত প্রমাণও দিকনির্দেশ করে যে, মু'জিযাটি অবিশ্বাসীদের দাবির প্রেক্ষিতে প্রদর্শিত হয় নাই। উপরে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, ঘটনাটি বর্জন নীতির দ্বিতীয় বৎসরের শেষে সংঘটিত হইয়াছিল, যখন কুরায়শ নেতৃবৃন্দ স্পষ্টরূপে বিতর্কের নীতির পরিহার করিয়াছিল এবং বনূ হাশিমকে ধ্বংস করিতে অথবা স্বয়ং মহানবী ﷺ -কে হত্যার উদ্দেশ্যে হাতে পাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহাদের জন্য তাঁহার নবুওয়াতের প্রমাণ দাবি করার বা তাঁহার জন্য অবিশ্বাসিগণকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহ্র নিকট তাঁহাকে মু'জিযা প্রদান করার উদ্দেশ্যে আবেদন জানাইবার সময় ছিল না।

সংশয়বাদিগণ বলিতে পারে যে, চন্দ্রের ন্যায় এত বৃহৎ একটি মহাকাশীয় বস্তুর নিজে নিজে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়া, এক অংশ অন্য অংশ হইতে হাজার হাজার মাইল দূরে বিচরণ করা এবং অতঃপর পূর্ব অবস্থানে প্রত্যাবর্তন করার জন্য আবার দুই অংশের পরস্পরের নিকটবর্তী ও সংযুক্ত হওয়া অবিশ্বাস্য ও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ ঘটনা। তাহারা আরও বলিতে পারে, যদি এরূপ ঘটনা কোন দিন ঘটিয়া থাকিত তবে ইহা পৃথিবীব্যাপী অনেকেরই দৃষ্টিগোচর হইত এবং ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদগণ কর্তৃক ইহার বিবরণও সংরক্ষিত থাকিত।

আপত্তি দুইটি অসমর্থনযোগ্য। যেমন সায়্যিদ মাওদূদী উল্লেখ করিয়াছেন,[২৩] যদি কেহ আল্লাহ্তে বিশ্বাস করেন তবে তিনি একথা বিশ্বাস করিতে দ্বিধা করিবেন না যে, তিনি (আল্লাহ্) তাঁহার অসীম ক্ষমতাবলে মানুষের পক্ষে অকল্পনীয় অথবা তাহার পক্ষে প্রকৃতি বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত সবকিছুই করিতে পারেন। কারণ স্বয়ং প্রকৃতি আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট। তথাপি বর্তমান বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, যাহার মতে সৌরজগতটি সূর্যের একটি মহাবিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না যে, অভ্যন্তরীণ বিস্ফোরণের ফলে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল এবং অংশ দুইটি তাহাদের চৌম্বক আকর্ষণের ফলে পুনর্বার সংযুক্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয় আপত্তি সম্পর্কে বলা যায় যে, চন্দ্র এক সময়ে পৃথিবীর শুধু অর্ধাংশে দৃষ্ট হয়। ঘটনাটি ঘটিবার পূর্বে কোন ঘোষণা বা ইঙ্গিত ছিল না। ঐ সময়ে জ্যোর্তির্বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থাও এত উন্নত ছিল না। তারপর ইহা ছিল অতি দ্রুত সংঘটিত একটি ঘটনা। এই কারণে

ইহা কোন আশ্চর্যের বিষয় নহে যে, এই ঘটনা অনেক লোকের দৃষ্টিগোচর হয় নাই বা তাহাদের দ্বারা কোন লিখিত বিবরণ সংরক্ষিত হয় নাই।

তিন ঃ শোকের বৎসর (‘আমুল হু’যন)

বয়কটের অবসান এবং গিরিসংকট হইতে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের বহির্গমন নিঃসন্দেহে তাহাদের এবং মহানবী ﷺ -এর পক্ষের বিজয় সূচিত করিয়াছিল। কিন্তু ঐ বৎসরটি, ধর্ম প্রচারের দশম বৎসর, স্বয়ং মহানবী ﷺ কর্তৃক "শোকের বৎসর" রূপে চিহ্নিত হইয়াছিল। ইহার কারণ এই যে, বয়কট অবসানের অল্পদিন পর এবং ঐ বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে তিনি তাঁহার দুইজন নিকটতম ও প্রিয়তম আত্মীয়কে হারান। তাঁহার পিতৃব্য আবূ তালিব এবং স্ত্রী খাদীজা (রা) উভয়েই মাত্র একমাস বা ঐরূপ সময়ের ব্যবধানে ইনতিকাল করেন।[২২]

পার্থিব দৃষ্টিকোণ হইতে এই ক্ষতি ছিল অপূরণীয় এবং এই ঘটনা তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে মারাত্মক আঘাত হানে। আবূ তালিব ছিলেন গোত্রপ্রধান এবং মহানবী ﷺ-এর প্রতি তাহারই অবিচল সমর্থনের ফলে বনূ হাশিম এবং বনূ মুত্তালিব অন্যান্য সকল গোত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়াছিল। ঘটনাস্থল হইতে তাঁহার অন্তর্ধান গোত্র নেতৃত্বের ক্ষেত্রে শূন্যতার সৃষ্টি করে যাহা আর কখনও পূর্ণ হয় নাই। অধিকতর গুরুত্বপূর্ণভাবে মহানবী ﷺ-কে সুরক্ষা প্রদানের প্রশ্নে দুই গোত্রের ঐক্য বাধাগ্রস্ত হয় এবং দৃশত ইহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া যায়, যাহার ফলে অনতিবিলম্বে মহানবী ﷺ-কে অন্য একটি ক্ষেত্রে সাহায্য ও আশ্রয় কামনা করিতে হয়। অপরপক্ষে খাদীজা (রা) ছিলেন মহানবীর সর্বাপেক্ষা উৎসর্গীত ও বিশ্বস্ত বন্ধু, যিনি তাঁহার আনন্দ ও বেদনায় অংশগ্রহণ করিতেন, দুঃসময়ে সান্ত্বনা ও স্বস্তি প্রদান করিতেন এবং সম্ভাব্য সকল প্রকার বিপদ ও আপদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতেন। এইরূপ একজন সঙ্গীকে হারাইবার ক্ষতি সহজে পূরণযোগ্য ছিল না। জীবনের অবশিষ্ট কালব্যাপী মহানবী ﷺ তাঁহার মহান স্মৃতি হৃদয়ে লালন করিয়াছেন।

আবূ তালিবের মৃতুর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দুইটি ঘটনা উল্লেখের দাবি রাখে। ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত আছে যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর প্রাক্কালে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহার মৃত্যুশয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হয় এবং তাহাদের ও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র মহানবী ﷺ-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্থাপন করিয়া দিতে অনুরোধ করে। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ডাকাইয়া আনেন এবং কুরায়শ নেতৃবৃন্দের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁহাকে অবহিত করেন। পূর্বের ন্যায় মহানবী ﷺ আরও একবার তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু তাহারা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে।[২৩] যদি বিবরণটি সত্য হয় তবে উহা প্রমাণ করে যে, কুরায়শ নেতৃবর্গ তাহাদের বয়কটের ব্যর্থতায় এবং আবূ তালিবের জীবনের আসন্ন মৃত্যুর বিবেচনায় মহানবী ﷺ-কে তাহাদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসার জন্য আর একবার অনুপ্রাণিত করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এই যে, আবূ তালিব মৃত্যুশয্যায় থাকাকালে মহানবী ﷺ তাঁহাকে তাঁহার পুরাতন ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ইসলাম গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন এবং জানান যে, এ ঘটনা আল্লাহ্‌র কাছে তাঁহার (আবূ তালিব) মুক্তির জন্য সুপারিশ করিতে তাঁহাকে (মহানবী ﷺ) শক্তি যোগাইবে। কিন্তু অহঙ্কারী বৃদ্ধ এই যুক্তিতে তাহা করিতে অস্বীকার করিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর সময়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করিলে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহাকে এই বলিয়া উপহাস করিবে যে, এই কাজ তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া করিয়াছেন।[২৬]

রঙ্গমঞ্চ হইতে আবূ তালিবের প্রস্থান মহানবী ﷺ-এর প্রতি কুরায়শদের পুনরুজ্জীবিত শত্রুতার সঙ্কেত হিসাবে কাজ করে। তাহারা যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে আয়ত্ত্বে আনিতে এবং হত্যা করিতে অগ্রসর হয় নাই বোধগম্যভাবে তাহার কারণ এই ছিল যে, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিবের কিছু সময়ের প্রয়োজন হইয়াছিল। অপরপক্ষে কুরায়শগণ তখন পর্যন্ত নিজেরাই তাহাদের নিজেদের মধ্যকার পার্থক্য দূর করিতে পারে নাই, যাহার ফলে বয়কট পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহা খুব সম্ভব এই দুর্বলতার জন্য যে, যেমন উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে, আরও একবার সমঝোতায় আসিতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছিল। যাহারা এখন পর্যন্ত মহানবীকে আক্রমণ করিতে সাহস পায় নাই তাহারা এখন সেই সাহস পাইল। মহানবী ﷺ কা'বাগৃহে সালাতে সিজদারত অবস্থায় থাকাকালে আবূ জাহ্‌ল্ বা অন্য কাহারও দ্বারা তাঁহার স্কন্ধে আবর্জনার স্তূপ স্থাপন করা বা 'উকবা ইবন আবূ মু'আয়ত কর্তৃক সিজদারত মহানবী ﷺ-এর পিঠে যবেহকৃত পশুর অন্ত্রাদি স্তূপীকরণের পূর্বোল্লিখিত ঘটনাসমূহ[২৭] সম্ভবত পরবর্তী কালে ঘটিয়াছিল।

আবূ তালিবের মৃত্যুর পর বনূ হাশিমের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে এবং মহানবী ﷺ -এর উপর হইতে তাহাদের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করাইতে আবূ লাহাবের অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় নাই। প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয়, আবূ লাহাব তাহার গোত্রের অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করিতে এবং তাহার মাধ্যমে তাহাদের দ্বারা তাহার নেতৃত্বকে স্বীকৃত করাইতে মনস্থ করে। ইব্‌ন সা'দের বিবরণ অনুসারে আবূ তালিবের মৃত্যুতে আবূ লাহাব মহানবী ﷺ -কে বলে যে, প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় সে (আবূ লাহাব) ও চাচার দায়িত্ব পালন করিবে এবং অন্যের শত্রুতা হইতে তাঁহাদের রক্ষা করিবে।

আরও বর্ণিত আছে, সে একদিন ইবনুল গায়তালা (কায়স ইবন 'আদী আস-সাহমী) মহানবী ﷺ-কে গালি দিলে আবূ লাহাব তাহার বিরোধিতা করে। ইবনুল গায়তালা আবূ লাহাবের এই ধরনের মনোভাব দেখিয়া হৈচৈ শুরু করে এবং অন্যান্য কুরায়শ নেতাদের নিকট অভিযোগ করে যে, সে পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছে। অতঃপর কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ঘটনার সত্যতা নিরূপণার্থে আবূ লাহাবের নিকট আসে। সে তাহাদিগকে বলে যে, সে তাহার পৈতৃক ধর্ম পরিত্যাগ করে নাই

কিন্তু বনূ-হাশিমের নেতা এবং মহানবী ﷺ-এর চাচা হিসাবে তাঁহাকে যে কোন শারীরিক ক্ষতি হইতে রক্ষা করা তাহার কর্তব্য ছিল। তাহারা চলিয়া গেল কিন্তু ঘটনার নিষ্পত্তি হইল না।

কয়েক দিন পর আবূ জাহ্ল্ ও 'উক্বা ইবন আবূ মু'আয়ত আবূ লাহাবকে তাহার (আবূ লাহাবের) পিতা আবদুল মুত্তালিবের ভাগ্য সম্পর্কে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিতে প্ররোচিত করে। আবূ লাহাব তাহাই করে এবং মহানবী ﷺ কর্তৃক কথিত হয় যে, আবদুল মুত্তালিব সেখানে অবস্থান করিবেন যেখানে তাঁহার গোত্রের অন্যরা অবস্থান করিবে। আবূ লাহাব কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে একথা জানাইলে তাহারা তাহাকে বলে যে, এই কথার অর্থ এই যে, তাহার পিতা দোযখবাসী হইবে। সুতরাং আবূ লাহাব মহানবী ﷺ-এর নিকট ইহার ব্যাখ্যা দাবি করিলে তিনি বলেন, অন্যান্য অবিশ্বাসী ও মুশরিকদের ন্যায় আবদুল মুত্তালিবও দোযখবাসী হইবে। উক্ত বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ-এর ঐ উত্তরে আবূ লাহাব তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হইল এবং চিরশত্রু হইবার প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করিল।[৮] এই কাহিনী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, কিভাবে মহানবী ﷺ-এর শত্রুপক্ষ কত দ্রুত আবূ লাহাবকে নিজেদের দলে টানিয়া লয়।

মহানবী ﷺ যে তাঁহার গোত্রের অবিচল সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইলেন তাহা এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট হয় যে, এই সময় হইতে তিনি অন্যান্য আরব গোত্রের নিকট তহাদের সমর্থন ও নিরাপত্তা কামনা করেন। সমর্থন অনুসন্ধানের পথে তিনি একই বৎসরের দ্বিতীয়ার্ধে তাইফে গমন করেন। এসব ঘটনার প্রতি দৃষ্টি দিবার পূর্বে মহানবী ﷺ-এর মক্কাবাসী শত্রুদের সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের মত ও ধারণার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া সময়োপযোগী হইবে।

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আবূ তাহের

তথ্যনির্দেশিকা

১. ইব্ন হিশাম, ১ম খ., ৩৫০।

২. ইব্ন সা'দ, ১ম খ., ২০৮।

৩. ঐ, পৃ. ২০৮-২০৯; ইবন হিশাম, ১ম খ., ৩৫০; আত-তাবারী, তারীখ, ২য় খ., ৩৩৫-৩৩৬; ইব্ন ইসহাক বলেন, দলীলটির লেখক ছিল বনূ আবদুদ-দার গোত্রের মানসূর ইব্ন 'ইকরামা এবং পরবর্তী কালে তাহার হাত অবশ হইয়া যায় (ইব্ন হিশাম, ১ম খ., ৩৫০, ৩৭৭; ইব্ন সা'দ, ১ম খ., ২০৯)। ইবন হিশাম বলেন, দলীলটির লেখক ছিল আন-নাদর ইবনুল হারিছ।

৪. বুখারী, নং ১৫৯০; মুসনাদ ২য় খ., ২৩৭।

৫. ইব্ন সা'দ, ১ম খ., ২০৯।

৬. কা'বা হইতে অনতিদূরে আবূ কুবায়স পর্বতে অবস্থিত।

৭. ইব্‌ন ইসহাক বলেন, ইহা দুই বা তিন বৎসর অব্যাহত ছিল। পক্ষান্তরে মূসা ইবন 'উকবা ও ইব্‌ন সা'দ নির্দিষ্ট করিয়া বলেন, ইহা তিন বৎসর অব্যাহত ছিল।

৮. সুহায়ালী ২খ., ১২৭।

৯. সুহায়ালী ২ খ., ১২৭।

১০. ইব্‌ন সা'দ ১ম খ., ২০৯।

১১. ইবন সা'দ, ২০৯; বুখারী, নং ১৫৯০; মুসনাদ ২য় খ., ২৪১।

১২. ইবন হিশাম, ১ম খ., ৩৫৪।

১৩. ঐ, পৃ. ৩৭৫।

১৪. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খ., ৩৭৪, ৩৭৫; আত-তাবারী, তারিখ, ২য় খ., ৩৪১ (১/১১৯৬)।

১৫. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খ., ৩৭৬; আত-তাবায়ী, তারীখ, ২ খ., ৩৪২ (১/১১৯৭)।

১৬. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খ., ৩৭৬; আত-তাবারী, তারীখ, ২ খ., ৩৪২ (১/১১৯৭)।

১৭. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৩৭৭; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., ২০৯-১০।

১৮. দ্র. বুখারী, নং ৩৮৬৮-৭১; ৪৮৬৪-৬৮; মুসলিম, নং ২৮০০-২৮০৩; মুসনাদ, ১খ., ৩৭৭, ৪১৩; ৪খ., ৮১-৮২।

১৯. উদাহরণস্বরূপ দ্র. কুরআন, ৭৫ ঃ ৭-৯, ৮১ ঃ ১-৬; ৮২ ঃ ১-৩ এবং ৮৪ ঃ ১-৪।

২০. উদাহরণস্বরূপ দেখুন মুসনাদ, ৪ খ., পৃ. ৮১-৮২।

২১. পূর্বোক্ত বরা; আরও দেখুন ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৭ম খ., ৪৪৭-৪৫০ এবং আত-তাবারী তাফসীর, ২৭ ঃ ৫০-৫২, যেখানে বিষয়টির উপর প্রায় সমস্ত বিবরণ দেওয়া আছে।

২২. বুখারী, নং ৩৮৬৮, মুসনাদ, ৩য় খ., ১৬৫।

২৩. মাওদূদী, সীরাতে সারওয়ারে আলাম, ২য় খ., ৬১৭-৬১৮।

২৪. দুইজনের মৃত্যুর ক্রম সম্পর্কে বিবরণসমূহ বিভিন্নতা রহিয়াছে।

২৫. ইব্‌ন হিশাম, ১ম খ., ৪১৭।

২৬. বুখারী, নং ৪৭৭১; মুসলিম, নং ২৪। আরও দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ৮খ., ২৭২; ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৫৬; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২য় খ., ২৪২, ২৪৩; ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা, ২০০-২০৯।

২৭. উপরে দ্র. পৃ. ৬৫২-৪। আরও দ্র. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪১৬।

২৮. ইব্‌ন সা'দ, ১ম খ., ২১০-২১১।

একত্রিশতম অধ্যায়

মক্কাবাসীদের বিরোধিতা ও প্রাচ্যবিদগণ

বিরোধিতার কারণ ও সূত্রপাত সম্পর্কে ওয়াটের তত্ত্ব

এক ঃ প্রাথমিক মন্তব্যসমূহ

মহানবী ﷺ-এর প্রতি মক্কার অবিশ্বাসীদের বিরোধিতা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের মতামত তিনটি প্রধান শিরোনামের অধীনে আলোচনা করা যাইতে পারে ঃ (ক) বিরোধিতার কারণ ও সূত্রপাত সম্পর্কে তাহাদের বিশ্লেষণ; (খ) বিরোধিতার প্রকৃতি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে তাহাদের মূল্যায়ন এবং (গ) অবিশ্বাসীদের আপত্তি বনাম প্রাচ্যবিদগণের মতামত। বর্তমান ও পরবর্তী দুই অধ্যায়ে যথাক্রমে তাহাদের মতামতের তিনটি দিক আলোচিত হইবে।

বিরোধিতার কারণ ও সূত্রপাতের মূল বিষয়বস্তু বিবেচনাকালে প্রধানত ওয়াট-এর মতামতসমূহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে শুধু এই কারণে যে, তিনি এই ব্যাপারে নূতন একটি মতবাদ উপস্থাপন করেন, যদিও তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার পূর্বসূরীদের মতামত হইতে গৃহীত। এই দিক হইতে মুইর এবং মারগোলিয়থ-এর মতবাদসমূহ কম-বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ এবং এগুলি প্রধানত উৎসসমূহে প্রদত্ত তথ্যসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

ইবন ইসহাকের বর্ণনার সারাংশের সঙ্গে সঙ্গতি রাখিয়া মুইর বলেন, মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে সাধারণ বিরোধিতা সৃষ্টি হয় সেই সময় যখন তিনি "প্রকাশ্যে স্বগোত্রীয় লোকজনকে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের প্রতি আহ্বান জানান" এবং প্রতিমাসমূহের নিন্দা জ্ঞাপন শুরু করেন।[১] মুইর-এর মতে প্রধান কারণটি ছিল "মক্কার গৌরব এবং সমগ্র আরববাসীর হজ্জের কেন্দ্র" কা'বার পূজার প্রতি মক্কাবাসীদের ভক্তি। এজন্য তাহারা ধর্মমতটিকে নিশ্চিহ্ন ও ইহার অনুসারিগণকে ইহা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল।[২]

কম-বেশি অনুরূপ মতবাদের প্রতিধ্বনি করিয়া মারগোলিয়থ বলেন, "মক্কা প্রধানত একটি ধর্মীয় কেন্দ্র হওয়া" এবং শান্তিপূর্ণ চারি মাসের পৌত্তলিক প্রথার "উপর নির্ভর করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত।" তিনি লিখিয়াছেন, মক্কাবাসিগণ এই ভয়ে ভীত ছিল যে, মহানবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল কা'বা এবং ধর্মীয় কেন্দ্র হিসাবে মক্কার মর্যাদা বিনষ্ট করা।" প্রাথমিক যুগের একটি প্রত্যাদেশের উদ্দেশ্য ছিল "মক্কাবাসীদিগকে এই বিষয়ে আশ্বস্ত করা"।[৩] তিনি আরও বলেন, "আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নাই" ঘোষণাটি ছিল বিরোধিতার প্রথম ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ।[৪] তিনি

আরো বলেন, ইহার একটি রাজনৈতিক কারণ ছিল। তিনি বলেন, "রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব পৃথক করা সম্ভব ছিল না এবং মক্কাবাসী মুহাম্মাদ ﷺ-কে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থিত দেখিতে প্রস্তুত ছিল না"।[৫] এভাবে মুইর ও মারগোলিয়থ উভয়ে এই মর্মে বক্তব্য পেশ করেন যে, কুরায়শগণের ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কা'বার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল এবং তাহাদের বিরোধিতার পিছন ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক উভয় প্রকার উদ্দেশ্য বিদ্যমান ছিল এবং মুইর এখানে সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক কারণের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান না করিলেও বিষয়টি সম্পর্কে তাহার ব্যাপক আলোচনায় ইহা অন্তর্নিহিত রহিয়াছে, বিশেষভাবে মহানবী ﷺ-এর কথিত "উচ্চাশা" এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে তাহার আলোচনায়।

ওয়াট তাহার পালায় বিরোধিতার পিছনে মুইর, মারগোলিয়থ প্রমুখ কর্তৃক ইঙ্গিতকৃত ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসমূহের উপরে নির্ভর করেন এবং এগুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। এই কাজ করিতে গিয়া অবশ্য তিনি একটি নূতন তত্ত্ব পেশ করেন। মুইর অথবা ইব্ন ইসহাকের বিবরণ হইতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে পথনির্দেশ লাভ করিয়া ওয়াট ইহাকে কুরআনের প্রাথমিক অনুচ্ছেদের মর্মবাণী সম্পর্কিত ও তাহার বা বেল-এর মতামতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করেন। ইব্ন ইসহাকের বিবরণটি এই ছিল যে, সাধারণ বিরোধিতা তখনই সংগঠিত হয় যখন মহানবী ﷺ প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার ও প্রতিমাসমূহের নিন্দাজ্ঞাপন শুরু করেন। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ওয়াট ইহা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, কুরআনের প্রাথমিক প্রত্যাদেশসমূহে কঠোর একত্ববাদ এবং প্রতিমাসমূহের বাতিল হওয়ার বিষয়টির উল্লেখ ছিল না।[৬] এখন তিনি ঐ ধারণাটিকে একদিকে "উল্লেখ" বা প্রতিমার নিন্দা জ্ঞাপনের সঙ্গে, যাহা বিরোধিতার কারণ ঘটাইয়াছিল এবং অপরদিকে "শয়তানী আয়াতসমূহ"-এর মিথ্যা কাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। তিনি মনে করেন, যেহেতু প্রাথমিকভাবে মহানবী ﷺ-এর একত্ববাদ ছিল একান্তই অস্পষ্ট। প্রতিমার স্বীকৃতিতে তাহার দ্বারা আয়াতসমূহের কথিত উচ্চারণ ছিল শুধুমাত্র এই যাবৎ তাঁহার দ্বারা ধারণকৃত মতবাদের একটি বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁহার ও কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের একটি উদ্যোগকে চিহ্নিত করে, সুতরাং আপোষমূলক আয়াতসমূহের কথিত রদকরণের অর্থ ছিল আপোষের ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতাটি সম্পর্কে ওয়াট বলেন, মহানবী ﷺ-কে প্রতিমাসমূহকে অস্বীকার করিতে এবং পরিণামে তাঁহার বিরোধিতা করা শুরু করিতে অনুপ্রাণিত করে। এই তত্ত্ব গঠন করিতে ওয়াট উরওয়া ইবনুয যুবায়র (র) কর্তৃক খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান (৬৮৬-৭০৫ খৃ./৬৫-৮৬ হি.)-কে লিখিত একখানা পত্রের উল্লেখ করেন এবং ইহার তথ্যাবলী "শয়তানী আয়াত"-এর কাহিনীর সহিত মিশ্রিত করেন। তিনি তত্ত্বে যতটা কাহিনীতেও ততটা সমর্থন দানের উদ্দেশ্যে কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কিত পূর্বোল্লিখিত কুরআনের কিছু সংখ্যক আয়াতের নিজস্ব ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন।[৭] পরিশেষে তিনি মহানবী ﷺ ও কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যকার বিবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গসমূহ আলোচনা করিয়াছেন।

দুই ঃ ওয়াট কর্তৃক উরওয়ার পত্র এবং শয়তানী পংক্তিমালার ব্যবহার

ওয়াট দুইটি প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তাহার আলোচনা শুরু করেন ঃ (ক) কখন ও কিভাবে বিরোধিতা শুরু হয় এবং (খ) ইহার পশ্চাতে "প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল? প্রথম প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তিনি খলীফা 'আবদুল মালিক ইবন মারওয়ানের নিকট লিখিত উরওয়া ইবনুয যুবায়র (র)-এর পত্রের অনুবাদ উদ্ধৃত করেন। পত্রটি উরওয়ার পুত্র হিশাম কর্তৃক হস্তান্তরিত এবং আত-তাবারী কর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে।[৮] পত্রটির ওয়াট কৃত অনুবাদ ব্যবহার করিয়া নিম্নলিখিতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সারসংক্ষেপ প্রদান করা যাইতে পারে।[৯]

১। আল্লাহ্র দূত "তাহার গোত্রকে ধর্মটি গ্রহণ করার আহ্বান জানাইলে" প্রথমে তাহারা ইহাতে বাঁধা প্রদান করে নাই, "বরং তাহাদের প্রতিমাসমূহের (তাওয়াগীত) তিনি নিন্দা না করা পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে তাঁহার কথা শ্রবণ করিত।"

২। তাইফ হইতে "সেখানে সম্পত্তির মালিক কিছু সংখ্যক কুরায়শ আগমন করে (তথা সেখানে)" এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং "তাহাদের অনুগত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে। সেই কারণে জনগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে"।

৩। "তখন সেখানে ইসলামের অনুসারীদের জন্য চূড়ান্ত পরীক্ষা (ফিতনা) এবং উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়..."

৪। "যখন মুসলমানগণের প্রতি এরূপ আহ্বান করা হয়" মহানবী ﷺ তখন তাহাদিগকে "আবিসিনিয়ায় যাইতে আদেশ প্রদান করেন এবং অধিকাংশ লোক সেখানে চলিয়া যায়"।

৫। মহানবী ﷺ স্বয়ং মক্কায় অবস্থান করিতে থাকেন। "বহু বৎসর যাবৎ তাহারা (তথা কুরায়শগণ) যাহারা মুসলিম হইয়াছিল তাহাদের প্রতি কঠোর আচরণ প্রদর্শন করা অব্যাহত রাখে....।"

এই দলীল হইতে ওয়াটতিনটি বিষয় উল্লেখ করেন। (ক) প্রথম সক্রিয় বিরোধটির "কারণ ছিল" প্রতিমাদের নিন্দাজ্ঞাপন। (সম্ভবত কুরআনে); (খ) "আত-তাইফের ভূ-সম্পত্তির মালিক কিছু সংখ্যক কুরায়শ নেতা মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে এবং (গ) এইসব ঘটনা আবিসিনিয়ায় হিজরতের পূর্বে ঘটিয়াছিল।" ওয়াট আরও বলেন, শেষের দুইটি দফা মানিয়া লইবার পক্ষে "খুব অসুবিধা ছিল না 'কিন্তু' প্রথমটির ব্যাপারে কিছু অসুবিধা ছিল"। Noldeke এবং Bell কর্তৃক কুরআনের তারিখ নির্ধারণে অনেকগুলি অনুচ্ছেদকে "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপনের পূর্বে স্থান" প্রদান করেন, যাহাতে মহানবী ﷺ-এর প্রতি বিরোধিতার উল্লেখ রহিয়াছে। ওয়াট আরও উল্লেখ করেন, 'উরওয়া ঘটনার সত্তর বৎসর পর বিবরণটি লিখিয়াছেন এবং তিনি অনুমানের ভিত্তিতে লিখিয়াছেন, "তখন বহু ঈশ্বরবাদের উপর আক্রমণ ছিল বিরোধিতার হেতু এবং ইহা পরবর্তী কালে ব্যাপক বিরোধিতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়" ওয়াট আরও

উল্লেখ করেন, "ইহা বোধগম্য কিন্তু সম্ভাবনাপূর্ণ নয়" যে, প্রতিমাগুলির নিন্দা জ্ঞাপন "শয়তানী আয়াতসমূহ"-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কারণ তাহা ইঙ্গিত প্রদান করে, "কুরায়শগণ অসন্তুষ্ট ছিল এই কারণে যে, আত-তাইফের মন্দিরকে খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করা হইতেছিল এবং ইহার অধিবাসীবৃন্দ মক্কাবাসীদের সমান স্তরে স্থাপিত হইয়াছিল"।[১০] এতদ্‌সত্ত্বেও ওয়াট সাময়িকভাবে প্রথম দফাটি গ্রহণ করেন যেমন "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপনের" পর অধিকতর সক্রিয় বিরোধের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। কারণ 'উরওয়া কর্তৃক "আত-তাইফের কুরায়শ"-এর উল্লেখ ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তাহার নিকট "কুরআান ছাড়াও প্রমাণের অন্য কোন উত্তম উৎস ছিল।"[১১]

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ওয়াট-এর দফাসমূহের প্রথম ও তৃতীয়টি, যেমন প্রথম সক্রিয় বিরোধিতার কারণ ছিল "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন" এবং "এইসব ঘটনা আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পূর্বে ঘটিয়াছিল" যতটা সম্ভব বিবেচনা করিলে এইগুলি ইব্‌ন ইসহাক প্রমুখের গ্রন্থাদি হইতে খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওয়াট কর্তৃক উরওয়ার পত্রের উল্লেখ করার প্রধান কারণ দ্বিতীয় দফাটি উল্লেখ করা। যেমন—তিনি উল্লেখ করেন, "আত-তাইফে ভূ-সম্পত্তির মালিক কিছু সংখ্যক কুরায়শ মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতা ছিল"। তিনি কিভাবে তাহা নিষ্পন্ন করিবেন তাহা লক্ষ্য করার জন্য অগ্রসর হইবার পূর্বে তাহার উপরিউক্ত বিবরণটি সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করা যাইতে পারে। তিনি উরওয়ার পত্র সম্পর্কে যে "অসুবিধাটি"র কথা উল্লেখ করেন, বিশেষভাবে প্রথম দফাটি গ্রহণ করা সম্পর্কে, তাহা ওয়াট-এর নিজের সৃষ্টি। তিনি কুরআনের প্রাথমিক আয়াতসমূহকে কঠোর একত্ববাদ এবং প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন বিবর্জিত বলিয়া ধারণা করেন যাহা সম্পূর্ণরূপে অসত্য ধারণা এবং তাহার ভিত্তিতে উরওয়ার পত্র একটি নূতন ধারণার সঞ্চার করে বলিয়া তিনি বিবেচনা করেন। প্রকৃত সত্য এই যে, কুরআনের প্রাথমিক আয়াতসমূহ না কঠোর একত্ববাদ ও প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন বিবর্জিত, না উরওয়ার প্রমাণ কুরআনে যাহা আছে তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোন কিছু 'নিরপেক্ষ'। স্বয়ং ওয়াট মান করেন, কথিত প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন কুরআনে যেরূপ আছে তদ্রূপ পূর্বে যেমন দেখান হইয়াছে।[১২] ওয়াট কর্তৃক প্রাথমিক অনুচ্ছেদসমূহের নির্বাচন শুধু উদ্দেশ্যমূলক ও ত্রুটিপূর্ণই ছিল না সেগুলির তৎকৃত ব্যাখ্যাও ছিল বিভ্রান্তিকর। প্রাথমিক অনুচ্ছেদসমূহে কঠোর একত্ববাদ অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে এবং সেগুলিতে প্রতিমা পূজার নিন্দা জ্ঞাপনও হইয়াছে। এখন যেমন ওয়াট স্বীকার করেন, Noldeke ও Bell-এর তারিখ নির্ধারণ অনেক অনুচ্ছেদ উপস্থাপিত করে যাহাতে মহানবী ﷺ–এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা প্রমাণিত বা আরোপিত হইয়াছে। তাহার অর্থ কোন একটি অনুচ্ছেদকে প্রাথমিক নহে বলিয়া বাতিল করার জন্য ওয়াট কর্তৃক অনুসৃত নীতি অনুচ্ছেদটি মহানবী ﷺ-এর প্রতি বিরোধিতা সম্পর্কে বলে বা আরোপ করে কিনা যুক্তিসিদ্ধ নয়। আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে, Noldeke ও Bell-এর অনুচ্ছেদসমূহের প্রতি প্রযুক্ত বৈশিষ্ট্যসূচক বাক্যাংশ "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপনের পূর্বে" ওয়াট-এর নিজস্ব বর্ণনা।

প্রথম দফা সম্পর্কে উরওয়ার তথ্যকে গ্রহণ করিতে যাহাকে তিনি অসুবিধা বলিয়া ধারণা করেন তাহা উল্লেখ করিয়াও প্রকৃতপক্ষে ওয়াট তাহার পরবর্তী আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ইহাকে

গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে যদিও ওয়াট উরওয়া কর্তৃক কথিত "প্রতিমাগুলির নিন্দা জ্ঞাপন"-এর সঙ্গে "শয়তানী আয়াতসমূহ"-এর কাহিনীর সম্পর্ক থাকা "সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল না" বলিয়া উল্লেখ করিয়াও তিনি দুইটি বিষয়কে সংযুক্ত করার জন্য অগ্রসর হন। এজন্যই তিনি উরওয়ার বর্ণনাটিকে বিকৃত করার চেষ্টা করেন, যখন তিনি বলেন, এতদনুসারে "তাইফে ভূসম্পত্তির মালিক কিছু সংখ্যক কুরায়শ প্রধান মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেতা ছিল"। তাৎক্ষণিকভাবে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইহা যথার্থভাবে তাহা নয় যাহা উরওয়া বলিয়া ছিলেন। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, ওয়াট-এর নিজস্ব অনুবাদে, "আত-তাইফ হইতে সেখানে ভূ-সম্পত্তির মালিক কুরায়শদের কিছু সংখ্যক আগমন করিয়াছিল"। বন্ধনীস্থ সংযোজন (সেখানে) ওয়াট-এর নিজের। উরওয়ার বাক্যে ওয়াট-এর পরিবর্তন সাধনের কোনও সমর্থন নাই[১৩] এবং তাহার নিজের দ্বারা কৃত এই বিকৃতির জন্য তিনি ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন, যদি "প্রতিমাগুলির নিন্দা জ্ঞাপন" "শয়তানী আয়াতসমূহ" -এর সাথে সম্পর্কযুক্ত হয় তাহা হইলে ইহা সূচিত করিবে যে, "কুরায়শগণ অসন্তুষ্ট ছিল। কারণ তাইফের মন্দিরকে খুব বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হইয়াছিল" ইত্যাদি। উরওয়া তাইফের কুরায়শ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যাহারা ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল, মক্কার কুরায়শদের সম্পর্কে নয় যাহাদের তাইফে ধন-সম্পদ ছিল যাহা ওয়াট ধারণা প্রদান করেন। তিনি "প্রতিমাগুলির নিন্দা জ্ঞাপন"কে "শয়তানী আয়াতসমূহ"-এর কাহিনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য এরূপ করেন। এইজন্য উরওয়ার তথ্যকে আরও কিছুকাল পরে আবার বিকৃত করেন এবং ইহাকে তাইফে ব্যবসায়িক স্বার্থ থাকা কিছু সংখ্যক মক্কাবাসী নেতা হিসাবে মানিয়া লন।[১৪] ইহা স্মরণ করা প্রয়োজন, "শয়তানী আয়াতসমূহ" -এর কাহিনী, ইহার যথার্থতা যাহাই হউক মক্কার কুরায়শদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং কথিত আপসটি তাইফের লোকদের সঙ্গে করা হয় নাই।

শুধু উরওয়া তথ্যকে নয়, "শয়তানী আয়াতসমূহ"-এর কাহিনীকেও বিকৃত কর ওয়াট উভয়টিকে সংযুক্ত করেন। এভাবে অতঃপর তিনি বলেন, কুরআনের মক্কায় অবতীর্ণ অংশে মূর্তি সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ সূরা আন-নাজাম (৫৩) এবং সেখানে একটি কাহিনী রহিয়াছে।[১৫] তারপর যে কাহিনীটি যাহা তিনি পুনরুল্লেখ করেন তাহা হইতেছে, "শয়তানী আয়াতসমূহ"-এর কল্পকাহিনী যাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৬] সুতরাং ইহার সত্যতা-অসত্যতা সম্পর্কে এখন আলোচনায় যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। এখানে আমরা শুধু ওয়াট তাহার তত্ত্ব নির্মাণে কিভাবে কাহিনীটিকে ব্যবহার করেন তাহার উপর আমাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত রাখিব। ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কাহিনীটির সবগুলি রূপ, ইহাদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সত্ত্বেও ইহাকে বিরোধিতার ক্রমবৃদ্ধির একটি ফল হিসাবে বর্ণনা করার বিষয়ে একমত। ইহাদের সবগুলি আবিসিনিয়া হইতে সাময়িকভাবে প্রত্যাবর্তনকারী মুহাজিরদের অনুকাহিনীর সঙ্গে ইহাকে যুক্ত করে। অবশ্য ওয়াট আবিসিনীয় অনুকাহিনী হইতে ইহাকে বিচ্ছিন্ন করেন। তিনি ইহাকে বিরোধিতার সূত্রপাত হইবার পূর্বের বা বিরোধিতার সূত্রপাত করার ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করেন।

কাহিনীটি পুনরুল্লেখ করিয়া ওয়াট ইহাতে দুইটি দফা চিহ্নিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, (ক) কোন এক সময় মুহাম্মাদ ﷺ অবশ্যই কুরআনের অংশ হিসাবে শয়তানী আয়াতসমূহ আবৃত্তি করিয়া থাকিবেন এবং (খ) "কিছু দিন পর" তিনি "ঘোষণা করেন, এই আয়াতগুলি প্রকৃতপক্ষে কুরআনের অংশ ছিল না এবং অন্যগুলি ইহার স্থলাভিষিক্ত হইবে"।[১৭] ওয়াট কর্তৃক এইগুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করার কারণ এই যে, "ইহা অচিন্ত্যনীয়, কাহিনীটি পরবর্তী কালে মুসলমানদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছিল অথবা অমুসলিমগণ কর্তৃক তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছিল"।[১৮] তিনি আরও বলেন, আল-লাত, আল-উয্যা ও মানাত যথাক্রমে তাইফ, নাখলা ও কুদায়দ (মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী)-এর প্রভাবশালী দেবদেবী হওয়ায় শয়তানী আয়াতসমূহের প্রাথমিক ইঙ্গিত ঐসকল স্থানের পূজার প্রতি করা হইয়াছিল। ওয়াট বলেন, "এইভাবে শয়তানী আয়াতসমূহের নিহিতার্থ" "মক্কার নিকটবর্তী স্থানসমূহে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মন্দিরের ধর্মীয় অনুষ্ঠান গ্রহণযোগ্য"। অনুরূপভাবে এইসব স্থানের পূজা অগ্রহণযোগ্য বলিয়া আয়াতসমূহের স্থগিতকরণের অর্থ "কা'বার পূজার নিন্দা নয়"।[১৯]

উপরে যে রূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, আমরা এখানে কাহিনীর সত্যতা-অসত্যতা নির্ধারণে অগ্রসর হইব না। সম্ভবত বিষয়টি সম্পর্কে যুক্তি-তর্কের অবতারণা করাও লাভজনক কিছু হইবে না। কারণ ওয়াট ঐ সব প্রমাণাদি পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইবেন না যাহার উপর কাহিনীটি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সর্বাপেক্ষা উত্তম যুক্তি তিনি উপরে দিয়াছেন। সুতরাং শুধু ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কাহিনীটি প্রকৃতপক্ষে না মুসলিমদের দ্বারা উদ্ভাবিত হইয়াছে, না অমুসলিমদের দ্বারা তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বরং ইহা তাহাদের দ্বারা রচিত হইয়াছে যাহারা মুসলিম হিসাবে ভান করিত এবং যাহাদিগকে সাধারণভাবে যিন্দীক হিসাবে অভিহিত করা হইত ও যাহাবা অনেক জাল হাদীছ চালু করার জন্য দায়ী ছিল। সুতরাং আমরা শুধু লক্ষ্য করিব ওয়াট কিভাবে আমাদের কাহিনী হইতে তাহার কাহিনীটি রচনা করিয়াছেন।

কাহিনীটিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া ওয়াট ইহার "অভিপ্রায় ও ব্যাখ্যা" অবগত করাইতে অগ্রসর হইয়াছেন। তিনি বলেন যে, "মুসলিম পণ্ডিতবর্গ ক্রমবিবর্তনের আধুনিক পাশ্চাত্যের ধারণার অধিকারী না হওয়ায়" কিভাবে "মহানবী ﷺ শয়তানী আয়াতসমূহের প্রচলিত ধর্ম বিরোধিতা লক্ষ্য করিতে ব্যর্থ হন" তাহা ব্যাখ্যা করা কঠিন মনে করেন। ওয়াট বলেন, সত্য এই যে, মহানবী ﷺ-এর "একত্ববাদ মূলগতভাবে তাহার অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত সমসাময়িকদের (হানীফ) একত্ববাদের ন্যায় কতকটা অস্পষ্ট ছিল" এবং "এত কঠোর ছিল না যে, নিম্নতর শ্রেণীর দেব-দেবীর স্বীকৃতি ইহার সহিত অসঙ্গতিপূণ হয়"। সম্ভবত ওয়াট ব্যাখ্যা করেন স্বর্গীয় দূত সম্পর্কিত ইয়াহূদী খৃষ্টান ধারণার ন্যায় মহানবী ﷺ আল-লাত, আল-'উয্যা ও আল-মানাতকে আল্লাহ হইতে নিম্নতর শ্রেণীর আসমানী সত্তা হিসাবে বিবেচনা করিতেন। এ কারণে তাহার দ্বারা

শয়তানী আয়াতসমূহের উচ্চারণ একত্ববাদ হইতে কোন প্রকার সজ্ঞান পশ্চাদপসরণ" নির্দেশ করে না, শুধু "সেই মতের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে" "যাহা তিনি সব সময় পোষণ করিতেন"।[২০]

এইভাবে ধারণা দিয়া যে, মহানবী ﷺ -এর পক্ষে শয়তানী আয়াতসমূহ উচ্চারণ করা অস্বাভাবিক ছিল না, কারণ এইগুলি ঐসব ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল "যাহা তিনি সব সময় পোষণ করিতেন" এবং যেহেতু তাঁহার একত্ববাদ তাঁহার "অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত সমসাময়িক"-গণের (হানীফ) একত্ববাদের মত প্রাথমিকভাবে শুধু অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। ওয়াট মহানবী ﷺ -এর এইরূপ আচরণের কারণ দর্শাইয়াছেন। তিনি বলেন, "আয়াতসমূহের রাজনৈতিক তাৎপর্য কৌতূহলোদ্দীপক" এবং জিজ্ঞাসা করেন মহানবী ﷺ কি "মদীনা ও আত-তাইফে এবং চারিপার্শ্বের গোত্রসমূহের মধ্যে অনুসারী পাইতে আগ্রহী ছিলেন? তিনি কি বহু সংখ্যক সমর্থক সংগ্রহ করিয়া কুরায়শ নেতাদের, যাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ছিল, প্রভাবের ভারসাম্য সাধন করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন? সবশেষে এইসব মন্দিরের উল্লেখ একটি সঙ্কেত যে, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত হইতেছে"।[২০]

কথিতভাবে শয়তানী আয়াতসমূহের আবৃত্তির মধ্যে মহানবী ﷺ -এর ধর্মবিশ্বাস ও তাঁহার উদ্দেশ্যের প্রকৃতির এইভাবে প্রদত্ত ব্যাখ্যা শুধু ওয়াট-এর নিজস্ব বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতির পরিচায়ক। এই ধরনের অনুমান যে, মহানবী ﷺ -এর একত্ববাদ মৌলিকভাবে অস্পষ্ট এবং তাঁহার অধিকতর হেদায়াতপ্রাপ্ত সমসাময়িকদের একত্ববাদ হইতে ক্ষীণ ছিল, শুধু ভ্রান্তিপূর্ণ এবং কুরআনের প্রাথমিক আয়াতসমূহের বিভ্রান্তিকর নির্বাচন ভিত্তিক নয়, বরং ইহা "ক্রমবিবর্তনের ধারণা"–এর সহিতও অসঙ্গতিপূর্ণ বটে যে সম্পর্কে মুসলিম পণ্ডিতগণ অনবহিত ছিলেন বলিয়া ওয়াট অভিযোগ করেন। যদি মহানবী ﷺ -এর একত্ববাদ ঐ সময়ের তথাকথিত অস্পষ্ট একত্ববাদ হইতে স্বতন্ত্র অথবা তাহা হইতে উন্নত প্রকৃতির না হইত তবে তিনি কাহারও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিতেন না, যাহা তিনি নিঃসন্দেহে করিতে পারিয়াছিলেন এবং কেহই তাঁহার অনুসরণ করিত না, যেরূপ অনেকটাই করিয়াছিল বলিয়া সকল বর্ণনায় পাওয়া যায়। পর্যায়ক্রমিক উন্নতির একটি সত্য ধারণা পূর্বেই মানিয়া লয় যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর নবূওয়াতের দাবি অবশ্যই তাঁহার সমসাময়িকদের অস্পষ্ট একত্ববাদের উপর একটি স্বতন্ত্র ও দৃষ্টিগ্রাহ্য সংস্কার সূচিত করে। ইহা অনুমান করাও এক প্রকার ভুল যেমন ওয়াট এখানে করিয়াছেন যে, ঐ সময়ের অস্পষ্ট একত্ববাদ দেবদেবীদের কার্যক্ষমতার স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কারণ যদি "হিদায়াতপ্রাপ্ত সমসাময়িকগণ" বলিতে ওয়াট হানীফদের বুঝাইয়া থাকেন তবে এই শেষোক্তগণ সকল বিবরণ অনুসারে সুস্পষ্টভাবে প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ ও অস্বীকার করিয়াছিলেন। অপরপক্ষে যদি ইঙ্গিতটি ঐ সময়ের খৃষ্টান ও ইয়াহূদীদের প্রতি হয় তবে তাহাদের ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতির অনেকগুলি বহু ঈশ্বরবাদ হইতে অবশ্যই স্বতন্ত্র ছিল।

আবার মহানবী ﷺ আল-লাত, আল-উয্যা ও মানাতকে ওয়াট যেমন বলেন, ফেরেশতাদের সম্পর্কে ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের স্বীকৃতির ন্যায়, আল্লাহ অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর আসমানী সত্তা বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকিবেন এবং যদি উল্লিখিত দেব-দেবীদের কার্যক্ষমতার স্বীকৃতি শুধু "মুহাম্মাদ ﷺ সব সময় যাহা ধারণা" করিতেন তাহার বহিঃপ্রকাশ হইয়া থাকে তবে ইহা বোধগম্য নয় কেন এই ধরনের স্বীকৃতি কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এবং পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহকে প্রভাবিত ও সন্তুষ্ট করিবে ও তাহাদিগকে তাঁহার দিকে টানিয়া আনিবে। কারণ ওয়াট-এর মতানুসারে মহানবী ﷺ তখন পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবে এবং সুস্পষ্টরূপে প্রতিমাগুলির বিরোধিতা করায় অবতীর্ণ হন নাই যদিও উহাদের পূজা ঐসব লোকের মধ্যে ইতোমধ্যেই এমনকি মহানবী ﷺ -এর অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রচলিত ছিল। আবার মহানবী ﷺ কেন "বহু সংখ্যক সমর্থক সংগ্রহ করিয়া কুরায়শ নেতাদের যাহারা বিরোধিতা করিতেছিল, প্রভাবের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করিবেন" যখন ওয়াট-এর মতানুসারে, মহানবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে বিরোধিতার সূত্রপাত হয় নাই এবং কোন কুরায়শ নেতাও তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয় নাই। আবার যদি শয়তানী আয়াতগুলিতে প্রদত্ত স্বীকৃতি বুঝাইত যে, "মক্কার চারি পার্শ্বের গুরুত্বপূর্ণ তিনটি মন্দিরের পূজানুষ্ঠান গ্রহণীয় ছিল" যেরূপ ওয়াট বলেন, যদি ঐ স্বীকৃতি প্রত্যাহারকরণ "কা'বার পূজার নিন্দাজ্ঞাপন না হয়" তাহা হইলে কিভাবে মক্কায় কুরায়শগণকে ইহা সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট করিতে পারে?

মক্কায় কুরায়শ নেতাগণ কেন মহানবী ﷺ -এর সঙ্গে একটি সমঝোতা স্থাপনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে তাহা ব্যাখ্যা করার জন্য ওয়াট উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এইভাবে তিনটি মন্দিরের স্বীকৃতি ছিল মুহাম্মাদ ﷺ -এর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যে সম্প্রসারিত হইতেছিল তাহার নিদর্শন, এই কথা ভাবিয়া ওয়াট শয়তানী আয়াতসমূহের কাহিনীর আবুল আলিয়াহ সংস্করণ এবং মহানবীর নিকট কুরায়শদের সমঝোতার প্রস্তাব সম্পর্কে সুপরিচিত বর্ণনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বলেন, মোটের উপর কাহিনীগুলি কর্তৃক প্রদত্ত মুহাম্মাদ ﷺ -এর অবস্থার চিত্র সম্ভবত সত্যের নিকটবর্তী ছিল......... তিনি প্রাথমিকভাবে কুরায়শ নেতৃবৃন্দকে তাঁহাকে "এক ধরনের প্রস্তাব" দিতে সম্মত করাইতে যথেষ্ট পরিমাণে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ওয়াট বলেন, "মহানবী ﷺ -কে কিছু পরিমাণে পার্থিব সুবিধা গ্রহণ করিতে এবং প্রতিদানে তাহাদের দেবদেবিগণকে কিছু পরিমাণে স্বীকৃতি প্রদান করিতে হইয়াছিল... শয়তানী আয়াতসমূহের প্রচারণাকে এই দরকষাকষির সঙ্গে যুক্ত করিতে হইবে"।[২১]

এখন ওয়াট-এর উপরে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণে সর্বাপেক্ষা প্রকট অসঙ্গতিটি এই যে, তিনি এই পর্যন্ত বলিয়াছেন যে, শয়তানী আয়াতসমূহের প্রচারণার অর্থ তাইফ, নাখলা ও কুদায়দের তিনটি মন্দিরের দেব-দেবীদের এক ধরনের স্বীকৃতি প্রদান এবং মহানবী ﷺ -এর এই পদক্ষেপ প্রকাশ করে যে, "কমপক্ষে" তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারিত হইতেছিল এবং তিনি "কুরায়শ নেতাদের প্রতিরোধের প্রভাবের ভারসাম্য রক্ষা করিতেছিলেন, যাহারা তাঁহার বিরোধিতা

করিতে ছিল"। ওয়াট তাহার অব্যবহিত পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, শয়তানী আয়াতসমূহের প্রচারণাটি ছিল "দরকষাকষি" যাহা কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ -এর সঙ্গে "কিছু পার্থিব সুবিধা" প্রদানের পরিবর্তে সম্পন্ন করিয়াছিল, যাহার অর্থ ছিল, "তাহাদের দেবদেবীদের প্রতি" একটি "স্বীকৃতি"। ওয়াট কি বলিতে চাহেন যে, বিরোধী কুরায়শ নেতৃবৃন্দের প্রভাবের ভারসাম্য বজায় রাখার এবং তাঁহার প্রভাব বলয় সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে মহানবী ﷺ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপটিকেই ঐসব কুরায়শ নেতৃবৃন্দ একটি দরকষাকষি ও তাহাদের দেবদেবীকে প্রদত্ত স্বীকৃতি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল? কোন্ বিভ্রান্তি ইহা অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্তিকর হইতে পারে!

আবার "তাহাদের দেবদেবীকে স্বীকার করিয়া লওয়া" কিভাবে তাহাদের জন্য একটি দরকষাকষি হইতে পারে যদি না মহানবী ﷺ ইতোপূর্বে তাহাদিগকে অস্বীকার করিয়া থাকেন এবং যদি শুধু আল্লাহ হইতে নিম্নতর শ্রেণীর সত্তা" হিসাবে উহাদিগকে বিবেচনা করিয়া থাকেন? সর্বোপরি শয়তানী আয়াতসমূহে দেবদেবীদিগকে প্রদত্ত মর্যাদা মধ্যস্থতাকারীর অর্থাৎ আল্লাহ অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর আসমানী সত্তার মর্যাদা অপেক্ষা অধিক কিছু ছিল না। ওয়াট -এর নিজের স্বীকৃতিতে কুরায়শ নেতাগণ, মহানবী ﷺ -এর প্রাথমিক সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে মিটমাট করার একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সুতরাং তাহারাই ছিল ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা মহানবী ﷺ -কে কিছু মূল্যবান পুরস্কারের প্রস্তাব দিয়াছিল। কিন্তু প্রস্তাবিত মিটমাট বিস্ময়করভাবে ঐ বিষয়ে নিশ্চুপ। ওয়াট শুধু এই প্রস্তাব করিয়া যে, "বিস্তারিত কিছু আমরা বলিতে পারিনা" নিজেকে আপাতদৃষ্টিতে এই সমস্যা হইতে অব্যাহতি দিতেছেন। কিভাবে একজন চুক্তি সম্পর্কে এতটা 'নিঃসন্দেহ' হইতে পারে যখন বিস্তারিত বর্ণনা স্বীকৃতরূপে অনিশ্চিত এবং যখন কথিত মিটমাট পুরস্কারটি সম্পর্কে অনন্যসাধারণভাবে নির্বাক যাহা কুরায়শ নেতাগণ মহানবী ﷺ-কে প্রদান করিতে চাহিয়াছিল?

শয়তানী আয়াতসমূহ রহিতকরণ সম্পর্কে পরবর্তী কালে ওয়াট যাহা বলিয়াছেন তাহাও কম বিভ্রান্তিকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ নহে। তিনি বলেন, আয়াতগুলি রহিতকরণের অর্থ "মিটমাটের ব্যর্থতা"। এই ব্যর্থতার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কুরায়শ নেতাগণ মহানবী ﷺ -কে "প্রতারিত" করে নাই, কিন্তু তিনি—

(ক) "উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, বানাতুল্লাহ্ (আল্লাহ্র কন্যা) তিনটি প্রতিমা (এবং অন্যান্যগুলি) যে নামে অভিহিত হইত, স্বীকার করার অর্থ আল্লাহ্কে তাহাদের পর্যায়ে নামাইয়া আনা";

(খ) তিনি আরও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, যেহেতু তাঁহার "কা'বা পূজা তাহাদের" তাইফ, নাখলা ও কুদায়দের পূজা হইতে "খুব বেশী পার্থক্যমণ্ডিত ছিল না", যে আপস-মীমাংসাটি তিনি করেন "অর্থ প্রকাশ করিত যে, আল্লাহ্র দূত তাহাদের পুরোহিত হইতে খুব পার্থক্যসম্পন্ন

ছিলেন না এবং খুব বেশী প্রভাবশালী হইবার সম্ভাবনাও ছিল না। এ কারণে মুহাম্মাদ ﷺ যে সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিয়াছিলেন তাহা বাস্তবায়িত হয় নাই";

(গ) তিনি বুঝিতে পারেন যে, "দেবদেবীগুলির প্রতি" এই ধরনের "স্বীকৃতি প্রদান আল্লাহ্ তাঁহাকে যে দায়িত্ব দিয়াছেন তাহার ব্যর্থতা সাধন করিবে"।

(ঘ) তদুপরি যেহেতু "কা'বাতে পূজা, যাহা ইতোপূর্বে বহু ঈশ্বরবাদী ছিল, পরিশোধিত হইতেছিল এবং অন্ততপক্ষে মুসলমানদের জন্য একত্ববাদে পরিণত করা হইতেছিল", মহানবী ﷺ অনুধাবন করিলেন, যদি একই ধরনের পূজা কয়েকটি মন্দিরে প্রবর্তন করা যায়, তবে "হিজাযের লোকজন অনিবার্যভাবে মনে করিবে যে, অনেকগুলি মোটামুটিভাবে সমপর্যায়ের দেবদেবীকে পূজা করা হইতেছে"।

(ঙ) ইহা ব্যতিরিকে বানাতুল্লাহ বাক্যাংশটি "আল্লাহর কন্যাগণ," "এই অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, এগুলি মোটামুটিভাবে আল্লাহ্র সমতুল্য সত্তা এবং একত্ববাদের সঙ্গে ইহাকে খাপ খাওয়ানো যাইতে পারে না"।

ইহা এখানে অবশ্যই উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেখানে শয়তানী বাক্যসমূহ রহিত করার কোনো প্রশ্ন ছিল না। কারণ কথিত বাক্যসমূহ কখনও মহানবী ﷺ কর্তৃক উচ্চারিত হয় নাই। কাহিনীটি ছিল সর্বাংশে বানোয়াট ও মনগড়া। কিন্তু এখানে আমরা শুধু ওয়াট-এর বর্ণনার অসঙ্গতিটি লক্ষ্য করি। কথিত আছে, তথাকথিত রহিতকরণের অর্থ আপস-মীমাংসার ব্যর্থতা এবং "তাহাদের দেবদেবীগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান" প্রত্যাহারকরণ। ইহা ওয়াট-এর বর্ণনা (তাহার পৃ. ১০৪) যে, শয়তানী বাক্যসমূহের প্রত্যাহার "কা'বার পূজায় নিন্দা" ছিল না–এর সহিত সরাসরি সাংঘর্ষিক। দ্বিতীয়ত ওয়াট এযাবৎ বলিয়া আসিয়াছেন যে, শয়তানী বাক্য উচ্চারণ করা পর্যন্ত মহানবী ﷺ-এর একত্ববাদ এত অস্পষ্ট ছিল যে, দেব-দেবীদেরকে স্বীকৃতি প্রদান করা ইহার সহিত সামঞ্জস্যহীন ছিল না এবং এই স্বীকৃতি আপস-মীমাংসার জন্য মক্কাবাসীদের ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু এখন তিনি ক্ষেত্র দুইটির উভয়টি হইতে পশ্চাদপসরণ করিতেছেন। তিনি মনে করেন, মহানবী ﷺ "মক্কাবাসীদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করেন", কারণ "তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে, বানাতুল্লাহ স্বীকার করার......... অর্থ ছিল আল্লাহকে তাহাদের সমপর্যায়ে নামাইয়া আনা" এবং আল্লাহ কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত দায়িত্বকে "ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করা"। ইহা ছাড়াও "বানাতুল্লাহ" বাক্যাংশটি এই অর্থ প্রকাশের জন্য ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে যে, "ঐগুলি মোটামুটিভাবে আল্লাহ্র সমতুল্য সত্তা ছিল" এবং ঐগুলিকে একত্ববাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা যাইতে পারে না (দেখুন উপরে ক, গ ও ঘ)।

ওয়াট কি বলিতে চাহেন যে, মহানবী ﷺ যিনি এতদিন পর্যন্ত শুধু একজন অস্পষ্ট একত্ববাদী ছিলেন, আকস্মিকভাবে একজন কট্টর একত্ববাদীতে পরিণত হন এবং এভাবে আপস-মীমাংসা ব্যর্থ করিয়া দেন? কিন্তু ওয়াট ঐ অবস্থানে অনড় আছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

এভাবে তিনি অনতিবিলম্বে মক্কা হইতে অন্যান্য মন্দিরে তাহার ক্ষেত্র পরিবর্তন এবং মন্তব্য করেন যে, মহানবী আপস-মীমাংসা বাতিল করেন। কারণ "কা'বাতে" তাঁহার "পূজা দৃশ্যত তাহাদের" এইসব মন্দিরের "পূজা হইতে খুব পার্থক্যসূচক ছিল না"। এবং ইহা এই অর্থ প্রকাশ করে যে, আল্লাহ্র দূত তাহাদের পুরোহিত হইতে ব্যাপকভাবে স্বতন্ত্র ও খুব বেশী পরিমাণে প্রভাবশালী ছিল না (দেখুন উপরে খ)। কিন্তু ওয়াট আরও একবার তাহার ক্ষেত্র পরিবর্তন করেন এবং কার্যত উপরে প্রদত্ত বিবরণের বিরোধিতা করেন এবং বলেন, কা'বার পূজা "যাহা পূর্বে বহু ঈশ্বরবাদী ছিল তাহা সংশোধিত হইতেছিল এবং অন্ততপক্ষে মুসলমানদের জন্য একত্ববাদে পরিণত করা হইতেছিল"। এজন্য মহানবী আপস-মীমাংসাটি বাতিল করেন। কারণ, যদি "বিভিন্ন মন্দিরে অনুরূপ পূজা প্রচলিত হয় তবে হিজাযের লোকজন অনিবার্যভাবে ধরিয়া লইবে যে, কয়েকটি মন্দিরে মোটামুটিভাবে সমপর্যায়ের দেবদেবীকে পূজা করা হইতেছে" (দেখুন উপরে ঘ)। ওয়াট কি এখানে বুঝাইতে চাহেন যে, তিনি দেবীকে স্বীকার করা অর্থ কা'বা ও অন্যান্য স্থানের মন্দিরসমূহের পূজার মধ্যে সাদৃশ্য স্থাপন করা এবং ইহাকে একত্ববাদে পরিণত করা? যাহা হউক, তাহার এই সর্বশেষ বর্ণনাটি ইতোপূর্বে এই মর্মে প্রদত্ত বিবরণের বিপরীত যে, কথিত আপস-মীমাংসা বাস্তবায়িত করার পূর্বে কৃত মহানবী এর পূজা তাহাদের কৃত ঐসব স্থানের পূজা হইতে খুব পার্থক্যমণ্ডিত ছিল না।

স্পষ্টত ওয়াট-এর এইসব অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর মতামতের কারণ তাহার দ্বৈত মানদণ্ড ও দ্বৈত আনুগত্য। তিনি প্রথমে মনে করেন, মহানবী তাইফ, নাখলা ও কুদায়দের জনসাধারণকে স্বপক্ষে টানার অভিপ্রায়ে শয়তানী বাক্যসমূহ আবৃত্তি করেন; এবং অতঃপর তিনি (ওয়াট) বলেন, শয়তানী বাক্যসমূহ "তাহাদের দেবীগণকে স্বীকৃতি প্রদান" করিয়া কুরায়শ নেতাদের একটি আপস-মীমাংসার ইচ্ছাকে পূরণ করার জন্য আবৃত্তি করা হইয়াছিল। ওয়াট একটি প্রাথমিক অনুমানসহ শুরু করেন যে, শয়তানী বাক্যসমূহ আবৃত্তি করার পূর্ব পর্যন্ত মহানবী -এর একত্ববাদ ছিল অস্পষ্ট এবং দেবীগুলিকে স্বীকৃতি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কিন্তু পরে ওয়াট আপস-মীমাংসার ব্যর্থতা ও মহানবী কর্তৃক ইহার বাতিলকরণ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন এই ধারণার বশবর্তী হইয়া যে, তাঁহার একত্ববাদ প্রতিমাগুলির প্রতি এই ধরনের স্বীকৃতি প্রদানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ ছিল। ওয়াট ভাবেন যে, শয়তানী বাক্যসমূহের প্রত্যাহার মক্কার নেতাদের সহিত আপস-মীমাংসাটির বাতিলকরণ সূচিত করিয়াছিল। ইহার পরও তিনি বলেন, মহানবী এরূপ করিয়াছিলেন, কারণ অন্যান্য স্থানের লোকজন ভুল বুঝিতে পারে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং এতদসত্ত্বেও বাতিলকরণটি "কা'বার পূজার কোন নিন্দাজ্ঞাপন ছিল না"। পরিষ্কারভাবে ওয়াট একবার মক্কার কুরায়শদের প্রতি এবং আবার তাইফ, নাখলা ও কুদায়দের মন্দিরসমূহের প্রতি তাহার আনুগত্যের ফলে তিনি বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হইয়াছেন।

এভাবে বহু সংখ্যক অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর বিবরণের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া, যাহাকে শয়তানী বাক্যসহ মক্কার নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে মহানবী -এর সম্পর্কচ্ছেদন বলা হয়,

ওয়াট ইহা দেখাইতে অগ্রসর হন যে, এই মতামত উরওয়ার তথ্যাবলীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যেমন তায়িফের কিছু সংখ্যক সম্পদশালী কুরায়শ মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিয়াছিল। অন্য কথায় ওয়াট এখন ইহা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, কেন মক্কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ অন্যান্য মন্দিরের দেবীদের স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য আগ্রহী ছিল এবং কেন এই স্বীকৃতির প্রত্যাহার তাহাদিগকে ক্রোধান্বিত করে। তিনি বলেন, 'উরওয়ার বর্ণনার "সর্বাপেক্ষা সম্ভাবনাপূর্ণ ব্যাখ্যা" এই যে, তাহারা ছিল "কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কিছু সংখ্যক যাহারা আত-তাইফের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল এবং ঐ স্থানের বাণিজ্যিক তৎপরতাকে "মক্কার অর্থব্যবস্থার গণ্ডীতে" আনয়ন করিয়াছিল। এইভাবে আল-লাতের মন্দির হইতে স্বীকৃতি প্রত্যাহার "অবশ্যই একভাবে না হয় অন্যভাবে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যকে হুমকির সম্মুখীন করে এবং মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিরুদ্ধে তাহাদের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করে"।[২৩]

ইতোপূর্বে যেমন উল্লেখ করা হইয়াছে, ঘটনাটির এইরূপ ব্যাখ্যা উরওয়ার বক্তব্যের বিপরীত। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, তাইফ হইতে কিছু সংখ্যক কুরায়শ ব্যক্তি আগমন করিয়াছিল, তাইফে সম্পত্তি বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এরূপ মক্কাবাসী কুরায়শ নয়। 'আগমন করিয়াছিল' অর্থবোধক 'কাদিমা' (قدم) ক্রিয়াটি এবং তাইফ হইতে আগত ব্যক্তিবর্গবোধক "নাস মিন আত-তাইফ" (نَاسٌ مِّنَ الطَّائِف) অভিব্যক্তিটি একথা অনুমান করার অবকাশ রাখে না যে, উরওয়া তাইফে সম্পত্তি অথবা ব্যবসায়িক সম্পর্ক আছে এরূপ মক্কাবাসী কুরায়শ ব্যক্তিবর্গ বুঝাইয়াছেন।

'উরওয়ার বিবরণের অর্থ যাহাই হউক, ওয়াট-এর মতবাদের বিরুদ্ধে সর্বাপেক্ষা কার্যকর আপত্তিটি হইতেছে, ইহা ব্যাখ্যা করে না কেন সকল কুরায়শ নেতাদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন, অনুমানসিদ্ধভাবে আত-তাইফে যাহাদের বাস্তব স্বার্থ আছে, শুধু ঐ স্থানের নয়, আরও অন্যান্য স্থানের দেবীদের অনুকূলে মহানবী ﷺ -এর স্বীকৃতি অর্জনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। এ ঘটনা সত্ত্বেও যে কা'বাতে তাহার পূজা, যেরূপ ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন, এই পর্যন্ত ঐসব স্থানে অনুষ্ঠিত পূজা হইতে সুস্পষ্টরূপে পৃথক করার উপযোগী ছিল না এবং কা'বার দেবীগুলিও এখন পর্যন্ত অস্বীকৃত ও পরিত্যক্ত হয় নাই, যে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি, বিশেষভাবে একজন ব্যবসায়ী এই পরিস্থিতিতে ঘুমন্ত কুকুরকে ঘুমাইতে দেওয়ার নীতি অনুসরণ করিত এবং সুনির্দিষ্টভাবে পার্শ্ববর্তী এলাকার মন্দিরসমূহের দেবীদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করিয়া প্রসঙ্গটিকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিত না। ইহাও ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন যে, ঐ সকল স্থানের দেবদেবীর জন্য কিভাবে মহানবী ﷺ -এর স্বীকৃতি সে স্থানের বাণিজ্যিক শুল্কের জন্য সুফল প্রসবী হইবে অথবা তাঁহার দ্বারা এই ধরনের স্বীকৃতি প্রত্যাহার ঐ শুল্কের প্রতি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। সর্বোপরি ঐ স্থানের ঐসব প্রতিমার পূজা অব্যাহত থাকা বা না থাকা এবং তাহাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত বাণিজ্যিক তৎপরতা—ইহাদের কোনটি তখন পর্যন্ত কোনভাবে তাহার স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল না।

ওয়াট বর্ণনা করেন, "আল-লাতের মন্দির হইতে স্বীকৃতি প্রত্যাহারকরণ একভাবে না হয় অন্যভাবে তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে হুমকির সম্মুখীন করিয়াছিল এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে তাহাদের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল"। ইহা এইরূপ হইতে পারিত যদি তাঁহার ধর্মপ্রচার ইতোপূর্বেই কুরায়শ নেতাদের মক্কার ব্যবসার প্রতি হুমকি প্রদর্শন করিত এবং যদি তাহা ঘটিত তবে বিরোধিতা উদ্ভূত হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য অন্যান্য স্থানের প্রতিমাদের অনুকূলে স্বীকৃতি অর্জনের চেষ্টার প্রয়োজন হইত না বা শয়তানী বাক্যের কাহিনীরও প্রয়োজন দেখা দিত না। এবং এইক্ষণে যাহা দেখা যাইবে সামান্য সময় পরে ওয়াট মন্তব্য করেন যে, মক্কা ও অন্যান্য স্থানের বাণিজ্যিক তৎপরতা মন্দিরসমূহে গোত্রগুলির দর্শনের উপর নির্ভরশীল ছিল না। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করা উচিত হইবে যে, পূর্বে প্রদর্শিতরূপে [২৫] তাইফকে মক্কার অর্থনৈতিক গণ্ডির মধ্যে আনয়ন করার উদ্যোগ ও সাফল্য সম্পর্কিত ওয়াট-এর তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে ভুল।

তিন ঃ ওয়াট কর্তৃক কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহের ব্যবহার

অতঃপর ওয়াট ইহা দেখাইবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন যে, "উরওয়ার পাত্রে ধারণকৃত মন্তব্য", যেমন কুরায়শ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মহানবী ﷺ -এর সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি "সঙ্কটময় পর্যায়" "মূর্তিদের উল্লেখ" কুরআনের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত। তিনি কুরআনের তিনটি সূরা ও আয়াত উদ্ধৃত করেন, যেমন ১৭ ঃ ৭৩-৭৫ (৭৫-৭৭); ৩৯ ঃ ৬৪-৬৬ ও ৬ ঃ ১৩৭ এবং বলেন, যদিও এই আয়াতগুলি মদীনার প্রাথমিক যুগে অবতীর্ণ, এগুলি "শয়তানী বাক্যসমূহ এবং ইহাদের রহিতকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত"।[২৬]

উহার পর তিনি সূরা আল-কাফিরূন (১০৯)-এর প্রচার সম্পর্কে উল্লেখ করেন ও মন্তব্য করেন যে, ইহা "বহু ঈশ্বরবাদের সঙ্গে" সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ চিহ্নিত করে এবং "ভবিষ্যতের জন্য আপস-মীমাংসা অসম্ভব" করিয়া তোলে।[২৭] তিনি আরও মন্তব্য করেন, আয়াত ৬ ঃ ৫৬ ও ৬ঃ৭০-সহ এই সূরাটি বুঝায় যে, "একটি উল্লেখযোগ্য সময়ব্যাপী আপস-মীমাংসার প্রতি আগ্রহ মুহাম্মাদ ﷺ এর মধ্যে বিদ্যমান ছিল"। এই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "মক্কী যুগে প্রতিমাদের সম্পর্কে কুরআনের উদ্দেশ্য ছিল "তাহাদের পূজা যে নিষ্ফল তাহা দেখানো। কারণ এইগুলি "মানুষের হিত বা অহিত সাধন করার ক্ষেত্রে অক্ষম এবং বিশেষভাবে এইগুলি কোন মানুষের পক্ষে মধ্যস্থতা করিতেও অক্ষম।"[২৮] তিনি বলেন, প্রতিমাগুলির প্রতি কুরআনের আক্রমণ এই সময় চরমভাবাপন্ন ছিল না। আরও একবার বানাতুল্লাহ্ বাক্যাংশের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ওয়াট বলেন, যেহেতু ইহা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, "প্রতিমাগুলি মোটামুটিভাবে আল্লাহ্র সহিত তুলনীয় ছিল" সেজন্য "শয়তানী বাক্যসমূহ রহিত হওয়ার সময়" ইহা "মুখ্যত অস্বীকৃত হইয়াছিল"।[২৯] ইহার পর তিনি মন্তব্য করেন, "কুরায়শ প্রধানগণ তাঁহাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করার জন্য মহানবী ﷺ প্রথম দিকে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। পার্শ্ববর্তী মন্দির সমূহের পূজার প্রতি কিছু পরিমাণে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করার জন্য তাঁহার উপর চাপ সৃষ্টি করা

হইয়াছিল। তিনি তাহা করার জন্য কিছু নমনীয় হইয়াছিলেন"। কিন্তু পরবর্তী কালে "আল্লাহর নির্দেশে, যেভাবে তিনি বিশ্বাস করেন, বুঝিতে পারেন যে, ইহা একটি মারাত্মক আপস-মীমাংসায় পরিণত হইবে"। অতএব "গুরুত্বপূর্ণ শর্ত সহকারে বহু ঈশ্বরবাদ বাতিল করার সূত্রে রচিত এবং ভবিষ্যতের জন্য আপস-মীমাংসার দ্বার রুদ্ধ হয়"।[৩০]

উরওয়ার তথ্যের ন্যায় ওয়াট-এর নিজস্ব মতবাদ এবং শয়তানী বাক্যের কাহিনীর জন্য যদি কুরআনে এইগুলির সত্যতার জন্য অনুসন্ধান করা হয় তবে বাড়াবাড়ি হইবে না। ইতোপূর্বে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে কাহিনীটির কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারী ইহাকে কুরআনের কিছু সংখ্যক আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ইহা বাস্তবায়িত করিতে যাইয়া কিভাবে তাহারা ভুল করিতেছেন তাহাও চিহ্নিত করা হইয়াছে।[৩১] এখানে আমরা শুধু ওয়াট-এর বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার বিচার-বিবেচনার মধ্যে নিজদিগকে সীমাবদ্ধ রাখিব।

তাহার সিদ্ধান্ত যে, প্রথম দিকে মহানবী ﷺ পর্যাপ্ত সাফল্য অর্জন করায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাঁহার উপর "পার্শ্ববর্তী মন্দিরগুলিতে যে পূজা হয় তাহার প্রতি কিছুটা স্বীকৃতি জ্ঞাপন করার" জন্য চাপ প্রয়োগ করে, ওয়াট-এর এই মন্তব্য মূলত অসত্য। কারণ সাধারণভাবে ইহা চিন্তা করা অসম্ভব যে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ "পার্শ্ববর্তী মন্দিরগুলিতে যে পূজা হয় তাহার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন" করার জন্য তাহার উপর চাপ প্রয়োগ করিবে যদি মহানবী ﷺ ইতোমধ্যে পৌত্তলিকতার নিন্দা না করিয়া থাকেন এবং তাঁহার ধর্ম প্রচার তাহাদের স্বার্থের প্রতি হুমকিস্বরূপ না হইয়া থাকে। যদি মহানবী ﷺ কা'বাতে প্রতিমা পূজার নিন্দা না করিয়া থাকেন, যেরূপ ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন, তবে তিনি পার্শ্ববর্তী মন্দিরসমূহের পূজার বিরোধী ছিলেন, কুরায়শ নেতাদের পক্ষে এই কথা ভাবিবার কোনও কারণ ছিল না। ওয়াট-এর সিদ্ধান্তের সর্বাপেক্ষা অযৌক্তিক দিক হইতেছে, হাদীছের বর্ণনা এবং তাহার নিজের স্বীকৃতি স্পষ্ট দেখায় যে, কুরায়শ নেতাগণ একটা আপস-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিল। ওয়াট এখন পরিস্থিতিটি সম্পূর্ণরূপে উল্টাইয়া দিতেছেন এবং বলিতেছেন, কুরআনের সাক্ষ্য অনুসারে মহানবী ﷺ ছিলেন সেই ব্যক্তি যিনি একটি আপস-মীমাংসার জন্য প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন এবং এই প্রলোভন একটি উল্লেখযোগ্য সময়ের জন্য তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান ছিল।

ওয়াট বলেন, কুরআনের কোন একটি আয়াত যেমন ১৭ : ৭৫-৭৭ (৭৩-৭৫) "প্রলোভনের প্রকৃতি অনির্দিষ্ট; অন্যটিতে (৩৯ : ৬৪-৬৬) ইহা নিশ্চিতরূপে আল্লাহর "অংশীদার" স্বীকার করা। এসব আয়াত আরও বর্ণনা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর জন্য আপস-মীমাংসার পরিণাম ইহলৌকিক ও পারলৌকিকভাবে মারাত্মক হইত ...."। অন্য একটি আয়াত ৬ : ১৩৭, ওয়াট এর মতে, বর্ণনা করে যে, যদিও পৌত্তলিকরা আনুষ্ঠানিকভাবে আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে, বাস্তবে তিনি (আল্লাহ) তাহাদের প্রতিমার মত পরিপূর্ণরূপে স্বীকৃত নন। সত্যের এই রূপটি মুহাম্মাদ ﷺ -কে দেখাইয়া থাকিতে পারে যে, আপস-মীমাংসা কার্যকর হইবে না"।[৩২]

এখন আমরা আয়াতসমূহের পর্যালোচনা করি। প্রথমে উল্লিখিত আয়াতটি সম্পর্কে ১৭ ঃ ৭৩-৭৫, শয়তানী বাক্যসমূহের মিথ্যা কাহিনীর প্রসঙ্গে ইহা ইতোপূর্বে উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। এখানে তাহা উদ্ধৃত করার প্রয়োজন নাই। আমরা যদি শুধু ইহার নিহিতার্থ উল্লেখ করি তাহাই যথেষ্ট হইবে। এগুলি হইল ঃ (ক) অবিশ্বাসীরা মহানবী ﷺ -এর নিকট আল্লাহ্‌র বাণীরূপে যাহা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা ব্যতিরেকে অন্য কিছুকে আল্লাহ্‌র বাণীরূপে রচিত করিয়া তাঁহাকে আপস-মীমাংসায় সম্মত করাইতে দৃঢ় প্রচেষ্টা চালাইয়াছিল; (খ) যদি আল্লাহ তাঁহাকে তাঁহার বিশ্বাসে দৃঢ় না করিতেন তবে তিনি তাহাদের প্রতি কিছুটা নমনীয় হইতে পারিতেন। আয়াতটির প্রধান গুরুত্ব নিহিত রহিয়াছে দ্বিতীয় দফায়। ইহা গুরুত্ব সহকারে বলে যে, আল্লাহ মহানবী ﷺ -কে অবিশ্বাসীদের ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা করিয়াছেন যাহাতে তিনি তাহাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও নমনীয় না হন। যে সকল পরিণাম সম্পর্কে তাঁহাকে সর্তক করা হইয়াছিল সেইগুলির উদ্দেশ্য ছিল সঠিক পথ হইতে যাহাতে তাঁহার সামান্যতম বিচ্যুতি না ঘটে তাহার জন্য তাঁহার দৃঢ়তাকে আরও বেশী দৃঢ় করা। এই আয়াতের স্পষ্ট অর্থের বিপরীতে ওয়াট ইহাতে মহানবী ﷺ -এর দিক হইতে আপস-মীমাংসা করার একটি প্রলুব্ধ হওয়ার উপস্থিতি দেখিতে পান। আয়াতটি দেখায় যে, অবিশ্বাসীরা মহানবী ﷺ -কে তাঁহার লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র সুরক্ষা ও সুপরিকল্পনার ফলে তাহাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও নমনীয় হন নাই। ওয়াট কর্তৃক উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়াতটি ঃ

قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَاْمُرُوْنِّيْٓ اَعْبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُوْنَ . وَلَقَدْ اُوْحِىَ اِلَيْكَ وَاِلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ . بَلِ اللّٰهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ.

"বল, হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাহারও ইবাদত করিতে বলিতেছ? তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই প্রত্যাদেশ হইয়াছে, তুমি আল্লাহ্‌র শরীক স্থির করিলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হইবে এবং তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হইবে। অতএব তুমি আল্লাহরই ইবাদত কর এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত থাক" (৩৯ ঃ ৬৪-৬৬)।

উপরিউক্ত আয়াতগুলি হইতে তিনটি জিনিস পরিষ্কারভাবে ফুটিয়া উঠে ঃ (এক) ইহা অবিশ্বাসীদের দ্বারা কৃত একটি প্রস্তাবকে দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে। (দুই) ইহা অবিশ্বাসীদের প্রস্তাবকে বোকামী বলিয়া চিত্রিত এবং ঐ কারণে তাহাদিগকে বোকা বলিয়া অভিহিত করিয়া কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে। (তিন) ইহা বর্ণনা করে যে, এমনকি ঐ বোকামীপূর্ণ প্রস্তাবটি করার পূর্বে ইহা মহানবী ﷺ এবং "তাঁহার পূর্ববর্তীদের" (অর্থাৎ পূর্ববর্তী নবীগণের) নিকট যে কোন প্রকার পৌত্তলিকতা ও বহু ঈশ্বরবাদ পরিহার ও বাতিলকরণের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিল। কল্পনা করা ব্যতিরেকে কেহ একথা বলিতে পারিবে না যে, এই আয়াত "প্রলোভন"-এর প্রকৃতি নির্দিষ্ট

করে যাহার অর্থ নিশ্চিতরূপে "আল্লাহর অংশীদার"গণকে স্বীকৃতি দান করা। আয়াতটির পরিষ্কার অর্থে, অবিশ্বাসিগণ ছিল সেইসব ব্যক্তি যাহারা একটি আপস-মীমাংসা চাহিয়াছিল এবং মহানবী ﷺ-কে ইহাতে সম্মত করাইতে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাদের প্রস্তাবটি এত ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছিল যে, তাহাদিগকে কৃত প্রশ্নের মধ্যেই বাতিলকরণ অন্তর্নিহিত ছিল।

পরবর্তী দুইটি আয়াতেই (৬৫-৬৬) কথিত প্রলোভনের কোন বিবরণ নাই। দৃশ্যত তাঁহার উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইলেও সেগুলি কুরআনে এই ধরনের অনেক আয়াতের মত মহানবী ﷺ -এর মাধ্যমে মক্কাবাসী এবং সাধারণ অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে, তাহাদিগকে ইতোমধ্যে বহু ঈশ্বরবাদের অযথার্থতা ও অশুভ পরিণাম সম্পর্কে অবগত করান হইয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া অবতীর্ণ হইয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে ইহাই হওয়া উচিৎ ছিল। কারণ তাহাদের পূজার বিরোধিতা না করা পর্যন্ত, যেরূপ এই আয়াত এবং এর পূর্বে উল্লিখিত অন্য একটি আয়াত দেখায়, অবিশ্বাসীরা তাহাদের দেবতা ও দেবীদের জন্য কোন প্রকার স্বীকৃতি প্রার্থনা করে নাই। এখানেও ওয়াট সিদ্ধান্তটি সমর্থন করার চেষ্টা করেন যাহা তাহার দ্বারা উদ্ধৃত আয়াতের মূল পাঠের সঙ্গে সরাসরিভাবে বিরোধিতাপূর্ণ। ঘটনাক্রমে এই আয়াত অতি স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে যে, ইহা মহানবী ﷺ-কে আল্লাহ্র অংশীদার প্রতিষ্ঠার সকল চিহ্ন পরিহার করার নির্দেশসহ ইতোপূর্বেই তঠাহার নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। এইভাবে আয়াতটি, যাহা স্বয়ং ওয়াট উদ্ধৃত করেন, তাহার তত্ত্বকে অপ্রমাণিত করে যে, অবিশ্বাসীরা একটা আপস-মীমাংসার জন্য প্রস্তাবসহ অগ্রসর হইবার পূর্বে প্রতিমা পূজাকে নিন্দা জ্ঞাপন করিয়া কোন প্রত্যাদেশ মহানবী ﷺ কর্তৃক প্রচারিত হয় নাই।

পৌত্তলিকরা তাহাদের প্রতিমাগুলিকে যেভাবে মানিয়া লইয়াছিল আল্লাহ্কে ততটা 'পূর্ণভাবে' মানিয়া না লওয়ায় মহানবী ﷺ বুঝিতে পারিলেন যে "আপস-মীমাসংসাটি কার্যকর হইবে না"। ওয়াট-এর এই যুক্তির সমর্থনে ৬ ঃ১৩৭ (১৩৬) আয়াতের তৎকৃত উদ্ধৃতিটি আরও অযথার্থ। এই সূত্রে সুস্পষ্ট অসঙ্গতিটি এই যে, এ যাবৎ দেবীগুলোকে মানিয়া লওয়ার জন্য মহানবী ﷺ-এর অনুমিত "প্রলোভন" -এর সুরটি বারবার বাজান হইয়াছে, কিন্তু এখানে তিনি অবিশ্বাসীদের নিকট হইতে আল্লাহ্র পূর্ণ স্বীকৃতি আদায় করিতেছেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি অবিশ্বাসীদের নিকট হইতে আল্লাহ্র একটি পূর্ণ এবং প্রকৃত স্বীকৃতি চাহিতেছেন কিন্তু বর্ণনাটি যে প্রতিমাগুলিকে তাহারা যেরূপ স্বীকৃতি দিয়াছে তিনি আল্লাহ্র নিকট সেইরূপ পূর্ণ স্বীকৃতি চাহিতেছেন বিষয়টি ওয়াট-এর নিজস্ব উদ্ভাবন।

অনুরূপভাবে ইহাও তাহার নিজস্ব অনুমান যে, অবিশ্বাসীদের ইহা না করা মহানবী ﷺ-কে ইহা দেখিতে অনুপ্রাণিত করে যে, "আপস-মীমাংসাটি কার্যকর হইবে না"। সবশেষে উল্লিখিত এই আয়াত এবং পূর্বে উল্লিখিত আয়াত দুইটির কোনটিই কোনভাবে প্রমাণিত করে না যে, একটা

আপস-মীমাংসা করা হইয়াছিল। বিপরীতক্রমে প্রথম আয়াত দুইটি প্রদর্শন করে যে, অবিশ্বাসীরাই আপস-মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাদের এই উদ্যোগ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছিল।

৬ ঃ ১৩৬ আয়াত সম্পর্কে ওয়াট ইহাকে ইহার প্রসঙ্গ হইতে প্রত্যাহার করেন এবং ইহা দেখাইতে ইহার অপব্যবহার করেন যে, মহানবী ﷺ অবিশ্বাসীদের নিকট চাহিয়াছিলেন যে, তাহারা তাহাদের প্রতিমাগুলিকে যেরূপ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিল আল্লাহ্‌র জন্যও সেইরূপ 'পূর্ণ' স্বীকৃতি প্রদান করিবে। ইহা যে আদৌ আলোচ্য আয়াতটির প্রয়োগ নয় তাহা ইহার দিকে দৃষ্টি দিলে পরিষ্কার হইবে। আয়াতটি এইরূপ :

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ مِمَّا ذَرَاَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوْا هٰذَا لِلّٰهِ بِزَعْمِهِمْ وَهٰذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ اِلَى اللّٰهِ وَمَا كَانَ لِلّٰهِ فَهُوَ يَصِلُ اِلٰى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ .

"আর তাহারা নির্দিষ্ট করে কিছু অংশ আল্লাহ্‌র জন্য তাহা হইতে যাহা আল্লাহ সৃষ্টি করিয়াছেন শস্য ও গবাদিপশু হইতে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, ইহা আল্লাহ্‌র জন্য এবং ইহা আমাদের দেবতাদের জন্য। যে অংশ তাহাদের দেবতাদের জন্য তাহা আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছে না, কিন্তু যে অংশ আল্লাহ্‌র জন্য তাহা তাহাদের দেবতাগুলির দিকে পৌঁছে যায়। তাহারা যাহা মীমাংসা করে তাহা অতি নিকৃষ্ট" (৬ ঃ ১৩৬)।

আয়াতটি অবিশ্বাসীদের একটি মন্দ প্রথা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে, যেমন পরবর্তী আয়াতটি তাহাদের অন্য একটি মন্দ প্রথা সম্পর্কে উল্লেখ করে—যেমন, তাহাদের কন্যা সন্তান হত্যা করা। এখানে উল্লিখিত প্রথাটি ছিল, অবিশ্বাসীরা শস্য সংগ্রহ করার বা গবাদিপশুর বৎসাদি প্রসব উপলক্ষে প্রত্যাশিত উৎপন্ন দ্রব্যের বৃহত্তর অংশটি তাহাদের প্রতিমাগুলির নামে রাখিত, যাহা প্রকৃত পক্ষে তাহাদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য রাখিত। অপরপক্ষে একটি ছোট অংশ আল্লাহ্‌র নামে রাখিত, যাহার অর্থ দাতব্য কাজে ব্যবহারের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখা। কিন্তু কোন কারণে যদি প্রতিমাগুলির নামে রাখা অংশে ঘাটতি দেখা দিত তাহা হইলে তাহারা আল্লাহ্‌র নামে চিহ্নিত অংশ হইতে ঘাটতি পূরণ করিত। কিন্তু তাহারা কোন কারণে আল্লাহ্‌র অংশে ঘাটতি দেখা দিলে অনুরূপ নিয়ম অনুসরণ করিত না।[৩৭]

এই কথা বলিতে যাইয়া আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ এবং "অংশীদারদের" মধ্যে আচরণের সমতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে না। ইহা সচরাচরভাবে সমস্ত শস্য ও গবাদিপশু সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র দান এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আল্লাহ্‌র অংশীদার স্থাপনের জন্য অবিশ্বাসীদের নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে। কুরআনের অন্যান্য অনেক আয়াতের ন্যায় এই আয়াত হইতেও ইহা স্পষ্ট যে, অবিশ্বাসীরা আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিল, যদিও তাহারা বোকামী

করিয়া তাহার সহিত অংশীদারও স্থাপন করিয়াছিল। এখন দেখা যাইবে, ওয়াট বিষয়টি সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত নন এবং ইহার ফলে বিষয়টি তাহাকে বিপুল পরিমাণ বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করিয়াছে।[৩৪] মহানবী ﷺ কর্তৃক আল্লাহ্র জন্য সমান স্বীকৃতি আদায় করা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠে না। তাঁহার সমস্ত প্রচেষ্টা আল্লাহ্র সঙ্গে অংশীদার স্থাপনের পাপের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইয়াছিল।

এইভাবে ওয়াট তাহার উদ্ধৃত আয়াতসমূহের বিভ্রান্তিকর অর্থ গ্রহণ ও ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করেন। মহানবী ﷺ প্রতিমাগুলি অস্বীকার করিলে তাইফের বিত্তশালী কুরায়শদের একটি দল আগমন করে এবং তাঁহার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে, উরওয়ার এই বর্ণনার সত্যতা প্রমাণের জন্য তাহারা না প্রমাণ উপস্থিত করে, না শয়তানী বাক্যসমূহের কল্পিত কাহিনী সমর্থন করে যাহা বলে যে, মহানবী ﷺ পৌত্তলিকদের সঙ্গে একটি আপস-মীমাংসায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্তী কালে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। উদ্ধৃত আয়াতসমূহ শুধুমাত্র আপস-মীমাংসার জন্য অবিশ্বাসীদের বোকামীপূর্ণ প্রস্তাবের দৃঢ় প্রত্যাখ্যান প্রদর্শন করে। একটি আপস-মীমাংসার সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবিত আপস-মীমাংসার অস্বীকৃতি ইহাদের কোনটিই আয়াতসমূহ হইতে প্রমাণিত করা যাইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে ওয়াট-এর অন্যান্য মন্তব্য এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি বলেন, সূরাতুল কাফিরূনের ঘোষণা "বহু ঈশ্বরবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদ চিহ্নিত করিয়াছিল এবং এই সময় হইতেই বহু ঈশ্বরবাদের প্রত্যাখ্যানকরণ কঠোর শব্দমালা দ্বারা সূত্রবদ্ধ করা হয়"।[৩৫] একই সময়ে তিনি বর্ণনা করেন যে, মক্কী যুগে কুরআনের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইহা দখান যে, "প্রতিমাগুলির পূজা ছিল অর্থহীন" এবং "প্রতিমাগুলির উপর আক্রমণ এই সময়ে চরম পর্যায়ে ছিল না"। সুস্পষ্টভাবে দুইটি ধারণাই অসঙ্গতিপূর্ণ। ওয়াট-এর বিভ্রান্তি তাহার নিজের পর্যাপ্ত সতর্কতার অভাব হইতে উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় যাহা তিনি তাহার পরবর্তী একটি গ্রন্থে স্বীকার করিয়াছেন[৩৬] যে, কুরআন অবতীর্ণ হইবার পূর্বে মক্কার অবিশ্বাসীরা আল্লাহকে একটি উচ্চতর সত্তা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাহার তথ্যের এই অপর্যাপ্ততার জন্য ইহা ঘটে যে, তিনি ইহা বলিতে অগ্রসর হন, "পৌত্তলিকরা তাহাদের পূজার বস্তুসমূহকে "মধ্যস্থতাকারী" হিসাবে শ্রদ্ধা করে বলিয়া কথিত হয়, যাহা সঠিকভাবে গ্রহণ করিলে অর্থ প্রকাশ করিবে যে, তাহারা কোন উচ্চতর সত্তাকে স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছিল"........।[৩৭] একই ভুল ধারণা তাহার শ্রমসাধ্য ব্যাখ্যার জন্য দায়ী যে, বানাতুল্লাহ অভিব্যক্তিটি "মোটামুটিভাবে আল্লাহ্র সঙ্গে তুলনীয় সত্তাসমূহ অর্থ প্রকাশ করে" অধিকতর গুরুত্বপূর্ণভাবে, সেই ভুল ধারণা যাহার উপর তাহার প্রধান ধারণার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহার প্রধান ধারণাটি ছিল, প্রাথমিকভাবে মহানবী ﷺ -এর ধর্মবিশ্বাস ছিল তাঁহার চাইতে "অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত সমসাময়িকগণ"-এর বিশ্বাস হইতে পৃথকীকরণের আযোগ্য শুধু একটি "অস্পষ্ট একত্ববাদ"।

চার ঃ সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রশ্নে ওয়াট-এর মতামত

"শয়তানী পংক্তিমালা ও বিরোধিতার সূত্রপাত সম্পর্কে ওয়াট তাহার আলোচনা সমাপ্ত করিয়া লক্ষ্য করেন যে, মহানবী ﷺ -এর মক্কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকা" এবং এই কারণে "বিদ্যমান প্রশ্নসমূহ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার জন্য তাহার ধর্মীয় সিদ্ধান্তসমূহের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল, যদিও তিনি ধর্মীয় দিকটিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন"। সুতরাং যদি কুরায়শ নেতৃবৃন্দের পক্ষ হইতে প্রস্তাব প্রদানের কাহিনী সত্য হয় তবে মহানবী ﷺ "নিশ্চয়ই তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহের রাজনৈতিক দিক এবং বিশেষভাবে শয়তানী পংক্তিমালার প্রচার ও পংক্তিমালার রহিতকরণ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন"। অনুরূপভাবে সূরাতুল কাফিরূন আবৃত্তি করার সময় তিনি জানিতেন, "কুরায়শদের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না যদি তাহারা তাঁহার ধর্ম প্রচারের বৈধতা স্বীকার না করে" এবং "কর্তৃত্ব ও প্রজ্ঞা সম্পর্কিত আরবীয় ধারণার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া" তাহাকে নেতৃস্থানীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে মানিয়া না লয়। ওয়াট মন্তব্য করেন, "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপনই সত্যিকারভাবে কুরায়শদের সক্রিয় বিরোধিতার সূত্রপাত এবং সূরাতুল কাফিরূন, যাহাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়, মুহাম্মাদ ﷺ -এর জন্য মক্কা বিজয় অপরিহার্য করিয়া তোলে"।[৬৮]

ইহা আরও একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মুহাম্মাদ ﷺ -এর বিরোধিতার সূত্রপাত নির্দেশক "শয়তানী পংক্তিমালা"র তথাকথিত প্রচার ও সেইগুলির রহিতকরণের তত্ত্বটি সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। উপরে যেমন দেখান হইয়াছে, ইহার ভিত্তি একগুচ্ছ বিভ্রান্তি ও অসঙ্গতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে ওয়াট ঐ তত্ত্বে শুধু মারগোলিয়থ-এর মতামত অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন যাহা, পূর্বে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যক্ত করে যে, মক্কাবাসীদের বিরোধিতার কারণসমূহের একটি ছিল, "রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতৃত্ব অপৃথকযোগ্য এবং তাহারা মুহাম্মাদ ﷺ -কে রাষ্ট্রপ্রধানরূপে দেখিতে প্রস্তুত ছিল না"।[৬৯] কিন্তু মারগোলিয়থ-কে যখন ঐ সতর্কতার দায়িত্ব সাধারণভাবে কুরায়শ নেতাদের উপর আরোপ করিতে দেখা যায়, তখন ওয়াট তাহার পালায় ইহাকে প্রধানত মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপর আরোপ করেন। ইহা করিতে যাইয়া তিনি আরও অসঙ্গতির অবতারণা করেন। যদি মহানবী ﷺ সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সমস্যাবলীর সঙ্গে জড়িত থাকিতেন এবং এইভাবে তাঁহার ধর্মীয় সিদ্ধান্তে রাজনৈতিক প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন হইতেন তবে তাঁহার ধর্মপ্রচারের শুরু হইতেই নিশ্চয়ই খুব সতর্কতার আশ্রয় লইতেন। বাস্তবিকই তিনি আল্লাহ কর্তৃক তাঁহার মনোনীত নবী ও দূত হিসাবে মনোনীত হইবার ঘোষণা দিয়া ধর্ম প্রচার আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঐ দাবি স্বয়ং কুরায়শ নেতাদের রাজনৈতিক চৈতন্য জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট ছিল।

প্রকৃতপক্ষে উৎসসমূহ হইতে দেখায় যে, তাহাদের তাত্ত্বিক আপত্তির অধিকাংশ ঐ দাবির বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছিল। ওয়াট বলেন, মহানবী ﷺ "শয়তানী পংক্তিমালা" প্রচারণার

রাজনৈতিক প্রয়োগ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। ইহার অর্থ এই যে, অনুমিতভাবে "শয়তানী পংক্তিমালা" প্রচার করার সময় তিনি অবশ্যই "তাহাদের দেব-দেবীদের" স্বীকৃতি দেওয়ার বিনিময়ে তাঁহার মর্যাদা সম্পর্কে তাহাদের কোন প্রকার স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার মর্যাদার এই প্রকার একটি স্বীকৃতি দেবীদেরকে তাঁহার তথাকথিত স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ততটাই পূর্বশর্ত ছিল যতটা ছিল তাহাদের এই স্বীকৃতি চাওয়ার। কারণ তাহাদের দেব-দেবীর জন্য তাঁহার স্বীকৃতি তাহাদের জন্য কোন গুরুত্ব বহন করে না এবং তাহারাও ইহা অর্জন করিতে যত্নবান হইবে না যদি না তাহারা যুগপৎভাবে সতর্ক হয় এবং স্বীকার করে যে, তাঁহার ঘোষণা গুরুত্ববহ এবং কর্তৃত্বসম্পন্ন। আপস-মীমাংসা ও চুক্তি তত্ত্বটি পরস্পরের দাবির এই ধরনের পারস্পরিক স্বীকৃতির পূর্ব ধারণা প্রদান করে। কিন্তু একই সময় ওয়াট কার্যত একই নিঃশ্বাসে একই বাক্যে বলেন যে, আয়াতসমূহ রহিতকরণের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে মহানবী ﷺ সচেতন ছিলেন এবং সূরাতুল কাফিরূন প্রচার করিয়াছিলেন। কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, কুরায়শগণ তাঁহার ধর্ম প্রচারের বৈধতা স্বীকার না করা পর্যন্ত অর্থাৎ তাহারা তাঁহাকে রাসূল ও রাজনৈতিক নেতা হিসাবে স্বীকার না করা পর্যন্ত সেখানে তাহাদের মধ্যে কোন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ওয়াট কি এই কথা বলিতে চাহেন যে, মহানবী ﷺ তথাকথিত আপস-মীমাংসা করার জন্য কোন পুরস্কার না পাইয়াই কি তাহা করিয়াছিলেন অথবা নবূওয়াতের প্রতি তাঁহার দাবি ত্যাগ করিয়াছিলেন অথবা কথিত আপস-মীমাংসাটি কি একতরফাভাবে আরোপিত শান্তির প্রস্তাব ছিল? ওয়াট পরিষ্কাররূপে তাহার দাবিতে অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি দেখিতে ব্যর্থ হন যে, মহানবী ﷺ কথিতভাবে শয়তানী পংক্তিসমূহ প্রচারে এবং সেইগুলি রহিতকরণের সময়ে তাঁহার ধর্ম প্রচারের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। বিরোধিতার জন্য দায়ী রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কিত তাঁহার পূর্বগামীর মতামতকে শয়তানী পংক্তিসমূহের কথিত কাহিনীর সম্পর্কে তাহার ব্যাখ্যা এবং বিরোধিতার সূত্রপাতকে সংযুক্ত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিতে যাইয়া ওয়াট পরোক্ষভাবে মহানবী ﷺ-এর পক্ষে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হওয়ার তত্ত্বের প্রতিধ্বনি করেন। এ কারণে মহানবী ﷺ-কে দিয়া তিনি একবার কুরায়শ নেতাদের সঙ্গে আপস-মীমাংসা করাইতেছেন, আবার এ কাজ করার রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে তাঁহার সতর্কতার কারণে তাঁহাকে দিয়াই তাহা রহিত করাইয়া দিতেছেন এবং পরিশেষে মন্তব্য করিতেছেন যে, মক্কা বিজয় ছিল রাজনৈতিক বিচার-বিবেচনার অনিবার্য ফল। ওয়াট এবং তাহার পূর্বগামীদের তৎপরতার পার্থক্য এই যে, সাধারণত তাহারা প্রত্যক্ষভাবে অভিযোগ করেন এবং ওয়াট ইহা করেন পরোক্ষভাবে এবং অযৌক্তিক মতবাদ ও সঙ্গতিবিহীন বর্ণনার সঙ্গে ইহাকে জড়িত করিয়া অনেকটা বিভ্রান্তিকরভাবে।

পাঁচ ঃ বিরোধিতার "উদ্দেশ্য" ও "প্রধান কারণ" সম্পর্কে ওয়াট-এর মতামত

মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুরায়শ নেতাদের বিরোধিতার "উদ্দেশ্য"-এর "প্রধান কারণ" সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে অসঙ্গতি খুবই প্রকট।[৪০] ওয়াট বলেন, "পৌত্তলিকতার উপর

আক্রমণের কারণে অর্থনৈতিক ভীতির তত্ত্ব বিস্মৃত হইয়া যাওয়া হয়"। কারণ মক্কার বাণিজ্য "এখন আর কা'বা ও অন্যান্য পবিত্র স্থান পরিদর্শনের উপর নির্ভরশীল নহে" এবং এই কারণে যে, "কুরআন বা অন্য কোন গ্রন্থে কা'বার পূজায় কোন আক্রমণ"-এর অতীত ইতিহাস নাই...। ইহা ছিল শুধু সম্পূরক ঘটনাবলী যাহা মক্কা বিজয়ের সময় পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়। "প্রতিমাগুলির প্রতি মূল আক্রমণ", ওয়াট স্মরণ করেন, "ছিল পার্শ্ববর্তী এলাকার নির্দিষ্ট মন্দিরসমূহে পূজার উপর একটি আক্রমণ" কিন্তু সেগুলি এত পর্যাপ্ত পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, তাহাদের পরিবর্জন মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটি সাধারণ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে।[৪১]

এখন বর্ণনাটি যে, কা'বাতে পূজার অর্থাৎ সেই স্থানের প্রতিমাগুলির উপর কোন আক্রমণের বর্ণনা কুরআন বা "অন্য কোথাও" বা অন্য কোন উৎসে নাই এবং ইহা ছিল শুধু সম্পূরক ঘটনা, যাহা মক্কা বিজয়ের সময় পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়াছিল—এই অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে অসত্য। সামান্যমাত্র সময় পূর্বে ওয়াট বর্ণনা করেন, সূরাতুল কাফিরূনের প্রচারের অর্থ ছিল "বহু ঈশ্বরবাদ হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা" এবং এই সময় হইতেই "বহু ঈশ্বরবাদের বাতিলকরণ কঠোর শর্তে সূত্রবদ্ধ করা হয়"। এই "কঠোর" বাতিলকরণকে শুধু আরবের অন্য কোন স্থানে বা ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কিন্তু মক্কা বা কা'বার জন্য নহে, এমন কথা পৌত্তলিকতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার জন্য গভীরভাবে কেহই বলিবে না। সত্য যে, কুরআনে পৌত্তলিকতার নিন্দাজ্ঞাপন প্রসঙ্গে কা'বা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নাই এবং সেখানে অন্যান্য স্থানের মন্দিরগুলিকেও নাম ধরিয়া উল্লেখ করা হয় নাই এবং "অন্য কোথাও" বা অন্য উৎস সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, বর্ণনাসমূহ কা'বার প্রতিমাসমূহের উপর আক্রমণের বিবরণে পরিপূর্ণ। এমনকি আয-যুহরী ও 'উরওয়ার বর্ণনাসমূহ, যাহা ওয়াট নিজে উদ্ধৃত করিয়াছেন, পৌত্তলিকতার উপর আপসহীন আক্রমণ সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। ইহা সুবিদিত যে, মক্কা বিজয়ের সময় কা'বাগৃহের প্রতিমাসমূহ স্থানান্তরিত ও ধ্বংসকৃত হয়। এইভাবে অবিসম্বাদী ঘটনাসমূহকে অস্বীকার করিয়াই কেবল কোন ব্যক্তি একটি প্রকটভাবে ভ্রমাত্মক বিবরণের ঝুঁকি নিতে পারে যে, ইহা ছিল কেবল কা'বাতে পূজার "সম্পূরক ঘটনাবলী, "যাহা মক্কা বিজয়ের সময় পরিবর্তিত ও সংশোধিত হইয়াছিল"।

দ্বিতীয়ত, মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্য আরবের "কা'বা এবং অন্যান্য পবিত্র স্থান" পরিদর্শনের উপর নির্ভরশীল ছিল না এবং অন্যান্য পবিত্র স্থানগুলি কোনভাবেই এত পর্যাপ্ত পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, সেইগুলির পরিবজর্ন মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটি সাধারণ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে– একথা বলিয়া ওয়াট তাহার পূর্ববর্তী তত্ত্বের সরাসরি বিরোধিতা করিতেছেন। পূর্ববর্তী তত্ত্বটি ছিল, "আল-লাতের মন্দিরসমূহ (আত-তাইফ) হইতে স্বীকৃতি প্রত্যাহারকরণ এভাবে না হয় অন্যভাবে কুরায়শ ব্যবসায়ীদের ব্যবসার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি তাহাদের ক্রোধকে উদ্দীপ্ত করিয়াছিল। ওয়াট অসঙ্গতিটি চিহ্নিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই কারণে তিনি দ্রুততার সঙ্গে যুক্ত করেন, ইহা "প্রায় নিশ্চিতরূপে সত্য" যে,

আক্রমণে জড়িত "ঐ সকল নির্দিষ্ট ব্যক্তি, নির্দিষ্ট মন্দিরের সহিত যাহাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল চরমভাবে বিরক্ত হয়" এবং তাহাদের ন্যায় অন্য দলও ছিল "যাহাদের বিশেষ স্বার্থ" মহানবী ﷺ -এর শিক্ষার বিশেষ দফা দ্বারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।[৪২]

অবশ্যই সেখানে "অন্যান্য দল" ছিল যাহাদের বিশেষ স্বার্থ মহানবী ﷺ-এর শিক্ষা দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হইয়াছিল; কিন্তু তাহা একই বিষয় নয় যাহা ইতোপূর্বে ওয়াট-এর তত্ত্বে উপস্থাপিত হইয়াছিল। ইহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই, কেন "বিশেষ ব্যক্তিদের" বিরক্তি "যাহাদের আক্রমণের সঙ্গে জড়িত বিশেষ মন্দিরগুলির সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল" সমস্ত কুরায়শ নেতাকে একটি সাধারণ এবং সংগঠিত বিরোধিতার দিকে পরিচালিত করিবে বিশেষভাবে সেই সময়ে জোর দিয়া বলা হইতেছে যে, ঐ সকল বিশেষ মন্দির কোনভাবেই এতটা পর্যাপ্ত পরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যে, সেগুলির পরিবর্জন মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্যকে একটি সাধারণ ধ্বংসের দিকে লইয়া যাইবে। ইহাও বোধগম্য নয় যে, কেন তথাকথিত বিশেষ ব্যক্তিগণ বিরক্ত হইবে যদি, যেমন গুরুত্ব সহকারে ইহা বলা হইয়াছে, মক্কাবাসীদের ব্যবসা এই সময়ে কা'বাগৃহ ও অন্যান্য মন্দিরে যাযাবরদের পরিদর্শনের উপর নির্ভরশীল না থাকে"। প্রকৃতপক্ষে "বিশেষ ব্যক্তিগণ" এবং "অন্যান্য দল" সম্পর্কে এই বিবরণ ওয়াট-এর পক্ষে তাহার পূর্ববর্তী ও বর্তমান মন্তব্যের মধ্যকার অসঙ্গতি হইতে রক্ষা পাওয়ার শুধু একটি দুর্বল প্রচেষ্টা। এই শেষোক্তগুলি ইতিপূর্বে এত শ্রমসাধ্যভাবে গঠিত তত্ত্বের সঙ্গে পরিষ্কারভাবে বিরুদ্ধতা প্রকাশ করে। তত্ত্বটি এই ছিল যে, অন্যান্য মন্দির হইতে "স্বীকৃতি প্রত্যাহারকরণ" সামগ্রিকভাবে কুরায়শ নেতাদের বিরোধিতার সূত্রপাত করে।

ইতিপূর্বে প্রদত্ত তাহার একটি তত্ত্বের দুর্বলতা ও অসমর্থনীয়তার বাস্তব স্বীকৃতি "বিরোধিতার প্রধান কারণসমূহ" সম্পর্কে তিনি চূড়ান্তভাবে যাহা বলেন তাহাতে নিহিত রহিয়াছে ইতিপূর্বে তিনি এগুলি রাজনৈতিক ছিল বলিয়া বলিয়াছিলেন। আরও একবার Margoliouth-এর মতবাদকে প্রতিফলিত করিয়া ওয়াট এখানে বলেন, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ "দেখিল নবী হওয়া সম্পর্কে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাবি গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা হইলে ইহার রাজনৈতিক প্রভাব থাকিবে"। কারণ আরব ধারণা অনুসারে "গোত্র বা বংশের শাসন তাঁহার হাতে থাকা উচিত যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রজ্ঞাশীল"।[৪৩]

কুরায়শ নেতারা যদি "মুহাম্মাদ ﷺ-এর সতর্কবাণী"-তে আস্থা স্থাপন করিত, ওয়াট বলেন, এবং তাহার পর জানিতে চাহিত ইহার আলোকে কিভাবে তাহাদের কার্যপ্রণালী পরিচালিত হইবে তবে মুহাম্মাদ ﷺ ব্যতীত তাহাদিগকে সুপরামর্শ দেওয়ার জন্য আর কে উত্তম ব্যক্তি ছিলেন? ওয়াট আরও বলেন, কুরায়শ নেতাগণ "কুরআনের শিক্ষা" ও তাহাদের বাণিজ্যিক তৎপরতার "মধ্যকার বিরোধিতা"-ও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিল। যেহেতু "একেবারে শুরু হইতেই সেখানে ধন-সম্পদের প্রতি তাহাদের ব্যক্তিতান্ত্রিক মনোভাবের সমালোচনা ছিল" তাহারা হয়ত

অনুভব করিয়া থাকিবে, "এসব নৈতিক ভাবধারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে যথেষ্ট রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান করিবে"। কেহ কেহ ইহাও "ভাবিয়া থাকিতে পারে যে, ইহা ছিল সবান্ধব মাখযূম ও হিলফুল-ফুযূলের মধ্যে নীতি সম্পর্কে পুরাতন বিতর্কের পুনরারম্ভ"।[৪৪]

এইভাবে কি পরিশেষে ওয়াট "বিরোধিতার প্রধান কারণসমূহ"-কে আহলাফ ও কুরায়শদের হিলফুল-ফুযূল দলসমূহের মধ্যে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কিত তাহার প্রিয় তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত করিতে চাহিয়াছেন? কুরায়শদের দুইটি দলের মধ্যে তীব্র বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঐ তত্ত্বের এবং ঐ প্রসঙ্গে ওয়াট-এর আরও মতামতের যে, মহানবী ﷺ-তাঁহার যৌবনকালে সর্বাপেক্ষা লাভজনক বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, অসমর্থনীয়তা ইতোপূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।[৪৫] ইহাও দেখান হইয়াছে যে, কুরায়শ নেতাদের কিছু সংখ্যক মহানবী ﷺ -এর উত্থানকে নেতৃত্বের জন্য আন্ত-বংশীয় প্রতিযোগিতার আলোকে পর্যবেক্ষণ করে এবং ইহাও দেখান হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারকে ঐ আন্ত-বংশীয় প্রতিযোগিতার নিরিখে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না এবং তিনিও ঐ ধরনের চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন নাই।[৪৬]

ইসলামের অভ্যুদয় ও ইহার প্রতি কুরায়শদের বিরোধিতার অন্তর্নিহিত বাস্তব কারণের ওয়াট ও প্রাচ্যবিদদের প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি কুরায়শ নেতাদের কিছু সংখ্যকের অযৌক্তিক মতামতের কম বা বেশি একটি সংক্ষিপ্ত অথবা সম্প্রসারিত রূপ। আবার ঐ প্রশ্নের আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া এখানে আমরা শুধু উল্লেখ করিব যে, ওয়াট-এর সর্বশেষে উল্লিখিত বিবরণসমূহ বিরোধিতার সূত্রপাত সম্পর্কে তাহার ইতোপূর্বে প্রদত্ত তত্ত্বকে কার্যকরভাবে বাতিল করিয়া দেয়।

ওয়াট এখানে স্বীকার করেন যে, মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচার নবূওয়াতের একটি দাবিসহ শুরু হইয়াছিল। পরে আরও উপলব্ধ হইয়াছে, ইহার রাজনৈতিক প্রভাব ছিল যাহা কুরায়শদের দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না এবং তাহারাও দেখিতে ব্যর্থ হয় নাই। ওয়াট এখানে আরও স্বীকার করেন যে, পরলোকের জীবন এবং বিশেভাবে শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সতর্কবাণী ও ধনসম্পদের প্রতি কুরায়শ নেতাদের 'ব্যক্তিতান্ত্রিক' ও স্বার্থপর মনোবৃত্তির প্রতি তীব্র ঘৃণা একবারে শুরু হইতেই কুরআনের বার্তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। কুরআনের প্রাথমিক বার্তাসমূহের আলোচনায়ও তিনি ইহার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এইভাবে ওয়াট-এর নিজের স্বীকৃতি দ্বারা "প্রধান কারণসমূহ" যাহা তিনি এখন বলেন, কুরায়শ নেতাদের মনোভাব নির্ধারণ করিত, মহানবী ﷺ ধর্মপ্রচারের শুরু হইতেই বিদ্যমান ছিলেন। সুতরাং বিরোধিতার পটভূমিকা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে "শয়তানী পংক্তিসমূহ"-এর সন্দেহজনক কাহিনীর জন্য, যাহাতে একটি আপস-মীমাংসা প্রতিষ্ঠিত এবং কিছু সংখ্যক অন্যান্য মন্দিরের দেবীদের জন্য স্বীকৃতি অর্জিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং ঐসব আয়াতসমূহের অনুমতি রহিতকরণের ঘটনার জন্য, যাহাতে মহানবী ﷺ কর্তৃক একটি আপস-মীমাংসা একতরফাভাবে বাতিলকৃত ও শুধু অন্যান্য মন্দির হইতে স্বীকৃতি

প্রত্যাহৃত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে, অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। ঐ তত্ত্বটি এবং ওয়াট-এর 'উদ্দেশ্যসমূহ' ও "বিরোধিতার প্রধান কারণসমূহ" চিহ্নিতকরণ পরস্পর বিরোধী।

ইতোপূর্বে যেরূপ বলা হইয়াছে, শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে সতর্কবাণীর প্রচার এবং কুরআনের প্রাথমিক আয়াতসমূহের মূল পাঠের মাধ্যমে কুরায়শ নেতাগণকে প্রতিমা পূজা পরিত্যাগ করিতে ও একত্ববাদের আদর্শের সহিত গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট হইতে আহ্বান জানান হয়। এইভাবে 'উরওয়া, আয-যুহরী ও ইবন ইসহাকের বর্ণনা যে "নামোল্লেখ" অর্থাৎ প্রতিমাগুলির বিরুদ্ধে নিন্দাজ্ঞাপন বিরোধিতার সূত্রপাত করিয়াছিল, ইহা বাস্তবভাবে সত্য। তাহাদের এইসব বর্ণনায় একদিকে প্রকাশ্য ও সাধারণভাবে ধর্ম প্রচারের ও অন্যদিকে সংগঠিত বিরোধিতার উদ্ভব সম্পর্কে উল্লেখ রহিয়াছে। 'উরওয়ার বর্ণনা যে, তাইফের কিছু সংখ্যক বিত্তশালী ব্যক্তি মহানবী -এর বিরুদ্ধে বিরোধিতা সংগঠন করিতে আসিয়াছিল, সংগঠিত বিরোধিতা সম্পর্কিত একটি অনুঘটনা হইতে পারে অথবা ইহা রাবী'আর পুত্রদ্বয় উৎবা ও শায়বার ন্যায় ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি উল্লেখ হইতে পারে, তাইফে যাহাদের ভূ-সম্পত্তি ছিল এবং যাহারা মহানবী -এর বিরোধী দলের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিল। যাহা হউক, উপরে উল্লিখিত লোকদেরকেই ইঙ্গিত প্রদান করে না যে, "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন" তথাকথিত শয়তানী পংক্তিসমূহের এবং উহাদের রহিতকরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ওয়াট কল্পিত কাহিনীটিকে আঁকড়াইয়া ধরেন এবং একদিকে শয়তানী পংক্তিসমূহের কথিত কাহিনী এবং অন্যদিকে তাহার নিজস্ব ভ্রান্ত অনুমানের যে, মহানবী -এর প্রাথমিক শিক্ষাতে দেবীদের সহনশীলতার সহিত সঙ্গতিপূর্ণ অস্পষ্ট ও ধূমানুকার একত্ববাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সত্যতা প্রমাণের জন্য 'উরওয়াসহ লেখকদের স্পষ্ট বিবরণের বিরুদ্ধে ইহাকে "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন"-এর সঙ্গে সংযুক্ত করেন। প্রকৃতপক্ষে ওয়াট কর্তৃক বেল-এর নিকট হইতে গৃহীত এই শেষের মতটিকে বজায় রাখিতে হইবে যে, ওয়াট বিরোধিতার সূত্রপাত সম্পর্কে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনার পরিবর্তে 'উরওয়ার বর্ণনাটি গ্রহণ করেন এবং "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন" অভিব্যক্তিটিকে শয়তানী পংক্তিসমূহের কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেন ও পরিশেষে মন্তব্য করেন যে, ঐ আয়াতের কথিত "রহিতকরণ" তাইফ ও অন্যান্য স্থানের মন্দিরের পূজার কেবল নিন্দাজ্ঞাপন বুঝাইত। কিন্তু উপরে যেরূপ দেখান হইয়াছে, মহানবী -এর প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাস শুধু একটি অস্পষ্ট একত্ববাদ হওয়ার তত্ত্ব, মহানবী কর্তৃক কা'বার প্রতিমাগুলির অনুমিত নিন্দাজ্ঞাপন না করা সত্ত্বেও কুরায়শ নেতাগণ কর্তৃক অন্যান্য স্থানের মন্দিরের প্রতিমারগুলির জন্য স্বীকৃতি প্রার্থনা এবং ঠিক সেই সময়ে, যখন অন্যান্য স্থানের মন্দিরগুলির পরিবর্জন মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষতিসাধন করার জন্য সম্ভাবনাপূর্ণ ছিল না, শুধু সেগুলির প্রতিমা হইতে স্বীকৃতি প্রত্যাহারের কারণে তাঁহার প্রতি বিমুখ হওয়ার মতবাদ বিপুল পরিমাণে বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি সম্বলিত স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে অবাস্তব বিবৃতিমাত্র।

বিরোধিতার প্রধান কারণ ও উদ্দেশ্য ওয়াট সম্পর্কে তাহার আলোচনা সমাপ্ত করিতে যাইয়া পরিশেষে বলেন, "বিরোধিতার এইসব যুক্তিকে" অর্থাৎ কুরায়শ নেতাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উপলব্ধিসমূহকে "সর্বাগ্রে স্থান দেওয়ার" দ্বারা তিনি "বুঝাইতে চাহেন না যে, পৌত্তলিকতার উপর কুরআনের আক্রমণ কোন বিরোধিতার সম্মুখীন হয় নাই।"[৪৭] তিনি ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, কুরায়শ নেতাদের হাতে "পৌত্তলিকতার স্বপক্ষে উপস্থাপিত করার মত কোন তাত্ত্বিক প্রতিরোধ ছিল না"। কিন্তু তাহারা অন্তর্নিহিত সংরক্ষণশীলতা, "তাহাদের পূর্বপুরুষদের জীবনধারার" প্রতি অনুরক্তি এবং ইহার ফলে "পরিবর্তন"-এর প্রতি বিতৃষ্ণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এখানে তাহারা বিশেষভাবে উত্তেজিত হয় এই দাবি দ্বারা যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ দোযখে রহিয়াছে।[৪৮]

ওয়াট আরও বলেন, কুরায়শ নেতাদের কিছু সংখ্যক "ডাহা ব্যক্তিতান্ত্রিক" হইলেও অন্যরা ছিল "অধিকতর সংরক্ষণশীল" এবং "দলের প্রতি অনুরক্ত"। এই শেষোক্তগণ ওয়াট-এর মতে, ইসলামের প্রবণতায় সমগ্র সমাজব্যবস্থার ক্ষতিসাধক "পরিবারের তীব্র বিভেদ সৃষ্টিকারী" আন্দোলনরূপে দেখিয়াছিল। "বাস্তবিকই" ওয়াট জোর দিয়া বলেন, "এক অর্থে ইহা তাহাই করিতেছিল"। তিনি এই বলিয়া সমাপ্তি টানেন যে, মহানবী ﷺ-এর সম্মুখবর্তী "অসুস্থতার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক" লক্ষণসমূহ ছিল। অতএব তাঁহার বাণী "অপরিহার্যভাবে ধর্মীয়" হইলেও অনিবার্যভাবে ইহা "অন্যান্য দিকসমূহকে প্রভাবিত করিয়াছিল এবং পরিণামে বিরোধিতার বহু দিকের উদ্ভব ঘটিয়াছিল"।[৪৯]

অবশ্যই মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে অবিশ্বাসীদের বিরোধিতার কারণ ও প্রকৃতি, যেরূপ পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে[৫০] বহুমুখী ছিল, যেমন–সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। এই ঘটনাটি আরও একবার প্রধানত বা অনিবার্যভাবে বিরোধিতার শুরু ও ক্রমবৃদ্ধিকে শয়তানী পংক্তিসমূহের কাঙ্ক্ষিত কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করার অযৌক্তিকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে, যদনুসারে ওয়াট বলেন, কুরায়শ নেতাগণ শুধু অন্যান্য মন্দিরের প্রতিমাগুলির পূজার একটি স্বীকৃতি চাহিয়াছিল এবং তাহাদের ক্রোধ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কারণ ঐ স্বীকৃতি প্রত্যাহারকৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, ওয়াট এখানে বলেন তিনি "ইঙ্গিত করেন না যে, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কুরআনের আক্রমণ কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় নাই"। তিনি "পৌত্তলিকতার উপর কুরআনের আক্রমণ" বলিতে এখানে কি বুঝাইতে চাহেন? তিনি কি বলিতে চাহেন যে, ইহার আক্রমণ ছিল শুধু স্বীকৃতভাবে অগুরুত্বপূর্ণ মন্দিরসমূহ এবং মক্কার বাহিরে তাহাদের প্রতিমা বা সাধারণভাবে পৌত্তলিকতার উপর, যাহা কুরায়শ নেতাদের রক্ষণশীলতা ও "পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা"-কে নাড়া দিয়াছিল? পরিষ্কারভাবে ওয়াট-এর ইঙ্গিত এই শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি। সুতরাং তাহার এই বিবরণটি তিনি পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় যে বিবরণ দিয়াছেন তাহার বিপরীত। উক্ত বিবরণটি ছিল, "কুরআনে

বা অন্য কোথাও কা'বার পূজার উপর আক্রমণের কোন বিবরণ নাই"। "পূর্বপুরুষদের জীবনধারা" অভিব্যক্তিটির অর্থের ব্যাপারেও তাঁহার বক্তব্য অস্পষ্ট। এই অভিব্যক্তিটি, যাহা কুরআন দেখায় যে, মহানবী ﷺ-এর বিরোধিতা করিতে অবিশ্বাসিগণ প্রায়ই ব্যবহার করিত, শুধু তাহাদের 'রক্ষণশীলতা" বা তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধা বা 'পরিবর্তন'-এর প্রতি তাহাদের বিতৃষ্ণার প্রতি ইঙ্গিত করে না। ইহা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে তাহাদের পূর্বপুরুষদের ধর্ম ও পূজাপদ্ধতি বুঝায় যাহা কুরায়শ নেতাগণ বজায় রাখিতে চাহিয়াছিল। তাহারা শুধু সাধারণভাবে তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিতেছিল না, প্রকৃতপক্ষে তাহারা তাহাদের প্রতিমা পূজার সমর্থনে তাহাদের পূর্বপুরুষদের কর্তৃত্ব কামনা করিতেছিল। সর্বোপরি তাহারা পরলোক ও শেষ বিচারের দিনে বিশ্বাস করিত না। সুতরাং বিবরণটি যে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ দোযখে ছিল, ইহার সরল অর্থে খুব কম ক্ষেত্রে তাহাদিগকে গভীরভাবে সাড়া দেয়।

দ্বিতীয়ত, ওয়াট বলেন, যদিও কুরায়শ নেতাদের "কিছু সংখ্যক" ছিল "ডাহা ব্যক্তিতান্ত্রিক", অন্যেরা ছিল তখনও দলের আদর্শের প্রতি নিবেদিত এবং তাহারা ইসলামে পরিবারসমূহকে ভাঙিয়া ফেলিবার ও "সমগ্র সমাজ ব্যবস্থার ক্ষতিসাধক" একটি আন্দোলন দেখিতে পাইয়াছিল। আমরা এখানে শেষোক্ত বর্ণনাটির দোষ-গুণ আলোচনা করিতে চাই না। এখানে যাহা উল্লেখ করা প্রয়োজন ও প্রাসঙ্গিক তাহা হইতেছে, ওয়াট ইতোপূর্বে ইহা দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, সেখানে ব্যক্তিতন্ত্রবাদের উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ক্রমবৃদ্ধি ও ইহার ফলে সামাজিক সংহতিতে অবনতি বিদ্যমান ছিল যাহা ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক সংহতির একটি নূতন ধারণা প্রবর্তনের পথকে সুগম করে। কিন্তু ওয়াট এখানে আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, শুধু "কিছু সংখ্যক" ব্যক্তি ডাহা ব্যক্তিতান্ত্রিক ছিল এবং কুরায়শদের জনসাধারণ ছিল রক্ষণশীল ও দলীয় আনুগত্যের আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি এখানে গুরুত্ব সহকারে বলেন, "আরবগণ স্বভাবে বা জন্মগতভাবে রক্ষণশীল" ছিল।[৫১] এবং ইহা ছিল এই অন্তর্নিহিত রক্ষণশীলতা, ওয়াট আমাদিগকে স্মরণ করান, "এই ঐতিহ্যের প্রতি ভক্তি" যাহা ইসলামের বিরুদ্ধে বিরোধিতার মূলে নিহিত রহিয়াছে। ব্যক্তিতন্ত্রবাদের ক্রমবৃদ্ধি এবং অনুবর্তী সামাজিক সংহতির অবনতি সম্পর্কে ওয়াট ইতোপূর্বে যাহা বলিয়াছিলেন এখানে তিনি তাহা পরিষ্কারভাবে অস্বীকার করেন। এখানে তিনি পরোক্ষভাবে স্বীকার করেন যে, ব্যক্তিতন্ত্রবাদ যাহার সম্পর্কে তিনি ইতোপূর্বে বক্তব্য রাখেন তাহা বাস্তবে ঐ সময়ের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর উপাদান ছিল না। আবার এই স্থলে ইহা বলা হইয়াছে যে, ইসলাম পরিবারসমূহে ভাঙ্গন ধরাইতেছিল এবং সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করিতেছিল। কিন্তু ইতোপূর্বে ইহা বলা হইয়াছিল যে, ব্যক্তিতন্ত্রবাদের উপর প্রভাবশালী সামাজিক সংহতি এবং ঐতিহ্যবাহী নিরাপত্তা পদ্ধতির ভাঙন ইসলামের উত্থানের জন্য আনুকূল্য করিতেছিল। এইভাবে যেগুলিকে ইতোপূর্বে কারণ ও পটভূমি হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল এখন সেগুলিকে প্রভাব ও ফলাফল হিসাবে বর্ণনা করা হইতেছে। পরিষ্কারভাবে বিষয়টি সম্পর্কে তাহার পর্যালোচনা বিভ্রান্তিকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ উভয়ই।

মোটকথা, বিরোধিতার সূত্রপাত সম্পর্কে ওয়াট-এর তত্ত্ব বিশেষভাবে মূর্তিসমূহের উল্লেখ সম্পর্কে 'উরওয়ার বক্তব্যকে শয়তানী পংক্তিসমূহের কল্পিত কাহিনীর সংযুক্তিকরণ অযৌক্তিক। কারণ ঃ

১। তর্কের ভিত্তি যে, মহানবী ﷺ-এর প্রাথমিক ধর্মবিশ্বাসে দেব-দেবীর পূজার প্রতি সহনশীল একটি অস্পষ্ট একত্ববাদ অন্তর্ভুক্ত ছিল, সত্য নয়। কেননা ইহার ভিত্তি হইল ঃ (ক) এমনকি মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে সৃষ্টিকর্তা ও সার্বভৌম অধিপতি হিসাবে আল্লাহ সম্পর্কিত ধারণা আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এই তথ্য সম্পর্কে একটি অসম্পূর্ণ সচেতনতা এবং (খ) কুরআনের প্রাথমিক যুগের একটি আয়াতের প্রমাদপূর্ণ নির্বাচন ও ব্যাখ্যার উপর।

২। তত্ত্বটি এমনকি শয়তানী পংক্তিসমূহের কথিত কাহিনীরও মূলনীতি বিরুদ্ধ। কারণ কাহিনীটির সবগুলি সংস্করণ অনুসারে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ও মহানবী ﷺ-এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত আপস-মীমাংসাটি তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু হইবার পর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, পূর্বে নয়।

৩। তত্ত্বটি সাধারণভাবে অযৌক্তিক, কারণ মহানবী ﷺ দেব-দেবীকে অস্বীকার করিবার পূর্বে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের ও অন্যদের দেব-দেবীর জন্য তাঁহার স্বীকৃতি লাভের চেষ্টা করিত না বা মহানবী ﷺ-ও তাঁহার স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাহাদের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করিতেন না।

৪। এই ব্যাখ্যাটি যে, মক্কার কিছু সংখ্যক কুরায়শ নেতা, যাহাদের তাইফের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ঐ স্থানের দেব-দেবীর এবং অন্যান্য স্থানের দুইটি মন্দিরের স্বীকৃতি অর্জন করার চেষ্টা করে এবং তাহারাই ঐসব দেব-দেবী হইতে মহানবী ﷺ-এর স্বীকৃতি প্রত্যাহারের পর তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করে, অনুরূপভাবে অযৌক্তিক। কারণ ইহা ব্যাখ্যা করা হয় নাই যে, কিভাবে ঐসব দেব-দেবীর নিকট হইতে স্বীকৃতির কথিত প্রত্যাহারকরণ ঐসব স্থানের কুরায়শ নেতাদের বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিবে যদি না এই ধরনের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া প্রতিমাগুলির অস্বীকৃতির ফল এ যাবৎ মক্কায় অনুভূত না হইয়া থাকে। মোটের উপর না মক্কার না অন্যান্য স্থানের বাণিজ্যিক তৎপরতা, শুধু তথাকার দেব-দেবীকে মহানবী ﷺ স্বীকৃতিদানের পর শুরু হইয়াছিল।

৫। তত্ত্বটি ওয়াট-এর অন্য একটি বিবরণের সহিতও অসঙ্গতিপূর্ণ যে, মক্কার ব্যবসা-বাণিজ্য কা'বা ও অন্যান্য স্থানের মন্দিরের যাযাবরদের পরিদর্শনের উপর নির্ভরশীল ছিল না।

৬। ইহা মক্কাবাসীদের বিরোধিতার পশ্চাতে "প্রধান কারণ" এবং উদ্দেশ্য হিসাবে সর্বশেষে যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ, যেমন নবূওয়াতের দাবির রাজনৈতিক গুরুত্ব ও ধন-সম্পদের প্রতি কুরায়শ নেতাদের ব্যক্তিতান্ত্রিক ও স্বার্থপরতাপূর্ণ মনোভাবের উপর আক্রমণ। কারণ ওয়াট-এর নিজের স্বীকৃতিতে এই প্রধান কারণ সমূহ মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভ

হইতেই সেখানে বিদ্যমান ছিল এবং দেব-দেবীর প্রতি স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের প্রশ্ন বিবেচনা ব্যতিরেকেই এইগুলি তাহাদের বিরোধিতার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল।

৭। তত্ত্বটি 'উরওয়া, আয-যুহরী ও ইবন ইসহাকের বর্ণনার বিপরীত, যাহাদের সকলেই বিরোধিতার কারণ "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন" বলার সময় একদিকে মহানবী ﷺ -এর স্বাধীন ও প্রকাশ্যভাবে ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভ এবং অন্যদিকে তাঁহার বিরুদ্ধে সংগঠিত বিরোধিতার উদ্ভব সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তাহাদের কেহই "প্রতিমাগুলির নিন্দাজ্ঞাপন"-কে শয়তানী পংক্তিসমূহের কল্পিত কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত করেন না।

অনুবাদ ঃ মোঃ আবু তাহের

তথ্যনির্দেশিকা

১. Muir, পূ. গ্র., তৃতীয় সং., ৬১।

২. Muir, পূ. গ্র., তৃতীয় সং., পৃ. ৬১।

৩. Margoliouth, পূ. গ্র., পৃ. ১১৯-১২০; পরোক্ষ উল্লেখটি পরিষ্কাররূপে সূরা ১০৬ সম্পর্কে।

৪. ঐ, পৃ. ১২০ -১২১।

৫. ঐ, পৃ. ১৪৪।

৬. উপরে দ্র. অধ্যায় ২৩।

৭. Supra, pp. ৬৮৩-৬৯৫। আরও দেখুন Infra, pp. ৭২৮-৭৩২ মূল গ্রন্থের।

৮. আত-তাবারী, তারীখ, ২য় খ., ৩২৮-৩২৯ (১/১১৮০-১১৮১)।

৯. Watt, M, at M., ১০০-১০১। আত-তাবারী কর্তৃক প্রদত্ত মূল পাঠটি নিম্নরূপ ঃ

حدثنا على بن نصر بن على الجهضمى وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال على بن نصر حدثنا عبد الصمد بعن عبد الوارث وقال عبد الوارث حدثنى ابى قال حدثنا ابان العطار قال حدثنا هشام بن عروة انه كتب الى عبد الملك بن مروان اما بعد فانه يعنى رسول الله ﷺ لما دعا قومه لما بعثه الله من الهدى والنور الذى انزل عليه لم يعدوا منه اول ما دعاهم وكانوا يسمعون له حتى ذكر طواغيتهم وقدم ناس من الطائف من قريش لهم اموال انكروا ذلك عليه واشتدوا عليه وكرهوا ما قال لهم واغروا به من اطاعهم فانصفق عنه عامة الناس فتركوه الا من حفظه الله

منهم وهم قليل فمكث بذلك ما قدر الله ان يمكث ثم انصرف رؤسهم بان يقصوا من تبعوا عن دين الله من ابنائهم واحواتهم وقبائلهم فكانت قصه شديدة الزلزال على من اتبع رسول الله ﷺ من اهل الاسلام فافتتن من الفتن وعصم الله منهم من شاء فلما فعل ذالك بالمسلمين امرهم رسول الله ﷺ ان يخرجوا الى الحبشة وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشى لا يظلم احد بارضه وكان يثنى عليه مع ذالك صلاح وكانت ارض الحبشة متجر القريش يتجرون فيها يجدون فيها رفاغا من الرزق وامنا ومتجرا حسنا فامرهم بها رسول الله ﷺ فذهب اليها عامتهم لما قهروا بمكة وخاف عليهم الفتن ومكث هو فلم يرح فمكث بعد ذلك سنوات يشتدون على من اسلم منهم ثم انه فشا الاسلام فيها ودخل رجال من اشرافهم .

১০. Watt, M, at M., ১০১।

১১. Watt, M. at M., ১০১। তিনি পরবর্তী কালে উল্লেখ করেন যে, আল-লাত, আল-উযযা ও মানাত যথাক্রমে তাইফ, নাখলা ও কুদায়দের "প্রভাবশালী দেব-দেবী" ছিল।

১২. Supra. অধ্যায় ২৩। বিশেষভাবে দেখুন পৃ. ৫৬৯-৫৮২ মূল গ্রন্থ।

১৩. উরওয়ার শব্দগুলি হইতেছে ঃ ...... قَدِمَ نَاسٌ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُمْ اَمْوَالٌ

১৪. Infra, পৃ. ৭২৬-৭২৭।

১৫. Watt, M. at. M., পৃ. ১০১।

১৬. উপরে দ্র., অধ্যায় ২৯।

১৭. Watt, পূ.গ্র., পৃ. ১০১।

১৮. ঐ গ্রন্থ।

১৯. ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১০৩-১০৪।

২০. ঐ, পৃ. ১০৪।

২১. ঐ, ১০৫।

২২. ঐ, ১০৫-১০৬।

২৩. ঐ, ১০৬-১০৭।

২৪. Supra, pp. পৃ. ৭৩৪-৭৩৬ মূল গ্রন্থ।

২৫. Supra, অধ্যায় ৯।

২৬. Watt, M. at. M., পৃ. ১০৭।

২৭. ঐ গ্রন্থ।

২৮. ঐ গ্রন্থ।

২৯. ঐ গ্রন্থ, ১০৮।

৩০. ঐ, ১০৮-১০৯।

৩১. Supra, pp. পৃ. ৯৬১-৯৭৬ মূল গ্রন্থ।

৩২. Watt, পৃ.গ্র., পৃ. ১০৭।

৩৩. দেখুন, উদাহরণের জন্য ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ২খ., ১৭৯।

৩৪. নিম্নে দ্র., মূল পাঠ।

৩৫. Watt, পৃ.গ্র., পৃ. ১০৭, ১০৯।

৩৬. Watt, Muhammad's Mecca, এডিন বার্গ, ১৯৮৮, পৃ. ভূমিকা।

৩৭. Watt, M.at M., ১০৮।

৩৮. ঐ, পৃ. ১০৯।

৩৯. Supra, pp. পৃ. ৭১৬-৭১৭ মূল গ্রন্থ।

৪০. Watt, M. at M. ,১৩৩-১৩৬।

৪১. ঐ, ১৩৪।

৪২. ঐ গ্রন্থ।

৪৩. ঐ, গ্রন্থ, ১৩৪-১৩৫।

৪৪. ঐ, ১৩৫।

৪৫. Supra, Char, Ix, আরও পৃ. ২৩৬-২৩৭।

৪৬. Supra, Chap. xxiv এবং পৃ. ৬১৮-৬১৯ মূল গ্রন্থ।

৪৭. Watt, M. at. M., ১৩৫।

৪৮. Watt, M. at. M., ১৩৫।

৪৯. Watt, M. at. M., ১৩৬।

৫০. Supra ch. xxv.

৫১. Watt, M. at W., পৃ. ১৩৫।

বত্রিশতম অধ্যায়

বিরোধিতার বিস্তৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণ

এক ঃ মুইর ও মারগোলিয়থ-এর মতামত

মক্কাবাসীদের বিরোধিতার বিস্তৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে মুইর-এর মতামতসমূহ উৎসসমূহের সঙ্গে আরও কম সঙ্গতিপূর্ণ যদিও তিনি মহানবী ﷺ-কে হত্যা করার জন্য কুরায়শদের উদ্যোগসমূহকে খাট করিয়া দেখেন। তিনি বলেন, অত্যাচারের পরিমাণ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ সকল ব্যক্তি যাহারা "নাগরিক" অর্থাৎ গোত্রসমূহ বা মিত্র গোত্রের সদস্য ছিলেন, "তাহাদের পরিবার কর্তৃক সম্মানের বিষয় হিসাবে সুরক্ষিত হওয়ায়" অধিকাংশ ক্ষেত্রে মারাত্মক আঘাত হইতে রক্ষা পাইয়াছেন। কিন্তু ক্রীতদাসগণ, যাহাদের এই ধরনের রক্ষাকর্তা ছিল না, অপরিসীম কষ্টের শিকার হন।[১]

ইবন ইসহাকের মত গ্রহণ করিয়া মুইর আরও বলেন, মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে সাধারণ বিরোধিতা সংগঠিত হইবার পূর্বে ইহা তাঁহার ধর্ম প্রচারের কিছু সময় তথা তিন কি চারি বৎসর অব্যাহত ছিল, কিন্তু শত্রুতা একবার "সৃষ্টি হইয়া ইহা একটি সহিংস তৎপরতায় পর্যবসিত হয়"।[২]

মুইর আরও বলেন, সময় অতিবাহিত হইতে থাকে এবং ইসলামের অব্যাহত সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে কুরায়শদের বিদ্বেষ ও শত্রুতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহাদের ক্রোধের প্রধান আঘাতটি ধর্মান্তরিত ক্রীতদাস ও বিদেশীদের উপর পতিত হয়। মুইর অত্যাচারের ঘটনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করেন, বিশেষভাবে বিলাল এবং 'আম্মারের উপর অত্যাচারের ঘটনা। শেষোক্তের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, মহানবী ﷺ "এই যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিতে" অত্যাচারিত ব্যক্তিকে অত্যাচার হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য "ছলনার আশ্রয় লইতে"ও অনুমতি প্রদান করেন।[৩]

মহানবী ﷺ ও গুরুত্বপূর্ণ গোত্রসমূহের সদস্যগণ যে মারাত্মক শারীরিক নির্যাতন হইতে রক্ষা পান ইহার কারণ ছিল গোত্র সংহতি প্রথা। এই প্রসঙ্গে মুইর বলেন, যখন বনূ মাখযূমের সদস্যগণ তাহাদের নিজেদের গোত্রের ধর্মান্তরিতগণকে বিশেষভাবে "তাহাদের বয়স্ক নেতার পুত্র" আল-ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদকে কঠোরভাবে শাস্তি দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। "তাহারা একত্রে তাহার ভ্রাতা, মহানবী ﷺ-এর একজন প্রচণ্ড উগ্র অত্যাচারী হিশামের নিকট গমন করে এবং তাহার সম্মতি প্রার্থনা করে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাহা প্রদান করে; কিন্তু সতর্কবাণী শোনায়, "তাহাকে

হত্যা করার বিষয়ে সতর্ক থাকিবে। যদি তাহাকে হত্যা কর তবে আমি তাহার পরিবর্তে তোমাদের প্রধানতম ব্যক্তিকে হত্যা করিব।[৪]

এইভাবে মুইর তিনটি জিনিসের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। তিনি বলেন, অত্যাচার ও শারীরিক নির্যাতন, প্রধানত ক্রীতদাস ও শক্তিশালী পারিবারিক ও গোত্রীয় সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিদের উপর নামিয়া আসে। দ্বিতীয়ত, ইহা ছিল গোত্রীয় সংহতির প্রথা অর্থাৎ প্রতিটি গোত্রের ইহার সদস্যদের অন্যদের আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ও নিরাপত্তা প্রদান করার দায়িত্ব, যা ছিল পারিবারিক ও গোত্রীয় সংযোগসম্পন্ন ধর্মান্তরিতদের জন্য নিষ্ঠুর অত্যাচার ও দৈহিক ক্ষতি হইতে সাধারণভাবে রক্ষা পাওয়ার প্রধান কারণ।

তৃতীয়ত, মুইর বলেন, ক্রীতদাস ও দরিদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার কোন কোন সময় এত মারাত্মক হইত যে, মহানবী ﷺ অন্তত একটি ক্ষেত্রে ধর্মান্তর গ্রহণকারী ব্যক্তিকে আরও বেশি অত্যাচার হইতে রক্ষা করার জন্য "ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে" অর্থাৎ ইসলাম পরিত্যাগ করার ভান করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

এসব বক্তব্যে মুইর আপাতদৃষ্টিতে নির্ভুল। কিন্তু তিনি গুরুত্ব সহকারে বলেন না যে, গোত্র সংহতির প্রথা যেমন কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করার জন্য কাজ করিয়াছিল, অত্যচার করার ক্ষেত্রেও ইহা তেমনি ভূমিকা পালন করিয়াছিল। এমনকি ক্রীতদাস ও মিত্রগণ যাহারা অমানবিক অত্যাচারের শিকার হইয়াছিলেন, তাহাদের নিজ নিজ মনিবের দ্বারা বা তাহাদের অনুমতিসহ তাহাদের প্রতি ঐরূপ আচরণ করা হইয়াছিল। এমনকি আল-ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদের উদাহরণ, যাহা মুইর গোত্র সংহতির বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য উদ্ধৃত করেন, বাস্তবিকই সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ধর্মান্তর গ্রহণকারীর একটি ঘটনা ব্যাখ্যা করে যিনি তাহার গোত্রের সদস্যদের দ্বারা পরিবারের অনুমতিক্রমে নির্যাতিত হইয়াছিলেন। ইহা আরো দেখায় যে, নির্যাতনের ধরন, যাহা সাধারণত ধর্মান্তরিতদের প্রতি প্রয়োগ করা হইত, নির্যাতিতের মৃত্যু ঘটানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এইজন্যই হিশাম তাহার গোত্রের সদস্যগণকে এই ধরনের আতিশয্যপূর্ণ কিছু করা হইতে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করিয়াছিল। কিন্তু তাহার অর্থ ইহা নয় যে, শাস্তি বংশীয় ও মর্যাদাসম্পন্ন ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণকে প্রদান করা হইত তাহা মারাত্মক ও অমানবিক ছিল না। মহানবী ﷺ অবশ্য তাঁহার গোত্রের কারণে রক্ষাপ্রাপ্ত হন, কিন্তু বংশীয় ও গোত্রীয় ধর্মান্তরিতদের অধিকাংশের বিষয়ে ঘটনা এরূপ ছিল না।

মারগোলিয়থ সাধারণভাবে মুইর দ্বারা নির্দিষ্ট তিনটি বিষয়ের সবগুলির ব্যাপারে অনুসরণ করিয়াছেন। এইভাবে মারগোলিয়থ বলেন, "নূতন ধর্মমতের অপেক্ষাকৃত দুর্বল অনুসরণকারীদের" বিরুদ্ধে সহিংসতা তীব্রভাবে চালানো হয়; সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা দগ্ধ করা বা মধ্যাহ্ন সূর্যের দিকে মুখমণ্ডল উঠাইয়া রাখা বৃদ্ধি পায়...। এমনকি

মক্কা পরিদর্শনকারী বিদেশিগণকে যাহারা মহানবী ﷺ সম্পর্কে খোঁজ-খবর লইতেন সহিংসতার শিকার হইতেন।[৫] তিনি আরো বলেন, এই ধরনের নির্যাতনের কারণে পাঁচ ব্যক্তি নূতন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া পৌত্তলিকতায় প্রত্যাবর্তন করে। অপরপক্ষে অন্যরা মহানবী ﷺ -এর অনুমতিক্রমে "মুখে মুখে" তাহাদের ধর্মবিশ্বাস অস্বীকার করেন", কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস বজায় রাখেন।[৬]

মারগোলিয়থ-এর শেষ মন্তব্যটি সুস্পষ্টরূপে অধিকতর নির্যাতন হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মহানবী ﷺ কর্তৃক কিছু সংখ্যক অনুসারীকে "কূটকৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করার" জন্য তাঁহার অনুমতি প্রদান প্রসঙ্গে মুইর যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিধ্বনি। মুইর-এর ন্যায় আবার মারগোলিয়থ গুরুত্ব সহকারে বলেন, "ধনী ও ক্ষমতাশালী " ধর্মান্তরিতগণ সাধারণভাবে সহিংসতা হইতে রক্ষা পাওয়ার কারণ ছিল পৌত্তলিকতার ঐ প্রথা যাহা গোত্র ও পারিবারিক বন্ধন যে কোন নৈতিক আইন হইতে অধিকতর শক্তিশালী করিয়াছিল।[৭] মহানবী ﷺ নিজে তাঁহার গোত্রের সাহায্যে রক্ষাপ্রাপ্ত হন। মারগোলিয়থ বলেন, বিশেষভাবে আবূ তালিবের সাহায্যে যিনি তাঁহাকে ধর্মান্ধদের ক্রোধ হইতে "তাহাদের অনুমতি ব্যতিরেকে" রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।[৮] এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ কিছুটা দুঃখের সঙ্গে বলেন, মক্কাবাসিগণ "গোত্র প্রথার প্রতি" এত অনুগত এবং"জ্ঞাতির রক্তপাতের ফলে উদ্ভূত ফলাফলের প্রতি এত ভীত" না হইলে এবং মহানবী ﷺ-এর গোত্রের সর্দার "তাঁহাকে আশ্রয়চ্যুত করিলে মক্কা সম্ভবত তাঁহার হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিত; কিন্তু আবূ তালিবকে তাহা করিতে প্ররোচিত করা যায় নাই এবং তাহার অস্বীকৃতি ঐ পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়"।[৯]

মারগোলিয়থ এভাবে মুইর-এর সহিত একমত হইয়া তিনটি নূতন মন্তব্য করেন। তিনি গোত্রচেতনা ব্যতিরেকে আবূ তালিবের ঐরূপ ভূমিকা পালনের কারণসমূহ উদ্ধার করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং মন্তব্য করেন, "সম্ভবত আবূ তালিব ও তাহার বহু সংখ্যক সদস্য সম্বলিত পরিবারের তাহাদের বিত্তশালী আত্মীয়গণকে পরিত্যাগ করার সামর্থ্য ছিল না; এবং বাস্তবিকই যদি তাঁহার পিতৃব্যের উপর তাঁহার কিছু পরিমাণ আধিপত্য না থাকিত। ইহা অস্বাভাবিক ছিল যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তি এই অসুবিধার নিকট আত্মসমর্পণ করিতেন যাহা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম প্রচার তাহার উপর আরোপ করিয়াছিল।[১০] (দুই) মারগোলিয়থ মন্তব্য করেন যে, মহানবী ﷺ এভাবে তাঁহার পিতৃব্য ও গোত্রের দ্বারা রক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ায় তাঁহার ও মক্কাবাসীদের মধ্যকার যুদ্ধটি দীর্ঘ কালের জন্য আট বা দশ বৎসর ছিল একটি বাকযুদ্ধ। ইহা ছিল "প্রধানত বিতর্কের ইতিহাস, যাহাতে শুধু এক পক্ষের উপদেশমূলক বক্তৃতা সংরক্ষিত হইয়াছে।[১১] (তিন) মারগোলিয়থ বলেন যে, মহানবী ﷺ-এর অনুসারীবৃন্দ প্রত্যেকটি নূতন আন্দোলনের সাধারণ প্রবণতা অনুসারে "আক্রমণাত্মক" হন এবং পূজার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। যাহা হউক তাহারা অযথার্থ হিসাবে বিবেচনা করিবেন এবং ইহা অনেক বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়।[১২]

মারগোলিয়থ তাহার প্রথম অনুমান সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। কিন্তু মহানবী ﷺ-কে সকল সময় রক্ষা করার জন্য আবূ তালিবের প্রচেষ্টাকে স্বার্থ প্রণোদিত উদ্দেশ্যরূপে তাহার উপর আরোপ করা কঠিন। ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ে ঘটনা যাহাই ঘটিয়া থাকুক, পরবর্তী কালে বিশেষভাবে সাময়িক কালের জন্য বর্জন ও অবরোধের সময় আবূ তালিব মহানবী ﷺ-এর ধন-সম্পদ হইতে তাহার বহু সদস্যপূর্ণ পরিবারের জন্য বাস্তব-সহায়তার আশায় কাজ করিয়াছিলেন একথা বলা যায় না। আবূ তালিব ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া কাজ করিতেছেন বলিয়া দৃষ্ট হওয়ার পর তাহার নীতিকে সমর্থন দান করার জন্য গোটা বনূ হাশিম ও বনূ মুত্তালিব গোত্রকে সম্মত করানো যাইত না। এই প্রসঙ্গে আবূ তালিবের চরিত্র সম্পর্কে মুইর-এর মন্তব্য উল্লেখ করা খুব উপযুক্ত হইবে। তিনি বলেন, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য, তাঁহার ধর্ম প্রচারের প্রতি অবিশ্বাসী হইয়াও তাহার নিজের ও পরিবারের ত্যাগ স্বীকার তাহার চরিত্রকে অসাধারণভাবে মহৎ ও নিঃস্বার্থ হিসাবে চিহ্নিত করে, একই সময় ঐগুলি মুহাম্মাদ ﷺ-এর অকপটতার অকাট্য প্রমাণ দেয়। আবূ তালিব একজন স্বার্থপর প্রতারকের জন্য এরূপ কাজ করিতেন না এবং তাঁহার যাচাই বা ছাট করার পর্যাপ্ত সুযোগ ছিল।[১৩]

মারগোলিয়থ-এর দ্বিতীয় বিবৃতি মহানবী ﷺ ও মক্কাবাসীদের মধ্যকার যুদ্ধটি ছিল প্রধানত একটি বাকযুদ্ধ। ইহার সত্যতা অচিরেই[১৪] মক্কার অবিশ্বাসীদের আপত্তি ও যুক্তি সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মন্তব্য প্রসঙ্গে পরীক্ষা করা হইবে।

তৃতীয় অভিযোগটি সম্পর্কে নওমুসলমানদের পক্ষে মারমুখী আক্রমণের অভিযোগ। মারগোলিয়থ বলেন যে, কুরআন ইবরাহীম (আ)-এর পৌত্তলিকতা ধ্বংসকর আচরণের প্রশংসা করে এবং মদীনাবাসী প্রাথমিক ধর্মান্তরিতগণ একই ধরনের কাজ করায় "ইহা খুবই সম্ভব যে, মক্কার ধর্মান্তর গ্রহণকারিগণ উদাহরণ স্থাপন করিয়াছিল। এই ধরনের তৎপরতার ফলে সহিংস ঘটনাবলী ঘটিয়াছিল ইহাতে কোন সন্দেহ নাই"।[১৫] মারগোলিয়থ-আরো বলেন, খাদ্যবস্তুর উপর আরোপিত বিধিনিষেধও অবিশ্বাসীদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছিল। কারণ বিধিনিষেধসমূহ, বিশেষভাবে প্রতিমাগুলির জন্য উৎসর্গিত মাংস গ্রহণ করার উপর নিষেধাজ্ঞা "কোন মুসলমানের জন্য দেশবাসীর অধিকাংশের ভোজনানুষ্ঠানে যোগদান করা অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল... আমরা সহজে অনুমান করিতে পারি, ইহা দ্বারা যাহাদের অভ্যাস আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা কি ক্রোধের সঙ্গে পবিত্রতার এই ধারণাটিকে দেখিয়াছিল"।[১৬]

মহানবী ﷺ-এর অনুসারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক আচরণের এই অভিযোগটি, যাহা মারগোলিয়থ-এর মতে অবশ্যই হিংসাত্মক ঘটনাবলীর জন্ম দিয়াছিল, সম্পূর্ণ অযথার্থ। প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের কথিত আক্রমণাত্মক আচরণ ও পৌত্তলিকতা ধ্বংসকামী উৎসাহের কারণে ঘটিত কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়ার একটি দৃষ্টান্তও উৎস গ্রন্থসমূহেও নাই। অপরপক্ষে কুরায়শ নেতাগণ যে আক্রমণাত্মক মনোভাব গ্রহণ করিয়াছিল তাহা সকল বিবরণ হইতে প্রমাণিত হয় এবং একটি নির্জন স্থানে মুসলমানদের প্রার্থনায় তাহাদের হস্তক্ষেপের ফলে প্রথম লিপিবদ্ধ ঘটনাটি

ঘটে[১৭] এবং ইহা ছিল খুব স্বাভাবিক কারণ ; আক্রমণাত্মক আচরণ ব্যক্তিবিশেষের নিজ শক্তি সম্পর্কে সচেতনতা এবং কাহারও প্রতিপক্ষের দুর্বলতা সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা হইতে উদ্ভূত হয়, যদিও উভয় ক্ষেত্রে ভুল হইবার আশংকা থাকে। একথা মনে করার জন্য উৎসসমূহে কোন প্রমাণ নাই যে, মক্কার প্রাথমিক ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ এইরূপ ভুল ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। নবী ইবরাহীম (আ)-এর দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে, কুরআন ইহাকে একত্ববাদের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য উল্লেখ করে, ধর্মান্তরিত ব্যক্তিবর্গকে এই ধরনের কাজে উৎসাহিত করার জন্য নয়। মারগোলিয়থ কর্তৃক অন্যত্র উল্লিখিত মহানবী ﷺ ও আলী (রা)-এর একত্রে কা'বার প্রতিমাসমূহ ধ্বংস করার দৃষ্টান্তটিও মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা, ধর্ম প্রচারের প্রাথমিক পর্যায়ের ঘটনা নহে। অনুরূপভাবে খাদ্যবস্তু সংক্রান্ত বিধি-নিষেধের ঘটনাটিও বিভ্রান্তিকর। প্রতিমাগুলির উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত মাংসে অংশীদার হইতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ছিল একত্ববাদের একটি পূর্বশর্ত, কখনও অবিশ্বাসীদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশের অভিব্যক্তি ছিল না। এমনকি মহানবী ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্ববর্তী সময়ে হানীফগণ কর্তৃক এই ধরনের মাংস গ্রহণ অসমর্থনীয় ছিল বলিয়া জানা যায়। তাহাদের বা প্রাথমিক মুসলমানদের কর্মকাণ্ড তাহাদের ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে কোনও বিরোধ ঘটে নাই।

মারগোলিয়থ-এর উপরে উল্লিখিত মন্তব্যসমূহে তিনি দুইটি প্রবণতা প্রতিফলিত করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যাহা বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচ্যের সকল শ্রেণীর পণ্ডিতবর্গের মধ্যে প্রসার লাভ করে। এগুলির উদ্দেশ্য ছিল কুরআনে মক্কাবাসীদের বিরোধিতা সম্পর্কে উল্লেখসমূহ বিবেচনা করিয়া ইহার প্রকৃতি ও বিস্তৃতির স্বরূপ নির্ধারণ এবং তাহার উপর ভিত্তি করিয়া মন্তব্য করা যে, মুসলমানদের উপর অত্যাচার ছিল সাধারণভাবে মৃদু এবং বিরোধিতার মধ্যে শুধু প্রধানত বিতর্কমূলক ছিল। মারগোলিয়থ যে সময়ে লিখিয়াছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়ে Leo Caetani কুরআনের বিভিন্ন আয়াত উল্লেখ করিয়া হুবহু এসব মন্তব্য করেন।[১৮] এইভাবে লিখিত কথাগুলি পরবর্তী লেখকগণ, বিশেষভাবে ওয়াট কর্তৃক কম বা বেশি অনুসরণ করা হইয়াছিল যাহা এখন দেখা যাইবে।

দুই ঃ ওয়াট-এর মন্তব্য

(ক) মুসলমানদের উপর নির্যাতন

ওয়াট মক্কাবাসীদের বিরোধিতা সম্পর্কে প্রধানত তিনটি উপ-শিরোনামের অধীনে আলোচনা করিয়াছেন ঃ (ক) মুসলমানদের উপর নির্যাতন, (খ) বনূ হাশিমের উপর চাপ প্রয়োগ ও (গ) মহানবী ﷺ-এর নিকট আপস-মীমাংসার প্রস্তাব। সবগুলির মধ্যে প্রথমটি বর্তমান অংশে আলোচনা করা হইয়াছে।

ওয়াট আবূ জাহ্লের ভূমিকার ব্যাপারে ইব্ন ইসহাকের বর্ণনার নিজস্ব অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া মুসলিম নির্যাতন সম্পর্কে তাহার আলোচনা শুরু করেন এবং উহার ভিত্তিতে বলেন, মুসলমানদের

উপর নির্যাতনে—(ক) প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর মৌখিক আক্রমণ (খ) "দরিদ্র মানুষ"-এর উপর অর্থনৈতিক চাপ এবং (গ)"প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতা বঞ্চিত ব্যক্তিদের উপর শারীরিক অত্যাচার অন্তর্ভুক্ত ছিল"।[১৯] এই বর্ণনার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া ওয়াট বলেন, কুরায়শ গোত্রসমূহের "অধিকাংশ" জ্ঞাতি বা মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ যে কাহারো প্রতি দুর্ব্যবহারকারী যে কোন ব্যক্তিকে কার্যকরভাবে দমন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী" এবং গোত্র সচেতনতার অধিকারী হওয়ায় "শারীরিক নির্যাতনের শিকার হইতে পারে এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা ছিল অল্প এবং তাহাদের মধ্যে ক্রীতদাস এবং স্পষ্ট গোত্র-সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত ছিল"। ওয়াট বলেন, জ্ঞাতি ও মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ ব্যক্তিগণকে বর্জন করা যাইতে পারিত। যেমন– আবূ বাক্র (রা) ইবনুদ দাগিনা-এর আশ্রয় গ্রহণ করিলে যেমন ঘটিয়াছিল বা মহানবী ﷺ তাইফ গমন করিলে যেমন ঘটিয়াছিল কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপ "গোত্রীয় মর্যাদাহানি ঘটাইত"।[২০]

ইহা উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই যে, ওয়াট গোত্র সংহতির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিতে কত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার পূর্বসূরীর অনুসরণ করিয়াছেন। মুইর ও মারগোলিয়থ উভয়ই কাহারও জ্ঞাতিকে আশ্রয়দানের সঙ্গে জড়িত সম্মানবোধ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

ধারাবাহিকতা বজায় রাখিয়া ওয়াট আরো বলেন, যখন উৎসসমূহ "প্রলোভন ও পরীক্ষা ফিত্না (ইয়ুফতিনু) সম্পর্কে" বলেন, "মুসলমানগণ যাহার নির্যাতনের শিকার হইয়াছিলেন সেগুলি আবূ জাহ্লের কাজের ন্যায় কাজকে বুঝায়"। "ইহা অবশ্য মারাত্মক নির্যাতন ছিল না"। এই প্রসঙ্গে তিনি "পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গকে" উৎসসমূহ অতিরঞ্জিত করার দোষে অভিযুক্ত করেন এবং জোর দিয়া বলেন, "আত-তাবারী এবং ইব্ন সা'দের জীবনীসমূহে ইব্ন হিশামের বিস্তৃত বিবরণের একটি গবেষণা মন্তব্য করার ইঙ্গিত" প্রদান করে যে, "নির্যাতন ছিল মৃদু ধরনের" এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অভিযোগ "খুব কম ক্ষেত্রে প্রাচীনতম উৎসসমূহের প্রতি প্রযোজ্য"।[২১]

নির্যাতনের উপরে উল্লিখিত তিনটি ধরনের উদাহরণ হিসাবে ওয়াট বলেন, মহানবী ﷺ "মৌখিকভাবে আক্রান্ত এবং মৃদু ভর্ৎসনার" শিকার হইয়াছিলেন, যদিও "অস্বস্তি আবূ তালিবের মৃত্যুর পর বৃদ্ধি পাইয়াছিল"।[২২] আবূ বাক্রের মদীনায় হিজরত করার সময় তাঁহার মূলধন ৪০,০০০ হইতে ৫,০০০ দিরহামে যে হ্রাস পায় ইহা সম্ভবত অধিকাংশে অর্থনৈতিক চাপের জন্য, যেমন আবূ জাহ্ল কর্তৃক প্রদর্শিত ভীতি ঘটিয়াছিল বলিয়া বিবেচনা করেন, ক্রীতদাস ক্রয়ের জন্য নয়, যেমন ইব্ন সা'দে বর্ণিত আছে। কারণ একজন ক্রীতদাসের মূল্য ছিল চারি শত দিরহাম।[২৩]

তৃতীয় দফা সম্পর্কে, শারীরিক নির্যাতনের বিষয়ে ওয়াট মনে করেন, "সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উদাহরণ" ছিল বিলাল এবং 'আমের ইব্ন ফুহায়রার ন্যায় ক্রীতদাসদের শাস্তি। তিনি একটা চতুর্থ দফা যুক্ত করেন—যেমন "পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতা কর্তৃক প্রভাবশালী গোত্র ও পরিবারের সদস্যদের উপর চাপ (শারীরিক নির্যাতনসহ) প্রয়োগ"। আল-ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ, সালামা

ইব্‌ন হিশাম, 'আয়্যাশ ইব্‌ন আবী রাবী'আর প্রতি নির্যাতনের উদাহরণ এবং "মৈত্রীচুক্তিবদ্ধ 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির ও তাঁহার পরিবারের প্রতি বনূ মাখযূমের রুক্ষ আচরণ প্রদর্শন" ওয়াট কর্তৃক এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[২৪]

এই সম্পর্কে ওয়াট তাহার আলোচনাকে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া সমাপ্ত করিতেছেন যে, মক্কায় বিরাজমান নিরাপত্তা পদ্ধতি– প্রত্যেক গোত্রের ইহার সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান করা অর্থ প্রকাশ করে যে, অন্য গোত্রের সদস্যের দ্বারা, যদি ইসলামের প্রতি তাহার আগ্রহ নাও থাকে, কোন মুসলিম মারাত্মকভাবে নির্যাতিত হইতে পারে না। সুতরাং নির্যাতন সীমাবদ্ধ ছিল "(ক) সেইসব ক্ষেত্রে যেখানে গোত্রীয় সম্পর্ক প্রভাবিত হইত না এবং (খ) সেইসব পদক্ষেপ গ্রহণে, যেমন অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ ও মৃদু অপমান করা, যাহা ঐতিহ্যবাহী সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতির বিপরীত হইত না বা ঐগুলি "ব্যক্তিকে প্রভাবিত করিত, গোত্রকে নয়"।[২৫]

"বনূ হাশিমের উপর চাপ প্রসঙ্গে ওয়াট-এর বর্ণনায় যাওয়ার পূর্বে তাহার উপরে উল্লিখিত "মুসলিম নির্যাতন"-এর বিশ্লেষণের প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি দেওয়া সময়োপযোগী হইবে। প্রথমে উল্লেখ্যযোগ্য বিষয়টি হইতেছে, এখানে তিনি কার্যকরভাবে যাহাকে 'Social' অর্থাৎ গোত্র সংহতি ও ব্যক্তিতান্ত্রিকবাদের উন্মেষ হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার দুর্বল হওয়া ও ভাঙ্গিয়া যাওয়া সম্পর্কে ইতোপূর্বে দেওয়া তত্ত্বটির বিরোধিতা করিয়াছেন এবং ইহাকে নাকচ করিয়াছেন যাহা তাহার মতে ধর্মে নিরাপত্তার জন্য একটি বিকল্প পদ্ধতি খুঁজিয়া পাইবার পথকে প্রশস্ত করে এবং ইসলামের উত্থানের একটি কারণ হয়।

এখানে তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, গোত্র সংহতিতে কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য শিথিলতা দেখা দেওয়া দূরে থাকুক, ইহা পূর্বের ন্যায় দৃঢ় ছিল এবং ইহাই ছিল মহানবী ﷺ ও মুসলমানদের গতি রুদ্ধ করিতে কুরায়শ নেতাদের ব্যর্থতার প্রধান কারণ। এমনকি যাহাদিগকে তিনি ইতোপূর্বে নিজদিগকে "উচ্চ বিত্তবান" এবং গোত্র ও পরিবার ভিত্তিক ব্যবসা সংক্রান্ত অংশীদারিত্বে নিয়োজিত ডাহা ব্যক্তিত্ববাদী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিলেন এখন তাহাদিগকেই নিরাপত্তার ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংহতির প্রতি নিবেদিতপ্রাণ বলিয়া চিহ্নিত করেন যাহা তাহাদিগকে মহানবী ﷺ ও তাহাদের নিজ নিজ গোত্রের মুসলমানদের প্রতি কঠোর আচরণ প্রদর্শন করা হইত বিরত রাখে। এইভাবে ওয়াট যেমন বলেন, ইসলামের উত্থানের মূলে অনুমিত গোত্র সংহতির অভাব নিহিত না থাকিয়া অক্ষত সুপ্রাচীন গোত্র সচেতনতা নিহিত ছিল যাহা ওয়াট-এর স্বীকৃতি অনুসারে কুরায়শ নেতাদের ব্যর্থতার জন্য এবং বিপরীতক্রমে মক্কায় ইসলামের টিকিয়া থাকা ও বিস্তার লাভের প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়াছিল। ঘটনা এইরূপ ছিল না যে, গোত্র সংহতির পৌত্তলিক রীতি দুর্বল ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য ইসলাম প্রসারলাভ করিয়াছিল, বরং এইরূপ ছিল যে, স্বয়ং পৌত্তলিকতা নিজের অভ্যন্তরে নিজের মৃত্যুর বীজ ধারণ করিয়াছিল।

ওয়াট-এর বিশ্লেষণের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দিকটি হইতেছে, তিনি প্রাথমিক যুগের মুসলিম ঐতিহাসিকগণের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের অতিরঞ্জন অভিযোগটিকে অযথার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। দৃশ্যর এইভাবে তিনি পাশ্চাত্যের অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ হইতে ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি তাহাদের ন্যায় একই লক্ষ্যবস্তুর দিকে দৃষ্টি রাখেন। তাহারা মুসলিম ঐতিহাসিকদের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জনের অভিযোগ করেন ইহা দেখাইবার জন্য যে, মুসলমানদের উপর নির্যাতন ততটা মারাত্মক ছিল না যতটা ছিল বলিয়া দেখান হইয়াছে। ওয়াট একই বিষয়বস্তুর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কিন্তু তিনি এইরূপ করেন ইহা দেখাইবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিয়া যে, প্রাচীন উৎসসমূহ মন্তব্য করে যে, "অত্যাচার ছিল মৃদু"।

প্রকৃত সত্য এই যে, একদিকে তিনি পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ কর্তৃক অযৌক্তিকভাবে উৎস-সমূহের বিরুদ্ধে অতিরঞ্জনের অভিযোগ আনার ভ্রম সংশোধন করেন এবং অপরদিকে ওয়াট নিজে উৎসমূহের লিপিবদ্ধ সত্য ঘটনাসমূহের অবমূল্যায়ন করার ভুলটি করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যদি কেহ নিরপেক্ষভাবে উৎসসমূহের প্রতি লক্ষ্য করেন তিনি দেখিতে ব্যর্থ হইবেন না যে, তাহাদের দ্বারা লিপিবদ্ধ ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে মারাত্মক অত্যাচারের একটি চিত্র পেশ করে। কোন প্রকারেই ইহা "সামান্য বা অধিকাংশ একটি মৃদু ধরনের" ছিল না, যেরূপ ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন। তিনি এই মন্তব্য করার ক্ষেত্রেও নির্ভুল নন যে, ফিৎনা/ইউফতিনু অভিব্যক্তিদ্বয় ছোটখাট বিরক্তি এবং "দরিদ্র ব্যক্তিদের" উপর অর্থনৈতিক চাপের ইঙ্গিত প্রদান করে। অভিব্যক্তি দুইটির পরিষ্কার অর্থ ছিল, যে কোন প্রকারে মক্কার মুসলমানদের ধর্মত্যাগ করাইবার উদ্যোগ গ্রহণ এবং সামান্য বা মৃদু চাপ বোধগম্যভাবে প্রয়োজন সমাধা করিতে পারিত না।

তৃতীয়ত, মুইর ও মারগোলিয়থ-এর ন্যায় ওয়াট একই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া মন্তব্য করেন যে, অত্যাচার সেইসব ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকায় যেখানে গোত্রীয় সম্পর্ক প্রভাবিত হইত না বা মর্যাদাবোধের ঐতিহ্যবাহী আদর্শ ও রীতির বিপরীত হইত না, ইহা সামান্য বা অধিকাংশ মৃদু প্রকৃতির ছিল। যেরূপ ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে মুসলমানদের উপর অত্যাচার অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোত্রীয় সম্পর্ক অনুযায়ী ছিল। এমনকি ক্রীতদাসগণ তাহাদের মনিবদের দ্বারা অথবা তাহাদের অনুমতিতে নির্যাতিত হইত। এরূপ ঘটে নাই যে, এক গোত্রের সদস্যগণ অন্য গোত্রের মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাইতে অগ্রসর হইয়াছে। গোত্রসমূহ নিজেরাই তাহাদের নিজ নিজ গোত্রের "দলত্যাগী"-দের শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিত।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াট কর্তৃক অত্যাচারের ঘটনাবলীর একটি চতুর্থ দফা চিহ্নিতকরণ, "এমনকি প্রভাবশালী গোত্র ও পরিবারের সদস্যদের পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক চাপ (শারীরিকসহ) প্রয়োগ"-এর দফাটি অতিরঞ্জিত এবং প্রকৃত বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি বিভ্রান্তিকর ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা হউক এই মন্তব্য করা মৌলিকভাবে ভুল যে, গোত্রীয় সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এইরূপ ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করা সীমাবদ্ধ থাকায় অর্থাৎ যেখানে গোত্রের সদস্যগণ নিজ গোত্রের

অপরাধিগণকে এবং সেইসব ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করিত যে ক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান করিলে মর্যাদাবোধের ঐতিহ্যবাহী আদর্শ ও রীতির বিরুদ্ধাচরণ করা হয় না, ইহা অনিবার্যভাবে সামান্য ও মৃদু ছিল।

যুদ্ধ-বিগ্রহ মারাত্মক ও ধ্বংসকর হওয়া হইতে বিরত হইত না, কারণ ইহা "প্রথানুগ" এবং 'চিরাচরিত" যুদ্ধরীতি অনুসারে অনুষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও। অনুরূপভাবে শাস্তি প্রদানও অত্যাবশ্যকভাবে সামান্য ও মৃদু হইত না অনুরূপভাবে ইহা স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক, যেমন একটি বংশ, একটি সরকার অথবা অন্য কোন আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত সংগঠন কর্তৃক ইহার সদস্যদের উপর প্রদত্ত হওয়া সত্ত্বেও। নির্যাতনও অমানবিক না হইবার কোন কারণ ছিল না, যেহেতু ইহা ক্রীতদাস বা পরিবার বা গোত্রীয় সম্পর্কবিহীন ব্যক্তির উপর কৃত হইত। কুরায়শ নেতাগণ মহানবী ﷺ-কে সমর্থন করার অপরাধে হারিছ ইব্ন আবী হালাহকে কা'বা প্রাঙ্গণে[২৬] হত্যা করিলে তাহা তাহাদের দ্বারা আচরণ বিধির আদর্শ ও নীতির বিরুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। ইয়াসির, তাঁহার স্ত্রী সুমায়্যা ও তাহাদের পুত্র 'আবদুল্লাহ (রা)-কে নির্যাতনপূর্বক হত্যার ঘটনাটিও কুরায়শ নেতাগণের আদর্শ বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। আল-ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদ-কে হত্যা করা ব্যতীত যে কোন উপায়ে নূতন ধর্ম ত্যাগ করাইতে তাহার পরিবার কর্তৃক জ্ঞাতিদের নিকট অর্পণ করা হইলে তাহার উপর কৃত নির্যাতন বোধগম্যরূপে শুধু সামান্য ও মৃদু ছিল না। কারণ নির্যাতনের কঠোরতা অত্যাবশ্যকভাবে প্রথমেই অপরাধীকে হত্যা করা দিয়া শুরু হয় না।

কুরায়শ নেতাগণ তাহাদের সিদ্ধান্তকে গোপন না করিয়া প্রকাশ্যভাবে মহানবী ﷺ-কে হত্যা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়ার সময়ে ইহা কোন সাধারণ বিষয় ছিল না, এমনকি তাহাদের শত্রুতাও শুধু মৃদু প্রকৃতির ছিল না। তাহারা শুধু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াই থামিয়া থাকে নাই, হত্যা শব্দটির সকল পারিভাষিক অর্থে তাহাদেব সিদ্ধান্তকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাহারা কয়েকটি উদ্যোগও গ্রহণ করিয়াছিল। কুরায়শ নেতারা তাহাদের আদর্শ ও আচরণবিধির ঐতিহ্যবাহী নীতির সীমানার মধ্যে ছিল না। ওয়াট-এর মতে, একজন জ্ঞাতিকে অস্বীকার করা তাহাদের জন্য একটি অস্বাভাবিক ও অসম্মানজনক কাজ ছিল। তাহারা তাহাও করিত। শুধু আবূ বক্র (রা) এবং মহানবী ﷺ নয়, অন্যদের একটি সম্পূর্ণ দলকে যে কোন শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তি বা দলের দ্বারা নিপীড়িত ও কোন প্রকার শাস্তির ঝুঁকি ব্যতিরেকে হত্যা করার জন্য বর্জন, সমাজ হইতে বহিষ্কার করা হয় ও গোত্রীয় নিরাপত্তা পদ্ধতির গণ্ডীর বাহিরে রাখা হয়।

তদানীন্তন আরব দেশীয় পরিস্থিতিতে একটি সম্পূর্ণ দলকে রাষ্ট্রহীন (Stateless) অনভিপ্রেত ব্যক্তিত্ব (Unpersons) করার এবং তাহাদিগকে কল্পনাযোগ্য সকল প্রকার বিপদের সম্মুখে ঠেলিয়া দেওয়ার এই ব্যবস্থা অপেক্ষা কোন কিছুই অধিকতর চরম ও ঐতিহ্য বিরোধী পদক্ষেপ হইতে পারিত না। এই পরিস্থিতিই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নওমুসলিমকে বিদেশে আশ্রয় ও

নিরাপত্তা সন্ধান করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এমনকি সমগ্র বনূ হাশিম গোত্রটি (বনূ মুত্তালিবসহ) অন্যান্য সকল কুরায়শ গোত্র কর্তৃক একঘরে করিয়া রাখা হয়, সমাজ হইতে বহিষ্কৃত ও অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মহানবী ﷺ-কে যাহাতে তাহারা হত্যা করিতে পারে সেজন্য তাঁহাকে তাহাদের হাতে সমর্পণ করিতে বাধ্য করা। এই পথ অবলম্বন করিয়া কুরায়শ গোত্রসমূহ আর একটি সুপ্রাচীন আরব প্রথা অর্থাৎ রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা ও আশ্রয় দেওয়ার প্রথা "সিলাতুর রাহিমের" প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর বনূ হাশিম মহানবী ﷺ-কে রক্ষা করার দায়িত্ব প্রত্যাহার করিলে তিনি নিকটবর্তী তাইফ শহরে আশ্রয় ও সমর্থন পাওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে বাধ্য হন যেখানে সামান্য চাপে পড়া দূরে থাকুক— মারাত্মকভাবে নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত হন। যদি ঐগুলি শুধু "সামান্য ও মৃদু" নির্যাতন ও শত্রুতার উদাহরণ হয় তবে কঠোরতার মানদণ্ড, যাহার সাহায্যে এগুলির মান নির্ধারণ করা হইয়াছে, অবশ্যই ভয়ঙ্করভাবে উচ্চ ছিল।

ওয়াট কিছু সময় পরে[২৭] বিষয়টির উপর কুরআনের সাক্ষ্য বিবেচনা করেন এবং বলেন, ইহা "ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক উপাদান হইতে" সংগৃহীত সাধারণ চিত্রসমূহের সত্যতা প্রতিপাদন করে, যেমন "মুসলমানদের উপর নির্যাতন ছিল মৃদু, ইহাতে প্রথা বিরুদ্ধ কোন ঘটনা অন্তর্ভুক্ত ছিল না"।[২৮] তিনি আরো বলেন, মৌখিক সমালোচনা ও বাদানুবাদ ছিল "বিরোধিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য" এবং প্রধান শত্রুতামূলক তৎপরতা ছিল, কুরআনে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, কায়দ (ষড়যন্ত্র) এবং মাক্‌র (ফেরেববাজি) যাহা "বাস্তব ধ্বংসের দিকে পরিচালিত" করিয়া থাকিতেও পারে, সব সময়ই আইনের গণ্ডির ভিতরে ছিল।[২৯] সুতরাং ওয়াট গুরুত্ব সহকারে বলেন, " সেখানে কোন মারাত্মক নির্যাতনের বা অন্য কোন কিছুর, যাহাকে অত্যাচার বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে, তাহার নিদর্শন নাই।[৩০] এই প্রসঙ্গে ওয়াট বিশেষভাবে মাদানী আয়াতটির উল্লেখ করেন , ১৬ ঃ ১১০ (ওয়াট -এর মতে ১৬ ঃ ১১) যাহা মুসলমানদের সম্পর্কে বলে যে, তাহারা ওয়াট-এর কথায় "অত্যাচারিত বা পরীক্ষিত (ফুতিনূ)" হইবার পর মদীনায় হিজরত করেন। যাহা পারিবারিক চাপসহ "কায়দ"-এর অতিরিক্ত কিছু নাও বুঝাইতে পারে।[৩১] তিনি অরো একটি আয়াতের উল্লেখ করেন, ৮৫ ঃ ১-৭ এবং বলেন, সেখানে উল্লিখিত পরিখাবাসী মানুষের কাহিনীটি (উখদূদ), যদিও ইহা "মক্কায় অত্যাচারের প্রতিফলন ঘটাইয়া থাকিতে পারে"— পাশ্চাত্যের পণ্ডিতবর্গ ইহাকে এইভাবে বিবেচনা করিতে আগ্রহী যে, ইহা দোযখের একটি বিবরণ এবং "আয়াতটিকে মুসলিম নির্যাতনের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না"।[৩২]

কুরআনের সাক্ষ্য ইঙ্গিত করে যে, মুসলমানদের উপর নির্যাতন মৃদু ছিল এবং বিরোধিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল বাদানুবাদ ও মৌখিক সমালোচনা, একথা বলিতে যাইয়া ওয়াট শুধু তাহার পূর্বগামী বিশেষভাবে মারগোলিয়থ ও Leo Caetani-এর গবেষণাসমূহের পুনরাবৃত্তি করেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতদের ঐ দিকটি, ইতোপূর্বে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। এখানে আরো একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ওয়াট-এর পক্ষে

ইহা বলা সম্পূর্ণরূপে নির্ভুল নয় যে, 'ফুতিন্' তিনি পরীক্ষারূপে যাহার অনুবাদ করিয়াছেন "পারিবারিক চাপসহ কায়দ অপেক্ষা অধিকতর কিছু" অর্থ প্রকাশ করে না। ফিতনাহ বা ফুতিন্ শব্দটি একটি ব্যাপক অভিব্যক্তি যাহার অর্থ অন্যান্য জিনিসের মধ্যে অবিশ্বাসিগণ কর্তৃক নবদীক্ষিত মুসলমানগণকে পূর্ব ধর্মে প্রত্যাবর্তন ও নূতন ধর্মবিশ্বাস হইতে প্রত্যাবর্তন করাইবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগকৃত নির্যাতন ও শারীরিক প্রহারসহ সকল প্রকার কৌশল ও উদ্যোগকে বুঝায়।

অনুরূপভাবে কায়দ ও মাক্র সব সময় "আইনের গণ্ডির মধ্যে" ছিল এই বর্ণনা ঠিক নহে। স্বতস্ফূর্তভাবে অবিশ্বাসীদের ঐ সকল উদ্যোগ কায়দ ও পারিবারিক চাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অনুরূপভাবে কায়দ ও মাক্র সব সময়ই "আইনের গণ্ডির মধ্যে" ছিল বর্ণনাটি বিভ্রান্তিকর উক্তি। পরবর্তী অভিব্যক্তিটি একটি আধুনিক বাক্যাংশ যাহা প্রায়শ কোন কাজ বা অচরণ যথার্থ কিনা তাহা প্রমাণ করা বা ক্ষমা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। পরিভাষা দুইটির সহজ অর্থ "গোপন পরিকল্পনা, প্রতারণা, কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র ও ধোঁকাবাজি" ইত্যাদি। এগুলি শুধু সেই পদ্ধতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে যে পদ্ধতিতে কোন অপকর্ম সম্পাদিত হয়, কর্মটির প্রকৃতির সঙ্গে নয়, ইহার কঠোরতা বা তীব্রতা দূরে থাকুক। প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও কৌশলপূর্ণ ষড়যন্ত্র গোত্রীয় বিবাদ ও শত্রুতার ক্ষেত্রে যতটা "আইনের গণ্ডির মধ্যে" ছিল ততটাই আধুনিক যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শত্রুতার মধ্যে রহিয়াছে। কিন্তু তাহা সংঘটিত ঘটনার কঠোরতা ও অমানবিকতার সীমা নির্ধারণ করে না। না কোন কর্মকাণ্ড যাহাকে ধোঁকাবাজি বা প্রতারণা বলা যাইতে পারে, অবশ্যম্ভাবীরূপে মৃদু বা কঠোর নয়, না কোন পদক্ষেপ যাহা আইনের গণ্ডির মধ্যে থাকিতে পারে, সব সময়ই মৃদু ও কঠোর নয়। নরহত্যার ঘটনা সম্পূর্ণরূপে আইনের গণ্ডির মধ্যে থাকিয়া ঘটিতে পারে, কিন্তু কেহই একথা বলিবে না যে, ইহা একটি মৃদু বা সামান্য পদক্ষেপ। বাস্তবিকই একথা বলা প্রকাশ্যভাবে একটি বিভ্রান্তিকর বর্ণনা হইবে যে, মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাসীরা যাহা করিয়াছিল তাহা পৌত্তলিক আইন ও প্রথানুসারে করা হইয়াছিল, ইহা কঠোর ছিল না এবং "অত্যাচার" ছিল না।

এই মন্তব্য ঠিক নয় যে, কুরআন সহজভাবে তাহাদের দ্বারা কৃত বা করার জন্য পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ও অপরাধের প্রকৃতি নির্ধারণ ব্যতিরেকে 'কায়দ ও মাক্র' সম্পর্কে বলিয়াছে। উদাহরণের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাইতে পারে ঃ

১। ৫৯ ঃ ৮ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ .

"এই সম্পদ অভাবগ্রস্ত মুহাজিরদের জন্য যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি ও সম্পদ হইতে উৎখাত হইয়াছে..."।

২। ১৬ ঃ ৪১ وَالَّذِيْنَ هٰجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا

"যাহারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়াছে...।"

৩। ৩ ঃ ১৯৫ فَالَّذِيْنَ هٰجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ .

"সুতরাং যাহারা হিজরত করিয়াছে ও নিজেদের ঘরবাড়ি হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে এবং আমার পথে নির্যাতিত হইয়াছে....।"

৪। ৮ ঃ ৩০ وَاِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ .

"আর স্মরণ কর, (হে নবী)! যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছিল তোমাকে বন্দী করার জন্য অথবা হত্যা করার জন্য অথবা দেশান্তরী করার জন্য ..."।

৫। ২২ ঃ ৩৯-৪০ اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْ...। الَّذِيْنَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ اِلاَّ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ .

"যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হইল তাহাদেরকে যাহাদের সাথে যুদ্ধ করা হয়। কেননা তাহাদের প্রতি জুলুম করা হইয়াছে.... যাহারা বহিষ্কৃত হইয়াছে অন্যায়ভাবে তাহাদের ঘরবাড়ি হইতে শুধু এইজন্য যে, তাহারা বলে, "আমাদের রব আল্লাহ"...।

উপরে উদ্ধৃত সামান্য কয়েকটি আয়াত হইতে ইহা পরিষ্কার হইবে। উহাদের কোনটির সঙ্গেই ওয়াট এইগুলিকে সম্পর্কযুক্ত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই যে, (ক) মুসলমানগণ তাহাদের গৃহ ও সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন; (খ) তাহারা অত্যাচারিত (জু'লিমূ) ও নির্যাতিত (উয়ূ') হইয়াছিলেন এবং (গ) অবিশ্বাসীরা মহানবী ﷺ-কে বন্দী ও অন্তরীণ রাখিতে বা গোপনে হত্যা করিতে বা নির্বাসিত করিতে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

অনুমেয়রূপে এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াট ইহা বলিয়া পরোক্ষভাবে উল্লেখ করেন যে, কায়দ ও মাক্র, যদিও বাস্তবভাবে ধ্বংসাত্মক, পৌত্তলিকদের স্বীকৃত আদর্শ ও প্রথার বিরুদ্ধ ছিল না, অবশ্যই মহানবী ﷺ-কে গোপনে হত্যা করার জন্য তাহাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হইলে তাহা ধ্বংসাত্মক হইত। কিন্তু ঐ ষড়যন্ত্রের ব্যর্থতা একথা বুঝায় না যে, কুরআনের সাক্ষ্য শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে মৃদু বিরোধিতা ও পারিবারিক চাপের প্রতি ইঙ্গিত করে, "অত্যাচার"-এর প্রতি নহে।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াট যাহা বর্ণনা করেন বা কুরআনের সারাংশ বলিয়া মনে করেন কুরআন নিজেই মোটামুটিভাবে তাহার বিরোধিতা করে। এইভাবে কুরআন মুসলমানদের উপর অত্যাচার ও সহিংসতার ঘটনাবলী সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করে না বলিয়া মন্তব্য করিলে কুরআন সুস্পষ্টভাবে বলে যে, তাহারা অত্যাচারিত ও নির্যাতিত হইয়াছিল এবং এমনকি তাহাদের গৃহ ও সম্পদ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। ওয়াট বলেন, অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের যাহা করিয়াছিল তাহা পৌত্তলিক

আরবদের আইন ও প্রথার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কুরআন স্পষ্টভাবে তাহাদের আচরণকে "নির্যাতন" এবং অন্যায় (জুলুম) ও অযৌক্তিক (বিগ'ায়র হ'ক্'ক') হিসাবে চিহ্নিত করে।

এখানে উল্লেখ করা সময়োপযোগী হইবে যে, প্রচলিত ধারণা অনুসারে জুলুম তাহাই যাহা স্বীকৃত আইন ও প্রথার গণ্ডি বহির্ভূত। ওয়াট বলেন, যাহা মুসলমানদের উপর কৃত হইয়াছিল তাহা ছিল মৃদু ও হালকা। কুরআন দেখায় যে, মুসলমানদের উপর নির্যাতন ও অত্যাচার, যাহাতে তাহাদের গৃহ ও সম্পদ হইতে বিতাড়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহাদিগকে অন্য স্থানে আশ্রয়প্রার্থী উদ্বাস্তুতে পরিণত হইতে বাধ্য করিয়াছিল। ইহা ব্যাখ্যা করাব প্রয়োজন নাই যে, তাহাদের প্রতি এভাবে কৃত নির্যাতন ও অত্যাচার মারাত্মক ও অমানবিক ছিল। কারণ কোন ব্যক্তিকে তাহার গৃহ ও সম্পত্তি হইতে বিতাড়িত করার কাজটিকে বিরোধিতার একটি মৃদু বহিপ্রকাশ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না বা ইহাও ধারণা করা যায় না যে, মুসলমানগণ শুধু বিরোধিতা ও সামান্য অসন্তোষের সম্মুখীন হওয়ার কারণে অন্যত্র আশ্রয় সন্ধান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

৮৫ ঃ ১-৭ আয়াত প্রসঙ্গে ওয়াট বলেন, ইহা "মক্কায় নির্যাতন বুঝাইতে পারে", কিন্তু পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ ইহাকে দোযখের বর্ণনারূপে বিবেচনা করিতে আগ্রহী এবং মনে করেন, "আয়াতগুলিকে মুসলিম নির্যাতনের প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা যায় না"।[৩৩]

হাঁ, আলোচ্য আয়াতটি মক্কার নির্যাতনের ইঙ্গিত করে। আয়াতটি কুরআনের এই ধরনের একমাত্র আয়াত নয়। অন্যান্য আরো আয়াত রহিয়াছে যাহা পূর্ববর্তী লোকদের দ্বারা তাহাদের নবী ও বিশ্বাসীদের উপর কৃত অত্যাচার সম্পর্কে এবং উহার পরিণাম সম্পর্কে ইঙ্গিত করে যাহা তাহাদের উপর আপতিত হইয়াছিল। ঐ আয়াতগুলির লক্ষ্য ছিল মক্কার অবিশ্বাসীদেরকে সতর্ক করা এবং মহানবী ও তাঁহার অনুসারিগণকে ধর্মপ্রচারে ও বিশ্বাসে অটল থাকার জন্য ধৈর্য ধারণ করিতে উৎসাহিত করা।[৩৪]

বর্ণনাটি সম্পর্কে যে, পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ আয়াতটিকে দোযখের একটি বিবরণ হিসাবে বিবেচনা করিয়াছেন, ওয়াট কিন্তু তাহাদের কাহাকেও নির্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করেন নাই। যদি কেহ আয়াতটি দোযখের একটি বিবরণ হিসাবে বিবেচনা করিতেন তবে তিনি দুঃখজনকভাবে ভুল করিতেন। কারণ এই আয়াতে উল্লিখিত "পরিখাবাসী লোক" (আস'হ'াবু'ল-'উখদূদ) যাহারাই হউক, ইহা পরিষ্কারভাবে একদল বিশ্বাসী সম্পর্কে বলা হইয়াছে যাহারা আগুন দ্বারা অত্যাচারিত হইতেছিল এবং তাহাদের অত্যাচারী অবিশ্বাসীরা তাহাদের এই অত্যাচারিত হওয়ার দৃশ্যটি দেখিতেছিল এবং উপভোগ করিতেছিল। কল্পনার কোন বিস্তৃতিতে ইহা সম্ভবপর নহে যে, কুরআন এরূপ দৃশ্যের বর্ণনা দিয়াছে যেখানে বিশ্বাসিগণ দোযখে শাস্তি পাইতেছেন এবং অবিশ্বাসীরা তাহা দেখিতেছে ও উপভোগ করিতেছে। এরূপ একটি ধারণা কুরআনের নয়, শেষ বিচার ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে বিশ্বাসের ধারক যে কোন ধর্মীয় গ্রন্থের মূলনীতির সঙ্গে কিম্ভূতকিমাকারভাবে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

সরাসরিভাবে আয়াতটিকে মুসলিম নির্যাতনের সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে না, এই বিবরণটি সম্পর্কে প্রশ্ন করা যাইতে পারে ঃ ওয়াট নিজেই স্বীকার করেন যে, কুরআন মহানবী ﷺ-এর শত্রুপক্ষের তৎপরতার "বিস্তারিত বিবরণ" দেয় না এবং ঐতিহ্যিক বিবরণসমূহ অত্যাবশ্যকীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্যের অপরিহার্য সম্পূরক উৎস, ইহা সত্ত্বেও কেন মক্কাবাসীদের বিরোধিতার বিস্তারিত বিবরণ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করার জন্য শুধু এই আয়াতটি বা শুধু কুরআনী সাক্ষ্য "সরাসরিভাবে" গ্রহণ করা হইবে?[৩৫]

ঘটনা এই যে, এখানে ওয়াট অন্যান্য স্থানের মত বিচ্ছিন্নভাবে ঐতিহাসিক বিবরণের তথ্য বিচার করেন এবং ইহার অবমূল্যায়ন করেন। তাহার পদ্ধতিতে তিনি উভয় প্রকার প্রমাণ বিবেচনা করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বাস্তবে তিনি প্রমাণের দুইটি ধরনের সতর্কভাবে তুলনা ও উহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করার অতি প্রয়োজনীয় কাজটি সযত্নে পরিহার করেন। যে কোন একটির গুরুত্ব হ্রাস করার প্রচেষ্টা ব্যতিরেকে যদি ইহা করা হইত তবে মক্কাবাসীদের বিরোধিতার একটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের চিত্র আবির্ভূত হইত। তখন পরিষ্কার হইত যে, অবিশ্বাসীরা মুসলমানদের উপর নির্যাতন চালাইবার সময় কিছু সংখ্যক মুসলমানকে অমানবিকভাবে নির্যাতন করিয়া হত্যা করিয়াছে, অন্য কিছু সংখ্যককে তাহাদের বুকের উপর উত্তপ্ত ও ভারি পাথর চাপা দিয়া মরুভূমির মধ্যাহ্ন সূর্যের নিচে উন্মুক্তভাবে রাখিয়া দিয়াছে, কিছু সংখ্যক লোককে হাত-পা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া খালি গায়ে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর রাখিয়াছে, সম্ভ্রান্ত পরিবারের সদস্যদের নিষ্ঠুরভাবে আঘাত ও নির্যাতন করিয়াছে, তাহাদিগকে বন্দী ও অন্তরীণ করিয়া একাদিক্রমে কয়েক দিন ব্যাপী আহার ও পানীয় ব্যতিরেকে থাকিতে বাধ্য করিয়াছে, তাহাদের পরিবার ও গোত্র হইতে অন্যান্য কয়েক ডজন লোককে অস্বীকার ও বহিষ্কার করিয়াছে, মহানবী ﷺ-কে, যাঁহাকে অবিশ্বাসীরা হত্যা করার জন্য প্রকাশ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এমন কি গোপনভাবে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করে, হাতে পাইবার একমাত্র উদ্দেশ্যে একটি সম্পূর্ণ গোত্রকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত, বর্জিত ও অর্থনৈতিকভাবে অবরুদ্ধ করিয়াছে ইত্যাদি। যদি কোন ব্যক্তি অবিশ্বাসীদের পক্ষ সমর্থনকারী না হইয়া থাকেন, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, সহিংসতা ও শত্রুতার এইসব পদক্ষেপ যদিও "সব সময় কুরায়শদের আইনের গণ্ডীর মধ্যে ছিল", চরমভাবে অত্যাচারমূলক ছিল এবং কোনভাবেই "মৃদু" বা "সামান্য" ছিল না, যেমন ওয়াট আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন।

(খ) বনূ হাশিমের উপর চাপ সম্পর্কে ওয়াট

বিরোধিতার একটি কৌশল হিসাবে ওয়াট একটি পৃথক উপ-বিভাগে, বনূ হাশিমের উপর চাপ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।[৩৬] তিনি বলেন, "আবূ জাহলের নেতৃত্বে কুরায়শ নেতাগণ আবূ তালিবের নিকট হয় তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে তাহার নূতন ধর্মপ্রচার করা হইতে বিরত রাখিতে অথবা তাঁহার নিকট হইতে পাহারা প্রত্যাহার করিতে আবেদন জানায়"। কিন্তু আবূ তালিব কোনটি

করিতেও সম্মত হন নাই।[৩৭] ওয়াট এই প্রসঙ্গে বা বনূ হাশিমের বর্জন[৩৮] সম্পর্কে তাহার আলোচনা প্রসঙ্গে গুরুত্ব আরোপ করেন না যে, উভয় ক্ষেত্রে কুরায়শ নেতাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল মহানবী ﷺ-কে হত্যা করার জন্য তাঁহাকে তাহাদের হাতে পাওয়া এবং এইভাবে তাঁহার ধর্ম প্রচার বন্ধ করা। নিশ্চিতরূপে তাহারা চায় নাই যে, বনূ হাশিম মহানবী ﷺ-এর উপর হইতে তাহাদের সুরক্ষা প্রত্যাহার করুক যাহাতে তাহারা মহানবী ﷺ-এর উপর 'মৃদুভাবে' বা 'সামান্যভাবে' অত্যাচার চালাইতে পারে যাহাতে তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার বন্ধ করেন।

ওয়াট আরো বলেন, আবূ তালিব ও বনূ হাশিমের মনোভাব গোত্রের মর্যাদার প্রশ্ন ব্যতিরিকে "অর্থনৈতিক নীতির একটি প্রশ্ন" দ্বারা নির্ধারিত হইয়াছিল। কারণ ওয়াট যুক্তি দেখান, মহানবী ﷺ-এর আন্দোলন "প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় হইলেও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং এই ক্ষেত্রে" ইহা "বিবেক বর্জিত একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের প্রতি বিরোধিতার হিলফুল ফুযূলের একটি মনোভাব"-এর এবং "বনূ হাশিমের ঐতিহ্যবাহী নীতি"-এর একটি ধারাবাহিকতাই ছিল।[৩৯] এমনকি বনূ হাশিমের বর্জন, ওয়াট বর্ণনা করেন, "হিলফুল ফুযূলের ক্ষতিসধান করিয়াও এবং তাহাদের সহযোগী গোত্রসমূহের সমৃদ্ধিতে" একটি ধাপ ছিল।[৪০]

ওয়াট-এর অর্থনৈতিক ও বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যার এই অংশটির সমর্থনে তিনি সামান্য কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন যাহা বিপরীত ফল প্রদান করে এবং দেখায়, কিভাবে তিনি ঘটনাসমূহকে তাহাদের পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে উদ্ধৃত করেন। এভাবে বনূ হাশিমের হিলফুল ফুযূলের নীতির ধারাবাহিকতা রক্ষা করার তত্ত্বের সমর্থনে ওয়াট বলেন, যখন আবূ তালিব তাহার ভাগিনেয় বনূ মাখযূম গোত্রের 'আবূ সালামা ইব্‌ন আবদুল আসাদকে আশ্রয় দেওয়ার প্রস্তাব করেন তখন আবূ লাহাব তাহাতে সমর্থন দান করে।[৪১] এই কথার সাথে সাথে অনতিবিলম্বে ওয়াট যোগ করেন, আবূ লাহাবের ঘটনাটি "কৌতূহলোদ্দীপক"। কারণ সে বিরোধিতার চাপের কাছে "নতি স্বীকার করে" এবং তাহাদের সঙ্গে "তাহার ব্যবসায়িক সম্পর্কের" কারণে তাহার স্ত্রীর গোত্র আব্‌দ শামসের পক্ষ অবলম্বন করে।[৪২]

এখন, আবূ লাহাবের ঘটনাটি প্রকৃতপক্ষে "কৌতূহলোদ্দীপক" নয়, কৌতূহলোদ্দীপক হইতেছে ওয়াট কর্তৃক তাহার মতের সমর্থনে তাহাকে ব্যবহার করা। তাহার পূর্ববর্তী একটি রচনায় আবূ লাহাবের ঘটনাটিকে "ব্যক্তিতন্ত্রবাদ"-এর উন্মেষের একটি উদাহরণ হিসাবে তিনি উদ্ধৃত করেন।[৪৩] এখন তিনি বলেন যে, আবূ লাহাব বিরোধীদের চাপের নিকট "নতি স্বীকার করে" এবং তাহার স্ত্রীর গোত্রের সঙ্গে "ব্যবসায়িক সম্পর্ক" থাকার কারণে তাহাদের পক্ষাবলম্বন করে। যদি তাহার নীতি প্রথম হইতে তাহার অনুমেয় "ব্যক্তিতন্ত্রবাদ" এবং বনূ আবদ শামসের সঙ্গে তাহার ব্যবসায়িক সম্পর্ক দ্বারা পরিচালিত হইত তবে এই মন্তব্য করার প্রয়োজন হইত না যে, সে বিরোধীদের চাপের নিকট "নতি স্বীকার করে"।

প্রকৃতপক্ষে আবূ লাহাব মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারের একেবারে শুরু হইতেই তাহার উপর কোন চাপ ব্যতীতই তাঁহার বিরুদ্ধে বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু যদি আমরা ওয়াট-এর বিবরণের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা গ্রহণ করি এবং এই মন্তব্যটি গ্রহণ করি যে, আবূ লাহাবের আচরণ ব্যবসায়িক বিবেচনা ও বিরোধিতার চাপ উভয়টি দ্বারা পরিচালিত হইয়াছিল তবে ইহা খুব কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, ওয়াট একই সময়ে মন্তব্য করেন যে, আবূ লাহাব আবূ সালামার ব্যাপারে আবূ তালিবের পক্ষ সমর্থন করে। কারণ সে (আবূ লাহাব) বিবেক বর্জিত একচেটিয়া ব্যবসায়ীদের প্রতি বনূ হাশিমের বিরোধিতার নীতি অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিয়াছিল। যদি মহানবী ﷺ ও আবূ সালামাকে রক্ষা করার জন্য আবূ তালিবের ইচ্ছা হিলফুল ফুযূলের নীতি অব্যাহত রাখার কথিত অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা পরিচালিত হইত এবং যদি আবূ লাহাব আদৌ চিন্তা করিত যে, মহানবী ﷺ-এর আন্দোলন ও আবূ তালিবের নীতি হিলফুল ফুযূলের ঐতিহ্যবাহী নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, তবে আবূ সালামার ঘটনার প্রসঙ্গে এবং তাহাও আবার শুধু সাময়িকভাবে ঐ নীতিটি একটা এত পরবর্তী পর্যায়ে সমর্থন করার পরিবর্তে একবারে শুরু হইতেই সমর্থন করিত। প্রকৃত ঘটনা এই যে, হিলফুল ফুযূলের নীতির কথিত ধারাবাহিকতার প্রশ্ন ব্যতিরেকে অন্য কোন বিবেচনা ছিল আবূ সালামার প্রসঙ্গে আবূ তালিবের দাবির প্রতি আবূ লাহাবের সমর্থনের কারণ।

এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বনূ আব্দ শামস্ নিজেরাই পূর্বে হিলফুল ফুযূলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল। কিন্তু স্বয়ং ওয়াট-এর মতে, ইহার সঙ্গে এখন বনূ মাখযূমের "অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক সম্পর্ক" স্থাপিত হইয়াছে। কারণ, "ঐতিহ্যবাহী মৈত্রী সম্পর্ক" নয়, "সাধারণ স্বার্থ" ইহার নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।[৪৪] ঘটনা এরূপ হওয়ায় প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, কেন বনূ হাশিম একা এবং আবূ লাহাব নিজে হিলফের নীতি অব্যাহত রাখার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী হইবে? ওয়াট নিজেকে এই প্রশ্নই করেন না, উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা।

অনুরূপভাবে বর্জনের প্রসঙ্গে যাহাকে "বনূ মাখযুমের সমৃদ্ধিতে একটি ধাপ" হিসাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, ওয়াট সেই কবিতাটির উল্লেখ করেন যাহা ঘটনাটি উপলক্ষ্যে আবূ তালিব রচনা করেন বলিয়া কথিত হয়, যাহাতে তিনি কিছু সংখ্যক ব্যক্তিকে "হিলফুল ফুযূলের গোত্রসমূহের সকল সদস্য"কে পুরাতন শত্রু বনূ সাহম, বনূ জুমাহ ও বনূ মাখযূমকে তাহাদের সমর্থনদান করার জন্য নিন্দা করেন।[৪৫] ওয়াট আরো উল্লেখ করেন, যাহারা বর্জন প্রত্যাহার করার ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করেন, যেমন বনূ 'আমেরের হিশাম ইব্ন 'আমর, বনূ আসাদের আল-মুতইম ইব্ন 'আদী এইরূপ করেন। কারণ সময় অতীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা উপলব্ধি করেন যে, মহামৈত্রী বন্ধন ও বর্জন শক্তিশালী গোত্রসমূহের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ দৃঢ় করিতেছে।[৪৬]

এসব ঘটনা ওয়াট-এর তত্ত্বকে প্রকৃত সমর্থন করা তো দূরের কথা, বরং উপরে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহকে গুরুত্বের সাথে উত্থাপন করে। কারণ আবূ তালিবের বিখ্যাত কবিতাটির সন্দেহজনক

প্রামাণিকতার প্রশ্ন ব্যতিরেকে এমনকি যদি ইহা ঘটনার প্রকৃত অবস্থা প্রতিফলিত করে বলিয়া ধরা হয়, দেখায় যে, কবিতায় উল্লিখিত নেতাগণ, যাহাদের সকলেই পূর্ববর্তী কালে হিলফের অন্তর্ভুক্ত গোত্রসমূহের সদস্য ছিলেন, আবূ তালিবের নীতি বা মহানবী ﷺ-এর আন্দোলনকে হিলফের নীতির ধারাবাহিকতা বা ইহার প্রতিরক্ষারূপে বিবেচনা করেন না। ইহাও বলা খুব প্রমাণ সিদ্ধ নয় যে, যাহারা বর্জন প্রত্যাহার করায় নেতৃত্ব দিয়াছিলেন সময় অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ইহার লক্ষ্য ছিল হিলফুল ফুযূলের গোত্রসমূহের ক্ষতিসাধন করিয়া বনূ মাখযূমের সমৃদ্ধি। সর্বোপরি, মহানবী ﷺ-এর প্রতি ঐ সকল কুরায়শ নেতাদের আচরণ যাহাই হউক, তাহারা ছিল চতুর ব্যবসায়ী এবং শুরু হইতেই বনূ মাখযূমের কৌশল লক্ষ্য করিতে সমর্থ হয়। তাহা হইলে কিভাবে বর্জন প্রথাটি হিলফের বাহিরের গোত্রসমূহের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করিত. যেখানে হিলফের সব গোত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত না হইয়া কেবল বনূ হাশিম (বনূ মুত্তালিবসহ)-এর বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইয়াছিল? ইহাও সম্পূর্ণ সঠিক নয় যে, বর্জন নীতি প্রত্যাহার করার আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ হিলফুল ফুযূলের গোত্র হইতে আসিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে বনূ মাখযূমের যুহায়র ইবন 'আবী উমায়্যা কুরায়শদের সমাবেশে বিরোধী পক্ষের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন, যেখানে বর্জন নীতির প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ওয়াট এই প্রসঙ্গে উহার সম্পর্কে উল্লেখ করা সযত্নে পরিহার করিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইভাবে বনূ হাশিমের উপর ফুযূলের গোত্রসমূহের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করিয়া বনূ মাখযূম সমৃদ্ধিতে একটি ধাপ ছিল এবং বিপরীতক্রমে আবূ তালিব মহানবী ﷺ-কে সমর্থন দান করিয়াছিলেন এই কারণে যে, আন্দোলনটি ছিল হিলফুল ফুযূল কর্তৃক প্রবর্তিত বিবেক বর্জিত ব্যবসায়ীদের বিরোধিতার নীতির ধারাবাহিকতা, ধোপে টেঁকে না বা ইহার স্বপক্ষে ওয়াট কর্তৃক তুলিয়া ধরা ঘটনাবলীর দ্বারাও ইহা সমর্থিত হয় না।

অনুবাদ ঃ মুহঃ আবু তাহের

তথ্যনির্দেশিকা

১. মুইর, পূ. গ্র., পৃ. ৬৪।

২. মুইর, পূ. গ্র., পৃ. ৬৬।

৩, মুইর, পূ. গ্র., পৃ. ৬৬।

৪. মুইর, পূ. গ্র., পৃ. ৬৭।

৫. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., পৃ. ১২১-১২২।

৬. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২১-১২২, ইয়া'কূবীকে উদ্ধৃত করিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮ এবং ইব্‌ন সা'দ, ২খ., পৃ. ১৭৮।

৭. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২২।

৮. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২২।

৯. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২৩।

১০. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ।

১১. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২৩-১২৫।

১২. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২৫।

১৩. মুইর, পূ. গ্র., তৃতীয় সং., ১০৩।

১৪. Infra, p. 763 গ.

১৫. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২৬।

১৬. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১২৬-১২৭।

১৭. Supra, pp. 652-653.

১৮. Leo Caeta ni, Ann, ১খ.; পৃ. ২৪৪।

১৯. Watt, M at M., ১১৭-১১৮।

২০. Watt, M at M., ১১৮।

২১. Watt, M at M., ১১৮।

২২. Watt, M at M., ১১৮।

২৩. Watt, M at M., ১১৮।

২৪. Watt, M at M., ১১৮।

২৫. Watt, M at. M., ১১৯।

২৬. Supra, p. ৫২৮।

২৭. Supra, p. ১২৩-১৩০।

২৮. Supra, p. ১২৩।

২৯. Supra, p. ১৩৩।

৩০. পূ. গ্র.।

৩১. Supra, p. ১৩২; আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هجَـرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جهَـدُوْا وَصَبَـرُوْا اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٦ : ١١١).

৩২. Ibid.

৩৩. Ibid, 132.

৩৪. উদাহরণের জন্য দেখুন, কুরআন ২ ঃ ২১৪ এবং ২৮ ঃ ৪।

৩৫ ঐ, পৃ. ১৩১। আরও দেখুন তাহার "The Reliability of Ibn Ishaq's Sources", in La Vie Du Prophete Mahomet Colloque de Strassboug, October 1980. pp 31-43.

৩৬. Watt, M at M., ১১৯-১২২।

৩৭. Watt, M at M., ১১৯-১২০।

৩৮. Watt, M at M., ১২০-১২২।

৩৯. Watt, M at M., ১২০।

৪০. Watt, M at M., ১২১।

৪১. Watt, M at M., ১২০।

৪২. Watt, M at M., ১২০।

৪৩. Supra, P.109; আরও দেখুন Watt, M at M, 18-19.

৪৪. Watt পৃ. গ্র. ১২২।

৪৫. Watt পৃ. গ্র. ১২২।

৪৬. Watt পৃ. গ্র., পৃ. ১২২।

তেত্রিশতম অধ্যায়

অবিশ্বাসীদের বিরোধিতা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণ

এক ঃ অবিশ্বাসীদের ও প্রাচ্যবিদদের মতামতের সাদৃশ্য

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে যেমন ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, বিশ শতকের প্রারম্ভে কাল হইতে প্রাচ্যবিদগণ মহানবী ﷺ ও তাঁহার ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধে মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদের বিরোধিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কুরআনী সাক্ষ্যসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইরূপ করিতে তাহারা দুইটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। তাহারা জোর দিয়া বলেন, মক্কাবাসীদের বিরোধিতার ইতিহাস ছিল একটি বিতর্কের বিষয়। ইহাতে প্রধানত মহানবী ﷺ এবং তাঁহার বাণীর মৌখিক সমালোচনা ছিল, নবদীক্ষিতদের উপর শারীরিক নির্যাতন নয়। দ্বিতীয়ত, এইভাবে প্রাচ্যবিদগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উত্থাপিত অবিশ্বাসীদের বিরোধিতার যথার্থতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন।

নবদীক্ষিতদের উপর মক্কাবাসীদের নির্যাতন যে "মৃদু" বা "সামান্য" ছিল না তাহা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখান হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ে অবিশ্বাসীদের দ্বারা উত্থাপিত বিভিন্ন ধরনের বিরোধিতা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মতামতসমূহ আলোচিত হইবে। এই বিরোধিতা নবুওয়াত, ওহী, পুনরুজ্জীবন, তাকদীর (ক'দর), মু'জিযা এই ধরনের অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। স্পষ্টত একটি অধ্যায়ে এই সকল বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা সম্ভবপর নহে। সুতরাং বর্তমান অধ্যায়টি বিরোধিতার উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখা এবং কিভাবে ঐসব মন্তব্য অযথার্থ বা ভুল তাহা প্রদর্শন করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। তাহা করিতে যাওয়ার পূর্বে ইহা উল্লেখ করা সময়োপযোগী হইবে যে, প্রাচ্যবিদদের মতামত এবং ধারণাসমূহ অবিশ্বাসীদের দ্বারা উত্থাপিত বিরোধিতার সঙ্গে বহুল পরিমাণে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদের আপত্তিসমূহের সারাংশ ছিল এই যে, মুহাম্মাদ ﷺ নবী বা আল্লাহ্‌র দূত ছিলেন না। প্রাচ্যবিদগণ প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে এই একই জিনিস বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করিত যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ্‌র নিকট হইতে কোন ওহী বা

বার্তা পান নাই। তবে তিনি একজন শয়তান বা জিন্ন বা কোন অতি প্রাকৃত সত্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। প্রাচ্যবিদগণ অনুরূপভাবে প্রমাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন যে, মহানবী ﷺ-এর দ্বারা প্রচারিত বাণী ছিল আল্লাহ্ হইতে প্রাপ্ত, একথা তিনি অকৃত্রিমভাবে বিশ্বাস করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা ছিল এমন কিছু যাহা তাঁহার নিকট অন্যদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল অথবা তাঁহার মন বা চিন্তা হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল, যাহা ছিল একটি "বুদ্ধিবৃত্তিক" বা "কাল্পনিক" বাচনভঙ্গি। প্রকৃত প্রস্তাবে মহানবী ﷺ -এর অকপটতা সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের স্বীকৃতি ওহী বিষয়ে তাহাদের এই মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

মক্কার অবিশ্বাসী মুশরিকরা অভিযোগ করে যে, মহানবী ﷺ উন্মাদ হইয়া গিয়াছিলেন অথবা একজন কবি ছিলেন। প্রাচ্যবিদগণের অনেকে, যদিও মহানবী ﷺ -এর উপর উন্মত্ততা আরোপ করেন না, বলেন যে, তিনি কোন ধরনের পীড়াগ্রস্ত ছিলেন, মৃগী অথবা মূর্ছা যাওয়ার পীড়া। তাহারা সাধারণভাবেও ভাবেন যে, তিনি ছিলেন এক ধরনের কবি এবং কুরআনও কবিতা সংক্রান্ত রচনা কৌশলের ধরনে রচিত।

মক্কার পৌত্তলিক অবিশ্বাসীরা অভিযোগ করে, মহানবী ﷺ যাহা প্রচার করেন তাহা ছিল "প্রাচীন কালের লোকদের কাহিনী"। প্রাচ্যবিদগণও মনে করেন যে, মহানবী ﷺ ব্যাপকভাবে ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মশাস্ত্র ও বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াছিলেন।

অবিশ্বাসীরা অভিযোগ করে যে, মহানবী ﷺ কতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক গৃহে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। প্রাচ্যবিদগণ কম-বেশী একই রকম ধারণা পোষণ করেন এবং বলেন যে, তাঁহার কোন নির্দিষ্ট গৃহশিক্ষক না থাকিলেও তিনি ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে অনেক কিছু শিক্ষা লাভ করেন, বিশেষভাবে ওয়ারাকা ইবন নাওফালের ন্যায় ব্যক্তিদের নিকট হইতে।

মক্কার অবিশ্বাসীরা ভাবিয়াছিল যে, মহানবী ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি ও নেতৃত্ব। প্রাচ্যবিদগণও অনুরূপভাবে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও পালিত ভূমিকার জন্য তাঁহার প্রস্তুতি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। অবিশ্বাসীদের অভিযোগসমূহের একটি ছিল, তিনি পরিবারসমূহে ভাঙ্গন ধরাইতেছেন এবং শিশুদেরকে প্রলুব্ধ করিয়া তাহাদের পিতা-মাতা হইতে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন। প্রাচ্যবিদগণ, বিশেষভাবে ওয়াট, একই ধরনের অভিযোগ প্রণয়ন ও সমর্থন করেন।

মক্কার অবিশ্বাসীদের আর একটি আপত্তি ছিল, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ কর্তৃক তাঁহার দূত হিসাবে নির্বাচিত হইবার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না। প্রাচ্যবিদগণ এই আপত্তি সম্পর্কে কুরআনী উল্লেখ হইতে তাহাদের পথনির্দেশ গ্রহণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করেন যে, মহানবী ﷺ প্রকৃতপক্ষে কোন সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী পরিবারের সন্তান ছিলেন না—যেরূপ উৎসসমূহ তাঁহার সম্পর্কে বর্ণিত আছে এবং তাঁহার পরিবার কোন এক সময়ে মক্কার সমাজে গুরুত্বপূর্ণ থাকিলেও তাঁহার মঞ্চে আসার সময়ে তাহারা পূর্ব গৌরব হারাইয়াছিল।

কুরায়শ নেতাদের একজন সুনির্দিষ্টভাবে বলেন যে, তিনি মহানবী ﷺ-এর ধর্মপ্রচারকে শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের জন্য তাহার (নেতাটির) গোত্র বানূ হাশিমের মধ্যে সুপ্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার শুধু একটি পর্যায় হিসাবে বিবেচনা করেন। বিশেষভাবে ওয়াটের বাগাড়ম্বরপূর্ণ "জড়বাদী" ব্যাখ্যা এবং তাহার তত্ত্ব যে, ইসলামের আবির্ভাবকে কুরায়শ গোত্রসমূহের দুইটি দলের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধির জন্য সুপ্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আলোকে দেখিতে হইবে, কুরায়শ নেতার দৃষ্টিভঙ্গির একটি অভিযোজন ও বিশদীকরণ বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এইভাবে ইহা মোটেই অস্বভাবিক নয় যে, সাধারণভাবে প্রাচ্যবিদগণ অবিশ্বাসীদের দ্বারা আনীত আপত্তিসমূহ সমর্থন ও অনুমোদন করার চেষ্টা করেন। ইহা মারগোলিয়থ ও ওয়াট-এর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই প্রসঙ্গে তাহাদের প্রধান মন্তব্যসমূহ পরবর্তী দুইটি অংশে আলোচনা করা হইল।

দুই ঃ মারগোলিয়থ-এর মন্তব্য প্রসঙ্গ

মারগোলিয়থ-এর মতানুসারে কুরআনে "উল্লিখিত এবং প্রতীয়মানভাবে উত্তর প্রদত্ত আপত্তিসমূহ" নূতন পদ্ধতির প্রতিটি অংশ এবং বৈশিষ্ট্যের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিগতভাবে মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে, তাঁহার নবুওয়াতী ধারণার বিরুদ্ধে, তাঁহার রীতিনীতি, তাঁহার বিবৃতিসমূহ, তাঁহার মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হইয়াছিল।[১] তিনি আরো বলেন, কুরআনের অধিকাংশ "বিতর্কমূলক, কিন্তু ধর্মোপদেশমূলক বা বর্ণনামূলক"[২] না হইলেও ইহা নিশ্চিত যে, একটি পূর্ববর্তী সময়ে কোন আপত্তিসমূহের উত্তরে "ইহা লিখিত আকারে প্রচারিত হইয়াছিল"।[৩] এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ কিছু পরিমাণে বেমানানভাবে মন্তব্য করেন যে, মহানবী ﷺ "বাস্তবিকই একজন শক্তিশালী প্রচারক" ছিলেন। কিন্তু "আপাত দৃষ্টিতে তিনি উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন বিতার্কিক ছিলেন না এবং তাঁহার পরিকল্পনা বাস্তবায়নকালে তিনি ব্যর্থ হইয়াছিলেন"। মারগোলিয়থ আরো অভিযোগ করেন, মহানবী ﷺ "প্রশ্নের আক্রমণাত্মক ও অপমানজনক উত্তর দিতে দক্ষ ছিলেন"। এইজন্য তিনি "প্রকাশ্য বিতর্কে অংশগ্রহণ পরিহার করার এবং অবিশ্বাসীরা ডাকিলে বা প্রশ্ন করিলে কৌশলে প্রশ্নটি এড়াইয়া বা প্রস্থান করিয়া যাওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন"।[৪]

মারগোলিয়থ তাহার এই বিবৃতির সমর্থনে যে, মহানবী ﷺ "প্রশ্নের আক্রমণাত্মক ও অপমানজনক উত্তর দিতে দক্ষ ছিলেন" আত-তাবারীর তাফসীর, ২৩ খ, ১৯ উদ্ধৃত করেন। গ্রন্থটিতে উল্লেখ আছে যে, ইহার ব্যাখ্যা হইল যাহারা জান্নাতবাসী হইবেন তাহাদের বর্ণনা সম্পর্কিত। বিশেষভাবে (৩৬ ঃ ৫৫) اِنَّ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِىْ شُغُلٍ فٰكِهُوْنَ এই আয়াতের ব্যাখ্যা এবং আলোচনাটি 'ফী শুগুলিন ফাকিহূন' অর্থকেন্দ্রিক। ঐ অভিব্যক্তিটির অর্থ যাহাই হউক না কেন, ইহা কোনভাবেই একজন বিতার্কিক হিসাবে মহানবী ﷺ-এর বৈশিষ্ট্য অথবা তাঁহার প্রতি করা প্রশ্নের আক্রমণাত্মক ও অপমানজনক উত্তর দিবার কথিত দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত

নহে। মারগোলিয়থ কর্তৃক তাহার বিবৃতির সমর্থনে এই উল্লেখটির উদ্ধৃতি সম্পূর্ণরূপে অশুদ্ধ এবং দুঃখজনকভাবে বিভ্রান্তিকর।

উপরে উল্লিখিত তাহার মন্তব্যটি অন্যায্য হওয়ায় ইহার উপর ভিত্তি করিয়া করা অন্য মন্তব্যটিও, যেমন আক্রমণাত্মক উত্তর দেওয়ার জন্য তাঁহার দক্ষতার কারণে মহানবী ﷺ প্রকাশ্য বিতর্কে অংশগ্রহণ পরিহার করা ইত্যাদির জন্য আল্লাহ্র নিকট হইতে নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একটি অন্যায় বিবৃতি ও অন্যায্য দাবি। মারগোলিয়থ অবশ্য আল্লাহ্র নিকট হইতে প্রাপ্ত কথিত নির্দেশের সমর্থনে আয়াত ৬ ঃ ৬৭ (প্রকৃতপক্ষে ৬ ঃ ৬৮) উদ্ধৃত করেন। ইহার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَاِذَا رَاَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوْضُوْنَ فِيْ اٰيٰتِنَا فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ.

"আর যখন তুমি দেখ, তাহারা আমার আয়াতসমূহের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে তখন তাহাদের নিকট হইতে সরিয়া থাকিবে, যে পর্যন্ত না তাহারা অন্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় .... " (৬ঃ ৬৮)।

স্পষ্টত ইহা মহানবী ﷺ-এর প্রতি তাহাদিগকে পরিহার করার জন্য একটি নির্দেশ যাহারা প্রত্যাদেশকে তীব্রভাবে গালাগালি দিয়াছিল এবং ইহার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়াছিল।[৪] ইহা এই অর্থ বুঝাইতেও গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, মহানবী ﷺ ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত না হওয়ার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু না এই আয়াত, না কুরআনের অন্য কিছু ইঙ্গিত দেয় যে, নির্দেশটি প্রদান করা হইয়াছিল এইজন্য যে, তিনি, যেরূপ মারগোলিয়থ অভিযোগ করেন, বিতর্কে "আক্রমণাত্মক ও অপমানজনক" ভাষা ব্যবহার করিতে দক্ষ ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আয়াতটির গুরুত্ব, ঐ সকল ব্যক্তির সঙ্গে মৌখিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার নিষ্ফলতার উপর, যাহারা শুধু প্রত্যাদেশের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং ইহাকে অস্বীকার করার জন্য দৃঢ়সংকল্প। কারণ কোন ফলপ্রসূ প্রয়োজন সাধিত হইবে না যদি আলোচনাটি উপলব্ধি ও অনুসন্ধানের অভিপ্রায়ে পরিচালিত না হয়।

নির্দেশটির অন্তর্নিহিত অর্থ যে এই তাহা ৪ ঃ ১৪০ আয়াতে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে, যাহা স্পষ্টভাবে উপরে উল্লিখিত একটিব সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং ইহার একটি ব্যাখ্যাসদৃশ। আয়াতটি নিম্নরূপ ঃ

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتٰبِ اَنْ اِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَاُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهٖ....٤/ ١٤٠.

"আর কুরআনে তোমাদের প্রতি তিনি নির্দেশ নাযিল করিয়াছেন, যখন তোমরা শুনিতে পাইবে আল্লাহ্র আয়াতের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হইতেছে, তখন তোমরা তাহাদের সঙ্গে বসিবে না, যতক্ষণ না তাহারা প্রসঙ্গান্তরে চলিয়া যায় ..... " (৪ ঃ ১৪০)।

এই স্থানের এ নির্দেশটি ছিল যেমন মহানবী ﷺ-এর জন্য তেমনই সাধারণ বিশ্বাসীদের জন্যও প্রযোজ্য।

মারগোলিয়থ কর্তৃক আনীত আর একটি অভিযোগ এই যে, মহানবী ﷺ "একটি ভয়ঙ্কর দিন অতি নিকটবর্তী, এই ভয় প্রদর্শন করার জন্য বাইবেলের দ্বিতীয় খণ্ডের নবীদের দৃষ্টান্তসমূহ অনুসরণ করিয়াছেন" এবং তাহাদের কাহিনীসমূহ বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ "তাহাদের মাধ্যমে" তিনি তাঁহার বিরোধীদের আপত্তিসমূহ কাটাইয়া উঠিয়াছেন।[৬] মারগোলিয়থ-এর মতানুসারে মক্কাবাসিগণ "পৌত্তলিকতার আচারানুষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকিলেও ঘটনা-পরম্পরার একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং তাহারা একজন নবীর অবাধ্য হইবার দোষে যে কোন পার্থিব শাস্তির ভীতির প্রতি যুক্তিযুক্তভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এবং তাহারা এই ধারণা পোষণ করিত যে, "এই সম্পর্কে মানবজাতির নৈতিক চরিত্রের কোন ভূমিকা ছিল না"। এজন্য তাহারা "অবজ্ঞাপূর্ণভাবে" মহানবী ﷺ-কে তাহাদের উপর শাস্তি আপতিত করিতে বলিত। কিন্তু মহানবী ﷺ বিচক্ষণতার সহিত প্রচার করিতেন যে, মক্কায় তাঁহার উপস্থিতি বিপদকে নিবারিত রাখিতেছে! অথবা অন্যান্য নগরীসমূহ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র অভিজ্ঞতা, যেগুলি আলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর মাধ্যমে কোন আলৌকিক ঘটনা প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছে"।[৭]

মারগোলিয়থ মক্কাবাসীদের কাঙ্ক্ষিত অলৌকিক ঘটনাবলীর ধরনও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, শুধু একটি ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ ভবিষ্যদ্বাণী করার ঝুঁকি গ্রহণ করিয়াছিলেন, "সেই বিখ্যাত ঘোষণাটি যে, 'পৃথিবীর নিকটতম অংশে' গ্রীকগণ অথবা রোমানগণ পরাজিত হইলেও তাহারা আবার বিজয় অর্জন করিবে"। মারগোলিয়থ আবার বলেন যে, "অনুমানটি ঝুঁকির সম্মুখীন করার জন্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না"।[৮]

মারগোলিয়থ আবার বলেন, "বদরের যুদ্ধের মাধ্যমে বিজয়দৃপ্তভাবে একটি অলৌকিক ঘটনার দাবি পূরণ করিতে সফল হইবার" পূর্বে মহানবী ﷺ-কে বহু বৎসর অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। তাহার পূর্বে তাঁহাকে কুরআন লইয়া শুধু যে কোন উপায়ে কার্য সাধনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে। তিনি বলেন যে, তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা না থাকিলেও "অলৌকিক প্রজ্ঞা" ছিল। এজন্য তিনি প্রাচীন কালের ঘটনার বর্ণনা দিতে পারিয়াছেন, " যে সময়ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন না"। এবং পরিশেষে যখন তিনি নিজস্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতিনীতিতে সম্পূর্ণ দক্ষ হইলেন, তখন যে কোন ব্যক্তিকে, এমনকি জিনের সহায়তায় "এত সুন্দরভাবে রচনা করার জন্য" প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানাইলেন।[৯]

কুরায়শগণ, তিনি ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া বলেন, "কুরআনের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী উভয়টির অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি সম্পর্কে" আপত্তি প্রদর্শন করে এবং বলে যে, "খৃস্টান ও

ইয়াহূদী গ্রন্থ”–এর কাহিনীসমূহ যাহা মহানবী ﷺ শুনাইয়াছেন, লোকজন তাঁহাকে শিখাইয়াছিল যাহাদের সম্পর্কে তাহারা উল্লেখও করিয়াছে।

মারগোলিয়থ পুনর্বার বলেন, “সেখানে কোন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা থাকুক বা না থাকুক, সম্ভবত কাহিনীগুলি মক্কাবাসীদের নিকট মোটেই নূতন ছিল না”। তদুপরি মক্কাবাসীদের একজন, আন-নাদর ইবনুল হারিছ প্রতিদ্বন্দ্বিতার আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া পারস্যের রাজাদের কাহিনী পদ্যে রূপান্তরিত করে এবং “মহানবী ﷺ যে ধরনের বৈঠকে কুরআন প্রচার করিতেন তদ্রূপ বৈঠকে” ঐ “কবিতাসমূহ” পাঠ করে। আন-নাদরের কার্যের প্রতিক্রিয়া “নিশ্চয়ই খুব ক্ষতিকর ছিল; কারণ মহানবী ﷺ বদরের যুদ্ধে যখন তাহাকে নাগালের মধ্যে পান তখনই তাহাকে হত্যা করেন, অপরপক্ষে অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদিগকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্ত করার অনুমতি প্রদান করেন”।[১০]

মারগোলিয়থ এভাবে মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে মক্কাবাসীদের বিতর্ক প্রসঙ্গে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত চারিটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করেন। (ক) তিনি বলেন, মহানবী ﷺ আল্লাহ্র দিক হইতে একটি আসন্ন শাস্তির ভয় দেখান। কিন্তু যখন তাঁহাকে শাস্তি আপতিত করার জন্য চ্যালেঞ্জ জানান হয় তখন তিনি এই কথা বলিয়া তাহা করা হইতে বিরত হন যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে তাঁহার উপস্থিতি শাস্তি প্রেরণ করা হইতে আল্লাহ্কে বিরত রাখিতেছে”।

(খ) মহানবী ﷺ অনুরূপভাবে এই বলিয়া একটি অলৌকিক ঘটনা উপস্থাপন করা পরিহার করেন যে, বহু প্রাচীন জনগোষ্ঠী অলৌকিক ঘটনা হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। এই ঘটনা আল্লাহকে তাঁহার “মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা” প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

(গ) বদর যুদ্ধের পূর্বে মহানবী ﷺ এই বলিয়া কুরআন লইয়া শুধু “যে কোন উপায়ে কার্যসাধনের উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত” থাকেন যে, “তাঁহার কোন অলৌকিক ক্ষমতা না” থাকিলেও অলৌকিক প্রজ্ঞা ছিল। এজন্য তিনি প্রাচীন কালের ঘটনার বর্ণনা দিতে পারিয়াছেন যখন তিনি বিদ্যমান ছিলেন না। আর যখন তিনি নিজের রীতি-নীতিতে সম্পূর্ণরূপে দক্ষ হইয়া উঠিলেন তখন যে কোন ব্যক্তিকে “এত সুন্দরভাবে রচনা করার জন্য” প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইতে আহ্বান জানাইলেন।

(ঘ) মক্কাবাসীরা এই বলিয়া কুরআনের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী, উভয়টির অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতি সম্পর্কে আপত্তি করে যে, মহানবী ﷺ অন্যের দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া খৃস্টান ও ইয়াহূদী গ্রন্থের কাহিনীসমূহ বর্ণনা করেন। অবশ্য কুরায়শ বিরোধীদের একজন, আন-নাদর পারস্যের রাজাদের কাহিনী এত সাফল্যের সঙ্গে পদ্যে রূপান্তরিত করে যে, মহানবী ﷺ যখন বদরের যুদ্ধে তাহাকে আয়ত্বের মধ্যে পান হত্যার নির্দেশ দেন, যদিও অন্য বন্দীগণকে মুক্তিপণের বিনিময়ে মুক্তি দেন।

এই সকল অভিযোগ ও সমালোচনার ভিত্তি কিছু সংখ্যক কুরআনী আয়াতের একগুচ্ছ ভুল ধারণা ও ভুল ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। একটি ভয়ঙ্কর দিন অতি নিকটবর্তী প্রসঙ্গে, যাহার সম্পর্কে মহানবী ﷺ এবং বাইবেলের দ্বিতীয় খণ্ডের নবীগণ সতর্ক করিয়াছেন, ইহা "শেষ বিচারের দিন"-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, পৃথিবীতে পাপীদের উপর আপতিত আল্লাহ্‌র দেওয়া কোন শাস্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। মারগোলিয়থ সাধারণভাবে ইহাকে আল্লাহ প্রদত্ত ঐ সকল শাস্তির দৃষ্টান্তের সঙ্গে তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন, যাহা কিছু সংখ্যক প্রাচীন জাতির উপর তাহাদের অবিরাম সীমালঙ্ঘনের কারণে পতিত হইয়াছিল এবং কুরআনের বহুসংখ্যক আয়াতে যাহাদের উল্লেখ রহিয়াছে। মহানবী ﷺ বাস্তবিকই অবিশ্বাসীদের আচার-ব্যবহার সংশোধন করার উদ্দেশ্যে এই সকল আয়াতের সঙ্গে "ভয়ঙ্কর দিন"-এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ঐ সকল আয়াতগুলিও পাঠ করিয়াছিলেন। প্রাচীন জাতি সম্পর্কিত আয়াতগুলি নিশ্চয়ই ইঙ্গিত দিয়াছিল যে, মক্কাবাসিগণ যদি তাহাদের অবিশ্বাস ও অবাধ্যতার প্রতি অবিচল থাকে তবে এ ধরনের দুর্ভাগ্য তাহাদের উপর নামিয়া আসিতে পারে। কিন্তু মহানবী ﷺ কখনই এ কথা বলেন নাই যে, তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবার 'ক্ষমতা তাঁহার আছে বা কখনও ইঙ্গিত প্রদান করেন নাই যে, এই ধরনের শাস্তি প্রেরণ করার জন্য তিনি আল্লাহকে অনুরোধ জানাইবেন। মক্কার অবিশ্বাসিগণ ভুল বুঝিয়াছিল, যেমন মারগোলিয়থ ও ভুল বুঝিয়াছেন যে, মহানবী ﷺ মিথ্যাভাবে তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন সেইজন্য তাহারা তাঁহার নিকট শাস্তি অবতীর্ণ করার দাবি জানাইয়াছিল। মহানবী ﷺ এত তাড়ার মধ্যে ছিলেন না বা মক্কার জনসাধারণের অধিকাংশ পরিণামে সত্যধর্ম গ্রহণ করিবে এই ব্যাপারে হতাশও হন নাই। এই কারণে তাঁহার ধর্মপ্রচারের মক্কী যুগের সর্বাপেক্ষা অন্ধকারময় সময়েও তাঁহার জনসাধারণকে শাস্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করেন নাই। যদি কেহ মক্কায় অবতীর্ণ সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহ সতর্কতা সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, অবিশ্বাসীদের মূর্খতাপূর্ণ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত একমাত্র ও সঙ্গতিপূর্ণ উত্তরটি এই ছিল যে, শাস্তি প্রদানের বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিজস্ব পরিকল্পনা ছিল এবং তিনি তাঁহার নিজের নির্ধারিত সময় অনুসরণ করিয়াছিলেন, ভ্রান্তিপ্রবণ ও নির্বোধ মানুষের খেয়াল-খুশী অনুসারে নয়।

আল্লাহ তাঁহার সর্বাত্মক জ্ঞানে জানিতেন যে, মক্কাবাসীদের অধিকাংশ সংশোধিত হইবার ক্ষমতাবিহীন ছিল না এবং মহানবী ﷺ যে তাহাদের পরিণামে সত্যধর্মে ধর্মান্তরিত হইবার প্রত্যাশায় সঠিক ছিলেন, তাহা এই ঘটনা দ্বারা বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয় যে, তাঁহার জীবদ্দশায় এবং এক দশকের সামান্য অধিক সময়ের মধ্যে মক্কাবাসিগণ শুধু সত্যধর্মে দীক্ষিতই হয় নাই, ইহার অত্যুৎসাহী সমর্থকও হইয়াছিল। তাহাদের ও মারগোলিয়থ এর মধ্যে পার্থক্য এই যে, যখন তাহারা সত্য প্রত্যক্ষ করে তখন অতীতের মূর্খতাকে উপলব্ধি করে এবং ইহার ব্যাপক সংশোধন সাধন করে, অপরপক্ষে তিনি কার্যত তাহাদের অবিশ্বাসকে অবলম্বন করেন এবং নবূওয়াতের প্রতি

মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাবির কথিত প্রতারণার সমর্থনে একটি যুক্তি হিসাবে তাহাদের মূর্খতাপূর্ণ দাবি উদ্ধৃত করেন যাহা তাহারা নিজেরাই প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যাহার করিয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ-এর সর্বাপেক্ষা গুরুতর ভুলটি তাহার এই বিবৃতির মধ্যে নিহিত যে, মহানবী ﷺ আসন্ন শাস্তি অবতীর্ণ পরিহার করার জন্য বিচক্ষণতার সহিত এই যুক্তি উপস্থাপন করেন যে, মক্কাবাসীদের মধ্যে তাঁহার উপস্থিতি আল্লাহ্‌কে শাস্তি প্রেরণ করা হইতে বিরত রাখিয়াছে।

এই আয়াতের স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে মারগোলিয়থ-এর ইঙ্গিত এই আয়াতের সহিত সম্পর্কযুক্ত ৮ ঃ ৩৩ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ "এবং আল্লাহ কখনও তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন না যতক্ষণ তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে...."। তিনি (মারগোলিয়থ) লক্ষ্য করিতে ব্যর্থ হন যে, এই 'আয়াতটি বদরের যুদ্ধের পর মদীনায় নাযিল হইয়াছিল। এইভাবে ইহা কখনও মক্কাবাসী অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে তাহাদের মূর্খতাপূর্ণ দাবির উত্তরে অবতীর্ণ হয় নাই। ইহা এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করিয়া বিশেষভাবে মহানবী ﷺ এবং মুসলমানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল যে, বদরের যুদ্ধে মক্কার নেতাদের ধ্বংস ছিল আল্লাহ্‌র একটি কার্য, একটি অলৌকিক ঘটনা, কিন্তু আল্লাহ ইহাকে ঐ সময় পর্যন্ত মুলতবি রাখিয়াছিলেন। কারণ মহানবী ﷺ তখন পর্যন্ত হিজরত করেন নাই এবং তাহারা সত্যধর্মে দীক্ষিত হইবে এই প্রত্যাশায় তাহাদের মধ্যে কর্মরত ছিলেন। কিন্তু এখন তাহারা মহানবী ﷺ -কে এবং মুসলিমগণকে বিতাড়িত করিয়াছে এবং নিজদিগকে পবিত্র মসজিদ (কা'বা)-এর তত্ত্বাবধায়ক ধরিয়া লইয়া ইহার সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড হইতে বিশ্বাসিগণকে বিরত রাখিয়াছে। আল্লাহ্ উদ্ধত নেতাদের উপর উপযুক্ত শাস্তি অবতীর্ণ করিয়াছেন। পূর্ণ আয়াতটি এইরূপ ঃ

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ . وَمَا لَهُمْ اَنْ لاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ وَهُمْ يَصُدُّوْنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوْا اَوْلِيَاءَهُ اِنْ اَوْلِيَاؤُهُ اِلاَّ الْمُتَّقُوْنَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ (٨:٣٣-٣٤).

"এবং আল্লাহ কখনও তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন না যতক্ষণ তুমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করিবে। তাহা ছাড়া তাহারা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাকিবে ততক্ষণ আল্লাহ তাহাদের শাস্তি দিবেন না। আর তাহাদের মধ্যে এমনকি বিষয় আছে যাহার জন্য আল্লাহ তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করিবেন না? অথচ তাহারা পবিত্র মসজিদে যাইতে বাধা প্রদান করে, তাহারা পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়কও নয়। উহার তত্ত্বাবধায়ক তো মুত্তাকী ব্যতীত আর কেহ নয়। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই তাহা জানে না" (৮ ঃ ৩৩–৩৪)।

এইভাবে মক্কার নেতাদের মূর্খতাপূর্ণ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত উত্তর হওয়া তো দূরের কথা, ইহা বরং বদরের অলৌকিক ঘটনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া, যাহা তাহাদের অনুকূলে ঘটিয়াছিল, মহানবী ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল। ইহা, যেরূপ বিভ্রান্তিকরভাবে মারগোলিয়থ বলেন, শাস্তি অবতীর্ণ পরিহার করার জন্য মহানবী কর্তৃক উপস্থাপিত একটি বিচক্ষণতাপূর্ণ অজুহাত নয়। ইহা পরিষ্কারভাবে ঐ শাস্তির প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করে যাহা ইতোমধ্যে মক্কার উদ্ধত নেতাদের উপর আপতিত হইয়াছে এবং যাহা, ঘটনাক্রমে মারগোলিয়থ একটি আলৌকিক ঘটনা হিসাবে স্বীকার করেন, বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আয়াতটি এই ঘটনার উপরও গুরুত্ব আরোপ করে যে, পাপীদিগকে শাস্তি প্রদান করার জন্য আল্লাহ্‌র নিজস্ব পরিকল্পনা ও নির্ধারিত সময় রহিয়াছে এবং তিনি এমন পদ্ধতিতে শাস্তি প্রদান করেন যাহাতে ঐ ঘটনা হইতে নবীগণ ও বিশ্বাসিগণ বাঁচিয়া যায়।[১১]

মারগোলিয়থ-এর উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে, কুরআনের বিবৃতিটি, যাহাকে তিনি মহানবী -এর পক্ষে বিচক্ষণতাপূর্ণ অজুহাতরূপে ধরিয়া লইয়াছেন, যুক্তিসঙ্গতভাবে কোন অজুহাতই হইতে পারে না। কারণ পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনীসমূহ, কুরআনে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, নির্ভুলভাবে স্পষ্ট করে যে, যখন আল্লাহ কোন পাপী সম্প্রদায়কে ধ্বংস করেন তখন তিনি ব্যতিক্রমহীনভাবে একই সময়ে নবীগণ ও তাঁহাদের অনুসারীবৃন্দকে, যাহারা ঐ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, রক্ষা করেন। অনুরূপভাবে যদি আল্লাহ মক্কার অবিশ্বাসীদের শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিতেন তবে মহানবী মুহাম্মাদ ও তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে রক্ষা করা হইতে তাঁহাকে বিরত করার কেহই ছিল না।

একইভাবে মারগোলিয়থ-এর মন্তব্যটি বিভ্রান্তিকর যে, এই বলিয়া মহানবী কোন অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা হইতে বিরত থাকেন যে, প্রাচীন জনগোষ্ঠী সম্পর্কে আল্লাহ্‌র শাস্তিবিধান যাহারা তাঁহার নিদর্শন হইতে শিক্ষালাভ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল, তাঁহার মাধ্যমে কোন অলৌকিক ঘটনা প্রেরণ করিতে আল্লাহকে বিরত করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ আরো বলেন যে, মহানবী বাইবেলের অলৌকিক কাহিনীসমূহ বিশ্বাস ও স্বীকারের মাধ্যমে এবং "সম্পূর্ণরূপে সরল বিশ্বাস" সেগুলিকে পুনরায় বলার মাধ্যমে নিজেকে তাঁহার ধর্ম প্রচারের এবং তাঁহার নিজের নয়, তাঁহার কোন অলৌকিক ঘটনা উপস্থাপিত করার সমালোচনার সম্মুখীন করিয়াছেন।[১২] মারগোলিয়থ-এর ইঙ্গিত ১৭ ঃ ৫৯ আয়াতের প্রতি। "পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠী কর্তৃক নিদর্শন অস্বীকার করার ফলেই আমাকে নিদর্শনাবলী প্রেরণ করা হইতে বিরত থাকিতে হইয়াছে.....।"

وَمَا مَنَعَنَا اَنْ نُّرْسِلَ بِالاٰيٰتِ اِلاَّ اَنْ كَذَّبَ بِهَا الاَوَّلُوْنَ

এই আয়াতটি ব্যাখ্যা করিতে অগ্রসর হইবার পূর্বে তিনটি ঘটনার পুনরুল্লেখ করা প্রয়োজন। (এক) মহানবী কখনও নিজেকে কোন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে দাবি করেন

নাই বা এইজন্য কখনও কোন ব্যক্তিকে তাঁহাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান নাই যে, তিনি অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে পারেন। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, এবং অতএব মহানবী ﷺ জোর দিয়া বলেন যে, আল্লাহ্‌র অনুমতি ও নির্দেশ ব্যতিরেকে কোন অলৌকিক ঘটনার অবতারণা করা কোন নবীর কাজ ছিল না।[১৩]

(দুই) অবিশ্বাসীরাই নবূওয়াত সম্পর্কে তাহাদের বিচিত্র ধারণার জন্য শুধু অলৌকিক ঘটনাসহ নয়, তাহাদের দ্বারা নির্ধারিত অতি বিস্ময়কর ও আত্মঘাতী ক্রিয়াকাণ্ডসহ উপস্থিত হওয়ার জন্য মহানবী ﷺ-এর নিকট দাবি জানায়।

(তিন) ইহা সত্য নয় যে, আল্লাহ মহানবী ﷺ -এর হাত দিয়া কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটান নাই।

মহানবী ﷺ-এর অনুরোধে ঘটিত বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনা সম্পর্কে বিবরণের কথা না বলিলেও আল-কুরআন অলৌকিক ঘটনার অনেকগুলির সংঘটন সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান করে। বদরের যুদ্ধ একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল, তেমনি ছিল চন্দ্রের ক্ষণস্থায়ীভাবে দ্বিখণ্ডিত হইবার ঘটনা। ইসরা এবং মি'রাজ অলৌকিক ঘটনা ছিল এবং কুরআন নিজেই নিজস্ব চ্যালেঞ্জিং ঘোষণাবলে একটি চিরন্তন অলৌকিক ঘটনা, যাহা আল্লাহ তাআলা মহানবী ﷺ-এর উপর অবতীর্ণ করিয়াছেন।

এখন, যদি উপরে উল্লিখিত প্রথম ঘটনাটি স্মরণ রাখা হয় তবে ইহা পরিষ্কার হইবে যে, মহানবী ﷺ-এর কোন অলৌকিক ঘটনার অবতারণা পরিহার করার কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কারণ তিনি নিজের কোন অলৌকিক ক্ষমতা থাকা সম্পর্কে কোন দাবি করেন নাই। এবং যেমন তিনি বলিয়াছেন, স্বয়ং আল্লাহ নবীদের মাধ্যমে অলৌকিক ঘটনা ঘটাইয়াছেন, তিনি কোনক্রমেই বলিতে পারেন না যে, আল্লাহ ঘটান নাই এবং তাঁহার মাধ্যমে কোন অলৌকিক ঘটনা ঘটাইতে অসমর্থ ছিলেন। ইহাও সত্য নয়, যেমন ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার ক্ষেত্রে কোনটি সংঘটিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় ঘটনার সঙ্গে মারগোলিয়থ-এর বক্রোক্তি এবং এই প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতের সম্পর্ক রহিয়াছে। ১৭ ঃ ৫৯ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার বিবরণ[১৪] দেখায় যে, অবিশ্বাসীরা ঠিক তাহাদের উপর আসন্ন শাস্তি অবতীর্ণ করার দাবির ন্যায় সাফা পাহাড়কে সোনার পাহাড়ে রূপান্তরিত করা অথবা দেশের পাহাড় ও পর্বতগুলিকে নিশ্চিহ্ন করা এবং ইহাকে উর্বর ও কৃষি ভূমিতে পরিণত করার জন্য মহানবী ﷺ-এর নিকট, যদি তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ্‌র দূত হইয়া থাকেন, আল্লাহ্‌কে আহ্বান করার দাবি জানায়। ঔদ্ধত্য সহকারে এমনকি তাহারা তাহাদের উপর প্রস্তর বৃষ্টি বর্ষণ করার দাবি করে। আলোচ্য আয়াতটি ঐ মূর্খতাপূর্ণ দাবির একটি জবাব। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, বিল-আয়াত (بالآيت) অভিব্যক্তিটি নির্দিষ্টরূপে আছে (নির্দিষ্ট article -এ 'আল' পূর্বে যুক্ত হওয়া)। এইভাবে ইহা সুনির্দিষ্ট অলৌকিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বলে যেগুলি সংঘটিত করার জন্য

অবিশ্বাসীরা দাবি জানাইয়াছিল এবং যেভাবে তাহাদের শাস্তির দাবি বাতিল করা হয় ঠিক সেইভাবে ও একই কারণে এই অদ্ভূত দাবিও বাতিল করা হয়।

মারগোলিয়থ 'আয়াতটির এই অর্থে ব্যাখ্যা করেন যে, আল্লাহ অলৌকিক ঘটনা অবতীর্ণ করা পরিহার করিয়াছিলেন এইজন্য যে, পূর্ববর্তী অবিশ্বাসীরা ঐগুলি হইতে শিক্ষাগ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিল। নিহিতার্থটি এই যে, 'তাহাদের চ্যালেঞ্জিং দাবিসমূহ পূর্ণ হইবার পরেও সত্যকে গ্রহণ করিতে তাহাদের অস্বীকৃতির অর্থ ছিল তাহাদিগকে শাস্তি প্রদান ব্যতিরেকে কোন গত্যন্তর না থাকা'। কারণ তাহার পরও কোন নিষ্ক্রিয়তা অবিশ্বাসীদের এই দাবিকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করিবে যে, নবূওয়াত বা আল্লাহ্র অস্তিত্ব বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। এই কারণেই এই পরিস্থিতিতে শাস্তির অনিবার্যতা। অনুরূপ অলৌকিক ঘটনাসমূহে পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠীসমূহের অবিশ্বাসের উল্লেখ করিয়া আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে ঐ শাস্তির অনিবার্যতা সম্পর্কে ইঙ্গিত করে যাহা ঐ সকল জনগোষ্ঠীর উপর পতিত হইয়াছিল এবং দেখায় যে, ইহা আল্লাহ্র ইচ্ছা ছিল না যে, মক্কাবাসীদের ভাগ্য এরূপ হউক। ইহা যাচিত অলৌকিক ঘটনার সংঘটন পরিহারকরণ ছিল না। ইহা ছিল নিশ্চিত ধ্বংস এড়াইয়া যাওয়া যাহা মক্কার অবিশ্বাসীরা ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে চাহিয়াছিল।

বস্তুত বিবরণসমূহ বলে যে, তাহারা এই ধরনের অলৌকিক ঘটনাবলী চাওয়ার ফলে আল্লাহ মহানবী ﷺ -এর নিকট এই কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য ফেরেশতা জিবরীলকে প্রেরণ করেন, তিনি চাহেন কিনা যে, অলৌকিক ঘটনাসমূহ, যাহা তাহারা চাহিয়াছিল মঞ্জুর করা হউক এবং তাহারা এইভাবে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে বিতাড়িত হউক অথবা চাহেন কিনা যে, তাহাদিগকে অবকাশ ও সংশোধিত হইবার সুযোগ দেওয়া হউক। মহানবী ﷺ শেষেরটি চাহিয়াছিলেন।[১৫] তাহাদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করার জন্য তাহাদের দাবির ক্ষেত্রে যেরূপ, তদ্রূপ তাহাদের সুনির্দিষ্ট অলৌকিক ঘটনাবলীর জন্য তাহাদের দাবির ক্ষেত্রে, একই ধরনের বিবেচনা সেগুলির বাস্তবায়ন রোধ করিয়াছিল। পরবর্তী ঘটনাবলী শুধু আল্লাহ্র পরিকল্পনা ও মহানবী ﷺ-এর প্রত্যাশার যথার্থতা প্রমাণিত করিয়াছিল।

মারগোলিয়থ-এর অভিযোগসমূহের তৃতীয়টি হইতেছে, বদরে যুদ্ধের পূর্বে মহানবী ﷺ -কে এই কথা বলিয়া শুধু কুরআন লইয়া "কার্য সাধনের" উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছে যে, তাঁহার অলৌকিক শক্তি না থাকিলেও "তাহার" "অলৌকিক প্রজ্ঞা" ছিল, এজন্য তিনি প্রাচীন কালের ইতিহাসের ঘটনাবলী বর্ণনা করিতে পারিয়াছেন, যে সময়ে তিনি বিদ্যমান ছিলেন না এবং যখন তিনি তাঁহার রীতিনীতিতে সম্পূর্ণভাবে দক্ষ হইয়া উঠিলেন তখন যে কোন ব্যক্তিকে "এত সুন্দরভাবে রচনা করার জন্য" চ্যালেঞ্জ জানাইলেন।

এই বিবরণ হইতে মারগোলিয়থ এই কথা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, বদরের যুদ্ধটি ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা। তিনি একথাও স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয়

যে, রোমকদের ধ্বংসাত্মক পরাজয় সত্ত্বেও পারসিকদের উপর তাহাদের বিজয় সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি ছিল অলৌকিক ঘটনার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, যদিও তিনি ইহার গুরুত্ব হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ভবিষ্যদ্বাণীটি বাস্তবিকই কুরআনের অলৌকিক বৈশিষ্ট্যের একটি প্রমাণ। কিন্তু মহানবী ﷺ ইহাকে তাঁহার দ্বারা সম্পাদিত কোন অলৌকিক ঘটনা বলিয়া দাবি করেন নাই। বদরের যুদ্ধটিকেও তিনি নিজের অলৌকিক ঘটনা বলিয়া দাবি করে নাই। ইহা বিশাল সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় মুসলিম বাহিনীর সহায়তায় আল্লাহ্‌র অলৌকিক সাহায্যের একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে উদ্ধৃত হয়।

ইহাও সত্য নয় যে, বদরের যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত মহানবী ﷺ বিশেষভাবে অতীত কালের ঘটনাবলী সম্পর্কে, যখন তিনি বিদ্যমান ছিলেন না, "অলৌকিক প্রজ্ঞা"র দাবি করিয়া শুধু কুরআন লইয়া "যে কোন উপায়ে কার্য সাধনের উপায় উদ্ভাবনে" ব্যস্ত ছিলেন। এই ইঙ্গিতটি কুরআনের এই ধরনের আয়াতের প্রতি যেমন ১২ ঃ ১০২; ২৮ ঃ ৪৪ এবং ৩ ঃ ৪৪ ইঙ্গিত করে। এই আয়াতগুলি পূর্ববর্তী নবীগণের কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এইসব আয়াতের শেষ আয়াতটি নিশ্চিতরূপে বদর পরবর্তী সময়ের। যাহা হউক, বিবরণটি, যখন মহানবী ﷺ এইভাবে তাঁহার রীতিনীতিতে সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা অর্জন করেন তখন তিনি যে কোন ব্যক্তির প্রতি "এত সুন্দরভাবে রচনা করা"র জন্য চ্যালেঞ্জ জানান, এই দাবি সুস্পষ্টভাবে ভুল। কারণ যে কোন ব্যক্তিকে কুরআনের মূল পাঠের সঙ্গে তুলনীয় যে কোন রচনা লইয়া আসার জন্য ইহার চ্যালেঞ্জ জানানো 'কুরআনের ঐ অংশসমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যাহা মহানবী ﷺ -কে, তিনি তাঁহার কথিত রীতিনীতিতে সম্পূর্ণরূপে দক্ষতা অর্জনের পর প্রদান করা হইয়াছিল। চ্যালেঞ্জটি প্রাথমিক ও পরবর্তী উভয় প্রত্যাদেশের কুরআনের প্রতিটি অংশ সম্পর্কে জানান হইয়াছিল এবং ইহা এমনকি এখন বিদ্যমান আছে।

ইহা আমাদিগকে মারগোলিয়থ-এর মন্তব্যসমূহের চতুর্থটির নিকটবর্তী করে। যেমন, মক্কাবাসীরা এই কথা বলিয়া কুরআনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী উভয়টির অলৌকিক প্রকৃতি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল যে, মহানবী ﷺ কিছু সংখ্যক ব্যক্তির নিকট প্রাচীন কাহিনীগুলি শিখিয়াছিলেন। তাহা ব্যতিরেকে আন-নাদর ইবনুল হারিছ পারস্যের রাজাদের কাহিনী পদ্যে রূপান্তরিত করিয়া এত সাফল্যের সঙ্গে কুরআনী রচনাশৈলীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল যে, মহানবী ﷺ আন-নাদরকে যখন হাতের মধ্যে পান সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করেন।

মারগোলিয়থ-এর বিবরণের কোনটিই যুক্তি দ্বারা সমর্থনযোগ্য নয়। ইহা সত্য নহে যে, কুরায়শগণ কুরআনের "বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলী উভয়টির প্রতি" আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিল। কুরআনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য ও রচনাশৈলী সম্পর্কে তাহারা সব সময়ই ইহাকে একটি সিহ্‌র (জাদু) হিসাবে বিবেচনা করিয়াছে। কিন্তু তাহারা একগুঁয়েভাবে ঘোষণা করিত যে, মহানবী ﷺ কতিপয় ব্যক্তির নিকট প্রাচীন কাহিনীসমূহ শিখিয়াছিলেন এবং তাহা ছাড়াও পাঠগুলি তাঁহার জন্য অন্যের দ্বারা রচিত হইয়াছিল।

তাহাদের এই অভিযোগসমূহ কুরআনের অলৌকিক রচনাশৈলীতে তাহাদের হতবুদ্ধিতার এবং একটি স্বীকৃতির চিহ্ন ছিল যে, 'মহানবী' ﷺ নিজে কুরআনের এরূপ রচনাশৈলী বা ইহার অন্তর্ভুক্ত কাহিনীসমূহ সৃষ্টি করিতে 'সমর্থ ছিলেন না'। অতএব কুরআন এই বিষয় উল্লেখ করিয়া দক্ষতার সহিত তাহাদের অভিযোগসমূহ খণ্ডন করে যে, ঐ সকল ব্যক্তি, যাহাদিগকে তাহারা মহানবী ﷺ-এর গৃহশিক্ষক বা লেখক হিসাবে ধরিয়া লইয়াছিল, এই ধরনের গ্রন্থ রচনা করিতে সম্পূর্ণরূপে অসমর্থ ছিল। কারণ (আরবী) তাহাদের মাতৃভাষা ছিল না।

এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ-এর মন্তব্যসমূহ ছিল কিছু পরিমাণে বিভ্রান্তিকর। তিনি বলেন, "সেখানে কোন বিজ্ঞ পরামর্শদাতা থাকুক বা না থাকুক, সম্ভবত গল্পগুলি মক্কাবাসীদের নিকট মোটেই নতুন ছিল না" যাহারা তাহাদের বাণিজ্য যাত্রাপথে ঐগুলি ইয়াহূদী বা খৃস্টানদের নিকট হইতে শুনিয়াছিল।[১৬]

এইভাবে যে সময়ে মক্কাবাসিগণ নিজেরা নবীগণের কাহিনী সম্পর্কে কোন অবগতির দাবি করে না এবং যেভাবে চিন্তা করিয়াছিল যে, এইগুলি অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা মহানবী ﷺ-কে শিখান হইয়াছিল, সেই সময়ে মারগোলিয়থ মনে করেন, "গল্পগুলি মক্কাবাসীদের নিকট মোটেই নূতন ছিল না"। মারগোলিয়থ তাহার পূর্ববর্তী একটি গ্রন্থে বলেন, পূর্বে যেরূপ লক্ষ্য করা হইয়াছে[১৭] যে, মহানবী ﷺ ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে বাইবেলীয় গল্পগুলি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন যাহা তিনি কুরআনে পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন এবং এখানে মারগোলিয়থ আমাদিগকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, কুরায়শগণ মহানবী ﷺ-এর সমালোচনা করিয়াছিল এই কারণে যে, তাহারাও গল্পগুলি ইয়াহূদী এবং খৃস্টানদের নিকট হইতে শুনিয়াছিল। অবশ্য সাধারণ ধারণায় নবীদের কাহিনীসমূহ একেবারে অশ্রুত ছিল না; কিন্তু যদি কুরায়শগণ প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাইত যে, কুরআনের গল্পগুলি ইতোপূর্বে শোনা গল্পগুলির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যাহা তাহারা তাহাদের বাণিজ্য যাত্রার সময়ে শুনিয়াছিল তবে তাহারা অভিযোগ করিত না যে, কিছু সংখ্যক ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ মহানবী ﷺ-কে ঐসব গল্প শিখাইয়াছিল এবং এই বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিত যে, তিনি নূতন কিছু আনেন নাই।

ইহাও আদৌ সত্য নহে যে, আন-নাদ্র ইবনুল হারিছ কুরআনের রচনাশৈলী অনুসারে কিছু রচনার দ্বারা সাফল্যজনকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। সে বাস্তবিকই পারস্যের রাজাদের কাহিনী পদ্যে রূপান্তরিত করিয়াছিল এবং সেগুলিকে কুরআন শ্রবণ করা হইতে জনসাধারণের মনোযোগ ভিন্নমুখী করার উদ্দেশ্যে জনসমাবেশে আবৃত্তি করিত। কিন্তু উৎসসমূহে কোন প্রকার ইঙ্গিত নাই যে, তাহার প্রচেষ্টা কিঞ্চিত পরিমাণেও সাফল্য লাভ করিয়াছিল। আমরা শুনিতে পাই নাই আন-নাদরের প্রদর্শনীর কারণে কেহ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে বা এমনকি কেহ মহানবী ﷺ সম্পর্কে সংশয়বাদে পতিত হইয়াছে, যেরূপ ইসরা এবং মি'রাজের মত অন্যান্য ঘটনায় আমরা শুনিতে পাই। প্রকৃতপক্ষে আন-নাদ্র কুরআনের যে কোন অংশের সঙ্গে আদৌ তুলনীয় কিছু রচনা করিয়া থাকিতে পারিলে কুরায়শগণ ঐ তিলকে তালে পরিণত করিত এবং মহানবী ﷺ

-এর দাবির বিরুদ্ধে একটি অব্যাহত চ্যালেঞ্জ হিসাবে ইহাকে সংরক্ষণ ও প্রচার করিত। সর্বোপরি কুরায়শগণ বদরের যুদ্ধের পরও একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময়ের জন্য মক্কার কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতার অধিকারী ছিল এবং আন-নাদ্‌র একজন প্রতিদ্বিন্দ্বী রচনাকারী ছিল, এই ধারণাটি সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন হওয়ায় ঐ কারণে মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগটি যে, তাহার রচনার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কারণে তিনি তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন, সম্পূর্ণরূপে ভুল এবং বিদ্বেষপূর্ণ। বদরের যুদ্ধের বন্দীদের মধ্যে শুধু আন-নাদ্‌রকে হত্যা করা হয় নাই। তাহাকে এবং কমপক্ষে অন্য একজন বন্দীকে প্রতিদ্বন্দ্বী রচনাকারী হিসাবে তাহার কথিত সাফল্য ব্যতিরেকে অন্য অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

মারগোলিয়থ মক্কার অবিশ্বাসীদের আপত্তির ভিত্তিতে অন্যান্য কিছু সংখ্যক অভিযোগ আনেন। এইভাবে সমগ্র কুরআন এক কিস্তিতে অবতীর্ণ করার জন্য তাহাদের দাবির প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ বলেন, যদি ইহা "প্রকৃতই একটি 'সুরক্ষিত লিপি ফলক' হইতে উদ্ধৃত" করা হইয়া থাকে তবে কেন ইহাকে একবারে একটি চূড়ান্ত সংস্করণ হিসাবে প্রকাশ করা হইল না। "(sie)"।[১৮] তিনি আরো বলেন, মহানবী ﷺ এইরূপ না করার জন্য তাঁহার দ্বারা প্রদত্ত ধারণাটি ছিল "তাঁহার ব্যক্তিগত তৃপ্তি ও সুবিধা"। অনুরূপভাবে মারগোলিয়থ যুক্তি প্রদর্শন করেন, মরমনবাদের প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ স্মিথ জোসেফ স্মিথ "এক খণ্ডে তাহার গ্রন্থ Book of Mormons প্রকাশ করায় 'তিনি' সময়ে সময়ে সাময়িক প্রত্যাদেশ দ্বারা ইহাকে সম্পূরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন"।[১৯]

স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে মারগোলিয়থ-এর বক্রোক্তি এই যে, মহানবী ﷺ-এর কম বেশী হাজার বৎসর পরে জোসেফ স্মিথ সময়ে সময়ে বিবৃতিসমূহের মানোন্নয়ন করার যে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিল তাহা এড়াইবার জন্য কুরআন একসঙ্গে প্রকাশ করা পরিহার কারিয়াছিলেন। তথাপি মারগোলিয়থ তাহার (মারগোলিয়থ-এর) গ্রন্থের ঠিক পরবর্তী পৃষ্ঠায় মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে ঐ নির্দিষ্ট অভিযোগটি আনেন এবং বলেন যে, মহানবী ﷺ কথিতভাবে অশুদ্ধ ও অবিমিশ্রিতকারী বিবৃতি প্রদানের পর সংশোধিত বা নূতন প্রত্যাদেশ দ্বারা সেগুলি সংশোধন করিতেন।[২০] প্রকৃত ঘটনা এই যে, মহানবী ﷺ তাঁহার ব্যক্তিগত তৃপ্তি বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বা মানোন্নয়ন ও সংশোধনের প্রয়োজন এড়াইবার অভিপ্রায়ে প্রত্যাদেশসমূহ দফায় দফায় আনয়ন করেন নাই বা তিনি প্রত্যাদেশসমূহের এই ধরনের কোন সংশোধন বা মানোন্নয়ন করেন নাই।

মহানবী ﷺ -এর ব্যক্তিগত সুবিধা সম্পর্কে মারগোলিয়থ-এর বক্রোক্তিটি কুরআনের ২৫ ঃ ৩২ আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যাহার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ لاَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيْلاً .

"অবিশ্বাসীরা বলে, তাহার প্রতি সমগ্র কুরআন একবারে কেন নাযিল হইল না? আমি ইহা এইভাবে অবতীর্ণ করিয়াছি এবং ক্রমে ক্রমে আবৃত্তি করিয়াছি তোমার অন্তরকে মজবুত করার জন্য" (২৫ ঃ ৩২)।

আয়াতটি কুরআনের পর্যায়ক্রমিক অবতরণের দুইটি কারণ নির্দেশ করে। এক ঃ ইহা বলে যে, আল্লাহ উহার সহিত "আপনার অন্তর"-কে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত করিতে বা উহার দ্বারা "আপনার অন্তর"-কে মজবুত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। 'আপনার অন্তর' ব্যাকাংশটি মহানবী ﷺ এবং মুসলমানদের সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে। আয়াতটির গুরুত্ব এই যে, আল্লাহ পর্যায়ক্রমে কুরআনের শিক্ষা ও হিতকর সংস্কারসমূহের প্রতি মুসলমানগণকে অভ্যস্থ করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন।[২১] বস্তুত প্রত্যেকটি আয়াত সর্বাপেক্ষা যথাযথ উপলক্ষ্যে ও সময়ে অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহাতে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের হৃদয়ে ইহার অর্থ ও গুরুত্ব দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হইয়া যায় এবং পরবর্তী মুসলিমগণ অনুরূপ অবস্থা ও সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হইয়া যথোপযুক্ত জ্ঞানালোক ও পথনির্দেশনা প্রাপ্ত হয়। আয়াতটি এই অর্থও প্রকাশ করে যে, কুরআন এভাবে দফায় দফায় অবতীর্ণ হইয়াছিল যাহাতে আয়াতগুলি মহানবী ﷺ-এর হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায় যাহাতে তিনি ভুলিয়া না যান এবং প্রাথমিক মুসলমানগণকে ইহা মুখস্থ করিতে সমর্থ করার জন্য যে ক্রমানুসারে ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল সেই ক্রমানুসারে তাহাদের সম্মুখে আবৃত্তি করিতে পারেন। কুরআন পর্যায়ক্রমিকভাবে অবতীর্ণ হইবার কারণসমূহ অন্য দুইটি আয়াতে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, ১৭ ঃ ১০৬ ও ৮৭ ঃ ৬। আয়াতগুলির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ وَّنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلًا .

"আমি কুরআনকে পৃথক পৃথকভাবে পাঠের উপযাগী করিয়া অবতীর্ণ করিয়াছি, যাহাতে তুমি তাহা মানুষের কাছে ধীরে ধীরে পাঠ করিতে পার এবং তাহা পর্যায়ক্রমে অবতীর্ণ করিয়াছি" (১৭ ঃ ১০৬)।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى .

"এবং তোমাকে পাঠ করাইতে থাকিব, তুমি ভুলিবে না" (৮৭ ঃ ৬)।

আয়াত ২৫ ঃ ৩২-এ প্রদত্ত (এবং ১৭ ঃ ১০৬-এও) দ্বিতীয় এবং মৌলিক কারণটি এই যে, স্বয়ং আল্লাহ এইভাবে দফায় দফায় এবং পর্যায়ক্রমে মহানবী ﷺ -এর নিকট কুরআনের অংশ প্রেরণ করেন।[২২] সুতরাং মহানবী ﷺ-এর নিজের পক্ষে সমগ্র কুরআন একবারে প্রকাশ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। বস্তুত আপত্তিটি, যাহা অবিশ্বাসিগণ তাঁহার সমগ্র কুরআন একবার প্রকাশ না করা সম্পর্কে আনিয়াছিল এবং যাহা মারগোলিয়থ পুনরাবৃত্তি করেন, মহানবী ﷺ স্বয়ং সেই কুরআনের মূলপাঠ রচনা করেন নাই, এটাই কার্যকর যুক্তি।

ইহা তাঁহার নিজের রচনা হইলে তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট ছোট আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র কুরআন অথবা ইহার উল্লেখযোগ্য অংশ একবারে প্রকাশ করিতে পারিতেন, বিশেষভাবে যেমন মারগোলিয়থ নিজে অভিযোগ করেন যে, মহানবী ﷺ তাঁহার পালিত ভূমিকার জন্য তিনি বিস্তৃত ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইলে তিনি মঞ্চে আবির্ভূত হন। মরমনবাদের প্রতিষ্ঠাতা জোসেফ স্মিথ-এর উদাহরণও যাহা মারগোলিয়থ উদ্ধৃত করেন, ইহা প্রমাণ করে। কারণ একজন নবীর ভূমিকা পালন করার জন্য পরিকল্পনা করার পূর্বাহ্নে রচিত ও প্রস্তুতকৃত সম্পূর্ণ পুস্তকসহ তিনি মঞ্চে আবির্ভূত হন। স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে তিনি ইহা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি মারগোলিয়থ-এর ন্যায়, মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মক্কার অবিশ্বাসীদের দ্বারা আনীত অভিযোগসমূহের ধরন সম্পর্কে অবশ্যই জ্ঞাত ছিলেন।

তৃতীয় কারণটি অব্যবহিত পরবর্তী আয়াতে দেওয়া হইয়াছে (২৫ ঃ৩৩)। তাহাতে রহিয়াছে ঃ "তাহারা আপনার কাছে এমন বিস্ময়কর প্রশ্ন লইয়া আসে না যাহার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করি নাই"।

وَلاَ يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلاَّ جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنَ تَفْسِيْرًا .

এইভাবে মহানবী ﷺ-এর নিকট পর্যায়ক্রমে কুরআন প্রেরণের কারণসমূহের একটি ছিল একবারে নয়, সময়ে সময়ে অবিশ্বাসিগণ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তিসমূহের সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা প্রদান করা। এমনকি সম্পূর্ণ কুরআনের একবারে অবতীর্ণ না হওয়ার বিষয়ে এই বিশেষ আপত্তিটি প্রসঙ্গে অবিশ্বাসীরা তাহাদের অবিশ্বাসের জন্য শুধু একটি খোঁড়া অজুহাত উপস্থাপিত করে। যেমন এই আপত্তি উত্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা প্রত্যেককে পৃথকভাবে একটি করিয়া লিখিত কুরআন দেওয়ার উদ্ভট দাবিও করে।[২৩] যেমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে উল্লেখ করেন কুরআনের সর্বাপেক্ষা স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা "শুধু ইহার বিরুদ্ধে আনীত আপত্তির উত্তরসমূহই ধারণ করে না, বরং যাহা দাবি করা হইয়াছে তাহার সত্যতার যুক্তিসমূহও উপস্থাপিত করে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ এই শর্ত পূরণ করে না যে বৈশিষ্ট্য এককভাবে কুরআনকে সকল ধর্মগ্রন্থের উপর স্থান দিয়াছে ......।[২৪]

মারগোলিয়থ আরো অভিযোগ করেন, এইভাবে মহানবী ﷺ সম্পর্কে মদীনার ইয়াহূদীদের মতামত জানার জন্য মক্কার নেতাগণ কর্তৃক তাহাদের দূতদের দুইজনকে ঐ স্থানে প্রেরণের ঘটনা প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ বলেন, প্রশ্নসমূহ, যাহা মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করার জন্য কুরায়শগণের নিকট প্রস্তাবিত হইয়াছিল, "সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তি ও মহামতি আলেকজান্ডার সম্পর্কিত হওয়ায়, আমরা নিশ্চিত হইতে পারি যে, ঐগুলি ইয়াহূদীদের দ্বারা প্রস্তাবিত হয় নাই"।[২৫] পূর্বে তিনি বলেন যে, গল্পটি ছিল "কালের বিচারে বেমানান একটি গল্প"। কারণ মহানবী ﷺ

মদীনায় হিজরত করার পর "ইয়াহূদীদের সঙ্গে বিতর্ক শুরু করিলেন"। ইহার পূর্বে মারগোলিয়থ বলেন, চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে তিনি আবেদন জানাইতেন এবং তাহারাও তাহার পক্ষে ছিল। কারণ "সমগ্র আবরদেশ খৃষ্টান হইয়া যাইবার বিপদ" দেখিয়া এমনকি তাহারাও "একজন অখৃষ্টান ধর্মপ্রচারককে উৎসাহিত করা বিচক্ষণতাপূর্ণ কাজ বলিয়া মনে করিত"।[২৬]

মারগোলিয়থ আরো অভিযোগ করেন, সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তি সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে মহানবী তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে ভুল করেন, কিন্তু "সূরাটির পরবর্তী সংস্করণে" ইহা বলা হইয়াছিল যে, বিষয়টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত রহিয়াছে এবং আল্লাহ সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। অনুরূপভাবে মারগোলিয়থ আরো লিখেন, মহানবী "যাহাকে পূজা করা হয় পূজকের ন্যায় তাহাকেও শাস্তি প্রদান করা হইবে" একথা বলার পর ঈসা (আ) সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যতিক্রম ঘটানোর জন্য একটি "নূতন প্রত্যাদেশ" আনয়ন করেন।[২৭]

এক্ষণে ইহা সত্য যে, ইয়াহূদীদের সঙ্গে বিতর্ক হিজরতের পরে শুরু হইয়াছিল, কিন্তু তাহা বুঝায় না যে, তাঁহার সঙ্গে কুরায়শ নেতাদের যুক্তি প্রদর্শনের সময় শেষোক্তগণ মহানবী-এর পক্ষে ছিল। বিবরণটি যে, আরবদেশে খৃষ্টান ধর্মের প্রায় সাফল্যের প্রেক্ষিতে এমনকি ইয়াহূদীগণও মহানবী -কে তাঁহার ধর্ম প্রচারে উৎসাহ যোগাইত, একটি নির্ভেজাল অনুমান এবং কোন ঘটনা দ্বারা সমর্থিত নয়। এই বক্তব্যটি যে, কুরায়শদের নিকট বাতলান প্রশ্নের ধরন, যেমন সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তি ও মহামতি আলোকজান্ডার সম্পর্কে, অনুপ্রেরকগণের ইয়াহূদী হওয়া নাকচ করিয়া দেওয়া মোটেই বোধমগ্য নয়। মারগোলিয়থ নিজে কোন কারণ উল্লেখ করেন না যে, কেন ইয়াহূদীরা এই সকল বিষয়ে উত্তেজিত করিতে লজ্জাবোধ করিবে। যাহা হউক, তাহার অভিযোগ যে, মহানবী সাতজন ঘুমন্ত ব্যক্তির সংখ্যা সম্পর্কে প্রথমে এক উত্তর প্রদান করেন এবং পরবর্তী কালে সূরাটির একটি "পরবর্তী সংস্করণে" ইহা সংশোধন করেন, অপরপক্ষে "প্রাথমিকভাবে তিনি যে সংখ্যা বলিয়াছিলেন তাহাতে অবিচল থাকা" সম্পূর্ণরূপে ভুল।

প্রকৃতপক্ষে মারগোলিয়থ এখানে তিনটি ভুল বিবরণ প্রদান করেন। যেমন (ক) মহানবী প্রাথমিকভাবে একটি সংখ্যা প্রদান করেন, (খ) পরবর্তী কালে সূরাটির একটি সংশোধিত সংস্করণ সংশোধন করেন এবং (গ) সংস্কার করার সময়ে তিনি মূল সংখ্যাটির প্রতি অবিচল ছিলেন, অবশ্য এই বলিয়া যে, আল্লাহই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন। এই দাবিগুলির প্রত্যেকটি অসত্য। সূরাটির একটি মাত্র আয়াত যাহা ঘুমন্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা সম্পর্কে বলে তাহা হইতেছে ১৮ ঃ ২২ আয়াত। ইহাতে মহানবী কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রদান করেন নাই। আয়াতটি শুধু তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের বিষয়ে বলে। উৎসসমূহে কোন ইঙ্গিত নাই যে, এই আয়াতটি পূর্ববর্তী একটি আয়াতের স্থলাভিষিক্ত হইয়াছে। সুতরাং ইহার পূর্ববর্তী একটি বিবরণের পুনর্বিবেচিত ও পরিবর্তিত রূপ হওয়া সম্পর্কে কোন প্রশ্নেই উঠে না। অনুরূপভাবে তাহাদের সংখ্যা সম্পর্কে আল্লাহই সর্বাপেক্ষা ভাল জানেন— এই কথার উপর গুরুত্ব প্রদান করার পর কথিতভাবে

পূর্বে প্রদত্ত সংখ্যার প্রতি অবিচল থাকার বিষয়টি অবান্তর। এখন আয়াতটির প্রতি লক্ষ্য করুন যাহার পাঠ নিম্নরূপ ঃ

سَيَقُوْلُوْنَ ثَلٰثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُوْلُوْنَ سَبْعَةٌ وَّثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَّبِّىْٓ اَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ.....

"কেহ কেহ বলিবে, তাহারা ছিল তিনজন, তাহাদের চতুর্থটি ছিল তাহাদের কুকুর এবং অন্যরা বলিবে, তাহারা ছিল পাঁচজন, ষষ্ঠটি ছিল তাহাদের কুকুর–এই ছিল অদৃশ্য বিষয়ে আনুমানিক কথা। আবার কেহ কেহ বলিবে, তাহারা সংখ্যায় ছিল সাতজন, অষ্টমটি ছিল তাহাদের কুকুর। তুমি বল, আমার প্রভুই তাহাদের সংখ্যা খুব ভাল জানেন" (১৮ ঃ ২২)।

'ঈসা (আ) সম্পর্কে মারগোলিয়থ-এর অন্য বিবরণটি সম্পর্কে, মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে কুরায়শ নেতাদের বিতর্কের সঙ্গে ইহার সম্পর্ক রহিয়াছে যাহার ইবন ইসহাক ও ভাষ্য লেখকদের দ্বারা লিখিত বিবরণ রহিয়াছে।[২৮] ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, একবার মহানবী ﷺ কুরায়শ নেতাদের একটি দলের সঙ্গে আলোচনাকালে তাহাদের সম্মুখে ২১ ঃ ৯৮ আয়াত পাঠ করেন যাহাতে রহিয়াছে ঃ তোমরা এবং তোমাদের ঐসব দেবতারা আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদের পূজা করিতেছ সকলেই দোযখের ইন্ধন হইবে; তোমরা সকলেই তাহাতে প্রবেশ করিবে"।[২৯]

ইহাতে তাহারা উত্তেজিত হয়। কিছুক্ষণ পর তাহাদের নেতাদের একজন 'আবদুল্লাহ ইব্‌নুয যাবা'রা (আস-সাহমী) তাহাদের নিকট আসে এবং তাহাদিগকে মহানবী ﷺ -কে এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বিভ্রান্ত করার পরামর্শ দেয়, ঐ ক্ষেত্রে উযায়র এবং ঈসা (তাহাদের উপর শান্তি বর্ষিত হউক) যাঁহাদিগকে যথাক্রমে ইয়াহূদী ও খৃস্টানগণ পূজা করিত, তাঁহারাও কি দোযখে যাইবেন? কুরায়শ নেতাগণ এই প্রস্তাবে খুব উৎসাহিত হয় এবং মহানবী ﷺ-কে এই ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে। ইহা বর্ণিত আছে যে, অবিশ্বাসীদের এই প্রশ্নের উত্তরে ২১ ঃ ১০১–১০৩ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয় যাহা কার্যত বলে যে, পূর্বে যাহাদের উপর আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ বর্ষিত হইয়াছিল তাহারা অবশ্যই দোযখ হইতে অনেক দূরে থাকিবেন।[৩০]

আয়াতটি ২১ ঃ ১৮-এ কৃত একটি সাধারণ ও অসতর্ক বিবৃতি বলিয়া যাহাকে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে তাহার কোন সংশোধন বা "ব্যতিক্রম" নয়। আয়াতটি বাস্তবে অবিশ্বাসীদের নিজেদের বোকামী ও ভুলের প্রতি নির্দেশক। যেরূপ ইব্‌ন কাছীর উল্লেখ করেন, ২১ ঃ ৯৮ 'আয়াতটি মক্কার অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা তাহাদের ও তাহারা যাহার পূজা করে তাহার সম্পর্কে বলে। 'ঈসা (আ) বা উযায়র (আ) তাহাদের কেহ নিজেদের পূজিত হইবার বিষয়ে উৎসাহ দেন নাই বা আনন্দবোধও করেন নাই, অন্যরা তাঁহাদের প্রতি যাহা করিয়াছে তাহার জন্য দায়ী হইবেন না।[৩১]

আত-তাবারী কুরায়শ নেতাগণ এবং যাহারা তাহাদের মতামত প্রয়োগ করিয়াছিল তাহাদের পক্ষের দ্বিতীয় ভুলটি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা এই যে, মা তা'বুদূনা (مَا تَعْبُدُوْنَ) অভিব্যক্তিটিতে ব্যবহৃত সর্বনাম মা (مَا = কি) শুধু–পরিষ্কার ইঙ্গিতসহ যে মক্কাবাসীদের পূজিত প্রতিমাসমূহ বুঝান হইয়াছে, অচেতন বস্তুসমূহ বুঝায়। যদি ঈসা (আ), উযায়র (আ) বা অন্য কাহাকেও বুঝান হইত তবে সর্বনাম مَا-এর পরিবর্তে মান (مَنْ = কাহাকে) ব্যবহৃত হইত।[৩২] মক্কাবাসীদের বোকামী ও বিভ্রান্তি স্বয়ং কুরআনের ৪৩ ঃ ৫৮) দ্বারা উল্লিখিত হইয়াছে যাহার মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ .

وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ .

"এবং তাহারা বলে, আমাদের দেবতারা উত্তম না 'ঈসা উত্তম? তাহারা তো কেবল ঝগড়ার উদ্দেশ্যই তোমাকে একথা বলে। বস্তুত তাহারা হইল এক কলহপ্রিয় জাতি" (৪৩ ঃ ৫৮)।

অতঃপর মারগোলিয়থ পরজগতে দেহের পুনরুজ্জীবনের প্রসঙ্গে মক্কার অবিশ্বাসীদের আপত্তির প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন এবং বলেন, মতবাদটির বিপক্ষে "কিছু সংখ্যক অত্যন্ত সুস্পষ্ট আপত্তি" রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাহাদের পূর্বপুরুষগণকে পুনরুজ্জীবিত করার দাবিটিরও উল্লেখ করেন এবং কুরআনের উত্তরটিকে, এই রকম পুনরুজ্জীবিতকরণ আল্লাহ্র জন্য মানুষ প্রথমবার সৃষ্টি করা অপেক্ষা অধিকতর কঠিন কিছু ছিল না, "ন্যায়ের ফাঁকি" হিসাবে অভিহিত করেন। মারগোলিয়থ আরো বলেন, উত্তরটি "বিষয়টিকে সম্পূর্ণরূপে সেখানেই পরিত্যাগ করে যেখানে ইহা ছিল"।[৩৩]

মারগোলিয়থ এখানে আবার সাদামাঠাভাবে অবিশ্বাসীদের মতবাদগুলি সমর্থন করেন। তিনি যেগুলিকে পুনরুজ্জীবনের মতবাদের বিরুদ্ধে "স্পষ্ট আপত্তি" বলেন তাহার কোন একটিও উল্লেখ করেন নাই। তিনি ইহাও উল্লেখ করেন নাই যে, মহানবী ﷺ কখনও নিজের জন্য মৃতকে জীবিত করার যোগ্যতা বা অলৌকিক ক্ষমতার দাবি করেন নাই। তিনি বা কুরআন সব সময়ই দাবি করিয়াছেন যে, একমাত্র আল্লাহই বিচার, পুরস্কার ও শাস্তির জন্য মৃতকে জীবিত করিবেন। অবিশ্বাসীদের আপত্তির উত্তরে প্রদত্ত উত্তরটি এইভাবে যথাযথ ছিল। ইহা ন্যায়ের ফাঁকি" ছিল না এবং বিষয়টিকেও যেখানে ছিল সেখানে রাখিয়া দেয় নাই।

একই বিষয়ের উপর মারগোলিয়থ তাহার মন্তব্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়া বলেন, পুরস্কার ও শাস্তির জন্য দেহের পুনর্গঠন সম্পর্কে বর্ণনাসমূহ "অসতর্ক বিবৃতি ব্যতিরেকে" প্রস্তুত হয় নাই "যাহা অমার্জিত সমালোচনার জন্ম দিয়াছে, যাহার সম্পর্কে যদি অন্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না যায়," মহানবী ﷺ বলিবেন, "উদ্দেশ্যটি ছিল বিশ্বাসীদের বিশ্বাস পরীক্ষা করা"। মারগোলিয়থ আরো অভিযোগ করেন, "প্রদর্শিত ধৃষ্টতার পরিমাণ খুব বেশী হইলে আয়াতটি প্রত্যাহার করা হইবে" এবং মহানবী ﷺ বলিবেন যে, একটি আয়াত প্রত্যাহার করা এবং তদস্থলে অন্য একটি আয়াত

প্রতিস্থাপন করা আল্লাহ্র ক্ষমতার মধ্যে রহিয়াছে। "ইহা নিশ্চিত ছিল" মারগোলিয়থ মন্তব্য করেন, "কিন্তু মানুষের ক্ষমতার মধ্যে এত সুস্পষ্টভাবে যে ইহা আমাদের নিকট বিস্ময়কর কিভাবে এত আপোসমূলক একটি কার্যপ্রণালী বন্ধু ও শত্রুর দ্বারা পদ্ধতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনুমোদিত হইতে পারে"।[৩৪]

মারগোলিয়থ-এর এই সকল মন্তব্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ঘটনার সংমিশ্রণ ও তথ্য বিকৃতি ঘটানোর মাধ্যমে করা হইয়াছে। কুরআনের কোন স্থানে মৃত ব্যক্তির পুনরুজ্জীবন এবং পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে কোন অসতর্ক বিবৃতি গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য "বিশ্বাসিগণের বিশ্বাস" পরীক্ষা করার কোন ওজর উপস্থাপিত হয় নাই। যদি ইঙ্গিতটি 'ইসরা' ও মি'রাজের সঙ্গে সম্পর্কিত 'আয়াত' ১৭ ঃ ৬০-এর প্রতি করা হইয়া থাকে তবে মন্তব্যটি ঘটনার মর্ম এবং আয়াতটির বিষয়বস্তু উভয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ। আপত্তিটি যাহা এই প্রসঙ্গে অবিশ্বাসীরা উত্থাপিত করিয়াছে বলিয়া কথিত হয়, 'ইসরা'র ঘটনা ও মি'রাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, পুনরুজ্জীবনের ঘটনার সঙ্গে নয়; এমনকি বেহেশ্ত ও দোযখের দৃশ্যাবলীর মঞ্চেও নয় যাহা ঐ অলৌকিক ঘটনা চলাকালে মহানবী ﷺ প্রত্যক্ষণ করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

অধিকতর গুরুত্বপূর্ণভাবে আয়াতটি বলে যে, দৃশ্যটি (আর-রু'য়া) যাহা মহানবী ﷺ বর্ণনা করিয়াছেন, মানুষের জন্য (লিন্নাস) একটি পরীক্ষা (ফিত্না), বিশ্বাসীদের জন্য নয়, যেরূপ মারগোলিয়থ বর্ণনা করিয়াছেন। অপরপক্ষে যদি ইঙ্গিতটি ৭৪ঃ৩১ আয়াতের প্রতি হয়, সেখানে অতি স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, উল্লেখিত সংখ্যাটি "অবিশ্বাসীদের জন্য" একটি পরীক্ষা এবং অপরদিকে "বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করা"র জন্য অভিপ্রেত।[৩৫]

অনুরূপভাবে, ২১ঃ১১১ আয়াত অবিশ্বাসীদের উপর আসন্ন শাস্তি অবতীর্ণ করার জন্য তাহাদের ধৈর্যহীন দাবির সঙ্গে যাহার সম্পর্ক রহিয়াছে, ফিতনা হিসাবে তাহাদিগকে প্রদত্ত অবকাশ বা তাহাদের জন্য পরীক্ষা সম্পর্কে বলে।[৩৬] বস্তুত কুরআনে পঞ্চাশটিরও অধিক স্থানের মধ্যে যেখানে সেখানে ফিত্নাহ্ শব্দটি প্রয়োগ করা হইয়াছে। কোন স্থানে ইহা পুনরুজ্জীবন বা আখিরাত সম্পর্কে "অসতর্ক" বিবৃতির বিষয়ে উল্লেখ করে না বা বিশ্বাসীদের জন্য একটি পরীক্ষার অর্থও বহন করে না।[৩৭] এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থ-এর মন্তব্য সম্পূর্ণরূপে অন্যায্য।

অনুরূপভাবে কুরআনে এইরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই যেখানে পুনরুজ্জীবন বা অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে একটি "অসতর্ক" বা "হঠকারী" বিবৃতি প্রত্যাহৃত ও অন্য একটি প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছিল। তাহার উক্তি যে, মহানবী ﷺ বলিবেন যে, একটি প্রত্যাদেশ প্রত্যাহার করা আল্লাহ্র ক্ষমতায় সহজ সুস্পষ্টভাবে ২ ঃ ১০৬ আয়াতকে সম্পর্কযুক্ত করে।[৩৮] মারগোলিয়থ এইভাবে মক্কার অবিশ্বাসীদের বিতর্কের বিষয়ে তাহার আলোচনার প্রসঙ্গে নাস্খ-এর প্রশ্নটি কুরআনে যেরূপ অন্তর্ভুক্ত আছে, উত্থাপন করেন এবং বলেন যে, মহানবী ﷺ "অসতর্ক" বিবৃতির সংশোধন বা অন্য একটি দ্বারা প্রতিস্থাপন করার এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছিলেন।

নাসখের মতবাদটি বাস্তবভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন বিষয়[৩৯] এবং ইহা এখানে আলোচনা করা কার্যকর বা প্রয়োজনীয় নয়। মারগোলিয়থ-এর জট এখানে পরিষ্কার হইবে যদি সাদামাঠাভাবে ইহা উল্লেখ করা হয় যে, আয়াতটি, যাহার প্রতি তিনি ইঙ্গিত করেন, মদীনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং মহানবী ﷺ -এর সঙ্গে মক্কার (এমনকি মদীনার) অবিশ্বাসীদের বিতর্কের কোন সম্পর্ক ছিল না বা ইহার সঙ্গে পুনরুজ্জীবন ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে কোন "অসতর্ক" বা "হঠকারী" বিবৃতিরও সম্পর্ক ছিল না।

পরিশেষে মারগোলিয়থ মক্কার অবিশ্বাসীদের অজুহাত সম্পর্কে উল্লেখ করেন, যদি সব কিছু আল্লাহ্‌র ইচ্ছানুসারে ঘটিয়া থাকে তবে আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কোন বস্তুকে পূজা করার জন্য তাহাদিগকে দায়ী হইতে হইবে না। কারণ যদি আল্লাহ ইচ্ছা না করিতেন তবে তাহারা ইহা করিত না। মারগোলিয়থ বলেন, "স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ"-এর এই প্রশ্নটি মহানবী ﷺ -এর জন্য কিছু অসুবিধা ঘটাইয়াছিল যিনি "এই পরিণামের কঠোরতা" অথবা সমস্যার পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি "উপলব্ধি করার জন্য খুব ক্ষুদ্র দার্শনিক ছিলেন"। এখানে মারগোলিয়থ মন্তব্য করেন, মহানবী ﷺ দৃঢ়তা সহকারে বলিতেন যে, প্রত্যেকটি ঘটনা "আল্লাহ্‌র পরিকল্পিত" এবং একই সময়ে মানুষকে "পরিণাম সম্পর্কে" সতর্ক করিতেন "যাহা তাহাদের দ্বারা অনুসৃত কার্যক্রম অনুসারে আসিবে"।[৪০]

এইভাবে মারগোলিয়থ মক্কার অবিশ্বাসীদের আপত্তি প্রসঙ্গে কাদর, কাদা বা মুশী'আত প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত করেন। অবিশ্বাসীদের এই সুনির্দিষ্ট অজুহাতটি কুরআনের দুইটি আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, ১৬ ঃ ৩৫ ও ৪৩ ঃ ২০ আয়াত যেগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ أَشْرَكُوْا لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا اٰبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ....

"মুশরিকরা বলে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা তাঁহাকে ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করিতাম না এবং আমাদের পূর্বপুরুষগণও করিত না। আর তাঁহার আদেশ ছাড়া আমরা কোন কিছু হারামও করিতাম না ..." (১৬ ঃ ৩৫)।

وَقَالُوْا لَوْ شَاءَ الرَّحْمٰنُ مَا عَبَدْنَا .

"এবং মুশরিকরা বলে, পরম দয়াময় আল্লাহ যদি ইচ্ছা করিতেন তবে আমরা উহাদের (প্রতিমাদের) ইবাদত করিতাম না...." (৪৩ ঃ ২০)।

এই অজুহাত পেশ করার সময়ে অবিশ্বাসীরা মোটেই আল্লাহ্‌র ইচ্ছাকে অস্বীকার ও তাহাদের "স্বাধীন ইচ্ছাকে" সমর্থন করার চেষ্টা করে নাই। তাহারা এই বলিয়া শুধু তাহাদের প্রতিমা পূজার যথার্থতা প্রতিপাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করে যে, আল্লাহ অবশ্যই তাহাদিগকে এরূপ করিতে

দিতে সম্মত ছিলেন। অন্যথায় তিনি তাহাদের বা তাহাদের পূর্বপুরুষদের উপর নিশ্চিতভাবে কোন দুর্যোগ বা শাস্তি আপতিত করিতেন।[৪১] তাহাদের পূর্বপুরুষদের প্রথার প্রতি একটি আগ্রহও তাহাদের ওজরের মধ্যে নিহিত আছে, যেমন আছে ক'াদরের প্রতিও। এজন্য এটা দেখা প্রয়োজন যে, তাহাদের এই অজুহাত সম্পর্কে কুরআনের উত্তরটি কি ছিল এবং এখন তাহা কি অবস্থায় আছে। উত্তরটি উপরে উল্লিখিত দুই আয়াতের অবশিষ্টাংশে এবং ইহাদের অব্যবহিত পরে যাহা আসিয়াছে তাহাতে নিহিত আছে। এগুলির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

...كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلاَّ الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ . وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلاَلَةُ فَسِيْرُوْا فِى الاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ .

".....এই রকমই করিয়াছিল তাহাদের পূর্বপুরুষগণ। রাসূলদের দায়িত্ব তো শুধু সুস্পষ্ট বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়া। আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই কোন না কোন রাসূল প্রেরণ করিয়াছি এই আদেশ প্রচারের জন্য যে, তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং তাগূত হইতে দূরে অবস্থান কর। অতঃপর তাহাদের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন এবং কিছু সংখ্যকের উপর গোমরাহী অবধারিত হইয়া গেল। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ মিথ্যারোপকারীদের পরিণাম কেমন হইয়াছে" (১৬ ঃ ৩৫–৩৬)।

... مَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ اِنْ هُمْ اِلاَّ يَخْرُصُوْنَ . اَمْ اٰتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِه فَهُمْ بِه مُسْتَمْسِكُوْنَ . بَلْ قَالُوْا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّهْتَدُوْنَ . وَكَذٰلِكَ مَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِىْ قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلاَّ قَالَ مُتْرَفُوْهَا اِنَّا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا عَلٰى اُمَّةٍ وَّاِنَّا عَلٰى اٰثَارِهِمْ مُّقْتَدُوْنَ .

" ..... এই সম্পর্কে তাহাদের কোন জ্ঞান নাই। তাহারা শুধু অনুমানে কথা বলে। আমি কি তাহাদেরকে ইতোপূর্বে কোন কিতাব দিয়াছি যাহা তাহারা দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিয়াছে।[৪২] না, বরং তাহারা বলে, আমরা তো পূর্বপুরুষগণকে এক ধর্মের উপর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। আর এইভাবেই তোমার পূর্বে যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠইয়াছি তখনই সেখানকার বিত্তশালী লোকেরা বলিয়াছে, আমরা তো আমাদের পূর্বপুরুষগণকে একটি ধর্মের উপর পাইয়াছি এবং আমরা তাহাদের পদাংক অনুকরণ করিয়া চলিয়াছি" (৪৩ ঃ ২০–২৩)।

উপরে উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহা স্পষ্ট হইবে যে, অবিশ্বাসীরা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদত্ত উত্তরটি তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। (এক) তাহারা তাগূতের সত্যতা প্রতিপাদনের জন্য

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও আল্লাহ্‌র বিধানের ওজর উত্থাপনকালে অজ্ঞতা ও নিবুর্দ্ধিতাপ্রসূত কথা বলে। তাহাদের এই অজুহাত ছিল একটি মিথ্যাচার ও জালিয়াতি।

(দুই) এই ব্যাপারে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও নির্দেশাবলী তাঁহার দূতের মাধ্যমে পূর্ববর্তী লোকজনের নিকট স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে, যাঁহাদের নিকট এই নির্দেশ প্রেরিত হইয়াছিল, অত্যন্ত পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্টভাবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও ইবাদত না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। যদি লোকজন নির্দেশনা ও ভ্রান্তির প্রতি পূর্ব-সম্পর্কিত হইয়া থাকে তবে তাহাদের নিকট প্রত্যাদেশ ও দূত প্রেরণ করার প্রয়োজন ছিল না।

(তিন) পূর্ববর্তী জনগোষ্ঠী সত্য ধর্ম হইতে মুখ ফিরাইয়া লওয়ার সময় এই একই পুরাতন আপত্তিটি উত্থাপন করিত যে, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণকে একটি ধর্মের অনুসারী দেখিতে পাইয়াছিল এবং যাহা এখন তাহারা অনুসরণ করিতেছে। সংক্ষেপে, কুরআন বলে যে, বহু ঈশ্বরবাদের সমর্থনে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ও বিধানের অজুহাত উত্থাপন করা আল্লাহ্ সম্পর্কে চরম অজ্ঞতা এবং একটি ডাহা মিথ্যাচার। কারণ তিনি তাঁহার অসংখ্য দূতের মাধ্যমে এই প্রসঙ্গে তাঁহার নির্দেশাবলী স্পষ্টভাবে প্রেরণ করিয়াছেন।

কুরআনে অন্তর্ভুক্ত ক'দর (তাকদীর)-এর ধারণা সম্পর্কে যতদূর বিবেচনা করা যায় ইহা অদৃষ্টবাদ বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিমিত্তের ভাগী হওয়ার সঙ্গে একই সীমারেখাবিশিষ্ট নয়। অনমনীয়তা ও স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের অসাধ্যতা যাহা মারগোলিয়থ ধারণা করেন, পরবর্তী দার্শনিকদের সৃষ্টি। যদি আমরা আমাদের নিজদিগকে দার্শনিকদের ক্লান্তিকর ও অপ্রয়োজনীয় তর্কজাল হইতে মুক্ত করি তাহা হইলে আমরা দেখিব যে, ক'দরের ধারণাটি স্বাধীন ইচ্ছার সঙ্গে বৈপরীত্যমূলক নয় বা ইহা মানুষকে তাহার কার্যের সকল দায়দায়িত্ব হইতে মুক্তি দিয়া দায়িত্বমুক্ত সত্তায় পরিণত করে না। ইহার লক্ষ্য মানুষকে তাহার গুণাবলী ও কর্মক্ষমতার অপর্যাপ্ততা এবং তাহার প্রত্যেক কার্য ও প্রচেষ্টায় আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়ার উপর সর্বশেষ নির্ভরশীলতা সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দেওয়া। সর্বোপরি সকল মানুষের গুণাবলী ও কার্যক্ষমতা, এমনকি তাহার স্বাধীন ইচ্ছা বা কোন ইচ্ছা করার ক্ষমতা সবই আল্লাহ্‌র দান।

সুতরাং যখন কুরআন বলে যে, আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা সৎপথ প্রদর্শন করেন এবং যাহার নিকট ইহাতে ইচ্ছা হয় সৎপথ প্রদর্শন প্রত্যাহার করেন, তখন ইহা শুধু এই অর্থ প্রকাশ করে যে, যেহেতু আল্লাহ ইতোমধ্যেই মানুষকে জানাইয়াছেন সৎপথ কি উপাদানে এবং বিভ্রান্তিপূর্ণ পথ কি উপাদানে গঠিত হয়। মানুষ সৎপথপ্রাপ্ত হইতে এবং বিভ্রান্তি পরিহার করিতে আল্লাহ তাআলাকে সন্তুষ্ট এবং তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও গুণাবলীকে কাজে লাগাইবে। বাস্তবভাবে সৎপথ শুধু মুত্তাকীদের জন্য। "ইহা (প্রত্যাদেশ, কুরআন) মুত্তাকীদের জন্য সৎপথ" (هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ)। "আমি তাঁহাকে (মানুষকে) পথ দেখাইয়াছি; এখন কৃতজ্ঞ থাকিবে,

না হয় অকৃতজ্ঞ থাকিবে (তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে)" انَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيْلَ امَّا شَاكِرًا وَّامَّا كَفُوْرًا)[৪৩]।

আল্লাহ্‌র ইচ্ছা এবং বিধান এইভাবে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার অস্বীকৃতি না হইয়া বরং একটি দৃঢ় স্বীকৃতি। ইহা আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতা ও তাঁহার অনুগ্রহ এবং দয়া প্রার্থনার সঙ্গে মিশ্রিত উদ্যম ও প্রচেষ্টার জন্য একটি উদ্দীপনা সৃষ্টির উপায় মাত্র।

তিন ঃ ওয়াট এবং অবিশ্বাসীদের আপত্তিসমূহ

ওয়াট মক্কার অবিশ্বাসীদের আপত্তি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন-"বাণী সম্পর্কে সমালোচনা" এবং "মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত সম্পর্কে সমালোচনা"।[৪৪] অবশ্য ইহা করিতে যাইয়া তিনি কমবেশী মারগোলিয়থ কর্তৃক উল্লিখিত একই আপত্তির বিষয়সমূহ আলোচনা করেন। প্রকৃতপক্ষে ঐ বিভাজনও কমবেশী মারগোলিয়থ কর্তৃক চিহ্নিত বিষয়সমূহ।

ওয়াট সর্বপ্রথম পুনরুজ্জীবন সম্পর্কিত মতবাদটির বিষয়ে অবিশ্বাসীদের সমালোচনার উল্লেখ করেন, বিশেষভাবে কবরের মাটিতে মিশিয়া যাওয়া মানবদেহে পুনর্জীবন সঞ্চার সম্পর্কে তাহাদের আপত্তিসমূহ। ওয়াট এই প্রসঙ্গে তাহার নিজকৃত অনুবাদে ৩৭ ঃ ১৩-১৭ আয়াত উল্লেখ করার পর মন্তব্য করেন যে, মক্কাবাসীরা "মাটিতে মিশিয়া যাওয়া মানবদেহে পুনরায় জীবন সঞ্চারিত করাকে জাদু হিসাবে বর্ণনা করিয়াছে"।[৪৫]

ইহা করিতে যাইয়া ওয়াট তাহার উদ্ধৃত আয়াতটির সুস্পষ্টভাবে ভুল অর্থ ও ভুল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইহা মোটেই এই অর্থ প্রকাশ করে না। উক্ত সূরার ১৪-১৫ নং আয়াতদ্বয় প্রত্যাদেশ (ওহী) সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং ইহাকে তাহাদের দ্বারা জাদু হিসাবে চিহ্নিত করা সম্পর্কে বলে, কবরের মাটিতে মিশিয়া যাওয়া দেহে জীবন সঞ্চারিত করাকে তাহাদের দ্বারা জাদু হিসাবে চিহ্নিত হওয়া সম্পর্কে বলে না, যাহা তাহারা স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করে নাই। আয়াত দুইটি বলে ঃ "আর যখন তাহারা কোন "নিদর্শন" দেখে তখন ইহার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে এবং বলে, ইহা প্রকাশ্য জাদু ব্যতিরেকে আর কিছু নয়"।[৪৬]

অনুচ্ছেদটির পরবর্তী দুইটি আয়াত ১৬-১৭ পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে তাহাদের অবিশ্বাস সম্পর্কে বলে। ওয়াট ভুলবশত এই অবিশ্বাসকে "নিদর্শন" অর্থাৎ প্রত্যাদেশ সম্পর্কে তাহাদের মন্তব্যের সঙ্গে যুক্ত করিয়াছেন যাহাকে তাহারা "জাদু" হিসাবে অভিহিত করিয়াছে এবং যাহা পূর্ববর্তী দুইটি আয়াতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মারগোলিয়থ-এর ন্যায় ওয়াট স্বীকার করেন যে, পুনরুজ্জীবনের প্রশ্নটি "শেষ বিচারের দিন এবং কৃতকর্মের পরিণামস্বরূপ চিরন্তন পুরস্কার ও শাস্তি"-এর মতবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তিনি আরো বলেন, মক্কাবাসিগণ কর্তৃক এই মতবাদ অস্বীকার করার অর্থ ছিল "ধর্মীয় আদেশ পালন

করার পুরস্কার ও উহা অমান্য করার শাস্তি সংক্রান্ত বিধানটি, যাহা ব্যাক্তিগত আচরণবিধির জন্য প্রবর্তিত হইতে যাইতেছিল, তাহা অকার্যকর রাখা"।[৪৭]

ওয়াট কর্তৃক এখানে উল্লিখিত তাহাদের আপত্তির ইঙ্গিতটি সঠিক। কিন্তু ইহা এই অর্থও প্রকাশ করিতে পারে যে, মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে তাহাদের আপত্তির প্রধান কারণসমূহের একটি ছিল, অবাধ অনুমতিপ্রাপ্ত জীবনযাত্রার পরিবর্তে যাহাতে তাহারা অভ্যস্থ ছিল,[৪৮] ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতার ভিত্তিতে আচরণবিধি গ্রহণ করিতে তাহাদের অস্বীকৃতি এবং সেই কারণে "আল্লাহ্র বাণী"-এর প্রতি তাহাদের বিরোধিতা মহানবী ﷺ-এর ধর্মপ্রচারের ঠিক প্রারম্ভ হইতেই শুরু হইয়াছিল, শয়তানী শ্লোকসমূহের তথাকথিত ঘটনার পরে নয়, যাহা ওয়াট এত পরিশ্রমসাধ্যভাবে এবং বিভ্রান্তিকররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ যেরূপ এখানে স্বীকার করেন, "শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে শিক্ষা কুরআনের প্রাথমিক বাণীসমূহের অংশ ছিল" এবং যেমন তিনি আরো স্বীকার করেন, "মৌখিক সমালোচনাসমূহ শয়তানী শ্লোকসমূহের ঘটনার বহু পূর্বে আরম্ভ হইয়া থাকিতে পারে"।[৪৯] এই যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে না যে, মহানবী ﷺকর্তৃক প্রদত্ত বাণীসমূহের "মৌখিক সমালোচনাসমূহ" এবং তাঁহার প্রতি "বিরোধিতা" ছিল দুইটি পৃথক ও আনুক্রমিক ঘটনা। ওয়াটের নিজস্ব তত্ত্ব যে, অবিশ্বাসীদের বিরোধিতায় প্রধানত সম্মিলিতভাবে মৌখিক সমালোচনা ও মৃদু "নির্যাতন" অন্তর্ভুক্ত ছিল, "মৌখিক সমালোচনাসমূহ" এবং "বিরোধিতা"-এর মধ্যে এই ধরনের একটি পার্থক্য সৃষ্টি করিতে বাধা প্রদান করে। এখানে ওয়াট সাধারণভাবে বিরোধিতা আরম্ভ হওয়া সম্পর্কে তাহার তত্ত্বটি বাতিল করেন, যদিও তিনি ইহা সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করিতে ব্যর্থ হন।

মারগোলিয়থ-এর ন্যায় ওয়াট আবার অবিশ্বাসীদের আপত্তিসমূহের যথার্থতা প্রতিপাদন করেন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এইভাবে কবরের মাটিতে মিশিয়া যাওয়া দেহের পুনর্গঠন সম্পর্কে তাহাদের আপত্তি সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহা "তাহাদের নিকট মহানবী ﷺ-এর দাবির" বিরুদ্ধে মনোবল চূর্ণকারী একটি উচিত জবাব বলিয়া প্রতীয়মান হয়," "গোটা পরলোকতত্ত্ব সংক্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে একটি কার্যকর আপত্তি"।[৫০] তদুপরি তাহাদের প্রশ্ন "কখন সেই সময়"?-এর উল্লেখ করিয়া ওয়াট বলেন, কুরআনে ইহার উত্তর আছে বা কুরআন দিয়াছে, "ইহা কে প্রতিরোধ করিতে পারে"? কিন্তু ইহা মুহাম্মাদ ﷺ -কে অস্বস্তিতে ফেলিয়া থাকিতে পারে।[৫১] এই কথা যোগ করিয়া যে, মহানবী ﷺ-এর "দুর্দমনীয় বিরোধিগণ" "নির্দশনসমূহ হইতে শিক্ষাগ্রহণ করে নাই" এবং "তাহা হইলে আমাদের পূর্বপুরুষগণকে উপস্থিত কর" বলিয়া "সমুচিত জবাব দেয়"। ওয়াট আরো বলেন যে, কুরআনের অনেক আয়াত যাহা আল্লাহ্র 'নিদর্শন' সম্পর্কে বলে, মৃতদেহে জীবন সঞ্চার সম্পর্কিত দুঃসাধ্যতার উত্তর বা প্রতিক্রিয়া বলিয়া প্রতীয়মান হয়"।[৫২]

অবশ্যই মহানবী ﷺ-এর দুর্দমনীয় বিরোধিগণ নিদর্শনসমূহ হইতে কোন শিক্ষা গ্রহণ করে নাই। কিন্তু অনুমান যে, তাহাদের প্রশ্ন "কখন সেই সময়"? পূর্বপুরুষগণকে উপস্থিত করার জন্য

তাহাদের দাবি মহানবী ﷺ-এর জন্য 'অস্বস্তি' ঘটাইয়াছিল অথবা দুঃসাধ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রভৃতি ওয়াটের নিজস্ব ধারণা। অনুমানসমূহ শুধু অবিশ্বাসীদের মনোভাবের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ একটি মনোভাবের নির্দেশক। কারণ আল্লাহ্‌তে একজন "বিশ্বাসী" পুনরুজ্জীবন ও শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে আপত্তিসমূহ কোন দুঃসাধ্যতা হিসাবে দেখা দিবে না, বরং অবিশ্বাসীদের পক্ষে অবাধ্যতার একটি চিহ্নরূপে দেখা দিবে।

ওয়াটের মতে "আলোচনার অন্য প্রধান কেন্দ্রবিন্দু" ছিল, "প্রতিমাগুলির প্রশ্ন ও আল্লাহ্‌র একত্ব"-এর উপর যাহার সম্পর্কে কুরআন উদ্যোগ গ্রহণ করে। অপরপক্ষে পৌত্তলিকরা পৌত্তলিকতার তত্ত্বগত প্রতিরক্ষার উপায় না থাকায় শুধু বলে যে, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিতেছে। তিনি স্বীকার করেন যে, অবিশ্বাসীদের এই উত্তর যতটা না ছিল মুহাম্মাদ ﷺ-এর বিরুদ্ধে তাঁহার পূর্বপুরুষদের পথ হইতে বিচ্যুত হওয়ার অভিযোগ ততটা "সাধারণ পরিভাষায় তাহাদের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গির একটি সত্যতা প্রতিপাদক যুক্তি"।[৫৩] এইভাবে বলিবার পর তিনি মন্তব্য করেন, কুরআনের মক্কায় অবতীর্ণ 'আয়াতসমূহে নবীগণের কাহিনীসমূহ ছিল আংশিকভাবে "তাহাদের পূর্বপুরুষদের পদাংক অনুসরণ করার বিরুদ্ধে একটি তীব্র প্রতিবাদ"। এবং এগুলির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানগণকে উৎসাহিত করা যাহারা "অবশ্যই অনুভব করিয়াছিল তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণকে ত্যাগ করিতেছেন" এবং এই বিষয়টি উপলব্ধি করান "যে, তাহাদের একটি স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার ছিল এবং তাহারা গভীর অতীতে প্রোথিত-মূল একটি সমাজের সদস্য ছিলেন"।[৫৪]

কুরআনে বর্ণিত নবীদের কাহিনীসমূহের প্রধান লক্ষ্য ছিল তৌহীদের মর্মকথা হৃদয়ঙ্গম করান এবং সেইগুলি এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যে, "গভীর অতীতে প্রোথিত-মূল"সহ ইসলামের একটি "স্বতন্ত্র আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার" রহিয়াছে। কিন্তু এই উক্তি যে, সেগুলি ছিল "অবিশ্বাসীদের পূর্বপুরুষগণের পদাংক অনুসরণ করার জন্য" তাহাদের দাবির বিরুদ্ধে একটি "তীব্র প্রতিবাদ" ওয়াটের শুধু একটি অনুমান মাত্র, যাহার ভিত্তি ছিল তাহার আরো একটি অনুমান যে, "মুসলমানগণ অবশ্যই অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাহারা তাহাদের পূর্বপুরুষগণকে ত্যাগ করিতেছেন"। শেষোক্ত অনুমানটি প্রাথমিক যুগে ইসলামে দীক্ষিত কোন মুসলমানের এই ধরনের কোন অনুভূতি বা দ্বিধার দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থিত নয়। তদুপরি, ইবরাহীম (আ)-কে বাদ দিলে, কুরআনে উল্লিখিত অন্য বহু সংখ্যক নবীর প্রসঙ্গে আরবদের জন্য পিতৃপুরুষের পুরুষানুক্রমিক বংশানুক্রম দাবি করা হয় না এবং খৃষ্টান ও ইয়াহূদীরা এই কথা স্বীকার করায় যে, ইয়া'কূব (য্যাকব), মূসা (মোজেস) এবং ঈসা (যীশুখৃষ্ট) সকলেই তাওহীদী ধর্ম প্রচার করিয়ছিলেন, কুরআন কর্তৃক ইহাকে তাহাদের শিক্ষার সহিত সম্পর্কযুক্ত করা অবিশ্বাসীদের কোন বিশেষ দাবির তীব্র প্রতিবাদ ছিল না।

মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবুওয়াত এবং আল্লাহ্র নিকট হইতে তাঁহার প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত হওয়ার দাবির বিরুদ্ধে পরিচালিত অবিশ্বাসীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে ওয়াট মহানবী ﷺ একজন মাজনূন (উম্মাদ), একজন কাহিন (ভবিষ্যদ্বক্তা), একজন সাহি'র (জাদুকর) এবং একজন শা'ইর (কবি) ইত্যাদি বলা বা আখ্যায়িত করা সম্পর্কে তাহাদের অভিযোগসমূহের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এই সকল অভিযোগ কোন অস্বীকৃতি বুঝায় না যে, মহানবী ﷺ-এর "অভিজ্ঞতাসমূহের কোনভাবে অতি প্রাকৃত কারণ ছিল"। কারণ এইসব আখ্যার মূলে ছিল কোন একটি আত্মা বা জিন্ন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ধারণা।[৫৫] ওয়াট আরো অভিযোগ সম্পর্কে উল্লেখ করেন যে, মহানবী ﷺ হয় নিজে কুরআন রচনা করিয়াছিলেন অথবা কোন মানব সহকারীর সাহায্যে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যাহাদের মধ্যে কয়েকজনের সম্পর্কে তাহারা উল্লেখও করিয়াছে। ওয়াট এইভাবে এই অভিযোগের সত্যতা প্রতিপাদন করেন ঃ "ঐতিহাসিকগণ মুহাম্মাদ ﷺ-এর এই বিশ্বাসে তাঁহার পূর্ণ অকপটতার স্বীকৃতি দিবেন যে, প্রত্যাদেশসমূহ তাঁহার নিজের বাহির হইতে তাঁহার নিকট আসিয়াছিল" এবং একই সময়ে একটি সম্ভাবনা হিসাবে স্বীকার করিবেন যে, প্রত্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে মুহাম্মাদ ﷺ কুরআনে বর্ণিত অথবা উল্লিখিত কাহিনীসমূহের কিছু সংখ্যক তথাকথিত সংবাদদাতাদের নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন।[৫৬]

এখন ধার করা জ্ঞানের তত্ত্বের প্রতি, বিশেষভাবে এই তত্ত্বের প্রতি আপত্তিসমূহ পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ নবীগণ সম্পর্কিত কাহিনীর জ্ঞান ঐ সকল ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের নিকট হইতে ধার করিয়াছিলেন যাহাদের সঙ্গে বাণিজ্য যাত্রার পথে বা অন্য কোন সময়ে তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়াছিল।[৫৭] ইহাও পূর্বে[৫৮] উল্লেখ করা হইয়াছে, কেন ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে প্রাচ্যবিদগণ মহানবী ﷺ-এর এই বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার অকপটতার উপর গুরুত্ব আরোপ করিতেছেন যে, তিনি তাঁহার নিজের বাহির হইতে প্রত্যাদেশসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহা এখানে আরো একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তাহারা এইরূপ করে শুধু এই কথা বলার জন্য যে, তাঁহার নিজের বিশ্বাস সত্ত্বেও সেই প্রত্যাদেশসমূহ বাহির হইতে আসিয়াছিল, ঘটনা প্রকৃতপক্ষে সেরূপ ছিল না। ওয়াট এখানে শুধু এই কথা বলেন। সুতরাং ইহা আরো একবার উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কোন নিরপেক্ষ ও সংস্কারমুক্ত ঐতিহাসিক, যিনি কুরআনে উল্লিখিত ও বাইবেলে লিখিত নবীগণের কাহিনীসমূহের মধ্যে তুলনা করিবেন, তথাকথিত সংবাদদাতাদের নিকট হইতে শুনিবার পর মহানবী ﷺ কর্তৃক সেগুলির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনাকে মানিয়া লইবেন না। তাহা না হইলে ইহাতে গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে, কুরআনে কি শুধু অথবা প্রধানত নবীগণের কাহিনী অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে?

ওয়াট অবিশ্বাসীদের স্পষ্টত প্রতীয়মানভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ অভিযোগসমূহের যে প্রত্যাদেশসমূহ ছিল একটি মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট এবং একই সময়ে ইহা ছিল জাদু (সিহ'র), সত্যতা প্রতিপাদন ও

সঙ্গতি সাধন করার উদ্যোগও গ্রহণ করেন। এইভাবে ওয়াট বর্ণনা করেন, ধারণাটি "সম্ভবত এই যে ছন্দপূর্ণ ও সাদৃশ্যপূর্ণ ধ্বনিবিশিষ্ট গদ্য রচনাটি ঐন্দ্রজালিক কর্তৃক তাঁহার রহস্যমূলক জ্ঞান হইতে সৃষ্ট একটি জাদুমন্ত্র এবং এই দিক হইতে মানবিক; কিন্তু নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, তিনি জ্ঞানটি জিন্নদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"।[৫৯] অবিশ্বাসীদের প্রত্যাদেশ সম্পর্কিত অসঙ্গতিপূর্ণ বিবরণসমূহ তাহাদের বিভ্রান্তির নিদর্শন ছিল, মহানবী ﷺ-এর "রহস্যমূলক জ্ঞান" নামে অভিহিত বিষয়ও সেই জ্ঞানটির মধ্যে, যাহা তিনি জিন্নদের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহাদের সচেতনভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করার চিহ্ন নয়।

ওয়াট আরো স্মরণ করেন, অবিশ্বাসীদের অভিযোগসমূহ যে, মহানবী ﷺ 'আল্লাহ কর্তৃক নবী হিসাবে মনোনীত হওয়ার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না এবং কোন মানুষ নবী হইতে পারে না। ওয়াট তাহাদের অলৌকিক ঘটনার দাবি সম্পর্কেও উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, দাবিকৃত অলৌকিক ঘটনাবলীর যথাযথ প্রকৃতিতে কিছু পরিবর্তন থাকিলেও "মূলগত ধারণাটি ছিল সবসময় একই রকম। যেমন The Divine (উর্দ্ধজাগতিক বিষয়) শুধু প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে সময়মত প্রকাশ পাইতে পারে"।[৬০] ওয়াট এখানে উর্দ্ধজাগতিক প্রকাশ (Divine manifestation) -এর খৃস্টান দৃষ্টিভঙ্গিটি উপস্থাপন করেন বলিয়া পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং ইহা শুধু উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, নবুওয়াত Divine-এর একটি প্রকাশ নয় এবং যথাযথভাবে ভুল ও বিভ্রান্তি পরিহার করার জন্য যাহা একজন নবীকে Divine (স্রষ্টার বহিঃপ্রকাশ) অবতার-এর মর্যাদায় উন্নীত করে, কুরআন বারংবার জোর দেয় যে, একজন নবী মানুষের চাইতে অধিক কিছু ছিলেন না এবং তিনি ছিলেন একজন বান্দা (('আব্দ); আল্লাহ্‌র বহিঃপ্রকাশ বা অবতার ছিলেন না এবং The Divine "প্রাকৃতিক শৃঙ্খলার বিশৃঙ্খলার মাধ্যমে" "প্রকাশিত" হন না বরং "প্রাকৃতিক শৃঙ্খল" নিজেই The Divine-এর একটি সন্দেহাতীত প্রমাণ। শুধু মাতার মাধ্যমে একটি শিশুর জন্ম—মাতা ও পিতা ব্যতিরেকে প্রথম মানুষের সৃষ্টি অপেক্ষা প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় অধিকতর বিশৃঙ্খলা নয়।

সে যাহাই হউক, এইখানেও সাধারণভাবে ওয়াট অবিশ্বাসীদের দুইটি পরস্পরবিরোধী যুক্তির, "মুহাম্মাদ ﷺ নবী হওয়ার জন্য যথেষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ছিলেন না এবং কোন মানুষ নবী হইতে পারে না", সত্যতা প্রতিপাদন ও সমর্থন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ওয়াট এই মন্তব্য করার জন্যও সঠিক ছিলেন না যে, "অনুমেয়রূপে ইহা ছিল বিরোধীদের অন্য একটি অংশ" যাহারা আপত্তিটি উথাপিত করিয়াছিল। কুরায়শ নেতাদের একই দল শুধু তাহাদের বিভ্রান্তি ও একগুঁয়ে অবাধ্যতাবশত অসঙ্গতিপূর্ণ আপত্তি দুইটি গঠন করে।

পরিশেষে ওয়াট মহানবী ﷺ-এর উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের অভিযোগটির উল্লেখ করেন এবং বলেন, মক্কায় অবতীর্ণ আয়াতসমূহ যেরূপ দেখায়, মহানবী ﷺ "তাঁহার দায়িত্বকে

প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় অর্থাৎ একজন সতর্ককারীর" দায়িত্ব বলিয়া ধারণা করিলেও মক্কার এই ধরনের পরিস্থিতিতে দায়িত্বের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ছিল এবং যখন ঘটনাবলী এই সংশ্লিষ্টতাতে এই পর্যায়ে উন্নীত করে যাহাতে রাজনৈতিক পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে তখন 'তিনি' পশ্চাৎপদ হন নাই, কারণ তিনি নেতৃত্বটি আল্লাহ্র দিক হইতে তাঁহার উপর চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।[৬১] হাঁ, মহানবী ﷺ পরিশেষে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা আল্লাহ তাঁহার উপর আরোপ করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি মনে করিতেন। কিন্তু তাহা কোনভাবেই অবিশ্বাসীদের অভিযোগটির বাস্তবতা ও সত্যতা প্রমাণ করে না যে, তিনি নিজেকে আল্লাহ্র দূত হিসাবে দাবি করিয়া নেতৃত্বের দিকে হাত বাড়াইয়াছিলেন।

মোটের উপর ইহাই হইতেছে অবিশ্বাসীদের আপত্তিসমূহ সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের আলোচনা। তাহারা সাধারণভাবে মহানবী ﷺ-এর জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক আলোচনায় মক্কার বিরোধীদের আপত্তিসমূহ অনুমোদন ও সমর্থন করেন। অপরপক্ষে তাহারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ ও পরিপুষ্ট করেন। সকল বিষয়ে প্রাচ্যবিদগণ একদিকে মক্কার বিরোধীদের মতামতসমূহ প্রচলিত করিতে ও অব্যাহত রাখিতে এবং অন্যদিকে অবিশ্বাসীদের মতামতের মাধ্যমে নিজেদের মতামত চালাইয়া দিতে অবতীর্ণ হন। যথার্থভাবে কুরআনে উল্লেখ আছে ঃ

كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ....

"এমনভাবেই তাহাদের পূর্ববর্তীগণ তাহাদেরই মত কথা বলিত। তাহাদের অন্তর এক রকম"।[৬২]

অনুবাদ ঃ মুহাঃ আবু তাহের

তথ্যনির্দেশিকা

১. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১৩০।

২. ঐ ,১৪৫।

৩. ঐ, ১২৮।

৪. ঐ, ১২৭।

৫. দেখুন আত-তাবারী, তাফসীর, ৭খ, ২২৮; ইবন কাছীর, তাফসীর, ৩খ., ২৭২।

৬. মারগোলিয়থ, পূ, গ্র, ১৩০-১৩১।

৭. ঐ, ১৩২।

৮. ঐ, ১৩৩–১৩৪।

৯. ঐ, ১৩৪।

১০. ঐ, ১৩৫।

১১. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, ইবন কাছীর, তাফসীর, ৩খ, ৫৮৯-৫৯০।

১২. মারগোলিয়থ, পূ প্র., ১৩২-১৩৩।

১৩. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, ১৩:৩৮ ও ৪৩ : ৭৮; উভয় আয়াতের পাঠ এইরূপ :

وَمَا كَانَ لِرَسُوْلٌ اَنْ يَّأْتِى بِايَةٍ الاَّ باذْنِ اللّٰهِ .

১৪. দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন আত'-তাবারী, তাফসীর, ১৫খ, ১০৭–১০৯।

১৫. ঐ।

১৬. মারগোলিয়থ, পূ. প্র., ১৩৪।

১৭. উপরে দেখুন পৃ. ২৫৪-২৫৫ (মূল গ্রন্থ)।

১৮. মারগোলিয়থ, পূ, প্র, ১৩৫-১৩৬।

১৯. ঐ, পৃ. ১৩৬।

২০. ঐ, ১৩৭, ১৩৯।

২১. দেখুন ইবন কাছীর, ৬খ. ১১৮।

২২. (وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلاً) এবং (وَنَزَّلْنٰهُ تَنْزِيْلاً)

২৩. দ্র. কুরআন, ৭৪ : ৫২।

২৪. মুহাম্মাদ আলী, The Holy Qur'an Arabie text. English translation and commentary, সপ্তম সংস্করণ, লাহোর, ১৯৮৫, পৃ. ৭০২-৭০৩, টীকা ১৭৮৫।

২৫. মারগোলিয়থ, পূ. প্র, ১৩৬-১৩৭।

২৬. ঐ, ১২৯।

২৭. ঐ, ১৩৭।

২৮. ইবন হিশাম, ১খ. ৩৫৮–৩৬০; আত–আবারী, তাফসীর, ১৭খ, ৭৬–৭৭; ইবন কাছীর ৫খ, ৩৭৪-৩৭৬।

২৯. মূল পাঠটি এইরূপ : اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ .

৩০. মূল পাঠটি এইরূপ : اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى اُوْلٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ .

৩১. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৫খ., পৃ. ৩৭৬।

৩২. আত-তাবারী, তাফসীর, ১৭খ., পৃ. ৭৭।

৩৩. মারগোলিয়থ, পূ.গ্র. পৃ. ১৩৮–১৩৯।

৩৪. ঐ, পৃ. ১৩৯।

৩৫. মূল পাঠটি এইরূপ ঃ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابِ يَزْدَادَ الَّذِيْنَ امَنُوْا اِيْمَانًا .

৩৬. উদাহরণের জন্য দেখুন, আশ-শাওকানী, তাফসীর, ৩খ, ৪৩১।

৩৭. দেখুন অভিব্যক্তিটি ফুয়াদ আবদুল বাকী, আল-মু'জামুল-মুফাহরাস লিআলফাযিল কুরআনিল কারীম-এ।

৩৮. মূল পাঠটি নিম্নরূপ ঃ مَا نَنْسَخْ مِنْ ايَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍمِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا .

৩৯. বিষয়টি সম্পর্কে আলোচনার জন্য দেখুন, উদাহরণস্বরূপ, ইবনুল জাওযী (জামালুদ্দীন আবুল ফারাজ আবদুর রাহমান), নাওয়াসিখুল কুরআন ইত্যাদি, মুহাম্মাদ আশরাফ 'আলী আল-মালয়াবারী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা ১৪০৪/১৯৮৪; মুহাম্মাদ মাক্কী ইবন আবী তালিব আল-কায়সী (আবূ মুহাম্মাদ, মৃ., ৪৩৭ হি.), আল-ইদাহ লি-নাসিখুল কুরআন ওয়া মানসূখিহি, সম্পা. আহমাদ হাসান ফারহাত, ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সাউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ ১৩৯৬ হি.। আরো দেখুন শাহ ওয়ালিউল্লাহ, আল-ফাওযুল কাবীর ফী উসূলিত তাফসীর।

৪০. মারগোলিয়থ, পূ. গ্র., ১৪০–১৪১।

৪১. আত-তাবারী, তাফসীর, ১৪খ, ১০৩; ২৫খ., ৫৯; ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ, ৪৮৮–৪৮৯; ৭খ, ২১০।

৪২. কুরআন, ২ ঃ ২।

৪৩. কুরআন, ৭৬ ঃ ৩।

৪৪. Watt, M at M, পৃ. ২৭–১৩১।

৪৫. ঐ, পৃ. ১২৪।

৪৬. আয়াত দুইটি নিম্নরূপঃ

وَاِذَا رَاَوْا ايَةً يَّسْتَسْخِرُوْنَ . وَقَالُوْآ اِنْ هذَا اِلاَّ سِحْرٌ مُّبِيْنٌ .

৪৭. Watt, M at M., ১২৪।

৪৮. দেখুন উপরে, পৃ. ৬১৬–৬১৭ (মূল গ্রন্থ)।

৪৯. ওয়াট, পূ. গ্র,, ১২৩।

৫০. ঐ, ১২৪।

৫১. ঐ, ১২৫। ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, মারগোলিয়থ এই ধরনের প্রশ্নে কুরআনের উত্তরকে ন্যায়ের ফাঁকি (Sophism) হিসাবে অভিহিত করেন যাহা বিষয়টি যেখানে ছিল সেখানে রাখিয়া দেয় বলিয়া কথিত হয়।

৫২. ঐ।

৫৩. ঐ, ১২৭।

৫৪. ঐ।

৫৫. ঐ, ১৩৭-১৩৮

৫৬. ঐ, ১২৮।

৫৭. উপরে দেখুন, অধ্যায় ১১; বিশেষভাবে দেখুন পৃ, ২৭৪-২৯০ মূল গ্রন্থ।

৫৮. দেখুন মুখবন্ধ।

৫৯. Watt, M. at M., ১২৯, ঐ।

৬০. ঐ, ১২৯-১৩১।

৬১. ঐ, ১৩০-১৩১।

৬২. কুরআন, ২ ঃ ১১৮।

চৌত্রিশতম অধ্যায়

আবিসিনিয়ায় হিজরত এবং প্রাচ্যবিদগণ

প্রাচ্যবিদগণের প্রায় সকলেই আবিসিনিয়ায় হিজরত সম্পর্কে বিভিন্ন, এমনকি প্রায় পরস্পর-বিরোধী ধারণা পোষণ করেন। উইলিয়াম মুইর এবং মার্গোলিয়থ যেখানে আবিসিনিয়ায় হিজরতের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিন্ন মতামত গ্রহণ করেন, সেইখানে মন্টগোমারী ওয়াট কেবল তাহাদের সঙ্গে মতানৈক্যই পোষণ করেন না, বরং তিনি এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ নূতন এক তত্ত্ব পেশ করেন। অনুরূপভাবে যদিও তাহাদের সকলেই "Satanic Verses" -এর মিথ্যা ও জাল গল্পকে একটি সত্যিকার ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেন, তথাপি মার্গোলিয়থ ইহাকে হিজরতের ভবিষ্যৎ ফলের সঙ্গে সংযুক্ত এক তত্ত্ব হিসাবে বিনির্মাণ করেন। ওয়াট, যেমন ইতোপূর্বে দেখা গিয়াছে, ঐ বিষয়াদি হইতে এতদসংক্রান্ত সকল বর্ণনা পৃথক করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত তাত্ত্বিক সমালোচনায় এইগুলি প্রয়োগ করেন।

এক ঃ মুইর এবং মার্গোলিয়থের ধারণাসমূহ

উইলিয়াম মুইর ও মার্গোলিয়থ উভয়ে হিজরতের কারণ সম্পর্কিত উৎসসমূহের প্রদত্ত ব্যাখ্যাকে বাস্তবিকভাবে গ্রহণ করেন এবং বলেন, মক্কায় মুসলমানদের জন্য অসহনীয় পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার কারণে মুসলমানগণ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। মক্কাবাসীদের মধ্যে যাহারা আযাদ ছিল (অর্থাৎ গোলাম ছিল না) তাহাদের সম্পদ, মার্গোলিয়থের পর্যবেক্ষণ মতে, "তাহাদের ক্ষুধার্ত ভাইদের সন্তান-সন্ততিদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য অপর্যাপ্ত ছিল। ক্ষুধার্ত দরিদ্রদের জীবন ছিল ধর্মীয় কারণে অসহ্য যাতনাপূর্ণ এবং অবিরাম জ্বালাতন ও নির্যাতন জর্জরিত"।[১]

যাহা হউক, মার্গোলিয়থ এই ধরনের কথা বলিয়া, অন্যদিকে আবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁহার অনুসারীদের আবিসিনিয়ায় প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অভিযুক্ত করেন। মার্গোলিয়থের এই অভিযুক্তকরণ সম্ভবত মুইর কর্তৃক প্রদত্ত ধারণার উপর ভিত্তি করিয়া যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে খুব বেশী কিছু বলেন নাই, যেমন কুরায়শ নেতাদের আশংকা সম্পর্কে লিখেন, "নাজাশী তাঁহাদিগকে (মুসলমানদেরকে) সামরিক বাহিনীর দ্বারা সমর্থন দিবেন এবং মক্কার

একটি খৃস্টান অথবা একটি সংস্কারপূর্ণ বিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেন, যেমনটি তাঁহার পূর্ববর্তী শাসকগণ ইয়ামান-এ করিয়াছিলেন।[২] এই আভাস মি. মার্গোলিয়থ কর্তৃক স্ফীত হয়, যিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ আবিসিনিয়ায় অভিবাসী পাঠানোর ব্যাপারে "সম্ভবত" এই প্রত্যাশায় ছিলেন যে, তাহাদিগকে আবিসিনিয়ান সেনাবাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসাবে প্রত্যাবর্তনকারী দেখিতে চাহেন"।[৩] তিনি পরববর্তী সময়ে আরও জোর দিয়া বলেন, "এই ব্যাপারে সন্দেহ করার কোন অবকাশ নাই যে, ইসলামের প্রবর্তকের স্বীয় অনুসারীবৃন্দকে বিদেশে প্রেরণের পিছনে অনুরূপ কোন উদ্দেশ্য নিহিত ছিল"।[৪] মার্গোলিয়থের বিবেচনায় দেশ নির্বাচনের কারণ এই ছিল যে, দেশটি ইতোপূর্বে নির্যাতিত আরব খৃষ্টানদের জন্য কার্যকর সাহায্য প্রেরণ করিয়াছিল।[৫] কা'বা ধ্বংস করার জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণের মাধ্যমে এবং মক্কার মূর্তিপূজার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছিল। ইয়ামানে আবিসিনীয়দের হস্তক্ষেপ অর্ধ শতাব্দী কালেরও পূর্বে সংঘটিত হয় এবং আবরাহার মক্কা আক্রমণের ঘটনা মহানবী ﷺ -এর জন্মের অল্পকাল পূর্বে সংঘটিত হয়।

এই অভিযোগসমূহ একেবারেই অনুমানভিত্তিক, এই অনুমান কোন ঘটনা বা কোন কারণ, ইহার কোনটার দ্বারাই সমর্থিত নহে। এই কথা বলাও সত্য হইতে অনেক দূরে যে, কা'বার বিরুদ্ধে আবরাহার আক্রমণ প্রাথমিকভাবে মক্কার পৌত্তলিকতার প্রতি তাহার ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছিল। ৬১৪-১৫ খৃ. আবিসিনিয়ার জন্য পরিস্থিতি আরবে খৃস্টান অভিযান পুনঃ পরিচালনার অধিকতর অনুকূল ছিল না। যেমন মার্গোলিয়থ অল্প পূর্বে তাহার এক রচনায় বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছেন[৬] যে, ঐ সময়ে বায়যান্টাইনীয় খৃস্টানদের পার্সিয়ানদের হাতে পরাজয় পার্সিয়ানদের জন্য গৌরবজনক ছিল, যে বিষয়টিকে তিনি আরবদের স্পিরিট বলিয়াছেন।

ইহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, বায়যান্টাইনীয়দের সহায়তায় মক্কায় 'উছমান ইবন হুওয়ায়রিছ-এর ক্ষমতা দখল করার প্রচেষ্টার চরম ব্যর্থতার কথা সেখানে ভুলিয়া যাওয়া হয়। সুতরাং কোন মক্কাবাসীই তাহার স্বদেশ ভূমিতে এবং শহরে বৈদেশিক হস্তক্ষেপ চাহিবে না, অন্যথায় ইহা তাহার জন্য আত্মহত্যার শামিল হইবে। প্রকৃতপক্ষে মার্গোলিয়থ কিয়ৎকাল পরে তাহার মূল্যায়নে নেতিবাচক অভিমত প্রকাশ করেন, যখন তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ব্যাপারে সম্ভবত সতর্ক ছিলেন যে, এমন ধরনের আক্রমণ তাঁহার জন্য এক সন্দেহপূর্ণ সুবিধা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, যেহেতু আবিসিনীয়গণ যদি জয়ী হইতে সক্ষম হয় তবে তাহা হইবে তাহাদের নিজেদের জন্য।[৭]

এইরূপে প্রথমে মার্গোলিয়থ কল্পনা ও ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত আবিসিনীয়দের একটি আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন এবং পরে এই ধরনের ঘটনা সংঘটনের জন্য অপরিপক্ক চিন্তার বিষয়টি অনুধাবন করেন। তিনি (মার্গোলিয়থ) পুনরায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই অনুধাবন সম্পর্কে উল্লেখ করেন। সম্পূর্ণ বিষয়টি মার্গোলিয়থের নিজস্ব কল্পনায় সংঘটিত হয় এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী বর্ণনা কেবল তাহার নিজস্ব চিন্তার স্তর নির্দেশ করে।

যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহা অনুধাবন করিতে পারিতেন যে, আবিসিনীয়গণ কেবল তাহাদের নিজেদের জন্যই জয় করিবে, তাহা হইলে প্রথমেই তিনি বুঝিতে পারিতেন যে, তিনি কখনও হিজরতকারীদের জন্য অথবা আবিসিনীয় সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী বা পশ্চাদবর্তী দল হিসাবে দেখিতে ইচ্ছুক হইতেন না।

মার্গোলিয়থ তাহার ধারণার সমর্থনে পুনরায় বলেন, কয়েক বৎসর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ "অপর এক শহরের" সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত করেন—বলা হয়, তিনি তাঁহার ধর্মের জন্য সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যে।[৮]

এখানে পরবর্তী কালে মদীনায় হিজরতের পরবর্তী ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। মার্গোলিয়থ সুস্পষ্টরূপে দুইটি পরিস্থিতির পার্থক্য নির্ধারণে ব্যর্থ হন এবং তাহার ধারণার সমর্থনে যাহা উল্লেখ করেন তাহা প্রকৃতপক্ষে তাহার মতবাদকে খণ্ডন করে। মদীনায় তাঁহার (রাসূলুল্লাহ ﷺ) অবস্থান প্রকৃতপক্ষে এরূপ ছিল যে, তিনি সর্বপ্রথম তাঁহার সকল অনুসারীদের মদীনায় হিজরতের ব্যবস্থা করেন এবং সর্বশেষে তিনি নিজে ঐ স্থানে (মদীনায়) উপনীত হন। (প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁহার নিজ শহর (মক্কা) হইতে স্বেচ্ছা নির্বাসিত হন নাই)। আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিষয়টি এরূপ ছিল যে, তিনি নিজে মক্কায় থাকিয়া গিয়াছিলেন, পক্ষান্তরে তাঁহার অনুসারীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ঐ দেশে হিজরত করেন। কোন বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহার অনুসারীদিগকে কোন ভিন্ন দেশে এই পরিকল্পনায় পাঠাইতে চাহিবেন না যে, তাহারা ঐ দেশের সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসাবে প্রত্যাবর্তন করুক এমতাবস্থায় যে, যখন তিনি নিজে তাঁহার ঘোর শত্রুকে আঁকড়াইয়া থাকেন।

অধিকন্তু নগরীসমূহ যতই স্বাধীন হউক না কেন মদীনা কোনক্রমেই "বিদেশ" ভূমি ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ অবশ্যই মদীনায় তাঁহার পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করেন এবং সেইখানে তাঁহার ক্ষমতা পাকাপোক্ত করেন। তিনি বিভিন্ন দিকে কতিপয় সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু সকল অভিযানের মধ্যে মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে তিনটি প্রধান ও সিদ্ধান্তমূলক সংঘর্ষ বদর, উহুদ ও খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মক্কাবাসীরাই মদীনার উপর চড়াও হইয়াছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার দিকে অভিযানে অগ্রসর হন নাই। তিনি চূড়ান্তভাবে যখন এইরূপ আচরণ করেন (অর্থাৎ আক্রমণাত্মক না হওয়া), তখন মক্কা ও মদীনা উভয় স্থানের জনমত এবং এমনকি আরব উপদ্বীপের সকল জনগণের মতামত সুনির্দিষ্টভাবে তাঁহার (রাসূলুল্লাহর) পক্ষে চলিয়া আসে। ফলে মক্কা "বিজয়" শান্তিপূর্ণ ও রক্তপাতহীনভাবে সম্পন্ন হয়। ইহা অপরিহার্যভাবেই একটি পশুশক্তির সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি মতার্দশের বিজয় এবং ইহা কোন ক্রমেই কোন "বিদেশী" সৈন্যবাহিনীর অগ্রবর্তী দল হিসাবে প্রত্যাবর্তন নহে।

মার্গোলিয়থ তাহার ধারণাসমূহ উপস্থাপন করিয়া কার্যত আরও কতিপয় স্ববিরোধী সমস্যার সৃষ্টি করেন। এইরূপে তিনি যখন এমন ব্যাখ্যা দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আবিসিনিয়ায়

তাহার অনুসারীদের প্রেরণ করার উদ্দেশ্য ছিল, আবিসিনীয় প্রতিপক্ষকে প্ররোচিত করিয়া আরবে একটি সামরিক অভিযান পাঠানোর ব্যবস্থা করা, একই সময়ে নলডেকে-এর ভাষাতে তিনি বলেন যে, উভয় পক্ষ তাহাদের পরস্পরের ভাষা (আবিসিনীয় ও আরবগণ) বুঝিতে পারিয়াছিল কি না তাহা জানা যায় নাই।[৯] যদিও কেবল মার্গোলিয়থ ইহাই বলেন নাই যে, মক্কাবাসীদের সঙ্গে আবিসিনীয়া রাষ্ট্রের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল,[১০] বরং তিনি ইহাও বলেন যে, আমর ইবনুল 'আস যিনি কুরায়শদের পক্ষ হইতে আবিসিনিয়ায় যান মুসলিম হিজরতকারীদিগকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনিবার জন্য সেই আমর পূর্বেও তথায় গিয়াছিল এবং সেই পূর্বের এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বাদশাহর কোন এক রাণীর অবিশ্বস্ততার কথা বাদশাহকে অবহিত করেন। তাহার নিজের (আমরের) ভুলের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে।[১১] উভয় পক্ষ তখন নিশ্চিতভাবেই তাহাদের পরস্পরের ভাষা বুঝিতে পারিয়াছিল। এমনকি আবিসিনীয় রাজদরবারে মুসলমানদের ব্যাপারে জা'ফার ইব্ন আবী তালিবের যৌক্তিকতা প্রদর্শন সর্ম্পকিত ভাষণ এই মতকে খণ্ডন করে।

মার্গোলিয়থ বলেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না যে, জা'ফার সেখানে যে সূরা আবৃত্তি করেন তাহা তিনি অনুবাদও করেন, সেই সূরাটি "ছন্দের অন্তমিল-এর দিক হইতে অনুপম সৌন্দর্যপূর্ণ ছিল"। এইখান হইতে, মার্গোলিয়থ লিখেন, "আমরা হয়ত স্থূল কল্পনায় বলিতে পারি যে, আবিসিনীয় শ্রোতামণ্ডলী এই কল্পকাহিনীর অর্থ সম্পর্কে অনুমান করিতে সক্ষম হইয়া থাকিবে যাহা তাহাদের নিজেদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিল"।[১২] এই বিষয়টি খুলিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মার্গোলিয়থ কর্তৃক এই স্থূল কল্পনা ইতোপূর্বে তৎকর্তৃক কৃত স্থূল কল্পনার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ। সেখানে তিনি বলেন যে, উভয় পক্ষ কদাচ তাহাদের পরস্পরের ভাষা বুঝিতে সক্ষম ছিল, তাহার এই বক্তব্যের সমর্থনে তিনি নলডেকে-এর রেফারেন্স দিয়াছেন।

পুনরায় এইসব বিষয়ের উপর বিশ্বাস না করিয়া, উম্মু সালামা (রা) আবিসিনীয় রাজদরবারে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে বলেন, কুরআনের ১৯ নম্বর সূরা, যীশুখৃষ্ট আল্লাহর পুত্র, এই বক্তব্যের প্রতি ঘৃণা ও ক্রোধ মিশ্রিত অস্বীকৃতি সম্বলিত বক্তব্য দিয়াছে এবং এই সূরা জা'ফার (রা) সেইখানে (আবিসিনীয় রাজদরবারে) তিলাওয়াত করিয়াছিলেন। মার্গোলিয়থের মতে, "পরবর্তী সময়ে এই অংশটি সূরার মধ্যে প্রশ্নাতীতরূপে সন্নিবেশ করা হয়" রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্যে। এই "সমস্যাসংকুল বিষয়টি পরিহার করা সত্যেও খৃষ্টানদের সঙ্গে বিবাদ করার জন্য ইহা তাঁহার নিকট একটি রাজনৈতিক বিষয় হইয়া দাঁড়ায়।"[১৩] পরবর্তীতে মার্গোলিয়থ আবিসিনীয় বাদশাহের ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে বর্ণনাসমূহকে অস্বীকার করেন এবং বলেন, যখন মুসলমানগণ খৃষ্টানদিগকে প্ররোচিত করিতে শুরু করে তখন তাহারা আবিসিনীয়ার খৃষ্টান রাজা নেগাস কর্তৃক তাহাদিগকে সাহায্য করিবার স্মৃতি সম্পর্কে বিদ্রূপ করিত। মার্গোলিয়থ বলেন, তখন "অলীক গল্প উদ্ভাবন করা হয়" এই দেখাইয়া যে, "নেগাস কিভাবে ইসলামের একজন অনুসারী ছিলেন, একজন খৃষ্টান ছিলেন না"।[১৪]

উপরোল্লিখিত উভয় ধারণাই অবাস্তব ও অবান্তর। মার্গোলিয়থ তাহার বর্ণনায় কোন বরাত উল্লেখ করেন নাই। তাহার বর্ণনা অনুযায়ী ১৯নং সূরার আয়াতটি পরবর্তী সময়ে সন্নিবেশিত। ইহা কোন বাস্তব ঘটনা নহে যে, রাসূলুল্লাহ খৃষ্টানদের মতবাদ "যীশুখৃষ্ট আল্লাহ্‌র পুত্র" এই বক্তব্যের সাথে পরবর্তী কালে মতানৈক্য পোষণ করিয়াছেন। আল্লাহর কোন বংশধর অথবা সন্তান নাই—এই কথাটি বহু সূরায় উল্লেখ করা হইয়াছে।[১৫] এই অনুমানও যে, কুরআনের সূরাসমূহ রাসূলুল্লাহ -এর নিজস্ব রচনা যাহা তিনি তাঁহার সুবিধামত সজ্জিত করিয়াছেন, সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত।

নাজাশী সম্পর্কে কথা এই যে, রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি তাহার বিশ্বাস এবং ইসলাম গ্রহণের ঘটনা নির্ভরযোগ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলিতে গেলে, রাসূলুল্লাহ -এর সঙ্গে নাজাশীর নিজস্ব যোগাযোগ ছিল।[১৬] যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ নাজাশীর মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পর তিনি তাহার উদ্দেশ্যে গায়েবানা জানাযা পড়েন।[১৭]

এইরূপ বর্ণনা যে, পরবর্তী কালে মুসলমানগণ খৃষ্টানদেরকে ধর্মীয় বা রাজনৈতিক কারণে যন্ত্রণা দিয়াছে ও নির্যাতন করিয়াছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। যেমন সংগত কোন কারণ ছাড়া অনুমানের ভিত্তিতে বলা হইয়াছে যে, নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের বর্ণনা ছিল জবাবস্বরূপ পরবর্তী কালের "উদ্ভাবিত" বিষয় যে, খৃষ্টানরা মুসলমানদিগকে (নাজাশীর সময়) যে সাহায্য করিয়াছিল তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া উপহাস করিত।

কিন্তু মার্গোলিয়থের ধারণার অত্যন্ত কৌতূহলপূর্ণ উদ্দেশ্য এই যে, ইহার ফলে তিনি পরে আবার তাহার বক্তব্যের সঙ্গেই পরস্পর বিরোধী বক্তব্য পেশ করেন, যখন তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ এবং মুসলমানগণ এই ব্যাপারে 'আবিসিনিয়ান কার্ড' সফলভাবে প্রয়োগ করিয়াছেন অর্থাৎ ফায়দা লাভ করিয়াছেন। মার্গোলিয়থ বলেন, "নাজাশী বিশ্বাস করিতেন, মুহাম্মাদ একজন রাসূল ছিলেন, এই ঘটনা এক্ষণে জোরেশোরে প্রচার করা হয়" এবং মক্কাবাসী মুহাম্মাদ -কে বিরক্তিজনক বরং বিপজ্জনক মনে করিতে লাগিল"।[১৮]

মার্গোলিয়থ সুস্পষ্টভাবে এইখানে তাহার পর্যবেক্ষণের ভিত্তি নাজাশীর ইসলাম গ্রহণের 'বাস্তব ঘটনার' উপর স্থাপন করিয়াছেন এবং পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, নাজাশীর ইসলাম গ্রহণ বিষয়টি পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবিত নহে।

চূড়ান্তভাবে "স্যাটানিক ভার্সেস"-এর গল্প সম্পর্কে মার্গোলিয়থ ইহাকে কেবল একটি ঘটনা হিসাবে সমালোচনাহীনরূপেই গ্রহণ করে নাই, তিনি ইহার উপর একটি তত্ত্বও নির্মাণ করেন। তিনি ইহাকে বনী হাশিমের বিরুদ্ধে অবরোধ ও নিষেধাজ্ঞার সহিত সম্পৃক্ত করেন এবং বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ আবিসিনীয় হস্তক্ষেপ-এর সন্দেহপূর্ণ সুবিধা অনুধাবন করেন এবং

তিনি তাহার উপাত্তসমূহ প্রবল প্রচেষ্টার মাধ্যমে প্রাপ্ত হন এবং "সম্ভবত" তিনি তাঁহার জ্ঞাতিদের নিকট হইতে অনেক নিন্দা ভর্ৎসনা সহ্য করেন যাহাদের সঙ্গে তিনি গুরুত্বের সাথে আপোষ করেন। এই আপোষের ফলে তাহাকে আল-লাত্ ও আল-উয্যা'র প্রতি ছাড় দিতে হয়। ইহার বিনিময়ে তাহারা তাঁহাকে নিষিদ্ধ করার বিষয়টি প্রত্যাহার করে এবং তাঁহার মর্যাদা আল্লাহর রাসূল হিসাবে স্বীকৃত হয়।[১৯] মারগোলিয়থ পুনরায় বলেন , আপোষ, "যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর রিসালাতের জীবনের একটি অত্যন্ত অযোগ্যতার ঘটনা হিসাবে বিবেচিত ছিল" যাহা তাঁহার জীবনীর প্রধান সংস্করণে "চাপা" রাখা হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্তী সংস্করণে ইহা সংরক্ষণ করা হয়। "হাশিমীদের নিষিদ্ধ অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ ছিল আপোষকামিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া" এবং এই ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল হৃদয়ের ব্যক্তিবর্গের ভূমিকা নিয়োজিত হওয়ায় তাহা সম্ভব হয়।[২০] তিনি আরো বলেন, আপোষকামিতা যাহা তাঁহার প্রজ্ঞা রাষ্ট্রনায়কোচিত ব্যক্তিত্বকে বাতিল করিয়া দেয়, কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ "অন্যান্যদের মত" তাঁহার আবেগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন নাই, যাহা তিনি উর্দ্ধে উঠাইয়া ছিলেন। তাঁহার অধিকাংশ অনুসারী, যাহারা একান্তভাবে আল্-লাত এবং আল্-'উয্যা' সম্পর্কে অবজ্ঞাপূর্ণ কথাবার্তা বলিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইল এবং দেব-দেবীদের ফলপ্রদ ধারণাকে সমর্থন করে। এইরূপ ব্যক্তিত্ব একজন আবিসিনিয়ায় রিফিউজী অথবা সম্ভবত উমর এই ছাড় দেওয়ার বিষয়টি প্রত্যাহার করার দাবি করেন। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ যিনি মক্কার অধিবাসীদের বহু ঈশ্বরবাদের ধারণাকে স্বীকৃতি দেন নাই, "তিনি এক্ষণে এই ঘোষণা দিতে অস্বীকার করেন যে, তিনি বহু ঈশ্বরবাদ গ্রহণ না করিয়া ভুল করিয়া ছিলেন.......... সূরা হইতে আপোষ মূল পংক্তিসমূহ মুছিয়া ফেলা হয় এবং ইহার প্রেক্ষিতে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়"।[২১]

এই গল্প কাহিনীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে"।[২২] এইখান হইতে কেবল মার্গোলিয়থের ধারণাসমূহের ভ্রান্তিসমূহ এবং তাহার তত্ত্বসমূহের অসারত্ব সার্বিকভাবে বর্ণনা করা হইবে। তাহার আলোচনার মূল বিষয়সমূহ এবং উপসংহার সব কিছুই সমানভাবে ভ্রান্ত। তাহার প্রাথমিক ধারণা, যাহার উপর ভিত্তি করিয়া তিনি তাহার তত্ত্ব বিনির্মাণ করিয়াছেন, যেমন তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার অনুসারীদেরকে আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন, পরবর্তী সময়ে তিনি আবিসিনীয় হস্তক্ষেপের সন্দেহপূর্ণ সুবিধা অনুধাবন করেন এবং ফলে তিনি কুরায়শ নেতাদের সঙ্গে আপোষ করিবার চিন্তা-ভাবনা করিতে শুরু করেন। মার্গোলিয়থের এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, যেমন উপরে দেখানো হইয়াছে। আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পিছনে মক্কার অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ঐ দেশের সামরিক সাহায্য চাহিবার কোন অভিপ্রায় ছিল না। এমনও নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম হইতে সব কিছু অনুধাবন করতে অক্ষম ছিলেন, যে অবস্থাকে সন্দেহপূর্ণ সুবিধা বলা হইয়াছে। অনুরূপভাবে তাঁহার জাগতিক অর্থবিত্তের নিঃশেষিত অবস্থার কারণে তিনি আবিসিনিয়ায় তাঁহার অনুসারীদের হিজরত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন অথবা তাঁহার হতাশা ও অসন্তুষ্ট জাতিদের ক্রমাগত উচ্চকণ্ঠের দাবির কারণে তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতের

ব্যাপারে বাধ্য হন, কোন তথ্য বা তত্ত্বাদির কোথায়ও এমন কোন দিক-নির্দেশনা নাই। ইহা কেবল মার্গোলিয়থের নিজস্ব ধারণা এবং ইহা অসঙ্গতিপূর্ণ বক্তব্য যাহা তিনি নিজে কিছু সময় পূর্বে অবরোধের অকার্যকারিতা সম্পর্কে বলেন। সেইখানে তিনি মন্তব্য করেন, হাশিমীগণ খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হন। কিন্তু দুর্মূল্যের মাধ্যমে এবং মক্কাবাসীদের অসতর্ক বদান্যতা ও তাহাদের ইতস্তত মনোভাব তাহাদের অবরোধ মুসলমানদিগকে একঘরে করিবার বিষয়টিকে অকার্যকর ব্যবস্থায় পরিণত করে। তিনি এই সম্পর্কে মুত'ইম ইব্ন আদী ও হিশাম ইব্ন আমর কর্তৃক অবরুদ্ধ হাশিমীদর খাদ্য সরবরাহ করিবার ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।[২৪]

এইসব ঘটনা এবং অন্যান্য আরও অনেক ঘটনা যেমন পবিত্র মাসে বা নিষিদ্ধ (যে সব মাসে রক্তপাত নিষিদ্ধ) মাসে রক্তপাত না করিবার নিয়ম ভঙ্গ করা, এমন দেখানো যে, ইহা কখনও বাস্তবিকভাবে সম্পূর্ণ কার্যকর ছিল না, যেমন একেশ্বরবাদ-এর মত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর উপর আপোষ করিতে বাধ্য করা।

দ্বিতীয়ত, যদি ধরা যায় বা রাসূলুল্লাহ -এর জাতিগণ হতাশাগ্রস্ত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া নিষিদ্ধ বিষয় প্রত্যাহার করিবার জন্য তাহার নিকট জোর দাবি জানাইয়াও থাকে, যেমনটি মার্গোলিয়থ ধারণা করেন এবং যদি হযরত উমরের মত মানুষ পরবর্তীতে ক্রমাগত রাসূলুল্লাহ -এর উপর বিশেষ বিষয় প্রত্যাহার করার জন্য চাপ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, যেমন মার্গোলিয়থ পুনরায় বলেন, এই আপোষের বিষয়টি রাসূলুল্লাহ পূর্বেই তাঁহার সাহাবীগণের সঙ্গে আলোচনা করিয়া থাকিবেন এবং এতদসংক্রান্ত উৎসসমূহে কিছু ইঙ্গিতও পাওয়া যাইত। মার্গোলিয়থের মত একজন মানব চরিত্রের অত্যন্ত চতুর মূল্যায়নকারী ও উচ্চ মানের জ্ঞানী বলেন যে, রাসূলুল্লাহ তাঁহার সাহাবীগণের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে অথবা যে কোনভাবে তাহাদের মতামত পরিমাপ না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত নিতেন না। প্রথমে তিনি মক্কাবাসীদের বহু ঈশ্বরবাদ সমর্থন করিতে অস্বীকার করেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি বহু ঈশ্বরবাদ সমর্থন করিতে অস্বীকার করিয়া যে ভুল করেন নাই সেই ঘোষণা দিতে অস্বীকার করেন। নিজের মত ও নীতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন করার এমন উদাহরণ কেবল মার্গোলিয়থের বক্তব্যেই ব্যবহৃত হয়। হযরত 'উমরের মত নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিত্ব যিনি ইসলামের খ্যাতি বৃদ্ধি করিয়াছেন এবং রাসূলুল্লাহ -এর নেতৃত্বকে অনুসরণ করিয়াছেন, ইহা কখনই নিতিন্তভাবে এইরূপ করেন নাই যে, তাঁহারা কেবল গভীর অনুভূতি ও ভাবাবেগ দ্বারাই তাঁহাদের পরবর্তী জীবন ব্যাপিয়া তাঁহাকে (রাসূলুল্লাহ -কে) অনুসরণ করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, মার্গোলিয়থের পক্ষে ইহা সন্দেহ করা অযৌক্তিক এই জন্য যে, আপোষের উপাখ্যান রাসূলুল্লাহ -এর জীবনীর প্রধান সংস্করণে গোপন করা হইয়াছিল, কারণ ইহা তাঁহার জীবনের অত্যন্ত মর্যাদাহানিকর উপাখ্যান হিসাবে বিবেচিত। পক্ষান্তরে যে সংস্করণে ইহা উল্লিখিত হয়, সেই সংস্করণে হাশিমীদের একঘরে করিবার বিষয় হইতে এই বিষয়টি পৃথকভাবে বর্ণনা করা

হয় এবং পরবর্তী ঘটনা বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড হিসাবে বর্ণিত হয় ইত্যাদি। এখান এই সংস্করণ, যাহার মধ্যে এই বর্ণনা সংরক্ষিত, সেই বর্ণনাকে এবং ঘটনাকে উপেক্ষা করিয়া বলা হয় যে, আপোষ করিবার উপাখ্যান রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য অত্যন্ত মর্যাদা হানিকর বিষয়। ইহার কোন কারণ নাই যে, কেন এই বিষয়টি উল্লেখ করা হয় নাই, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর হতাশাগ্রস্ত লোকদের দ্বারা তাঁহাকে যে চাপ প্রয়োগ করা হয় এবং পরবর্তী কালে 'উমর (রা) -এর মত ব্যক্তিত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তিনি যে ছাড় দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিবার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। ইহাও যৌক্তিক নহে যে, এই সংস্করণটি মিথ্যা কল্পকাহিনীযুক্ত একটি অমর্যাদাপূর্ণ বর্ণনা ছিল যাহাতে বিশেষ কতিপয় ব্যক্তির ভূমিকা ছিল অবরোধ প্রত্যাহার সংক্রান্ত বর্ণনার জন্য। ইহাও স্মরণ করা যাইতে পারে যে, মুত'ইম ইব্ন 'আদী ও হিশাম ইব্ন আমর-এর অনুরূপ ব্যক্তিবর্গ, যাহারা মার্গোলিয়থ কর্তৃক স্বীকৃত ব্যক্তি ছিল, তাহারা বানূ হাশিমকে নিষিদ্ধ বা একঘরে করিবার বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল এবং তাহারা এমন ব্যক্তিত্ব ছিল যে, তাহারা এই বিষয়টি একটি পরিসমাপ্তির দিকে লইয়া যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। অনুরূপভাবে ইহা সুস্পষ্ট যে, প্রথম হইতে তাহারা বানূ হাশিমকে নিষিদ্ধ বা একঘরে করিবার পক্ষে ছিল না এবং সঙ্গত কারণেই তাহারা ইহাকে চ্যালেঞ্জ করিবার ব্যাপারে নেতৃত্ব দান করিয়াছিল।

পরিশেষে মার্গোলিয়থ বলেন যে, আপোষমূলক আয়াতসমূহ সূরা হইতে মুছিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং দুঃখ প্রকাশ করিবার মত একটি বক্তব্য উপস্থাপন করা হইয়াছিল। দুঃখ প্রকাশ এবং বিকল্প যাহা তিনি উল্লেখ করেন[২৫] তাহা প্রকৃতপক্ষে ২২ ঃ ৫২ আয়াতের একটি সুবিধাজনক বর্ণনার সারমর্ম। এই আয়াত যেমন ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে,[২৬] কোন প্রকারেই অভিযোগে উল্লিখিত স্যাটানিক ভার্সেস-এর বাতিল করিবার বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নহে। এই আয়াতের ব্যাপারে যে ব্যাখ্যাই দেওয়া হউক না কেন, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, ইহা আন-নাজ্ম-এ উল্লিখিত হয় নাই যাহার মধ্যে অভিযোগে বর্ণিত স্যাটানিক ভার্সেস ধারণাগতভাবে প্রক্ষেপ (অন্যায়ভাবে সন্নিবেশ) করা হয় এবং ইহা (২২ ঃ ৫২) অনেক পরে ওহী হিসাবে অবতীর্ণ হয় যুক্তি অগ্রাহ্য করার জন্য যে, ইহা "স্যাটানিক ভার্সেস"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

দুই ঃ আবিসিনিয়ায় হিজরত সম্পর্কে ওয়াট-এর তত্ত্ব

আবিসিনিয়ায় হিজরত সম্পর্কে ওয়াট-এর ধারণাসমূহের উপাদান দুই ধরনের তত্ত্বে বিভক্ত। যেমন দুইটি হিজরত সম্পর্কে তাহার তত্ত্ব অথবা হিজরতকারীদের দুইটি তালিকা এবং হিজরতের পিছনে কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কিত তাহার ধারণা। প্রথম ধারণা সম্পর্কে ওয়াট বলেন, আবিসিনিয়ায় দুই হিজরত হওয়ার বিষয়টি কায়তানী (Caetani) যে অস্বীকার করিয়াছেন তাহা তিনি গ্রহণ করেন এবং অবিকল উদ্ধৃত করেন। ওয়াট বলেন, মূল কারণ এই যে, ইব্ন ইসহাক "প্রকৃতপক্ষে দুইটি হিজরত হইয়াছিল" বলিয়া উল্লেখ করেন নাই বরং বলেন যে, যাহারা হিজরত করিয়াছিলেন তাহারা ছিলেন অমুক অমুক (১০ জন প্রাপ্তবয়স্ক এবং দুইজন অপ্রাপ্ত বয়স্ক নামসহ

উল্লেখ করেন)। ইহার পর তিনি বলিয়াছেন, "জা'ফার ইব্ন আবী তালিব হিজরত করিয়াছেন এবং একের পর এক মুসলমানগণ তাহার অনুসরণ করিয়াছেন"। চূড়ান্তভাবে তিনি ৮৩ জন পুরুষের একটি তালিকা প্রদান করেন, প্রথম তালিকায় যাহারা ছিলেন তাহারা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।[২৭]

ওয়াট পরে আবার বলেন, "প্রথম তালিকায় সেই সকল লোকের উল্লেখ নাই যাহারা ফেরত আসিয়া পুনরায় দ্বিতীয় বার প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন"। এমনকি প্রথম হইতে পর্যায়ক্রমে কাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন সেই তালিকাও নাই, কিন্তু "ধারণাগতভাবে" খিলাফতের সরকারী তালিকায় "অগ্রবর্তী ক্রম অনুযায়ী তালিকাভুক্ত আছে"। এই ক্ষেত্রে ওয়াট বলেন, "সেইখানে বড় দুইটি দল ছিল না, বরং কতিপয় ক্ষুদ্র দল ছিল"। হিজরতকারীদের একটি মাত্র স্রোতধারা ছিল। ইব্ন ইসহাক যে দুইটি তালিকা দিয়াছেন ইহার ব্যাখ্যা প্রদানে তিনি বলেন, তাঁহার কালের লোকজনের মধ্যে তাহাদের দুইটি তালিকা বিদ্যমান ছিল যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দুইটি তালিকার প্রকৃত সম্পর্কের ব্যাপারে অনিশ্চিত ছিলেন"।[২৮]

ওয়াট এতদ্‌সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মানুষের ইসলামের প্রতি আনুগত্যের তারিখ অনুযায়ী এবং ইহার ফলে তাহার তৎপরতার ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে সরকার প্রদত্ত বার্ষিক আর্থিক অনুদানের পদ্ধতি কি ছিল, তাহাও বর্ণনা করেন। ওয়াট মনে করেন, সম্ভবত কোন কোন সময় মুহাজিরগণ ছিলেন সর্বোচ্চ শ্রেণীর লোক। পরবর্তী কালে 'উমার (রা) ১৫ হিজরী সালে এই তালিকা পুনর্বিন্যস্ত করেন। তিনি ঐ তালিকায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পরিবারকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং যাহারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদিগকেও ঐ তালিকায় অগ্রাধিকার দান করেন। খায়বার যুদ্ধের সময়ে (৭ম হিজরীতে) যাহারা আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করেন, তাহাদিগকে বদরের যোদ্ধাদের দুই স্তর নিচে নামাইয়া দেন। ওয়াট পুনরায় ঐ সময়ে দুইটি হিজরতের দাবি সম্পর্কে ইঙ্গিত করিয়া বলেন, একটি ছিল আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি ছিল মদীনায়। তিনি ধারণা দেন যে, দুইটি তালিকা ইব্ন ইসহাক কর্তৃক প্রদত্ত এবং সরকার কর্তৃক বার্ষিক আর্থিক সাহায্য বণ্টনে অগ্রাধিকার নির্ধারণে মতপার্থক্য নির্দেশ করে।[২৯]

এখন এই সম্পর্কিত বার্ষিক আর্থিক সাহায্য বণ্টনের প্রশ্নে এবং নির্দিষ্ট সহযাত্রীদের বর্ণনাও দাবি করে যে, তাঁহারা দুইটি হিজরত করিয়াছিলেন, যেমন একটি আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি মদীনায় এবং তাঁহারা ৭ম হিজরীতে আবিসিনিয়া হইতে ফেরত আসা হিজরতকারীদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মন্তব্য স্মরণ করেন যে, তাঁহাদেরও দুইটি হিজরত হইয়াছিল। একটি আবিসিনিয়ায় এবং অপরটি আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মদীনায়। এই সকল বর্ণনা কোনরূপেই দুইটি তালিকার কথা ব্যাখ্যা করে না অথবা আবিসিনিয়ায় দুইটি হিজরত করার প্রশ্নের উদ্রেক করে না। উদাহরণস্বরূপ কোন সাহাবী এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং আবিসিনিয়ার দুইটি হিজরতের কোন অতিরিক্ত ফযীলত দাবি করেন নাই। দুইটি হিজরতের কথা বলা হইয়াছে বটে,

তবে তাহার একটি আবিসিনিয়ার এবং অপরটি মদীনায়, একই স্থানে দুইটি হিজরতের কথা কখনও বলা হয় নাই। বার্ষিক আর্থিক অনুদান সম্পর্কে সম্পূর্ণ যুক্তিতর্ক দুইটি তালিকার কথা ব্যাখ্যা করার কথা বলে না এবং আবিসিনিয়ায় দুইটি হিজরতের ঘটনাও বর্ণনা করে না । পরবর্তী কালের ধারণা (অর্থাৎ আবিসিনিয়ায় দুইটি হিজরতের ধারণা) ওয়াট কর্তৃক বর্ণিত নজীরের উপর ভিত্তি করিয়া নহে বরং ঐ ঘটনার উপর নির্ভর করিয়া যে, তাহাদের সকলের প্রত্যাবর্তন অথবা হিজরতকারী প্রথম দল কয়েক মাস আবিসিনিয়ায় অবস্থান করার পর মক্কায় প্রত্যাবর্তনের প্রথম ঘটনা এবং তাঁহাদের পুনরায় ঐ দেশে অন্যদের অনুসরণ করিয়া এক বিশেষ সময়কাল শেষে গমন করার ফলে তাঁহাদের সংখ্যা এক সময়ে প্রায় এক শ'তে পৌঁছায়। ওয়াট হিজরতকারীদের প্রথম দলের প্রত্যাবর্তনের ঘটনা অস্বীকার করেন এবং অনুরূপ সুষ্ঠুভাবে একটি ভুলের ভিত্তিতে তিনি জোর দিয়া বলেন, "প্রথম দল প্রত্যাবর্তন করার পর দ্বিতীয় বার পুনরায় হিজরত করার কোন উল্লেখ নাই" ; অবশ্য ইব্ন ইসহাক ইহা বলেন নাই যে, হিজরতকারীদের প্রথম দল প্রত্যাবর্তন করার পর দ্বিতীয় বার আবার ফিরিয়া যান"। কিন্তু তিনি জোর দিয়া অল্প সময় পরে প্রত্যাবর্তনের কথা উল্লেখ করেন। ইহা তাঁহার বর্ণনায় এবং অন্যান্য উৎস হইতে পরিষ্কার যে, আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের অনেকেই প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় আবিসিনিয়ায় ফিরিয়া যান এবং অন্যান্য হিজরতকারীরাও তাহাদের অনুসরণ করেন। হিজরতকারীদের প্রথম দলের প্রত্যাবর্তন এবং আবিসিনিয়ায় তাহাদের পুনরায় হিজরত করার এই ঘটনাকে সেইখানে দুইবার হিজরত সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন সাহাবী অথবা তিনি নিজেও আবিসিনিয়ায় দুইবার হিজরতের জন্য অতিরিক্ত কোন ফযীলত বর্ণনা করেন নাই।

পরিশেষে বলা যায়, আবিসিনিয়ায় হিজরতের উদ্দেশ্য ও কারণ সম্পর্কে ওয়াট-এর তত্ত্ব অসমর্থনীয়। এতদ্সম্পর্কে তিনি এই ধারণা বাতিল করিয়া দেন যে , কঠোরতা এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নির্যাতন ছিল হিজরতের কারণ। তদুপরি তিনি বর্ণনা করেন, "ইহা ধারণা করা যায় যে, ইসলামের এইসব প্রাথমিক সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী প্রধানত ভোগান্তির ভয়-ভীতি তাড়িত"।[৩০] তিনি তাহার এই পক্ষপাতমূলক ধারণায় হিলফুল ফুযূল দল এবং বানূ মাখযূম ও বানূ আবদুদ-দার-এর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা আনয়ন করেন এবং আবিসিনিয়ায় হিজরতকেও এই ছাঁচে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন তাহাদের দুই জন ব্যতিক্রম ছাড়া সকলেই ছিলেন দ্বিতীয় দলভুক্ত। এই ভিত্তিতে তিনি বলেন, গোত্রীয় হিলফুল-ফুযূল দেখে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "প্রাথমিকভাবে মক্কাবাসী কর্তৃক ব্যবসায়ীদিগকে উচ্চ হারে রাজস্ব ধার্য করা যাহা তাহারা নিজেরা অপছন্দ করিত" এই বিষয়টির বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন, এইজন্য তাহারা মুসলমানদিগকে নির্যাতন করিতে উদ্যোগী ছিল না। ওয়াট-এর মতে, "তাহাদের উপর গোত্রীয়ভাবে, এমনকি পারিবারিকভাবে চাপ প্রয়োগ করা সম্বলিত বিষয় ছিল", যেমন মাখযূম ও আবদ্ শাম্স গোত্রের ছিল এবং এই কারণে গোত্রের অপর শাখার (হাশিমী) ইসলাম গ্রহণ করার পর আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন।[৩১]

মুসলমানদের উপর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে ওয়াট-এর মূল্যায়নের ভ্রান্তি সম্পর্কে ইতোপূর্বে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে ।[৩২] এইখানে কেবল এইটুকু বলা যায় যে, এইরূপ বিবরণ এমন ধারণার সমর্থনের ফল যে, এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নির্যাতন ছিল হিজরতের মূল ভিত্তিগত কারণ, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নির্যাতনের ধরন যাহাই হউক না কেন এবং যাহার দ্বারাই এই আঘাত হানা হউক অথবা যাহার উপরই ইহার প্রজ্জ্বলিত আগুন পড়ুক না কেন। ইহা ইতোপূর্বে[৩৩] দেখানো হইয়াছে যে, কুরায়শ গোত্রের দুইটি শাখার মধ্যে অব্যাহত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কিত তাহার তত্ত্ব ইসলামের ইন্দ্রিয়গাহ্য এই বিশ্লেষণ সঠিকও নহে এবং সমর্থনীয়ও নহে । ইহা এমন একটি ঘটনাও নহে যে, হিলফুল ফুযূল গ্রুপ তাহাদের নিজস্ব গোত্রের মুসলমানদের ক্ষেত্রে নমনীয়তা গ্রহণ করে।

ওয়াট অবশ্য তাহার তত্ত্বের স্বপক্ষে আরও যুক্তি উপস্থাপন করেন। এইরূপে এই যুক্তি বাতিল করিয়া এবং অত্যন্ত সঠিকভাবে "পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ" তত্ত্ব উপস্থাপন করিয়া বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার অনুসারীদিগকে "ধর্মত্যাগের বিপদ হইতে দূরে রাখার" জন্য আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করেন অথবা তাহারা সেইখানে ব্যবসায় ব্যাপৃত হয় অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদিগকে আবিসিনীয়দের সামরিক সাহায্য পাওয়ার আশায় প্রেরণ করেন। ওয়াট ধারণা দান করেন যে, হিজরতের অত্যন্ত জোরালো কারণ ছিল "মুসলিম সম্প্রদায়ের অবিকাশিত মতামতের বিভাজনের দ্রুত বৃদ্ধি"।[৩৪] মতামতের এই বিভাজনের প্রমাণস্বরূপ ওয়াট বর্ণনা করেন যে, উছমান ইব্ন মায'উন, যাঁহাকে ইব্ন হিশাম আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নেতা হিসাবে উল্লেখ করেন এবং যিনি মূলত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট চারজন বন্ধুসহ আসিয়াছিলেন, তিনি "প্রায় নিশ্চিতভাবে" একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন এবং আবূ বক্র (রা)-এর নেতৃত্বে "একটি প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের সঙ্গে তাঁহার বৈরিতা ছিল।" উদাহরণস্বরূপ পরবর্তী সময়ে 'উমার (রা) মন্তব্য করেন যে, তিনি উছমান (রা) সম্পর্কে বলেন যে, তিনি বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন এবং ওয়াট-এর মতে, ইহা ছিল "উছমান ইব্ন মাযউন এবং আবূ বাক্র ও 'উমার (রা)-এর গ্রুপের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘটনা"।[৩৫]

প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের মধ্যে মতপার্থক্যের আরও কতিপয় ইঙ্গিত প্রদান করিয়া ওয়াট 'আব্দ শামস গোত্রের খালিদ ইব্ন সা'ঈদ-এর উদাহরণ তুলিয়া ধরেন, যিনি সর্বপ্রথম আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কিন্তু তিনি খায়বার যুদ্ধের সময় পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করেন নাই এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পরে আবূ বাক্র-এর সঙ্গে কিছুটা বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন।[৩৬] আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করা হয় যে, "আল-হাজ্জাজ ইবনুল হারিছ ইব্ন কায়স্"-এর বিষয় ওয়াট যাহাকে আল-হারিছ ইব্ন আল-হারিছ ইব্ন কায়স বলিয়া ধারণা করেন এবং বলেন যে, তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে বদর প্রান্তরে যুদ্ধরত অবস্থায় বন্দী হইয়াছিলেন। অথচ তিনি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের একজন ছিলেন।

ওয়াট বলেন, "যদি আবিসিনিয়ায় হিজরতকারী এই ধরনের মনোভাব পোষণ করেন, তাহা হইলে অন্যান্য হিজরতকারিগণ এরূপ করিবেন না কেন?"[৩৭]

পরিশেষে ওয়াট উল্লেখ করেন যে, নু'আয়ম ইব্ন আবদুল্লাহ্ আন্-নাহ্হাম ছিলেন প্রাথমিক যুগের একজন বিখ্যাত মুসলিম, কিন্তু "একটি ঠাণ্ডা লড়াই তাহার মধ্যে এবং মুসলমানদের মূল দলের মধ্যে শুরু হয় যাহা ছিল প্রধানত আবূ বকর (রা)-এর দল"। ফলে নু'আয়ম হিজরী ৬ সালের পূর্বে মদীনায় যান নাই।[৩৮] ওয়াট বলেন যে, যাহারা আবিসিনিয়ায় গিয়াছিলেন তাহারা ছিলেন " প্রকৃত ধর্মীয় প্রত্যয়দীপ্ত মানুষ" এবং এই ধরনের মানুষ "আবূ বকর-এর নীতি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন" যাহা "সম্ভবত একটি গোয়ার্তুমিপূর্ণ বিষয়" যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ "অবশ্যই একজন রাজনৈতিক, এমনকি একজন ধর্মীয় নেতা হিসাবে গ্রহণযোগ্য হন তাঁহার ঘোষিত ও দাবিকৃত সংবাদ (ওহী)-এর সামাজিক-রাজনৈতিক প্রায়োগিকতার কারণে"। ফলে এই সম্ভাব্য প্রায়োগিকতায় আবূ বকর (রা) নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন এবং ঐ সময় হইতে যাহারা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন তাহাদের প্রায় সকলেই হিলফুল ফুযূলের গোত্রবহির্ভূত। "তাহারা আদি হিলফুল ফুযূলের ধারণাসম্পন্ন হওয়ায় হাশিমী বংশীয় কোন নেতাকে অনুসরণ করিতে তাহারা প্রস্তুত ছিল না"।[৩৯]

ওয়াট আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ হিজরতের ব্যাপারে যে উদ্যোগ গ্রহণ করেন "তাহা ছিল একটি গোপন প্রচেষ্টা। যাহারা মক্কায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল তিনি তাহাদের নিকট হিজরতের এই উদ্দেশ্য গোপন রাখেন"। তাহা ছাড়া ইহা "ছিল" রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর "চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ এই মতে যে, তিনি অবশ্যই ধর্মগত অনৈক্য ও বিভেদ আরম্ভ হইতে যাইতেছে এমন পরিস্থিতি সম্পর্কে দ্রুত সজাগ হন এবং এই অবস্থা হইতে পরিত্রাণের জন্য তাঁহার অনুসারীদিগকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দান করার মত পদক্ষেপ গ্রহণ করেন..." ।[৪০]

এইভাবে ওয়াট তাহার পছন্দমত চিন্তাধারার মাধ্যমে কুরায়শদের দুইটি শাখার মধ্যে শত্রুতা আবিষ্কার করিয়া আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন অথবা তিনি তাহার পূর্বের ধ্যান-ধারণার মধ্যে পরবর্তী ঘটনা প্রয়োগ করিয়া নিজের সুবিধামত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেন। তাহার মূল্যায়ন সুষ্ঠুরূপে তাহার সহজাত স্ববিরোধিতাপূর্ণ এবং একদিকে ইহা দ্বিমুখী নীতিসম্পন্ন (doube standard) এবং অপরদিকে প্রকৃত ঘটনার অপব্যাখ্যা মাত্র।

প্রথম লক্ষণীয় যে, তিনি একদিকে বলেন এবং সঠিকভাবেই বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর 'ওহীর' (message) সামাজিক-রাজনৈতিক প্রযোজ্যতা ছিল এবং তৎকালীন মক্কার (অথবা বরং বিশ্ব) পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ধর্মীয় অবস্থা হইতে পৃথক করা সম্ভব ছিল না এবং তিনি এই ঘটনাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধী পক্ষ কুরায়শ নেতাদের জন্য মূল কারণ হিসাবে

বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু হিলফুল ফুযূল গ্রুপের গোত্র বহির্ভূত যুবকদের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করার বেলায় অথবা যাহাদিগকে তিনি "উত্তম পরিবারসমূহের কনিষ্ঠ সন্তান" বলিয়া অভিহিত করেন, এমনকি তাহাদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের কথা বর্ণনায় তিনি (ওয়াট) "ধর্ম" এবং "রাজনীতির" মধ্যে আধুনিক ধ্যান-ধারণার বিভাজিত নীতি প্রয়োগ করেন (অথবা বরং চার্চ ও রাষ্ট্রে) এবং ঐ যুবকদের ক্ষেত্রে ও এই নীতি প্রয়োগ করেন এই ধারণায় যে, তাহাদের কর্মকাণ্ড ঐ বৈশিষ্ট্যের সচেতনতার দ্বারা পরিচালিত ছিল। এইভাবে ইতোপূর্বে তিনি তাহাদের ধর্মান্তরের কথা বলেন। ওয়াট বর্ণনা করেন, যখন তাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তাহাদের সম্ভবত কোন স্পষ্ট সচেতনতা ছিল না। তাহারা যাহা করিতেছিলেন তাহার মধ্যে এই সচেতনতা ছিল না যে, তাহার মধ্যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয় সংশ্লিষ্ট আছে এবং "ওহীর' (message) ধর্মীয় উদ্দেশ্য তাহাদের আত্মিক বৈশিষ্ট্যকে দৃঢ় করিয়া তোলে।[৪১]

এখন তাঁহাদের আবিসিনিয়ায় হিজরতের বিষয় ব্যাখ্যা করিতে গিয়া ওয়াট বলেন, তাঁহারা ওহীর (message) রাজনৈতিক প্রয়োগের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন এবং একই সময়ে তাহারা হাশিমীদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। কারণ তাহারা নিজদিগকে তখন একটি বিদেশ ভূমিতে নিয়া গিয়াছিলেন। এই উভয় ক্ষেত্রেই ওয়াট তাহাদিগকে "ধর্ম" ও "রাজনীতি"-র মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করিয়া দেন। এইরূপে ওয়াট একদিকে কুরায়শ নেতাদের মনোভাব একভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং অন্যদিকে তাহাদের যুবকদের মনোভাব অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি তাহার সুবিধামত ঘটনা এড়াইয়া যান যে, এই ধরনের পার্থক্য ঐ সময়ে আর বিদ্যমান ছিল না এবং "উত্তম পরিবারের" সন্তানেরা ওহীর (mesage) সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োগ অনুধাবন করিতে ব্যর্থ হয় নাই, পক্ষান্তরে তাহাদের পিতাগণ ব্যর্থ হয় এবং এমনকি আবূ বক্র (রা) তাহাদেরকে সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃতি ও সমর্থন দান করেন (ওহীর সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োগ)। ওয়াট অবশ্য তাহার প্রস্তাবনায় সহজাত স্ববিরোধিতাকে এড়াইয়া যান। যদি ওহীর (message) সামাজিক-রাজনৈতিক প্রায়োগিকতা থাকিত যাহা কার্যত ছিল, ঐ সব উত্তম পরিবারের জ্ঞানী যুবকগণ ইহার (ওহীর) সামাজিক-রাজনৈতিক প্রায়োগিকতাকে অন্ধভাবে গ্রহণ করিত না অথবা ইহা হইতে তাহাদেরকে পৃথক করিত না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইসলামকে সার্বিক ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নেতৃত্বসহ ইহার সকল প্রায়োগিক বিষয়কে ভালভাবে জানিয়া শুনিয়া। ওয়াট তাঁহাদিগকে অন্ধ মূর্খ বানাইয়া দেন তাঁহাদিগকে অসেচতন বলিয়া অথবা তাঁহাদের ইসলাম গ্রহণের সময় ইসলামের সামাজিক রাজনৈতিক প্রায়োগিকতা সম্পর্কে অসংশ্লিষ্টতার বিষয় উল্লেখ করেন এবং যখন তিনি বলেন যে, ঐ সব প্রায়োগিকতায় তাঁহারা সবশেষে সচেতন হইয়া একঘরে হওয়ার পরিবর্তে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বাছিয়া লন।

যাহাকে তাহারা 'ওহী' (message)-এর "ধর্মীয়" উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিতেন যদি তাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ রাজনৈতিক নেতৃত্ব গভীরভাবে ও শক্তভাবে অপছন্দনীয় হইত তাহা হইলে তাহারা তাহাদের নিজেদের দেশে ও সমাজে থাকাকেই শ্রেয় মনে করিতেন (হিজরত করিতেন না)। তাহারা বরং প্রত্যেকটির অর্ধেক করিয়া গ্রহণ করার পরিবর্তে সম্পূর্ণরূপে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এবং ইসলামকে পরিত্যাগ করিতেন।

ওয়াট-এর তত্ত্ব যে সুবিদিত ঘটনার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ সেই সম্পর্কে ওয়াট সম্যক সচেতন রহিয়াছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার অনুসারিগণকে আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দান করেন। এই সময় হইতে ওয়াট এই অসঙ্গতিটিকে এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন যে, যে রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই রিওয়ায়াতে (বর্ণনায়) "সম্ভবত একটি প্রচেষ্টা ছিল, যাহারা তাহাকে মক্কায় একঘরে করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের নিকট হিজরতের উদ্দেশ্য গোপন করা"।

কে এই উদ্দেশ্যকে গোপন করার এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিল এবং কেন করিয়াছিল তাহা ওয়াট কর্তৃক বিশ্লেষিত হয় নাই। কিন্তু তিনি দ্রুত তাহার অবস্থান পরিবর্তন করেন এবং বলেন, "এইভাবে এই তথ্য ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজন নাই"। যেমন তাহার মতে ইহা ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে, তিনি দ্রুত ধর্মগত বিষয়ে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হইতেছে এমন বিষয়ে সচেতন হইয়া যান এবং আবিসিনিয়ায় ভ্রমণের (হিজরতের) পরামর্শ দান করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

অনুরূপভাবে ওয়াট আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, উত্তম পরিবারসমূহের যুবকগণ মক্কায় রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পরিত্যাগ করে। কারণ তাহারা তাঁহার রাজনৈতিক নেতৃত্বকে পছন্দ করিত না। তখনই রাসূলুল্লাহ ﷺ "ধর্মগত বিষয়ে অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হইতে পারে" এমন আশংকা দূর করার জন্য দ্রুত আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দান করেন।

এখানে যদি তথাকথিত ধর্মীয় বিভেদই কেবল সৃষ্টি হইত তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়িত না এবং কার্যকরভাবে তাহার অনুসারীদের এক বিরাট অংশকে ইসলামের উন্নতির কারণে বহিষ্কার করিয়া দিতে হইত না। তিনি অতি সহজেই তাঁহার প্রাপ্ত ওহীর (message) রাজনৈতিক প্রায়োগিকতার একটি নমনীয় পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ধর্মীয় বিভেদ সৃষ্টির বিষয়টিতে চিড় ধরাইয়া সংকট পরিহার করিতে পারিতেন। যদি, অপরদিকে ধর্মীয় অনৈক্য ও বিভেদ যেকোন ভূখণ্ডে দেখা দেয় তাহা হইলে কেন "রাজনৈতিক" আইন অমান্যকারীরা নির্বাসনের আদেশ দেয়, তখন ইহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ অথবা আপত্তির কণ্ঠ উত্থাপিত হয় না কেন? কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিজের কন্যা ও জামাতা (রুকায়্যা ও 'উছমান ইব্ন আফ্ফান) ও চাচাত ভাই জা'ফার ইব্ন আবী তালিব (রা)

আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন? সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, কেন আবূ বকর (রা) স্বয়ং ঐ দেশে অর্থাৎ আবিসিনিয়ায় হিজরত করিতে রওয়ানা করেন এবং বেশ কিছু দূরত্বের পথ অতিক্রম করেন, যখন তিনি ইবনুদ্ দাগিনা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইবনুদ দাগিনা তাঁহাকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দান করেন? ওয়াট ইবনুদ্ দাগিনা কর্তৃক আবূ বকর (রা)-কে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানের ঘটনা উল্লেখ করেন।[৪২] কিন্তু তিনি অন্যান্য বিষয় এবং উক্ত কাহিনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ পাশ কাটাইয়া যান।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াট-এর মূল ধারণা এই যে, এই ঘটনার প্রাথমিক পর্যায়ে যখন ইসলামের ভাগ্য অনিশ্চিত ছিল তখন আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য তাকীদ দিতে থাকেন এই আশায় যে, তিনি নিজে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে নেতৃত্বের দ্বিতীয় স্থানে আসীন হইবেন যাহা সম্পূর্ণরূপে অগ্রহণযোগ্য। উৎস গ্রন্থসমূহে এই ধরনের কোন ইঙ্গিত নাই যে, তিনি (আবূ বকর) এমন প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। এমনও নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে তাঁহার (রাসূলের) রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণ করাইয়া পরে তাঁহাকে এই পদে নিয়োজিত করেন। এইরূপ হীন উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষভাবে আবূ বকর (রা)-এর প্রতি এবং অপ্রত্যক্ষভাবে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর প্রতি আরোপিত হওয়া সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক। ওয়াট পরবর্তী কালে সাধারণভাবে আবূ বকর ও 'উমার (রা)-এর মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করেন।

স্বয়ং ওয়াট কর্তৃক বর্ণিত তথ্য সার্বিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ, এমনকি তৎকর্তৃক বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাবলীও অসঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আবিসিনিয়ায় হিজরত সংঘটিত হয় অন্ততপক্ষে কয়েক বৎসর সময়কাল ব্যাপিয়া। এই হিজরতে কতিপয় "ছোট ছোট দলে" বিভক্ত হইয়া মুসলমানগণ সেই স্থানে গমন করেন।

ওয়াট-এর তথ্যসমূহের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অন্যান্য আপত্তিসমূহ বর্ণিত হয় ডাব্লিউ আরাফাত কর্তৃক।[৪৩] তিনি অত্যন্ত সঠিকভাবে উল্লেখ করেন যে, ওয়াট অবিবেচনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে 'উছমান ইব্‌ন মায'উন-এর ব্যক্তিত্বকে স্ফীত করিয়াছেন। ইহা ইব্‌ন হিশামের বক্তব্য, ইবন ইসহাকের নহে যে, 'উছমান ইব্‌ন মায'উন (রা) আবিসিনিয়ায় হিজরতকারীদের নেতা ছিলেন। "এমন কোন দৃষ্টান্তের ইঙ্গিত নাই যেখানে তিনি তাঁহার নেতৃত্ব অথবা বিরোধিতার চেষ্টা করিয়াছেন"। ওয়াট যে অনুমান করেন, 'উছমান ইব্‌ন মাযউন সম্পর্কে 'উমরের যে মন্তব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহা ছিল "পূর্বের শত্রুতার রেশ যাহা উছমান ইব্‌ন মাযউন-এর দলের মধ্যে এবং আবু বক্‌র ও উমরের দলের মধ্যে বিদ্যমান ছিল" তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সর্বসম্মত মতানুসারে 'উমার (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন উছমাম ইব্‌ন মায'উনসহ আবিসিনিয়ায় প্রথম দলের হিজরতের পর। তাই উছমান ইব্‌ন মাযউন সম্পর্কে উমর (রা)-এর কথিত মন্তব্য যাহাই বর্ণিত হউক না কেন, ইহা কিছুতেই তাঁহার সঙ্গে আবূ বকর ও 'উমরের দলের সঙ্গে পূর্ব-শত্রুতার জের নহে। যদি এই বিষয়টি মানিয়াও লওয়া হয় তবুও দেখা যায় যে, আবূ বক্‌র উমর (রা)-এর যে দলের কথা বলা

হইয়াছে, উমর (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাহার অস্তিত্বই ছিল না। অধিকন্তু ইব্ন সা'দ কর্তৃক বর্ণিত উছমান ইব্ন মায'উন সম্পর্কে উমার (রা)-এর মন্তব্য দেখায় যে, উমার প্রকৃতপক্ষে উছমান ইব্ন মাযউনের সঙ্গে খুব কমই সম্পৃক্ত ছিলেন, যখন উছমান তাহার বিছানায় মৃত্যুবরণ করেন (২য় হিজরী), তিনি উমরের মূল্যায়ন অনুযায়ী চরম অধঃপতনের দিকে ধাবিত হইতেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-ও একইভাবে ইন্তিকাল করেন, তখন উমারের দৃষ্টিতে উছমানের মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে এই ঘটনা ওয়াট কর্তৃক বর্ণিত বিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা প্রকাশ করে।[৪৪]

অনুরূপভাবে খালিদ ইব্ন সাঈদ ('আব্দ শাম্স গোত্রীয়)-এর সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনায় বর্ণিত যুক্তিও অস্বাভাবিক যিনি (খালিদ ইব্ন সাঈদ) খায়বার যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই এবং যাঁহার সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ইন্তিকালের পর "আবূ বক্র (রা)-এর প্রতি শত্রুতা " প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রকৃত ঘটনা এই যে, খায়বার যুদ্ধের পর খালিদ (রা)-এর আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তন করা আবূ বক্র (রা)-এর সঙ্গে তাহার শত্রুতার স্বপক্ষে কোন যুক্তি হইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আপন চাচাতো ভাই জা'ফার ইব্ন আবী তালিব, যিনি আবিসিনিয়া হিজরতকারীদের নেতা এবং তাহাদের মুখপাত্র ছিলেন। তিনিও আবিসিনিয়া হইতে সকলের শেষে প্রত্যাবর্তনকারীদের একজন ছিলেন। পক্ষান্তরে উছমান ইব্ন মায'উন, যিনি নিজে অর্থাৎ যাহাকে ওয়াট আবূ বক্র (রা)-এর বিরোধী দলের নেতা বানাইয়াছেন, তিনি কিছুকাল পরেই প্রত্যাবর্তন করেন এবং যাহারা মদীনায় হিজরত করেন তিনিও (উছমান ইব্ন মায'উন) তাঁহাদের একজন ছিলেন এবং তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ওয়াট অবশ্য এই অসঙ্গতি এই বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করেন যে, তাহাদের মধ্যে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মধ্যে কখনও পরিপূর্ণ বিরোধ বা বিচ্ছিন্নতা ছিল না বরং তাহাদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে মিলন ও সমন্বয় ছিল।[৪৫]

যে কেহ ইহা বলিতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে যদি "সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা"না থাকে এবং "ধর্মীয় অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টি হয় এমন অবস্থা যদি তুলনামূলকভাবে দ্রুত সমন্বয় হইত" তাহা হইলে কেন খালিদ ইব্ন সাঈদের খায়বার যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আবিসিনিয়ায় অবস্থানের ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নীতির সঙ্গে তাহার ও অন্যান্যদের মতবিরোধের প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা হইল। ঘটনা এই যে, ধর্মীয় অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টির ঘটনা এবং দ্রুত সমন্বয় সাধনের ঘটনা এই উভয়টিই ওয়াট-এর কাল্পনিক বর্ণনা। মার্গোলিয়থের মত, যিনি কল্পনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ (মক্কার উপর) আবিসিনিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, পরে বুঝিতে পারেন যে, আবিসিনীয়রা কেবল তাহাদের জন্যই যুদ্ধ করিবে এবং জয় করিবে, অথচ মার্গোলিয়থ তাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর আরোপ করেন। ওয়াটও এমন একটি ধারণা তৈরী করেন এবং তাহা

প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ধারণার সঙ্গে বিরোধপূর্ণ দেখিতে পান, অতঃপর উহার দায় রাসূলুল্লাহ ﷺ অথবা তাঁহার সাহাবীদের উপর চাপাইয়া দেন।

ওয়াট-এর আল-হাজ্জাজ ইব্‌নুল হারিছ ইব্‌ন কায়সকে আল-হারিছ ইবনুল হারিছ ইব্‌ন কায়স-এর সঙ্গে একীভূত করা সম্পর্ক ডাব্লিউ আরাফাত সঠিকভাবে বলেন, "ইহা একটি তালগোল পাকানো বিষয়"। যদি বিভিন্ন বিজ্ঞজনের বর্ণনা অধিক গুরুত্ব বহন করে তাহা হইলে ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনা ও প্রমাণ নিশ্চিতভাবে অধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং এই বিষয়ে তাঁহার কোন সন্দেহ নাই যে, তাহারা উভয়ে ভিন্ন দুই ব্যক্তি"।[৪৬]

অনুরূপভাবে নু'আয়ম ইব্‌ন আবদুল্লাহ আন-নাহ্‌হাম-এর যে উদাহারণ ওয়াট প্রদান করেন এবং তাঁহাকে আবূ বক্‌র (রা)-এর দলের বিরোধী বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া বর্ণনা করেন তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গতিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ ওয়াট নিজেই স্বীকার করেন, নু'আয়ম আদৌ আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন নাই, এমনকি তাঁহার ষষ্ঠ হিজরীতে মদীনায় হিজরতের ঘটনাও সঠিক নহে। আবূ বকর (রা) –কে তাঁহার অপছন্দ করা অথবা আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে তাঁহার কোন দলের অস্তিত্ব থাকারও কোন প্রমাণ নাই। অধিকন্তু ইব্‌ন সা'দ বর্ণনা করেন, নু'আয়ম তাঁহার নিজের অভাবী গোত্রের জেদাজেদির সময় মক্কায় অবস্থান করেন যাহারা তাঁহাকে তাঁহার বিশ্বাসের স্বাধীনতার অনুমতি দিয়াছিল।" ইহা সম্ভব যে, তিনি ইহা অনুভব করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি হিজরত করেন তবে ইহা হইবে তাহার গোত্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা"।[৪৭]

এইভাবে ওয়াট-এর অন্যান্য অনেক তত্ত্বের মত এই তত্ত্বটিও খুবই অসমর্থনীয় এবং মুইর, মার্গোলিয়থ ও অন্যদের প্রাচীন ধারণার আবর্তে আবর্তিত। যেমন এই ধারণায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক পূর্ব হইতেই রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রত্যাশী ছিলেন এবং ওয়াট ধারণা করেন যে, তাঁহার (রাসূলুল্লাহ-এর) উত্থান এবং অন্যান্য ঘটনাবলী কুরায়শদের দুইটি দলের মধ্যে যুগ যুগ ধরিয়া চলমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল। ওয়াট তাঁহার এইসব কিছু বাস্তবে প্রমাণ করার জন্য প্রস্তাবনা ও অনুমানপ্রসূত কল্পনার মধ্যে কেবল পরস্পর বিরোধী ধারণা উপস্থাপন করিয়াছেন।

অনুবাদ ঃ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তথ্যনির্দেশিকা

১. মার্গোলিয়থ, op. cit.,156; আরও দ্র. মূইর, op. cit., ৩য় সংস্করণ, পৃ. ৩৪-৩৫।

২. মুইর, op, cit, ৯১।

৩. মার্গোলিয়থ, op. cit., ১৫৭।

৪. প্রাগুক্ত, ১৬৬।

৫. প্রাগুক্ত, ১৫৭।

৬. প্রাগুক্ত, ১১৯।

৭. প্রাগুক্ত, ১৭০।

৮. প্রাগুক্ত, ১৬৬।

৯. প্রাগুক্ত, ১৫৬।

১০. প্রাগুক্ত, ১৫৭।

১১. প্রাগুক্ত, ১৫৯।

১২. প্রাগুক্ত, ১৬১।

১৩. প্রাগুক্ত।

১৪. প্রাগুক্ত।

১৫. উদাহরণ স্বরূপ দ্র. কুরআন ১১২ ঃ ৩; ২৫ ঃ ২।

১৬. দ্র. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ্, মাজমূ'আতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা লিল-আহ্দিন্ নাবাবী ওয়াল-খুলাফাইর রাশিদা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮৭ খৃ., পৃ. ১০৪-১০৫।

১৭. Supra, পৃ. ৬৭৯।

১৮. মার্গোলিয়থ, op. cit. ১৬৯-১৭০।

১৯. প্রাগুক্ত, ১৭০-১৭১।

২০. প্রাগুক্ত, ১৭১-১৭২।

২১. প্রাগুক্ত, ১৭২-১৭৩।

২২. Supra, অধ্যায় ২৯।

২৩. মার্গোলিয়থ, op. cit. ১৬৮।

২৪. প্রাগুক্ত, ১৬৮-১৬৯।

২৫. প্রাগুক্ত, ১৭৩।

২৬. Supra, পৃ. ৬৮৬-৬৯৫।

২৭. Watt, M. at M., ১১০-১১১।

২৮. প্রাগুক্ত, ১১১।

২৯. প্রাগুক্ত, ১১১-১১২।

৩০. প্রাগুক্ত, ১১৩।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. Supra, পৃ. ৭৪৭-৭৫৬।

৩৩. Supra, অধ্যায় ৯।

৩৪. Watt, M. at M, ১১৪-১১৫।

৩৫. প্রাগুক্ত, ১১৫।

৩৬. প্রাগুক্ত।

৩৭. প্রাগুক্ত, ১১৫-১১৬।

৩৮. প্রাগুক্ত, ১১৬।

৩৯. প্রাগুক্ত, ১১৬-১১৭।

৪০. প্রাগুক্ত, ১১৭।

৪১. প্রাগুক্ত, ৯৭; আরও দ্র. Supra, পৃ. ৬০১-৬০২।

৪২. Watt, M. at M., ১১৮।

৪৩. The Islamic Quarterly (London), vol. 1, No. 3, October 1954, Rp., 182-184.

৪৪. প্রাগুক্ত, ১৮৩।

৪৫. Watt, M. at M., 117.

৪৬. W. Arafat, op. cit., 183.

৪৭. প্রাগুক্ত।

সপ্তম ভাগ

THE LATE MAKKAN PHASE AND MIGRATION TO MADINA

মক্কায় অনুষ্ঠিত ঘটনাবলীর সর্বশেষ পর্যায় এবং মদীনায় হিজরত

পঁয়ত্রিশতম অধ্যায়

মক্কার বাহিরে সমর্থন অন্বেষণ

এক ঃ তাইফ গমন

পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আবূ তালিব ও খাদীজা (রা)-এর ইন্তিকালের অব্যবহিত পরই আবূ লাহাব বনূ হাশিম গোত্রের নেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।[১] বর্তমান অধ্যায়েও লক্ষ্য করা যাইবে যে,[২] এই সমস্ত ঘটনাবলীর পূর্ব হইতেই, প্রকৃতপক্ষে বয়কট চলাকালে, মহানবী ﷺ নিরাপত্তা সমর্থন লাভের জন্য মক্কার বাহিরের বিভিন্ন আরব গোত্রের শরণাপন্ন হন। এক্ষণে আবূ লাহাবের নেতৃত্ব গ্রহণের পর মহানবী ﷺ -এর নিরাপত্তার প্রশ্নে বানূ হাশিম ও বানূ আল-মুত্তালিবের মধ্যকার গোত্রীয় সংহতি ভাঙিয়া পড়ে এবং কার্যত তাহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। ইহার ফলে অন্যান্য মহল হইতে সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা আরও জরুরী প্রতিভাত হয়। কারণ মক্কায় মহানবী ﷺ -এর অবস্থান আর নিরাপদ রহিল না। প্রকৃতপক্ষে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নগর হইতে বিতাড়িত হইয়া যান। কাজেই তাঁহার আশু মনযোগ ভ্রাতৃপ্রতীম নগরী তাইফ[৩]-এর উপর নিবদ্ধ হয়। শহরটি মক্কা নগরীর ষাট মাইল পূর্ব দিকে পর্বতশ্রেণীর এক তুলনামূলক উর্ভর মালভূমিতে অবস্থিত ছিল। ধর্ম প্রচারের দশম বর্ষের শাওয়াল মাসের শেষদিকে তিনি ঐ শহরের বাসিন্দাদের নিকট হইতে নিরাপত্তা ও সমর্থন লাভের আশায় ব্যক্তিগতভাবে তথায় গমন করেন।

মহানবী ﷺ তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও মুক্তদাস যায়দ ইবন হারিছা[৪]সহ তাইফ অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি প্রায় একমাস তথায় অবস্থান করিয়া উহার অধিবাসিগণকে আল্লাহ্ এবং ইসলামের পথে আহ্বান করেন। শহরটির অধিবাসীগণের সিংহভাগ ছিল বানূ ছাকীফ গোত্রভুক্ত, যাহাদের নেতা ছিল 'আমর ইব্ন 'উমায়র ইব্ন আওফ-এর তিন পুত্র 'আব্দ ইয়ালীল, মাসউদ ও হাবীব। এই ভ্রাতৃত্রয়ের একজন বানূ যুহরা গোত্রের সাফিয়্যা বিনতে মা'মার নামক মক্কার এক কুরায়শ ভদ্রমহিলার পাণি গ্রহণ করিয়াছিল। মহানবী ﷺ বিশেষত এই তিন ভ্রাতার শরণাপন্ন হন এবং মক্কার কাফিরদের বিরুদ্ধে তাহাদের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করেন। কিন্তু তাহারা তাঁহার আহ্বানে সাড়া না দিয়া উল্টা তাঁহাকে গালি-গালাজ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে। কথিত আছে যে,

তাহাদের সহিত তাঁহার আলোচনা চলাকারে ভ্রাতৃত্রয়ের একজন এইরূপ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করে যে, মহানবী প্রকৃতই যদি আল্লাহ্‌র বার্তাবাহক হইয়া থাকেন সেক্ষেত্রে সে পবিত্র কা'বা ঘরের গিলাফ ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। আরেকজন ভ্রাতা এই বলিয়া মন্তব্য করে যে, আল্লাহ কি তাঁহার নবী হিসাবে নিযুক্ত করিবার জন্য আর কোন লোক পান নাই? অনুরূপভাবে তৃতীয় ভ্রাতা এইরূপ মন্তব্য করে যে, যদি তিনি (মহানবী) আল্লাহ্‌র নবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার মর্যাদা এতই উচ্চ যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সহিত বিতর্ক চলে না; এবং তিনি যদি আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যাচারী হইয়া থাকেন সেক্ষেত্রে তিনি আলোচনার যোগ্য পাত্র হিসাবে বিবেচিত হইতে পারেন না।[৫]

তাহাদের আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত ও হতাশ হইয়া তিনি তাহাদের আলোচনার বিষয়বস্তুকে গোপন রাখিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাহারা তার প্রতি এই সামান্য সৌজন্যবোধটুকুও দেখাইল না, বরং তাঁহার এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া একটি হৈ চৈ বাঁধাইয়া দিল। তাহারা তাহাদের ভৃত্য, অনুচরবর্গ ও নগরবাসীদিগকে প্ররোচিত করিয়া মহানবী -কে তিরস্কার ও মারপিটসহ নগর হইতে বহিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরিশেষে তিনি নগর হইতে বহির্গত হইবার প্রাক্কালে নগরবাসী ও রাস্তার বখাটে বালকেরা তাহাদের নেতবৃন্দের দ্বারা প্ররোচিত হইয়া রাস্তার দুই ধারে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে গালিগালাজ এবং বিশেষত তাঁহার পদযুগল লক্ষ্য করিয়া নির্দয়ভাবে পাথর নিক্ষেপ করিতে থাকে। যায়দ ইব্‌ন হারিছা তাঁহাকে রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে অবিরত পাথর বৃষ্টি হইতে আড়াল করিতে সচেষ্ট হন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি নিজের মাথায় মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হন। মহানবী -এর পদযুগলও অনুরূপভাবে আঘতপ্রাপ্ত হয় এবং ক্ষতস্থান হইতে প্রচুর রক্তক্ষরণ হয়। কিন্তু যখনই তিনি চলৎশক্তি রহিত হইয়া বসিয়া পড়িতেন তখনই রাস্তার বখাটে বালকেরা তাঁহাকে উঠিয়া হাঁটিতে বাধ্য করিত।

এইভাবে তিনি শহরের উপকণ্ঠে প্রায় তিন মাইল পথ ধিক্কারধ্বনি শুনিতে শুনিতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং জোরপূর্বক হাঁটিতে বাধ্য হইবার পর মহানবী -এর চলৎশক্তি রহিত হইয়া যায়। যায়দ মহানবী -কে তাহার কাঁধে বহন করিয়া দ্রুততার সহিত একটি আঙ্গুর বাগানের সন্নিকটবর্তী অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করেন। তিনি মহানবী -কে উক্ত আঙ্গুর বাগানের দেওয়ালে হেলান দিয়া বসাইয়া দেন। উক্ত বাগানের মালিক ছিল মক্কার রাবী'আ-এর দুই পুত্র 'উতবা ও শায়বা। এই দুইজনই সেই সময় তাহাদের দ্রাক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল। খুব সম্ভব তাহারা তাইফ গমন করিয়া তথাকার নেতৃবৃন্দকে মহানবী -এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করিয়াছিল।[৬] মহানবী এ-র করুণ অবস্থা দর্শনে তাহারা তাঁহার প্রতি সদয় আচরণ করে এবং তাহাদের একজন ভৃত্য আদ্দাসকে এক পেয়ালা আঙ্গুর ভর্তি একটি পাত্র তাঁহার নিকট প্রেরণ করে। ঐ ভৃত্যের মাধ্যমে তাহারা মহানবী -কে আঙ্গুরগুলি ভক্ষণের অনুরোধ জানায়।

আদ্দাস ছিলেন নিনেভা (হযরত ইউনুস আ)-এর বসতি এলাকা হইতে আগত একজন খৃষ্টান। নির্দেশমত ভৃত্যটি মহানবী -এর নিকট আগমন করিয়া তাঁহাকে আঙ্গুরগুলি ভক্ষণের অনুরোধ জানায়। মহানবী আল্লাহ্‌র নামে (বিসমিল্লাহ্‌ বলিয়া) সেগুলি ভক্ষণ শুরু করিলে 'আদ্দাস আশ্চর্যান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত আলাপচারিতায় মগ্ন হন। মহানবী -এর আলাপ-আলোচনা, বিশেষত তৎকর্তৃক ইউনুস নবীর (আ) প্রসঙ্গ আনয়ন আদ্দাসকে মোহিত করে এবং গভীর শ্রদ্ধাবশত তিনি তাঁহার হস্ত ও পদযুগল চুম্বন করেন। 'উতবা ও শায়বা দূর হইতে তাহাদের ভৃত্যের আচরণ লক্ষ্য করে। অনন্তর ভৃত্যটি তাহাদের নিকট প্রত্যাগমন করিলে তাহারা তাহাকে ঐকান্তিক পরামর্শ দেয় যে, সে যেন তাহার পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ না করে যাহা ছিল তাহাদের মতে মহানবী -এর ধর্ম হইতে উৎকৃষ্টতর।[৭]

যখন মহানবী তাঁহার শক্তি ফিরিয়া পান তখন তিনি তাঁহার নিজ অক্ষমতা ও অপর্যাপ্ত অবস্থাকে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্য আল্লাহ্‌র দরবারে প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে পর্যুদস্তকারী তাঁহার করুণ দশা ও সমস্যাবলীর পরিবর্তে তিনি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করেন। এই প্রার্থনাটি তাঁহার উম্মত, তাঁহার বিশ্বাস এবং তাহার উদ্দেশ্যের ঐকান্তিকতার প্রতি প্রগাঢ় অনুভূতি ও ভালবাসার উপর এক উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করে। আল্লাহ্‌র উপর তাঁহার পরিপূর্ণ নির্ভরশীলতাও ইহাতে প্রতিভাত হইয়াছে। প্রার্থনাটির পরিপূর্ণ বয়ান নিম্নরূপ ঃ[৮]

"হে আমার প্রভু! আমি আমার দুর্বলতা, উপায়হীনতা এবং লোকচক্ষে আমার অক্ষমতার প্রতিকূলে তোমার নিকট ফরিয়াদ করিতেছি। হে দয়ার সাগর! তুমি দুর্বলের প্রভু এবং আমারও মালিক। প্রভু! তুমি আমাকে কোন সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণ করিতেছ? তুমি আমাকে কাহার হাতে সমর্পণ করিতেছ যাহারা রুক্ষ ও কর্কশ ভাষায় আমাকে জর্জরিত করিবে? তাহাদের হাতেই না যাহারা আমার সাধনাকে বিপর্যস্ত করিবার ক্ষমতা তাহাদের হাতে? না যাহারা আমার সাধনাকে বিপর্যস্ত করিবার ক্ষমতা রাখে তাহাদের হাতে? যদি তুমি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট না হইয়া থাক তাহা হইলে আমি তাহাদিগকে তোয়াক্কা করি না। কিন্তু যদি আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হই তাহাই হইবে আমার জন্য সবচাইতে প্রশস্ততম সম্বল। তোমার যে পুণ্য জ্যোতির প্রভাবে সকল অন্ধকারই আলোকিত হইয়া উঠে এবং ইহকাল ও পরকালের সমস্ত কাজই সুবিন্যস্ত হয় আমি সেই পুণ্য জ্যোতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমার প্রতি তোমার ক্রোধ অবতীর্ণ না হওয়ার এবং তোমার অসন্তুষ্টি পতিত না হওয়ার প্রার্থনা জানাইতেছি। তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই তোমার দরবারে আর্তনাদ করিতেছি। হে প্রভু! তুমি শক্তি দান না করিলে সৎকাজ করিবার এবং পাপ কাজ হইতে বাঁচিয়া থাকার ক্ষমতা আমার নাই"।

প্রার্থনাটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, যাহারা রাসূলুল্লাহ -এর প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়াছিল তাহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা রাগ-দ্বেষ ইহাতে নাই। ইহা তাঁহার উদার

মনোভাব, চারিত্রিক উৎকর্ষ এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব নির্দেশ করে। কাফিরদের নিকট হইতে এযাবত কাল তিনি যে আচরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তন্মধ্যে তাইফবাসীদের আচরণ ছিল নিষ্ঠুরতম। পরবর্তী কালে যখন হযরত আইশা (রা) তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহুদ যুদ্ধের সহিত তুলনীয় অন্য কোন কঠিন অবস্থার সম্মুখীন কখনও তিনি হইয়াছেন কিনা তখন উত্তরে তিনি বলেন, তাইফবাসীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ব্যবহার ছিল তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা সঙ্কটাপন্ন সময়।[৯]

কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় প্রত্যাগমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তিনি কারনুস সা'আলিব (বা কারনুল মানাযিল) এ পৌছানার পর তাঁহাকে ছায়াদানকারী আকাশের এক খণ্ড মেঘের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।[১০] তিনি সেখানে জিবরীল (আ)-কে লক্ষ্য করেন। জিবরীল (আ) তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, কাফিরগণ তাঁহার প্রতি যে দুর্ব্যবহার করিয়াছে, মহান আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন তাহা লক্ষ্য করিয়াছেন এবং পাহাড় ও পর্বতের দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে পাঠাইয়াছেন যাহাতে কাফিরদের প্রতি তাঁহার ইচ্ছা মাফিক কার্য-নির্বাহ করা হয়। অতঃপর সেই ফেরেশতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সালাম নিবেদন করিয়া বলেন যে, আল্লাহ্ তাঁহাকে তাঁহার (মহানবী ﷺ-এর) নির্দেশ পালন করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছেন। তিনি ইচ্ছা করিলে মক্কার পর্বত-দ্বয়কে (আবূ কুবায়স এবং কুওয়ায় কু'আন) উত্থিত করিয়া ঐ সকল কাফির সম্প্রদায়ের উপরে নিক্ষেপ করা হইবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ এই পরামর্শকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং তৎপরিবর্তে এইরূপ আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহ তাহাদের বংশধরদের মধ্য হইতে সেসব মু'মিন ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটাইবেন যাহারা কেবল মহান আল্লাহ্র ইবাদত করিবে এবং তাঁহার সহিত কোন শরীক করিবে না।[১১]

ফেরেশতার পরামর্শের প্রেক্ষিতে তাঁহার এইরূপ জবাব তদীয় প্রাগুক্ত প্রার্থনার পরিপূরক। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাহাদের চরম বৈরিতা এবং তৎপ্রতি গুরুতর অসদাচরণ সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কাফিরদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ বা তাহাদিগকে শাস্তি প্রদানের কামনা করেন নাই। ইহাতে আরও প্রমাণিত হয় যে, চরম তমসাচ্ছন্ন দুর্যোগ মুহূর্তেও তিনি ভগ্নমনোরথ হন নাই। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে, তাঁহার লোকেরা একদিন সত্যধর্ম গ্রহণ করিবে এবং ইতিহাসই ইহার সাক্ষী, তাঁহার আশাবাদ ও আস্থা কতই না সঠিক ছিল। ঘটনাটির মাধ্যমে আল্লাহ্র তা'আলার তরফ হইতে এইরূপ সান্ত্বনা ও পুনঃনিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, তিনি তাঁহার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) কর্মকাণ্ড ও গৃহীত পদক্ষেপসমূহের তত্ত্বাবধান করিতেছেন এবং প্রয়োজনে তাঁহার সাহায্য ও সহযোগিতা আসিবে।

পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাখলাহ উপত্যকায় অবস্থান করেন। এখানে রাত্রি বেলা তাঁহার প্রার্থনার সময় একদল জিন তাঁহাকে অতিক্রমকালে তাঁহার কুরআন তিলাওয়াত তাহাদের শ্রুতি গোচর হয়। তাঁহারা ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস স্থাপন করেন এবং ঘরে ফিরিয়া তাহাদের সাহাবীদেরকে

অবহিত করেন[১২]; এই ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে পরিষ্কারভাবে বিধৃত হইয়াছে ৪৬ ঃ ২৯-৩১ (সূরা আহকাফে) এবং ৭২ ঃ ১-২ (সূরা জিন্ন)-এ।

দুইটি অনুচ্ছেদের প্রারম্ভিক আয়াতগুলি যথাক্রমে নিম্নরূপ ঃ

وَاِذْ صَرَفْنَا اِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُوْنَ الْقُرْاٰنَ فَلَمَّا حَضَرُوْهُ قَالُوْۤا اَنْصِتُوْا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ . قَالُوْا يٰقَوْمَنَاۤ اِنَّا سَمِعْنَا كِتٰبًا اُنْزِلَ مِنْۢ بَعْدِ مُوْسٰى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيْۤ اِلَى الْحَقِّ وَاِلٰى طَرِيْقٍ مُّسْتَقِيْمٍ . يٰقَوْمَنَاۤ اَجِيْبُوْا دَاعِيَ اللّٰهِ وَاٰمِنُوْا بِهٖ يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ .

"আর দেখ, আমি কুরআন শ্রবণ করিবার জন্য একদল জিনকে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করিলাম। তাহারা আসিয়া বলিল, নীরবে শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণান্তে তাহারা তাহাদের সম্প্রদায়ের নিকট ফিরিয়া গেল এবং (পাপকর্ম হইতে বিরত থাকিবার জন্য) তাহাদিগকে সতর্ক করিল। তাহারা (তাহাদিগকে) বলিল, হে আমাদের সম্প্রদায়! বাস্তবিকপক্ষে আমরা মূসার আমল হইতে পরবর্তীকালীন এমন এক কিতাবের বাণী শ্রবণ করিয়াছি যাহা উহার পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবসমূহের সত্যতা প্রতিপাদন করে। ইহা সত্য ও সরল পথের দিশারী। হে আমাদের কওম! তোমরা আল্লাহ্র প্রতি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দাও এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি তোমাদিগের পাপরাশি ক্ষমা করিবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আযাব হইতে মুক্তি দিবেন" (৪৬ ঃ ২৯-৩১)।

قُلْ اُوْحِيَ اِلَيَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْۤا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا . يَّهْدِيْۤ اِلَى الرُّشْدِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَاۤ اَحَدًا .

"বল, আমার উপর ওহী নাযিল হইয়াছে যে, একদল জিন কুরআন শ্রবণ করিয়া বলিল, আমরা বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করিয়াছি। ইহা সঠিক পথ প্রদর্শন করে। সুতরাং আমরা ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। আমরা কখনও আমাদের প্রতিপালকের সহিত আর কাহাকেও শরীক স্থির করিব না" (৭২ ঃ ১-২)।

জিনদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও তাহাদের মহানবী ﷺ-এর নিকট আগমনের ঘটনা নির্ভরযোগ্য হাদীছসমূহ দ্বারাও সমর্থিত হইয়াছে।

মহানবী ﷺ অতঃপর হি'রাতে আগমন করেন এবং তদস্থল হইতে কিভাবে মক্কাতে গমন করা যায় তাহা বিবেচনায় আনেন। ইতোপূর্বে ঐ শহর হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতাড়িত হন বিধায় প্রশ্নটি যায়দ ইবন হারিছার মনে উদিত হয়। ইহার প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ শান্তভাবে বলেন, আল্লাহ তা'আলা তদীয় ধর্মের রক্ষাকর্তা হিসাবে নিশ্চয় একটি পথ বাতলাইয়া দিবেন। অতঃপর তিনি কুরায়শ নেতা আল-আখনাস ইবন শারীকের নিকট একজন দূত (আবদুল্লাহ ইবন

উরায়কিত·) প্রেরণ করিয়া জানিতে চান যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আশ্রয়দানে প্রস্তুত আছেন কিনা। আল-আখনাস ছিলেন মূলত বানূ ছাকীফ গোত্রের একজন ব্যক্তি। তিনি বানূ যুহরা গোত্রের এক শরীক দল হিসাবে মক্কাতে বসতি স্থাপন করেন এবং কালক্রমে সেখানকার একজন খ্যাতনামা নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি এই বলিয়া তাহার জবাব দেন, যেহেতু তিনি গোত্র-বহির্ভূত একজন মিত্র মাত্র (হালীফ) সেহেতু কোন মূল কুরায়শ গোত্রের বিরুদ্ধে তৎকর্তৃক প্রদত্ত আশ্রয় কোন কাজে আসিবে না।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দূতকে বানূ 'আমেরের সুহায়ল ইব্ন 'আমরের নিকট প্রেরণ করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি বলেন, বানূ কা'বের ন্যায় গোত্রের বিরুদ্ধে আশ্রয় দানের ক্ষমতা বানূ 'আমর গোত্রের নাই।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার দূতকে বানূ নাওফালের মুত'ইম ইব্ন 'আদীর নিকট প্রেরণ করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সুরক্ষা দানে সম্মত হন। সেমতে মুত'ইম ও তাহার পুত্রগণ সশস্ত্র অবস্থায় কা'বা প্রাঙ্গণে গমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে শহরে প্রবেশ করিতে বলেন। তিনি কা'বা তাওয়াফ করেন এবং মুত'ইম ও তাঁহার পুত্রগণ তথায় অপেক্ষমাণ থাকে।[১৪]

এই সময় একজন কুরায়শ নেতা (আবূ সুফয়ান অথবা আবূ জাহল) মুত'ইমকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, নাকি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সুরক্ষা দানের জন্য আগমন করিয়াছেন? মুত'ইম বলেন যে, তিনি সুরক্ষা দানের জন্য তথায় আগমন করিয়াছেন। কুরায়শ নেতা উপলব্ধি করেন যে, মুত'ইমের সুরক্ষাকে অগ্রাহ্য করা যাইবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ মুত'ইমের এই সাহায্য এবং বানূ হাশিম গোত্রের বিরুদ্ধে বয়কট অবসানে তাঁহার অবদানের কথা ভুলেন নাই। অল্পদিন পর মুত'ইম ইন্তিকাল করেন। বদরের যুদ্ধে জয়লাভের পর কুরায়শ যুদ্ধবন্দীদের প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যদি মুত'ইম জীবিত থাকিতেন এবং তাহাদের মুক্তি প্রার্থনা করিতেন, তাহা হইলে সানন্দে তিনি তাহা করিতেন।[১৫]

দুই ঃ গোত্রসমূহের নিকট আবেদন

মুত'ইম ইব্ন আদীর নিকট হইতে সুরক্ষাপ্রাপ্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য স্থান হইতে সহযোগিতা ও সমর্থন আদায়ের কাজে পুনরায় মনোনিবেশ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, বয়কট অবসানের পূর্ব হইতেই এই প্রচেষ্টা শুরু করা হয়। ইহা ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক। কারণ আবূ তালিব অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। দিন দিন তাহার স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি ঘটিতেছিল এবং ইহাতে সকলেই উপলব্ধি করেন যে, তিনি আর বেশিদিন বাঁচিয়া থাকিবেন না। এই পটভূমিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুধাবন করেন যে, আবূ তালিবের ইন্তিকালের পর মক্কাতে তাঁহার এবং তাঁহার ধর্মবিশ্বাসের অবস্থান আরও শোচনীয় রূপ পরিগ্রহ করিবে। কাজেই তীর্থযাত্রা এবং অন্য উপলক্ষ্যে মক্কাতে আগমনকারী গোত্রীয় তীর্থযাত্রিগণ ও তাহাদের

নেতৃবৃন্দের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ সমর্থন লাভ করার প্রয়াস চালান। ইব্‌ন ইসহাক, আত-তাবারী, ইব্‌ন সা'দ প্রমুখ ইতিহাসবিদ অবশ্য আবূ তালিব এবং তাইফের ঘটনার ইতিবৃত্তের পর বিভিন্ন গোত্রের নিকট সমর্থন আদায়ের বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা ইহা বলেন নাই যে, ঐসব সাহায্যের আবেদন ঘটনাগুলি ঘটিবার পরে করা হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহাদের বর্ণনা এবং মক্কায় অতিবাহিত শেষ তিন বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনার জ্ঞাত ক্রমপঞ্জি হইতে ইহা স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বিভিন্ন গোত্রের নিকট হইতে সমর্থন আদায়ের প্রক্রিয়াটি প্রায় যুগপৎ বয়কট আরম্ভের প্রাক্কাল হইতে সূচিত হয়। ইহা সুপরিজ্ঞাত যে, মদীনাতে হিজরত ইসলাম ধর্ম প্রচারাভিযানের ১৪শ বর্ষের প্রারম্ভে করা হইয়াছিল, দ্বিতীয় আকাবা ১৩শ বর্ষের শেষভাগে হইয়াছিল, প্রথম আকাবা হইয়াছিল ১২শ বর্ষের শেষভাগে এবং ছয়জন মদীনাবাসীর প্রথম দলটি ইসলাম ধর্ম প্রচার মিশনের ১১শ বর্ষ শেষের আকাবাতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইব্‌ন ইসহাক সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শেষোক্ত উপলক্ষ্যে মদীনাবাসীদের নিকট ইসলামের পয়গাম উপস্থাপন করেন, যেমনটি তিনি "প্রতি বৎসর" হজ্জের মওসুমে করিতেন।[১৬]

ইহাতে বুঝা যায় যে, মহানবী ﷺ দুই-এক বৎসর পূর্ব হইতেই অর্থাৎ বানূ হাশিম গোত্রের বিরুদ্ধে অবরোধ যখন কার্যকর ছিল তখন হইতেই বিভিন্ন গোত্রের নিকট হইতে সমর্থন ও সুরক্ষা আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। উল্লেখ্য যে, হজ্জের মওসুমে বয়কট ও অবরোধ প্রকৃতপক্ষে কার্যকর থাকিত না এবং অন্যদের ন্যায় রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা, মিনা ও অন্যান্য স্থানে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারিতেন। সেখানে তিনি ধর্মপ্রচার এবং বিভিন্ন গোত্রের সমর্থন ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিতেন। এক অর্থে ধরিতে গেলে বয়কট বাহিরের বিভিন্ন গোত্রের শরণাপন্ন হওয়ার জন্য তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ যেহেতু কুরায়শ জোট কিনানা-এর ন্যায় দূরবর্তী গোত্রকে তাহাদের স্বপক্ষে টানিতে প্রয়াস পায় সেহেতু ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, বানূ হাশিম এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহার বিপক্ষে তাহাদের যাহা কিছু করা সম্ভব ছিল তাহা করেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্বেই যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, একটি হজ্জ মওসুমে, যখন ধরিতে গেলে বয়কট কার্যকর ছিল, এমনকি তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ কিনানার শিবির পরিদর্শনের প্রস্তাব করেন। ইতোপূর্বে বানূ হাশিম-এর বিরুদ্ধে বয়কট কার্যকর করার জন্য শেষোক্ত বানূ কিনানা গোত্রের সহিত কুরায়শগণ এক চুক্তি সম্পাদন করে।[১৭]

অনুরূপভাবে 'উরওয়া ইবনুয যুবায়রও তাঁহার একটি প্রতিবেদনে উল্লেখ করিয়াছেন যে, বয়কট চুক্তি রদ হইবার পূর্ব হইতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বায় আগমনকারী বিভিন্ন গোত্রের নিকট হইতে সমর্থন ও সুরক্ষা আদায়ে সচেষ্ট হন।[১৮] এবং আল-বায়হাকী ও আবূ নু'আয়ম অত্যন্ত সঠিকভাবে তাইফ ভ্রমণকে তাহাদের ইতিবৃত্তে "বিভিন্ন গোত্রের শরণাপন্ন হওয়া" শীর্ষক অধ্যায়গুলির অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।[১৯]

ইহা অবশ্য স্মর্তব্য যে, "প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার" শুরুর প্রাক্কাল হইতে মহানবী ﷺ হজ্জের মওসুমগুলিতে মক্কা ও মিনাতে আগত বিভিন্ন স্থান ও গোত্রের তীর্থযাত্রীদের নিকট গমন করিয়া তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত দিতে থাকেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার আহ্বানের এই নব পর্যায়টি ছিল অবশ্য ভিন্নতর। এক্ষণে, তাহাদিগকে ইসলাম এবং আল্লাহ্র দিকে আহ্বান জানানো ছাড়াও তিনি নিজকে "তাহাদিগের সকাশে সমর্পণ করত" খোলাখুলি এবং উদাত্ত ভাষায় আহ্বান জানান যেন তাহাকে সুরক্ষা ও সাহায্য করা হয় এবং তাঁহাকে তাঁহাদের দেশে আশ্রয় দান করা হয়।[২০]

এই লক্ষ্য অর্জনে তিনি গুরত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী বিভিন্ন গোত্রের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎপ্রার্থী হন। অতএব শুধু হজ্জ মওসুমেই নয়, উকায-যুল মাজায ও মাজাননা নামক মেলা উপলক্ষ্যে তাহাদের মক্কাতে আগমন কালেও তিনি তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। এইভাবে তাহাদের সহিত আলোচনাকালে তিনি অবধারিতভাবেই তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ডাকেন এবং ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। অবশ্য সেখানে তাঁহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের মধ্যে ইহাও প্রতিভাত হয় যে, তিনি ইসলামকে কাহারও উপর জোরপূর্বক চাপাইতে চাহেন না। তিনি তাহাদিগকে বলেন, যদি তাহারা তাঁহাকে সাহায্য করে এবং আল্লাহ্র মনোনীত নবী হিসাবে তাঁহার দীন প্রচারে সুরক্ষা ও সামর্থ্য যোগায় তাহা হইলে তিনি (মহান আল্লাহ) তাহাদিগকে পুরস্কার হিসাবে বেহেশত দান করিবেন।[২১] কখনো কখনো তিনি এরূপ ইঙ্গিত দান করিতেন বলিয়া বর্ণনা রহিয়াছে যে, যদি সত্য ধর্ম প্রতিষ্ঠায় তাহারা তাঁহাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে তাহা হইলে তাহারা সকল আরব ভূমির মালিকানা লাভ করিবে এবং প্রতিবেশী দেশসমূহ তাহাদের পদানত হইবে।[২২]

গোত্রসমূহের নিকট হইতে সাহায্যের অন্বেষণে মহানবী ﷺ তাঁহার পছন্দকে উপদ্বীপের কোন অঞ্চল বা এলাকার উপরে সীমাবদ্ধ করেন নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয় বরং তিনি আরবের উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব অথবা পশ্চিমে বসবাসরত যে কোন প্রভাবশালী গোত্রীয় জনগোষ্ঠীর সমর্থন প্রার্থনা করেন। বিভিন্ন সময়ে যে সকল গোত্রের নিকট তিনি সাহায্য কামনা করেন তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণগুলি ছিল : (১) বানূ 'আমের ইবন সা'সা'আ, (২) বানূ মুহারিব ইব্ন খাসাফাহ, (৩) বানূ ফাযারা, (৪) বানূ গাসসান, (৫) বানূ মুররাহ, (৬) বানূ হানীফা, (৭) বানূ সুলায়ম, (৮) বানূ 'আব্স, (৯) বানূ নাদর, (১০) বানূ বাককা, (১১) বানূ কিনদা, (১২) বানূ কাল্ব, (১৩) বানুল হারিছ ইবন কা'ব, (১৪) বানূ 'উযরাহ, (১৫) বানূ হাদারিমা, (১৬) বানূ বকর ইব্ন ওয়াইল, (১৭) বানূ শায়বান ইব্ন ছা'লাবা এবং (১৮) বানূ হামদান।[২৩]

উপরে বর্ণিত গোত্রগুলির বসবাস সারা আরবে বিস্তৃত ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ১নং গোত্র বানূ 'আমের নাজ্দ্-এ বসবাস করিত, কিন্তু তাহাদের প্রভাব তাইফ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৪নং গোত্র (গাসসান) বসবাস করিত আরবের উত্তর-পশ্চিমে, সেখানে তাহাদের রাজপুত্রদের মধ্যে একজন ছিল বায়যানটাইন সাম্রাজ্যের এক সামন্ত। ৬ নং গোত্র (বানূ হানীফা) পূর্ব আরবের

আল-ইয়ামামাতে বসবাস করিত; তাহারা সামরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। ৭ নং গোত্র (বানূ সুলায়ম) খায়বার-এর নিকটে বসবাস করিত। ১১নং গোত্র (বানূ কিনদা) দক্ষিণ আরবে বসবাস করিত। তাহাদের প্রভাব হাদরামাওত হইতে ইয়ামান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১২ নং গোত্র (বানূ কালব) উত্তর আরবে বসবাস করিত এবং ইহাদের প্রভাব বলয় দূমাতুল জানদাল হইতে তাবূক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ১৬ নং গোত্রটি (বানূ বকর ইবন ওয়াইল) ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী; তাহাদের কর্তৃত্ব মধ্য-আরব হইতে পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূলবর্তী পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গোত্রটি মাঝে মধ্যে শেষোক্তদের সহিত সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হইত। অন্যান্য গোত্রগুলিও আরবের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিমে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অবস্থায় বসবাস করিতেছিল।

এইভাবে মহানবী ﷺ যে সকল গোত্রের শরণাপন্ন হন তাহারা তাঁহার প্রস্তাবনার তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হয়। কারণ মক্কাতে তাঁহার নিজেব লোকদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ এবং তাঁহার শিক্ষাদানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলির বিষয়ে ইতোমধ্যে তাহারা সম্যক ধারণালাভে সক্ষম হইয়াছিল। অধিকাংশ গোত্র উপলব্ধি করে যে, মহানবী ﷺ -কে আশ্রয় ও সুরক্ষা দান করিলে শুধু মক্কাবাসীদের সহিত নয়, অন্যান্য আরব গোত্র, এমনকি কতিপয় প্রতিবেশী শক্তির সহিত তাহাদের দ্বন্দ্ব হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বিভিন্ন সময়ে মহানবী ﷺ যখন মিনাতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোত্রের শিবিরে যাইতেন তখন আবূ লাহাব তাঁহাকে ঐ সমস্ত স্থানসমূহে অনুসরণ করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাইত এবং তাঁহার কোন কথায় কর্ণপাত না করার জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দিত।[২৪]

এই প্রেক্ষিতে গোত্রগুলির মনোভাবে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। মহানবী ﷺ -এর আহ্বানকে অনেকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। কেহবা উহাতে বৈরী যুক্তি-তর্কের অবতারণা করে, আবার কেহবা উহাতে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়িয়া যায় বা পাশ কাটাইয়া যায়। ইহা দ্বারা অনেকে তাঁহার সহিত দর কষাকষি করে, তাহাদের সাহায্যে মহানবী ﷺ তাঁহার মিশনে সাফল্য লাভ করিলে তাঁহাদের বৈষয়িক লাভ কি হইবে তাহা খতাইয়া দেখে। প্রায়শই কোন কোন গোত্র এই মন্তব্যসহ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে যে, একজন ব্যক্তি তাঁহার নিজের লোকদের মধ্যেই সমধিক পরিচিত; এক্ষেত্রে যেহেতু তিনি তাহাদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেহেতু তদদ্বারা অন্যদের কোন মঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন গোত্রের সহিত তাঁহার আলোচনার কতিপয় বিস্তারিত বিবরণের উপর আলোকপাত করিলে আমরা তাহাদের ঐরূপ মনোভাবের পরিচয় পাই।

এইভাবে মহানবী ﷺ বানূ কাল্ব, বিশেষত তাহাদের নেতৃস্থানীয় উপদল বানূ আবদুল্লাহকে দীনের দাওয়াত দেন। তিনি তাহাদিগকে আল্লাহ্র পথে ডাকেন, তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বলেন এবং তাহাদের সমর্থন ও সুরক্ষাপ্রার্থী হন। কিন্তু তাহারা তাহাকে গ্রহণ করিল না।[২৫]

অনুরূপভাবে একদা তিনি মিনাতে বানূ হানীফা গোত্রের শিবিরে উপনীত হন, তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বলেন এবং তাহাদের সাহায্য ও সুরক্ষাপ্রার্থী হন। তাহারা কর্কশ ভাষায় তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁহাকে গালমন্দ করে।[২৬]

শেষোক্ত গোত্র হইতেই মুসায়লামা আল-কায্যাব-এর উদয় হয়, তাহারা আবূ বকর (রা)-এর খিলাফাতকালে ইসলামের কঠোর বিরোধিতা করে।

পুনরায় মহানবী ﷺ বানূ 'আমের ইব্ন সা'সা'আহ গোত্রের শিবিরে আগমন করেন, তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করিতে বলেন এবং তাহাদের নিকট সমর্থন ও সুরক্ষা প্রার্থনা করেন। ঐ গোত্রের একজন নামজাদা সদস্য বায়হারা তাহার মনে এইরূপ ধারণা পোষণ করে যে, যদি সে কুরায়শ যুবাকে (মহানবী ﷺ) তাহার সাথী করে এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বাস্তবায়নে তাঁহাকে সমর্থন যোগায়, তাহা হইলে সে সমগ্র আরব ভূ-খণ্ডকে তাহার নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করিতে সক্ষম হইবে। মনে মনে এইরূপ অভিলাষ পোষণ করিবার পর সে মহানবী ﷺ -কে জিজ্ঞাসা করে, যদি তাহাদের সমর্থনসহ তিনি তাঁহার মিশনে সাফল্য অর্জন করেন তাহা হইলে বানূ 'আমের শাসন ক্ষমতায় তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে কিনা। মহানবী ﷺ তদুত্তরে বলেন, কাহাকেও শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিবার এখতিয়ার পরিপূর্ণভাবে একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার উপর ন্যস্ত। তিনি যাহাকে খুশি উহা দান করেন।

স্বভাবতই এই জবাবে বায়হারা খুশি হইতে পারে নাই। সে বলে, শুধু মহানবী ﷺ-এর স্বার্থে অন্য সকল আরব গোত্রের শত্রুপক্ষে পরিণত হওয়া বানূ 'আমের গোত্রের পক্ষে সম্ভব নহে। কারণ মহানবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর বানূ 'আমের গোত্র তাঁহার শাসন ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইবে না। অতএব এই কারণে সে বলে যে, মহানবীকে তাহার প্রয়োজন নাই।[২৭]

এই কাহিনীর উত্তরভাগ কম চিত্তাকর্ষক নহে। কথিত আছে যে, বানূ 'আমের-এর ঐ সকল লোক যখন গৃহে প্রত্যাবর্তন করে তখন তাহাদের একজন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি বৃদ্ধাবস্থা এবং অক্ষমতাহেতু হজ্জে যাইতে পারেন নাই, তিনি ঘটনাটি শ্রবণান্তে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়া তাহার ভ্রাতাদের নির্বুদ্ধিতার জন্য তাহাদিগকে তিরস্কার করেন। তিনি আরও বলেন যে, তাহারা এমন একটি নজীরবিহীন সুযোগ হারাইয়াছে যাহা তাহাদের জীবনে আর কখনো ফিরিয়া আসিবে না। তিনি ইহাতে মন্তব্য করেন যে, ইসমাঈল (আ)-এর কোন বংশধর কখনো মিথ্যা নবূওয়াতের দাবি করিবেন না।[২৮]

রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ কিনদা গোত্রের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাদের জবাবও ছিল প্রায় একই প্রকৃতির। তাহারা বলে, তাহারা তাঁহাকে সাহায্য ও সুরক্ষা দিবে, যদি তাহারা আরব ভূমির শাসন ক্ষমতার উত্তরাধিকারী হইতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐরূপ ওয়াদা করিতে অস্বীকৃতি জানান।[২৯]

এইখানে লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে, বানূ 'আমের ইব্‌ন সা'সা'আহ ও বানূ কিনদা গোত্রদ্বয়ের সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ যে আলোচনা করেন, সেখানে উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার জবাব ছিল অত্যন্ত সঠিক ও যথোপযুক্ত। তিনি একটি মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন, আরব ভূমির শাসনক্ষমতা লাভের জন্য নহে। সুতরাং তিনি এইরূপ কোন শর্তে রাজী হন নাই যাহা তাঁহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না অথবা যাহা পূরণ করা ছিল তাঁহার ক্ষমতা বহির্ভূত। আগেভাগে ঐরূপ চুক্তি করিলে উহা তাঁহার মিশনকে একটি রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত করিত এবং এইভাবে উহার উদ্দেশ্যও লক্ষ্য ব্যাহত হইত।

একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ হামদান গোত্রের শরণাপন্ন হন। কথিত আছে যে, একদা তিনি বিভিন্ন গোত্রের তাঁবু প্রদক্ষিণরত অবস্থায় বলেন ঃ "এমন কোন ব্যক্তি কি আছেন যিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাহাদের দেশে নিবেন"? তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া বানূ হামদানের এক ব্যক্তি আগাইয়া আসে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাহার সঙ্গে লইয়া যাইতে সম্মত হয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সে চিন্তা করে যে, তাহার গোত্র সম্ভবত তাহার এই কাজের স্বীকৃতি দিবে না। সুতরাং সে দ্রুততার সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিকট ফিরিয়া আসিয়া বলে যে, সে বরং তাহার গোত্রের সহিত এই বিষয়ে প্রথমে আলোচনা করিবে এবং পরবর্তী বৎসর ফিরিয়া আসিবে।[৩০]

অপর একটি প্রতিবেদন হইতে আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক বানূ 'আবস গোত্রের শরণাপন্ন হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ পাই। তিনি যায়দ ইব্‌ন হারিছাসহ জামরাতুল 'উলাতে অবস্থিত উক্ত গোত্রের তাঁবুতে গমন করিয়া তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান, তিনি তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং তাঁহাকে তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে বলেন। ঐ বিবরণী হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, পূর্ববর্তী বৎসরগুলিতেও রাসূলুল্লাহ ﷺ একইভাবে তাহাদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার অনুরোধে সাড়া দেয় নাই। এই বৎসর মায়সারা ইব্‌ন মাস্‌রূক আল-আবসী নামক জনৈক ব্যক্তি ঐ দলটিতে ছিলেন। তিনি তাঁহার লোকদের বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তাঁহার পয়গাম গ্রহণ করা এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাওয়া বিজ্ঞজনোচিত কাজ হইবে। কারণ তাঁহার মহৎ কর্ম প্রচার, প্রসার ও স্থিতি লাভ করিবে এবং উহা বিশ্বের সকল স্থানে পৌঁছিয়া যাইবে। কিন্তু মায়সারার লোকজন তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলে যে, ঐ কাজের সহিত যে গুরুভার জড়িত রহিয়াছে তাহা বহনের ক্ষমতা তাহাদের নাই।

যাহা হউক, রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়সারার কথায় কিছুটা আশান্বিত হইয়া তাঁহার সহিত কথা বলেন। মনোযোগ সহকারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা শ্রবণান্তে মায়সারা মন্তব্য করেন, আপনার বাণী কত কল্যাণপ্রদ এবং আলোকোজ্জ্বল! কিন্তু আমার নিজ সম্প্রদায় আমার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। যেহেতু তাহারা ইহার প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করিতেছে সেহেতু (গোত্রের)

অন্যরাও ইহার প্রতি তুলনামূলকভাবে আরও বেশী বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ স্থান ত্যাগ করেন। এই ঘটনার কয়েক বৎসর পর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বিদায় হজ্জব্রত পালন করেন তখন মায়সারা নিজকে তাঁহার নিকট সমর্পণ করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়া বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত মিনাতে তাহার সাক্ষাতের প্রথম দিন হইতেই তিনি ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আরও সুস্পষ্টভাবে বর্ণনামূলক আরেকটি ঘটনার বিবরণ আমরা পাই 'আলী ইব্ন আবী তালিব (রা) হইতে বর্ণিত একটি ঘটনায়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে এবং আবূ বকর (রা)-কে সঙ্গে করিয়া মিনাতে বানূ রাবী'আ-এর একদল 'আরবের সহিত সাক্ষাত করেন। আবূ বকর তাহাদের সহিত কিছুক্ষণ কথা বলিয়া তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সাফল্য অর্জন করিতে পারিলেন না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ শায়বান ইব্ন ছা'লাবা-এর একদল লোকের সহিত সাক্ষাত করেন। তাহাদের মধ্যে ছিল মাফরূক· ইব্ন আমর, হানী ইব্ন কুবায়সা, আল-মুছান্না ইব্নুল হারিছা ও নু'মান ইব্ন শারীক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। মাফরূকের সহিত আবূ বকর (রা)-এর অন্তরঙ্গতা ছিল। সুতরাং তিনি মাফরূকের সহিত আলোচনা করেন এবং তাহাদের সামরিক শক্তি ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। মাফরূকের জবাব হইতে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, উভয় দিক হইতেই তাহারা বেশ শক্তিশালী।

অতঃপর আবূ বকর (রা) মহানবী ﷺ-কে তাহার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার সহিত কথা বলেন। মাফরূক রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশন ও শিক্ষার বিষয়ে জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। তিনি তাহার নিকট ইসলাম ধর্মের বিবরণ দেন এবং কলেমার দাওয়াতসহ বলেন, "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং তিনি হইতেছেন তাঁহার প্রেরিত রাসূল"। তিনি তাহাদিগকে বলেন যে, তিনি তাহাদের নিকট সাহায্য ও সুরক্ষা চাহেন যাহাতে তিনি তাঁহাকে প্রদত্ত আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ বাস্তবায়িত করিতে পারেন। কারণ কুরায়শগণ তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে এবং আল্লাহ তা'আলার বাণীকে অবজ্ঞা করিয়া সত্যের পরিবর্তে মিথ্যাকে গ্রহণ করিয়া স্বস্তিবোধ করিতেছে।

মাফরূক এই বিষয়ে আরও জানিতে চাহে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে সূরা আল-আন'আম (সূরা ৬)-এর ১৫১-১৫৩ আয়াত তিলাওয়াত করিয়া শোনান। মাফরূক কুরআন মাজীদ সম্পর্কে আরও জানিতে চায় এবং বলে যে, ইহা মানুষের রচনা হইতে পারে না, হইলে তাহারা তাহা বুঝিতে পারিত। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে সূরা (১৬) আন-নাহ্লের ৯০ নম্বর আয়াতটি তিলওয়াত করিয়া শোনান।

মাফরূক প্রভাবিত হয় এবং সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাহাদের সরদার ও ধর্মীয় নেতা হানী ইব্ন কুবায়স-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দেয়। শেষোক্ত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি বলেন যে, তিনি ইতোপূর্বেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কথা শুনিয়াছেন এবং তিনি বিশ্বাস করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ

যাহা বলেন তাহা সত্য। কিন্তু তাহাদের নিকট তাঁহার এই উপস্থাপনার পরিণাম সম্পর্কে তিনি তখনও ভাবিয়া দেখেন নাই। তিনি আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত কেবল একবার বসিয়া আলোচনার সূত্র ধরিয়া তাহাদের বাপ-দাদার ধর্মকে পরিত্যাগ করা সমীচিন হইবে না বলিয়া তিনি মনে করেন। ইহা ছাড়া তাহার সম্প্রদায়ের অন্যান্য লোকেরা সেখানে ছিল না। কাজেই তাহাদের সহিত পূর্বেই আলোচনা না করিয়া কোন সিদ্ধান্ত তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া ঠিক হইবে না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রত্যাশিত সমর্থনের বিষয়ে আলোচনার জন্য হানী তাঁহাকে তাহাদের সমর বিষয়ক অধিনায়ক আল-মুছাননা ইবনুল হারিছা-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। আল-মুছাননা বলেন যে, তিনিও তাহাদের কথোপকথন শুনিয়াছেন এবং তাহার জবাবও ছিল হানী-এর মতই। আল-মুছাননা আরও বলেন, তাহাদের সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চল হইতে শুরু করিয়া এবং সম্প্রতি তাহারা পারস্যের সহিত এই মর্মে এক চুক্তিতে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহারা দেশে এই ধরনের কোন পরিবর্তন সূচিত করিবেন না বা কাহাকেও ঐরূপ করিতে দিবেন না। তৎসহ তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, আরবদের বিরুদ্ধে তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কার্যকর সাহায্য ও সুরক্ষা দিতে পারে, কিন্তু পারস্যের বিরুদ্ধে ঐরূপ করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে। আল-মুছাননার প্রাণখোলা জবাবের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন, কিন্তু মন্তব্য করেন, যখন কেহ আল্লাহর পথে বাহির হয় তখন কোন ওজর আপত্তিই তাহার বাধার কারণ হইতে পারে না। অতঃপর তিনি তথা হইতে চলিয়া আসেন।

বর্ণনাটি বিভিন্ন দিক হইতে তাৎপর্যপূর্ণ। ইহা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, বানূ শায়বান ইব্‌ন ছা'লাবা অন্যান্য অনেক গোত্রের ন্যায় যাহাদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহায্য ও সমর্থন প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারা তাঁহাকে তাহাদের আশ্রয় ও সুরক্ষা দেওয়ার পরিণাম বিষয়ে ওয়াকিফহাল ছিলেন। দ্বিতীয়ত, মুছাননার নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যে একথা প্রকাশ পায় যে, তাহারা দেশে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত এক চুক্তিতে উপনীত হইয়াছে এবং উহাতে এই মর্মে একটি বিশেষ শর্ত সংযোজন করা হইয়াছে যাহাতে কোনরূপ পরিবর্তন আনয়নের কোন প্রবক্তাকে কোনরূপ সুযোগ না দেওয়া হয়।

এই সকল পূর্ব-সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি দৃষ্টে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পারস্যের ন্যায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রীয় শক্তিগুলি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আরবে সত্য ধর্ম প্রচারের পরিপ্রেক্ষিত জনিত অগ্রগতি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে বানূ শায়বান এবং পারস্যের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির শেষোক্ত শর্তটি বিশেষত রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে লক্ষ্য করিয়া সম্পদিত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে এই কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে নিঃশর্ত সহযোগিতার অন্বেষণ ও উহার প্রতি গুরুত্বারোপ অত্যন্ত সময়োপযোগী ও যথোপযুক্ত ছিল।

উপরিউক্ত ইতিবৃত্তের উপসংহারে বলা হইয়াছে যে, বানূ শায়বান-এর শিবির ত্যাগ করার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেদের নিকট আগমন করেন। তাহারা ইতোপূর্বে তাঁহার পক্ষাবলম্বনের শপথ গ্রহণ করিয়াছিল।[৩৩] ইহাতে বুঝা যায় যে, বানূ শায়বানের সহিত সাক্ষাত মিশনের ১১শ বা ১২শ বর্ষে হইয়া থাকিবে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বশেষ যে গোত্রগুলির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, বানূ শায়বান ছিল তাহাদের অন্যতম। যেভাবেই হউক না কেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহায্যকারী (আনসার) হওয়ার গৌরব বা মর্যাদা লাভের সৌভাগ্য ও কল্যাণকর সুযোগ শেষ পর্যন্ত মদীনাবাসীরা অর্জন করেন।

তিন ঃ মদীনার পরিস্থিতি

মদীনার পূর্বতন নাম ছিল ইয়াছরিব, ইহা মক্কা হইতে প্রায় তিন শত মাইল উত্তরে অবস্থিত। ঐ সময় ইহা বানূ নাযীর, বানূ কায়নুকা ও বানূ কুরায়যা নামক তিনটি ইয়াহূদী গোত্র এবং আওস ও খাযরাজ নামক দুইটি আরব গোত্র অধ্যুষিত ছিল। উপর্যুপরি বিদেশী আক্রমণের কারণে ইয়াহূদীরা তাহাদের নিজেদের দেশ ত্যাগ করে এবং ইসলামের আবির্ভাবের কয়েক শতাব্দী পূর্বে মদীনায় আসিয়া বসতি স্থাপন করে। একইভাবে আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয় মূলত ইয়ামান হইতে আগমন করিয়া মদীনাতে বসতি স্থাপন করে। ইয়াহূদীরা শিক্ষাগতভাবে অধিকতর অগ্রসর ছিল এবং কালক্রমে তাহারা অর্থনৈতিকভাবেও অনুরূপ অগ্রণী অবস্থানে উপনীত হয়। ইহার ফলে তাহারা আরব গোত্রদ্বয়ের উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

শেষোক্ত ঐশী কিতাববিহীন আরবগণ ছিল বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তাহারা অনেকগুলি প্রতিমার পূজা করিত। আরব গোত্রদ্বয়ের মধ্যকার বহু বর্ষব্যাপী দ্বন্দ্ব ও ঈর্ষার কারণে তাহাদের উপর ইয়াহূদীদের প্রভাব বিস্তার সহজতর হয়। যদিও আরব গোত্রদ্বয় ছিল একই বংশোদ্ভূত, তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ রক্ত সম্পর্ক ও বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয়তা ছিল এবং যদিও ইয়াহূদীরা ছিল তাহাদের সাধারণ শত্রু, তথাপি ঐ আরব গোত্রদ্বয়ের নিজেদের মধ্যে সদা-সর্বদা বিরোধ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত লাগিয়াই থাকিত। ইসলামের অভ্যুদয়ের পূর্বের দেড় শতাব্দীর মধ্যে ছোটখাট সশস্ত্র সংঘর্ষ ছাড়াও কমপক্ষে দশটি বিপর্যয়কর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। স্বভাবতই ইয়াহূদীরা এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করিত এবং প্রায়ই এক গোত্রকে কৌশলে অন্য গোত্রের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিত। কারণ আরব গোত্রদ্বয়ের বিভক্তি ও দুর্বলতার মধ্যে ইয়াহূদীরা নিজেদের নিরাপত্তা ও অব্যাহত প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করে। এমনকি মাঝে মাঝে তাহারা এই বলিয়াও ভীতি প্রদর্শন করিত যে, একজন নূতন রাসূলের আবির্ভাবের সময় সমাগত হইয়াছে। তিনি আসিলে তাহারা তাঁহার সাহায্যে 'আওস ও 'খাযরাজ গোত্রদ্বয়ের উপর এক চরম বিপর্যয় আনয়ন করা হইবে, যেমনটি প্রাচীন কালে করা হইয়াছিল অভিশপ্ত 'আদ ও ছামূদ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে।

এতদসত্ত্বেও সম্প্রদায় দুইটি তাহাদের মধ্যকার ঈর্ষা ও বৈরিতার অবসান ঘটাইতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানগণ মক্কার কাফিরদের দ্বারা সৃষ্ট বয়কট ও অবরোধের মুকাবিলা করিতেছিলেন, তখন ঐ গোত্রদ্বয় আরেকটি আত্মঘাতী যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতেছিল। বু'আছ-এর যুদ্ধ নামে পরিচিত এই ঘটনা রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মদীনাতে হিজরতের পাঁচ বৎসর পূর্বে সংঘটিত হয়। আসন্ন এই যুদ্ধের পটভূমিতে ঐ স্থানের কতিপয় নেতার সহিত সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

চার ঃ মদীনার সহিত সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্থাপন

ইব্ন ইসহাকের[৩৪] বর্ণনামতে, বানূ আওস গোত্রের শাখা বানূ 'আমের, ইব্ন 'আওফের সুওয়ায়দ ইব্ন স'ামিত 'উমরা বা হজ্জ করিবার জন্য মক্কায় আগমন করেন। তাঁহার অভিজাত কুলজী এবং চৌকশ ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে তিনি কামিল 'নিখুঁত' (perfect) নামে পরিচিত ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত তাঁহার দূর-সম্পর্কের আত্মীয়তাও ছিল। কারণ সুওয়ায়দের মা লায়লা বিন্ত আমর ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাদা 'আবদুল মুত্তালিবের মা সালমা বিন্ত 'আমর-এর একজন সহোদরা। সুওয়ায়দের মক্কায় আগমনের সংবাদ শুনিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার সহিত সাক্ষাত করেন এবং তাঁহাকে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, "সম্ভবত তোমার কাছে এমন কিছু আছে যাহা আমারটির অনুরূপ"। তাহার কাছে কি আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহা জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, তাহার সঙ্গে আছে লুকমানের জ্ঞান (বা কিতাব)।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ "তোমার কাছে প্রাসঙ্গিক যাহা আছে তাহার সবই ভাল, কিন্তু আমার কাছে যাহা আছে তাহা আরও উত্তম। ইহা হইতেছে কুরআন মাজীদ। মহান আল্লাহ ইহা আমার উপর নাযিল করিয়াছেন। ইহা পথপ্রদর্শক এবং জ্ঞানের আকর"। এইরূপ বলিবার পর তিনি পবিত্র কুরআন হইতে কিছু অংশ তিলাওয়াত করিয়া সুওয়ায়দকে শুনান এবং ইসলাম গ্রহণের জন্য তাঁহাকে আবারও আহ্বান জানান। তিনি ইহাতে অস্বীকৃতি জানান নাই এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আহ্বান দৃশ্যত তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করে। তিনি বলেন, তিনি যাহা শুনিয়াছেন তাহা প্রকৃতপক্ষে ভাল। তারপর তিনি মদীনাতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং অল্পকাল পরেই বু'আছের যুদ্ধের পূর্বে খাযরাজ গোত্রের এক ব্যক্তির হাতে নিহত হন।[৩৫]

মদীনার কোন নেতার সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যোগাযোগ স্থাপনের পরবর্তী ঘটনাটি বু'আছ যুদ্ধের পটভূমির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কথিত আছে যে, 'আওস গোত্রের শাখা বানূ 'আবদুল আশহালের আবুল হায়ছার আনাস ইব্ন রাফে' তাহার দলভুক্ত ইয়াস ইব্ন মু'আয প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তিসহ মক্কাতে আগমন করিয়া খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে কুরায়শদের সহিত একটি সামরিক আঁতাত করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে। তাহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া রাসূলুল্লাহ

তাহাদের সহিত সাক্ষাত করেন। তিনি তাহাদের সহিত কথা বলেন এবং জানিতে চাহেন, তাহারা যে উদ্দেশ্য সাধনে মক্কাতে আসিয়াছে তদপেক্ষা ভাল কিছু গ্রহণে তাহারা সম্মত আছে কিনা। তাহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং উহা কি সে বিষয়ে তাহারা জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। তখন রাসূলুল্লাহ বলেন, আল্লাহ তা'য়ালা তাহাকে তাঁহার রাসূল হিসাবে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি তাহাদিগকে শুধু আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করিবার জন্য এবং তাঁহার সহিত কোন শরীক স্থাপন না করিবার আহ্বান জানান। তিনি তাহাদিগকে আরও বলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উপর এক আসমানী কিতাব নাযিল করিয়াছেন; উহা হইতেছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। অতঃপর তিনি উহার কিছু অংশ তাহাদিগকে তিলাওয়াত করিয়া শুনান। তিনি তাহাদের সমীপে ইসলামের ব্যাখ্যা পেশ করেন।

তাঁহার বাণী মনোযোগের সহিত শ্রবণান্তে ইয়াস ইব্ন মু'আয, যিনি বয়সে একজন তরুণ ছিলেন, এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, তাহার সঙ্গীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন, হে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা! আল্লাহ্র শপথ, আমরা যে উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করিয়াছি তদপেক্ষা ইহা উত্তম। কিন্তু খাযরাজ গোত্রের বিরুদ্ধে দলনেতা 'আবুল হায়ছার শত্রুতায় ও ঈর্ষাজনিত রোষানলে এতটাই অন্ধবৎ হইয়া পড়েন যে, তিনি বিরক্তির চরম সীমায় উপনীত হন এবং তদবস্থায় একমুঠি ধুলি হস্তে ধারণ করিয়া তাহা ইয়াসের মুখমণ্ডলে নিক্ষেপ করেন এবং মন্তব্য করেন যে, তাহারা যে উদ্দেশ্যে মক্কাতে আগমনের কষ্ট স্বীকার করিয়াছে ইহা তাহা নহে। ইহাতে ইয়াস নিশ্চুপ হইয়া যান এবং মহানবী তাহাদিগকে ত্যাগ করেন।[৩৬]

যাহা হউক, 'আবুল হায়সার যে মিশন লইয়া কুরাশগণের নিকট আগমন করেন তাহা সফল হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে বু'আছের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। অধিকাংশ সূত্রমতে, ইহা রাসূলুল্লাহ কর্তৃক মদীনায় হিজরতের চার-পাঁচ বৎসর পূর্বে ঘটিয়াছিল। অতএব কারণে বুঝা যায় যে, মদীনার লোকদের সহিত উপরিউক্ত সকল যোগাযোগই দাওয়াত মিশনের ১০ম বর্ষের প্রারম্ভে বয়কট ও অবরোধ অবসানের পূর্বে স্থাপিত হইয়াছিল। ইয়াস ইব্ন মু'আয অবশ্য বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। তিনি বু'আছ যুদ্ধের স্বল্পকাল পরে এবং রাসূলুল্লাহ -এর মদীনাতে হিজরতের পূর্বে ইন্তিকাল করেন। কথিত আছে যে, যাহারা তাঁহার ইন্তিকালের প্রাক্কালে উপস্থিত ছিলেন তাহারা তাঁহাকে মৃত্যুশয্যায় আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করিতে এবং আল্লাহ্র একত্ব (তাওহীদ) ঘোষণা করিতে শুনিয়াছেন। তাহাদের কোন সন্দেহ ছিল না যে, তিনি একজন মুসলমান হিসাবে ইন্তিকাল করেন। তিনি মক্কাতে রাসূলুল্লাহ -এর সহিত সাক্ষাতকালে ইসলামের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন।[৩৭]

আরেকটি বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, মদীনাতে সর্বপ্রথম যাহারা ইসলাম গ্রহণ করেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন আস'আদ ইব্ন যুরারা এবং যাকওয়ান ইব্ন 'আবদ কায়স। কথিত আছে যে, কতিপয় বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য তাঁহারা মক্কাতে উতবা ইব্ন রাবী'আর নিকট আসিয়াছিলেন।

যখন তাঁহারা তাহার সহিত সাক্ষাৎ করেন তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলে, "এই ধর্ম প্রচারকারী সকল কিছু হইতে আমাদের মনোযোগ বিচ্যুত করিয়াছে। তিনি নিজকে আল্লাহ্ তা'আলার রাসূল হিসাবে দাবি করেন"। এই মন্তব্য শুনিয়া যাকওয়ান তাহার সঙ্গীর কানে কানে বলেন, আস'আদ! দেখ, ইহাই তোমার ধর্ম"। কারণ আস'আদ ইব্‌ন যুরারা এবং অপর একজন মদীনাবাসী আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান তাওহীদ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। যাকওয়ান ও আস'আদ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের নিকট ইসলামের ব্যাখ্যা করেন। তাঁহারা ইসলামে দীক্ষিত হইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। আস'আদ পরবর্তীতে আবুল হায়ছাম ইব্‌নুত তায়্যিহানের সহিত সাক্ষাত করিয়া তাহাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ইসলামের সকল বিষয়ে অবহিত করেন। সুতরাং তিনিও ইসলামে দীক্ষিত হন।[৩৮]

এতদ্ব্যতীত আরও একটি ইতিবৃত্তে বলা হইয়াছে যে, রাফে' ইব্‌ন মালিক আয-যুরাকী ও মু'আয ইব্‌ন 'আফরা 'উমরা পালনের জন্য মক্কাতে আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার ধর্মপ্রচার বিষয়ে অবহিত হন। সুতরাং তাঁহারা তাঁহার নিকট গমন করেন, ইসলামের মর্মবাণী মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করেন এবং ইহাতে দীক্ষিত হন।[৩৯]

উপরিউক্ত বর্ণনা দুইটি হইতে আমরা ইসলামের প্রাথমিক দীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে অনুধাবন করিতে পারি। উহার একদিকে একটি ঘটনায় যাকওয়ান ও আস'আদ ইব্‌ন যুরারা এবং অপর দিকে আরেকটি ঘটনায় রাফে' ইব্‌ন মালিক ও মু'আয ইব্‌ন 'আফরা কর্তৃক ইসলাম গ্রহণের বিষয়ে সত্যতা যাহাই থাকুক না কেন, ঘটনাগুলি হইতে আমরা এই ইঙ্গিত পাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ইসলামের খবর মদীনাতে প্রচারিত হইতেছিল যেমনটি হইতেছিল 'আরবের অন্যান্য অংশেও। যাহা হউক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, মিশনের ১১শ বর্ষের শেষদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আকাবাতে যে ছয় ব্যক্তির সহিত মিলিত হন এবং ঐ উপলক্ষে যাহারা ইসলামে দীক্ষিত হন, আস'আদ ইব্‌ন যুরারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একজন।

অনুরূপ আস'আদ ও যাকওয়ান দ্বাদশ বর্ষের শেষদিকে আকাবার প্রথম বায়'আতে যে বারজন অংশগ্রহণ করেন তাঁহাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, সুওয়ায়দ ইবন স'মিত ও ইয়াস ইব্‌ন মু'আয-এর সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত ঘটিয়াছিল বু'আছ যুদ্ধের পূর্বে। এই প্রাথমিক যোগাযোগ এবং ইয়াসের নিজের লোকদের জন্য উন্নতির বিষয়ে আগ্রহ শেষ পর্যন্ত সফল হয়। কেননা তাহার ইন্তিকালের সময়ে অথবা তাহার অল্প পরেই মদীনার ছয়জন নাগরিক ইসলামের জন্য একাদশ বর্ষের শেষের দিকে আকাবার প্রথম বায়'আতে অংশগ্রহণ করেন।

অনুবাদ ঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তথ্যনির্দেশিকা

১. উপরে দ্র. পৃ. ৭১৩ (মূল গ্রন্থ)।

২. নিচে দ্র. এই অধ্যায়ের সেকশন-২।

৩. ইব্‌ন সা'দ, ১খ, ২১০-২১১।

৪. ইব্‌ন ইসহাক বলেন, মহানবী ﷺ একাই সেখানে গিয়াছিলেন (ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪১৯); কিন্তু ইহা সঠিক নয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৫. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪১৯; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ, ৪১৫।

৬. সম্ভবত উতবা ও শায়বার তাইফে উপস্থিতির এই ঘটনাকেই 'উরওয়া ইবন যুবায়র (র) এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ "আত-তাইফ হইতে কুরায়শ গোত্রীয় কিছু ধন্যাঢ্য ব্যক্তি তথায় আগমন করিয়া তাহাদের অনুসারীদিগকে মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে" ইত্যাদি। দ্র. উপরে পৃ. ৭১৭ প. (মূল গ্রন্থ)। স্পষ্টত উরওয়া এখানে কিছু তালগোল পাকাইয়া ফেলিয়াছেন।

৭. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪২০, ৪২১; ইব্‌ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, ১৩৫-৩৬; আল-বায়হাকী, ২খ, ৪১৫-৪১৬।

৮. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪২০; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ, ৩৪৬ (১/১২০১); আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬খ, ৩৮-৩৯; আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১৬খ, ২১১। মুনাজাতের মূল ভাষ্যটি নিম্নরূপ ঃ

اَللّٰهُمَّ اِلَيْكَ اَشْكُوْ ضَعْفَ قُوَّتِيْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِيْ وَهَوَانِيْ عَلَى النَّاسِ يَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِيْنَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَاَنْتَ رَبِّيْ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِيْ اِلٰى بَعِيْدٍ يَتَجَهَّمُنِيْ اَمْ اِلٰى عَدُوٍّ مَلَّكْتَهُ اَمْرِيْ اِنْ لَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا اُبَالِيْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ اَوْسَعُ لِيْ اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِيْ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ بِيْ غَضَبَكَ اَوْ يَحِلَّ عَلَيَّ سَخَطُكَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ .

৯. বুখারী, নং ৩২৩১, ৭৩৮৯; মুসলিম, ১৭৯৫; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ, ৪১৭; আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৮১-২৮২।

১০. বর্তমানে ইহা নাজদের দিক হইতে আগত হাজ্জীদের জন্য একটি মীকাত হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

১১. বুখারী, নং ৩২৩১, ৭৩৮৯; মুসলিম, নং ১৭৯৫; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ, ৪১৭; আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৮১-২৮২।

১২. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪২২; ইব্‌ন সাদ, ১খ, ২১১-২১২।

১৩. বুখারী, নং ৪৯২১; মুসলিম, নং ৪৪৯, ৪৫০; মুসনাদ, ১খ, ৪৩৬; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ., ২২৫-২৩৩; আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ৩৬৩-৩৬৬; ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৭খ, '২৭২-২৮৭।

১৪. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৩৮১, ইবন সা'দ, ১খ., ২১২।

১৫. বুখারী, নং ৩১৩৯, ৪০২০।

১৬. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪২৮; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ, ৩৫৩ (১/১২০৯)।

১৭. বুখারী, নং ১৫৯০; মুসনাদ, ২খ, পৃ. ২৩৭।

১৮. আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৯৫, (নং ২২১)।

১৯. ঐ লেখক, পৃ. ২৮১-৩৩০; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ, ৪১৩-৪১৫।

২০. মুসনাদ, ৩খ, ৩২২; তিরমিযী, ফাদাইল আল-কুরআন, ২৩ (তুহফাতুল আহওয়াযী, নং ৪০৯-১১; আবূ দাউদ, সুনান, কিতাব আস-সুন্নাহ, বাব ২১, হাদীছ ১; ইব্ন মাজা, সুনান, নং ২০১ (খণ্ড ১, পৃ. ৭৩)।

২১. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪২২; আত-তাবারী, তারীখ, ২খ, ৩৪৮ (১/১২০৪)।

২২. ইব্ন সা'দ, ১খ, ২১৬।

২৩. ঐ লেখক, ১খ., ২১৬-২১৭, আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৯৩; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, ১৪৬।

২৪. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪২৩।

২৫. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪২৪-৪২৫। বর্ণানটির একটি ঈষৎ ভিন্নতর ভাষ্যের জন্য দ্র. আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৮৮-২৯০।

২৬. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৯২৫।

২৭. ঐ লেখক, ১খ., পৃ. ৪২৪-৪২৫।

২৮. ঐ লেখক।

২৯. আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৯১।

৩০. ঐ লেখক, পৃ. ২৯১–২৯২, মুসনাদ; ৩খ, পৃ. ৩৯০; ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, পৃ. ১৪৬।

৩১. আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৯৩–২৯৪ (নং ২২০)। আরও দ্র. আল-ইসাবা, নং ৮৩৮১ (৩খ, ৪৬৯–৪৭০) এবং ইব্ন কাছীর, আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ৩খ, ১৪৫-১৪৬।

৩২. আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৮২–২৮৮।

৩৩. ঐ, পৃ. ২৮৮।

৩৪. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪২৫-৪২৭।

৩৫. ঐ লেখক, ১খ., পৃ. ৪২৭। ইব্ন ইসহাককে সমর্থন করিয়া ইব্ন 'আবদুল বার্র আরও বলেন, সুওয়ায়দ নিহত হন বু'আছ যুদ্ধের পূর্বেই (আল-ইসতী'আব, ২খ, ৬৭৭)। ইবনুল আছীর অবশ্য বলেন, সুওয়ায়দ বু'আছের যুদ্ধে নিহত হন (উসদুল গাবা, ২খ, ৩৩৭, নং ২৩৪৭)।

৩৬. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪২৭-৩২৮।

৩৭. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪২৮।

৩৮. ইব্ন সা'দ, ১খ, ২১৮।

৩৯. পূর্বোক্ত বরাত।

ছত্রিশতম অধ্যায়

আল-ইসরা ও আল-মি'রাজ

মক্কার বাহির হইতে সাহায্য ও সমর্থন আদায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্যোগের আরও বর্ণনা প্রদান করিবার পূর্বে কোন নবী বা রাসূলের জীবনে সংঘটিত সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ করা যুক্তিসঙ্গত যাহা আল-ইসরা ও মি'রাজ নামে পরিচিত। কুরআন মাজীদ এবং নির্ভরযোগ্য তথ্য সূত্রাদি হইতে সংগৃহীত উক্ত স্মরণীয় ঘটনাবলীর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল।

এক ঃ আল-ইসরা ও আল-মি'রাজ।

আল-ইসরা ও আল-মি'রাজের শব্দগত অর্থ হইতেছে যথাক্রমে "রাত্রিকালীন ভ্রমণ" এবং "রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ঊর্ধ্বগমন"—এগুলির দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর প্রতি দিকনির্দেশ করা হয়। ঘটনাটি এই যে, আল্লাহ্র ইচ্ছায় একদা রাত্রিযোগে তিনি ফেরেশতা জিবরীলসহ আলোর ঝলকানির বেগে কা'বা প্রাঙ্গণ হইতে বায়তুল মাকদিস (জেরুসালেম) এবং সেখান হইতে সপ্ত আকাশের সর্বশেষ সীমায় আরোহণ করেন এবং সেখানে তাঁহাকে আল্লাহ তা'আলার কতিপয় নিদর্শন দেখানো হয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ তথা আল্লাহ্র বাণী তিনি সেখানে প্রাপ্ত হন এবং এই প্রকারে সেই একই রাত্রিতেই তিনি মক্কাতে প্রত্যাবর্তন করেন। ইসলামী পরিভাষায় আল-ইসরা এবং আল-মি'রাজ শব্দ দুইটি পরস্পর সমার্থক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়। বাস্তবিকপক্ষে যেহেতু সমগ্র ভ্রমণটি একটি মাত্র রাত্রিতে সম্পন্ন হয়, সেহেতু ভ্রমণ এবং আরোহণ উভয় পর্বকে প্রথম শব্দ আল-ইসরা-এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এইভাবে ইমাম মুসলিম অত্যন্ত সঠিকভাবেই তাঁহার বর্ণনায় এই ঘটনাবলীকে 'বাব ইসরা' পর্বের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অবশ্য উভয় ঘটনাকে বুঝাইতে আল-মি'রাজ শীর্ষক সাধারণ নামটি সমধিক জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে কুরআন মজীদে বর্ণিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ ১৭ নং সূরা, যাহা সূরাতুল ইসরা (বা বানূ ইসরাঈল) নামেও পরিচিত, সেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الاَقْصَى الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ .

"অতি পবিত্র তিনি যিনি রাতের বেলা স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম হইতে মসজিদুল আক্সায় লইয়া গিয়াছিলেন যাহার চতুষ্পার্শ আমি বরকতপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছি। এজন্য যে, তাহাকে আমি স্বীয় নিদর্শনাবলী দর্শন করাইব। নিশ্চয় তিনি সবকিছু দেখেন, সবকিছু শুনেন" (১৭ ঃ ১)।

এই আয়াতে কা'বা প্রাঙ্গণ হইতে বায়তুল মাকদিস (জেরুসালেম) পর্যন্ত রাত্রিকালীন ভ্রমণের উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর সূরা আন-নাজ্‌ম (৫৩)-এর ১৩-১৮ সংখ্যক আয়াতসমূহে নিম্নবর্ণিতভাবে তাঁহার উর্ধ্বলোকে আরোহণের কথা বলা হইয়াছে ঃ

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى . عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى . يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى . مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى . لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى .

"এবং নিশ্চয় সে (রাসূলুল্লাহ) দ্বিতীয় আরোহণকালে তাহাকে (জিবরীলকে তাঁহার নিজস্ব আকৃতিতে) আর একবার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সেই সীমান্ত নির্দেশকারী সিদরা বৃক্ষের নিকটে। তাহারই নিকটে জান্নাতুল মাওয়া (বেহেশত নিকেতন)। যখন সিদরাকে যাহা দ্বারা আবৃত করিবার তাহা দ্বারা আবৃত করা হইয়াছিল। তাহার চক্ষু দৃষ্টিভ্রমে পড়ে নাই, সীমাতিক্রমও করে নাই। নিঃসন্দেহে সে তাহার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শনসমূহের (কতিপয়) প্রত্যক্ষ করিয়াছে" (৫৩ ঃ ১৩-১৮)।

এই অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সিদরা বা বৃক্ষ বিশেষের নিকটে কতিপয় নিদর্শন অবলোকন করানো হয় যাহাকে "তাঁহার প্রভুর মহোত্তম নিদর্শন" হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উল্লেখ্য যে, কোন জীবন্ত প্রাণীর পক্ষে ঐ চরম প্রান্ত নির্দেশক বৃক্ষের সীমানা অতিক্রম করা সম্ভব নহে। এইভাবে উপরিউক্ত অনুচ্ছেদদ্বয়ে সমগ্র ভ্রমণের যথাক্রমে প্রথম ও শেষাংশের বর্ণনা করা হইয়াছে। এতদ্বারা ঘটনাটির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অংশ অর্থাৎ ইসরা ও মি'রাজের একীভূত ধারণা উপলব্ধি করা যায়।

কুরআন মজীদের আরেকটি সূরাতে (১৭ ঃ ৬০) এই ভ্রমণটির উত্তর পর্বের বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহার সংশ্লিষ্ট অংশ নিম্নরূপ ঃ

وَاِذْ قُلْنَا لَكَ اِنَّ رَبَّكَ اَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِىْ اَرَيْنٰكَ اِلاَّ فِتْنَةً لِّلنَّاسِ .

"আর যখন আমি তোমাকে বলিলাম, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক লোকদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। আর কুরআনে বর্ণিত অভিশপ্ত বৃক্ষ তোমাকে প্রত্যক্ষ করাইয়াছিলাম, উহাকে আমি মানবমণ্ডলীর নিমিত্ত পরীক্ষার কারণ বানাইয়া রাখিয়াছি ......" (১৭ ঃ ৬০)।

এই আয়াতে ঘটনাটির পরিণাম ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি মি'রাজের ঘটনা প্রকাশ করিলে অনেকেই তাহা অবিশ্বাস করে। এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সান্ত্বনা দেওয়া হইয়াছে, এবং সন্দেহবাদীদের ধারণাকে খণ্ডন করিয়া বলা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'আলা সকল লোকের বিষয়ে খুব ভালোমতোই অবহিত আছেন। তাঁহার পরিকল্পনা এই যে, প্রদর্শিত 'নিদর্শনাদি'-কে সাধারণ মানুষের জন্য একটি "পরীক্ষা" ও "নিরীক্ষার" ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করা হইবে।[১] কুরআন মাজীদের ১৭ ঃ ১ আয়াতেও উহা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে ঃ "নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) সবকিছু দেখেন, সবকিছু শুনেন," অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা ইসরা ও মি'রাজের ঘটনাকে কিভাবে গ্রহণ করে আল্লাহ তাহা দেখিয়া লইবেন।

ইহা সহজেই অনুমেয় যে, কুরআন মাজীদে এই ঘটনার যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা যদিও অতি নির্ভুল ও ইতিবাচক, তথাপি তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। এই বিষয়ের উপর বিস্তারিত বিবরণীসম্বলিত গ্রন্থপঞ্জী রহিয়াছে। এইগুলি সাহাবীদের বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। তাঁহারা নিজেরা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হইতে শুনিয়াছিলেন।[২] এই বিষয়ের উপর যেসব সাহাবী আলোকপাত করিয়াছেন, অধিকাংশই একে অপর হইতে স্বতন্ত্রভাবে, তাঁহাদের সংখ্যা বিশজনের কম হইবে না। তাঁহাদের মধ্যে রহিয়াছেন, 'উম্মু হানী', 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস[৩], আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ,[৪] আনাস ইব্ন মালিক,[৫] আবূ হুরায়রা,[৬] আবূ যার,[৭] জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ,[৮] মালিক ইব্ন সা'সা'আহ্[৯], হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান,[১০] উবায়্যি ইব্ন কা'ব[১১] এবং আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)।[১২]

বিস্তারিত বিবরণের ক্ষেত্রে অবশ্য বর্ণনাগুলির পার্থক্য রহিয়াছে, কিন্তু অত্যাবশ্যকীয় ক্ষেত্রে সাধারণভাবে সেগুলির মধ্যে ঐকমত্য রহিয়াছে। বর্ণনাসমূহের সারমর্ম এই যে, এক রাত্রিতে ফেরেশতা জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন এবং তাঁহাকে কা'বা প্রাঙ্গণ হইতে বায়তুল মাকদিসে লইয়া যান। তাঁহাকে বুরাক নামক এক আশ্চর্যজনক প্রাণীর আরোহী করা হয় যাহা বিদ্যুৎবেগে ভ্রমণ করে। সেখানে পথিমধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বায়তুল মাকদিসে স্বাগত অভিবাদন জানানোর জন্য হযরত ইবরাহীম, মূসা ও 'ঈসা (আ) প্রমুখ পূর্ববর্তী নবীদের উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা পূর্বেই রাখা হয় এবং তাঁহারা সেমতে কার্য করেন। তারপর তিনি সেখানে

উক্ত নবীগণসহ সালাত আদায় করেন যাহাতে তিনি ছিলেন ইমাম। অতঃপর জিবরীল (আ) তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সপ্তাকাশে আরোহণ করেন। প্রথম আকাশে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান এবং তাঁহার নবুওয়াতপ্রাপ্তির বিষয় পরিসমর্থন করেন আদম (আ) যাঁহাকে এই কাজের জন্য সেখানে রাখা হইয়াছিল।

অনুরূপভাবে তাঁহাকে স্বাগত অভিবাদন জানান দ্বিতীয় আসমানে ইয়াহ্ইয়া ও ঈসা (আ), তৃতীয় আসমানে য়ূসুফ (আ), চতুর্থ আসমানে ইদরীস (আ), পঞ্চম আসমানে হারূন (আ), ষষ্ঠ আসমানে মূসা (আ) এবং সপ্তম আসমানে ইবরাহীম (আ)। অতঃপর তাঁহাকে আরও উচ্চতায় অত্যুজ্জ্বল আলোকাচ্ছাদিত সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আরোহণ করানো হয়। ইহার পর তাঁহাকে আল্লাহ্ তা'আলার কতিপয় মহোত্তম ও সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর নিদর্শন দেখানো হয় যাহার মধ্যে ছিল জিবরীলের আসল অবয়ব এবং আল-বায়তুল মা'মূর যেখানে প্রতিদিন সত্তর হাজার ফেরেশতার একটি নূতন দল প্রার্থনার জন্য প্রবেশ করেন। সেখানে তিনি আল্লাহ্ তা'আলার নিকট হইতে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রাপ্ত হন ঃ (ক) প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার নির্দেশ, (খ) সূরা আল-বাকারা-এর শেষ আয়াতদ্বয় এবং (গ) এই মর্মে একটি নিশ্চয়তা যে, তাঁহার সকল উম্মত (উম্মাহ) বেহেশত লাভ করিবেন যদি তাহারা শিরক (আল্লাহ্র সহিত অংশীদার স্থাপন)-জনিত পাপ না করেন বা বড় ধরনের কোন গুনাহ (কবীরা গুনাহ) না করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বেহেশত এবং দোযখও দেখানো হয়।

ব্যভিচারী, সূদখোর ও ইয়াতীমের সম্পদ গ্রাসকারীদের ন্যায় মহাপাপী দোযখীদের শাস্তি কিরূপ হইবে সেই নমুনাও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করানো হয়। অতঃপর জিবরীল (আ) তাঁহাকে একই পথে ফিরাইয়া আনেন। তিনি পুনরায় বায়তুল মাকদিস পরিদর্শন করেন এবং তথা হইতে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার প্রত্যাগমন পথে তিনি একটি বাণিজ্য কাফেলা প্রত্যক্ষ করেন যাহারা তাহাদের একটি পশু হারাইয়া ফেলিয়াছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদিগকে ঐ হৃত পশুটির সন্ধান দান করেন। এই সকল ঘটনা ঐ রাতেই সম্পন্ন হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রভাত হইবার পূর্বেই মক্কাতে তাঁহার স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করেন।

কথিত আছে যে, চাচাত বোন উম্মু হানী' (রা) তাঁহার নিকট হইতে এই ঘটনা শোনার পর তাঁহার অভিজ্ঞতা লোকসমক্ষে প্রকাশ না করার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দেন। কারণ উম্মু হানী নিশ্চিত ছিলেন যে, ইহাতে লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবিশ্বাস ও উপহাস করিবে।[১৩] রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেও ভালভাবে জানিতেন যে, ঘটনা এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক।[১৪] তথাপি তিনি সত্য প্রকাশে দৃঢ়সকল্প ছিলেন। সেমতে সকালে তিনি কা'বা প্রাঙ্গণে যান এবং তাঁহার অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। পূর্বের মতই অবিশ্বাস ও উপহাসের নেতৃত্বে ছিল আবূ জাহল। সে কুরায়শদিগকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চতুর্দিকে সমবেত করিয়া ঘটনাটি তাহাদের সম্মুখে আবার বর্ণনা করিবার জন্য তাঁহাকে বলে। তিনি তাহাই করেন। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা অবিশ্বাসে ফাটিয়া পড়ে

এবং উপহাসে মাতোয়ারা হয়। কেহ কেহ বিস্ময়ে হতবাক হইয়া যায়। এমনকি কতিপয় মুসলমানও এই কাহিনী অবিশ্বাস করিয়া তাহাদের পূর্বতন অবস্থায় ফিরিয়া যায়। আবূ জাহল এবং তাহার লোকেরা ধারণা করে, ঘটনাটি এতই অসম্ভব যে, উহা এমনকি আবূ বকর (রা)-এর বিশ্বাসের ভিতও নড়াইয়া দিবে।

সুতরাং তাহাদের কয়েকজন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট ঘটনাটি বলিল এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি এই অদ্ভুত কাহিনীটি বিশ্বাস করেন কিনা। কিন্তু আশাপূর্ণ না হওয়ায় তাহারা হতাশ ও দুঃখিত হয়। আবূ বকর (রা) তাহাদিগকে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহা বলিয়া থাকিলে অবশ্যই ইহা সত্য হইবে। তিনি আরও বলেন, তিনি তাঁহার নিকট হইতে ইহার চেয়ে আরও অনেক বেশী অভূতপূর্ব জিনিসে বিশ্বাস করেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক প্রতিদিন আসমানী প্রত্যাদেশ প্রাপ্তি ও তাহা লোকদের নিকট পৌঁছানোর সত্য ঘটনা উল্লেখ করেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট যান এবং জিজ্ঞাসা করেন, লোকেরা তাঁহার বিষয়ে যাহা বলিতেছে তাহা সত্য কিনা। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইহাতে (ইতিবাচক) জবাব দিলেন। আবূ বকর (রা) তাৎক্ষণিকভাবে আস্থা স্থাপন করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে আস-সিদ্দীক (পরম সত্যবাদী) উপাধিতে আখ্যায়িত করেন এবং তাহার পর হইতে তাঁহাকে এই সম্মানজনক উপাধি সহকারে স্মরণ করা হয়।

কাফিররা অবশ্য বিষয়টির এখানেই ক্ষান্ত দেয় নাই। তাহারা বলে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি সত্যই সেখানে গমন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি বায়তুল মাকদিসের একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিবেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদিগকে বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান করিতে শুরু করিলে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার চোখের সম্মুখে বায়তুল মাকদিসকে এমনভাবে দৃশ্যমান করেন যে, তিনি উহার সঠিক বিবরণ উপস্থাপনে সক্ষম হন।[১৫] চ্যালেঞ্জ দানকারীরা স্তব্ধ হয়, যদিও তখন পর্যন্ত তাহারা ইসলাম গ্রহণ হইতে বিরত থাকে।

এই স্মরণীয় ঘটনার সঠিক দিন-তারিখ বিষয়ে গ্রহণযোগ্য সূত্রগুলির মধ্যে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রচার মিশন শুরুর প্রথম দিকে ঘটিয়াছিল, তবে অধিকাংশ বর্ণনাকারীর মতে ঘটনাটি তাঁহার মদীনাতে হিজরতের ছয় মাস হইতে দুই বৎসর পূর্বে ঘটিয়া থাকিবে।

সূরাতুল ইসরা-এর বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাসমূহের অভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য-প্রমাণাদি হইতে নির্ভুলভাবে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, এই অলৌকিক ঘটনা মক্কায় দাওয়াতী মিশনের শেষের দিকে ঘটিয়া থাকিবে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, দিনে পাঁচবার সালাত আদায়ের নির্দেশ অবশ্যই মি'রাজের সময় প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং যেহেতু খাদীজা (রা)-এর জীবদ্দশায় উক্ত সালাত আদায় করা হয় নাই এবং সেহেতু তিনি মিশনের দশম বর্ষের শেষদিকে ইন্তিকাল করেন, সেহেতু

ঐরূপ করার এবং সেক্ষেত্রে মি'রাজ অবশ্যই তাঁহার (খাদীজার) ইন্তিকালের পরে ঘটিয়া থাকিবে। এইরূপ বিবেচনা হইতে সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, ইসরা ও মি'রাজ প্রথম 'আকাবা (মিশনের দ্বাদশ বর্ষ)-এর স্বল্পকাল পূর্বে বা পরে হইয়া থাকিবে। আর সাধারণভাবে গৃহীত সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তারিখ ২৭ রজবের রাত্রিতে এই নৈশ সফর সংঘটিত হইয়াছিল।

দুই ঃ তাৎপর্য ও গুরুত্ব

প্রকৃতপক্ষে ইসরা ও মি'রাজ ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আল্লাহ প্রদত্ত আর একটি বিশেষ আনুকূল্য এবং তাইফ ভ্রমণের পর তাঁহাকে প্রদেয় চূড়ান্ত সাফল্যের আরেকটি ইঙ্গিত হিসাবেও ইহাকে বিবেচনা করা হয়। এই সমস্ত উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিতসমূহের মধ্যে প্রথমটি হইতেছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিপীড়নকারীদের বিষয়ে তাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করার জন্য পর্বতমালার দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতাকে তাঁহার আজ্ঞাবহ হিসাবে নিয়োগ দান।[১৭]

দ্বিতীয়টি হইতেছে ,একদল জ্বিন কর্তৃক পবিত্র কুরআন মাক্কীদের তিলাওয়াত শ্রবণ এবং তাহাদের ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ।[১৮] তৃতীয় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিতটি হইতেছে ইসরা'ও মি'রাজ।

এই সমস্ত উৎসাহব্যঞ্জক নযীর এবং অগ্রগতির প্রেক্ষিতে ঘটনাটির তাৎপর্য প্রাঞ্জলভাবে প্রতিপাদিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দাওয়াতী মিশন এবং সংগ্রাম এক্ষণে এক বিষম ও চূড়ান্ত পর্যায়ের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে যাহার সাফল্য তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। কাজেই সম্মুখের বৃহৎ কাজের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বিশেষভাবে তৈরী করার মানসে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার (মহানবীর) বিশ্বাসকে আরও মজবুত করিয়া দেন এবং তাঁহার (আল্লাহর) কতিপয় মহোত্তম নিদর্শন তাঁহার (রাসূলের) সমক্ষে উন্মোচিত করিয়া দেন। এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনা হইতে তাঁহার জন্য অপেক্ষমাণ সুনিশ্চিত বিজয়ের সংখ্যাতিরিক্ত আভাস পাওয়া যায়। নবীগণের জীবনের চরম সন্ধিক্ষণে এইরূপ বিশেষ অনুগ্রহ তাঁহারা পাইয়া থাকেন। কারণ ইহাই আল্লাহ তা'আলার অনুসৃত রীতি, সুন্নাতুল্লাহ। এইভাবে ইবরাহীম (আ)-কে দেখান হইয়াছিল ঃ

وَكَذٰلِكَ نُرِيْ اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلِيَكُوْنَ مِنَ الْمُوْقِنِيْنَ .

"এইভাবে আমি ইবরাহীমকে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী পরিচালনা ব্যবস্থা দেখাই আর যাহাতে সে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়" (৬ ঃ ৭৫)।

"আসমান ও যমীনের রাজ্যসমূহ (গুপ্ত রহস্য) যাহাতে তিনি নিঃসন্দেহবাদীদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব হিসাবে পরিগণিত হইতে পারেন।"[১৭]

অনুরূপভাবে মূসা (আ)-কে আল্লাহ্ তা'আলার কর্তৃক কতিপয় মহোত্তম নিদর্শন প্রদর্শন করা হয়।[১৮]

لِنُرِيَكَ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى ٠

"ইহা এইজন্য যে, আমি তোমাকে দেখাইব আমার মহান নিদর্শনগুলির কিছু" (২০ ঃ ২৩)।

ইসরা বা মি'রাজের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ধর্মবিশ্বাস দুর্বল বা অসম্পূর্ণ ছিল বলিয়া ধারণা করা কিছুতেই সঠিক হইবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধর্মবিশ্বাস পূর্ণাঙ্গ ও দৃঢ় ছিল। কিন্তু এই সমস্ত অলৌকিক ঘটনার পরে তাঁহার বিশ্বাস আরও ঘনীভূত হয় অর্থাৎ বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রাপ্ত ওহীর আলোকে ইতোপূর্বে তিনি শুধু বিশ্বাস ও ঘোষণা করিতে পারিতেন যে, সাতটি আসমানের অস্তিত্ব রহিয়াছে; কিন্তু এখন তিনি নিজের চোখে ঐ বাস্তবতা প্রত্যক্ষ করেন। ইতোপূর্বে তিনি ফেরেশতাগণের কথা বলিতেন আর এখন তিনি তাহাদিগকে চাক্ষুষ দেখেন এবং তাহাদের কার্যপরিধি প্রত্যক্ষ করেন। ইহার পূর্বে তিনি বেহেশত ও দোযখের কথা বলিতেন এবং মৃতদের পুনরুত্থান, পুরস্কার ও শাস্তির কথা উল্লেখ করিতেন। এখন তিনি এই সকল সত্য ঘটনার কিছু নমুনা প্রত্যক্ষ করেন।

নিঃসন্দেহবাদ এবং বাস্তব জ্ঞান যাহা তাঁহার মধ্যে এইভাবে সংস্থাপিত হয় তাহার প্রভাবে তিনি পৃথিবীর সকল ঝুট-ঝামেলা, শত্রুপক্ষের শত্রুতা এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপকে অকুতোভয়ে ও দ্বিধাহীন চিত্তে মুকাবিলা করেন। এই নিঃসন্দেহবাদ এবং জ্ঞান তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত সংযুক্ত হওয়ার কারণে তিনি তাঁহার চাচাত বোন 'উম্ম হানী'-এর সস্নেহ উপদেশ এবং সত্য ঘটনা বলার পরিপ্রেক্ষিতে সহসা কি ঘটিতে পারে সে বিষয়ে তিনি নিজে অবহিত থাকা সত্ত্বেও নির্ভয়ে ও মুক্তকণ্ঠে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত বিরল অভিজ্ঞতার কথা ঘোষণা করিতে সাহসী হন।

অবস্থাটি প্রণিধানযোগ্য। তাঁহার নিজের গোষ্ঠী কর্তৃক তিনি এক প্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। তিনি পার্শ্ববর্তী তাইফ নগরী হইতেও বিতাড়িত হইয়াছিলেন এবং শুধু একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের (মুত'ইম ইব্ন 'আদী) নিরাপত্তা দানের কারণে, যিনি ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাকে সেবা ও সুরক্ষা দান করেন, ঐরূপ অবস্থায় সাধারণত কোন ব্যক্তিই তাহার এমন কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করিবার ঝুঁকি গ্রহণ করিতেন না যাহা সমস্যাকে নিশ্চিতভাবে আরও বাড়াইয়া দিতে পারে এবং উহার ফলে শত্রুপক্ষের অবিশ্বাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের মাত্রাও বাড়িয়া যাইতে পারে। ইহা ছাড়া সময়ের ঐ ক্রান্তিলগ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক দৃশ্যত অদ্ভুত ও অবাস্তব ঐরূপ একটি কাহিনী রচনা এবং তাহা প্রচার করার আবশ্যকতা ছিল না। ইহা আরও সত্য এই কারণে যে, ইহাতে তাঁহার সম্প্রদায়ের বৈরিতা হ্রাসের বা ইসলামে আরও লোকের দীক্ষা গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না।

এতদ্‌সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেন। কারণ তাঁহার দর্শন, শিক্ষা ও বিশ্বাস ছিল অসাধারণ। তাঁহার অর্জিত অভিজ্ঞতাকে গোপন রাখা বা অস্বীকার করার অর্থ ছিল তাঁহার নিজের অস্তিত্ব ও মিশনকে অস্বীকার করা এবং গোপন রাখা। এই নিঃসন্দেহবাদ এবং দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাকে পথ চলার শক্তি যোগায়। শত্রুর হাতে ধরা পড়া এবং নিহত হওয়ার নিশ্চিত আশংকার মুখেও তিনি আবূ বকর (রা)-কে বলিতে পারেন, "ভয় পাইও না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"। এই বিশ্বাস ও নিঃসন্দেহবাদ তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুসরণকারীদিগকে সকল প্রতিকূলতা ও বিপদসঙ্কুল অবস্থা সাহসিকতার সহিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য মুকাবিলা করিবার প্রেরণা যোগায়।

এই বর্ণনার মধ্য দিয়া আমরা ইসরা ও মি'রাজের দ্বিতীয় তাৎপর্যে উপনীত হই। এই বিষয়ে পবিত্র কুরআন মাজীদে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, এই ঘটনা দ্বারা মানুষের বিশ্বাস ও মনোভাবকে পরীক্ষা করা হয়। মুসলমানদের ক্ষেত্রে ইহা ছিল তাহাদের বিশ্বাস এবং মহান আল্লাহর রাসূলের প্রতি তাহাদের আনুগত্যের এক পরীক্ষা। আবূ বক্‌র (রা) তাৎক্ষণিকভাবে এবং অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, তৎসহ অন্যান্য মুসলমানগণও যথাসময়ে ইহাতে উত্তীর্ণ হন। মি'রাজ-এর কাহিনী শুনিয়া কতিপয় মুসলমান তাহাদের বিশ্বাস পরিত্যাগ করে বলিয়া যে বর্ণনা রহিয়াছে তাহা প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তিগণকে জানা বা চেনার জন্য প্রয়োজন ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশন এবং সংগ্রাম একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইয়াছিল যাহার জন্য তাঁহার অনুসারীদের তরফ হইতে সর্বোচ্চ ত্যাগস্বীকারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সুতরাং মহান আল্লাহ ইচ্ছা করেন যে, এই সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চতুর্পার্শ্বে শুধু সেই দৃঢ়চেতা ঈমানদারগণই থাকিবেন যাহারা তাহাদের প্রশ্নাতীত বিশ্বাস এবং অক্ষয় ভক্তি ও আনুগত্যের জন্য ইতোমধ্যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে যে সমস্ত "সাহাবী মহানবী ﷺ-এর সঙ্গকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের ঘর-বাড়ী, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পদ ও পার্থিব বিষয়-আশয় এবং সর্বোপরি তাঁহাদের জানমাল ইসলামী উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে উৎসর্গ করার" চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এইরূপ উন্নত চরিত্র ও বিশ্বাস মহান আল্লাহর মেহেরবাণীতে তাহাদিগকে বিজয়ের পথ দেখায় যাহা বদর যুদ্ধের মাধ্যমে সূচিত হয়।

ইসরা এবং মি'রাজের তৃতীয় ও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য এই যে, ইহার একটি প্রতীকি মর্যাদা রহিয়াছে। উহা একবার ঘটিয়াছে এবং উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা সকল মুসলমানের জন্য অত্যাবশক। ঘটনাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নবী ও রাসূলগণের অন্তর্ভুক্ত শেষ নবী ও তাঁহাদের নেতা ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে সমগ্র মানবজাতির পথপ্রদর্শক হিসাবে নিয়োগ দান করিয়া পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

মি'রাজের আরেকটি তাৎপর্য এই যে, তাঁহার উপর কুরআন মাজীদের যে বাণী নাযিল হয় তাহা ছিল পূর্বে প্রেরিত নবীগণের উপর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহের ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ মহাগ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত, বায়তুল মাকদিস হইতে তাঁহার মহাজগতিক নৈশ-ভ্রমণ সূচিত

হওয়াতে বুঝা যায় যে, কা'বা-এর ন্যায় বায়তুল মাকদিসও একটি অতি পবিত্র "বরকতময়" (بَارَكْنَا حَوْلَهُ) স্থান এবং উহা ঈমানদার ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণের আরেকটি কেন্দ্রবিন্দুও বটে। স্থানটির এইরূপ গুরুত্ব ও মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে একটি বাস্তব রূপ লাভ করে যখন স্বল্পকালের জন্য উহাকে কিবলা (প্রার্থনার দিক) নির্ধারণ করা হয়।[১৯]

তিন ঃ আল-ইসরা ও আল-মি'রাজের প্রকৃতি

ইসরা এবং মি'রাজ ছিল একটি অলৌকিক ঘটনা যাহা কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য একটি বিরল মু'জিযা। তিনি ছাড়া আর কেহ ইহা অবলোকন করেন নাই। অবশ্য অন্য কাহারও পক্ষে এরূপ অবলোকন বা অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভবও ছিল না। অলৌকিক ঘটনাটির এই অনন্য সাধারণ ব্যক্তিগত প্রকৃতির কারণে ইহার প্রকৃতি বিষয়ে পরবর্তীতে নানারূপ মতবাদের উদয় হয়। ইহার মধ্যে প্রধানত দুইটি দৃষ্টিভঙ্গি কালক্রমে প্রতিষ্ঠা ও বিকাশ লাভ করে। উহার একটি মতবাদ অনুসারে ইহা স্বপ্নে ঘটিয়াছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন ঘুমাইতেছিলেন। অপরপক্ষে অন্য মতবাদ অনুসারে, ইহা আধ্যাত্মিকভাবে ঘটিয়াছিল অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর "আত্মা" বা রূহ ভ্রমণ করিয়াছিল, তাঁহার শরীর মোবারক এই ভ্রমণে শরীক হয় নাই। উভয় মতবাদের সমর্থনে যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হয় তাহা এখানে পর্যালোচনা করা হইবে।

এই প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে উল্লেখ করা বাঞ্ছনীয় যে, উভয় মতবাদ এইরূপ প্রাথমিক ধারণা সম্ভূত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষে শারীরিকভাবে ঈদৃশ একটি কর্মসম্পাদন অসম্ভব বা অবাস্তব। ঐ ধরনের অনুভূতি অবিশ্বাসের নিকটবর্তী। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন নাই যে, তিনি ইহা করিয়াছেন। তিনি বলেন, এবং পবিত্র কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ্ ইহা ফরমাইয়াছেন। যেমন একদা কোন এক রজনীতে আল্লাহ তা'আলা তাঁহার ভৃত্যকে তাঁহার নিকট আনয়ন করেন। অতএব বিষয়টিতে সম্ভব ও অসম্ভবের কোন প্রশ্নই আসে না। সম্ভব ও অসম্ভব এবং যেরূপ মওলানা মাওদূদী উল্লেখ করিয়াছেন, সময় ও মহাশূন্যের সীমাবদ্ধতা কেবল মানুষের বেলায়ই প্রযোজ্য, আল্লাহ তা'য়ালা উহার উর্ধ্বে।[২০] কোন নির্দিষ্ট একটি ঘটনা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষে ঘটানো অসম্ভব—এরূপ মনে করা অবিশ্বাসী বা কাফির হওয়ার নামান্তর।

"স্বপ্ন তত্ত্ব"-টি এই বিষয়ে রচিত কতিপয় প্রতিবেদনের বর্ণনার উপর সংস্থাপিত। এক্ষেত্রে সমধিক উল্লেখযোগ্য বর্ণনাটি মু'আবিয়া ইব্ন 'আবী সুফ্য়ান (রা)-কৃত এবং ইব্ন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।[২১] কথিত আছে যে, যখন ইসরা এবং মি'রাজ সম্পর্কে জানিতে চাওয়া হয় তখন মু'আবিয়া (রা) বলেন, ইহা ছিল একটি "বাস্তব স্বপ্ন" যাহা আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখাইয়াছিলেন (كَانَتْ رُؤْيَا صَادِقَةً مِنَ اللهِ)। ইহার সমর্থনে কুরআন মাজীদের ১৭ ঃ ৬০ নং আয়াতটিও উল্লেখ করা হয়, সেখানে এই ঘটনা উপস্থাপনে রু'য়া (رُؤْيَا) শব্দটি ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বপ্ন তত্ত্বের প্রবক্তাগণ এখানে রু'য়া শব্দটিকে স্বপ্ন বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন।

অনুরূপভাবে "আত্মাতত্ত্ব" উদ্ভূত হইয়াছে 'আইশা (রা) কথিত একটি বক্তব্য হইতে যাহার বর্ণনাকারী হইতেছেন ইব্‌ন ইসহাক।[২২] শেষোক্ত বর্ণনাকারী বলেন যে, আল-বকর (র)-এর পরিবারের এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলেন যে, আইশা (রা) উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শরীর মুবারক বাহিরে নেওয়া হয় নাই, শুধুমাত্র তাঁহার রূহ-কে 'ইসরা' এবং মি'রাজের উদ্দেশ্যে উর্ধ্বে উঠানো হয়। ইব্‌ন ইসহাক নিজে স্বপ্ন ও আত্মা তত্ত্বকে সমর্থন করিয়াছেন, অবশ্য খুব একটা প্রাসঙ্গিকভাবে নয়। তিনি বলেন, যেহেতু একজন রাসূল কর্তৃক স্বপ্নে প্রাপ্ত ওহী তাঁহার জাগ্রত থাকাকালে উহা প্রাপ্ত হওয়ার সমকক্ষ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু বলেন যে, তাঁহার চক্ষু ঘুমাইলেও তাঁহার আত্মা (ক'লব) ঘুমায় না, সেহেতু 'ইসরা' ও মি'রাজ তাঁহার নিদ্রা বা জাগরণে যেভাবে ঘটুক না কেন, উহার তাৎপর্য ও গুরুত্ব উভয়ই সমান। যে অবয়বেই ইহা ঘটুক না কেন, তাহা সঠিক এবং সত্য।[২৩]

এইভাবে ইব্‌ন ইসহাক তাহার সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির সহিত সঙ্গতি রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আত্মা তত্ত্বের বিষয়ে বলা যায় যে, তৎকালে মুসলমানদের মধ্যে সঞ্চারিত সূফীবাদ অধ্যাত্মবাদের উপজাত হিসাবে উহা প্রচারিত হইয়া থাকিবে। কেহ কেহ ইব্‌ন ইসহাকের চেয়ে আরও জ্ঞানগর্ভ মতবাদ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং উভয় মতবাদের সমন্বয় সাধনাকল্পে বলেন যে, কা'বা হইতে বায়তুল মাকদিস পর্যন্ত ইসরা শারীরিকভাবে (বি-জাসাদিহী), কিন্তু শেষোক্ত স্থান হইতে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত মি'রাজ আধ্যাত্মিকভাবে (বি-রূহিহী) হইয়া থাকিবে।[২৪]

এই সকল দৃষ্টিভঙ্গীর সবগুলিই ভ্রান্ত এবং অগ্রহণযোগ্য। কারণ সেগুলি কুরআন মাজীদের সুস্পষ্ট ভাষ্য ও অন্তর্নিহিত অর্থ এবং নির্ভরযোগ্য সূত্রসমূহের পরিপন্থী। আত-তাবারী অত্যন্ত গ্রহণযোগ্যভাবে স্বপ্ন ও আত্মা তত্ত্বের প্রতিবাদ উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁহার বর্ণনার সমর্থনে বিভিন্ন উপাত্ত পেশ করিয়া বলেন যে, নিম্নবর্ণিত কারণে স্বপ্ন ও আত্মা তত্ত্বদ্বয় ভ্রান্ত।

(এক) তত্ত্বগুলি কুরআন মাজীদের পরিষ্কার মূল পাঠের পরিপন্থী। যদি ইহা স্বপ্নে বা আত্মিকভাবে ঘটিত, তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা এক্ষত্রে اسرى بعبده বলিতেন না; বরং উহার পরিবর্তে তিনি কতিপয় অভিব্যক্তি যেমন 'আসরা বিরূহিহী' বা 'আসরা ফী মানামিহী' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে বা আত্মিকভাবে ভ্রমণ করানো হইয়াছে, ইত্যাদি ব্যবহার করিতেন। কুরআন মাজীদের সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের প্রত্যক্ষ অর্থ হইতে বিচ্যুত হওয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। তাহা ছাড়া উহার সরাসরি অর্থের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন ব্যাখ্যা উহাতে সংযুক্ত করাও সমীচিন নহে।

(দুই) ইসরা ও মি'রাজ কোন আত্মিক বা স্বপ্নাদিষ্ট' বিষয় হইলে ইহাকে নবুওয়াতের কোন প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করা যায় না। আর সেক্ষেত্রে কাফিরগণ কর্তৃক তাঁহাকে যে অবিশ্বাস ও

বিদ্রূপের বর্ণনা আমরা পাই, তাহার কোন অবকাশ থাকিত না। কারণ যে কেহ স্বপ্নে যে কোনরূপ অদ্ভূত স্বপ্ন দেখিতে পারে।

(তিন) মি'রাজের কাহিনীতে বুরাক. এবং অন্যান্য জিনিসের বর্ণনা হইতে আমরা তাঁহার সশরীরে ভ্রমণের ইঙ্গিতই পাই; উহা কোন ক্রমেই রূহ-এর সফর ছিল না।[২৫]

(চার) ইব্ন আব্বাস (রা) যেমন উল্লেখ করেন,[২৬] কুরআন মাজীদের ১৭ ঃ ৬০ নম্বর আয়াতে বর্ণিত রু'য়া-এর অর্থ দাঁড়ায় 'ব্যক্তির নিজ চক্ষে দেখা'। ইহার সমর্থনে আরও উল্লেখ্য, আয়াতটির শেষ অংশে বলা হইয়াছে যে, অত্র রু'য়া-কে মানবমণ্ডলীর জন্য একটি পরীক্ষা (ফিতনা) হিসাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে।

অতএব আয়াতটির অন্তর্নিহিত অর্থ অবশ্যই শারীরিকভাবে অবলোকন করা হইবে, অন্যথায় ইহাকে কাহারও পরীক্ষার ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে না। সুতরাং আত-তাবারী গুরুত্ব সহকারে বলেন যে, কুরআন মাজীদের ১৭ ঃ ৬০ নম্বর আয়াতটিকে উক্ত সূরার প্রথম আয়াতের সমন্বয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত যেখানে 'ইসরা'-র কথা বলা হইয়াছে; এবং উভয় স্থানে যে অভিজ্ঞতার কথা বলা হইয়াছে তাহা শারীরিকভাবে অর্জিত অভিজ্ঞতা নির্দেশ করে।[২৭]

এখানে উল্লেখ যে, আইশা (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীছের সনদ অজ্ঞাত (মাজহূল) এবং এইরূপ ত্রুটিমুক্ত ইসনাদের উপর ভিত্তি করিয়া নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে, তিনি ঐরূপ অভিব্যক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন। সে যাহাই হউক না কেন এই বর্ণনা এবং মুআবিয়া (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত বক্তব্য উভয়ই কুরআন মজীদের সহজ-সরল অর্থের পরিপন্থী এবং ঐ আসমানী গ্রন্থের উপর তাঁহাদের কথিত বক্তব্যের কোন বৈধতা নাই। প্রকৃত সত্য এই যে, 'ইসরা' ও 'মি'রাজ' শারীরিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর জাগ্রত অবস্থায় ঘটিয়াছিল। ইহা কোন স্বপ্ন বা আত্মিক অভিজ্ঞতা নহে। আত-তাবারী কর্তৃক এইভাবে বর্ণিত যুক্তিগুলি সুচিন্তিত ও সঠিক, যাহা পরবর্তী কালের পণ্ডিত ও ভাষ্যকারগণ কর্তৃক বিভিন্নভাবে পরিসমর্থিত হইয়াছে।[২৮]

চার ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কি আল্লাহকে দেখিয়াছিলেন?

সর্বশেষ, কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ নহে যে বিষয়টি, তাহা হইতেছে মি'রাজে রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন কিনা সেই প্রশ্নটি। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবন এবং ইসলামের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রশ্নের ন্যায় এই প্রশ্নটি সম্পর্কেও কুরআন মাজীদে সুনিশ্চিত ও সঠিক সাক্ষ্য-প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। সূরা আল-ইসরা (১৭)-এর প্রথম আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁহার কতিপয় মহৎ নিদর্শন তাঁহার রাসূলকে দেখানোর জন্য তাঁহাকে রাত্রিকালে ভ্রমণ করান। (لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا الْكُبْرٰى) কুরআন মাজীদে এই ঘটনার আরেকটি রেফারেন্স সম্বলিত সূরা আন-নাজ্‌ম (৫৩)-এর ১৮ নং আয়াতে অনুরূপ লক্ষণীয়ভাবে

উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ "তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁহার প্রভুর কতিপয় মহোত্তম নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন" (لَقَدْ رَاى مِنْ ايت رَبِّه الْكُبْرى)। উক্ত সূরাতে এই আয়াতের পূর্বে উল্লেখ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা উর্ধ্ব গগনে জিবরীলকে নিজ আকৃতিতে প্রত্যক্ষ করেন এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয়বার তাঁহাকে দেখিতে পান সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে যাহা ঐ সময় আবৃত ছিল "যাহা দ্বারা উহা ঢাকা হয় তদ্বারা"।[২৯]

এইভাবে কুরআন মাজীদের সংশ্লিষ্ট উভয় অনুচ্ছেদেই সমান গুরুত্বের সহিত উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁহার প্রভুর কতিপয় মহান নিদর্শন অবলোকন করানো হয়, যাহার মধ্যে ছিল ফেরেশতা জিবরীলকে তাঁহার পরিপূর্ণ অবয়বে দর্শন। বাস্তবিকপক্ষে তিনি আল্লাহ তা'আলা দর্শন লাভ করিলে এইরূপ একটি বিশেষ ঘটনা লক্ষ্যণযোগ্যভাবে কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হইত, যেমন উল্লেখযোগ্যভাবে করা হইয়াছে মূসা (আ)-এর সহিত মহান আল্লাহর কথোপকথনের বিষয়টি। এইভাবে কুরআন মাজীদের ভাষ্যমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মহান আল্লাহর কতিপয় মহোত্তম নিদর্শন অবলোকন করেন, যদিও তাঁহার দর্শন লাভ করেন নাই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মহান আল্লাহর দীদার (দর্শনলাভ) প্রশ্নের বিভিন্ন প্রকারের বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সমস্ত বিবরণ দুইটি সুস্পষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত। উহার এক শ্রেণীর বর্ণনা কুরআন মাজীদের তথ্য ও উহার ব্যাখ্যা ভিত্তিক। ঐগুলিতে খুব পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীল (আ)-কে তাঁহার আসল চেহারায় দেখিতে পান এবং তিনি আল্লাহ তা'আলার আরও কতিপয় নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। এ বিষয়ে আরও গুরুত্বপূর্ণ যে, বর্ণনাকারিগণ বা তাঁহাদের অধিকাংশই রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন এবং তদুত্তরে তাঁহার জবাবের অবিকল উদ্ধৃতি দেন। তাঁহাদের সনদও ত্রুটিমুক্ত।

অপরপক্ষে আর এক শ্রেণীর বর্ণনাতে কুরআন মাজীদের উপরিউক্ত সূত্রগুলির, বিশেষত সূরা আন-নাজমের ব্যাখ্যায় দেখানো হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার রবকে দেখিয়াছিলেন। যদিও এই বর্ণনাগুলির সনদ বিতর্কিত নহে, তথাপি প্রথম শ্রেণীর বর্ণনাসমূহের তুলনায় সেগুলিতে কিছু অসংলগ্নতা রহিয়াছে। (এক) সেগুলি কুরআন মাজীদের প্রত্যক্ষ তথ্যভিত্তিক নয়, উহার আওতা বহির্ভূত। (দুই) সেগুলি প্রথম দল ভিত্তিক যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত বর্ণনাগুলিকে খণ্ডনের উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছে। (তিন) দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বর্ণনার রাবীগণ বলেন নাই যে, তাঁহারা এই বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন অথবা তাঁহাদের জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে তৎপ্রদত্ত জবাবের কোন হুবহু উদ্ধৃতিও তাঁহারা দেন নাই। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে উদ্ধৃত না করার ফলে তাঁহাদের বর্ণনাগুলি সংশ্লিষ্ট রাবীগণের একান্ত নিজস্ব অভিমত বলিয়া বিবেচিত হয়। চার শেষোক্ত বর্ণনা গুচ্ছের বর্ণনাগুলি পরস্পর বিরোধী।

প্রথম শ্রেণীভুক্ত বর্ণনাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটি আইশা (রা) কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, যাহা বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। বর্ণনাটির পূর্ণাঙ্গ ভাষ্য এইরূপ ঃ মাসরূক

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহকে দেখিয়াছিলেন কিনা। তদুত্তরে তিনি বলেন যে, প্রশ্নটি শুনিয়া তাঁহার গায়ের লোম শিহরিয়া উঠিয়াছে। তারপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এইরূপ ধারণা করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে দেখিয়াছেন, সে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার বিরুদ্ধে মিথ্যাচার অপরাধে অভিযুক্ত। এই সময় মাসরূক তাঁহার নিকট হইতে কুরআন মাজীদের ৮১ ঃ ২৩ নম্বর আয়াতটির ব্যাখ্যা জানিতে চাহেন "তিনি প্রকৃতপক্ষে পরিষ্কার আকাশে তাঁহাকে দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ করেন"। (لَقَدْ رَاٰهُ بِالاُفُقِ الْمُبِيْنِ) এবং কুরআন মাজীদের ৫৩ ঃ ১৩ নম্বর আয়াতটিরও ব্যাখ্যা জানিতে চাহেন وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى "তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহার দ্বিতীয় অবয়ব প্রত্যক্ষ করেন"। তিনি বলেন, "আমি আল্লাহর রাসূলকে (আল্লাহর শান্তি ও মঙ্গল তাঁহার উপর বর্ষিত হউক) এই ঘটনার বিষয়ে জিজ্ঞাসাকারী সর্বপ্রথম ব্যক্তি। তিনি বলেন, "তিনি ছিলেন জিবরীল। এই দুইবার ব্যতীত আমি তাহাকে সৃজিত আসল চেহারায় দেখি নাই। আমি তাহাকে আকাশ হইতে অবতরণ করিতে দেখি এবং তাহার বিশাল আকৃতি আকাশ ও পাতালের সকল কিছু জুড়িয়া পরিব্যাপ্ত হয়"। তারপর তিনি মাসরূক-কে কুরআন মাজীদের ৬ ঃ ১০৩ নম্বর আয়াতটি স্মরণ করাইয়া দেন। "তিনি দৃষ্টির অধিগম্য নহেন কিন্তু দৃষ্টিশক্তি তাঁহার অধিগত। (لاَ تُدْرِكُهُ الاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الاَبْصَارَ) এই প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ৪২ ঃ ৫১ নম্বর আয়াতটিকেও পর্যালোচনা করা হয় وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلاَّ وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ... "মানুষের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য নহে যে, আল্লাহ তাহাদের সহিত কথা বলেন ওহী বা পর্দার অন্তরাল ব্যতীত........"।[৩০]

এই প্রসঙ্গে আবূ যার (রা)-এর বক্তব্যটিও সমভাবে জোরালো। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞাসা করি, হে আল্লাহর রাসূল! "আপনি কি আপনার রবকে দেখিয়াছেন?" প্রত্যুত্তরে তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) বলেন, জ্যোতি! আমি কিভাবে তাঁহাকে দেখি?"[৩১] অন্য সূত্রমতে প্রাপ্ত আর একটি ভাষ্যে বলা হইয়াছে, আবদুল্লাহ ইবন শাকীক "আবূ যার (রা)-কে বলেন, "আমি যদি আল্লাহ তা'আলার রাসূলের সাক্ষাৎ পাইতাম তাহা হইলে তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতাম"। 'আবূ যার (রা) বলেন, "কোন বিষয়ে তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করিতে?" আবদুল্লাহ ইবন শাকীক বলেন, "আমি জিজ্ঞাসা করিতাম, 'আপনি কি আপনার রবের দর্শন লাভ করিয়াছেন।" ইহার প্রেক্ষিতে আবূ যার (রা) বলেন, "আমি প্রকৃতপক্ষে তাঁহাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলেন, 'আমি জ্যোতি দেখিয়াছিলাম।"[৩২]

এইভাবে আবূ মূসা আল-আশ'আরী (রা) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদিগকে বলেন, "তাঁহার (আল্লাহর) আবরণ হইতেছে আলো। তিনি যদি ইহা উন্মোচন করেন তাহা হইলে তাঁহার চেহারা মুবারকের অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা তাঁহার সৃষ্টির যাহা কিছুর উপর আপতিত হইত সকলই পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইত।"[৩৩] ইহা ব্যতীত আবূ হুরায়রা (রা) কুরআন মাজীদের ৫৩ ঃ ১৩ নম্বর

আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জিবরীলকে প্রত্যক্ষ করেন।[৩৪] আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রা) কুরআন মাজীদের ৫৩ ঃ ৯-১০ এবং ৫৩ ঃ ১৭-১৮ সংখ্যক আয়াতসমূহের ব্যাখ্যাতেও অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।[৩৫]

অন্যান্য শ্রেণীর বর্ণনাসমূহের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস (রা)-এর বর্ণনাগুলি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এই বর্ণানগুলির একটিতে তাঁহাকে আমরা বলিতে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ "তাঁহাকে" তাঁহার হৃদয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন।[৩৬] আরেকটি ভাষ্যে তিনি বলেন যে ,রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার হৃদয় দ্বারা দুইবার তাঁহার সুদর্শন লাভ করেন।"[৩৭] এখানে লক্ষণীয় যে, ইব্‌ন 'আব্বাসের এই দুইটি বর্ণনাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর লক্ষ্যবস্তু কি ছিল সে বিষয়ে কোন কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই।[৩৮] 'ইকরিমার মাধ্যমে প্রাপ্ত এবং তিরমিযীতে বর্ণিত একটি তৃতীয় ভাষ্যে বলা হয় যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহ তা'আলাকে দেখিয়াছিলেন"।[৩৯] তিরমিযী বলেন যে, ইহা একটি ভাল কিন্তু অদ্ভুত বর্ণনা।[৪০] ইকরিমার মাধ্যমে আগত আর একটি বর্ণনায় দেখা যায় যে, ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ উল্লেখ করেন, "আমি আমার রবকে দেখিয়াছি।"[৪১]

ইহা লক্ষণীয় যে, একই ইকরিমার মাধ্যমে প্রাপ্ত দুইটি ভাষ্যের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। উহার একটির বক্তা হিসাবে ইব্‌ন 'আব্বাস এবং অন্যটির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। একই ইকরিমার মাধ্যমে প্রাপ্ত আর একটি বর্ণনাতে দেখা যায় যে, ইবন আব্বাস (রা) বলেন, "তুমি কি বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আ)-কে তাঁহার বন্ধুত্বের (خلة) দ্বারা, মূসা (আ)-কে তাঁহার কথোপকথন (كلام) দ্বারা এবং মুহাম্মাদ ﷺ -কে তাঁহার দর্শন দ্বারা মহিমান্বিত করিয়াছিলেন?[৪২] ইহা ছাড়াও ইব্‌ন 'আব্বাসের আরেকটি বক্তব্যে এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বপ্নে তাঁহার রবের দেখা পান।[৪৩] ইহা ছাড়া তাঁহার বক্তব্যের আর একটি ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা তাঁহার রবকে হৃদয় দ্বারা এবং আরেকবার তিনি তাঁহাকে চক্ষু দ্বারা দেখিতে পান।[৪৪]

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা)-এর এইরূপ বিভিন্নধর্মী বক্তব্য সত্ত্বেও বর্তমান শ্রেণীভুক্ত দুইটি বর্ণনা মনোযোগ আকর্ষণের দাবি রাখে। উহার মধ্যে একটি হইতেছে মুহাম্মাদ ইব্‌ন কা'ব আল-কুরাজী কৃত। সেখানে বর্ণিত আছে যে, কতিপয় ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি তাঁহার প্রভুকে দেখিয়াছেন কিনা? তদুত্তরে তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলাকে তিনি নিজের চোখে না দেখিলেও দুইবার তাঁহাকে হৃদয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করেন।[৪৫] এতদ্বিষয়ক অন্য বর্ণনাটি আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) কৃত। তিনি 'ইসরা' প্রসঙ্গের ব্যাখ্যায় বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় তাঁহার রবের এত নিকট সন্নিধানে পৌঁছেন যে, তাঁহাদের মধ্যে মাত্র দুই ধনুকের ব্যবধান অপেক্ষা আরও কম ছিল। এই বর্ণনাটিকে সাধারণত দুইটি পৃথক ঘটনার সংমিশ্রণ হিসাবে বিবেচনা করা

হয় যাহা সম্ভবত পরবর্তীকালীন একজন বর্ণনাকারীর বক্তব্যে তালগোল পাকাইয়া ফেলার কারণে ঘটিয়া থাকিবে।[৪৬]

এইভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বর্ণনাগুলি শুধু যে পরস্পর বিরোধী তাহাই নহে, সেগুলি কুরআন মাজীদের প্রত্যক্ষ ও পরিষ্কার ভাষ্য এবং প্রথম শ্রেণীভুক্ত অধিকতর যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনাসমূহের পরিপন্থী। সুতরাং অধিকাংশ গ্রহণযোগ্য সূত্রের পর্যালোচনান্তে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ শারীরিকভাবে এবং তাঁহার নিজের চক্ষে তাঁহার প্রভুর কতিপয় মহোত্তম নিদর্শন প্রত্যক্ষ করেন। তিনি আল্লাহ তা'আলাকে আবরণদানকারী আলোকচ্ছটা এবং জিবরীলকে স্বচক্ষে দ্বিতীয়বার অবলোকন করেন। (এই বিষয়ে সীরাত বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ডে মি'রাজ শীর্ষক নিবন্ধটিও পাঠ করা যাইতে পারে)।

অনুবাদ ঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ

তথ্যনির্দেশিকা

১. আয়াতটির উপর অধিকতর আলোচনার জন্য নিম্নে দেখুন।

২. অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা যে সমস্ত গ্রন্থ হইতে সন্নিবেশিত হইয়াছে ঃ আত্-তাবারী, তাফসীর, ১৫খ, ২-১৬; আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১০খ, ২০৫-২০৮ এবং ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৫খ, ৪-৩৯।

৩. বুখারী, নং ৩২৩৯, ৩৩৯৬, ৩৮৮৮, ৬৬১৩; মুসলিম, নং ১৬৫, ১৭৬; মুসনাদ, ১খ, ২৫৭, ৩৭৪।

৪. মুসনাদ, ১খ, ৩৭৫, ৩৮৭, ৪২২।

৫, বুখারী, নং ৩৩৭০, ৪৯৬৪, ৫৬১০, ৫৭১৭, ৬৫৮১; মুসলিম, নং ১৬৫; মুসনাদ, ৩খ, ১২০, ১২৮, ১৪৮-১৪৯, ২২৪, ৩৩১-৩৩২, ২৩০-২৪০।

৬. বুখারী, নং ৫৫৭৬; মুসনাদ, ২খ, ৩৫৩, ৩৬৩।

৭. বুখারী, নং ১৬৩৬, ৩৩৪২।

৮, বুখারী, নং ৩৮৮৬, ৪৭১০।

৯, বুখারী, নং ৩২০৭, ৩৩৯৩, ৩৪৩০, ৩৮৮৭; মুসনাদ, ৪খ, ২০৭-২১০, নাসাঈ নং ৪৪৮-৪৫১।

১০. মুসনাদ, ৫খ, ৩৮৭, ৩৯২, ৩৯৪; তায়ালিসী, নং ৪১১।

১১. মুসনাদ, ৫খ; ১৪৩-১৪৪।

১২. মুসনাদ, ৫খ, ৪১৮।

১৩. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪০২।

১৪. মুসনাদ, ১খ., ৩০৯ (আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাসের বর্ণনা)।

১৫. বুখারী, নং ৩৮৮৬।

১৬. তারিখ প্রশ্নে কিছু আলোচনার জন্য দেখুন আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১০খ, ২১০; আন-নববী, শারহু মুসলিম, ২য় অংশ, ২০৯-২১০; আশ-শাওকানী, তাফসীর, ৩খ, ২০৭-২০৮; যাদুল মা'আদ, ২খ, পৃ. ৪৯।

১৭. উপরে পৃ. ৮১০ মূল গ্রন্থ।

১৮. উপরে দ্র. পৃ. ৮১০-৮১১ মূল গ্রন্থ।

১৯. ঠিক কখন বায়তুল মাকদিসকে কিবলারূপে নির্ধারণ করা হইয়াছিল তাহা সুনিশ্চিতভাবে জানা যায় না। সাধারণভাবে ইহাকে "দুইটি কিবলার মধ্যে প্রথম" (اولى القبلتين) বলিয়া যে ধারণা করা হয় তাহা সঠিক নহে। ইবন ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ দুইটি রুকনের (কালো পাথর ও ইয়ামানী রুকনের) মধ্যবর্তী স্থানে সালাত আদায় করিতেন। এইভাবে তিনি সিরিয়া (বায়তুল মাকদিস) ও কা'বা-এর দিকে মুখ ফিরাইয়া সালাত আদায় করিতেন। বর্ণনাটিকে কিবলা বিষয়ে একটি নিষ্পত্তিমূলক অভিব্যক্তি বলা যাইতে পারে। কারণ বায়তুল মাকদিস কিছু কালের জন্য যেমন কিবলা হিসাবে নির্ধারিত ছিল, ঠিক তেমনি ইহাও সুবিদিত সত্য যে, মক্কাতে অবস্থানকালে প্রার্থনা বা আল্লাহর আনুকূল্য ভিক্ষাকালে মহানবী ﷺ কখনও কা'বার দিকে তাঁহার পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু এই ঘটনা এবং এই বর্ণনার বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্ন সত্ত্বেও সেখানে বলা হয় নাই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বদা উক্ত রুকনদ্বয়ের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সালাত আদায় করিতেন। তিনি তাঁহার মক্কী জীবনের শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত এইরূপ করিয়াছেন এমন কথাও প্রকৃতপক্ষে ঐ বর্ণনার কোথাও বলা হয় নাই। ইহার বিপরীতে আমরা কতকগুলি গ্রহণযোগ্য বর্ণনা লক্ষ্য করি যেখানে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাতে হিজরতের পূর্বে কা'বার দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করিতেন; যেমনটি তিনি করিতেন হি'জর (হাতীম)-এ প্রার্থনার সময় অথবা মাকামে ইবরাহীমে অথবা রুকন (কালো পাথর)-এর নিকটে অথবা শহরতলীতে (আল-আবতাহ) অথবা মিনাতে। উদাহরণস্বরূপ, বুখারী, নং ৩৮৫৬; মুসলিম, নং ১৭৯৪ ও ২৪৭৩; মুসনাদ, ৪খ, ৫৫; ৬খ, ৩৪৯ এবং আত-তাবারী, তারীখ, ২খ, ৩১১ (১/১১৬১-৬২)। প্রকৃতপক্ষে মদীনাতে হিজরতের প্রাক্কালে অথবা যুগপৎ হিজরত করিয়া বায়তুল মাকদিস কিবলা হিসাবে নির্ধারিত হইয়া থাকিবে। তৎপূর্বে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বাকে পিছনে রাখিয়া শুধু বায়তুল মাকদিসের দিকে ফিরিয়া সালাত আদায় করিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ একটি হৈ চৈ বাধিয়া যাইত এবং ইহা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে ঘিরিয়া কার্যকর সমালোচনার একটি বিষয় হইত এবং উহাতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক পরিচালিত সমালোচনা আরও উৎসাহিত হইত। অধিকন্তু অনাদি কালের প্রথাসিদ্ধ কা'বার গুরুত্ব ও পবিত্রতা, যাহা সূরা ফীল (১০৫)-এ পুনর্ব্যক্ত করা হইয়াছে এবং সূরা কুরায়শে (১০৬) যেখানে "আল্লাহ এই ঘরের

প্রভুকে আরাধনা"(فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هذَا الْبَيْتِ) করিতে বলা হইয়াছে, সেখানে মক্কাতে দাওয়াতী মিশনের প্রথম পর্যায়ে কা'বার পরিবর্তে বায়তুল মাকদিসকে কিবলা হিসাবে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা ও সম্ভাবনা কম। বায়তুল মাকদিসকে পরিবর্তনশীল সময়ে এক স্বল্পকালের জন্য কিবলা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। কা'বা ঘর মুসলমানদের প্রথম এবং চূড়ান্ত কিবলা হিসাবে স্বীকৃত।

২০. আবুল আ'লা মাওদূদী, সীরাতে সরওয়ারে 'আলাম, লাহোর ১৩৯৮/১৯৭৯ ২খ., পৃ. ৬৪৬।

২১. ইব্ন হিশাম, ১খ, ৪০০।

২২. ঐ, পৃ. ৩৯৯।

২৩. ঐ, পৃ. ৪০০। ইব্ন ইসহাকের বর্ণনা এইরূপ ঃ

على ایّ حالیه کان نائما او یقظان کلّ ذلك حق وصدق .

২৪. বর্ণনাটির তথ্যসূত্র আশ-শাওকানী, তাফসীর, ৩খ, ২০৭।

২৫. আত-তাবারী, তাফসারী, ১৫খ, ১৬-১৭।

২৬. ঐ লেখক, পৃ. ১১০।

২৭. আত-তাবারী, তাফসীর, ১৪ খ, ১১৩।

২৮. উদাহরণস্বরূপ দ্র. আল-কুরতুবী, তাফসীর, ১০খ, ২০৮-২০৯; ইব্ন কাছীর, তাফসীর, ৫খ, ৪০-৪১; আশ-শাওকানী, তাফসীর, ৩খ, ২০৭।

২৯. এই অনুচ্ছেদের বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের জন্য দ্র. উপরে পৃ. ৪৩৯-৪৪৫ (মূল গ্রন্থ)।

৩০. মুসলিম, নং ১৭৭; বুখারী, নং ৩২৩৪, ৩২৩৫, ৪৮৫৫, ৭৩৮০; ৭৩৫১; মুসনাদ, ৬খ., ৪৯-৫০, ২৩০-২৪১; আত-তাবারী, তাফসীর, ২৭খ, ৫০-৫১।

৩১. মুসলিম, নং ১৭৮(১) বক্তব্যটি এইরূপ ঃ

(قَالَ نُورٌ اَنّى اَرَاهُ) ; আরও দেখুন মুসানদ, ৫খ, ১৪৭।

৩২. মুসলিম, নং ১৭৮(২) (قَالَ رَاَيْتُ نُوْرًا); আরও দ্র. তিরমিযী, নং ৩২৮২।

৩৩. মুসলিম, নং ১৭৯। বক্তব্যটি এইরূপ ঃ

وَحِجَابُهُ النُّوْرُ لَوْ كَشَفَهُ لاَحْرَقَتْ سُبْحَاتَ وَجْهِهِ مَا انْتَهى اِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ .

৩৪. ঐ, নং ১৭৫।

৩৫. ঐ, নং ১৭৪; বুখারী, নং ৩২৩২, ৩২৩৩, ৪৮৫৬-৪৮৫৮; তিরমিযী, নং ৩২৭৭, ৩২৮৩; মুসনাদ, ১খ, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪০৭।

৩৬. মুসলিম, নং ১৭৬(১)। বক্তব্যটি এইরূপ ঃ وَقَالَ رَاهُ بِقَلْبِهِ

৩৭. ঐ, নং ১৭৬(১)। বক্তব্যটি এইরূপ ঃ وَقَالَ رَاٰهُ بِفُؤْدِهِ مَرَّتَيْنِ ; আরও দেখুন তিরমিযী, নং ৩২৮১।

৩৮. ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত যে, ইব্‌ন কাছীর (রা) লিপিকর/সম্পাদক) রাব্বাহু (رَبَّهُ) শব্দটিকে বর্ণনায় (رَاى مُحَمَّد رَبَّهُ مَرَّتَيْنِ) সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন এবং সহীহ মুসলিমকে বরাত হিসাবে উল্লেখ করিয়াছেন দ্র. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৭খ., ৪২২)। মুসলিমের দুইটি ভাষ্যের কোনটির মূলপাঠে 'রাব্বাহু' শব্দটি নাই।।

৩৯. তিরমিযী, নং ৩২৭...৯, মূল পাঠ ঃ وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَاى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ

৪০. তিরমিযী, মূল পাঠ ঃ هذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ

৪১. মুসনাদ, ১খ, ২৯০।

৪২. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৭খ, ৪২৪। .

৪৩. ঐ, পৃ. ৩৬৮।

৪৪. তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ১২খ, ২২০, হাদীছ নং ১২৯৪১।

৪৫. আত-তাবারী, তাফসীর, ২৭খ, ৪৬-৪৭; ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৭খ, ৪২৪-৪২৫।

৪৬. ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ৭খ, ৪২২।

সাঁইত্রিশতম অধ্যায়

হিজরতের পূর্বকথা

এক ঃ সমর্থনের প্রাথমিক অগ্রদূতগণ

সময়টি ছিল দাওয়াতী মিশনের ১১শ বর্ষের হজ্জ মৌসুম। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহায্য ও সমর্থনের প্রত্যাশায় বিভিন্ন গোত্রের শিবিরে যোগাযোগের এক পর্যায়ে আকাবাতে একদল মদীনাবাসীর সহিত সাক্ষাত করেন।[১] তিনি তাহাদের পরিচয় জানিতে চাহেন। তাহারা যখন বলেন যে, তাহারা মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ জানিতে চাহেন, তাহারা কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া তাঁহার কথা শুনিবেন কিনা। তাহারা সম্মত হইয়া তাঁহার কথা শুনিতে বসেন। তিনি তখন তাহাদিগকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর ইবাদতের দাওয়াত দেন, তাহাদের নিকট ইসলামের ব্যাখ্যা দেন এবং তাহাদিগকে কুরআন মাজীদের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করিয়া শুনান।

এই লোকগুলি মদীনাতে ইয়াহূদীদের মিত্র ছিল। পূর্বেই যেমন বলা হইয়াছে, ইয়াহূদীরা প্রায়শ তাহাদিগকে বলিত যে, একজন নবীর আগমনের সময় সমাগত হইয়াছে এবং তাহারা সেই নবীর সহায়তায় আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রদ্বয়কে পরাজিত ও ধ্বংস করিবে। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন তাঁহার কথা শেষ করেন, তখন এই মদীনাবাসীরা তাহাদের মধ্যে এই মর্মে আলোচনা করেন যে, এই ব্যক্তিই নিশ্চয় সেই নবী হইবেন যাহার কথা ইয়াহূদীরা তাহাদিগকে বলিয়া থাকে। এমনকি তাহাদের অনেকে একে অপরকে বলেন, "আসুন আমরা সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করি যাহাতে এক্ষেত্রে ইয়াহূদীরা আমাদের আগে না অগ্রণী ভূমিকা লইয়া যায়। অর্থাৎ আমাদের পূর্বে এই নবীর উম্মত হইতে না পারে"।

এইভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর ডাকে সাড়া দিয়া ইসলামে দীক্ষিত হন। তারপর তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অবহিত করণার্থে বলেন, "আমরা আমাদের স্বজনদিগকে বাড়ীতে রাখিয়া আসিয়াছি। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক ঈর্ষা, শত্রুতা ও বৈরিতা নজিরবিহীনভাবে সর্বব্যাপী ও সর্বগ্রাসী রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সম্ভবত আল্লাহ তা'আলা আপনার মাধ্যমে তাঁহাদের মধ্যে একতা আনয়ন করিবেন। আমরা তাহাদের নিকট গমন করিব

এবং আপনি আমাদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহাদিগকে ইহার দাওয়াত দিব। এতদ্ব্যতীত আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়া এই যে সত্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি উহার ব্যাখ্যা তাহাদের নিকট উপস্থাপন করিব। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যদি তাহাদিগকে এই পটভূমিতে একত্র করেন তাহা হইলে আপনার চেয়ে অধিক শক্তিশালী আর কেহ হইবে না"।[২]

যদিও উপরিউক্ত বর্ণনাতে দেখা যায় যে, মদীনাবাসীরা মাঝে মাঝে ইয়াহূদীদের নিকট হইতে একজন নবীর আগমন বার্তা শুনিয়া প্রধানত সেই কারণে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন, তথাপি ইহা ধারণা করা সঠিক হইবে না যে, ইতোপূর্বে তাহারা তাঁহার বা ইসলাম ধর্মের বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত 'আকাবাতে সাক্ষাতের পূর্বে অন্যভাবে অবগত ছিলেন না। কারণ তাঁহার এবং তাঁহার রিসালাতের খবর ইতোমধ্যে মদীনাসহ সমগ্র আরব ভূখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। উল্লেখ্য যে, অন্যান্য স্থানের ন্যায় খোদ মদীনা হইতেও তীর্থযাত্রীরা এবং অন্যেরা পূর্ববর্তী দশক জুড়িয়া মক্কা সফর করিয়া আসিতেছিল। অতএব তাহারা নিশ্চয় মক্কাতে সংঘটিত বিশাল আন্দোলনগুলির বিষয়ে অনবহিত ছিলেন না। বিশেষত সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইসলাম প্রচারের কারণে কুরায়শদের অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির দ্বারা বানূ হাশিম গোষ্ঠীকে বয়কট ও অবরোধের কথা তাহারা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন।

অধিকন্তু সুওয়ায়দ ইব্ন সামিত এবং ইয়াস ইব্ন মু'আয-এর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহিত সাক্ষাতের পর মদীনায় প্রত্যাগমন করিয়া অবশ্যই নীরব থাকিতে পারেন না। এইভাবে উপরিউক্ত সূত্রসমূহ হইতে এবং সময়ে সময়ে ইয়াহূদীদের মন্তব্য হইতে মদীনার লোকেরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার মিশন সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট পূর্ব-ধারণা লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত ব্যক্তিগত সাক্ষাতে তাঁহার নিকট হইতে ইসলাম ধর্মের একটি পরিষ্কার ধারণা তাহারা লাভ করেন এবং এই বিষয়ে নিশ্চিত হন যে, ইসলামই আল্লাহ তা'আলার মনোনীত সত্য ও সঠিক ধর্ম এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার প্রেরিত রাসূল।

বর্ণনাটি সম্পর্কে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে মদীনাবাসিগণ কর্তৃক তাঁহার নিকট নিবেদিত তাহাদের শেষ কথাগুলি। তাহাদের বক্তব্য হইতে, বিশেষত তাহাদের শেষ চয়ন হইতে ইহা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের নিকট ইসলামের ব্যাখ্যা প্রদানকালে এবং তাহাদিগকে ইসলাম ও এক আল্লাহর প্রতি আহ্বানের প্রাক্কালে তিনি তাঁহার মিশনে তাহাদের সাহায্য ও সমর্থন কামনা করেন। আরবের অন্যান্য গোত্রের নিকট হইতেও তিনি ঐরূপ সহযোগিতা প্রত্যাশা করেন। স্বভাবতই অনুমেয় যে, তাহাদের সহিত তাঁহার কথোপকথনের সেই অংশের বর্ণনা এই রিপোর্টে তেমনভাবে নাই যাহার জবাবে মদীনাবাসীরা তাঁহাকে এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন, "অতঃপর আপনার চেয়ে শক্তিশালী আর কেহ হইবে না"।

প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনা বিষয়ক রিপোর্টের আর একটি ভাষ্যে বলা হইয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের সমর্থন সুনির্দিষ্টভাবে কামনা করিয়াছিলেন যাহাতে তিনি আল্লাহ্ তা‘আলা নির্দেশিত বাণী লোকসমাজে প্রচার করিতে পারেন। এই অনুরোধের প্রেক্ষিতে মদীনাবাসীদের জবাব ছিল, "হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আল্লাহ ও তাঁহার রাসূলের জন্য সংগ্রাম করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অবধান করুন, আমরা (একে অপরের) শত্রু, আমরা পরস্পরকে ঘৃণা করি এবং মাত্র এক বৎসর পূর্বে সংঘটিত বু‘আছের যুদ্ধে আমরা একে অপরকে হত্যা করিয়াছি। সুতরাং আপনি যদি এখন আগমন করেন তাহা হইলে আপনার বিষয়ে আমাদের মধ্যে একতা লাভ হইতে পারে। সুতরাং আমাদিগকে আমাদের লোকদের নিকট ফিরিয়া যাইতে দিন। হয়ত আল্লাহ তা‘আলা আমাদিগের মধ্যকার গোলমাল মিটাইয়া দিবেন। পরবর্তী (হজ্জের) মৌসুমে আপনার সহিত আমাদের পুনরায় সাক্ষাত হইবে"।[৩]

ইব্ন ইসহাকের মতে সমর্থনের অগ্রদূতগণ সংখ্যায় ছিলেন ছয়জন। তাঁহারা ছিলেন ঃ

১. আস‘আদ ইব্ন যুরারা	বানূ আন-নাজ্জার গোত্রের
২. ‘আওফ ইবনুল হারিছ	"
৩. রাফে‘ ইব্ন মালিক	বানূ যুরায়ক গোত্রের
৪. কু‘তায়বাহ্ ইব্ন ‘আমের	সালিমা গোত্রের
৫. ‘উক‘বা ইব্ন ‘আমের	হারায ইব্ন কা‘ব গোত্রের
৬. জাবির ইব্ন ‘আবদুল্লাহ	‘উবায়দ ইব্ন ‘আদী গোত্রের

মদীনাতে প্রত্যাগমনের পর সেই ব্যক্তিবর্গ বাস্তবিকপক্ষে তাঁহাদের কথামত কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাদের লোকদের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার জীবন, কর্ম ও মিশন বিষয়ে এমন ব্যাপক আলোচনা করেন যে, তাঁহাদের লোকদের ভিতরে এমন কোন পরিবার ও গোষ্ঠী রহিল না যাঁহারা তাঁহার এবং ইসলামের বিষয়ে আলোচনা করেন নাই।[৪]

আরেকটি বর্ণনামতে ‘আকাবাতে প্রথমবারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত যাহারা সাক্ষাত করেন তাঁহারা সংখ্যায় ছিলেন আট ব্যক্তি। তাঁহারা হইতেছেন ঃ বানূ আন-নাজ্জার গোত্রের আস‘আদ ইব্ন যুরারা এবং মু‘আয ইব্ন আফরা’, বানূ যুরায়ক গোত্রের রাফে‘ ইব্ন মালিক এবং যাকওয়ান ইব্ন ‘আবদ কায়স, বানূ সালিম গোত্রের উবাদা ইবনুস সামিত এবং আবূ আবদুর রাহমান (ইয়াযীদ ইব্ন ছা‘লাবা), বানূ ‘আবদুল আশহাল গোত্রের আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান এবং বানূ ‘আমর ইব্ন আওফ গোত্রের উআয়ম ইব্ন সাইদা। ইব্ন সা‘দ, যিনি এই বিবরণটি বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি আরও বলেন, আল-ওয়াকিদী উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইব্ন ইসহাক যে ছয় ব্যক্তির তালিকা দিয়াছেন "তাহা আমাদের নিকট অধিক বিশ্বাসযোগ্য এবং এই দৃষ্টিভঙ্গীতে সকলে ঐকমত্য পোষণ করেন"।[৫]

দুই ঃ 'আকাবার প্রথম বায়'আত (শপথ)

উল্লিখিত ছয় ব্যক্তি তাঁহাদের কথা রাখেন এবং পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে মদীনার ১২ জন মুসলমান 'আকাবাতে রাসূলুল্লাহ -এর সহিত সাক্ষাত করেন। তাঁহাদের মধ্যে ১০জন ছিলেন খাযরাজ এবং দুইজন ছিলেন 'আওস গোত্র হইতে আগত। তাঁহারা ছিলেন ঃ

১. আসআদ ইব্ন যুরারা	বানূ নাজ্জার গোত্রের
২. 'আওফ ইবনুল হারিছ	"
৩. মু'আয ইব্ন আল-হারিছ (উপরিউক্ত ব্যক্তির ভ্রাতা)	বানূ নাজ্জার গোত্রের
৪. রাফে' ইব্ন মালিক	বানূ যুরায়ক "
৫. যাকওয়ান ইব্ন 'আবদ কায়স	"
৬. উবাদা ইব্ন আস-সামিত	বনূ আওফ ইব্ন আল-খাযরাজ
৭. 'আবূ 'আবদুর রহমান (ইয়াযীদ)	"
৮. আল-'আব্বাস ইব্ন উবাদা ইব্ন নাদলা	বানূ সালিম গোত্রের
৯. 'উকবা ইব্ন 'আমের	"
১০. কুতবা ইব্ন 'আমের (উপরিউক্ত ১০ ব্যক্তি খাযরাজ গোত্র হইতে আগত)	বানূ সাওয়াদ ইব্ন গানম গোত্রের
১১. 'আবুল হায়ছাম ইব্ন আত-তায়্যিহান	আশহাল গোত্রের
১২. উআয়ম ইব্ন সাইদা (উপরিউক্ত দুই ব্যক্তি আওস হইতে আগত)	বানূ আমর ইব্ন আওফ গোত্রের।

উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাঁচ ব্যক্তি পূর্ববর্তী বর্ষে যাঁহারা রাসূলুল্লাহ -এর সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন (অর্থাৎ ক্রমিক ১,২,৪, ৯ ও ১০ সংখ্যক ব্যক্তিগণ)। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, উপরিউক্ত ১২ ব্যক্তি ঐ বৎসর আকাবাতে উপস্থিত থাকিয়া রাসূলুল্লাহ -এর স্বপক্ষ অবলম্বনের যে শপথ গ্রহণ করেন সেই বিষয়ে গ্রহণযোগ্য। সূত্রগুলির মধ্যে কোন মতদ্বৈধতা নাই। উক্ত শপথের ধারাগুলি লিপিবদ্ধ করেন উবাদা ইব্ন আস-সামিত (রা)। সেখানে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি নিশ্চিত করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় ঃ

(১) আল্লাহর সহিত কোন শরীক না করা;

(২) চুরি না করা।

(৩) ব্যভিচার ও অনাচার হইতে বিরত থাকা,

(৪) শিশুহত্যা না করা;

(৫) কাহারো বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ রটনা না করা;

(৬) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কোন আইনসঙ্গত নির্দেশ অমান্য না করা এবং

(৭) সুখে-দুঃখে তাঁহার অনুগত থাকা ও তাঁহাকে অনুসরণ করা।

যদি তাঁহারা এই সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলেন তাহা হইলে তাঁহাদের পুরস্কার হইবে বেহেশত। কিন্তু যদি তাঁহারা ইহার কোনটি অমান্য করেন এবং ইহকালে তাহার জন্য সাজাপ্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ইহাকে ঐ অপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে পরিগণিত করা হইবে। কিন্তু অপরাধটি যদি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত অজ্ঞাত থাকে তাহা হইলে আল্লাহ তা'আলা তাহাকে যেরূপ ইচ্ছা করেন সেরূপ শাস্তি দিবেন অথবা ক্ষমা করিয়া দিবেন।[৬]

উল্লেখ্য, রাসূলুল্লাহ ﷺ সর্বপ্রথম সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে কাজটি তাহাদিগকে করিতে বলেন তাহা হইতেছে ঃ অদ্বিতীয় আল্লাহ ছাড়া আর কাহারো উপাসনা না করা এবং তাহাদের চরিত্র ও আচরণকে পুনর্গঠন করা। ঐ সকল শর্তাবলীর আলোকে শুধু আইনসঙ্গত বিষয়ে তিনি তাহাদের আনুগত্য আবশ্যিক করেন। 'আকাবার এই প্রথম প্রতিশ্রুতি "মহিলাদের প্রতিশ্রুতি" (বায়'আতুন নিসা) নামে পরিচিতি। ইহার এই সাধারণ নামকরণের কারণ হইতেছে আল্লাহ তা'আলার রাস্তায় যুদ্ধ করার নির্দেশ তখনও নাযিল হয় নাই এবং মহিলাদের নিকট হইতে সচরাচর এই সকল শর্ত ও নিয়মাবলী মতে বায়'আত গ্রহণ করা হয়।[৭]

এই প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর মদীনার বারজন মুসলিম তাঁহাদের ঘরে ফিরিয়া যান। একটি বর্ণনাতে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কুরআন মাজীদ এবং দীন ইসলাম শিক্ষা দানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাদের সহিত মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (রা)-কে প্রেরণ করেন। কিন্তু আর একটি বর্ণনায় আছে যে, মদীনাতে প্রত্যাগমনের পর আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অনুরোধ করেন, তাহাদিগকে কুরআন মাজীদ এবং ইসলাম ধর্মের বিধি-নিষেধ শিক্ষাদানের জন্য সেখানে যেন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়। সেমতে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (রা)-কে উক্ত কার্য সম্পাদনের জন্য মদীনাতে প্রেরণ করেন। মুসআব ইব্‌ন 'উমায়র (রা) ছিলেন প্রকৃতপক্ষে প্রথম ব্যক্তি যাহাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার বাহিরে কিন্তু আরবের ভিতরে একজন ইসলাম প্রচারক হিসাবে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাকে প্রদত্ত কর্মে সাফল্য অর্জন করেন।

তিন ঃ মুস'আব (রা)-র কার্যক্রম এবং মদীনায় ইসলাম ধর্মের প্রচার

মদীনাতে মুস'আব (রা) আবূ উমামা আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা)-র বাসভবনে অবস্থান করেন এবং তাঁহাকে প্রদত্ত কর্মে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেখানে "কুরআন মাজীদের শিক্ষক (মুকরি)" হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং মুসলমানদের সমাজে ইমামতি করিতে থাকেন।[৮]

ইব্ন ইসহাক বলেন, এই সময়ই আবূ উমামা আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা) মদীনার সতীর্থ মুসলমানদেরকে শুক্রবারে সমবেত করিয়া বানূ বায়দ-এর বাড়ীতে জুমু'আর নামায আদায় করেন। প্রথম জুমুআর নামায আদায়কারী মুসল্লীর সংখ্যা ছিল চল্লিশজন।[১০] স্পষ্টতই, আসআদ ইব্ন যুরারা এবং ইমাম মুস'আব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হইতে নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়া উহা করিয়াছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও ঐ সময় নাগাদ জুমুআর নামায আদায়ের আসমানী নির্দেশ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন।

উপরিউক্ত তথ্যের ভিত্তিতে দেখা যায়, ঐ সময় নাগাদ মদীনাতে মুসলমানদের সংখ্যা কমপক্ষে চল্লিশে উপনীত হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে মদীনাতে মুস'আবের কর্মের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তথাকার লোকদের মধ্যে ইসলামের প্রচার। তিনি আস'আদ ইব্ন যুরারা ও অন্যান্য মুসলমানদের সহযোগিতায় কৃতিত্বপূর্ণভাবেই তাহা করেন। এক্ষেত্রে তাঁহার উল্লেখযোগ্য সাফল্য ছিল, বানূ 'আবদুল আশহাল গোত্রের দুইজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুদায়র এবং তাঁহাদের মাধ্যমে তাঁহাদের গোত্রের (খাযরাজ) অধিকাংশকে ইসলামে দীক্ষিত করেন।

ইব্ন ইসহাক এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার একটি বিবরণ প্রদান করিয়াছেন যাহা নিম্নরূপ ঃ একদা আস'আদ ইব্ন যুরারা ও মুস'আব ইব্ন উমায়র ইসলাম ধর্ম প্রচারে বাহির হন। তাঁহারা একটি বাগানে একটি কূপের ধারে বসেন। বাগানটি ছিল বানূ 'আবদুল আশহালের শাখাগোত্র বানূ জাফর এর। শীঘ্রই সেখানে আরও কয়েকজন নওমুসলিম সমবেত হন। এইজন্য সমাবেশের খবর শীঘ্রই সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুদায়র-এর নিকট পৌঁছে। এই শেষোক্ত ব্যক্তিদ্বয় ছিলেন বহু ঈশ্বরবাদী এবং মদীনাতে আস'আদ ও মুস'আবের সাম্প্রতিক কাজ সম্পর্কে তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং ঐ সময় তাহার নিকট অবস্থানকারী উসায়দকে আস'আদ ও মুস'আবের নিকট গমন করিতে বলে এবং পরামর্শ দেয় যে, তাহাদিগকে যেন অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিতে বলা হয়। তাঁহারা যেন আর কখনও তাহাদের স্থানে তাহাদের দুর্বলমনা লোকদিগকে বিভ্রান্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ না করে। সা'দ আরও বলেন যে, তিনি নিজেই সেখানে যাইতেন, কিন্তু আস'আদ তাহার মামাত ভাই হওয়াতে তিনি এই বিষয়ে তাঁহার সহিত সরাসরি ঝগড়াতে লিপ্ত হইতে চাহেন না।

সেমতে উসায়দ তাহার বল্লমসহ উত্তেজিত চিত্তে সেখানে অগ্রসর হন। তাহাকে স্থানটির নিকটে আসিতে দেখিয়া আস'আদ কানে কানে মুস'আবকে বলেন, তাহাদের দিকে অগ্রসরমান লোকটি তাহার লোকদের নেতা। সুতরাং ইহা উত্তম হইবে যদি তাঁহাকে ইসলাম ধর্মের সত্যে বিশ্বাস করানো যায়। মুসআব বলেন যে, তিনি তাঁহার সহিত কথা বলিবেন এবং তিনি তাহাদের সহিত কিছুক্ষণ বসিতে সম্মত আছেন কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। সেস্থানে আসিয়াই উসায়দ তাহাদিগকে গালমন্দ করিতে থাকেন এবং তাঁহাদের সেখানে আসার কারণ জানিতে চাহেন।

তৎসহ তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার গোত্রের নিরীহ লোকদিগকে যেন বোকা বানানো ও বিভ্রান্ত করার উদ্যোগ তাঁহারা আর গ্রহণ না করেন। তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে সেস্থান ত্যাগ করার নির্দেশও দেন, যদি তাঁহাদের প্রাণের মায়া থাকে।

এইরূপ কটু কথার প্রত্যুত্তরে মুস'আব (রা) পরিপূর্ণ শান্ত-সমাহিতভাবে জানিতে চাহেন, উসায়দ কিছুক্ষণের জন্য বসিয়া তাঁহার কয়েকটি কথা শুনিতে রাজী আছেন কিনা এবং তিনি যদি কিছু পছন্দ করেন তবে তাহা গ্রহণ করা বা না করা তাহার ইচ্ছা। কিন্তু যদি তাহার নিকট উহা কোনভাবে গ্রহণযোগ্য না হয় তবে তাঁহারা তাহার অপছন্দনীয় কোন কাজ করিবেন না এবং তৎক্ষণাৎ সেস্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য থাকিবেন।

"সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত" এইরূপ মন্তব্য করিয়া উসায়দ তাঁহার বল্লম ভূমিতে প্রোথিত করিয়া বসিয়া পড়িলেন। অতঃপর মুস'আব (রা) তাঁহার সমীপে ইসলামের ব্যাখ্যা নিবেদন করিলেন এবং কুরআন মাজীদের কিছু অংশ আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। এমনকি তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই তিনি উসায়দের হাবভাবে লক্ষ্য করেন যে, তাঁহার মনে একটি পরিবর্তন সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ইসলামের সত্যে পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেন। সুতরাং মুস'আব তাঁহার তিলাওয়াত শেষ করিলে উসায়দ এইমাত্র যাহা শুনিয়াছেন তাহার প্রশংসা করেন এবং মুসলমান হওয়ার জন্য তাঁহার কি করণীয় সে বিষয়ে জানিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন তাঁহাকে তাঁহার করণীয় যাবতীয় বিষয়ের বর্ণনায় বলা হয় যে, তিনি গোসল করিবেন, তাঁহার পরিধেয় বস্ত্র পরিশুদ্ধ করিবেন, এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর কলেমা উচ্চারণ করিবেন এবং দুই রাক'আত নামায আদায় করিবেন। উসায়দ তৎক্ষণাৎ এইগুলি সম্পন্ন করেন এবং মুস'আব (রা)-এর হস্তে ইসলামে দীক্ষিত হন। শুধু তাহাই নহে। তিনি মুস'আব (রা) এবং আস'আদ ইব্ন যুরারা (রা)-কে বলেন যে, তিনি তাঁহার লোকদের গোত্রপ্রধানকে রাখিয়া আসিয়াছেন, যদি তাহাকেও দীক্ষা গ্রহণ করানো যায় তাহা হইলে তাঁহাদের গোত্রে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত না হওয়ার মত আর কেহই থাকিবে না। এইরূপ বলিয়া তিনি সেস্থান ত্যাগ করেন এবং সা'দকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

উসায়দের পরিবর্তন তাঁহার মুখমণ্ডলে নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহাকে অন্য রকম মেযাজে প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া সা'দ তাঁহার চারিদিকে অবস্থানকারী তাঁহার আপন ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ্য করিয়া মন্তব্য করেন, আল্লাহর শপথ! "উসায়দ যে অবস্থায় গমন করিয়াছিল সেই তুলনায় এই প্রত্যাগমনকালে তাঁহার চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ্য করিতেছি"। ইতোমধ্যে উসায়দ এক কৌশল অবলম্বন করিলেন যাহাতে সা'দকে মুস'আব (রা)-এর নিকট প্রেরণ করা যায়। সুতরাং সা'দ যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহাকে যে কাজের জন্য সেখানে প্রেরণ করা হইয়াছিল সেই বিষয়ে কি অর্জন সাধিত হইয়াছে? তখন উসায়দ বলেন, "বাস্তবিকপক্ষে আমি ঐ দুই ব্যক্তির সহিত কথা বলি এবং আল্লাহর কসম! আমি তাঁহাদের মধ্যে কোন খারাপ মনোভাব লক্ষ্য করি নাই। তাঁহারা যাহা করিতেছে তাহা হইতে বিরত থাকার নির্দেশ দিলে তাঁহারা আমাকে

বলেন, 'আমরা আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী কার্য নির্বাহ করিব'। কিন্তু ঘটনাচক্রে বানূ হারিছা সেখানে আসিয়া আস'আদ ইব্ন যুরারাকে হত্যা করিতে উদ্যত হয়। কারণ শেষোক্ত ব্যক্তি তোমার মামাত ভাই, এই কাজের মাধ্যমে তাহারা তোমার ক্ষতিসাধন ও তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিতে চাহে।

ইহা শুনিয়া সা'দ রাগান্বিত হইয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উসায়দের নিকট হইতে বল্লমটি লইয়া আস'আদ ইব্ন যুরারাকে দেখা এবং তাঁহাকে রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হইলেন। ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া আস'আদ এবং তাঁহার সহযোগীদের নিরাপদ ও আয়েশী মেযাজে দেখিয়া সা'দ বুঝিতে পারেন যে, উসায়দ কৌশলে তাহাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের কথা শুনিতে পারেন। এইরূপ উপলব্ধিসহ তিনি রূঢ়ভাবে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহারা কোন কাজে এখানে আসিয়াছেন? আর কারণ যাহাই হউক, তিনি তাহাদিগকে অবিলম্বে স্থানটি ত্যাগের নির্দেশ দেন। মুস'আব (রা) অনুনয় করিয়া তাঁহাকে বসিয়া কিছু কথা শুনিতে বলেন। তৎসহ আরও বলেন যে, কিছু পছন্দ হইলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন; আর যদি তিনি ইহা পছন্দ না করেন তবে তাহারা সন্তুষ্টচিত্তে সে স্থান ত্যাগ করিবেন। প্রকৃতপক্ষে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হইল। মুস'আব তাঁহার নিকট ইসলামের ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাঁহাকে কুরআন মাজীদের কিছু অংশ তিলাওয়াত করিয়া সা'দকে শুনাইলেন। তিনি সমভাবে অনুপ্রাণিত হইলেন এবং একই প্রক্রিয়ায় ইসলাম গ্রহণ করিলেন।

তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রত্যাগমন করিলে তাহারা তাঁহার বিষয়ে তাহাদের মধ্যে একই মন্তব্য করিয়া বলিল যে, তিনি যে অবস্থায় যাত্রা করিয়াছিলেন তদপেক্ষা সম্পূর্ণ এক ভিন্ন চেহারাসহ ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাহাদের নিকটে আসিয়া তিনি তাঁহার বিষয়ে তাহাদের মতামত কি তাহা সরাসরি জানিতে চাহেন। তাহারা একবাক্যে জবাব দেন যে, তিনি তাহাদের মহান এবং বিজ্ঞ নেতা। অতঃপর তিনি তাহাদিগকে বলেন, যদি উহা সত্য হয় তবে তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের কোন পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে ততক্ষণ বাক্যালাপ করিবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা ইসলামে দীক্ষিত হয়। ঘটনাটির ইতিবৃত্তে বর্ণিত আছে যে, উমায়্যা ইব্ন যায়দের পরিবারের কতিপয় সদস্য ব্যতীত ঐ দিন সন্ধ্যা নাগাদ 'আবদুল আশহাল গোত্রের প্রায় সকলেই ইসলাম দীক্ষিত হন।[১১]

এমনকি যদি ঘটনাটির দৃশ্যত নাটকীয় ছোঁয়া এবং বর্ণনার অলঙ্করণ বাদ দেওয়া হয়, তথাপি ইহা নিঃসন্দেহ যে, সা'দ ইব্ন মু'আয ও উসায়দ ইব্ন হুদায়র-এর ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পিছনে ছিল মুস'আব ইব্ন 'উমায়র ও আস'আদ ইব্ন যুরারার অনুপ্রেরণা। এইভাবে বানূ 'আবদুল আশহাল গোত্রের ঐ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদ্বয় অর্থাৎ সা'দ ও উসায়দের ইসলামে দীক্ষা গ্রহণ তাহাদের সম্প্রদায়ের অন্যান্যদের দীক্ষা গ্রহণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত বর্ণনার মধ্যে আমরা

ঘটনাটির একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও লাভ করি। সেখানে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ইহাই স্বাভাবিক ছিল যে, মদীনাতে মুস'আব (রা)-এর কাজকে সকল মহল সুনজরে দেখিতে পারে নাই।

প্রকৃতপক্ষে 'উরওয়া ইবনুয যুবায়র বর্ণিত সা'দ ইব্‌ন মু'আযের ধর্মান্তরের বিবরণে বলা হইয়াছে যে, বানূ 'আবদুল আশহাল গোত্রের মধ্যে মুস'আবের সাফল্য আস'আদ ইব্‌ন যুরারার আপন গোত্র বানূ নাজ্জারের মধ্যে বিশ্বাস নষ্ট করে। আস'আদের গোত্র তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুস'আবকে তাঁহার গৃহত্যাগে বাধ্য করে। অতঃপর মুস'আব গৃহ পাল্টাইয়া সা'দ ইব্‌ন মু'আযের সহিত বসবাস শুরু করেন এবং তাঁহার সহযোগিতায় ইসলাম প্রচার ও কুরআন শিক্ষা অব্যাহত রাখেন।[১২] মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র কর্তৃক মদীনাতে এক বৎসরেরও কম সময় যাবৎ ইসলাম প্রচারের অগ্রগতির মাত্রা পরিলক্ষিত হয় পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে যখন সত্তর জনেরও বেশী মদীনার মুসলমান হজ্জযাত্রা করেন এবং 'আক'াবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিতে অংশগ্রহণ করেন।

চার ঃ 'আকাবার দ্বিতীয় বায়'আত (নবুওয়াতের ১৩শ বর্ষ)

ইব্‌ন ইসহাকের মতে মুস'আব হজ্জ মৌসুমের পূর্বেই মক্কাতে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৩] হজ্জ মৌসুমে মদীনার মুসলমানরা তাঁহাদের বহু ঈশ্বরবাদী প্রতিবেশিগণসহ মক্কাতে হজ্জযাত্রায় আগমন করেন। স্বভাবতই মুসলমানগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহিত তাহাদের সাক্ষাতের কথা প্রতিমাপূজক সহযাত্রীদিগের নিকট প্রকাশ করেন নাই। হজ্জ সমাপনান্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহিত সাক্ষাতের সময় সমাগত হইলে মুসলমানগণ খাযরাজের প্রখ্যাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন হারামের সমর্থন আদায় করিয়া তাঁহাদের দলকে শক্তিশালী করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাহারা তাহাকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিশেষ আহ্বান জানান এই বলিয়া যে, যেহেতু তিনি সমাজের নেতৃস্থানীয় একজন মহৎ ব্যক্তি, তাই তাহারা ইচ্ছা করেন না যে, তাহার মৃত্যুর পরে তিনি দোযখে অগ্নিদগ্ধ হন। তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সহিত তাহাদের পূর্ব-নির্ধারিত সাক্ষাত পরিকল্পনার কথাও তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন। মুসলমানগণ তাঁহার সহিত এভাবে কথা বলেন এই সঙ্গত কারণে যে, তাহারা 'আবদুল্লাহর মধ্যে সত্য ধর্ম ইসলামের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৪]

তাঁহার যোগদানের ফলে হজ্জ কাফেলায় মদীনার মুসলমানদের সংখ্যা তিয়াত্তরে উন্নীত হয়। এই তিয়াত্তর ব্যক্তির সঙ্গে ছিলেন দুইজন মহিলা মুসলমান, নুসায়বা বিন্‌ত কা'ব (মাযিন ইব্‌ন আন-নাজ্জার গোত্রের) এবং আসমা বিনত 'আমর ইব্‌ন 'আদী ইব্‌ন নাবী (সালিমা গোত্রের)। তাঁহারা আকাবাতে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন (মিনাতে অবস্থিত প্রথম বা বৃহৎ জামরার নিকটে)। তাঁহাদের বহু ঈশ্বরবাদী প্রতিবেশী হজ্জযাত্রিগণ যাহাতে তাঁহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে না পারে তাহা নিশ্চিত করণার্থে তাঁহারা স্ব স্ব শিবিরে অন্যান্যদের সহিত স্বাভাবিকভাবে নিদ্রাগমন করেন। অতঃপর যখন রাত্রির এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হইল অন্যরা গভীর নিদ্রার

কোলে ঢলিয়া পড়িল, তখন নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করিয়া ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া তাঁহারা সভাস্থলে গমন করিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার চাচা 'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিবসহ পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে সভাস্থলে আগমন করেন। তাঁহার চাচা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি তাঁহার ভাতিজার কর্ম স্বচক্ষে দেখার এবং আনসারদের আন্তরিকতা ও আগ্রহের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সভাতে তিনিই প্রথমে বক্তব্য পেশ করেন। মদীনাবাসীদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলেন, মুহাম্মাদ ﷺ যেরূপ তাহারা অবগত আছেন, তাঁহার নিজ জন্মস্থানে সম্মান ও নিরাপত্তার সহিত বসবাস করিতেছেন এবং তাঁহার গোত্র এ যাবৎকাল তাঁহার সুরক্ষা প্রদান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন যেহেতু তিনি মদীনাবাসীদের সহিত যোগদানে ইচ্ছুক, সেহেতু তিনি ('আব্বাস) বিষয়টিকে সতর্কতার সহিত বিবেচনা করিবার জন্য তাহাদিগকে পরামর্শ দেন। তিনি তাহাদিগকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেন, যদি তাহারা তাহাদের প্রতিজ্ঞা পালনে নিশ্চিত হন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধে সুরক্ষাদানে সক্ষম হন, তবে তাহারা এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁহারা মনে করেন যে, তিনি তাহাদের সহিত যোগদানের পর চাপের মুখে তাঁহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইবেন কিম্বা তাঁহাকে শত্রুদের নিকট সমর্পণ করিবেন, তাহা হইলে তিনি যে অবস্থায় আছেন তাঁহাকে সেই অবস্থায় থাকিতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় হইবে।

তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিবার পূর্বেই তদুত্তরে আনসারগণ বলিলেন, "আমরা আপনার বক্তব্য শুনিয়াছি"। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উদ্দেশ্যে করিয়া তাহারা বলিলেন, "আপনিই বলুন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এবং আপনার প্রভুর স্বার্থে যাহা করণীয়, আপনি সেই সমুদয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুন"।

ইহার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে এক অভিভাষণ দান করেন। তিনি প্রথমে কুরআন মাজীদ হইতে তিলাওয়াত করেন, তাহাদিগকে আল্লাহর রাস্তায় আহ্বান জানান, তাহাদিগকে ইসলামের প্রতিও শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের মাধ্যমে উৎসাহ প্রদান করেন এবং বলেন : "আমি আপনাদের নিকট হইতে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি চাহিতেছি যে, আপনারা আমাকে ঐরূপ প্রতিরক্ষা দান করিবেন যেরূপ আপনারা আপনাদের স্ত্রীলোক ও সন্তান-সন্ততিগণকে প্রদান করিয়া থাকেন"।[১৫]

ইহার প্রেক্ষিতে আল-বারা'আ ইব্ন মা'রূর রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হস্ত মুবারক আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, আমরা আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণকারী মহাপ্রভুর শপথ করিয়া বলিতেছি, আমরা নিশ্চয় আপনাকে ঐরূপ সুরক্ষা দান করিব যেরূপ আমরা আমাদের পরিবার ও সন্তান-সন্ততিগণকে দিয়া থাকি। কারণ আমরা যোদ্ধার জাতি এবং বাপ-দাদাদের আমল হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে সশস্ত্র"।[১৬]

এই পর্যায়ে আল-বারা'আর কথার সহিত আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এবং লোকদের (অর্থাৎ ইয়াহূদীদের) মধ্যে একটি চুক্তি আছে এবং আমরা উহা হইতে সরিয়া আসিতেছি। কিন্তু যখন উহা সম্পন্ন হইবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা আপনাকে আপনার কর্মে জয়যুক্ত করিবেন, তখন কি আপনি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া আপনার সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করিবেন?"

ইহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন ঃ "না, আমার রক্ত হইতেছে আপনাদের রক্ত এবং আমার জীবন হইতেছে আপনাদের জীবন। আমি আপনাদের লোক এবং আপনারা আমার লোক। আমি তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব, যাহাদের বিরুদ্ধে আপনারা যুদ্ধ করেন এবং শান্তি স্থাপন করিব তাহাদের সহিত, যাহাদের সহিত আপনারা শান্তি স্থাপন করেন"।[১৭]

ইহার পর আবুল হায়ছাম তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের দিকে ফিরিয়া তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, তাহাদের সহিত রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে লইয়া যাওয়ার অর্থ এই যে, আরবদেশের সকল লোক তাহাদের বিপক্ষ অবলম্বন করিবে এবং তাহাদের কটাক্ষ জ্যা-মুক্ত তীরের ন্যায় তাহাদিগকে বিদ্ধ করিবে। সুতরাং যদি তাঁহারা এইরূপ নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারেন যে, সকল ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে হইলেও কোন অবস্থাতেই তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পরিত্যাগ করিবেন না, তবে তাহারা প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে পারেন। তখন তাহাদের সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠেন যে, তাহারা তাহাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন এবং কোন অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে পরিত্যাগ করিবেন না।[১৮]

অন্যরাও এই উপলক্ষে বক্তব্য রাখেন। এইভাবে আস'আদ ইব্ন যুরারা তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। তিনি আবুল হায়ছামের বক্তব্যের সমর্থনে তাহাদিগকে মনে করাইয়া দেন যে, তাহারা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বভার গ্রহণ করিতে যাইতেছেন যাহার ফলে তাহারা আরবদের শত্রুতার নিশ্চিত লক্ষবস্তুতে পরিণত হইবেন।[১৯]

তদ্রূপ আব্বাস ইব্ন 'উবাদা ইব্ন নাদলা আল-আনসারী তাঁহার সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাহার বক্তব্যে বলেন, "হে খাযরাজ গোত্রের লোকেরা! রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বিষয়বস্তু আপনারা কি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন"? তদুত্তরে তাহারা বলিলেন, "হাঁ, পারিয়াছি"। আব্বাস ইব্ন উবাদা অতঃপর ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, আপনারা প্রয়োজনে রক্তক্ষয়ী লড়াই করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন। সুতরাং যদি আপনারা মনে করেন, যখন বিপদ ঘনাইয়া আসিবে, আপনাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংস হইবে এবং আপনাদের নেতৃবৃন্দ নিহত হইতে থাকিবেন, তখন আপনারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবেন, তবে এখনই তাহা করুন। কারণ ঐরূপ করাতে, আল্লাহর কসম! আপনারা ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। কিন্তু যদি আপনারা এইরূপ নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আপনারা আপনাদের বাধ্যবাধকতা পরিপূর্ণরূপে পালন করিবেন, যদিও তাহাতে আপনাদের সহায়-সম্পদ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও আপনাদের নেতৃবৃন্দ শহীদ হন, তবে এই গুরুদায়িত্ব

গ্রহণ করুন। কারণ আল্লাহ্ তা'আলার কসম! উহা আপনাদের ইহকাল ও পরকালের জন্য সর্বোত্তম পাথেয় হইবে"।

তদুত্তরে তাহারা সকলেই বলিলেন, "নিশ্চয় আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালন করিব, যদিও উহার মূল্য হিসাবে আমাদের সহায়-সম্পদ ও নেতৃবৃন্দকে বিসর্জন দিতে হয়"। ইহার পর আল-আব্বাস ইব্‌ন 'উবাদা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের পুরস্কার কি হইবে, হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারি?" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, "জান্নাত"। "তাহা হইলে আপনার হস্তদ্বয় প্রসারিত করুন"। তাঁহারা বলিলেনঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাই বলিলেন এবং তাঁহারা শপথ গ্রহণ করিলেন।

আকাবাতে সেই স্মরণীয় রাতের কার্যবিবরণীর এই সকল সার-সংক্ষেপ হইতে ইহা স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, আল-আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব কর্তৃক আনসারদের নিকট হইতে নিশ্চয়তা ও প্রতিশ্রুতি গ্রহণ ছাড়াও ঐ সময় আনসারগণ নিজেরা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত তাঁহাদের কার্যক্রমের পুনর্মূল্যায়ন করিয়া উহার পরিপ্রেক্ষিত ও আসন্ন ফলাফল বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করেন।

তাঁহারা পরিপূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেন যে, প্রয়োজন হইলে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ চাহিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং ইসলামের স্বার্থে তাঁহারা যুদ্ধে শহীদ হইবেন এবং তাঁহাদের সহায়-সম্পদ ও ধন-জন কোরবানী দিবেন। অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। তিনিও সমভাবে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, তিনি তাঁহাদের আপনজন হইবেন, তাঁহাদের জন্য যুদ্ধ করিবেন এবং তাঁহাদের স্বার্থে রক্তদানে কার্পণ্য করিবেন না। অধিকন্তু তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে, বিজয় ও সাফল্য লাভের পরেও তিনি তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিবেন না, এমনকি তখনও তিনি তাঁহার লোকদের নিকট এবং তাঁহার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। সর্বোপরি আনসারগণ তাঁহার নিকট হইতে এই নিশ্চয়তা গ্রহণ করেন যে, যদি বিশ্বস্তভাবে তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পূরণে সক্ষম হন, তবে তাঁহাদিগকে পুরস্কার হিসাবে জান্নাত দান করা হইবে।

এইভাবে আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল সত্যিকারভাবে একটি পরস্পরিক প্রতিশ্রুতি, যেখানে উভয় পক্ষ নির্ধারিত বাধ্যবাধকতা পালনে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় এবং এই মর্মে তাঁহারা শপথ গ্রহণ করেন। বিষয়টিকে উভয় ওজনদণ্ডে পরিমাপ করিলে দেখা যাইবে যে, আনসারগণ যৌথ দর কষাকষিতে প্রকৃতপক্ষে একটি অত্যন্ত অনুকূল ও লাভজনক অবস্থানে উন্নীত হন। তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আজীবন তাঁহাদের সহিত সংযুক্ত করেন এবং তাঁহাদের জন্য জান্নাত অর্জনের চিরস্থায়ী কল্যাণ লাভ করেন এবং যখন পরীক্ষার সময় উপস্থিত হয় তখন বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা এই দুইটি জিনিসকে অন্য সকল বিবেচনার উর্ধ্বে স্থান দেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হস্তে কে প্রথম বায়'আত হন সেই বিষয়ে বর্ণনাকারীদের বর্ণনার মধ্যে মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন, বানূ নাজজার গোত্রের দাবি অনুযায়ী তিনি ছিলেন আস'আদ ইব্‌ন যুরারা; বানূ 'আবদুল আশহাল গোত্রের মতে এই ব্যক্তি ছিলেন আবুল হায়ছাম ইব্‌নুত তায়্যিহান। অপরপক্ষে ঐ প্রতিশ্রুতিতে অংশগ্রহণকারী কা'ব ইব্‌ন মালিকের মতে আল-বারা'আ ইব্‌ন মা'রূরই ছিলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হস্তে সর্বপ্রথম বায়'আত হন।[২১]

প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন বর্ণনায় ঘুরিয়া ফিরিয়া এই নামগুলিই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিষয়ে মতদ্বৈধতা এবং সুনিশ্চিতভাবে সঠিক নামটি বলিতে না পারার কারণ সম্ভবত এই যে, প্রধানত এই তিন ব্যক্তিই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাহাদের নিজ সম্প্রদায়ের লোকজন, এই উভয় পক্ষকে উদ্দেশ্য করিয়া বক্তব্য রাখেন এবং এহেন প্রক্রিয়ায় উক্ত অঙ্গীকারনামা গ্রহণের স্বপক্ষে তাহাদের ঐকমত্য ঘোষণা করেন। বিষয়বস্তু এবং মদীনাতে ঘটনার ক্রমবিকাশের পটভূমি হইতে এই আভাসই পাওয়া যায় যে, খুব সম্ভব আস'আদ ইব্‌ন যুরারা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হস্তে সর্বপ্রথম বায়'আত হইয়া থাকিবেন। অন্যরা তাঁহার পরে ইহা করেন।[২২]

বিভিন্ন বর্ণনা হইতে 'আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিতে আনসারদের জন্য নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলীর যে বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ[২৩]

১. তাঁহারা অদ্বিতীয় আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করিবেন এবং তাঁহার সহিত কোন শরীক করিবেন না।[২৪]

২. তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার সাহাবীদিগকে (মুহাজিরগণকে) যখন তাঁহারা মদীনাতে হিজরত করিবেন, তখন আশ্রয় দান করিবেন।[২৫]

৩. তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার সাহাবীগণকে যে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে ঐরূপ প্রতিরক্ষা দান করিবেন যেমনটি তাঁহারা (আনসারগণ) তাঁহাদের নিজেদের পরিবারবর্গ ও সন্তান-সন্ততিদের ক্ষেত্রে করিয়া থাকেন।[২৬]

৪. উপরের অঙ্গীকারগুলি বাস্তবায়নের ব্যয় এবং আর্থিক দায়দায়িত্ব তাঁহাদের পক্ষে সহজ হউক বা কঠিন হউক তাঁহারা তাহা বহন করিবেন।[২৭]

৫. তাঁহারা সুখে-দুঃখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ পালন করিবেন; তাঁহারা উহা পছন্দ করুন বা না করুন, এমনকি যদিও আপাত দৃষ্টিতে তাহা তাঁহাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলিয়া প্রতীয়মান হয়।[২৮]

৬. তাঁহারা আইনগত কর্তৃপক্ষের সহিত বিরোধ বা তর্কে লিপ্ত হইবেন না।[২৯]

৭. তাঁহারা সৎ কার্যের পরামর্শ দিবেন এবং অসৎ কার্য হইতে দূরে থাকিবেন।[৩০]

৮. তাহারা সবখানে সকল অবস্থায় সত্য বলিবেন এবং তিরস্কার বা লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভয় না করিয়া সত্য ধর্ম ও আল্লাহর ভাবমর্যাদাকে ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিবেন।[৩১]

বায়'আত শেষে রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদিগকে তাঁহাদের মধ্য হইতে এমন ১২ জন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করিতে বলেন যাঁহারা প্রতিনিধি বা নেতা (নকীব) হিসাবে মদীনাতে তাঁহাদের বিষয়াদির দেখাশুনা করিবেন ও সংগঠন প্রতিষ্ঠা করিবেন। সুতরাং তাঁহারা ১২ জন লোককে নির্বাচিত করেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন খাযরাজ গোত্রের ৯ জন এবং 'আওস গোত্রের ৩ জন। নিম্নে তাঁহাদের বর্ণনা প্রদান করা হইল :

১. আস'আদ ইব্ন যুরারা (আবূ উমামা)	খাযরাজ গোত্র
২. সা'দ ইবনুর-রাবী' ইব্ন 'আমর	"
৩. 'আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা ইব্ন ছা'লাবা	"
৪. রাফে' ইব্ন মালিক ইবনু'ল-'আজলান	"
৫. আল-বারাআ ইব্ন মা'রূর ইব্ন স'াখর	"
৬. 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর ইব্ন হারাম	"
৭. উবাদা ইবনুস সামিত ইব্ন কায়স	"
৮. সা'দ ইব্ন 'উবাদা ইব্ন সুলায়ম	"
৯. আল-মুনযির ইব্ন 'আমর ইবনুল খুনায়স	"
১০. 'উসায়দ ইব্দ হুদায়র ইব্ন সিমাক	আওস গোত্রের
১১. সা'দ ইব্ন খায়ছামা ইবনুল হারিছ	"
১২. রিফা'আ ইব্ন 'আবদুল মুনযির ইবন যুবায়র	"[৩২]

সভার কার্যক্রম অত্যন্ত গোপনে এবং যথাসম্ভব কম সময়ে সম্পন্ন করা হয়। এজন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারদিগকে তাঁহাদের বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করিতে বলেন যাহাতে একদিকে তাঁহাদের সঙ্গী বহু ঈশ্বরবাদী হজ্জযাত্রিগণ এবং অন্যদিকে কুরায়শ সম্প্রদায়ের লোকেরা তাহাদের বিষয়ে অবহিত হইতে না পারে। তথাপি ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এক শয়তান (মানুষ অথবা জিন জাতির মধ্য হইতে) বিষয়টি জানিয়া ফেলে। নিকটবর্তী একটি পাহাড়ের চূড়া হইতে কুরায়শগণকে সম্বোধন করিয়া যথাসম্ভব উচ্চস্বরে সে বলে, "হে শিবিরবাসিগণ! ঘৃণ্য ব্যক্তি (এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বুঝানো হইয়াছে) এবং স্বধর্মত্যাগী ব্যক্তিগণ (সু'বাহ, স'াবি-এর বহুবচন) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য এইমাত্র চুক্তিবদ্ধ হইল।"

ইহা শুনিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ আনসারগণকে বলেন, ঐ চিৎকারকারী হইতেছে মিনার একটি শয়তান। তারপর শয়তানের দিকে ফিরিয়া তিনি বলেন, "হে আল্লাহর শত্রু! আমি ইনশাআল্লাহ তোর মুকাবিলা করিব।" অতঃপর তিনি আনসারগণকে দ্রুত তাঁহাদের স্ব স্ব শিবিরে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। তাঁহারা তাহাই করিলেন। বিদায়ের মুহূর্তে আল-আব্বাস ইব্ন নাদলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সম্বোধন করিয়া বলেন, "সেই আল্লাহর কসম যিনি আপনাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করিয়াছেন! যদি আপনি চাহেন, আগামী কাল আমরা আমাদের তরবারিসহ মিনার লোকদের (অর্থাৎ কুরায়শদের) উপর ঝাঁপাইয়া পড়িব।" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলিলেন, "আমরা এখনও এরূপ করিবার নির্দেশ প্রাপ্ত হই নাই।" সুতরাং তাহারা তাহাদের শিবিরসমূহে প্রত্যাগমন করিয়া রাত্রির অবশিষ্টাংশের জন্য নিদ্রাগত হইলেন।[৩৩]

বিষয়টি অবশ্য সম্পূর্ণ গোপন রহিল না। সকাল বেলা কুরায়শদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ মদীনাবাসীদের শিবিরে আসিয়া অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিল, "আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, তোমরা আমাদের এই লোককে আমাদের মধ্য হইতে তোমাদের সহিত লইয়া যাইবার জন্য এখানে আগমন করিয়াছ। আমরা ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তাঁহার সহিত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছ। আল্লাহর কসম! আরবদেশে এমন আর কোন সম্প্রদায় নাই যাহাদের সহিত যুদ্ধকে আমরা তোমাদের চেয়ে বেশী ঘৃণা করি।"

ইহাতে মদীনার অবিশ্বাসী লোকেরা আশ্চর্যান্বিত হইল। তাহারা ছিল নিরীহ, তাই তাহারা প্রতিবাদ করিল এবং আল্লাহ্র শপথ নিয়া বলিল যে, তাহারা অভিযুক্ত বিষয়ে কিছুই জানে না। তাহারা সত্য বলিয়াছিল, কারণ তাহারা প্রকৃত ঘটনা অবগত ছিল না। যাহা হউক, আনসারগণ তাহাদের পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করিলেন। মদীনাবাসীদের এইরূপ প্রতিবাদের মুখে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ, যাহাদের মধ্যে ছিলেন বানূ মাখযূমের আল-হারিছ ইব্ন হিশাম ইব্ন আল-মুগীরা, সেই স্থান ত্যাগ করে।[৩৪]

কুরায়শগণ বিষয়টির সেখানে ইতি টানে নাই। তাহারা এই বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করে এবং জানিতে পারে যে, ঘটনাটি সত্য। ইতোমধ্যে হজ্জযাত্রীরা মিনা ত্যাগ করে। সুতরাং কুরায়শ গোত্রের একদল লোক অত্যন্ত মরিয়া হইয়া আনসারদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। মক্কা হইতে আনুমানিক পাঁচ মাইল দূরবর্তী আযাকির নামক স্থানে তাহারা একদল মদীনাবাসীর সন্ধান পায় এবং সা'দ ইব্ন 'উবাদা ও আল-মুনযির ইব্ন আমরকে গ্রেফতার করিতে সক্ষম হয়। তাঁহারা উভয়ে ছিলেন ১২ নাকীবের অন্তর্ভুক্ত। আল-মুনযির শক্তিতে তাহার গ্রেফতারকারিগণকে পরাজিত করিয়া পলায়ন করেন। সা'দকে বন্দী করা হয়। তাঁহার হাত দুইটিকে তাঁহার গলার সহিত বাঁধিয়া তাঁহাকে মাটির উপর দিয়া টানিয়া মক্কাতে আনয়ন করা হয়। সেখানে তাঁহাকে মারধর ও নির্যাতন করা হয়। তাঁহাকে দেখিয়া একজন প্রত্যক্ষদর্শীর দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি তাঁহার নিকট জানিতে চাহেন,

কুরায়শ গোত্রের মধ্যে তাঁহার পরিচিত এমন কোন লোকজন আছে কিনা যাহাদের নিকট হইতে সাহায্য ও সুরক্ষা প্রাপ্তির জন্য তাহার পারস্পরিক সমঝোতা রহিয়াছে।

সা'দ (রা) বলেন, তিনি জুবায়র ইব্ন মুত'ইম ইব্ন 'আদী ও আল-হারিছ ইব্ন হারব ইব্ন উমায়্যাকে চিনেন। যখন তাহারা ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে মদীনাতে গমন করেন তখন তিনি তাহাদের সাহায্য ও সুরক্ষা দান করেন। তখন প্রত্যক্ষদর্শী ঐ দুই ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করিয়া সাহায্য প্রার্থনার জন্য সা'দকে পরামর্শ দেন। তিনি তাহাই করেন। মক্কাবাসী ব্যক্তিটি তখন ঐ দুই ব্যক্তির নিকট গমন করেন। তাহারা তখন কা'বা প্রাঙ্গণে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি তাহাদিগকে অবহিত করেন যে, সা'দ ইব্ন 'উবাদা নামক খাযরাজ গোত্রীয় এক ব্যক্তিকে শহরের একটি নির্দিষ্ট স্থানে মারধর ও নির্যাতন করা হইতেছে এবং তিনি (সা'দ) তাহাদের নিকট হইতে সাহায্যের আশায় আর্তচিৎকার করিতেছেন। তাহারা স্মরণ করেন যে, বাস্তবিকই তাহাদের মদীনাতে অবস্থানকালে তিনি সুরক্ষা প্রদান করেন। অতএব তাহারা দ্রুত ঘটনাস্থলে গমন করেন, সা'দকে তাঁহার নির্যাতনকারীদের কবল হইতে উদ্ধার করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার সম্প্রদায়ের লোকদের নিকট প্রত্যাগমনের সুযোগ করিয়া দেন।

পাঁচ ঃ দ্বিতীয় 'আকাবা প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য ও প্রকৃতি

প্রাথমিক এবং সুদূরপ্রসারী, উভয় তাৎপর্যের দিক হইতে বিবেচনা করিলে আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিকে বিশ্বের ইতিহাসে এই যাবতকালের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিসমূহের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলা যাইতে পারে। ইহা ছিল মুসলমানদের পরবর্তী কর্মকাণ্ডের মূলসূত্র ও বুনিয়াদ, যাহার ফলে মুসলমানগণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষে মদীনাতে হিজরত করা সম্ভব হয়। সেখানে একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা, মুহাজিরগণ ও আনসারদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সংস্থান করা, কাফিরদের বিরুদ্ধে চরম বিজয় অর্জন করা, প্রাথমিকভাবে নিখিল আরবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং পরবর্তীতে সমগ্র সভ্য জগতকে একক রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে আনয়ন এবং যুগপৎ পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ইসলামকে একটি আলোকদীপ্ত সভ্যতার সূচক ও সাংস্কৃতিক শক্তি হিসাবে অগ্রসরমান করাও সহজ হয়। আকাবাতে ৬২১-২২ খৃষ্টাব্দের সেই স্মরণীয় রজনীতে একপক্ষে মদীনার পঁচাত্তর জন নর-নারী এবং অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ (তৎসহ তাঁহার চাচা আল-'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব) প্রকতপক্ষে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেন।

এই স্মরণীয় কর্মের অংশগ্রহণকারিগণ, তাহারা যে প্রদত্ত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছিলেন উহার মর্মার্থ সমধিক অবগত ছিলেন। সভার কার্যবিবরণী এবং বিভিন্ন বক্তার বক্তব্য হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা এই কর্মভার ও দায়দায়িত্ব ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ঘটনাবলীর পরিপূর্ণ জ্ঞান ও উপলব্ধিসহ গ্রহণ করেন। চুক্তিনামার বিভিন্ন ধারা, যেমন আনসারগণ সুখে-দুঃখে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নির্দেশ পালন করিয়া চলিবেন, তাঁহারা আইনসঙ্গতভাবে গঠিত কর্তৃপক্ষের সহিত বিরোধ ও

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে বিরত থাকিবেন এবং ন্যায়-ধর্মের প্রতিরক্ষায় তাহাদের জীবন ও সহায়-সম্পদ উৎসর্গ করিবেন, ইত্যপ্রকার বিষয় সকলের সংস্থান হইতে তথায় একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্ব-ধারণা লাভ করা যায়। আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির শর্তগুলি ছিল বলিতে গেলে পরবর্তীতে মদীনাতে গঠিতব্য রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মূলনীতি। সুতরাং ইহাতে আশ্চর্যান্বিত হইবার কিছু নাই। উক্ত মহৎ কর্মের একজন অংশগ্রহণকারী কা'ব ইব্ন মালিক যখন বার্ধক্যে উপনীত হন এবং অন্ধ হইয়া যান তখন এই বলিয়া গর্ব অনুভব করিতেন যে, তিনি ছিলেন তাহাদের একজন যাহারা এই চুক্তিনামাটি সম্পাদন করেন। তৎসহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিতে না পারায় তিনি নিজকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দেন যে, তাঁহার মতে, বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা অপেক্ষা আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিতে অংশগ্রহণ করা ছিল আরও অনেক বেশী মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ, যদিও লোকেরা বদর যুদ্ধের বিষয়ে অধিক আলোচনা করিয়া থাকেন।[৩৫] তাঁহার এই অনুভূতি যুক্তিসঙ্গত বটে।

অন্য আরেকটি দিক হইতে আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি পৃথিবীর ইতিহাসে অদ্বিতীয় রূপ লাভ করিয়াছে। অন্য আর কোন ঐতিহাসিক চুক্তিনামার ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে এত আন্তরিকতা ও এত সদিচ্ছার সহিত সমঝোতা চুক্তির সকল শর্ত পালন করিতে দেখা যায় নাই। আনসারগণ আনন্দিত চিত্তে এবং উদারভাবে মুহাজিরগণকে আশ্রয় ও সুরক্ষা দান করেন। তাঁহারা একে অপরের সহায়-সম্পদ ভাগাভাগি করিয়া ভোগ করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের স্বার্থে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহাদের জীবন দান করেন, সুখে-দুঃখে, এমনকি তাঁহাদের অব্যবহিত স্বার্থের পরিপন্থী হইলেও অনুসরণ করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁহাদের দেয়া এই প্রতিশ্রুতি হইতে কখনও বিন্দুমাত্র বিচ্যুতও হন নাই।

অপরপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুহাজিরগণ চিরতরে তাঁহাদের জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করেন, মদীনা ও ইহার লোকজনকে তাঁহাদের নিজ ভূমি ও মাতৃ-সম্প্রদায় হিসাবে গ্রহণ করেন এবং কখনও স্থায়ীভাবে তাঁহাদের জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই, এমনকি পরিস্থিতি যখন সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের অনুকূলে আসে তখনও নয়। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা ত্যাগের প্রাক্কালে অবশ্যই ব্যথিত হন এবং জন্মভূমির জন্য তিনি আজীবন দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, তথাপি তিনি চিরকালের জন্য শহরটি ত্যাগ করেন এবং আর কখনও স্থায়ীভাবে সেখানে ফিরিয়া আসেন নাই। এমনকি তিনি যখন সেখানে হজ্জযাত্রী হিসাবে আগমন করিতেন তখনও তিনি স্থানটিকে তাঁহার আবাসস্থল হিসাবে গণ্য করিতেন না এবং দূরবর্তী স্থানসমূহ হইতে সেখানে আগত পর্যটকদের জন্য নির্ধারিত হ্রাসকৃত সালাত (কসর-এর নামায) আদায়ের মাধ্যমে ইহা তিনি ব্যক্ত করিতেন। প্রাক্তন ইয়াছরিব চিরকালের জন্য মদীনা (মদীনাতুন্নবী বা মহানবীর শহর) নামে পরিচিতি লাভ করে। ইহার কারণ শুধু এই নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে হিজরত করেন অথবা শুধু এইজন্য নয় যে, তিনি ইহাকে প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র বা ইহাকে ইসলামের পরবর্তী

বিজয়গুলির উৎসমূল হিসাবে পরিগণিত করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই নামকরণের প্রাথমিক কারণ ছিল আকাবার চুক্তিনামা যাহার ধারামতে তিনি মদীনাকে তাঁহার নিজ ভূমি বা দেশ হিসাবে বিবেচনা করেন, ইহার লোকজনকে তিনি নিজ সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করেন। এমনকি তাঁহাদের প্রয়োজন শেষ হইলেও তিনি কখনও এস্থান ত্যাগ করেন নাই। তিনি আজীবন সেখানে বসবাস করেন এবং তিনি সেখানে সমাহিত আছেন। ইসলামী বিশ্বে এবং মুসলমানদের মনে বর্তমানে মদীনার যে ভাবমর্যাদা তাহা আকাবা চুক্তির একটি প্রত্যক্ষ সুফল হিসাবে বিবেচিত হয়।

এতদ্‌সত্ত্বেও চুক্তিটি (প্রতিশ্রুতি) শুধু মৌখিকভাবে করা হয়, লিখিতভাবে নহে। বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া আবশ্যক। কারণ, ইহার উপসংহার ও বাস্তবায়ন উভয়ের সংযোগ শক্তির পশ্চাতে ছিল ঈমানের বল ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা।

যখন আকাবাতে আনসারগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলেন, "গ্রহণ করুন (বা চুক্তি করুন) হে আল্লাহর রাসূল! আপনার জন্য এবং আপনার প্রভুর জন্য যাহা আপনার অভিরুচি", তখন ইহাতে তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাসের গভীরতা, ইসলামের ধর্মের জন্য তাঁহাদের সবকিছু উৎসর্গ করার ঐকান্তিকতা এবং ইহার স্বার্থে কঠিনতম বাধ্যবাধকতাগুলি পালনে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, 'আকবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল মদীনাতে ইসলামের প্রাথমিক সাফল্যের ফল, ইহার কারণ নয়, যদিও প্রকারান্তরে ইহা ইসলামের অধিকতর সাফল্যগুলির সূচনাপর্ব হিসাবে বিবেচিত হয়।

উক্ত প্রতিশ্রুতির একজন অংশগ্রহণকারী উবাদা ইবনুস সামিত (রা) চুক্তিটিকে 'যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার' (বায়'আত আল-হ'ারব) হিসাবে আখ্যায়িত করেন।[৩৬]

ইব্‌ন ইসহাক, উপরিউক্ত মতের সমর্থনে আরও বলেন, চুক্তিটিকে ঐরূপ আখ্যায়িত করার কারণ হইতেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐ সময় নাগাদ যুদ্ধের অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন।[৩৭] শেষোক্ত বক্তব্যটি সত্য নহে। যুদ্ধ করার অনুমতি হিজরতের পরে পাওয়া গিয়াছিল, যেমন কুরআন মাজীদের ২২ঃ ৩৯-৪০ সংখ্যক আয়াতগুলিতে স্পষ্টভাবে ঐ অনুমতির ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে। এই আয়াতগুলিতে বলা হয়, "যাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে এবং যাহাদিগকে ঘরছাড়া করা হইয়াছে, তাহাদিগকে (যুদ্ধের জন্য) অনুমতি প্রদান করা হইল..." ইত্যাদি। স্পষ্টতই তাঁহারা গৃহহীন হইবার অব্যবহিত পর অর্থাৎ হিজরতের পর যুদ্ধের অনুমতি পাওয়া গিয়াছিল, আল-'আব্বাস ইব্‌ন উবাদা ইব্‌ন নাদলা (রা) আকাবা চুক্তির অব্যবহিত পরে কুরায়শদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার অতি উৎসাহ ব্যক্ত করিলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে যে জবাব দেন যাহা ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণনায় বিধৃত হইয়াছে, তাহাতেও ইহার স্বপক্ষে প্রমাণ মিলে।[৩৮]

মহানবী ﷺ বলিয়াছিলেন, "আমরা এখনও উহা করার অনুমতি প্রাপ্ত হই নাই"। অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে, 'উবাদা ইবনুস সামিত কর্তৃক আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতিকে "যুদ্ধের জন্য অঙ্গীকার" হিসাবে আখ্যায়িত করা সঠিক হয় নাই। চুক্তিতে অংশগ্রহণকারিগণ কর্তৃক গৃহীত বাধ্যবাধকতা ও সেই বিষয়ে তাহারা যে সম্পূর্ণ সজাগ ছিলেন, উপরিউক্ত বক্তব্যে সেই ইঙ্গিত ও গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁহারা পরিষ্কারভাবে ইহার ধারণা লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের বক্তব্যে এইরূপ আভাস দেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে তাঁহাদের দলভুক্ত করার অর্থ হইতেছে ইহাতে তাহারা শুধু কুরায়শগণের নহে, বরং অন্যান্য আরবগণেরও বৈরিতা ও আক্রমণের শিকার হইবেন। সুতরাং আনসারগণ ইহাও উপলব্ধি করেন যে, ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্বার্থে যুদ্ধে জান-মাল কুরবানী করার জন্য তাঁহাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ -ও বারংবার তাঁহাদিগকে তাহাদের গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহের ফলাফল পর্যালোচনার পরামর্শ দেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার সাহাবীদের প্রতিরক্ষার জন্য তাঁহাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে বলেন تَمْنَعُونِّي। এভাবে আকবার দ্বিতীয় চুক্তিটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের প্রতিরক্ষায় যুদ্ধের অঙ্গীকার। ইহা আবশ্যিকভাবে ছিল একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি।

ছয় ঃ মদীনায় ইসলামের বিজয়ের কারণসমূহ

উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, 'আকাবার দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি ছিল প্রকৃতপক্ষে মদীনাতে ইসলামের প্রাথমিক সাফল্যের ফল। এই সাফল্যের কারণসমূহের মধ্যে প্রথম ও সর্বাগ্রে বিবেচ্য বিষয়টি হইতেছে মদীনাবাসীদের উপর মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। কারণ আল্লাহই সবকিছুর নিয়ন্তা এবং ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর ইচ্ছা ছিল, মদীনা হইবে ইসলামের সাফল্যের ভিত্তিভূমি।

পার্থিব কারণসমূহের মধ্যে সর্বাগ্রবর্তী হিসাবে 'আইশা (রা) বুআছ যুদ্ধের ফলাফল বিষয়ে যে তথ্য নির্দেশ করেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন যে, বু'আছ যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মদীনাতে ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গ্রহণের পটভূমি প্রস্তুত করেন। কারণ ঐ যুদ্ধের ফলে আওস ও খাযরাজ গোত্রের প্রায় সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি নিহত হন এবং গোত্রদ্বয় সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত ও বিভক্ত হইয়া পড়ে'।[৪০] প্রকৃতপক্ষে একজন সর্বজনগ্রাহ্য ও বিজ্ঞ নেতার নেতৃত্বে শান্তি ও সমতার নব ভিত্তিতে গঠিত একটি সমাজ ব্যবস্থায় নূতনভাবে জীবনযাত্রা শুরু করা তাহাদের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। ইসলাম সেই নবভিত্তির যোগান দেয় এবং শান্তি ও ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিতব্য জীবন ব্যবস্থায় নেতৃত্ব দানের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের নিকট আল্লাহ প্রেরিত একজন প্রাকৃতিক নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তিত্ব হিসাবে আবির্ভূত হন।

তৃতীয় কারণটি ছিল মদীনাতে ইয়াহূদীদের অস্তিত্ব। ইহা দ্বিবিধভাবে কার্যকর হয়। একপক্ষে ইয়াহূদীরা নিজেদের মধ্যে একজন নবীর আশু আগমন সম্পর্কে বলাবলি করিত। তাহারা আরও বলিত যে, ঐ নবীকে তাহারা অনুসরণ করিবে এবং তাঁহার সাহায্যে 'আওস ও খাযরাজ

গোত্রদ্বয়কে তাহারা মদীনা হইতে উৎখাত করিবে। স্বভাবতই ইহা শেষোক্ত গোত্রদ্বয়কে ভাবী নবী সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু করিয়া তোলে। ইতোপূর্বে যেরূপ ইঙ্গিত প্রদান করা হইয়াছে,[৪১] তাঁহাদের এই আগ্রহের কারণে তাঁহাদের কতিপয় ব্যক্তি আকাবাতে মহানবী ﷺ -এর সহিত প্রথম সাক্ষাতেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন।

অপরপক্ষে ইয়াহূদীরা আওস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে এক ব্যাপক অত্যাচারী ও অন্যায্য সূদ ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্বিকভাবে শোষণ করিত এবং তাহারা এক গোত্রকে আরেক গোত্রের বিরুদ্ধ লেলাইয়া দিয়া তামাশা দেখিত। অবশেষে উভয় গোত্র ইয়াহূদীদের এই নিষ্ঠুর খেলার মারপ্যাচ বুঝিতে পারে এবং তাহারা শোষণের নির্মম আবর্ত হইতে মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবনে দৃঢ়সংকল্প হয়।

একই কারণে উভয় গোত্র কোন ইয়াহূদী বা তাহাদের অনুগত কাহারও অধীনে ঐক্যবদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক ছিল। ইসলাম কাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতার পথ প্রদর্শন করে এবং মহানবী ﷺ তাহাদের বহু প্রত্যাশিত অভিন্ন নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করেন। এইভাবে ঐ সময়ে খৃস্টান ও ইয়াহূদীদের দুর্নীতি ও তদ্দ্বারা আল্লাহর নাযিলকৃত আসমানী কিতাবসমূহকে বিকৃত ও বিপথগামী করায় ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক পটভূমি নির্মিত হয় এবং অবশেষে মদীনার ইয়াহূদীগণ কর্তৃক আর্থিক শোষণ ও রাজনৈতিক নীতিজ্ঞানহীতা তাহাদের পাপের ষোলকলা পূর্ণ করে। ইহার ফলে মদীনার অ-ইয়াহূদী জনগণের মধ্যে ইসলামের আশ্চর্যজনক সাফল্য সূচিত হয়।

এই প্রসঙ্গে ইয়াহূদী ও খৃস্টান লেখকদের একটি দাবি প্রণিধানযোগ্য। এখানে প্রায়শই তাহারা বলেন, ইয়াহূদীদের দ্বারা প্রবর্তিত একেশ্বরবাদ আওস ও খাযরাজ গোত্রের লোকদিগকে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত একত্ববাদ গ্রহণে প্রভাবিত করে। ইহা ঐরূপ সঙ্গত বা সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, যেরূপ কিনা দাবি করা হয় যে, ইয়াহূদী ও খৃস্টান ধর্মের প্রভাব হইতে ইসলাম ধর্মের সূত্রপাত হইয়াছে। উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত যুক্তিটি শেষোক্তের একটি সম্প্রসারণ মাত্র। মদীনার ইয়াহূদীদের নৈতিকতা ও আচার-ব্যবহার তাহাদের ধর্মের প্রতি অ-ইয়াহূদী জনগণকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণ করিয়াছিল। যদি ইয়াহূদীদের একত্ববাদ তাহাদের নিকট কোন আবেদন সৃষ্টি করিত, তবে ইসলামের অভ্যুদয় বা মহানবী ﷺ-এর মদীনাতে হিজরতের অব্যবহিত পূর্ববর্তী বর্ষসমূহে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোকজন ইয়াহূদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইত। কিন্তু ইতিহাস তাহা বলে না।

মদীনাতে ইসলামের সাফল্যের চতুর্থ কারণ হিসাবে ঐ স্থানের লোকদের মেযাজ-প্রকৃতির কথা উল্লেখ করা যায়। স্থানটির আবহাওয়া যেমন মক্কা হইতে ভিন্ন, তেমনি ইহার অধিবাসিগণও মক্কার তুলনায় ভিন্নরূপ অর্থাৎ প্রকৃতিগতভাবে তাহারা আরও ভদ্র, নম্র ও পরোপকারী। এই দুইটি স্থানের আবহাওয়া এবং সেগুলিতে বসবাসকারী লোকদের মেযাজ ও প্রকৃতিগত পার্থক্য অদ্যাবধি দর্শনযোগ্য। সুতরাং স্বভাবতই মদীনাতে ইসলাম অধিক আন্তরিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে।

সর্বশেষ হইলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, যেমন একজন লেখক উল্লেখ করিয়াছেন,[৪২] মক্কাবাসিগণ কর্তৃক ইসলামের বিরোধিতা করার মূল কারণগুলি মদীনাতে সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল। মক্কার নেতৃবৃন্দ কর্তৃক ইসলামের বিরোধিতা করার একটি সর্বাগ্রবর্তী কারণ ছিল মহানবী -এর সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইতে উদ্ভূত ঈর্ষা ও দাম্ভিকতা। তিনি ছিলেন তাহাদের আপনজনদের মধ্যে একজন, যিনি তাহাদের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া লালিত-পালিত হইয়া বড় হইয়াছেন। সুতরাং মক্কার বয়োজ্যেষ্ঠরা তাঁহার প্রতি সেই প্রকৃতিগত ঈর্ষান্বিত দৃষ্টিভঙ্গিই পোষণ করিত যাহা ঘনিষ্ঠতাসম্ভূত। তাহাদের সমাজের একজন বয়োকনিষ্ঠ সদস্যের নেতৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণকে তাহারা মানিয়া লইতে পারে নাই। তাহাদের বয়োজ্যেষ্ঠতা এবং রক্তসম্পর্কের কারণে তাহারা তাঁহার নিকট হইতে নির্ভেজাল আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। তাহারা কোনক্রমেই আশা করে নাই যে, তিনি নেতৃত্ব ও নির্দেশনায় তাহাদিগকে অতিক্রম করার যোগ্যতা অর্জন করিবেন। বিরোধিতার এই প্রাকৃতিক কারণ সহজভাবেই মদীনাতে অনুপস্থিত ছিল।

দ্বিতীয়ত, মক্কার বয়োজ্যেষ্ঠরা একটি পুরোহিত শ্রেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল যাহাদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব ও আর্থিক স্বার্থ কা'বা ঘরকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট ধর্মীয় প্রথা ও পূজা ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ইহার অব্যাহত চর্চার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। ইসলাম ও মহানবী তাহাদের সেই কায়েমি স্বার্থের প্রতি এক প্রত্যক্ষ হুমকি হইয়া দাঁড়ান। প্রধানত এই পুরোহিত শ্রেণীর বয়োজ্যেষ্ঠরাই মক্কাতে বিরোধিতার আয়োজন করিয়াছিল। মদীনাতে এরূপ কোন পুরোহিত শ্রেণী ছিল না যাহাদের কায়েমি স্বার্থের বিরুদ্ধে ইসলাম কোন হুমকি হইতে পারে। সুতরাং মহানবী ও ইসলাম তথায় তুলনামূলকভাবে বরং অধিক সমাদরে আদৃত হন।

উপরে যাহাই বর্ণিত হউক না কেন, সর্বোপরি ইহাই স্মর্তব্য যে, ইসলামের অন্তর্নিহিত গুণমান ও ইহার শিক্ষা এবং মহানবী -এর চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব মদীনার লোকদিগকে সর্বাধিক প্রভাবান্বিত করিয়াছিল।

অনুবাদ ঃ মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ

তথ্যনির্দেশিকা

১. মিনাতে, প্রথম জামরার নিকটে।

২. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪২৮-৪২৯; আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৯৮-২৯৯।

৩. ইব্ন সা'দ, ১খ, ২১৮-২১৯।

৪. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪২৯-৪৩০।

৫. ইব্ন সা'দ, ১খ, ২১৮-২১৯।

৬. বর্ণনাটির বিভিন্ন ভাষ্যে যে বিবরণ পরিলক্ষিত হয় সে সমস্ত সূত্র হইতে এস্থলে সেইগুলির একটি সারসংক্ষেপ প্রদান করা হইল। উদাহরণস্বরূপ দেখুন বুখারী, নং ১৮, ৩৮৯২, ৩৮৯৩, ৩৯৯৯, ৪৮৯৪,

৬৭৮৪, ৬৮০১, ৬৮৭৩, ৭০৫৫, ৭১৯৯, ৭২১৩, ৭৪৬৮; মুসলিম, নং ১৭০৯, ১৮০৯; মুসনাদ, ৩খ, ৪৪১; ৪খ, ১১৯; ৫খ, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, নাসাঈ, নং ৪১৪৯-৪১৫৩, ৪১৬০, ৪১৬১, ৫০০২; ইব্‌ন মাজা, নং ২৮৬৬; তায়ালিসী, নং ৫৭৯; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ, ৪৩৬-৪৩৭; ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৩৩-৪৩৪।

৭: দেখুন, কুরআন মাজীদ, ৬০ ঃ ১২।

৮. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৩৪।

৯. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৩৪; মুসনাদ, ৪খ, ২৮৪, ২৮৯; তায়ালিসী, নং ৭০৪; আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ২৯৯।

১০. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৩৫; ইব্‌ন মাজা, নং ১০৮২; আবূ দাঊদ, কিতাব-২, বাব ২০৯।

১১. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৩৫-৪৩৮; আল-বায়হাকী, দালাইল, ২খ, ২৩৮-২৪০; আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ৩০৭-৩০৮।

১২. ইব্‌ন শ্যািম, ১খ, ৪৩৮।

১৩. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৪০-৪৪১।

১৪. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৪১।

১৫. প্রাগুক্ত।

১৬. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৪২; মুসনাদ, ৩খ, ৩২৩, ৩৩৯, ৪৬১-৪৬২; আত-তাবারানী, আল-মু'জামুল কাবীর, ১৯খ, ৮৯; আল-হায়ছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, ৬খ, ৪৭। মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

ابايعكم على ان تمنعونى مما تمنعون نساءكم وابناءكم .

১৭. প্রাগুক্ত।

১৮. আবূ নু'আয়ম, দালাইল, পৃ. ৩০৪, ৩০৯।

১৯. মুসনাদ, ৩খ, ৩২২-৩২৩, ৩৩৯-৩৪০; ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা, পৃ. ২৩১।

২০. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৪৬; মুসানাদ, ৩খ, ৩২২।

২১. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৪৭।

২২. উপস্থিত ভদ্রমহিলাদ্বয় মহানবী ﷺ-এর হস্ত স্পর্শ না করিয়াই বায়'আত গ্রহণ করেন (দ্র.. বুখারী, নং ৫২৮৮)।

২৩. দেখুন বুখারী, নং ৭১৯৯, ৭২০২; মুসলিম, নং ১৮৪১; মুসনাদ, ৩খ, ৩২২, ৩২৩, ৩৩৯, ৩৪০, ৪৪১, ৪৬১, ৪খ, ১১৯-১২০, ৫খ, ৩১৪, ৩১৬, ৩'৮, ৩১৯, ৩২১, ৩২৫ এবং আল-বায়হাকী; দালাইল, ২খ, ৪৪৩, ৪৫২।

২৪. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ وَاسَالُكُم لِحَرْبِى عَزَّ وَجَلَّ اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا (উদাহরণ-স্বরূপ দ্র. মুসনাদ, ৪খ ১১৯-১২০)।

২৫. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ وَاِنْ تَوَوْنَا وَتَنْصُرُوْ اَو قدمْتُ يَثْرَبَ (উদাহরণস্বরূপ দ্র. প্রাগুক্ত; আরও দ্র. ৩খ, ৩৪০)।

২৬. মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ وَتَمْنَعُوْنِىْ مِمَّا تَمْنَعُوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَزْوَاجَكُمْ وَاَبْنَاءَكُمْ

২৭. উদাহরণস্বরূপ দেখুন প্রাগুক্ত। মূল পাঠ এই ঃ اَلنفقة فِى الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ

২৮. উদাহরণস্বরূপ দেখুন মুসনাদ, ৩খ, ৪৪১। মূল পাঠ এই ঃ

على السَّمْعِ وَالطَّاعَةَ فِى عسرنا وَيَسَّرنا.......والاثرة عَلَيْنَا .

২৯. উদাহরণস্বরূপ দ্র.. ঐ; আরও দ্র. বুখারী, নং ৭১৯৯; মুসলিম, নং ১৮৪১। বক্তব্য এই ঃ

وَاِنْ لا تنازع الامر اهله .

৩০. উদাহরণস্বরূপ দেখুন মুসনাদ, ৩খ, ৩২২-৩২৩, ৩৩৯-৩৪০। বক্তব্য এই ঃ

عَلَى الأَمْرِ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىِ عَنِ الْمُنْكَرِ .

৩১. উদাহরণস্বরূপ দেখুন বুখারী, নং ৭১৯৯; মুসলিম, নং ১৮৪১। বক্তব্য এই ঃ

وَاِنْ نَقُوْمُ اَوْنَقُوْلُ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللهِ لَوْمَةَ لاَئِمٌ .

৩২. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৪৩-৪৪। প্রথম সাতটি নাম ইব্‌ন হিশাম কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, বাকীগুলি ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে। ১২তম ব্যক্তিটি বিষয়েও কিছু মতদ্বৈধতা রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি হইতেছেন 'আবুল হায়ছাম ইবনুত তায়্যিহান।

৩৩. ঐ, পৃ. ৪৪৭-৪৮৮।

৩৪. ঐ, পৃ. ৪৪৮-৪৪৯।

৩৫. বুখারী, নং ৩৮৯০।

৩৬. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৫৪; মুসনাদ, ৫খ, পৃ. ৩২০।

৩৭. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৫৪।

৩৮. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৪৫৪।

৩৯. পূর্বোক্ত বরাত; আরও দেখুন উপরে পৃ. ৮৪৯ মূল গ্রন্থ; মুসনাদ, ১খ, ২১৬ (ইব্‌ন 'আব্বাসের বর্ণনা)।

৪০. বুখারী, নং ৩৮৪৭, ৩৯৩০।

৪১. উপরে, ৮৩৭-৮৩৮।

৪২. আকরম খান, মোস্তফা চরিত (বাংলা), ৪র্থ সংশোধিত সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ, পৃ. ৪৭৩-৪৭৫।

আটত্রিশতম অধ্যায়

মদীনায় হিজরত

এক ঃ হিজরতের কারণ ও প্রকৃতি

'আকাবার দ্বিতীয় শপথ মুসলমানগণের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিল। বস্তুত 'আকাবা' শপথটি ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ধর্ম প্রচারের কাজ চালাইবার জন্য সমর্থন লাভের এবং একটি উপযুক্ত প্রচারকেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়ার উদ্দেশ্যে কমপক্ষে তিন বৎসর প্রচেষ্টার ফল। যেহেতু আল্লাহ্ তাঁহার এই ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন এবং তিনি এই উদ্দেশ্যে মক্কার বাহিরের গোত্রগুলির নিকট গমন করেন। অনুরূপভাবে মদীনায় মুসলমানদের ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত সযত্নে প্রণীত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সহকারে বাস্তবায়িত করা হইয়াছিল। ইহা আকস্মিক তাড়নায় হঠাৎ কৃত কোন কাজ ছিল না বা ইহা অপ্রত্যাশিত জরুরী অবস্থা পরিহার করার জন্য পরিকল্পনাহীনভাবেও সম্পন্ন করা হয় নাই।

কিছুকাল হইতেই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানগণের নিকট ইহা স্পষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে অবশ্যই সমর্থন লাভ করার ও একটি প্রচার কেন্দ্রের জন্য অন্য কোন স্থানে অনুসন্ধান চালাইতে হইবে এবং বরাবরই তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের প্রচারকার্য চালাইয়া যাওয়া। গোত্রসমূহের নিকট গমন বা মদীনায় হিজরত করা এই দুইটি পদক্ষেপের কোনটিই শুধু বা মৌলিকভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য বা মোটেও তাঁহার নিজের স্বার্থসিদ্ধি বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্য গৃহীত হয় নাই। দাওস গোত্রের নিরাপদ দুর্গে অবস্থান করিয়া নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেখানে তাঁহার সুরক্ষার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য শক্তিশালী লোকজন উপস্থিত ছিল। তুফায়ল ইবন আমর আদ-দাওসী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত প্রস্তাবটি তাঁহার দ্বারা প্রত্যাখ্যানের ঘটনা অপেক্ষা আর কোন কিছু অধিকতর পরিষ্কারভাবে এই সত্যকে ব্যাখ্যা করে না।[১]

ইহাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কিছু সংখ্যক গোত্র তাহাদের সঙ্গে সমগ্র আরবের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও ভাগাভাগি করিয়া লওয়ার বিনিময়ে তাঁহাকে সাহায্য করার যে প্রস্তাবটি প্রদান করে তাহাও তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।[২]

মদীনায় হিজরত ভৌগোলিক অর্থে শুধু এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন বা একটি রাজনৈতিক কৌশল অথবা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সংক্রান্ত পদক্ষেপ ছিল না। মূল উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য ছিল মহান আল্লাহর আদেশ পালন এবং ইসলামের অগ্রগতি সাধন করা। এই কারণে যথার্থভাবে কুরআন ও হাদীছে ইহাকে "আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত (হিজরাহ ইলাল্লাহ ওয়ারাসূলিহী) হিসাবে আখ্যায়িত করা হইয়াছে।

হিজরতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ইহার মৌলিক কারণটির ব্যাখ্যাও প্রদান করিয়াছে। মুসলমানগণ ও রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন। কারণ এই মক্কা আর ইসলামের অনুশীলন ও প্রচারের জন্য অনুকূল স্থান ছিল না বা সেখানে ইসলামের অনুশীলন ও প্রচার করা সম্ভব ছিল না। অন্য কথায় হিজরতের একক কারণ ছিল ইসলামের বিরুদ্ধে কুরায়শ নেতাদের বিরোধিতা। বিরোধিতার বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন দিক পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইয়াছে।[৩] এখানে শুধু ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কুরআন এবং হাদীছসমূহ হিজরত সম্পর্কে উল্লেখ করার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎভাবে ইহার কারণ সম্পর্কেও ইঙ্গিত প্রদান করে। এভাবে কুরআন সুনির্দিষ্টভাবে হিজরতের কারণ হিসাবে উল্লেখ করে যে, মুসলিমগণ ছিলেন ঃ

(ক) তাহাদের ধর্মের জন্য নির্যাতিত (জুলিমূ ظُلِمُوا) [৪]

(খ) তাহাদের ধর্মের জন্য বিপদাপন্ন (ফুতিনূ فُتِنُوا) অর্থাৎ যে কোন প্রকারে তাহাদিগকে মৌখিকভাবে ধর্মমত পরিত্যাগ করার অথবা ইসলামের অনুশীলন করিতে অসমর্থ হওয়ার পর্যায়ে আনা হইয়াছিল।[৫]

(গ) নির্যাতিত ও আবাসভূমি হইতে বিতাড়িত (উষ' أُوذُوا এবং উখরিজূ أُخْرِجُوا)।[৬]

বর্ণনাসমূহ এই বলিয়া হিজরতের কারণ সম্পর্কিত বিবরণের দৃঢ়তা সম্পাদন ও সম্পূরণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে অবিশ্বাস এবং গৃহ হইতে বিতাড়িত করা হইলে মুসলমানগণও অত্যাচারিত, নির্যাতিত ও ধর্মের কারণে বিপদাপন্ন হইয়াছে এবং তাঁহাদের ঘরবাড়ি ও সম্পত্তি হইতে তাহাদিগকে উৎখাত করা হইয়াছে।[৭]

ইহা স্মরণযোগ্য যে, সামান্য কয়েক বৎসর পূর্বে কিছু সংখ্যক মুসলমান আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন। মদীনাতে হিজরত ও আবিসিনিয়াতে হিজরতের মধ্যে কয়েকটি বিষয়ে পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে। আবিসিনিয়াতে হিজরতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রধানত এবং মূলত প্রাথমিক মুসলমান এবং তাহাদের ধর্ম সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে এই বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া সেখানে যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, সেখানে তাঁহারা তাঁহাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা এবং তাঁহাদের ধর্ম পালন ও প্রচার করার সুযোগ উভয়ই পাইবেন। তিনি নিজে মক্কা ত্যাগ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন নাই স্পষ্টত এই কারণে যে, তিনি তখন পর্যন্ত মক্কা

সম্পর্কে নিরাশ হন নাই এবং ধর্ম প্রচার অব্যাহত রাখিয়া তাহাদিগকে ইসলামে দীক্ষিত করার আশা পোষণ করিতেছিলেন। মদীনায় হিজরত করার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকৃতির। রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখিয়াছিলেন যে, মক্কাতে ইসলামের অগ্রগতি সাধনের বা তাঁহার কাজের ধারা অব্যাহত রাখার আর কোন সুযোগ নাই। তদুপরি তাঁহার আত্মীয়-স্বজন তাঁহাকে নিশ্চিতরূপে পরিত্যাগ ও বহিষ্কার করিয়াছিল। এজন্য তিনি একটি নূতন কর্মস্থলের অনুসন্ধান করিতেছিলেন যেখান হইতে তিনি তাঁহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন। তিনি শুধু যাইবার চিন্তা করেন নাই, এই স্থানটিকে তিনি তাঁহার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করার কেন্দ্র করারও চিন্তা করিয়াছিলেন।

অতএব দ্বিতীয়ত, তিনি প্রথমে তাঁহার হিজরতের কাঙ্ক্ষিত স্থানের লোকজনদিগকে ইসলাম গ্রহণ করার আহ্বান জানাইয়া ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন এবং যখন তাহাদের কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করেন তখন ইসলামে দীক্ষিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি সেখানে ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা প্রদান ও তাহা প্রচার করার জন্য একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করিয়া ক্ষেত্রটিকে আরও ভালভাবে প্রস্তুত করেন। আবিসিনিয়ায় হিজরতের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রাথমিক কোন কাজ সম্পন্ন করা হয় নাই। কারণ সেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ব্যক্তিগতভাবে যাওয়ার এবং সে স্থানটিকে তাঁহার প্রচারকার্যের কেন্দ্রে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা ছিলনা।

তৃতীয়ত, শেষোক্ত পরিস্থিতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায় হিসাবে একটি সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং মদীনার মুসলমানদের (আনসারদের) সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত একটি শপথনামা সম্পাদন করেন যাহাতে তিনি স্বয়ং তাঁহাদের নিকট যাওয়ার এবং আজীবন তাঁহাদের সঙ্গে বসবাস করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং তাঁহারাও ইসলামের বিধানাবলী মানিয়া চলিতে এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁহার রাসূলের জন্য তাঁহাদের সবকিছু উৎসর্গ করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

আবিসিনীয়দের কোন দলের সঙ্গে এই ধরনের কোন পূর্বচুক্তি বা শপথনামা সম্পাদিত হয় নাই। কারণ সেখানে মুসলমানদের হিজরতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন ধরনের। মদীনায় হিজরত ছিল একটি দ্বিপাক্ষিক ও পারস্পরিক চুক্তির ফল। আবিসিনিয়ায় হিজরত ছিল একদল নির্যাতিত লোকের দ্বারা যাঁহারা তাঁহাদের বিবেকের জন্য নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন, শুধু একটি একপাক্ষিক আশ্রয় প্রার্থনার বিষয় ছিল।

সর্বশেষ হইলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, শেষোক্ত পরিস্থিতি হইতে স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত আবিসিনীয় হিজরতটি ছিল প্রস্তুতির দিক দিয়া অস্থায়ী। হিজরতকারীদের জন্য মক্কায় প্রত্যাবর্তন করার ব্যাপারে আপত্তির কিছু ছিল না এবং বাস্তবিকই কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সেখান হইতে সকলেই

প্রত্যাবর্তন করিয়াছিল। অপরপক্ষে মদীনায় হিজরত প্রকৃতির দিক দিয়া ছিল চিরস্থায়ী। এই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ বা মুহাজিরগণ কেহই স্থায়ীভাবে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই। পরবর্তী কালের মক্কা বিজয় এই কারণে বিজয়ীদের প্রত্যাবর্তন ছিল না। হিজরতের সময় পরিত্যক্ত তাঁহাদের ঘরবাড়িও তাঁহারা পুনরাধিকার করেন নাই।

দুই ঃ সাহাবীগণের হিজরত

ইব্ন ইসহাকের মতে, প্রারম্ভিক কাজ সমাপ্ত হইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমানদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন ঃ "সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ তোমাদিগকে ভ্রাতৃবৃন্দ (বিশ্বাসে) এবং একটি আশ্রয়স্থল প্রদান করিয়াছেন; সেখানে তোমরা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হইবে"।[৮] ইহাও বর্ণনাসমূহে আছে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে পূর্ববর্তী সময়ে তাঁহার হিজরতের স্থানটি স্বপ্নযোগে দেখান হইয়াছিল যাহা খেজুর বৃক্ষ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং যাহাকে তিনি এখন মদীনা বলিয়া শনাক্ত করেন।[৯] মহানবী ﷺ-এর নির্দেশপ্রাপ্ত হইয়া আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকারী মুসলমানগণসহ মক্কার মুসলমানগণ দলে দলে মদীনায় হিজরত করা আরম্ভ করেন। মহানবী ﷺ- স্বয়ং প্রথমে হিজরত করেন নাই। কিন্তু তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সাহাবীগণ শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরাপদে তাঁহাদের হিজরত সম্পন্ন করিয়াছেন এবং তিনি মক্কা ত্যাগের জন্য তাঁহার নিজের প্রতি আল্লাহ তা'আলার সুনির্দিষ্ট নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকিলেন।

ইবন ইসহাকের[১০] মতে, মদীনায় হিজরতকারী প্রথম ব্যক্তি ছিলেন বানূ মাখযূমের আবূ সালামা ('আবদুল্লাহ) ইব্ন আসাদ। তিনি পূর্বে আবিসিনিয়ায় হিজরত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার গোত্র তাঁহার উপর নূতনভাবে অত্যাচার শুরু করে। মদীনায় কিছু সংখ্যক লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছেন জানিতে পারার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেখানে হিজরত করেন। ইব্ন ইসহাক বর্ণনা করেন, এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল "আকাবা শপথের এক বৎসর পূর্বে"। স্পষ্টভাবে তিনি এস্থলে 'আকাবার দ্বিতীয় শপথের উল্লেখ করিয়াছেন। এভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, আবূ সালামা (রা) 'আকাবার প্রথম শপথ সম্পন্ন হইবার অব্যবহিত পরেই মদীনায় হিজরত করিয়াছিলেন।

আবূ সালামার হিজরত অবশ্য কোন শান্তিপূর্ণ ঘটনা ছিল না। তাঁহার স্ত্রী উম্মু সালামা (পরবর্তী কালে উম্মুল মু'মিনীন) ঘটনাটির একটি মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলেন ঃ তাঁহার স্বামী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া এবং তাঁহার ক্রোড়ে তাঁহার শিশুসহ তাঁহাকে একটি উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া মদীনাভিমুখে যাত্রা করিবামাত্র তাঁহার (উম্মু সালামার) পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন তাঁহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং আবূ সালামাকে বলে যে, তাঁহার পছন্দমত যে কোন স্থানে যাওয়ার স্বাধীনতা তাঁহার থাকিলেও তাহারা তাহাদের কন্যাকে তাঁহার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিবে না। এই

কথা বলিয়া সত্য সত্যই তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লয়। ঘটনার এই পর্যায়ে আবূ সালামার পিতৃকুলের আত্মীয়-স্বজন হস্তক্ষেপ করে, কিন্তু তাহার পক্ষে নয়, অপর পক্ষের বিরুদ্ধে। তাহারা উম্মু সালামার আত্মীয়-স্বজনগণকে বলে, তাহারা তাহাদের কন্যাকে তাহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু শিশুটিকে লইয়া যাইবার অধিকার তাহাদের নাই। সে তাঁহাদের সন্তান (আবূ সালামার আত্মীয়-স্বজনদের) এবং তাঁহাদের মালিকানাধীন। তাহারা তখন অপর পক্ষের নিকট হইতে শিশুটিকে কাড়িয়া লয়। উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, দুই পক্ষের টানাটানিতে শিশুটির এক বাহুর অস্থি স্থানচ্যুত হয়।

এভাবে তাঁহাদের মদীনা যাত্রাকালে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজনগণ কর্তৃক ছোট পরিবারটির তিন সদস্য একে অপরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয়। এভাবে তাঁহার স্ত্রী ও সন্তানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আবূ সালামা একাকী মদীনায় গমন করেন। উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন ঃ তিনি প্রায় এক বৎসর তাঁহার স্বামী ও সন্তানের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন থাকেন। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন ঐ স্থানটিতে গমন করিতেন যেখান থেকে তিনি তাঁহার স্বামী ও সন্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন এবং বিকাল পর্যন্ত সেখানে বসিয়া কান্নাকাটি করিতেন। অবশেষে তাঁহার একজন আত্মীয় তাঁহার প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর নিকট যাইতে দেওয়ার জন্য অন্যদেরকে অনুরোধ করেন। অনুরূপভাবে তাঁহার স্বামীর আত্মীয়-স্বজনও তাহাদের মনোভাব শিথিল করে এবং শিশুটিকে তাঁহার নিকট প্রত্যর্পণ করে।

তারপর তিনি শিশুটিকে লইয়া উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া একাকী মদীনার পথে যাত্রা করেন। মক্কা হইতে কম-বেশী পাঁচ মাইল দূরে তান'ঈমে উপস্থিত হইলে বানূ আবদুদ দারের 'উছমান ইব্ন তালহা ইব্ন আবী তালহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হন। তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন এবং তিনি একাকী মদীনা যাইতেছেন জানিতে পারিয়া বিবেচনা করিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে একটি দুঃসাহসিক কাজ এবং একাকী এভাবে যাইতে দেওয়া তাহার জন্যও অত্যন্ত অগৌরবসুলভ ঘটনা। সুতরাং তিনি স্বেচ্ছায় তাঁহাকে মদীনায় পৌঁছাইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতঃপর তিনি তাঁহার উটের রশি ধরিয়া মদীনার নিকটবর্তী কুবা পর্যন্ত তাঁহাকে পথ দেখাইয়া ও সঙ্গ দিয়া লইয়া গেলেন। এখানে তাঁহার স্বামী অবস্থান করিতেছিলেন। উম্মু সালামা (রা) বর্ণনা করেন, উছমান ইব্ন তালহা তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ প্রদর্শন করেন এবং ইতোপূর্বে তিনি কখনও এরূপ মহৎ ও সৎ ব্যক্তির দেখা পান নাই।[১১]

এখানে ইহা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আল-বারাআ ইব্ন 'আযিব (একজন আনসারী)-এর বর্ণনায় আছে, আমাদের নিকট "সর্বপ্রথম আগত" ব্যক্তিগণ ছিলেন মুস'আব ইব্ন উমায়র এবং ইব্ন উম্মে মাকতূম যিনি 'আনসারগণকে কুরআন শিক্ষা দিতেন। তাঁহাদের

পরবর্তী ব্যক্তিগণ ছিলেন বিলাল, সা'দ ও 'আম্মার ইব্‌ন ইয়াসির। ইহার পর আগমন করেন আরও বিশজনসহ উমার ইবনুল খাত্তাব। ইহার পরে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় আগমন করেন।[১২]

মুস'আব ইব্‌ন 'উমায়র (রা) সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, ইতোপূর্বে দেখা গিয়াছে যে,[১৩] আকাবার প্রথম শপথের পর তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক আনসারগণকে কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং মদীনায় ইসলাম প্রচার করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি আকাবার দ্বিতীয় শপথ অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং অতঃপর মদীনায় হিজরত করেন, যখন ইহা অনুষ্ঠিত হইবার পর মহানবী ﷺ মুসলমানগণকে এরূপ করার নির্দেশ প্রদান করেন। খুব সম্ভব উপরে উল্লিখিত বিবরণটি হয় মুস'আবের একজন কুরআন শিক্ষক ও প্রচারক হিসাবে মদীনায় অবস্থান করা, না হয় 'আকাবার দ্বিতীয় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর প্রথম ব্যক্তি হিসাবে মদীনায় হিজরত করা সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করে।

আবূ সালামার ঘটনাটি এই কারণে ভিন্ন প্রকারের যে, তিনি মদীনায় হিজরত করেন, যেরূপ নির্দিষ্টভাবে ইব্‌ন ইসহাক উল্লেখ করেন, 'আকাবার শপথের এক বৎসর পূর্বে' এবং যেহেতু তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন নাই, ইব্‌ন ইসহাকের বিবরণ এই যে, তিনি হিজরত করার ক্ষেত্রে প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, বাস্তবভাবে নির্ভুল। উপরে উল্লিখিত বর্ণনা হইতে ইহাও প্রতীয়মান হইবে যে, ইব্‌ন উম্মু মাকতূমও কিছু কালের জন্য মুস'আবের সঙ্গে 'আনসারদের কুরআন শিক্ষক হিসাবে কাজ করিয়াছেন। সকল সম্ভাবনায় এই ঘটনা ছিল আকাবার দ্বিতীয় শপথের পরবর্তী কালের। 'উমার ইবনুল খাত্তাব এবং তাঁহার মুহাজিরদের একটি দল সম্পর্কে ইহা নিশ্চিত যে, তাঁহারা আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর হিজরত করিয়াছিলেন। সুতরাং আবূ সালামার পর বিলাল, সা'দ, 'আম্মার এবং অন্যরাও তাহাই করিয়াছিলেন।

'উমার (রা) নিজে তাঁহার হিজরতের একটি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন যাহা ইব্‌ন ইসহাক কর্তৃক পুনর্লিখিত হইয়াছে এবং যাহা এখনই দৃষ্ট হইবে।

মদীনায় প্রথম মুহাজিরদের আগমনের পর 'আনসারদের মধ্য হইতে চারজনকে মক্কায় প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা ছিলেন যাকওয়ান ইব্‌ন 'আবদ কায়স, 'উকবা ইব্‌ন ওয়াহ্‌ব, আল-আব্বাস ইব্‌ন 'উবাদা ইব্‌ন নাদলা এবং যিয়াদ ইব্‌ন লাবীদ। পরবর্তী কালে তাঁহারা মক্কা হইতে মুহাজিরদের বিভিন্ন দলসহ মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন। এই কারণে এই চারিজন মুহাজিরী 'আনসারী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[১৪] এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, হিজরতের পদ্ধতিটি আনসারগণের পূর্ণ সহযোগিতার ফলে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ইবন ইসহাকের মতানুসারে আবূ সালামার পরে মদীনায় হিজরতকারী ব্যক্তিটি ছিলেন বানু 'আদিয়্যি ইব্‌ন কা'বের একজন মিত্র 'আমের ইব্‌ন রাবী'আ। তিনি তাঁহার স্ত্রী একই গোত্রীয়

লায়লা বিন্ত 'আবী হাছমা ইব্ন গানমকে সঙ্গে লইয়া যান। তাঁহাদের পরে জাহ্শ পরিবার এবং বানূ উমায়্যা ইব্ন আব্দ শামসের মিত্রগণ, বানূ গানম ইব্ন দূদানের অন্যান্য সদস্যগণ গমন করেন। প্রকৃতপক্ষে বানূ গানম ইব্ন দূদানের নারী-পুরুষ, শিশুসহ সকল সদস্য তাহাদের মালিকানাধীন যাহা কিছু তাহারা বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন সঙ্গে লইয়া এবং আবাসস্থল পরিত্যাগ করিয়া একদলভুক্ত হইয়া হিজরত করেন। এই দলে অন্তর্ভুক্ত পুরুষগণ ছিলেন ঃ

'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ ইব্ন রিয়াব, তাঁহার ভ্রাতা আবূ আহমাদ ('আব্দ ইব্ন জাহ্শ), উক্কাশা ইব্ন মিহ্সান, শুজা' ইব্ন ওয়াহ্ব, 'উকবা ইব্ন ওয়াহ্ব, আবিদ ইব্ন হুমায়্যিরা (বা হুমায়রা), মুনকিয ইব্ন নাবাতা, সাঈদ ইব্ন রুকায়শ, মুহ্রিয ইব্ন নাইলা, ইয়াযীদ ইব্ন কুরায়শ, কায়স ইব্ন জাবির, 'আমর ইব্ন মিহ্সান, মালিক ইব্ন আমর, সাফওয়ান ইব্ন 'আমর, ছাক্ফ ইব্ন 'আমর, রাবীআ ইব্ন আকছাম, আয-যুবায়র ইব্ন 'উবায়দ, তাম্মাম ইব্ন 'উবায়দা, সাখবারা ইব্ন 'উবায়দা ও মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন জাহ্শ। আর মহিলাদের মধ্যে ছিলেন আল-ফারআ (ফুরায়'আ?) বিন্ত আবী সুফয়ান ইব্ন হারব (আবূ আহমাদের স্ত্রী), যায়নাব বিন্ত জাহ্শ (যায়দ ইব্ন হারিছার স্ত্রী, পরবর্তী কালে উম্মুল মু'মিনীন), 'উম্মু হাবীব বিন্ত জাহ্শ ('আবদুর রাহমান ইব্ন আওফের স্ত্রী), হামনা বিন্ত জাহ্শ (মুসআব ইব্ন 'উমায়রের স্ত্রী), জুদামা বিন্ত জান্দাল, উম্মু কায়স বিন্ত মিহ্সান, উম্মু হাবীব বিন্ত ছুমামা, আমিনা বিনত রুকায়শ ও সাখবারা বিন্ত তামীম।[১৫]

এই সকল ব্যক্তির হিজরত স্বাভাবিকভাবে তাঁহাদের আবাসিক এলাকাকে একটি পরিত্যক্ত এলাকায় পরিণত করে। ইব্ন ইসহাক কর্তৃক ইহা বর্ণিত হইয়াছে যে, একদিন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ, আল-'আব্বাস ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব ও আবূ জাহলকে এই এলাকা অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। শূন্য ঘরবাড়ির দিকে তাকাইয়া 'উতবা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে এবং দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করে যে, বানূ জাহ্শের আবাসিক এলাকাটি একটি পরিত্যক্ত এলাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহাতে আবূ জাহল আল-'আব্বাসের দিকে তাকাইয়া বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য প্রকাশ করে, "ইহা আমাদের ভ্রাতুষ্পুত্রের কাজ। সে আমাদের সমাজকে বিভক্ত করিয়াছে। আমাদের কর্মকাণ্ডে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে এবং আমাদিগকে একের নিকট হইতে অন্যকে পৃথক করিয়াছে"।[১৬]

মদীনায় হিজরতকারী সাহাবীদের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য দলটি ছিল 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) কর্তৃক পরিচালিত দল। ইহা কথিত হয় যে, তাঁহার পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও অন্যান্যদের মধ্য হইতে কমবেশী বিশজন তাঁহার সহগামী হইয়াছিলেন। ইব্ন ইসহাক ঘটনাটি সম্পর্কে 'উমারের নিজস্ব বিবরণ পেশ করিয়াছেন। বিবরণ অনুসারে, 'উমার, 'আয়্যাশ ইব্ন 'আবী রাবী'আ ও হিশাম

ইবনুল আস ইব্ন ওয়াইল নিজেদের মধ্যে ঠিক করেন যে, পরদিন ভোরে তাহারা মক্কা হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত আত-তানাদুব নামক একটি স্থানে মিলিত হইবেন এবং যদি কেহ নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হয় তবে ধরিয়া লওয়া হইবে যে, তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া অবরুদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং তাহাকে ছাড়াই অন্য দুইজন মদীনা অভিমুখে যাত্রা করিবেন।

পরদিন ভোরে উমার ও 'আয়্যাশ ইব্ন 'আবী রাবী'আ নির্ধারিত স্থানে যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু হিশাম ইবনুল আস ইব্ন ওয়াইলকে আটকাইয়া রাখার জন্য তিনি উপস্থিত হইতে পরিলেন না। এজন্য 'উমার ও 'আয়্যাশ দলের অন্যান্য সদস্যসহ মদীনার দিকে যাত্রা করেন। মদীনায় পৌঁছিয়া তাঁহারা বানূ 'আমর ইব্ন 'আওফের লোকজনের সঙ্গে কুবা-তে অবস্থান করেন।

ইহার কিছু কাল পরে আবূ জাহল ইব্ন হিশাম এবং তাহার ভ্রাতা আল-হারিছ ইব্ন হিশাম 'আয়্যাশকে মক্কায় ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য প্রলোভিত করার উদ্দেশ্যে কুবাতে উপস্থিত হয়। কারণ তিনি ছিলেন তাহাদের বৈপিত্রেয় ভাই। তাহারা তাহাকে বলে যে, তাঁহার হিজরতে তাঁহার মাতা এত শোকগ্রস্ত হইয়াছেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন যতদিন না তাহার পুত্র 'আয়্যাশ মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিবে ততদিন তিনি কেশবিন্যাস করিবেন না ও রৌদ্র হইতে ছায়ায় গমন করিবেন না। তাহারা তাঁহার মাতাকে দেখার জন্য এবং এভাবে তাহাকে তাহার প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ করার উদ্দেশ্যে শুধু একবারের জন্য মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতে তাঁহাকে অনুরোধ জানাইল।

'আয়্যাশ ঘটনা শুনিয়া বিচলিত হইয়া উমারের সঙ্গে আলোচনা করিলেন। তিনি তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি (আয়্যাশ) তাঁহার মাতার জন্য এবং তাড়াতাড়ি করার ফলে তিনি যে ধন-সম্পদ সেখানে রাখিয়া আসিয়াছেন তাহা আন্দাজ করার জন্য সাময়িকভাবে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতে ইচ্ছা করেন। উমার (রা) আবূ জাহলের কৌশল বুঝিতে পারিলেন এবং 'আয়্যাশকে এই কথা বুঝাইয়া ফাঁদে না পড়িতে সতর্ক করিলেন যে, শেষ পর্যন্ত তাঁহার মাতা শোক ভুলিয়া যাইবেন এবং স্বাভাবিক জীবন যাত্রা শুরু করিবেন। 'উমার আরও বলিলেন, যদি বিষয়টি ধনসম্পদ সংক্রান্ত হয় তবে তাহা তাহার নিকট পর্যাপ্ত পরিমাণে আছে এবং তাহার যে পরিমাণ ধন সম্পদ আছে তাহার অর্ধাংশ তিনি আয়্যাশকে প্রদান করিবেন।

'আয়্যাশ তাঁহার মাতার প্রতি ভক্তিতে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং যাওয়ার জন্য অতি আগ্রহ প্রকাশ করেতে লাগিলেন। অবশেষে 'উমার (রা) তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উটটি 'আয়্যাশকে দিয়া ঐ উটটিতে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতে বলিলেন এবং পরামর্শ দিলেন যে,

তিনি তাঁহার সঙ্গীদের মধ্যে অনভিপ্রেত কিছু দেখিতে পাইলে উহার সাহায্যে দ্রুত মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইবেন এবং তাহারা তাহাদের উটগুলির সাহায্যে পথিমধ্যে তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না।

উমারের আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয়। কারণ, তাহারা মক্কার পথে কিছু দূর অগ্রসর হইবার পর আবূ জাহল 'আয়্যাশকে উট হইতে অবতরণ করিতে প্ররোচিত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দুইজন আকস্মিকভাবে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলে ও বন্দী অবস্থায় মক্কায় লইয়া যায় এবং সেখানে বন্দী করিয়া রাখে। ইব্ন ইসহাক বলেন, যখন তাহারা মক্কায় উপস্থিত হয় তখন ছিল দিবাকাল এবং আবূ জাহল দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলে, "এভাবে আমরা আমাদের নির্বোধদের প্রতারিত করিয়াছি। এখন তোমাদের উচিৎ তোমাদের নির্বোধদের সঙ্গে এরূপ আচরণ করা"।[১৭]

অবশ্য পরবর্তী কালে হিশাম ইবনুল আস ইব্ন ওয়াইল উমার ইবনুল খাত্তাবের নিকট হইতে একখানা পত্র প্রাপ্ত হইয়া বন্দীদশা হইতে পলায়ন করেন এবং মদীনায় হিজরত করেন। এই ঘটনা মহানবী ﷺ সেখানে যাইবার পর ঘটিয়াছিল।[১৮] অনুরূপভাবে 'আয়্যাশ ইব্ন আবী রাবী'আও পরবর্তী এক সময়ে পলায়ন করিতে এবং অন্যান্য কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিতে সক্ষম হন।[১৯]

হামযা ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব, 'উছমান ইব্ন 'আফফান, 'উছমান ইব্ন মাজ'উন, আবদুর রাহমান ইব্ন 'আওফ, 'আবূ হুতায়ফা ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ এবং অন্যান্যদের ন্যায় বিখ্যাত সাহাবীদের হিজরতের বিবরণ জানা যায় না। খুব সম্ভব তাঁহারা কোন অপ্রতিকর ঘটনা ব্যতিরেকেই হিজরত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মোটের উপর কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক অবরুদ্ধ ও নির্যাতিত হওয়া অথবা তাহাদের ব্যক্তিগত অথবা অন্য কোন কারণে অক্ষম হওয়া সাহাবীগণ ব্যতিরেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রায় সকল সাহাবী মদীনায় হিজরত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ, আবূ বক্র ও 'আলী ইব্ন আবী তালিবসহ এই সকল ব্যক্তি হিজরতের অপেক্ষায় ছিলেন।[২০] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ঠিক পরেই যাহারা হিজরত করেন তাঁহাদের একজন ছিলেন আয-যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম যিনি অন্য কয়েকজন মুসলমানসহ ব্যবসায়িক ভ্রমণে সিরিয়ায় ছিলেন এবং যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাত লাভ করেন। তিনি তখন মদীনায় হিজরত করিতেছিলেন।[২১] সম্ভবত মহানবী ﷺ মুসলমানগণকে মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দিবার পূর্বে আয-যুবায়র সিরিয়ার উদ্দেশে যাত্রা করিয়াছিলেন।

একইভাবে সুহায়ব ইব্ন সিনানও মহানবী -এর পরে হিজরত করেন। বর্ণিত আছে যে, সুহায়ব মদীনার উদ্দেশে যাত্রা করিলে মক্কার কুরায়শগণ এই বলিয়া তাহার প্রতিরোধ করে যে, তিনি তাহাদের শহরে মূলত একজন গরীব ব্যক্তি হিসাবে আসেন এবং সেখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়া প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হন এবং তাহারা তাঁহাকে তাঁহার ধনসম্পদসহ চলিয়া যাইতে দিবে না। তাহারা সুহায়বের ধর্মবিশ্বাসের গভীরতা সম্পর্কে বাস্তবিকই ভুল ধারণা পোষণ করিয়াছিল। কারণ তিনি তৎক্ষণাত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি তিনি তাঁহার সমস্ত ধন-সম্পদ তাহাদের নিকট সমর্পণ করেন তবে তাহারা তাহাকে যাইতে দিবে কি না। তাহারা তাহাতে সম্মত হয়। অতঃপর সুহায়ব (রা) তাঁহার সঞ্চিত স্বর্ণসহ ধন-সম্পদ ও মূল্যবান বস্তুসমূহ সমর্পণ করেন এবং এভাবে তিনি তাহাদের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করেন। তিনি মদীনায় আগমন করিলে এবং মহানবী এ বিষয়ে জানিতে পারিলে মন্তব্য করেন যে, সুহায়ব বাস্তবিকই একটি খুব লাভজনক ব্যবসা করিয়াছে।[২২] আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, কুরআনী আয়াত ২ ঃ ২০৭, "মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রয় করিয়া দেয়" আয়াতটি সুহায়ব ও তাঁহার ন্যায় অন্যদের সম্পর্কে যাঁহারা আল্লাহ এবং তাঁহার রাসূলের উদ্দেশ্যে হিজরত করার জন্য তাঁহাদের সকল জাগতিক স্বার্থ কুরবানী করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়।[২৩]

আনসারদের দ্বারা স্থাপিত ত্যাগের এবং মুহাজিদের প্রতি তাহাদের মহানুভবতার উদাহরণসমূহও কম দীপ্তিময় ছিল না। তাঁহাদিগকে সকল প্রকার যত্ন, আন্তরিকতা ও প্রস্তুতি সহকারে অভ্যর্থনা জানানো হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত বাসস্থান এবং দৈনন্দিন জীবনের নিত্য-ব্যবহার্য সকল দ্রব্য প্রদান করা হইয়াছিল। এই উদ্দেশ্যে আনসারগণ মুহাজিরগণকে নিজেদের মধ্যে বণ্টিত করিয়া লইয়াছিলেন এবং প্রত্যেকে নিজ সাধ্যানুসারে যত বেশীজন সম্ভব মুহাজিরের আতিথ্যকর্তার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কোন কোন সময় কোন মুহাজির কোন আনসারের কাছে যাইবেন তাহা নির্ধারণ করার জন্য তাহারা লটারির আশ্রয় লইতেন। তাঁহাদের এইরূপ করার কারণ এই ছিল না যে, দয়িত্বে অংশগ্রহণ করিতে কাহারও পক্ষ হইতে কোন আপত্তি ছিল, বরং এই কারণে যে, কয়জন মুহাজিরকে আতিথ্য প্রদান করিবেন সে বিষয়ে তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দিত। একজন আনসার মহিলা উম্মুল আলা বর্ণনা করেন, লটারি অনুষ্ঠিত হইলে তাঁহাদের পরিবার উছমান ইব্ন মাজ'উন (রা)-কে গ্রহণ করার দায়িত্ব পান। তাঁহারা তাঁহাকে গ্রহণ করেন কিন্তু তিনি শীঘ্রই পীড়িত হন এবং অল্পকাল পরে ইনতিকাল করেন।[২৪]

ইব্ন ইসহাক আনসারদের মধ্যে মুহাজিরগণকে বণ্টন করার একটি বিবরণ আমাদের জন্য সংরক্ষণ করিয়াছেন। তালিকাটি পূর্ণ না হইলেও তাঁহার দেওয়া তথ্যসমূহ সেই শৃঙ্খলাপূর্ণ ও

প্রণালীবদ্ধ পন্থাটি ব্যাখ্যা করে যাহার মাধ্যমে মদীনায় মুহাজিরগণকে গ্রহণ করা হইত।[২৫] তথ্যটিকে নিম্নরূপভাবে সারণিবদ্ধ করা যাইতে পারে ঃ

মুহাজিরগণ	আতিথ্যকর্তাগণ
(ক) আবূ সালামা ইব্‌ন 'আবদুল আসাদ, 'আমের ইব্‌ন রাবী'আ, 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাহশ, আবূ আহমাদ ('আব্‌দ ইব্‌ন জাহশ)	(ক) কুবার বানূ আমর ইব্‌ন 'আওফের সিবআর ইব্‌ন 'আবদুল মুনফির ইব্‌ন যানবার।
(খ) 'উমার ইবনুল খাত্তাব, যায়দ ইবনুল খাত্তাব (উপরে উল্লিখিত ব্যক্তির ভ্রাতা), 'আমর ইব্‌ন সুরাকা ইবনুল মু'তামার, 'আব্‌দ ইব্‌ন সুরাকা ইবনুল মু'তামার (উপরে উল্লিখিত ব্যক্তির ভ্রাতা), খুনায়স ইব্‌ন হুযাফা আস-সাহমী ('উমার ইবনুল খাত্তাবের জামাতা, হাফসার স্বামী (পরবর্তীতে উম্মুল মুমিনীন) সা'ঈদ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন 'আমর ইব্‌ন নুফায়ল, ওয়াকিদ ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ আত-তামীমী, খাওলা ইব্‌ন আবী খাওলা, মালিক ইব্‌ন আবী খাওলা, ইয়াস ইবনুল বুকায়র, 'আকিল ইবনুল বুকায়র, 'আমের ইবনু'ল বুকায়র, খালিদ ইবনুল বুকায়র (তাঁহাদের বানূ সা'দ ইব্‌ন লায়ছের মিত্রসহ), 'আয়্যাশ ইব্‌ন আবী রাবী'আ	(খ) কুবার বানূ আমর ইব্‌ন আওফের রিফাআহ ইব্‌ন 'আবদুল মুনফির ইব্‌ন যানবার।

(গ) তালহা ইব্ন 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'উছমান, সুহায়ব ইব্ন সিনান	(গ) আস-সুনহ (মদীনার আধুনিক আওয়ালী এলাকা)-এর বানূ আল-হারিছ ইবনুল খাযরাজের খুবায়ব ইব্ন ইসাফ
(ঘ) হামযা ইব্ন 'আবদুল মুত্তালিব, যায়দ ইব্ন হারিছা, আবূ মারছাদ কান্নায ইব্ন হিসন, মারছাদ আল-গানাবী (উপরের জনের পুত্র), 'আনাশা, আবূ কাবশা (সালীম)	(ঘ) কুবার বানূ আমর ইব্ন আওফের কুলছুম ইব্ন হিদম (অন্য একটি বিবরণ অনুসারে তাঁহারা সা'দ ইব্ন খায়ছামার সঙ্গে ছিলেন)
(ঙ) 'উবায়দা ইবনুল হারিছ ইবনুল মুত্তালিব, তুফায়ল ইবনুল হারিছ (উপরের জনের ভ্রাতা), আল-হুসায়ন ইবনুল হারিছ, মিসতাহ ইব্ন উছাছা ইব্ন আব্বাদ, সুওয়ায়বিত ইব্ন সা'দ ইব্ন হারমালা, তুলায় ইব্ন 'উমায়র, খাব্বাব ইবনুল আরাত	(ঙ) কুবার বানূ আল-'আজলানের 'আবদুল্লাহ ইব্ন সালামা
(চ) 'আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ, মুহাজিরদের একটি ছোট দলসহ	(চ) কুবার বানূ আল-হারিছ ইবনুল খাযরাজের সা'দ ইব্নুর-রাবী'
(ছ) আয-যুবায়র ইবনুল 'আওয়াম, আবূ সাবরা ইব্ন আবী রুহম	(ছ) আল-'উসবাহ বানূ জাহ্জাবার মুনযির ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন উকবা ইব্ন উহায়হাহ
(জ) মুস'আব ইব্ন 'উমায়র ইব্ন হাশিম	(জ) বানূ আবদুল আশহালের সা'দ ইব্ন মু'আয ইবনুন নু'মান।
(ঝ) আবূ হুযায়ফা ইব্ন 'উতবা ইব্ন রাবী'আ সালীম (উপরের জনের ভৃত্য), 'উতবা ইব্ন গাযওয়ান ইব্ন জাবির	(ঝ) বানূ 'আবদুল আশহালের 'আব্বাদ ইব্ন বিশ্র ইব্ন ওয়াক্শ।
(ঞ) উছমান ইব্ন 'আফ্ফান	(ঞ) বানূ আন-নাজ্জারের আওস ইব্ন ছাবিত ইবনুল মুনযির (হাসসান ইব্ন ছাবিতের ভ্রাতা)
(ট) অবিবাহিত মুহাজিরগণের একটি দল	(ট) সা'দ ইব্ন খায়ছামা

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, এই বণ্টন সব সময় স্থায়ী হইত না বরং সময়ে সময়ে পরিবর্তিত হইত। যাহারা এখানে উল্লিখিত হন নাই তাহারা বোধগম্যভাবে আনসারদের মধ্যে অনুরূপভাবে বণ্টিত হইয়াছিলেন। উপরে উল্লিখিত তথ্যাবলী প্রথমত ব্যাখ্যা করে যে, হিজরত একটি সুপরিকল্পিত, সুসংগঠিত ও সুসমন্বিত পদ্ধতিতে পরিচালিত হইত। ইহা কোন বিশৃঙ্খল পলায়ন ছিল না, যদিও মুহাজিরদের জন্মভূমি, তাহাদের ভিটামাটি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহাদের ধন-সম্পত্তি ও বিত্ত-বৈভব পরিত্যাগ করার ঘটনাটি তাহাদের উপর অশেষ দুঃখ-দুর্দশা ও কষ্ট চাপাইয়া দিয়াছিল। মক্কায় কমপক্ষে চারজন আনসারের উপস্থিতি যাহারা হিজরতের প্রাথমিক পর্যায়ে মদীনা হইতে আগমন করিয়াছিলেন, এই প্রসঙ্গে মক্কা ও মদীনার মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করার ইঙ্গিত প্রদান করে।

দ্বিতীয়ত, মুহাজিরগণ যতটা সম্ভব নীরবে ও সতর্কভাবে মক্কা ত্যাগ করিলেও তাহাদের স্থানান্তর গমন তাঁহাদের শত্রুদের নিকট গোপন রাখা যাইত না। কারণ পরিবারসমূহের প্রস্থান এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এলাকাবাসীর স্থানত্যাগ প্রতিবেশীদের অগোচরীভূত থাকিত না।

তৃতীয়ত, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইলে হিজরতের ঘটনা যাহাতে না ঘটে সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্যোগ গ্রহণে সচেষ্ট হইত।

এইগুলি তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু হিজরতের বিশেষ প্রকৃতি তাহাদের যাত্রাপথে বাধা স্থাপন করিত। যেখানে পারিত তাহারা তাহাদিগকে বাধা দিত, বন্দী করিত, অবরুদ্ধ করিয়া রাখিত এবং নির্যাতন করিত। কিন্তু হিজরত হইতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহারা বিরত রাখিতে পারিত না। কারণ মুসলমানগণ অনির্ধারিত সময়ে এবং দুই মাসের কম নয় এমন একটি সময় পরপর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোট ছোট দলে হিজরত করিতেন। এই অবস্থায় কুরায়শ নেতৃবৃন্দ হিজরত রোধ করিতে পারিত শুধু যদি তাহাদের পক্ষে হিজরত করিতে ইচ্ছুক মুসলমানগণ অবশিষ্ট থাকা পর্যন্ত বহির্গমনের রাস্তাসমূহ বন্ধ করিয়া এবং কার্যকরভাবে প্রহরা বসাইয়া শহরটিকে একটি বাস্তবভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায় রাখিতে পারিত।

মক্কার ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এবং বিরাজমান সামাজিক অবস্থা কুরায়শ নেতৃবৃন্দের জন্য এইরূপ একটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। তদুপরি মুসলমানগণ সময়ে সময়ে এরূপ বড় আকারের দল গঠন করিয়া ভ্রমণ করিতেন যাহাতে রাহাজানদের আক্রমণে শুধু নিজদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন না, বরং কুরায়শ নেতৃবৃন্দ কর্তৃক তাড়াহুড়া করিয়া গঠিত শত্রুদলের আক্রমণ হইতেও নিজদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেন। ইবন হিশাম কর্তৃক প্রদত্ত উমার ইবনুল খাত্তাবের যে কোন ব্যক্তিকে তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া বা তাঁহার হিজরতে বাধা দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করার বিবরণটি সত্য নাও হইতে পারে। কিন্তু স্বজনদের প্রতি আগ্রাসন ও অমানবিকতা প্রদর্শনজনিত হীনমন্যতাবোধের জন্য হৃত মনোবল কুরায়শ

নেতৃবৃন্দের পক্ষে দৃঢ় বিশ্বাসের শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও গৃহীত ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত এরূপ একটি যুবক দলের সম্মুখীন হওয়া বা তাহাদের হিজরতে বাধা দেওয়া কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। এভাবে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের এই সম্পর্কে জানা থাকা এবং ইহা রোধ করার জন্য তাহাদের বিক্ষিপ্ত নিষ্ঠুর উদ্যোগ সত্ত্বেও মদীনায় মুসলমানদের হিজরত বাস্তবায়িত হয়।

তিন ঃ মহানবী ﷺ-এর হিজরত

(ক) তাঁহাকে হত্যা করার শেষ উদ্যোগ

সর্বশেষ উপায় হিসাবে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ মহানবী ﷺ-এর উপর তাহাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে এবং তাহা করা হয় স্পষ্ট দুইটি কারণে। (এক) তাহারা সাধারণ মুসলমানদের হিজরত নিয়ন্ত্রণ অথবা রোধ করিতে না পরিলেও কমপক্ষে এক ব্যক্তির উপর সক্রিয় দৃষ্টি দিতে এবং তাঁহার হিজরত রোধ করিতে পারিত। (দুই) তাহারা পূর্ণরূপে অনুধাবন করিতে পারিয়াছিল যে, মদীনায় মুসলমানদের সমাবেশ কুরায়শদের জন্য বিপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে কেবল মহানবী ﷺ যদি সেখানে হিজরত করিতে এবং তাঁহাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন। সুতরাং কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ইহা ঘটিতে বাধা দেওয়ার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

ইব্ন ইসহাক এই বিষয় সংক্রান্ত কুরায়শদের কৌশলের কিছু বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, মুসলমানগণ তাঁহাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় পাইয়াছেন দেখিয়া তাহারা পরিস্থিতির গুরুত্ব এবং মহানবী ﷺ-এর অবিলম্বে মদীনায় হিজরতের বিষয়টি অনুধাবন করিতে পারিল। সুতরাং তাহারা মহানবী ﷺ সম্পর্কে কি কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণের জন্য কা'বার নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত দারুন নাদওয়ায় পরামর্শ সভায় মিলিত হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ইহা একটি রুদ্ধদ্বার ও গোপনীয় পরামর্শ সভা ছিল যাহাতে শুধু কুরায়শগণের এবং যাহাদের উপর তাহাদের পূর্ণ আস্থা ছিল তাহাদের প্রবেশাধিকার ছিল। ইব্ন ইসহাক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, কিছু সংখ্যক অকুরায়শ ব্যক্তিও স্পষ্টত যাহাদের সঙ্গে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের যোগসাজশ ছিল, সভায় যোগ দিয়াছিল। আরও কথিত আছে যে, এক বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ নাজদী শায়খের আকারে একটি শয়তানও ঐ সভায় যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তাহাকেও সভায় যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়। এই ব্যক্তি সভার কার্যক্রমে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

ইব্ন ইসহাক সভায় উপস্থিত কুরায়শ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বানূ আবদুশ শামসের প্রতিনিধি উতবা ইব্ন রাবী'আ, শায়বা ইব্ন রাবী'আ ও আবূ সুফ্য়ান ইব্ন হারব, বানূ নাওফাল ইব্ন 'আব্দ মানাফের প্রতিনিধি তুয়ামা ইব্ন 'আদী, জুবায়র ইব্ন মুত'ইম ইব্ন 'আদিয়্য ও 'আল-হারিছ ইব্ন 'আমের, বানূ 'আবদুদ-দারের প্রতিনিধি আন-নাদর ইবনুল হারিছ, বানূ আসাদ ইব্ন 'আবদুল উয্যার প্রতিনিধি আবদুল বাখতারী ইব্ন হিশাম, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব ও

হাকীম ইব্ন হিযাম, বানূ মাখযূম-এর প্রতিনিধি আবূ জাহল; বানূ সাহমের প্রতিনিধি এবং দুইভাই নুবায়হ ইবনুল হাজ্জাজ ও মুনাববিহ ইবনুল হাজ্জাজ এবং বানূ জুমাহ্‌র উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন।[২৭]

সভায় কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপিত ও আলোচিত হয়। নেতাদের একজন প্রস্তাব করে যে, মহানবী ﷺ কে ধরিয়া তাঁহার হাত ও পা লোহার শিকলে বাঁধিয়া আহার ও পানীয় ব্যতিরেকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হউক যাহাতে তিনি যুহায়র ও নাবিগাহ্‌র ন্যায় প্রাচীন কয়েক কবিদের মত মৃত্যুবরণ করেন। প্রধানত উপরে উল্লিখিত নাজদী শায়খ প্রস্তাবটির বিরোধিতা করে এবং বলে যে, মহানবী ﷺ কে এইরূপে অবরুদ্ধ করার সংবাদ যে গৃহে তাহাকে বন্দী করিয়া রাখা হইবে তাহার পশ্চাদ্দ্বার দিয়া প্রকাশ পাইবা মাত্র তাঁহার অনুসারিগণ যে কোন উপায়ে তাঁহাকে তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার করিবেন। সুতরাং প্রস্তাবটিকে বাতিল করা হইল।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই ছিল যে, মহানবী ﷺ -কে মক্কা হইতে বহিষ্কার করা হউক। তিনি কোথায় যাইবেন তাহা কোন চিন্তার ব্যাপার নয়। কারণ তিনি চলিয়া গেলে শহরটি সেই আপদ হইতে মুক্ত হইবে যাহা তাহার দ্বারা আনীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধেও নাজদী শায়খ ভেটো প্রয়োগ করে। সে বলে, প্রস্তাবিত পদক্ষেপটি সেই একই বিপদ ডাকিয়া আনিবে যাহা তাহারা পরিহার করিতে চেষ্টা করিতেছে। কারণ মহানবী ﷺ তাঁহার যুক্তিপূর্ণ ও সুভাষণ দ্বারা,, সর্বোপরি তাঁহার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও স্বভাব দ্বারা যেইখানে তিনি গমন করিবেন সেখানকার জনসাধারণকে আকৃষ্ট করিতে পারিবেন এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবেন। তদনুসারে এই প্রস্তাবটিকেও বাতিল করা হইল।

পরিশেষে আবূ জাহ্‌ল মহানবী ﷺ-কে সকলে মিলিয়া হত্যা করার প্রস্তাব করে। সে পরামর্শ প্রদান করে যে, প্রত্যেক গোত্র হইতে একজন করিয়া শক্তিশালী ও সাহসী লোক নির্বাচন করা হইবে এবং প্রত্যেককে একখানা করিয়া ক্ষুরধার তরবারি প্রদান করা হইবে, সেগুলির দ্বারা সকলে একসঙ্গে মহানবী ﷺ-কে আঘাত করিবে। মনে হইবে যেন এক ব্যক্তির আঘাত এবং এভাবে তাহাকে হত্যা করা হইবে। এভাবে রক্তঋণে সকল গোত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টিত হইবে যাহার ফলে বানূ হাশিমের পক্ষে প্রত্যেক কুরায়শ গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা অসম্ভব হইবে। অবশেষে তাহারা বানূ হাশিমকে রক্তমূল্য গ্রহণ করার জন্য চাপ দিবে যাহা সকল গোত্র মিলিয়া পরিশোধ করিবে। নাজদী শায়খ কর্তৃক এই প্রস্তাবটি প্রবলভাবে সমর্থিত হয় এবং তাহা সভা কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।[২৮]

আল-কুরআনে পরিষ্কারভাবে ৮ ঃ ৩০ আয়াতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের এই পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে পাঠটি নিম্নরূপ ঃ

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ .

"এবং (স্মরণ কর) যখন কাফিররা আপনার বিরুদ্ধে কৌশল করিয়াছিল–আপনাকে বন্দী করিবার জন্য অথবা আপনাকে হত্যা করিবার অথবা আপনাকে দেশান্তরিত করিবার জন্য এবং তাহারা তো ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং আল্লাহও তাঁহার কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী" (৮ ঃ ৩০)।

কুরায়শ নেতৃবৃন্দের গোপন সভার দুইটি দিকে গভীরতর দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। (এক) সভায় মুত'ইম ইব্ন আদিয়্যির পুত্র যুবায়র ও ভ্রাতা তুআয়মার উপস্থিতি। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, বানূ নাওফালের নেতা মুত'ইম কর্তৃক প্রায় তিন বৎসর পূর্বে মহানবী ﷺ-এর তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তাঁহাকে প্রদত্ত সুরক্ষা আর কার্যকর ছিল না। মুত'ইম তখনও মৃত্যুবরণ করে নাই। সে বদর যুদ্ধের প্রায় সাত মাস পূর্বে মারা যায়।[২৯] সম্ভবত বার্ধক্যের কারণে সে তাহার পুত্র ও ভ্রাতাকে গোত্রপতি হিসাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হইতে দিয়াছিল।[৩০] যাহা হউক যুবায়র ইব্ন মুত'ইম ও তাহার গোত্র বানূ নাওফাল কুরায়শ দলে যোগ দিয়াছিল এবং মহানবী ﷺ আর বানূ নাওফালের আশ্রয়ে ছিলেন না। তিনি মক্কায় বসবাস করা অব্যাহত রাখিয়াছিলেন এবং কমপক্ষে দুই বৎসর তিনি মদীনায় গোত্রসমূহ ও লোকজনের সঙ্গে তাহার যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করেন।

(দুই) এই ঘটনা আমাদিগকে গোপন সভার কার্যক্রমের দ্বিতীয় দিকটি সম্পর্কে অবহিত করায়। যেমন রক্ত-ঋণ সবগুলি গোত্রের উপর সমানভাবে বণ্টন করিয়া দিয়া বানূ হাশিমের অনিবার্য প্রতিশোধ গ্রহণ পরিহার করার জন্য নেতৃবৃন্দের, বিশেষভাবে আবূ জাহলের উদ্বেগ। প্রকৃতপক্ষে মহানবী ﷺ-কে হত্যা করা হইবে কি না এই ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য ছিল না। বানূ হাশিমের প্রতিশোধ কিভাবে নির্মূল করা যাইবে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আসাটাই ছিল একমাত্র সমস্যা। ইহার অর্থ এই যে, বানূ হাশিম ঐ সময়ে মহানবী ﷺ-কে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে নাই। সন্দেহ নাই যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর পর যখন আবূ লাহাব গোত্রের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয় এবং ঐ সময়ে তাহারা মহানবী ﷺ-কে পরিত্যাগ করে, যাহার ফলে তিনি তাইফে সমর্থন ও আশ্রয় সন্ধান করিতে বাধ্য হন। এইভাবে ইহা প্রতীয়মান হইবে যে, মুত'ইম ইব্ন 'আদিয়্যির সুরক্ষা প্রদানে বিরতি, হামযা, আব্বাস ও আলীর ন্যায় বানূ হাশিমের অন্যান্য সদস্যগণকে আবূ লাহাবের পরিকল্পনাটি অনুমোদন না করা এবং মহানবী ﷺ-এর জন্য তাহাদের রক্ষা ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য গোত্রটিকে স্বপক্ষে আনিতে সমর্থ করিয়াছিল।

প্রকৃতপক্ষে বানূ হাশিমের এই ধরনের দায়িত্ব পুনঃগ্রহণ মুত'ইম ইব্ন 'আদিয়্যি সুরক্ষা ব্যবস্থা প্রদানের সমাপ্তির ব্যাখ্যা প্রদান করে যাহা পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে প্রত্যাহার অথবা

সমর্পণ করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যে কৃতজ্ঞতার অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ হইয়া মহানবী ﷺ মুত'ইমের সাহায্যকে স্মরণ করিয়াছেন তাহা স্বীকার করে না যে, তিনি কোন মন্দ বিশ্বাসের অনুসারী হইয়াছিলেন।[৩১] বানূ হাশিম কর্তৃক মহানবী ﷺ-কে সুরক্ষা প্রদান করার দায়িত্ব পুনঃ গ্রহণ শুধু মুত'ইমের সুরক্ষা ব্যবস্থার সমাপ্তির ব্যাখ্যাই প্রদান করে না বরং হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত মহানবী ﷺ-এর মক্কাতে অবস্থান, গোত্রসমূহের কিছু সংখ্যকের সমর্থন কামনা করিয়া তাহাদের শিবিরে গমনকালে তাহাকে আল-'আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিবের বাঁধাদান, বিশেষভাবে আকাবাতে দ্বিতীয় শপথে তাঁহার উপস্থিতি, সর্বোপরি মহানবী ﷺ -কে হত্যা করার জন্য তাহাদের আগ্রহের অভাব না থাকা সত্ত্বেও হত্যাকাণ্ড বাস্তবায়িত করিতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দের ব্যর্থতা প্রভৃতির ব্যাখ্যাও প্রদান করে।

(খ) "নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"

সাহাবীদের অধিকাংশের মদীনা গমনের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং তাঁহার হিজরতের জন্য আল্লাহ্‌র সুনির্দিষ্ট নির্দেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। অপরপক্ষে আবূ বকর (রা) কুরায়শ নেতৃবৃন্দের বিরোধিতা এবং তাঁহার উপর আরোপিত চাপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাঁহার নিজের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজরতের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁহার জন্য একজন উত্তম সঙ্গীর ব্যবস্থা করিবেন এই কথা বলিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন।[৩২]

পরিষ্কার ইঙ্গিতটি এই ছিল যে, হিজরতের সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহাকে সঙ্গী হিসাবে পাইতে ইচ্ছুক ছিলেন। অতঃপর নিশ্চিত হওয়ার জন্য আবূ বকর (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার হিজরতের জন্যও তিনি আল্লাহর অনুমতির প্রত্যাশা করিতেছেন কি না। তিনি উত্তর দিলেন ঃ হাঁ, তিনি প্রত্যাশা করিতেছেন। সুতরাং আবূ বকর (রা) অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রকৃতপক্ষে আকাবার দ্বিতীয় শপথের পূর্ব হইতেই তিনি হিজরতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিলেন। বর্ণিত আছে যে, ধর্ম প্রচারের চতুর্দশ বৎসরের রাবীউল আওয়ালের প্রথমদিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে তাঁহার হিজরতের চারি মাস পূর্ব হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে দুইটি উটকে তিনি বিশেষভাবে প্রতিপালন করিতেছিলেন।[৩৩]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করার জন্য কুরায়শ নেতৃবৃন্দ ষড়যন্ত্র পাকা করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা এই সম্পর্কে তাঁহাকে অবগত করাইলেন। বাস্তবিকই এই ঘটনা সম্পর্কে একটি ইঙ্গিত ৮ ঃ ৩০ আয়াতের শেষ অংশে বিধৃত হইয়াছে, যাহাতে রহিয়াছে 'এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ কৌশলী'। এই বিবৃতির সহজ অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা উত্তমরূপে জানিতেন কিভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করিতে হইবে। তিনি তাহাদের ষড়যন্ত্রসমূহের উপর দৃষ্টি রাখিতেছেন এবং তাঁহার পরিকল্পনা ছিল, তাহাদের ষড়যন্ত্র নয়, বরং তাঁহার কৌশল বিজয়ী হইবে। বর্ণিত আছে যে, কুরায়শ নেতাগণ তাহাদের গোপন সভা হইতে চলিয়া যাইবার সঙ্গে

সঙ্গে জিবরীল (আ) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আগমন করেন এবং সভার কার্যবিবরণী সম্পর্কে তাঁহাকে অবগত করান ও সতর্ক করেন যে, তিনি যেন ঐ রাত্রিতে তাঁহার নিজের শয্যায় নিদ্রা না যান।[৩৪] জিবরীল (আ) তাঁহাকে হিজরতের জন্য আল্লাহর অনুমতির সংবাদও প্রদান করেন। ইব্ন 'আব্বাসের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের জন্য এই ঐশী আদেশ ১৭ ঃ ৮০ আয়াতে বিধৃত আছে।[৩৫]

অবশিষ্ট সামান্য কয়েক ঘণ্টা বোধগম্যভাবে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি চূড়ান্ত করার সময় ছিল যাহা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) স্বাভাবিকভাবে হিজরতের অনুমতির প্রত্যাশায় কিছু সময়ের জন্য করিয়া আসিতেছিলেন। হিজরত বাস্তবায়নের পদ্ধতিটির লিখিত বিবরণ নাই, কিন্তু উহার সঙ্গে সরাসরিভাবে জড়িত আবূ বকর, 'আইশা ও সুরাকা ইব্ন জু'শুম (রা) প্রদত্ত হিজরতের বাস্তব পদ্ধতিটির বিবরণসমূহ এই প্রসঙ্গে গৃহীত পরিকল্পনা ও প্রস্তুতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বিহিত করিতে আমাদিগকে সাহায্য করে। এইগুলি হইতেছে ঃ

(ক) হিজরতের তারিখের কমপক্ষে চারি মাস পূর্ব হইতে হিজরতের উদ্দেশ্যে আবূ বকর (রা) কর্তৃক দুইটি উৎকৃষ্ট উটকে বিশেষভাবে আহার প্রদান ও প্রতিপালন করা।

(খ) বানূ আদ-দু'ইল (দীল?) ইব্ন বকরের আবদুল্লাহ ইব্ন উরায়কিতের সঙ্গে একটি চুক্তি যিনি একজন অমুসলমান ও বানূ সাহম গোত্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একজন বিশ্বস্ত লোক ছিলেন এবং যিনি তাহাকে প্রদত্ত কিছু পরিশ্রমিকের বিনিময়ে হিজরতের প্রাক্কালে উট দুইটির দায়িত্ব গ্রহণ করিতে, নির্ধারিত স্থানে ও সময়ে সেইগুলিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর নিকট আনয়ন করিতে, মদীনার যাত্রাপথের মানচিত্রে অপ্রদর্শিত ও অব্যবহৃত অংশের মধ্য দিয়া যে পথে যাত্রা করার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন এবং যাহা স্পষ্ট তাহার বা আবূ বকর (রা)-এর পরিচিত ছিল না, পথ প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিতে এবং সর্বোপরি এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে গোপন করিতে সম্মত হইয়াছিলেন।(গ) কুরায়শদের ক্রোধের উত্তাপ প্রশমিত ও অনুসরণ কার্যক্রম না থামা পর্যন্ত লুকায়িত থাকার স্থান হিসাবে ছওর গুহা নির্বাচন করা। গুহাটি মক্কার সামান্য কয়েক মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। সুতরাং মদীনার দিকে নহে, যেদিকে স্বাভাবিকভাবে ও অনতিবিলম্বে অনুসন্ধানী দৃষ্টি পতিত হইবে।

(ঘ) আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকর ও আমের ইব্ন ফুহায়রাকে নির্দেশ প্রদান। প্রথমজন দিবাকালে কুরায়শ নেতাদের কাজকর্ম ও কথাবার্তার উপর নজর রাখার জন্য মক্কায় অবস্থান করিবে এবং গভীর রাত্রিতে তাঁহার পিতা ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই সম্পর্কিত সংবাদ দিবে। দ্বিতীয়জন ছাগপালক 'আমের গুহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ছাগল চরাইবে এবং এইভাবে একদিকে পাহাড়ের দিকে যাওয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর পদচিহ্ন নিশ্চিহ্ন করিবে এবং অপরপক্ষে রাত্রিতে তাহাদিগকে ছাগলের দুধ সরবরাহ করিবে এবং অতঃপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন

করিবে। দুইজনকেই তাহাদের দায়িত্ব এইভাবে পালন করিতে হইবে যেন তাহাদের গতিবিধির প্রতি মক্কাবাসীদের সন্দেহ বা কৌতূহল জাগ্রত না হয়।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এইরূপ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি মুহূর্তের বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সম্পন্ন করা যাইতে পারে না। ঐ পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি সময়মত উদ্ভাবিত ও বিন্যাসিত হইয়াছিল, যদিও সেগুলি মক্কা ত্যাগের সামান্য কাল পূর্বে চূড়ান্ত হয়। ইহাও ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, আবদুল্লাহ ইব্ন উরায়কিতকে প্রথমদিকে গুহা সম্পর্কে অবগত করান হয় নাই। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আবদুল্লাহ ইব্ন আবূ বকরের মাধ্যমে জানান হইয়াছিল যে, যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত উটসহ কোথায় ও কখন তাহাকে (উরায়কিত) উপস্থিত থাকিতে হইবে। কারণ ইব্ন ইসহাক খুব গুরুত্ব সহকারে বলেন, আবূ বকর (রা), তাঁহার পরিবার এবং আলী (রা) ব্যতীত মহানবী ﷺ-এর গুহায় যাত্রা সম্পর্কে আর কেহই জানিত না।[৩৬]

কুরায়শ নেতাগণও তাহাদের পরিকল্পনা মুতাবিক অগ্রসর হয়, কিন্তু এই অসুবিধাসহ যে, তাহারা জানিত না যে, তাহাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে মহানবী ﷺ জ্ঞাত ছিলেন। তাহাদের ষড়যন্ত্র মুতাবিক তাহাদের নির্বাচিত ঘাতকের দল মহানবী ﷺ-কে হত্যা করার জন্য তাঁহার আবাসস্থলের বাহিরে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।[৩৭] ইব্ন সা'দ আল-ওয়াকিদী ও তাঁহার বর্ণনাকারীদের পরম্পরার উপর নির্ভর করিয়া এইভাবে অপেক্ষমাণ ঘাতকদের নাম উল্লেখ করেন। দলে বারজন ঘাতক ছিল। যেমন আবূ জাহল, আল-হাকাম ইব্ন আবিল-আস, উকবা ইব্ন আবী মু'আয়ত, আন-নাদর ইবনুল হারিছ, উমায়্যা ইব্ন খালাফ, ইবনুল গায়তালা, যাম'আ ইবনুল আসওয়াদ, তু'আয়মা ইব্ন 'আদিয়্যি, আবূ লাহাব, উবায়্যি ইব্ন খালাফ, নুবায়হ ইবনুল হাজ্জাজ এবং তাহার ভ্রাতা মুনাব্বিহ ইবনুল হাজ্জাজ।[৩৮] আরও বলা হইয়াছে যে, তাহারা ইচ্ছা করিয়াছিল মহানবী ﷺ-এর গৃহে প্রবেশ করিবে এবং তাঁহাকে আঘাত করিবে, কিন্তু তাঁহাকে আঘাত করিতে কে প্রথমে প্রবেশ করিবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসিতে পারে নাই।[৩৯] মহানবী ﷺ প্রভাতে বাহিরে আসিবেন এইজন্য তাহারা বাহিরে অপেক্ষমাণ থাকে।

মহানবী ﷺ ও তাঁহাকে জিবরীল (আ) কর্তৃক প্রদত্ত পরামর্শ অনুসারে কড়া শৃঙ্খলার সঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি 'আলী (রা)-কে হাদরামাওতী কম্বল দ্বারা, যে কম্বলটি মহানবী ﷺ নিদ্রা গমনের সময় ব্যবহার করিতেন, নিজেকে আবৃত করিয়া তাঁহার (মহানবী ﷺ-এর) বিছানায় নিদ্রাগমন করিতে নির্দেশ প্রদান করেন যাহাতে গৃহে কেহ উঁকি দিলে মনে করে সেখানে মহানবী ﷺ স্বয়ং নিদ্রা যাইতেছেন। 'আলী (রা)-কে আরও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল, তিনি যেন মহানবী ﷺ চলিয়া যাইবার পর মহানবী ﷺ-এর নিকট গচ্ছিত রাখা ধনরত্ন, মূল্যবান দ্রব্যাদি উহাদের মালিকদের যথাযথভাবে প্রত্যর্পণ করেন।[৪০] মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে শত্রুতামূলক যাহা কিছু ঘটিয়াছিল তাহা সত্ত্বেও সাধারণ মক্কাবাসিগণ তাঁহাকে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে বিবেচনা

করিত এবং তাহাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি নিরাপদে রাখার জন্য তাঁহার নিকট আমানত রাখিত। এই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া মহানবী ﷺ ঘাতকদের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিয়া যান।

ঠিক কোন সময়ে মহানবী ﷺ তাঁহার গৃহ ত্যাগ করেন সেই সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে, যাহা সম্ভবত পরিপূর্ণ গোপনীয়তার ইঙ্গিত বহন করে, যাহা অবলম্বন করিয়া তিনি মক্কা হইতে প্রস্থান করেন। আমাদের হাতে আসা আবূ বকর (রা)-এর বিবরণটি বিবেচনা করিলে দেখা যায়, ইহার কাহিনী শুধু তাহাদের ছওর গুহা ত্যাগ করার সময় হইতে শুরু হইয়াছে।[৪১] পরবর্তী সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য বিবরণটি 'আইশা (রা)-এর। ইহা আবূ বকরের সঙ্গে আলোচনা করার পর মহানবী ﷺ নিজ আবাসে প্রত্যাবর্তন করেন না কি রাত্রি পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন এই বিষয়ে সুনির্দিষ্টভাবে কোন উল্লেখ না করিয়া দ্বিপ্রহরের ব্যতিক্রমী সময়ে মহানবী ﷺ-এর আবূ বকর (রা)-এর আবাসে গমন করা সম্পর্কে বলে যাহার নিকট তিনি তাঁহার হিজরতের জন্য আল্লাহর তা'আলার অনুমতির কথা প্রকাশ করেন এবং ছওর গুহায় যাত্রা করাসহ অন্যান্য প্রসঙ্গে আলোচনা করেন।[৪২]

আল-ওয়াকিদীর বর্ণনাকারীদের পরম্পরার উপর ভিত্তি করিয়া তৎকর্তৃক প্রদত্ত তৃতীয় বিবরণটি এই যে, মহানবী ﷺ আবূ বকর (রা)-এর গৃহে রাত্রিতে অবস্থান করেন, তারপর উভয়ে গুহায় গমন করেন। আরও বলে যে, ইহা এমন এক সময়ে ঘটিয়াছিল যখন সফর মাস শেষ হইতে আর মাত্র তিন রাত্রি বাকী ছিল।[৪৩]

৪র্থ বিবরণটি ইব্ন ইসহাক প্রদত্ত এবং আত-তাবারী কর্তৃক পুনরাবৃত্তিকৃত, কিন্তু কেহই সনদ উল্লেখ করেন নাই। বর্ণিত আছে যে, মহানবী ﷺ হিজরত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, অতঃপর আবূ বকর (রা)-এর বাড়িতে গমন করেন এবং তাঁহার বাড়ির পশ্চাৎ দরজা হইতে উভয়ে ছওর গুহাভিমুখে যাত্রা করেন।[৪৪]

পঞ্চম বিবরণটি, ইহাও যথাযথ সনদবিহীন, মহানবী ﷺ-এর গৃহপরিচারিকা মারিয়াকে উদ্ধৃত করিয়া বর্ণিত। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মহানবী ﷺ-এর অবিশ্বাসীদের হাত হইতে মুক্তি লাভের রাত্রিতে তিনি দেওয়ালে আরোহণ করার জন্য যাহাতে তাহার উপর পা রাখিতে পারেন সেজন্য তিনি নত হইয়াছিলেন।[৪৫]

উপরে উল্লিখিত পাঁচটি বিবরণের বিপরীত দুইট বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইব্ন 'আব্বাসের প্রতি আরোপিত একটি বর্ণনা যে, সেই রাত্রে আবূ বকর (রা) মহানবী ﷺ-এর গৃহে আগমন করেন এবং সেখানে শুধু 'আলী (রা)-কে দেখিতে পান যিনি তাঁহাকে জানান যে, মহানবী ﷺ ইতোমধ্যে বি'র মায়মূনের উদ্দেশে গৃহ হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, সেখানে আবূ বকর (রা)-কে তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগের জন্য যাইতে হইবে। অতঃপর আবূ বকর (রা) সেখানে

গমন করেন এবং মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হন, অতঃপর তাঁহারা দুইজন একসঙ্গে ছুওর গুহায় যান।[৪৬]

অন্য বিবরণটি মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজীর, যাহা ইব্ন ইসহাক[৪৭] এবং বর্ণনাকারীদের একটি ভিন্ন পরম্পরাসহ আল-ওয়াকিদী কর্তৃক পুনরাবৃত্তি করা হইয়াছে।[৪৮] এই বর্ণনায় আছে, ঘাতকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাড়ির দরজায় উপস্থিত হইলে তাহাদের নেতা আবূ জাহল বিশেষভাবে পুনরুত্থান, শেষ বিচারের দিন, পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কে তাঁহার শিক্ষাকে ব্যঙ্গ করিয়া চীৎকার সহকারে তাঁহার প্রতি গালি বর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহের বাহিরে আসেন এবং তাহাকে (আবূ জাহলকে) এই বলিয়া গলাগালির জবাব দেন যে, সে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্ কর্তৃক শাস্তি প্রাপ্ত হইবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মুঠি ধুলি হাতে নিলেন ও সূরা ইয়াসীন (নং ৩৬)-এর প্রথম কয়েকটি আয়াত পাঠ করেন এবং ঘাতকদের মাথায় ঐ ধুলি নিক্ষেপ করেন। ফলে তাহারা সাময়িকভাবে অন্ধ হইয়া যায় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহাদের অলক্ষ্যে গৃহত্যাগ করেন। কিছু সময় পরে অন্য এক ব্যক্তি, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বাহিরে যাইতে দেখিয়াছিল সে ঘাতকদের নিকট আগমন করে এবং জানায় যে, তাহাদের লক্ষ্যবস্তু ইতোমধ্যেই গৃহ ত্যাগ করিয়াছেন। অতঃপর বিছানায় যেখানে 'আলী (রা) নিদ্রা যাইতেছিলেন, উঁকি দিয়া দেখিয়া তাহারা মনে করিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছেন এবং সংবাদদাতা তাহাদিগকে মিথ্যা বলিয়াছে। সুতরাং তাহারা সেখানে ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিল এবং দেখিল, শুধু আলী (রা) গৃহে অবস্থান করিতেছেন। তাহারা বুঝিল, তাহাদের সংবাদদাতা সঠিক সংবাদ দিয়াছিল।

মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল-কুরাজী হিজরতের কমবেশী চল্লিশ বৎসর পর জন্মগ্রহণকারী একজন তাবিঈ হওয়ায় এবং তাঁহার তথ্যের কোন উৎস উল্লেখ না থাকায় এই বিবরণটি মুরসাল হওয়া ছাড়াও কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত করে, যাহা ইহার বিশ্বাসযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জিবরীল (আ) কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ঐ রাত্রিতে তাঁহার নিজের বিছানায় নিদ্রা না যাওয়ার জন্য প্রদত্ত নির্দেশটি শুধু এই অর্থ প্রকাশ করে না যে, তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) তাঁহার নিজ বিছানায় কেবল একজন লোককে রাখিবেন এবং কি ঘটনা ঘটে তাহা দেখিবার জন্য স্বীয় গৃহে অপেক্ষা করিবেন এবং পরে যদি প্রয়োজন হয় গৃহ ত্যাগ করিবেন। নির্দেশটির পরিষ্কার অর্থ এই ছিল যে, ষড়যন্ত্রকারীদের তাঁহার গৃহে প্রবেশ করার এবং তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার খুব সম্ভাবনা ছিল। সুতরাং তিনি তাঁহার সাধারণ অবস্থানস্থল হইতে দূরে অবস্থান করিবেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শত্রুগণ কর্তৃক ষড়যন্ত্রটি করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা তাঁহাকে এই সম্পর্কে অবগত করান, অর্থ এই ছিল যে, তাহাদের আক্রমণ পরিহার এবং ব্যর্থ করার জন্য তিনি সম্ভাব্য সকল প্রকার পূর্ব সতর্কতা অবলম্বন করিবেন।

এইরূপ নির্দেশের বিপরীতে রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন তাঁহার শত্রুরা তাহাকে খুঁজিয়া পাইতে পারে এমন স্থানে থাকার জন্য যুক্তিসম্মতভাবে কোন ঝুঁকি নিতে পারিতেন না। তেমনি ঘাতকরা যে তাঁহার গৃহে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে নির্দেশসমূহ হার সম্ভাবনা পরিষ্কার ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছিল।

দ্বিতীয়ত, আবূ জাহল এবং তাহার সহষড়যন্ত্রকারীরা মহানবী ﷺ ও তাঁহার জ্ঞাতিদিগকে অপ্রত্যাশিতভাবে আক্রমণ করিয়া চোরাগোপ্তাভাবে ও আকস্মিকতার সঙ্গে তাহাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করার জন্য নিপুণভাবে পরিকল্পনা করিয়াছিল। এইজন্য আবূ জাহলের পক্ষে যেমন মহানবী ﷺ-এর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া চীৎকার ও তাঁহাকে গালাগালি করা অসম্ভব ছিল তেমন ঐ রাত্রিতে এমনকি তাঁহার বিছানায় না থাকিবার পরামর্শ প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও মহানবী ﷺ-এর পক্ষে গৃহের বাহিরে আসিয়া শত্রুদের সম্মুখবর্তী হওয়াও অপত্যাশিত ছিল। তাঁহার পক্ষে এইরূপ আচরণ হিজরতের জন্য সর্বপ্রকার যে সতর্ক পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারও বিরুদ্ধ ছিল।

অপরপক্ষে যদি ধরিয়া লওয়া হয় যে, মহানবী ﷺ-কে আবূ জাহলের কথিত গালাগালির উদ্দেশ্য ছিল তাঁহাকে গৃহের বাহিরে আসিতে উত্তেজিত করা, তবে আরও প্রশ্ন দেখা দেয় যে, তাহা কেন তাঁহার দ্বারা কৃত হয় নাই। তদুপরি এই প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় যে, আবূ জাহল এবং তাহার সঙ্গীরা কেন পূর্ব পরিকল্পনামত তাঁহার দিকে ধাবিত হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করার পরিবর্তে তাঁহাকে গালাগালির জবাব দিবার, ধুলি উঠাইবার ও আয়াত ইত্যাদি পাঠ করিবার সময় দিল?

অন্য বর্ণনাটি সম্পর্কে বলে হয় যে, আবূ বকর (রা) ঐ রাত্রে মহানবী ﷺ-এর গৃহে আসিয়াছিলেন শুধুমাত্র ইহা দেখিবার জন্য, ইতোপূর্বেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দুইটির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রকাশ করে যাহা 'আইশা (রা)-র বিবরণ এবং তাহাদের পূর্ববর্তী আলাপ-আলোচনা ও পরিকল্পনার ঘটনার সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ। ইহা গৃহের বাহিরে ষড়যন্ত্রকারীদের লক্ষ্য রাখার ঘটনার সহিতও অসঙ্গতিপূর্ণ। আবূ বকর (রা) আক্রান্ত না হইলেও তাহাদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হইয়া গৃহে আসিতে বা বাহিরে যাইতে পারিতেন না। যদি শত্রু কর্তৃক তাঁহার গৃহ বেষ্টিত হইবার পূর্ব-রাত্রির প্রথমভাগে তাঁহারা গৃহে আসিতেন তাহা হইলে মহানবী ﷺ-কে তিনি সেখানে দেখিতে পাইতেন। কারণ যদি তিনি আবূ বকর (রা)-কে তাঁহার গৃহে আগমন করিতে বলিতেন তবে তিনি খুব বেশী পূর্বে গৃহ ত্যাগ করিতেন না। অপরপক্ষে যদি শত্রুগণ কর্তৃক তাঁহার গৃহ পরিবেষ্টিত হইবার সম্ভাবনার সময়ের বেশ পূর্বে তিনি গৃহ ত্যাগ করিতেন তবে তিনি সোজা আবূ বকরের গৃহে অথবা তাহাদের দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে চলিয়া যাইতেন। সব দিক বিবেচনা করিলে বিবরণটি মহানবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত পূর্ববর্তী আলোচনা ও তাহাদের প্রণীত পরিকল্পনার ঘটনার সহিত মৌলিকভাবে অসঙ্গতিপূর্ণ।[৪৯]

এই সবকিছু বিবেচনা করিয়া ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রথমে উল্লিখিত পাঁচটি বিবরণ, বিশেষভাবে 'আইশা (রা)-এর বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া বলা যাইতে পারে যে, এমনকি যদি মহানবী (স) 'আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে পরিকল্পনাসমূহ চূড়ান্ত করার পর তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতেন তবে শত্রুগণ তাঁহার গৃহ পরিবেষ্টন করার পূর্বে উপযুক্ত সময়ে গৃহ ত্যাগ করিতেন, অতঃপর তিনি আবূ বকর (রা)-এর সঙ্গে তাঁহার গৃহে মিলিত হইতেন এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে এই অনুমান করিয়া যে, শত্রুরা আবূ বকরের গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণের সচরাচর ব্যবহৃত দরজার উপর দৃষ্টি রাখিতে পারে, তাঁহারা দুইজন একত্রে তাঁহার গৃহের পশ্চাদদ্বার দিয়া গভীর রাত্রিতে গুহার দিকে যাত্রা করিতেন।

আমরা এখন এই বিষয়ের উপর আইশা (রা)-এর বিবরণটির প্রতি দৃষ্টি দিব। তিনি বলেন, একদিন দ্বিপ্রহরে তিনি ও তাঁহার ভগিনী 'আসমা' তাঁহাদের পিতা আবূ বকরের সঙ্গে তাঁহার গৃহে ছিলেন। এই সময় এক ব্যক্তি মহানবী (স)-এর দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যিনি তাহার মুখ ঢাকিয়া খুব সম্ভব দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রতাপ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাহাদের দিকে আসিতেছিলেন। তিনি আরও বলেন, মহানবী (স) সাধারণত হয় সকালে, না হয় বিকালে তাঁহাদের গৃহে আসিতেন, কিন্তু দ্বিপ্রহরের ঐ সময়ে কখনও আসিতেন না। সত্য সত্যই তিনি আসিতেছেন দেখিয়া আবূ বকর মন্তব্য করেন, অবশ্যই গুরুতর কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে যাহা তাঁহাকে এই অসময়ে সেখানে আনিয়াছে। ঐ স্থানে আসিয়া মহানবী (স) গৃহে প্রবেশ করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তাঁহাকে গৃহে স্বাগত জানান হইলে তিনি আবূ বকর (রা)-কে তাঁহার সঙ্গে একা থাকিতে বলেন। আবূ বকর (রা) মহানবী (স)-কে জানাইলেন, যাহারা ওখানে ছিলেন তাঁহারা তাঁহার নিজ পরিবারের সদস্য।[৫০] মহানবী (স) অতঃপর প্রকাশ করেন যে, তিনি হিজরত করার জন্য আল্লাহ তা'আলার অনুমতি ও নির্দেশ পাইয়াছেন।

আবূ বকর (রা) ব্যগ্রতা সহকার জানিতে চাহিলেন যে, তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইবে কি না। মহানবী (স) ইতিবাচক উত্তর দিলে আবূ বকর (রা)-এর আনন্দের সীমা থাকিল না।[৫১] অতঃপর তিনি মহানবী (স)-কে প্রত্যাশিত যাত্রার জন্য বিশেষভাবে প্রতিপালিত তাঁহার উট দুইটির একটি গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তিনি উহা এই শর্তে গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন যে, আবূ বকর (রা) পশুটির মূল্য গ্রহণ করিবেন। অতঃপর 'আইশা (রা) বলেন যে, তিনি এবং তাঁহার ভগিনী 'আসমা' খুব তাড়াতাড়ি তাঁহাদের সঙ্গে দেওয়ার জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করেন এবং উহা বাঁধিয়া দেওয়ার জন্য কিছু না পাইয়া তাঁহার ভগিনীর কোমরবন্ধনী ছিঁড়িয়া দুই খণ্ড করেন এবং তাহা দ্বারা উক্ত খাদ্যসামগ্রী বাঁধিয়া দেন। 'আইশা (রা) বলেন, ঐ কারণে 'আসমা' পরবর্তী কালে যাতুন-নিতাকায়ন (দুই কোমরবন্ধনীর অধিকারিনী) আখ্যায় পরিচিত হন।[৫২]

'আইশা (রা) আর কোন বিস্তারিত বিবরণ না দিয়া বলেন, এই ঘটনার অব্যবহিত পর মহানবী (স) ও আবূ বকর (রা) ছওর গিরি গুহায় গমন করেন এবং সেখানে তিন রাত্রি অতিবাহিত

করেন। তাঁহার ভ্রাতা 'আবদুল্লাহ, যে ছিল একজন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন অত্যন্ত সুচতুর তরুণ, তাঁহাদের সাথে রাত্রি যাপনের পর অতি প্রত্যুষে গুহা ত্যাগ করিয়া যথাসময়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করিতেন এই কথা বিশ্বাস করানোর জন্য যে, তিনি মক্কায় রাত্রি যাপন করিয়াছেন। তিনি দিনের বেলায় মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে কুরায়শ নেতাদের কথাবার্তা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে যতটা বেশী সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করিতেন এবং রাত্রিতে মহানবী ও আবূ বকর (রা)-এর নিকট সবকিছু নিবেদন করিতেন।

অপরপক্ষে আবূ বকরের ভৃত্য 'আমের ইব্‌ন ফুহায়রা ছওর (গরি) গুহার নিকটবর্তী স্থানে আবূ বকর (রা)-এর ছাগলের পাল চরাইতে লইয়া যাইত এবং এলাকটি অন্ধকারে আবৃত হইলে ছাগলের পাল গুহার নিকটে উঠাইয়া আনিত এবং উহাদের দুধ দোহাইয়া মহানবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-কে পান করাইত। এইভাবে 'আবদুল্লাহ ও 'আমের পালাক্রমে রাত্রে ও দিনে মহানবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর যত্ন লইতেন। 'আইশা (রা) আরও বলেন, মহানবী ﷺ ও আবূ বকর (রা) 'আব্‌দ ইব্‌ন 'আদিয়্যি গোত্রের বানূ আদ-দীলের একজন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শককে (অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইব্‌ন উরায়কিতকে) ভাড়া করিয়াছিলেন যিনি মহানবী ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর গুহায় অবস্থানকালে উট দুইটির দেখাশোনা করা এবং পরে একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাহার নিজের বাহনটি এবং ঐ দুইটি উটসহ ঐ স্থানে উপস্থিত হইবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাকে প্রদত্ত নির্দেশ অনুসারে তিনি এরূপ করেন।[৫৩]

কুরায়শ নেতাগণ মহানবী ﷺ তাহাদের দৃষ্টি এড়াইয়া চলিয়া গিয়াছেন দেখিয়া প্রথমেই 'আলীকে পাকড়াও করে এবং মহানবী ﷺ সম্পর্কে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে। তিনি মহানবী ﷺ-এর অবস্থানস্থল সম্পর্কে কোন সূত্র প্রদান করিলেন না। অতঃপর তাহারা দ্রুতবেগে আবূ বকর (রা)-এর গৃহে উপস্থিত হয় এবং 'আসমাকে তাহার পিতার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। তিনি তাঁহার পিতার অবস্থানস্থল সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে আবূ জাহল তাঁহাকে এত জোরে চপেটাঘাত করে যে, তাঁহার কানের রিং খসিয়া পড়ে।[৫৪] বাস্তবিকপক্ষে ষড়যন্ত্রকারীদের ক্রোধ তাহাদের হতাশার ন্যায় গগণচুম্বী ছিল। এইরূপ হইবার কারণ, তাহারা এই ভুল ধারণার বশবর্তী হইয়া পরিশ্রম করিয়াছে যে, তাহাদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মহানবী ﷺ সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং তাহারা মহানবী ﷺ-কে আকস্মিকভাবে তাহাদের হাতের মুঠায় পাইবে।

আলী (রা) কিংবা আসমা (রা)-র নিকট হইতে মহানবী ﷺ সম্পর্কে কোন সংবাদ না পাইয়া কুরায়শ নেতাগণ মহানবী ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য সশস্ত্র যুবকদিগকে বিভিন্ন দিকে প্রেরণ করিল। মহানবী ﷺ রাত্রিকালে কোন পথে যাইতে পারেন সেই সম্পর্কে যতদূর সম্ভব অনুমান করিয়া তাহারা শহর হইতে বাহির হইবার রাস্তাগুলিতে

অনুসন্ধান করিল। তাহারা তাঁহাদের পলায়নের দিক খুঁজিয়া পাইতে পদচিহ্ন বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করিল। আল-ওয়াকিদীর বর্ণনা অনুসারে, কুরায়য ইব্ন 'আলকামা নামক এক ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে কুরায়শ নেতাগণ এই ধরনের একজন বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ করে।[৫৫] কুরায়শ নেতাদের অনুসন্ধানী দলগুলির একটি বাস্তবিকই ছওর গুহার মুখ পর্যন্ত অগ্রসর হয়। অলৌকিকভাবে যথেষ্ট, তাহারা গুহার মুখের এত কাছে উপস্থিত হয় যে, ইহার অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিদ্বয় ইহার ভিতর হইতে তাহাদের পাগুলি দেখিতে পান। তাহা সত্ত্বেও তাহারা গুহায় প্রবেশও করে নাই বা ভিতরে উঁকি দিয়াও দেখে নাই। ঐ সঙ্কটময় সময়ের বর্ণনা দিতে গিয়া আবূ বকর (রা) বলেন যে, তিনি উপরের দিকে তাকান এবং কিছু সংখ্যক কুরায়শ ব্যক্তির পা দেখিতে পান। ভীতির একটি বোধগম্য ভাবাবেশে তিনি মহানবী ﷺ-কে বলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! যদি তাহাদের কেহ নিচের দিকে তাকায় তবে সে আমাদিগকে দেখিতে পাইবে। মহানবী ﷺ তাঁহাকে বলিলেন, "ধৈর্য ধারণ করুন। আমরা দুইজন, তৃতীয়জন হিসাবে আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন"।[৫৬] কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে ৯ ঃ ৪০ আয়াতে নিম্নরূপে এই ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করা হইয়াছে ঃ

فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْهُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لاَ تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَيْهِ .

"তবে আল্লাহ বাস্তবভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন যখন কাফিররা তাঁহাকে বহিষ্কার করিয়াছিল। তিনি ছিলেন দুইজনের একজন, তাঁহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি সঙ্গীকে বলিলেন, বিষণ্ন হইও না, নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন। তাহার পর আল্লাহ স্বীয় প্রশান্তি তাহার উপর বর্ষণ করিলেন" (৯ ঃ ৪০)।

কিছু সংখ্যক বর্ণনায় বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে। যেমন গুহার মুখে একটি গাছ জন্মিয়াছিল যাহার উপর দুইটি ঘুঘু পাখি নিজেদের বাসায় বিশ্রাম গ্রহণ করিতেছিল[৫৭] অথবা গুহার মুখ আবৃত করিয়া একটি মাকড়সা জাল বিস্তার করিয়াছিল যাহা দেখিয়া কুরায়শগণ মনে করিল, সম্প্রতি ইহাতে কেহ প্রবেশ করে নাই এবং ইহার ভিতরে উঁকি না দিয়াই তাহারা ফিরিয়া গেল।[৫৮] এইসব বিশেষ বিবরণের সত্যতা সন্দেহাতীত নয়।[৫৯] কিন্তু এইসব বর্ণনার সারমর্ম এই যে, ইহা ছিল আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁহার অদৃশ্য সাহায্যের দ্বারা সৃষ্ট অলৌকিক ঘটনা—যাহা মহানবী ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীর নিকট হইতে অবিশ্বাসিগণকে ফিরাইয়া দিয়াছিল এবং তাঁহাদের অনুসন্ধানকারীদের একেবারে নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও তাহাদের ধৃত হওয়া বা বন্দী হওয়া হইতে রক্ষা করিয়াছিল।

চার ঃ প্রত্যেকের মাথার জন্য এক শত উট (পুরস্কার ঘোষণা)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং আবূ বকর (রা) গুহার মধ্যে তিন রাত্রি অতিবাহিত করেন। ইহার পর 'আবদুল্লাহ ইব্ন উরায়কিত চুক্তি অনুসারে নির্ধারিত সময়ে তাঁহার নিজের বাহন ও ঐ উট দুইটিসহ সেখানে উপস্থিত হয়। আমের ইব্ন ফুহায়রাও সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসে। চারজনের কাফেলাটি তখন উপকূলের পথ ধরিয়া গুহা হইতে যাত্রা শুরু করে।

আবূ বকর (রা) বলেন যে, তাঁহারা রাত্রিতে যাত্রা শুরু করিয়াছিলেন[৬০] এবং সারা রাত্রি ও পর দিন দুপুর পর্যন্ত তাঁহারা একটানা ভ্রমণ করেন। রৌদ্র ও মরুভূমির তাপ অসহনীয় রূপ ধারণ করায় তিনি একটি উপযুক্ত স্থান খুঁজিতেছিলেন যেখানে বিশ্রাম লইতে পারিবেন। এই সময়ে দূরের একটি শৈলভূমি তাঁহার গোচরীভূত হইল। ইহার নিকটবর্তী হইয়া তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ইহার ছায়া তাঁহাদের বিশ্রাম গ্রহণের জন্য খুবই উপযুক্ত। তিনি স্থানটি পরিষ্কার করিলেন এবং একখণ্ড লোমযুক্ত পশুচর্ম, যাহা তাঁহার সঙ্গে ছিল, বিস্তৃত করিয়া শয্যা প্রস্তুত করিলেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সেখানে নিদ্রাগমন করার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। তিনি নিজে সর্বক্ষণ পাহারারত থাকিলেন।

ঐ সময় আবূ বকর (রা) দেখিতে পাইলেন, এক মেষপালক তাহার মেষপালসহ ঐ স্থানের দিকে ছায়াতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য আসিতেছে। তিনি তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন এবং জ্ঞাত হইলেন যে, সে তাহার একজন পরিচিত মক্কাবাসীর কাজে নিযুক্ত রহিয়াছে। অতঃপর তিনি মেষপালককে তাহার সঙ্গে থাকা মেষ পালে দুধ পাওয়া যাইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে পাওয়া যাইবে বলিয়া জানাইল। আবূ বকর (রা) তাহাকে একটি ছাগী দোহন করিতে এবং তাহাদিগকে কিছু দুধ দিতে অনুরোধ জানাইলেন। মেষ পালক তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিল। মহানবী ﷺ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইলে তিনি তাঁহাকে কিছু পরিমাণ দুধ দিলেন এবং তিনি তৃপ্তি সহকারে তাহা পান করিলেন। আবূ বকর (রা) আরও বলেন, ইহাতে তিনি খুব সন্তুষ্টি লাভ করিয়াছিলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণের পর সূর্য ঢলিয়া পড়িলে তাঁহারা মরু পথে আবার তাহাদের যাত্রা শুরু করিলেন।[৬১]

ইতোমধ্যে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীকে খুঁজিয়া পাইতে ও বন্দী করার জন্য তাহাদের তাৎক্ষণিক উদ্যোগে ব্যর্থ হইয়া তাঁহাদের প্রত্যকের মাথার জন্য মূল্য ধার্য করিয়া এই মর্মে ঘোষণা দেয়, যে কেহ ঐ দুই ব্যক্তিকে মৃত বা জীবিত অবস্থায় তাহাদের কাছে উপস্থিত করিতে পারিলে তাহাকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এক শত করিয়া উট পুরস্কার দেওয়া হইবে। শুধু ইহাই নহে, কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের দূতগণকে বিশেষভাবে মদীনার রাস্তায় অবস্থিত গোত্রসমূহকে যতটা সম্ভব ব্যাপকভাবে এই ঘোষণা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য প্রেরণ করে এবং এইভাবে যাযাবর ও অর্ধ-যাযাবর গোত্রসমূহের শিকারী কুকুরগুলিকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-এর বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেয়। এরূপ এক বিপজ্জনক ও বেপরোয়া ব্যক্তি সুরাকা ইব্ন

মালিক ইব্ন জু'শুম। সে এইভাবে পুরস্কার পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-কে খুঁজিয়া বাহির করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল। সে নিজে তাহার কাহিনী বর্ণনা করে, আবূ বকর (রা)-এর বিবরণ দ্বারা সম্পূরণকৃত তাহার ভাষ্যটি নিম্নরূপ ঃ

সুরাকা বর্ণনা করে যে, কুরায়শদের প্রেরিত দূত তাহার গোত্র বানূ আল-মুদলিজ (কুদায়দের নিকট বসবাসরত)-এর নিকট আসে এবং তাহাদিগকে অবগত করায়, যে কেহ রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-কে হত্যা অথবা বন্দী করিতে পারিলে সে প্রত্যেকের জন্য এক শত উট পুরস্কারস্বরূপ পাইবে। এইরূপ একটি পরিস্থিতিতে সে একদিন তাহার গোত্রের সদস্যদের একটি সমাবেশে বসিয়াছিল, যখন ঐ গোত্রের এক ব্যক্তি ঐ স্থানে আসে এবং তাহাদিগকে বলে যে, এইমাত্র সে একটি ক্ষুদ্র কাফেলাকে উপকূলের দিকে যাইতে দেখিয়াছে। সে আরও বলে যে, তাহার ধারণা তাহারাই ছিলেন মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁহার সঙ্গীগণ। সুরাকা বলে যে, সে তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিয়াছিল ঐ ব্যক্তিগণ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীরা। কিন্তু অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করা এবং একা নিজে ঐ কাজটির জন্য কৃতিত্ব ও পুরস্কার পাওয়ার জন্য সে সংবাদদাতাকে বলিল যে, সে যাহাদিগকে দেখিয়াছে তাঁহারা ঐ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন না। তাহারা ছিল অমুক অমুক ব্যক্তি যাহারা এইমাত্র ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছে।

এই কথা বলিয়া সে সমবেত ব্যক্তিদের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকে। অতঃপর সে বাড়িতে আসে এবং নিজের বর্শা, ধনুক ও তীর লইয়া বাড়ির পশ্চাৎ দরজা দিয়া বাহির হয়, তাহার অশ্বে আরোহণ করে এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁহার কাফেলার অনুসন্ধানে দ্রুত তাহার অশ্বকে ধাবিত করে। কিছু সময় পর তাঁহারা সত্যই তাহার গোচরীভূত হন। সে তাহার গতি আরও বৃদ্ধি করিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার অশ্ব হোঁচট খাইল এবং তাহাকে ভূমিতে ফেলিয়া দিল। ঘটনাটিকে নিরুৎসাহব্যঞ্জক লক্ষণ ভাবিয়া সে ভাগ্য পরীক্ষাকারী তীরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করিল। পরীক্ষা যে ইঙ্গিত দিল তাহা তাহার মনোপুত হইল না। যেমন এই অভিযানে সে সাফল্য অর্জন করিবে না। ভাগ্য পরীক্ষার ফলাফল উপেক্ষা করিয়া সে তাহার অভিযান অব্যাহত রাখিল এবং তাহাদের এত নিকটে আসিল যে, সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুরআন পাঠ শুনিতে পাইল। সুরাকা বলে যে, সে লক্ষ্য করিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ডানে, বামে বা পশ্চাদদিকে না তাঁকাইয়া উটের উপর শান্তভাবে বসিয়াছিলেন। অপরদিকে আবূ বকর (রা) অনবরত ডানে, বামে ও পশ্চাদদিকে তাকাইতেছেন এবং সকল দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেছেন।[৬২]

আবূ বকর (রা) বলেন, যখন তিনি একজন অনুসরণকারীকে তাহাদের পশ্চাতে দেখিতে পাইলেন তখন বিচলিতভাবে ইহার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। বিবরণটির একটি ভাষ্য বলে যে, আবূ বকর (রা) ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন, নিজের জন্য নহে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিরাপত্তার জন্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুসরণকারী হইতে নিরাপত্তার জন্য

আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করিলেন, আবূ বকর (রা)-কে নিরাশ হইতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তাঁহাদের সহিত রহিয়াছেন।[৬৩]

সুরাকা বলে যে, তৎক্ষণাৎ আকস্মিকভাবে তাহার অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয় ভূমিতে প্রোথিত হইয়া যায় এবং সে অশ্বপৃষ্ঠে ঝাঁকুনি খাইয়া ভূমিতে পতিত হয়। সে চীৎকার করিয়া তাহার অশ্বটিকে উঠিয়া দাঁড়াইতে বলে। অনেক চেষ্টার পর তাহার অশ্বটি ভূগর্ভ হইতে ইহার পদদ্বয় উঠাইতে সক্ষম হয়। কিন্তু একটি ধূলি ও ধূম্রের স্তম্ভ ঐ স্থানটি হইতে আকাশের দিকে উত্থিত হইতে থাকে। সে আরও একবার ভাগ্য নির্ধাণকারী তীরের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে এবং তাহা আরও নিরুৎসাহব্যঞ্জক ফল দান করে। সে তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-কে চীৎকার করিয়া ডাকিতে থাকে, তাঁহাদিকে নিজের নাম বলে ও নিশ্চয়তা প্রদান করে যে, সে তাঁহাদের কোন ক্ষতি করিবে না এবং তাঁহাদিগকে থামিতে ও তাহার কথা শুনিতে অনুরোধ জানায়। ইহাতে তাঁহারা থামেন।

সুরাকা বলে, সেই পুনঃপুন নিরুৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে বুঝাইতে সক্ষম হইয়াছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিশন অনতিবিলম্বে সাফল্যমণ্ডিত হইবে। অতঃপর তাঁহাদের নিকটবর্তী হইয়া সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দলের কোন ব্যক্তিকে জীবিত বা মৃত বন্দী করিতে পারিলে তাহাকে প্রত্যেক ব্যক্তির বিনিময়ে ১০০ উট পুরস্কার দেওয়া হইবে, কুরায়শ নেতাদের এই ঘোষণাসহ তাহাদের পরিকল্পনা ও অভিপ্রায় সম্পর্কে সবকিছু তাঁহাদিগকে অবগত করিল। সে তাঁহাদিগকে তাহার সঙ্গে থাকা খাদ্য ও রসদপত্র গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার কোন কিছু গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তবে তাহাকে শুধু তাঁহাদের অবস্থান সম্পর্কে গোপনীয়তা অবলম্বন করিতে ও তাঁহাদের অনুসরণ করা হইতে অন্যদেরকে বারণ অথবা বিপক্ষে পরিচালিত করিতে বলেন। সুরাকা ইহা করিতে সম্মত হয় এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট একটি নিরাপত্তা পত্রের জন্য আবেদন জানায়। সুরাকা এইরূপ একখানা পত্র লিখিয়া দিতে বলে যাহা ফুহায়রা একখণ্ড হা'ড় বা চামড়ার উপর লিখেন এবং সুরাকাকে প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীগণ পুনরায় তাঁহাদের যাত্রা শুরু করেন এবং সুরাকা তাহার বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করে।[৬৪]

পাঁচ ঃ সফরের পরবর্তী পর্যায়

সুরাকার এই ঘটনার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনাভিমুখী সফর একটি নূতন পর্যায়ে প্রবেশ করে। এই সময়ে তাঁহারা কুদায়দকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দূরত্বে পশ্চাতে রাখিয়া মক্কা হইতে প্রায় দুই দিনের যাত্রাপথ দূরে অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহারা এমন একটি এলাকায় ছিলেন যে, সেখানে কুরায়শ নেতাদের ঘোষণা এত দ্রুত পৌছায় নাই। সুরাকা তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিয়াছিল। সে সুস্পষ্টভাবে বলে যে, তাহার নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন করার পর সে কয়েক ব্যক্তির দেখা পায় যাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিল। সে

তাহাদিগকে এই বলিয়া ফিরাইয়া দেয় যে, সে নিজে যতদূর সম্ভব ব্যাপকভাবে সকল সম্ভাব্য পথে অনুসন্ধান চালাইয়াছে। সুতরাং তাহাদের জন্য অনুসন্ধান চালাইবার কোন কিছুই নাই।[৬৫] বাস্তবিকপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার কাফেলাসহ এই সময়ে তুলনামূলকভাবে একটি নিরাপদ এলাকায় ছিলেন এবং এই সময় হইতে তাহাদিগকে উল্লেখযোগ্য আর কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় নাই।[৬৬]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার কাফেলাসহ এই সময় হইতে মদীনাগামী কমবেশী সচরাচর ব্যবহৃত রাস্তা ব্যবহার করেন। ইব্‌ন ইসহাক ও ইব্‌ন সা'দ রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার হিজরতকালে যেইসব স্থান অতিক্রম করিয়াছেন উহার কতিপয় স্থানের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[৬৭] কিন্তু এইসব বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া সঠিক যাত্রাপথ নির্ধারণ করা কঠিন। কারণ তাহার পর হইতে সেই সকল স্থানের নামসমূহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পরিবর্তিত হইয়াছে। যাহা হউক, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার কাফেলা উপযুক্ত স্থানে বিশ্রাম গ্রহণের জন্য বা রাস্তা সংক্ষেপ করার জন্য বিকল্প পথ ব্যবহার করিলেও প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা সময়ে সময়ে প্রধান ও সচরাচর ব্যবহৃত রাস্তায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আমাদের হাতে আসা তিনটি তথ্যের দ্বারা ইহা সূচিত হয়। এই গুলি হইতেছে ঃ

(ক) উম্মু মা'বাদের শিবিরে তাঁহাদের আশ্রয় গ্রহণ, যাহা প্রধান রাস্তায় অবস্থিত ছিল এবং যাহা সফরকারিগণের জন্য এক ধরনের বিশ্রামস্থল ছিল।

(খ) কিছু সংখ্যক ব্যক্তি কর্তৃক আবূ বকর (রা)-কে চিনিতে পারা যাহাদিগকে তিনি পূর্ব হইতে চিনিতেন এবং যাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিল।

(গ) পথে সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনরত মুসলমান বণিকদের একটি কাফেলার সঙ্গে দেখা হওয়া, যাহাদের মধ্যে আয-যুবায়র ইবনুল আওওয়াম ও আবূ বকর (রা)-এর জামাতা [আসমা (রা)-র স্বামী] ছিলেন।

উম্মু মা'বাদ ('আতিকা বিন্‌ত খালিদ)-এর কাহিনীটি কৌতুহলোদ্দীপক। তিনি বানূ খুযাআর সদস্য এবং একজন জনকল্যাণমুখী মহিলা ছিলেন এবং যিনি তাহার শিবিরে ব্যবসা পরিচালনা করিতেন ও ভ্রমণকারীদিগকে খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করিতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার শিবিরে আসিয়া তাহার নিকট হইতে গোশত ও খেজুর কিনিতে চাহিলেন, কিন্তু ঐ সময়ে তাহার নিকট কোন কিছুই ছিল না। বিবরণটিতে বর্ণিত আছে যে, ঐ সময়ে এলাকাটিতে খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্যের দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল। তাহার স্বামী তাহাদের ছাগলের পাল চরাইতে বাহিরে গিয়াছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিবিরের এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং এক কোণায় একটি ছাগল তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি উম্মু মা'বাদকে ছাগলটি সেখানে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, ছাগলটি এত বেশী দুর্বল যে, উহাকে চরাইবার জন্য মাঠে লইয়া

যাওয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছাগলটিতে দুধ আছে কিনা জানিতে চাহিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, উহা এত দুর্বল যে, উহাতে দুধ থাকিতে পারে না। ইহার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাহার নিকট জানিতে চাহিলেন, তিনি ছাগলটিকে দোহন করার অনুমতি দিবেন কিনা। তিনি জানাইলেন, ইহাতে তাহার কোন আপত্তি নাই, যদি তিনি কোন দুধ পান। রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর নিকট মুনাজাত করিলেন এবং ছাগলটির স্তন স্পর্শ করিলেন। অলৌকিক ঘটনা, ছাগলটির স্তন দুধে পূর্ণ হইয়া উঠিল। অতঃপর তিনি একটি পাত্র লইলেন এবং দুধ দোহন করিলেন। কাফেলার প্রত্যেকে এবং উম্মু মা'বাদ নিজে ইচ্ছামত দুধ পান করিলেন। সবশেষে পান করিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ। তিনি আবার ছাগলটি দোহন করিলেন এবং তাহার ও তাহার স্বামীর জন্য পূর্ণ এক পাত্র দুধ রাখিয়া দিলেন।[৬৮] অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার কাফেলাসহ ঐ স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

বর্ণনাটির একটি ভাষ্যমতে উম্মু মা'বাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রস্থানের পূর্বে তাঁহার হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন।[৬৯] অপরপক্ষে অন্য একটি ভাষ্যে আছে যে, তিনি পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট হিজরত করেন এবং তাহার পর ইসলাম গ্রহণ করেন।[৭০] রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রস্থানের অল্প সময় পরে তাহার স্বামী আব্দ মা'বাদ শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং দুধ দেখিয়া অতি মাত্রায় বিস্মিত হন। উম্মু মা'বাদ সম্পূর্ণ ঘটনা তাহার নিকট বর্ণনা করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চেহারা ও ব্যক্তিত্বের একটি খুব জীবন্ত বর্ণনাও প্রদান করেন। তাহার স্বামী সানন্দে বলিলেন, তাহার মেহমান কুরায়শদের সেই ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ ছিলেন না যাহার ধর্ম প্রচার সম্পর্কে এত কিছু শোনা গিয়াছে। তিনি তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছাও প্রকাশ করিলেন যে, যদি তিনি সুযোগ পাইতেন তবে নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহগামী হইতেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার কাফেলার যাত্রাপথে এক স্থানে তাঁহাদের সঙ্গে কিছু লোকের দেখা হয় যাহারা পূর্বে আবূ বকর (রা)-কে সিরিয়া ভ্রমণের কারণে তাঁহাকে চিনিত। অবশ্য তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে চিনিত না। সুতরাং তাহারা আবূ বকরকে জিজ্ঞাসা করিল তিনি কে? আবূ বকর (রা) নিরাপত্তার কারণে তাঁহার পরিচয় প্রকাশ করা ভাল মনে করিলেন না। তদনুসারে তিনি কৌশলে উত্তর দিলেন, ঐ ব্যক্তি তাহার "পথপ্রদর্শক"। ফলে তাহারা তাঁহাকে পথপ্রদর্শক মনে করিল। অপরপক্ষে আবূ বকর (রা) ঐ অভিব্যক্তি দ্বারা বুঝাইলেন সত্যের পথপ্রদর্শক।[৭১] তাঁহাদের সফরের অন্য একটি পর্যায়ে তাঁহারা সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্তনরত মুসলমান বণিকদের একটি দলের সাক্ষাত পান। তাহাদের মধ্যে ছিলেন আয-যুবায়র ইবনুল 'আওওয়াম (রা)। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা)-কে সিরিয়া হইতে আনীত সাদা কাপড়ের খণ্ড উপহার প্রদান করেন যাহা মদীনায় উপস্থিত হওয়ার সময় তাঁহাদের পরনে ছিল।[৭২]

এইভাবে দশ হইতে বার দিন ভ্রমণের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীগণ মদীনার উপকণ্ঠে উপস্থিত হন। সেখানে আনসার ও মুহাজিরগণ মক্কা হইতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রস্থানের কথা জানিতে পারিয়া আগ্রহের সঙ্গে যে কোন দিন তাঁহার আগমনের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে তাহারা কুবার পার্শ্ববর্তী মুক্ত কংকরময় ময়দানে যাইতেন এবং দ্বিপ্রহরের রৌদ্রের তাপ তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে এবং বাড়ি যাইতে বাধ্য না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন।

একদিন তাহারা, যখন ময়দানে দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর সবেমাত্র প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, একজন ইয়াহূদীর চিৎকার শুনিতে পাইলেন। সে তাহার উঁচু দালানের ছাদ হইতে মরুভূমিতে বেশ দূরে ভ্রমণকারীদের একটি ছোট কাফেলাকে গোচরীভূত হইতে এবং শহরের দিকে আসিতে দেখিয়াছে। সে সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারে যে, তাঁহারা ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার কাফেলা। সে চিৎকার করিয়া মুসলমানগণকে ডাকিয়া বলিল, "সৌভাগ্য" যাঁহার জন্য তাহারা অপেক্ষা করিতেছেন, মরুভূমিতে দেখা দিয়াছেন এবং তাহাদের দিকে আসিতেছেন। ইহা শুনিয়া মুসলমানগণ দ্রুত নিজেদিগকে অস্ত্রে সজ্জিত করিলেন এবং দলবদ্ধ হইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে অভ্যর্থনা জানাইতে বাহিরে গেলেন। তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত কুবাতে প্রবেশ করেন এবং বানূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফের আতিথ্য গ্রহণ করেন।[৭৩]

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ সোমবার ১২ রাবীউল আওয়াল তাঁহার ধর্ম প্রচারের চতুর্দশতম বৎসরে (১ হি./২৩ সেপ্টম্বর ৬২২ খৃ.) কুবাতে উপস্থিত হন। সামান্য কয়েক দিন পর 'আলী ইব্‌ন আবূ তালিব বিশ্বস্ততার সঙ্গে তাঁহার উপর আরোপিত দায়িত্ব পালন করিয়া সেখানে আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হন। পরবর্তী কালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পরিবারবর্গ ও আবূ বকরের পরিবারের সদস্যগণ আগমন করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে মিলিত হন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কুবাতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম প্রচারের মক্কী যুগের অবসান ঘটে এবং তাঁহার জীবনের ও ইসলামের এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়।

অনুবাদ ঃ মুহাঃ আবু তাহের

তথ্যনির্দেশিকা

১. মুসলিম, নং ১১৬; মুসনাদ, ৩খ., ৩৭০।

২. দেখুন উপরে পৃ. ৮১৫-৮১৭ (মূল গ্রন্থ)।

৩. দেখুন পঞ্চদশ অধ্যায়।

৪. ১৬ (আন নাহল) ঃ ৪১ = তাহারা নির্যাতিত হইবার পর আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হিজরত করিয়াছে......

وَالَّذِيْنَ هٰجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا .

৫. ১৬ ঃ ১১০ = নিশ্চয় যাহারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর হিজরত করিয়াছে...

لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا .

৬. ৩ (আল ইমরান) ১৯৫ ঃ

فَالَّذِيْنَ هجَرُوْا وَأُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوْذُوْا فِيْ سَبِيْلِيْ ...

وَالْمُهَاجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ ... ঃ (আল-হাশর) ৫৯ এবং

"মুহাজিরদের মধ্যে যাহারা নিজেদের ঘরবাড়ি হইতে উৎখাত হইয়াছে"।

৭. দৃষ্টান্তস্বরূপ দ্র. বুখারী, নং ৩৯০০ ও ৩৯০১; ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৬৯।

৮. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৬৮।

৯. বুখারী, নং ৩৯০৫।

১০. ইবন হিশাম, ১খ., ৪৬৮।

১১. ঐ, ৪৬৯–৪৭০। উছমান ইব্‌ন তালহা (রা) ঐ সময়ে একজন অমুসলমান ছিলেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির পর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খালিদ ইবনুল ওয়ালীদের সঙ্গে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি আজনাদায়নের যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন।

১২. বুখারী, নং ৩৯২৪, ৩৯২৫।

১৩. উপরে দ্র. পৃ. ৮৪১–৮৪৪।

১৪. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., ২২৬।

১৫. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৭০–৪৭২।

১৬. ঐ, ৪৭১।

১৭. ঐ, ৪৭৪–৪৭৫।

১৮. ঐ, ৪৭৫-৪৭৬।

১৯. ঐ; আরও দেখুন বুখারী, নং ৪৫৬০ এবং ফাতহুল বারী, ৮খ., ৭৪-৭৫। ইব্‌ন হিশাম প্রদত্ত মক্কা হইতে এই দুইজনকে উদ্ধার করার সম্পর্কে আল-ওয়ালীদ ইবনুল ওয়ালীদের রোমাঞ্চকর কাহিনী সত্য নয়। কারণ ইবনুল ওয়ালীদ বদর যুদ্ধের পর ইসলাম কবুল করেন।

২০. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৮০; ইব্‌ন সা'দ, ১খ., ২২৬।

২১. বুখারী, নং ৩৯০৫।

২২. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৭৭।

২৩. উদাহরণের জন্য দেখুন ইব্‌ন কাছীর, তাফসীর, ১খ., ৩৬০।

২৪. বুখারী, নং ৩৯২৯।

২৫. ইব্ন হিশাম, ১খ., পৃ. ৪৭; ৪৭৬-৪৮০।

২৬. অন্য একটি বিবরণ অনুসারে তালহা বানূ আবদুল আশহালের আস'আদ ইব্ন যুরারার সঙ্গে থাকিতেন।

২৭. ঐ, ৪৮১।

২৮. ঐ, ৪৮০-৪৮২; ইব্ন সা'দ, ১খ., ২২৭।

২৯. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৮৩-৪৮৪; মুসনাদ, ১খ., ৩৪৮; আত-তাবারী, তাফসীর, ৯খ., ২২৭-২৩০; ইবন কাছীর, তাফসীর, ৪খ., ৪৯।

৩০. উসদুল গাবা, ১খ., ২৭১।

৩১. মুত'ইমের পুত্র যুবায়র যখন মহানবী ﷺ-এর নিকট বদরের বন্দীদের জন্য সুপারিশ করেন তখন তিনি মন্তব্য করেন, যদি মুত'ইম জীবিত থাকিতেন এবং বন্দীদের জন্য সুপরিশ করিতেন তবে সব বন্দী বিনা মুক্তিপণে মুক্ত হইত।

৩২. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৮০; বুখারী, নং ১৯০৫, ৪০৬৮।

৩৩. ঐ; আরও দেখুন বুখারী, নং ২১৩৮।

৩৪. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৮২; ইব্ন সা'দ, ১খ., ২২৭।

৩৫. আল-মুসতাদরাক, ৩খ, ৩; মুসনাদ, ১খ., ২২৩। মূল পাঠ নিম্নরূপ ঃ

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْـرِجْنِـىْ مُـخْـرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَـلْ لِّـىْ مِـنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا .

৩৬. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৮৫।

৩৭. ঐ, ৪৮৩; ইব্ন সা'দ, ১খ., ২২৮।

৩৮. ঐ।

৩৯. ঐ

৪০. ঐ; আরও দেখুন ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৮৫। পক্ষান্তরে সুহায়লী "কিছু সংখ্যক লেখক"-এর, যাহাদের সম্পর্কে তিনি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, বরাত দিয়া (৩খ., ২২৯) বলেন, ঘাতকরা দেওয়ালে আরোহণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু গৃহের একজন মহিলার আর্তচীৎকার তাহাদিগকে আরোহণ করা হইতে বিরত রাখে।

৪১. বুখারী, নং ৩৬১৫, ৩৬৫২; আরও দেখুন নিম্নে (মূলপাঠ)।

৪২. বুখারী, নং ৩৯০৫।

৪৩. ইব্ন সা'দ, ১খ., ২২৮; ইবনুল জাওরী; আল-ওয়াফাতেও উদ্ধৃত, পৃ. ২৩৮।

৪৪. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৮৫; আত-তাবারী, তারীখ, ১খ., ৩৭৮ (১খ., ১২৩৯)।

৪৫. আল-ইসতীআব, নং ৭২৫৯; আল জারহ ওয়াত-তা'দীল, ২/২ খ., ৩৬-৩৭।

৪৬. মুসনাদ, ১খ., ৩৩১। আল-মুসতাদরকে অনুরূপ বর্ণনা রহিয়াছে (৩খ., ৪)। উহা তথ্যের উপরে উল্লিখিত অংশটি ধারণ করে না।

৪৭. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৮৩।

৪৮. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., ২২৮।

৪৯. সুলায়মান হাম্‌দ আল-আওদা এই মত প্রকাশ করিয়া বিবরণটিকে আইশা (রা)-এর বিবরণের সঙ্গে খাপ খাওয়াইতে চেষ্টা করেন যে, মহানবী ﷺ আবূ বকরের সঙ্গে তাঁহার আলাপ-আলোচনা সম্পন্ন করার পর নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। আস-সিরাত আন-নাবাবিয়্যা ফিস-সাহীহায়ন ওয়া ইনদা ইব্‌ন ইসহাক, অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস, ইমাম মুহাম্মাদ বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪০৭/১৯৮৭, পৃ. ৪০৩। যাহা হউক এই ব্যাখ্যাটি তাহাদের সতর্ক পরিকল্পনার ঘটনাসহ বিবরণটির সহজাত অসামাঞ্জস্যতা অগ্রাহ্য করে।

৫০. ঐ সময়ের পূর্বেই মহানবী ﷺ -এর সহিত আইশা (রা)-র বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছিল।

৫১. অন্য একটি বর্ণনায় আছে, আবূ বকর (রা) আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন।

৫২. বুখারী, নং ৩৯০৫। আরও দেখুন, নং ২৯৭৯, ৩৯০৭ ও ৫৩৮৮।

৫৩. বুখারী, নং ৩৯০৫। ইব্‌ন ইসহাক (ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৮৪-৪৮৭; ইব্‌ন সা'দ (১খ., ২২৯) প্রমুখাত কর্তৃক আইশা (রা)-এর বরাতে কমবেশী একই কাহিনী বর্ণিত।

৫৪. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪৮৭। আসমা (রা) ঐ সময়ে প্রায় চারি মাসের গর্ভবতী ছিলেন। কারণ পরবর্তী কালে ছয় মাস পরে মদীনায় তাহার হিজরতের প্রায় অব্যবহিত পরে তাহার পুত্র আবদুল্লাহ জন্মগ্রহণ করে। (বুখারী, নং ৩৯০৯, ৩৯১০)।

৫৫. ইব্‌ন হাজার কর্তৃক উদ্ধৃত, ফাতহুল বারী, ৭খ., ২৭৯; আল-ইসাবা, ৩খ., ২৯১।

৫৬. বুখারী, নং ৩৯২২, ৪৬৬৩; মুসলিম, নং ২৩৮১; মুসনাদ, ১খ., ৪।

৫৭. ইব্‌ন সা'দ, ১খ., ২২৯।

৫৮. মুসনাদ, ১খ., ৩৪৮।

৫৯. উদাহরণের জন্য দেখুন আহমাদ শাকির (সম্পা.), আল-মুসনাদ, ৫খ., ৮৭, হাদীছ নং ৩২৫১-এর টীকা; মীযানুল ইতিদাল., ৩খ., ৩০৬; আল-গাযালী, ফিকুহুস সীরাহ, নং ১৭৩, টীকা ২ (আল-আলবানীর মন্তব্যসমূহ)।

৬০. বুখারী, নং ৩৯১৭; মুসলিম, নং ৩০০৯। তু. বুখারী, নং ৩৯০৫, যেখানে 'আইশা (রা) বলেন, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উরায়কিত তিন রাত্রি অতিবাহিত হইবার পর "প্রাতকালে" (صَبَاحًا) গুহার নিকটে আসেন। রাত্রিতে গুহা হইতে তাঁহাদের যাত্রা করা অধিকতর সম্ভাবনাপূর্ণ। কারণ এই সময়টি চলাচলের এবং অন্যদের নজর এড়ানোর জন্য অধিকতর সুবিধাজনক। ইব্‌ন হাজার দুইটি বিবরণের মধ্যে প্রতীয়মান

পার্থক্যের কোন ব্যাখ্যা প্রদান করেন নাই। পথপ্রদর্শক গভীর রাত্রিতে গুহায় আসে এবং তাহারা ঠিক মধ্যরাত্রির পরে যাত্রা শুরু করেন ইহা ধরিয়া লইয়া সহজে এবং খুব যুক্তিসঙ্গতভাবেও এইগুলির মধ্য সমন্বয়সাধন করা যাইতে পারে।

৬১. বুখারী, নং ৩৯০৮, ৩৯১৭; মুসলিম, নং ২০০৯, ৩০০১।

৬২. বুখারী, নং ৩৯০৬।

৬৩. ঐ, নং ৩৬১৫, ৩৬৫২, ৩৯০৮, ৩৯১১; মুসলিম, নং ২০০৯, ৩০০৯; মুসনাদ, ১খ., পৃ. ২।

৬৪. ঐ; আরও দেখুন বুখারী, নং ৩৯০৬, ৩৯০৮, ৩৯১১। সুরাকা নিরাপত্তা পত্রটি তাহার নিকট সংরক্ষিত করিয়াছিলেন এবং হুনায়ন বিজয়ের পর ইহা মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন এবং এই ঘটনার পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন (ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৯০)।

৬৫. বুখারী, নং ৩৬১৫; মুসলিম নং ৩০০৯।

৬৬. আরও একটি বিবরণ আছে। বর্ণিত আছে যে, বানূ আসলাম গোত্রের বুরায়দা ইবনুল হাসীব তাহার গোত্রের ৭০ বা ৮০ জন লোকসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বন্দী করার উদ্দেশ্যে তাঁহার অনুসন্ধানে বাহির হয় এবং আল-গামীম নামক স্থানে তাঁহার সাক্ষাত লাভ করে, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও কথায় মুগ্ধ হইয়া সে তাহার সকল সাথীসহ ইসলাম গ্রহণ করে (ইবন সা'দ, ৪খ., ২৪২; ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা, পৃ. ২৪৮)। বর্ণনাটিতে বুরায়দা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সহিত সাক্ষাত করে তখন সে তাঁহার প্রতি কোন শত্রুতামূলক আচরণ প্রদর্শন করিয়াছিল কিনা তাহার উল্লেখ নাই।

৬৭. ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৯১; ইব্ন সা'দ, ১খ., ২৩২-২৩৩।

৬৮. ইব্ন সা'দ, ১খ., ২৩০-২৩২; আল-মুসতাদরাক, ৩খ., ৯-১০; আবূ নুআয়ম, দালাইল, পৃ. ৩৩৭-৩৪১; ইবনুল জাওযী, আল-ওয়াফা, পৃ. ২৪৪-২৪৭ ইত্যাদি।

৬৯. আল-মুসতাদরাক, ৩খ., ১০।

৭০. ইব্ন সা'দ, ১খ., ২৩২।

৭১. বুখারী, নং ৩৯১১; ইব্ন সা'দ, ১খ., ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫।

৭২. বুখারী, নং ৩৯০৬; আরও দেখুন ফাতহুল বারী, ৭খ., ২৮৬; আল-মুসতাদরাক, ৩খ., ১৪।

৭৩. বুখারী, নং ৩৯০৬; ইব্ন হিশাম, ১খ., ৪৯২; ইব্ন সা'দ, ১খ., ২৩৩। ইব্ন ইসহাক এবং ইব্ন সা'দ, উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বানূ আমর ইব্ন আওফের কুলছূম ইব্ন হিদমের আশ্রয়ে অবস্থান করিতেন।

উনচল্লিশতম অধ্যায়

মদীনায় হিজরত সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণের দৃষ্টিভংগি

মদীনায় হিজরতের পটভূমি ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রাচ্যবিদদের মতামতসমূহ পাঁচটি প্রধান শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করা যাইতে পারে। যেমন (ক) মহানবী ﷺ-এর তাইফ গমন; (খ) গোত্রসমূহ ও মদীনার সঙ্গে যোগাযোগ; (গ) মদীনাবাসিগণ কর্তৃক ইসলাম ও মহানবী ﷺ-কে গ্রহণের কারণসমূহ; (ঘ) কুরায়শদের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র এবং (ঙ) হিজরতের পদ্ধতি।

এক ঃ মহানবী ﷺ-এর তাইফ গমন সম্পর্কে

মহানবী ﷺ-এর তাইফ গমন সম্পর্কে প্রাচ্যবিদগণ সাধারণভাবে উৎসসমূহে উল্লিখিত প্রধান ঘটনাসমূহ গ্রহণ করেন। যেমন আবূ তালিবের মৃত্যুর পর মক্কায় মহানবী ﷺ-এর অবস্থা সংকটাপন্ন হয়। সুতরাং তিনি তাইফে সমর্থন অনুসন্ধান করেন। তিনি প্রধানত 'আব্দ ইয়ালীল এবং তাহার ভ্রাতাদের নিকট গমন করেন যাহারা তাহাদের গোত্রের নেতা ছিল। তাহারা মহানবী ﷺ-কে শুধু প্রত্যাখ্যানই করে নাই, বরং তাহারা তাঁহাকে শহর হইতে বিতাড়িত করার জন্য শহরবাসীদিগকে প্ররোচিতও করে। তিনি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত 'উতবা ও শায়বার উদ্যানে বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তাহাদের ভৃত্য 'আদদাস মহানবী ﷺ-এর কথায় প্রভাবিত হয় এবং তাঁহাকে অসাধারণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। পরে মহানবী ﷺ নাখলা ও হিরাতে যাত্রাবিরতি করেন এবং মুত'ইম ইব্ন 'আদীর নিরাপত্তাধীনে মক্কায় পুনঃপ্রবেশ করেন। এই সকল ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচ্যবিশারদগণ কিছু সংখ্যক অনুমান ও পূর্বধারণার বশবর্তী হন। এইগুলি প্রধানত মহানবী ﷺ-এর তাইফ গমনের কারণ ও ইহার লোকদের নিকট যাওয়ার সময় তাঁহার মনকে প্রভাবিত করা চিন্তাভাবনাসমূহকে পরিবেষ্টন করিয়া আবর্তিত হয়।

মুইর বলেন, মক্কায় মহানবী ﷺ-এর অবস্থা এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হইয়াছিল যে, তাঁহাকে সেখানে "অবশ্যই প্রাধান্য অর্জন করিতে হইত", না হয় "নবূওয়াতের দাবি পরিত্যাগ করিতে হইত অথবা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইত"। তাঁহার অনুসারীদের অধিকাংশ দূরে আবিসিনিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন এবং সাম্প্রতিক কালে "তিন বা চারি বৎসর পূর্বে 'উমার ও হামযা (রা)-র ইসলাম গ্রহণের পর হইতে অন্ততপক্ষে উল্লেখযোগ্য কেহ ইসলাম গ্রহণ করে

নাই"। মুইর জোর দিয়া বলেন, "প্রকাশ্য শত্রুতা" "তাহাদেরকে বিরত করার যে কোন উদ্যোগ সত্ত্বেও যে কোন দিন সংগ্রামটিকে ঘনীভূত করিতে পারে এবং তাহার উদ্দেশ্যটি অপূরণীয়ভাবে ধ্বংস করিতে পারে"।[১] এই কারণে তিনি চতুর্দিকে সমর্থন অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বিতীয়ত, মুইর ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, মহানবী ﷺ এই সময় নিশ্চিত ছিলেন যে, "তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য শীঘ্রই মক্কার উপর আল্লাহ্‌র দিক হইতে শাস্তি অবতীর্ণ হইবে"। মুইর লিখেন, "মক্কাবাসীরা ধ্বংসের তারিখ জানিত না, তবে ধ্বংস প্রায় অবধারিত হইয়া পড়িয়াছিল"।[২]

তৃতীয়ত, মুইর আরও বলেন, মহানবী ﷺ আশা পোষণ করিতেন যে, তিনি তাইফের জনগণকে স্বপক্ষে আনিতে পারিবেন যাহারা "ঘনঘন" আন্তঃ বিবাহ সম্পর্ক দ্বারা আবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও "কুরায়শদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। তাহাদের নিজেদের একটি লাত বা প্রধান মূর্তি ছিল। তাহাদের গোত্রীয় অহমিকা ও বিবেককে নাড়া দিয়া, তাহাদিগকে মক্কার জনগণের বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইতে পারিত"।[৩]

উপরে উল্লিখিত বিবরণটিতে "প্রকাশ্য শত্রুতা" অভিব্যক্তিটি দ্বারা মুইর স্বতঃস্ফূর্তভাবে সশস্ত্র সংঘর্ষের সূচনা বুঝাইয়াছেন। এই কথা বলিয়াও যে, এইরূপ 'প্রকাশ্য শত্রুতা' "তাঁহার উদ্দেশ্যকে অপূরণীয়ভাবে ধ্বংস করিবে", মুইর স্পষ্টভাবে বুঝান যে, মহানবী ﷺ এই ধরনের শত্রুতা শুরু করার মত অবস্থায় ছিলেন না এবং কুরায়শ নেতাদের পক্ষ হইতে এইরূপ সশস্ত্র আক্রমণের আশঙ্কা ছিল; যদিও কিছু সময় পর মুইর কুরায়শ নেতাদের অনুমিত শান্তি স্থাপক অভিপ্রায়কে তুলিয়া ধরেন।[৪] সম্ভবত তিনি বলিতে চাহেন যে. মক্কায় মহানবী ﷺ-এর অবস্থা বিপজ্জনক ছিল, যাহা মূলত সত্য।

তাহার অন্য দুইটি অনুমান, যেমন মহানবী ﷺ মক্কার উপর পতনশীল ঐশী শাস্তির আসন্নতা অনুমান করিয়াছিলেন এবং তিনি মক্কার লোকদের বিরুদ্ধে তাইফবাসীদের তথাকথিত ঈর্ষাপরায়ণতার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিতেন, উভয়টি অসমর্থনীয় ও অযৌক্তিক অনুমান। কুরআন এবং একই কারণে মহানবী ﷺ অবিশ্বাসী কুরায়শগণকে অতীতের অব্যাহভাবে অবিশ্বাসে লিপ্ত গোত্রসমূহের দুর্ভাগ্য সম্পর্কে বারবার স্মরণ করাইয়াছেন এই ইঙ্গিতসহ যে, যদি তাহারা তাহাদের ভ্রান্ত পথে অবিচলিত থাকে তবে তাহারাও এই ধরনের দুর্ভাগ্যের শিকার হইতে পারে। কিন্তু কুরআন বা হাদীছে এইরূপ কিছুই নাই যাহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, মহানবী ﷺ তাইফ যাত্রার প্রাক্কালে কিংবা অন্য কোন সময় মক্কায় ঐশী শাস্তির আসন্নতা সম্পর্কে আশঙ্কা করিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে এই অনুমানটি যে, তিনি তাইফবাসীদের অনুমিত ঈর্ষাপরায়ণতার সুযাগ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই বাস্তব সত্য দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয় যে, ঐ শহরটির অধিবাসীদের কোন অংশই মহানবী ﷺ-এর প্রতি কোন কৌতুহল বা আগ্রহ প্রকাশ করে নাই।[৫]

মুইরের উক্তি যে, "তাহাদের নিজেদের একটি লাত বা প্রধান মূর্তি ছিল" কিয়ৎপরিমাণে বিভ্রান্তিকর। যদি তিনি বুঝাইতে চাহেন যে, মক্কাতে যেরূপ ছিল তাহার বিপরীতে তাহাদের একটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেবী এবং একটি প্রতিদ্বন্দ্বী যাজক সংক্রান্ত শ্রেণী ছিল, তাহা হইলে ইহা মক্কাবাসীদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে সমর্থন দিবার কারণ না হইয়া বরং মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে তাহাদের সেইরূপ বিরোধিতার একটি কারণ হইবে যেরূপ মক্কার যাজক সংক্রান্ত শ্রেণী কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে।

সর্বোপরি তিনি নিশ্চয় তাহাদের "প্রধান মূর্তি"-র পক্ষ সমর্থন করিতে তাইফে যান নাই। বাস্তবিকই তাইফের অধিবাসিগণ কর্তৃক মহানবী ﷺ -কে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করার ঘটনায় তাহাদের এরূপ আচরণ অনুমান অপেক্ষা অধিক একটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা করে, যেরূপ মক্কাবাসীদের প্রতি তাহাদের অনুমিত ঈর্ষাপরায়ণতা সম্পর্কে মুইর করেন, যেটিকে মহানবী ﷺ তাঁহার নিজের স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহারের কথা সম্ভবত ভাবিয়া থাকিতে পারেন।

এই দিক হইতে বিষয়টি সম্পর্কে মার্গোলিয়থের আলোচনাটি ভিন্নধর্মী। সেখানে তাইফবাসিগণ কর্তৃক মহানবী ﷺ-কে প্রত্যাখ্যান করার কি কি কারণ থাকিতে পারে বলিয়া তিনি মনে করেন, তাহার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন। মহানবী ﷺ-এর সেখানে যাইবার কারণসমূহ সম্পর্কে যতদূর সম্ভব পর্যালোচনা করিয়া মার্গোলিয়থ সংক্ষিপ্তভাবে এই বলিয়া সেগুলিকে বাতিল করেন, "আবূ তালিবের মৃত্যুর পর মহানবী ﷺ নির্মম অত্যাচার ভোগ করেন বলিয়া কথিত হন"। সুতরাং তিনি "অন্যত্র আশ্রয় পাওয়ার উদ্দেশ্যে" মক্কা ত্যাগ করেন।[৬]

কিছু সময় পর তিনি এই কথা বলিয়া একটি অভিনব ধারণা প্রকাশ করেন, তাইফের "শাসক পরিবারসমূহের একটিতে একজন কুরায়শ বংশীয় স্ত্রী ছিল। এই কারণে মুহাম্মাদ ﷺ কুরায়শ বংশীয় হিসাবে শাসক পরিবারটির নিরাপত্তা দাবি করিতে পারিতেন"।[৭]

এই ইঙ্গিত হইতেছে 'আমর ইব্ন উমায়রের পরিবারের প্রতি যাহার তিন পুত্র 'আব্দ ইয়ালীল, মাস'উদ ও হাবীব তাইফের নেতা ছিল এবং যাহাদের একজন বাস্তবিকই মক্কার বানূ জুমাহ-এর এক মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিল। অবশ্য ঐ পরিবারের নিকট আশ্রয় প্রার্থনার প্রসঙ্গে ঐ বিষয়টি মহানবী ﷺ-এর প্রাথমিক বিবেচনা ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ইহা একটি হীন ধারণা। কারণ বানূ জুমাহসহ কুরায়শগণ নিজেরাই মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে ছিল। সুতরাং তাঁহার "একজন কুরায়শ বংশীয়" হইবার বিষয়টি শুধু এই কারণে তাইফী পরিবারের নিকট তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনার হেতু হইতে পারে না যে, তাহারা মক্কার একটি কুরায়শ পরিবারের বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় ছিল। এই বিশেষ ঘটনা মহানবী ﷺ -এর বিরুদ্ধে আব্দ ইয়ালীল ভ্রাতাদের শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে আরও যথাযথভাবে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

তাইফবাসী কর্তৃক মহানবী ﷺ-কে প্রত্যাখ্যান করার ঘটনার উপর জোর দিয়া মার্গোলিয়থ মন্তব্য করে, মহানবী ﷺ সমর্থন পাওয়ার জন্য "আপাত দৃষ্টিতে কোন অধিকতর মন্দ" জায়গা

"পছন্দ করিতে পারিতেন না" এবং তাইফবাসীদের এই প্রত্যাখ্যান ব্যাখ্যায় মার্গোলিয়থ বাস্তবিকপক্ষে সেইসব ঘটনা ব্যবহার করেন যাহা মুইর মহানবী ﷺ-এর সেখানে যাওয়ার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহার করিয়াছেন।

এইভাবে প্রথমত, মার্গোলিয়থ বলেন, তাইফ শহরটি মক্কা শহরের সঙ্গে বহু বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং পূর্বোক্তটি মহানবী ﷺ-এর প্রতি একটি সদৃশ্য নীতি অনুসরণ করে। দ্বিতীয়ত, তাইফের অধিবাসীগণ "তাহাদের দেবীদের প্রতি কম শ্রদ্ধাশীল ছিল না" এবং "কয়েক বৎসর পর পর তাহারা তাহাদের ধর্মের জন্য অন্য যে কোন আরব শহরের অধিবাসীগণ কর্তৃক কৃত সংগ্রাম অপেক্ষা কঠিনতর সংগ্রাম করিত"।[৮] তৃতীয়ত মুইর বলেন, তাইফের অধিবাসীদের অধিকাংশ পূর্বেই মহানবী ও তাঁহার ধর্ম প্রচার সম্পর্কে অবগত ছিল এবং প্রাথমিকভাবে তাঁহাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান প্রদর্শন করিত কিন্তু তাহাদের নেতৃবৃন্দ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিলে তাহারাও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।[৯]

মার্গোলিয়থ মনে করেন, তাইফ মক্কা হইতে দুই দিনের যাত্রাপথ না হইলেও এবং অনেক মক্কাবাসীর সেখানে সম্পত্তি থাকিলেও মহানবী ﷺ-এর প্রচারকার্য, যদিও ইতোমধ্যে ইহার দশ বৎসর অতীত হইয়াছিল, "তাইফের জনগণের কানে পৌঁছায় নাই"।[১০] সুতরাং প্রথম বারের মত তাঁহার কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহার প্রতি মোটেই মনোযোগ দেয় নাই।

এইভাবে মুইর ও মার্গোলিয়থ একই প্রকার ঘটনা ও একই প্রকার পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করিয়া বিপরীতধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। প্রথমজনের বিবরণ যে, তাইফের অধিবাসীরা তাহাদের নেতাদের প্ররোচনায় মহানবী ﷺ-এর বিপক্ষে গমন করে, ঘটনাবলী ও উৎসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। অপরপক্ষে মার্গোলিয়থের দাবি যে, তাইফের অধিবাসিরাপূর্ব হইতে মহানবী ﷺ এবং তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞাত ছিল বোধগম্যভাবে তাঁহাকে মর্যাদাহীন করার উদ্দেশ্যে ইহা তাহার একটি অমূলক ধারণা।

তাইফবাসী কর্তৃক মহানবী ﷺ-কে প্রত্যাখ্যান করার ঘটনার উপর মার্গোলিয়থ কর্তৃক আরোপিত গুরুত্ব ওয়াট (Watt) -কে প্রভাবিত করে নাই বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যিনি তাহার পালায় আশ্রয়ের জন্য মহানবী ﷺ-এর সেখানে গমন করার কারণ ও উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান করেন। ইহা করিতে যাইয়া ওয়াট উপরে উল্লিখিত মুইরের অভিমতসমূহ গ্রহণ ও সম্প্রসারিত করেন। ইহা উল্লেখ করার পর যে, মক্কায় মহানবী ﷺ-এর পক্ষে যাহা করা সম্ভব ছিল তাহা তিনি করিয়াছিলেন এবং উমারের ইসলাম গ্রহণের পর সেখানে ধর্মান্তরিতকরণের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই, ওয়াট মক্কার আসন্ন ধ্বংস হওয়া সম্পর্কে মুইরের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন। তিনি বলেন, উৎসসমূহ মহানবী ﷺ-এর অন্যত্র আশ্রয় অনুসন্ধান করার কারণ হিসাবে আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তাঁহার "ক্রমবর্দ্ধমান হারে অবমাননাকর আচরণ"-এর শিকার হওয়া সম্পর্কে বলা হইলেও "সম্ভাবনাটি এড়াইয়া যাওয়া যায় না যে, মক্কা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত

হইবার পর ইহার উপর তিনি কিছু ঐশী শাস্তি আপতিত হইবার প্রত্যাশায় ছিলেন এবং তাঁহার অনুগামিগণকে স্থানান্তরিত করিতে চাহিয়াছিলেন"।[১১]

ইহা তাৎক্ষণিভাবে উল্লেখযোগ্য যে, অনুমানটি যৌক্তিকতাবিহীন। উৎসসমূহে এইরূপ ইঙ্গিত প্রদানকারী কিছু নাই যে, মক্কার উপর আল্লাহ্র অভিশাপের আসন্ন বর্ষণের আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া মহানবী ﷺ তাইফ গমন করেন বা এমন কোন ইঙ্গিতও ছিল না যে, তিনি তাঁহার অনুসারীবৃন্দকে তাইফে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।

ইহা অবশ্য মুইরের অন্য একটি ইঙ্গিত। যেমন মহানবী ﷺ সম্ভবত মক্কাবাসীদের প্রতি তাইফবাসীদের অনুমিত ঈর্ষাপরায়ণতার সুযোগ গ্রহণ করা সম্পর্কে চিন্তা করিয়াছিলেন, যাহা প্রধানত ওয়াট কাজ করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি তাহার মতবাদটি পুনরাবৃত্তি করেন, "সম্ভবত ফিজারের যুদ্ধের একটি ফল হিসাবে" তাইফকে কুরায়শদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য মানিয়া লইতে হইয়াছিল, বানূ ছাকীফের সঙ্গে বানূ মাখযূমের কমপক্ষে একটি অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল।

ওয়াট তাইফের দুই প্রধান রাজনৈতিক দল বানূ মালিক ও আহলাফ সম্পর্কেও উল্লেখ করেন। প্রথমোক্তটি, তিনি বলেন, শক্তিশালী প্রতিবেশী গোত্র হাওয়াযিনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং ইহার সঙ্গে "শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করা, ইহার জন্য আহলাফ গোত্রটি "কুরায়শদের সমর্থন কামনা করিয়াছিল"। অতঃপর ওয়াট বলেন, "সেখানে প্রায় নিশ্চিতরূপে স্থানীয় রাজনীতিতে কোন মতানৈক্যের বিষয় ছিল, মুহাম্মাদ ﷺ যাহার সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন"। 'আব্দ ইয়ালীল ও তাহার ভ্রাতাদের নিকট যাইবার সময় তিনি সম্ভবত "মাখযূমদের কবল হইতে অর্থনৈতিক মুক্তির টোপ দিয়া তাহাদিগকে আকৃষ্ট করার আশা করিয়াছিলেন"।[১২]

পূর্বে যেরূপ দেখান হইয়াছে,[১৩] ফিজার যুদ্ধের ফল হিসাবে তাইফকে মক্কার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণে আনার মতবাদ ভ্রান্তিপূর্ণ। ইহা ছাড়াও যদি বানূ মাখযূমের তাইফের কিছু সংখ্যক ব্যক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক থাকিয়া থাকে তবে বানূ ছাকীফ গোত্রের কতক ব্যক্তির সঙ্গে মক্কার অনেক ব্যক্তির অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। মূলত ইহা ছিল একটি দ্বিমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা এবং এক পক্ষের অন্য পক্ষের কোন রকম নিয়ন্ত্রণে থাকার প্রশ্নটি ছিল অবান্তর। ওয়াট নিজেই স্বীকার করেন, "সম্পর্কটি সম্পূর্ণরূপে এক পাক্ষিক ছিল না" এবং উল্লেখ করেন যে বানূ ছাকীফের আল-আখনাস ইব্ন শারীক কিছু সময়ের জন্য মক্কার বানূ যুহরার নেতা ছিলেন।[১৪] শুধু তাহাই নহে, ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তাইফের নেতা 'আব্দ ইয়ালীল এবং তাহার ভ্রাতাগণ, "মাখযূমের কবলে" থাকা দূরে থাকুক, তাহারা নিজেরা, কোন কোন বর্ণনা অনুসারে, বানূ মাখযূমের সদস্যগণ মক্কার অনেক ব্যবসায়ী ব্যক্তির ব্যবসায়ের অর্থ বিনিয়োগকারী ছিল।[১৫]

এই মতবাদটির বিপক্ষে সর্বাপেক্ষা বড় আপত্তি এই যে, মহানবী ﷺ যদি "স্থানীয় রাজনীতির কোন মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়"-এর সুযোগ গ্রহণ করা সম্পর্কে ইচ্ছা পোষণ করিতেন তবে

তিনি বানূ মালিকের নেতৃবৃন্দের নিকট যাইতে পারিতেন, 'আব্দ ইয়ালীল এবং তাহার ভ্রাতাদের কাছে নহে, যাহারা আহলাফের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাহারা ওয়াটের নিজস্ব বিশ্লেষণ অনুসারে কুরায়শদের সঙ্গে বন্ধু ভাবাপন্ন ছিল।

পরিশেষে এই বাস্তব ঘটনা যে, তাইফবাসীদের কোন অংশই মহানবী ﷺ-এর প্রতি কোন আগ্রহ দেখায় নাই, এই অনুমানটিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে যে, সেখানে এইরূপ কোন স্থানীয় মতানৈক্য ছিল যাহা একজন বহিরাগতকে সেই মতানৈক্যকে নিজের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য কাজে লাগাইতে অনুপ্রাণিত করিতে পারিত। বাস্তব সত্যটি এই যে, মহানবী ﷺ তাইফ গিয়াছিলেন, কারণ মক্কায় তাঁহার অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, ঐ প্রতিবেশী শহরটির অধিবাসিগণ, তাঁহার বাণীর প্রতি মনোযোগ দিতে ও তাহা গ্রহণ করিতে পারে এবং তাঁহাকে আশ্রয় ও সহায়তা দিতে পারে। ঘটনাটির আলোচনাশেষে মুইর যে মন্তব্য করেন তাহা যথার্থ। তিনি বলেন, "মুহাম্মাদ ﷺ-এর তাইফ যাত্রার মধ্যে মহিমান্বিত ও বীরোচিত কিছু ছিল; তাঁহার নিজের গোত্রের লোক কর্তৃক অবহেলিত ও প্রত্যাখ্যাত নিঃসঙ্গ একজন মানুষ, যিনি আল্লাহ্‌র নামে সাহসিকতার সঙ্গে অগ্রসর হন, যেমনটি নিনেভাতে ইউনুস ('আ) করিয়াছিলেন এবং একটি পৌত্তলিক শহরকে অনুতাপ করার ও তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্যে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানান। ইহা তাঁহার আহ্বানের ঐশীমূলে তাঁহার বিশ্বাসের দৃঢ়তার উপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করে"।[১৬]

দুই ঃ গোত্রসমূহের সংগে এবং মদীনার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন প্রসঙ্গে

গোত্রসমূহ ও মদীনার সঙ্গে মহানবী ﷺ-এর যোগাযোগ স্থাপন প্রসঙ্গে প্রাচ্যবিদগণ প্রধানত মদীনায় ইসলামের সাফল্যের এবং মদীনাবাসী কর্তৃক তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করার কারণসমূহের উপর তাহাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেন। এই প্রশ্নটি ব্যতিরেকেও ঐ সময়টির বিভিন্ন দিক ও ঘটনাবলী সম্পর্কে তাহারা কিছু সংখ্যক প্রাসঙ্গিক মন্তব্য করেন। আলোচনার সুবিধার্থে বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ে এই সকল প্রাসঙ্গিক মন্তব্য আলোচিত হইল।

আলোচনার সূচনাতে "ইসরা ও মি'রাজের" ঘটনা সম্পর্কে উল্লেখ করিয়া মুইর বলেন, মদীনার সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম পর্যায় সম্পন্ন করার পর মহানবী ﷺ-এর ধ্যান-ধারণা এতই উত্তরমুখী হয় যে, "তাঁহার দিনের চিন্তাভাবনা রাত্রির তন্দ্রায় পুনরাবির্ভূত হয়" এবং তিনি (কোন বাহনযোগে) জেরুসালেমে চলিয়া যাওয়ার স্বপ্ন দেখেন। শুধু তাহাই নহে, তাহার "উত্তেজিত আত্মা" তাঁহাকে "তাহার স্রষ্টার অনির্বচনীয় সান্নিধ্যে না দেখা" পর্যন্ত এক আকাশ হইতে অন্য আকাশে উড্ডীন করাইয়া "আরো অলৌকিক দৃশ্যাবলীর ভোজবাজি দেখায়" ইত্যাদি।[১৭]

সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলির তারিখ যতটা, মহানবী ﷺ-এর জীবনের এই পর্যায়ের ঘটনাগুলি সম্পর্কে মুইরের উল্লেখসমূহ নিঃসন্দেহে পূর্বযুগের মুসলমান পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতামতের

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তাহা ছাড়াও যেহেতু ঘটনাগুলি প্রকৃতিতে অলৌকিক এবং বিশ্বাসের আওতাভুক্ত, ইহা বোধগম্য যদি মুহাম্মাদ ﷺ-এর নবূওয়াতের এবং কুরআনের ঐশী উৎপত্তিতে একজন অবিশ্বাসী এই সকল ঘটনাকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর দেখা "স্বপ্ন" হিসাবে বিবেচনা করে। কিন্তু যাহা বোধগম্য নহে তাহা হইতেছে মুইরের অনুমিত কারণ। যদি মদীনার সঙ্গে যোগাযোগের প্রথম পর্যায়ের সাফল্যজনক সমাপ্তি মহানবী ﷺ-এর মন ও চিন্তাভাবনাকে উত্তরের প্রতি উদ্বেলিত করিয়া থাকিত তবে ঐ সকল "চিন্তাভাবনা" তাঁহাকে পূর্ববর্তী জেরুসালেমে এবং অতঃপর "তাহার স্রষ্টার অনির্বচনীয় সান্নিধ্যে" লইয়া যাওয়ার পরিবর্তে প্রথমেই তাঁহাকে মদীনার দিকে পরিচালিত করিত এবং সেখানে তাঁহার দ্বারা বিস্ময়কর ঘটনাবলী ঘটাইত। মুইরের অনুমিত কারণটি যেমনই দুর্বোধ্য তেমনই নিছক অবাস্তব। যথেষ্ট কৌতহলের বিষয় যে, তিনি পরবর্তী কালের সংযোজন বলিয়া সেই হাদীছটিকে খারিজ করেন যাহা বলে যে, মহানবী ﷺ সত্য সত্যই স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, মদীনাই সেই স্থান যেখানে মুসলমানগণকে হিজরত করিতে হইবে।[১৮]

মুইরের দ্বিতীয় অনুমানটি এই যে, মহানবী ﷺ দীর্ঘকাল পূর্বে এমনকি পরিণামে রোমকদের বিজয় সম্পর্কে সূরা ৩০ (আর-রূম)-এ একটি "দূরদৃষ্টি প্রসূত ভবিষ্যদ্বাণী" করিয়া উত্তরের রাজনীতির প্রতি, বিশেষভাবে বায়যান্টীয় ও পারসিক সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেও ইহা শুধু "প্রায় এই সময়ে" অর্থাৎ প্রথম আকাবার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন হইবার পর ঘটে যে, রোমক সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাঁহার আগ্রহ বৃদ্ধি পায় এবং সেই কারণে তিনি "হয় মক্কার খৃস্টান ক্রীতদাস হইতে, পার্শ্ববর্তী মেলা হইতে অথবা ওয়ারাকা ও অন্যান্যদের দ্বারা নকলকৃত খৃস্টের জীবনকাহিনী সংক্রান্ত গ্রন্থের অংশবিশেষ হইতে" খৃস্টের জীবনী সম্পর্কে "সংক্ষিপ্ত জ্ঞান অর্জন করেন" এবং ইহাকে "সাধারণ উপকথা" হিসাবে বিবেচনা করেন এবং অসম্পূর্ণভাবে কুরআনে সন্নিবেশিত করেন।[১৯]

অনুমানটির অবাস্তবতা এই ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইসলামের উৎপত্তি ও সূচনা ব্যাখ্যা করার এবং একথা বলার সময়ে একই প্রকার অনুমান করেন যে, মহানবী ﷺ খৃস্টধর্ম, ইয়াহূদী ধর্ম প্রভৃতি হইতে ধারণা গ্রহণ করার পর তাঁহার নবূওয়াতের দাবি ও ধর্মীয় মতবাদসহ আবির্ভূত হন।[২০] সূরা মারয়াম (১৯)-এর তারিখ মহানবী ﷺ-এর তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর নির্ধারণ করাও মুইরের একটি বড় ধরনের ভুল।[২১] সূরাটি অনেক আগে অবতীর্ণ হইয়াছিল এবং ইহা সুবিদিত যে, সূরাহটি জা'ফার ইব্‌ন আবী তালিব (রা) কর্তৃক আবিসিনীয় শাসকের দরবারে মহানবী ﷺ-এর শিক্ষা সম্পর্কে তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে আবৃত্ত হইয়াছিল। যাহা হউক, ইহা ধরিয়া লওয়া স্পষ্টত অসম্ভব যে, মহানবী ﷺ তাঁহার ধর্ম প্রচারের কমপক্ষে দশ বৎসর অতীত হইবার এবং অবিশ্বাসিগণ কর্তৃক এত বেশী বিরোধিতা ও সমালোচনার সম্মুখীন হইবার পর যিশুখৃস্টও তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কে কিছু উদ্দেশ্যবিহীন তথ্য পাইবার চিন্তা করিয়াছিলেন—শুধু তখন,

যখন তিনি (মহানবী ﷺ) তৎকালীন খৃস্টান সিরিয়ার সীমান্তের নিকটবর্তী একটি স্থানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

মুইরের তৃতীয় অনুমানটি এই যে, 'আকাবার প্রথম শপথের পর মহানবী ﷺ পরবর্তী হজ্জ মৌসুমে মদীনার মুসলমানগণের আগমনের জন্য ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করত তাঁহার আক্রমণাত্মক মনোভাব শিথিল করেন। "বর্তমান সময়ের জন্য ইসলামকে" মুইর বলেন," আর আক্রমণাত্মক হইতে হইবে না এবং কুরায়শগণ, তাহাদের শত্রু আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছে এবং এখন অক্ষতিকর ভাবিয়া নিজদিগকে তুষ্ট করিয়া তাহাদের সতর্ক প্রহরা ও বিরোধিতা শিথিল করে"। এই বর্ণনার সমর্থনে মুইর তাহার নিজের অনুবাদে কুরআনের ৬ ঃ ১০৬-১০৮ আয়াত উদ্ধৃত করেন যাহাতে তিনি বলেন, মহানবী ﷺ -কে আক্রমণাত্মকতা শিথিল করার জন্য ঐশী কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।[২২]

উপরে বর্ণিত বক্রোক্তিটি এই যে, ইসলাম অর্থাৎ মহানবী ﷺ প্রথম আকাবার শপথ সম্পন্ন হওয়ার পূর্বে তাঁহার প্রচারকার্যে আক্রমণাত্মক ছিলেন, এই অনুমানটির মতই ভিত্তিহীন যে, শেষোক্ত ঘটনাটির পর অনুমিত আক্রমণাত্মক মনোভাবে শিথিলতা ছিল। তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে মদীনায় হিজরত করার পূর্ব পর্যন্ত মহানবী ﷺ মক্কায় একই অবস্থায় কাটাইতে থাকার কারণ একদিকে অনুমিত আক্রমণাত্মক মনোভাব শিথিলকরণ এবং অপর দিকে অনুবর্তী সতর্ক প্রহরা ও বিরোধিতা শিথিলকরণ ধরিয়া লওয়া ব্যতিরেকেও ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে মহানবী ﷺ-এর তাইফ গমনের পটভূমিকা সম্পর্কে মুইরের নিজস্ব বর্ণনা যেমন মক্কায় তাঁহার অবস্থার চরম বিপজ্জনকতা, সেখানে ইসলামের প্রগতি বাস্তবিকভাবে রুদ্ধ হওয়া এবং কুরায়শগণকে তাহাদের সতর্ক প্রহরা শিথিল করার জন্য অনুপ্রাণিত করিতে তাঁহার নীতিতে কোন পরিবর্তন আনার জন্য অপেক্ষা করা শুধু অপ্রয়োজনীয় করিয়া তুলিয়াছিল, যদি তাহা তাহারা আদৌ করিয়া থাকে। বস্তুত সেখানে তাহাদের সতর্ক প্রহরা ও বিরোধিতার কোন শিথিলতা ছিল না। মহানবী ﷺ মক্কায় অবস্থানকালে কষ্টের শিকার হইয়াছিলেন। কারণ তাহাদের মতে, তাঁহাকে সম্পূর্ণ অসহায়ত্বের মধ্যে নিপতিত করা হইয়াছিল এবং এই কারণে যে, মুত'ইম ইব্ন 'আদিয়্যি কর্তৃক তাঁহাকে নিরাপত্তা প্রদান করা হইয়াছিল এবং তাহা ছাড়াও, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বানূ হাশিম তাহাদের নিজেদিগকে আবূ লাহাবের নীতি হইতে মুক্ত করিয়াছিল ও তাহাদের বংশীয় লোকদিগকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য তাহারা তাহাদের কর্তব্যে যোগদান করিয়াছিল। সে যাহাই হউক, মুইর কর্তৃক উদ্ধৃত কুরআনের আয়াত ৬ ঃ ১০৬-১০৮ কোনভাবেই মহানবী ﷺ-এর পক্ষে তাঁহার নীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত করে না।

ইহার প্রথম আয়াতটি ৬ ঃ ১০৬ মহানবী ﷺ -কে তাঁহার প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিতে এবং "মুশরিকদের দিক হইতে তাঁহার মুখ ফিরাইয়া লইতে নির্দেশ দেয়":

وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ .

এই শেষ অভিব্যক্তিটি মুশরিকদের নিকট ধর্ম প্রচারের বিরতি বুঝায় না। ইহা তাহাদের বিরোধিতা উপেক্ষা করার এবং তাহাদের কৌশল ও অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করার জন্য একটি অনুপ্রেরণা। এই অর্থটি প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচার আরম্ভ করার জন্য প্রথম আদেশটির সঙ্গে অনুরূপ একটি অভিব্যক্তির সংযোগ সাধন অপেক্ষা পরিষ্কাররূপে আর কিছু বুঝায় না ঃ

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ .

"আপনি জোরেশোরে প্রচার করুন যাহা আপনাকে আদেশ করা হইয়াছে এবং মুশরিকদেরকে উপক্ষো করুন"।

দ্বিতীয় আয়াতটি মহানবী ﷺ-কে জানায় যে, তিনি মুশরিকদের কার্যাবলীর সংরক্ষক (حَفِيْظ) নহেন।

ইহাও কোন নূতন উপদেশ ছিল না। শুধু সতর্ককারী (نَذِيْرٌ) সুসংবাদদাতা (بَشِيْرٌ) এবং কাহাকেও জোরপূর্বক কোন কিছু করিতে বাধ্য করার ক্ষমতাবিহীন একজন ব্যক্তি হিসাবে মহানবী ﷺ-এর ভূমিকার উপর পূর্ববর্তী বহু কুরআনী আয়াতে পুনঃপুনঃ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে যাহা কেবল মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারের অস্বেচ্ছাচারী ও অনাক্রমণাত্মক প্রকৃতি প্রকাশ করে।[২৫]

তৃতীয় আয়াতটি (৬ ঃ ১০৮) অন্যদের দেবদেবীর প্রতি গালাগালি বর্ষণ না করার জন্য মুসলমানদের প্রতি একটি উপদেশ। সম্ভবত মুইর প্রধানত এই আয়াতটির প্রতি দৃকপাত করিয়াছিলেন। পরিষ্কারভাবে ইহা কিছু সংখ্যক নও-মুসলিমের অতি উৎসাহের প্রতি ইঙ্গিত করে। সুতরাং ইহা এমন একটি অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে যাহা পূর্বে বিদ্যমান ছিল এবং মহানবী ﷺ -এর তাইফ গমনের পরবর্তী অবস্থার সমতুল্য নহে। যাহা হউক, ইবাদতের অযোগ্য মূল্যহীন বস্তু হিসাবে প্রতিমাগুলিকে বাতিল করার বিষয়ে কোন শিথিলতা ছিল না। গুরুত্বপূর্ণভাবে যথেষ্ট, আলোচ্য প্রথম আয়াতটি এই আপোষবিরোধী মনোবৃত্তির পুনরাবৃত্তি করে এবং বলে ঃ

"আপনার প্রভু কর্তৃক আপনার উপর যাহা অবতীর্ণ করা হইয়াছে তাহা অনুসরণ করুন। তিনি ব্যতীত ইবাদতের যোগ্য আর কেহ নাই। সুতরাং মুশরিকদিগকে অগ্রাহ্য করুন (তাহাদের দিক হইত মুখ ফিরাইয়া লউন)"।

এখানে প্রতিমা ও পৌত্তলিকতার বিরোধিতা কুরআনের অন্যান্য স্থানের মতই জোরালো। ইহা উল্লেখ করা অপ্রয়োজন যে, যখন পৌত্তলিকতা ও বহু-ঈশ্বরবাদ বাতিলকরণ এতটা দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবি করা হয় তখন মুশরিকদের ইবাদতের বস্তুসমূহকে গালি দেওয়া হইতে কিছু সংখ্যক নওমসলিমের শুধু বিরতি, যাহা বেশীর পক্ষে এই আয়াত হইতে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে, খুব কমই কুরায়শ নেতাদের জন্য তাহাদের সতর্ক প্রহরা ও বিরোধিতা শিথিল করার ভিত্তি হইতে পারে। আলোচ্য আয়াতটি কোনভাবেই নীতির কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন চিহ্নিত

করে না যাহাতে কুরায়শ নেতৃবৃন্দ তাহাদের বিরোধিতা ও শত্রুতা স্থগিত করার জন্য অনুপ্রাণিত হইতে পারে।

তাইফ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর মক্কায় মহানবী ﷺ-এর বিরামহীন অবস্থানের প্রশ্নে মার্গোলিয়থ নিজের পক্ষে একটি সহজ উত্তর প্রদান করেন। "সুযোগ-সুবিধাসমূহ যেহেতু সাধারণত উহাদের সঙ্গে সংযুক্ত শর্তসহ মঞ্জুর করা হয়"। মার্গোলিয়থ বলেন, সেহেতু "আমাদের একথা অনুমান করার অধিকার আছে" যে, মহানবী ﷺ "শুধু মক্কার একটি পরিবারে নিরাপত্তা ভোগ করার অনুমতি পাইয়াছিলেন এই শর্তে যে, তিনি তাঁহার ধর্মান্তরিতকরণের উদ্যোগসমূহ বহিরাগতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন"।[২৬]

স্পষ্টভাবে মার্গোলিয়থ এখানে পুনরীক্ষণাধীন সময়ে গোত্রসমূহ ও মদীনার সঙ্গে মহানবী ﷺ-এর যোগাযোগ স্থাপনের ঘটনা দ্বারা পরিচালিত হইয়াছেন। অনুমান করার সময় মার্গোলিয়থ ব্যাখ্যা করেন না কেন, মহানবী ﷺ-কে মুত'ইম ইব্ন আদী কর্তৃক নিরাপত্তা মঞ্জুর করার সময় যদি এই ধরনের কোন শর্ত আরোপিত হইয়া থাকে, এ সম্পর্কিত বর্ণনায় তাহা উল্লেখ করা হয় নাই কেন? মার্গোলিয়থ অনুমিত চুক্তিটির নিহিতার্থের স্বরূপ উপলব্ধি করিতেও ব্যর্থ হইয়াছেন। ইহার অর্থ হইবে মহানবী ﷺ-কে পার্শ্ববর্তী গোত্রসমূহে ধর্মান্তরকরণ চালাইয়া যাইবার এবং পরবর্তী সময়ে একটি বাস্তব ঘটনারূপে পার্শ্ববর্তী গোত্রগুলিকে ধর্মান্তরিত করিয়া মক্কার বিরুদ্ধে আক্রমণ করার সুযোগ দেওয়া। মক্কার নেতাগণ এই ধরনের একটি আত্মঘাতী কার্যক্রমের প্রতি বোধগম্যভাবে অন্ধ হইয়া থাকিতে পারিত না। নীতির এই পরিবর্তন গোত্রসমূহের দৃষ্টি এড়াইতে পারিত না।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মার্গোলিয়থ অনুমানটি করার ব্যাপারে খুবই স্ববিরোধী। কারণ তিনি তাহার ঠিক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করেন যে, কিভাবে ও কখন মহানবী ﷺ তাঁহার সময়ে হজ্জের বা মেলার মৌসুমে গোত্রসমূহের নিকট গমন করিতেন। "আবূ জাহল [আবূ লাহাব]" প্রচারকের প্রতি কাদামাটি নিক্ষেপ করিয়া: এবং তাহাদিগকে "তাহাদের দেবতাগণকে পরিত্যাগ না করার জন্য[২৭] সতর্ক করিয়া" তাঁহার পিছু ধাওয়া করিত। ইহা এমন একটি ঘটনা যাহা এই অনুমানটিকে ডাহা মিথ্যা হিসাবে প্রমাণ করে যে, কুরায়শ নেতাগণ মহানবী ﷺ-কে গোত্রসমূহের নিকট ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা দিয়াছিল এবং ঘটনাটি আমাদিগকে মার্গোলিয়থের তৃতীয় ভুলটির নিকটবর্তী করে।

মহানবী ﷺ কর্তৃক গোত্রসমূহ ও বহিরাগতদের নিকট ধর্মপ্রচারের কাজ প্রধানত বা প্রায় একচেটিয়াভাবে হজ্জের এবং মেলার মৌসুমে অর্থাৎ পবিত্র মাসগুলিতে, যখন আরবদের পবিত্র দায়িত্ব ছিল শত্রুতা বন্ধ করা এবং শান্তি বজায় রাখা, যাহাতে প্রত্যেকে নিরাপদে চলাফেরা করিতে পারে এবং সাধারণত কোন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন ব্যক্তি প্রদত্ত নিরাপত্তার প্রয়োজন হয় না।

অতএব ঐ নির্দিষ্ট সময়ে কুরায়শ নেতাদের পক্ষে মহানবী ﷺ-কে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্নই ছিল না বা তাঁহার জন্য শুধু ঐ প্রয়োজনে কাহারও নিরাপত্তা গ্রহণ করা বাস্তবভাবে প্রয়োজন ছিল না। মার্গোলিয়থের ধারণা বা অনুমানটি তাহার দ্বারা উল্লিখিত ঘটনাটির পরস্পর বিরোধী হওয়ার বিষয়টি তিনি নিজেও উল্লেখ করিয়াছেন।

মহানবী ﷺ-এর জন্য মুত'ইম ইব্ন আদিয়্যির বিদ্যমান নিরাপত্তার সঙ্গে কিছু শর্ত সংযুক্ত হইবার অনুমানটি কিন্তু ওয়াট কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, যদিও তিনি এই প্রসঙ্গে মার্গোলিয়থ সম্পর্কে কোন উল্লেখ করেন নাই। ওয়াট বলেন, "উৎসসমূহে শর্ত সম্পর্কে কোন উল্লেখ না থাকিলেও আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তিনি [মুত'ইম] কিছু সংখ্যক শর্ত আরোপ করিয়াছিলেন"।[২৮] ওয়াট অনুমিত শর্তাবলীর প্রকৃতি সম্পর্কে অনুমানের বিষয়ে কোন ঝুঁকি না নিতে সতর্ক থাকেন। তিনি এই বিষয়ে উৎসসমূহের নীরবতা ব্যাখ্যা করার উদ্যোগও গ্রহণ করেন এই বলিয়া যে, "কাহিনীটি নাওফালের বংশের সম্মানে পুনরায় বলা হইয়াছে। পরবর্তী কালে ইহা সামান্যভাবে পরিবর্তিত হয়। কারণ হাশিমের জন্য ইহা অসম্মানজনক ছিল, ইহা ইব্ন ইসহাক কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিল", কিন্তু ইবন হিশাম ইহা সংযোজন করেন।[২৯]

যুক্তিটি দুর্বোধ্য। কুরায়শ নেতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কোন শর্ত বা শর্তাবলী আরোপিত হইয়া থাকিতে পারে যেরূপ তাহাদের দ্বারা আবূ বকরের জন্য ইবনুদ দাগিনা কর্তৃক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বলবৎ করা হইয়াছিল।[৩০] অতএব ঐ ধরনের শর্ত মুত'ইম বা বনূ নাওফালের সম্মানহানি ঘটাইবে না। ইহা গোপন করার কোন কারণ ছিল না, যদি ওয়াট সেরূপ অনুমান করেন। গল্পটি "নাওফালের বংশের সম্মানে পুনরায় বলা হইয়া থাকে"। ইহা বোধগম্য নহে কেন, "হাশিমদের নিকট অসম্মানজনক" ছিল বলিয়া যদি পরবর্তী কালে কাহিনীটি সামান্য পরিবর্তিত হইয়া থাকে, তবে একজন অ-হাশিমী কর্তৃক নিরাপত্তা মঞ্জুর করার ঘটনাটি স্বয়ং পরিত্যক্ত না হইয়া শুধু অনুমিত শর্তাবলী পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মোটের উপর শর্ত বা শর্তাবলীর উল্লেখ বরং বানূ হাশিমের অসম্মান হ্রাস করিত। বাস্তব সত্য এই যে, কাহিনীটি প্রাথমিকভাবে "নাওফালের বংশের সম্মানে পুনরায় বলা" হয় নাই বা বানূ হাশিমের অসম্মান পরিহার করার জন্য ইহা পরবর্তী কালে সামান্যভাবে পরিবর্তিতও হয় নাই। মুত'ইমের সহায়তার জন্য মহানবী ﷺ-এর কৃতজ্ঞতাপূর্ণ স্মৃতির ঘটনা ইব্ন ইসহাকসহ অনেকেই বর্ণনা করিয়াছেন।

উপরে উল্লিখিত অনুমান ব্যতিরেকে ওয়াট গোত্রসমূহ ও অন্যান্যদের সঙ্গে মহানবী ﷺ-এর যোগাযোগ প্রসঙ্গে আরও দুইটি বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, মহানবী ﷺ প্রাথমিকভাবে নিজেকে "এককভাবে বা প্রধানত কুরায়শদের জন্য" প্ররিত একজন হিসাবে ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং আরও বলেন, "বলার কোন উপায় নাই যে, তিনি আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্বে সাধারণ আরববাসীদের নিকট তাঁহার প্রচারকার্য প্রসারিত করার চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা"। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তাঁহার অবস্থার অবনতি, ওয়াট বলেন, "তাঁহাকে দূরে, আরও দূরে দৃষ্টি

নিক্ষেপ করিতে বাধ্য করিয়াছিল"। এইজন্য মক্কায় তাঁহার অবস্থানের শেষ তিনটি বৎসর "আমরা বেদুঈন গোত্রসমূহ ও আত-তাইফের ও ইয়াছরিবের নাগরিকদের সঙ্গে তাঁহার যোগাযোগের কথা শুনিতে পাই"।[৩১]

অনুমানটি শুধু সেইসব প্রাচ্যবিদদের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যাহারা ইসলামের মহানবী ﷺ -কে "আরবের মহানবী" ﷺ হিসাবে বর্ণনা করেন এবং ধারণা করেন যে, ইসলাম প্রাথমিকভাবে প্রধানত আরবদেশবাসী ও পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জন্য আবির্ভূত হইয়াছিল। ওয়াট এখানে অনুমানটি আরও সংরক্ষিত করেন কার্যত এই বলিয়া যে, মুহাম্মাদ ﷺ প্রাথমিকভাবে একজন মক্কাবাসী এবং পরবর্তী কালে একজন আরবদেশীয় নবী ছিলেন। মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারের পরিধি ও প্রকৃতিকে এই ধরনের বিশেষায়িত করা ভুল এবং বিভ্রান্তিকর। ইহা কুরআন এবং মহানবী ﷺ-এর মক্কী জীবনের জ্ঞাত ঘটনাবলী উভয়টি দ্বারা অস্বীকৃত।

এই বিষয়ে কুরআনী প্রমাণাদি যতটা সংশ্লিষ্ট, প্রথমে ঐ সমস্ত অনুচ্ছেদের উল্লেখ করিতে হইবে যাহা অনেক স্থানে বলে যে, আল্লাহ্র শাস্তি কোন জনপদ (ক'রয়াহ = قرية)-এর উপর ততক্ষণ আপতিত হয় না যতক্ষণ একজন সতর্ককারী বা একজন নবী ইহাতে প্রেরিত না হন[৩২] এবং কখনও কোন নবী কোন জনপদে প্রেরিত হন নাই এই ঘটনা ব্যতিরেকে যে, ইহার অধিবাসীরা তাঁহার বিরোধিতা করে নাই এবং তাঁহাকে উপহাস করে নাই[৩৩] ও একখানা আরবী ভাষার কুরআন তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হয় নাই যাহাতে তিনি উহার দ্বারা "জনপদসমূহের মাতা ও উহার পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহকে সতর্ক করিতে পারেন"।[৩৪] সেখানে এমন একটি অনুচ্ছেদও আছে যাহা বলে যে, কুরায়শগণ প্রায়শ একথা বলিত যে, তাহাদের প্রতি একজন নবী প্রেরিত হইলে জনপদসমূহের যে কোন স্থানের অধিবাসী অপেক্ষা অধিকতর ভালভাবে তাহার উপদেশ গ্রহণ করিত; কিন্তু যখন একজন সতর্ককারী আসিলেন তখন তাহাদের মধ্যে শুধু অবাধ্যতা বৃদ্ধি পাইল।[৩৫] এইগুলি হইতেছে সেইসব অনুচ্ছেদ সেগুলিকে এই কথা উপস্থাপন করার জন্য চূড়ান্তভাবে বিকৃত করা যে, মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারকার্য "জনপদসমূহের মাতা" মক্কার জন্য অভিপ্রেত ছিল। এই সকল বিশেষ অনুচ্ছেদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মক্কার মুশরিকদিগকে মুহাম্মাদের নবূওয়াতের সত্যতা উপলব্ধি করানো।

অনুচ্ছেদগুলি কোনভাবেই বলেনা যে, মহানবী ﷺ শুধু মক্কাবাসী জনগণের প্রতি ও তাহাদের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। অপরপক্ষে সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদদ্বয়ের (৪২ ঃ ৭ এবং ৬ ঃ ৯২) উভয়টিতে ব্যবহৃত "উহার পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ" বাক্যাংশসহ "জনপদসমূহের মাতা" সন্দেহের কোন অবকাশ রাখে না যে, মক্কা ও ইহার পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ উভয়ই অনুচ্ছেদদ্বয়ের আওতার মধ্যে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষ অভিব্যক্তিটি "জনপদসমূহের মাতা" এককভাবে ইঙ্গিত করে যে, ইহার প্রতি প্রেরিত বার্তাটি সকল জনপদের জন্যই অভিপ্রেত; সেগুলির ইহা "মাতা" বা কেন্দ্র/রাজধানী। ইহাই যে আয়াতটির ইঙ্গিত তাহা অন্য দুইটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে খুব পরিষ্কার

হয়, যেমন ২৫ ঃ ৫১ এবং ২৮ ঃ ৫৯। প্রথম অনুচ্ছেদটি বলে ঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيْرًا .

"আমি যদি ইচ্ছা করিতাম তবে প্রতিটি জনপদে একজন 'সতর্ককারী' প্রেরণ করিতাম" (২৫ ঃ ৫১)।

অন্য অনুচ্ছেদটি আরও নির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করে ঃ

وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى حَتّٰى يَبْعَثَ فِىْ أُمِّهَا رَسُوْلاً .

"আর আপনার রব জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না যে পর্যন্ত না তাহাদের কেন্দ্রস্থলে (রাজধানী-উম্মিহাতে) একজন রাসূল প্রেরণ করেন" (২৮ ঃ ৫৯)।

এভাবে বিশেষ অনুচ্ছেদ দুইটি, যেইগুলি মক্কা বা জনপদসমূহের মাতার কথা বলে, পরিষ্কারভাবে এই অর্থ প্রকাশ করে যে, ইহার প্রতি প্রেরিত বার্তা সেই এলাকার অভ্যন্তরস্থ অধিবাসী/উপনিবেশসমূহের জন্যও অভিপ্রেত ছিল যাহা মক্কাকে তাহাদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব কেন্দ্র হিসাবে স্বীকার করিবে। এভাবে সেখানে মহানবী -এর পক্ষে তাঁহার জীবনের কোন পর্যায়ে একথা উপলব্ধি করিবার প্রশ্ন ছিল না, তাঁহার ধর্ম প্রচারকার্য এককভাবে বা প্রাথমিকভাবে মক্কার কুরায়শদের জন্য অভিপ্রেত ছিল। ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেসমূহ মধ্য মক্কী যুগ হইতে শেষ মক্কী যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

উপরে উল্লিখিত অনুচ্ছেদগুলি ছাড়াও চারিটি অনুচ্ছেদ আছে যাহাতে মহানবী -কে একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করা ও নির্দেশ দেওয়ার আদেশ রহিয়াছে। এইগুলির বক্তব্য এই যে, প্রত্যাদেশটি তাঁহার ভাষায় সহজ করা হইয়াছে যাহাতে তিনি আল্লাহভীরু লোকগণকে সুসংবাদ প্রদান ও একটি "অবাধ্য জনগোষ্ঠী" (قَوْمًا لُّدًّا)-কে[৩৬] সতর্ক করিতে পারেন এবং প্রত্যাদেশটি সেই সকল জনতাকে সতর্ক করার জন্য যাহাদের নিকট মহানবী -এর পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেন নাই[৩৭] বা যাহাদের পূর্বপুরুষগণকে সতর্ক করা হয় নাই।[৩৮] এই প্রত্যাদেশ জনগণকে সতর্ক করার জন্য তাঁহার প্রভুর নিকট হইতে তাঁহার প্রতি একটি আশীর্বাদ। এসব অনুচ্ছেদের চারিটিতে ব্যবহৃত কাওম (قوم) অভিব্যক্তিটির সাধারণ প্রকৃতি ধারণা দেয় যে, কুরায়শ নহে বরং অন্যান্য আরব গোত্রদলই উদ্দেশ্য। আরও একবার ইহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে যে, এই অনুচ্ছেদগুলিও বলে না যে, মহানবী শুধু তাহাদের জন্য প্রেরিত হইয়াছেন। ইহা আরও উল্লেখ করিতে হইবে যে, ঐগুলি প্রাথমিক মক্কী যুগ হইতে পরবর্তী মক্কী যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং তাহাদের কিছু সংখ্যক এমন কি প্রথম শ্রেণীর অনুচ্ছেদগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর।

কুরআনী আয়াতসমূহের তৃতীয় আর একটি গুচ্ছ রহিয়াছে যেইগুলির মধ্যে অনেকগুলি নিশ্চিতরূপে উপরে উল্লিখিত দুইটি শ্রেণী অপেক্ষা প্রাচীনতর এবং যেইগুলির সবকয়টি খুব

পরিষ্কাররূপে বর্ণনা করে যে, কুরআনের প্রত্যাদেশ এবং ইহার বার্তাসমূহ গোটা মানবজাতি ও সমগ্র বিশ্বের জন্য। নিম্নলিখিতগুলি হইতেছে সেইসব গুরুত্বপূর্ণ বার্তার কিছু সংখ্যক ঃ

১। وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ .

"অথচ ইহা (কুরআনী প্রত্যাদেশসমূহ) তো সমগ্র বিশ্বের/জাতিসমূহের জন্য উপদেশ মাত্র" (৬৮ ঃ ৫২)।

২। اِنْ هُوَ اِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ "ইহা (কুরআনী প্রত্যাদেশসমূহ) জাতিসমূহের জন্য উপদেশ" (সূরাতুত তাকবীর, ৮১ ঃ ২৭)।

৩। (وَمَا هُوَ اِلاَّ ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ...نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ) "এবং এইগুলি (কুরআনী প্রত্যাদেশসমূহ) মানবজাতির জন্য নির্দেশ... মানবজাতির জন্য একটি উপদেশ" (৭৪ ঃ ৩১-৩৬)।

৪। وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا.... "আর আমি তো আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করিয়াছি" (৩৪ ঃ ২৮)।

৫। تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهِ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا . "মহিমান্বিত তিনি যিনি তাঁহার বান্দার প্রতি ফুরকান (কুরআন) নাযিল করিয়াছেন তাঁহার বান্দার প্রতি যাহাতে তিনি জাতিসমূহের জন্য সতর্ককারী হন" (২৫ ঃ ১)।

৬। وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ . "আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই পাঠাইয়াছি" (২১ ঃ ১০৭)।

৭। قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا... "বলুন, হে মানবজাতি! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ্র রাসূল" (৭ ঃ ১৫৮)।

৮। ...وَاُوْحِىَ اِلَىَّ هٰذَا الْقُرْاٰنُ لِاُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ.... "এবং আমার নিকট এই কুরআন নাযিল করা হইয়াছে যেন আমি ইহার মাধ্যমে তোমাদেরকে এবং যাহাদের নিকট ইহা পৌঁছিবে সকলকে সতর্ক করিতে পারি" (৬ ঃ ১৯)।

৯। ...كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ . "এই কুরআন একটি কিতাব যাহা আমি আপনার উপর অবতীর্ণ করিয়াছি যাহাতে আপনি মানবজাতিকে অন্ধকার হইতে আলোর দিকে আনিতে পারেন" (১৪ ঃ ১)।

১০। هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهِ وَلِيَعْلَمُوْا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ....

"এই কুরআন মানুষের জন্য এক বাণী যাহাতে ইহার মাধ্যমে তাহারা সতর্ক হয় এবং জানিতে পারে যে, তিনিই একমাত্র আল্লাহ ....." (১৪ ঃ ৫২)।

১১। إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ....

"আমি মানুষের জন্য আপনার উপর সত্যসহ কুরআন নাযিল করিয়াছি" (৩৯ ঃ ৪১)।

১২। ... أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا.... "আপনি সতর্ক করুন মানবজাতিকে এবং সুসংবাদ দিন তাহাদিগকে যাহারা বিশ্বাস করে ..." (১০ ঃ ২)।

১৩। ... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ .

... আর আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছি কুরআন যাহাতে আপনি মানুষকে বুঝাইয়া দেন যাহা তাহাদের প্রতি নাযিল করা হইয়াছে..." (১৬ ঃ ৪৪)।

১৪। وَقُرْاٰنًا فَرَقْنٰهُ لِتَقْرَاَهٗ عَلَى النَّاسِ عَلٰى مُكْثٍ... "আমি কুরআনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া প্রেরণ করিয়াছি যাহাতে আপনি মানুষের কাছে তাহা থামিয়া থামিয়া পাঠ করিতে পারেন" (১৭ ঃ ১০৬)।

১৫। قُلْ يٰاَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ .

"বলুন, হে মানুষ! তোমাদের কাছে আসিয়াছে তোমাদের প্রভুর পক্ষ হইতে সত্য..." (১০ ঃ ১০৮)।

এইগুলি হইতেছে সংশ্লিষ্ট আয়াতসমূহের কয়েকটি আয়াত মাত্র। শুধু মক্কী সূরাসমূহে এইরূপ আরও অনেক আয়াত রহিয়াছে যেগুলিতে মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচারের সর্বজনীন প্রকৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে এবং কুরআনে প্রদত্ত নির্দেশাবলী, ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তসমূহ যে মানবজাতির (لِلنَّاسِ) জন্য তাহা পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে।[৩৯] তাঁহার জীবনের প্রারম্ভ কাল হইতে এবং মক্কী যুগ ব্যাপিয়া (এবং পরবর্তী কালেও) ইহা পুনঃপুনঃ ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মহানবী ﷺ-এর ধর্মপ্রচার এবং তাঁহার উপর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশসমূহ মানবজাতি এবং সমগ্র বিশ্বের উদ্দেশ্যেই ছিল; শুধু কুরায়শ বা কেবল আরব দেশবাসীর জন্য নহে। ইহাই ছিল মহানবী ﷺ-এর ধর্ম প্রচার ও নবূওয়াতের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য।

তাঁহার ধর্ম প্রচারের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, অনিবার্যভাবে ইহা একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে শুরু করিতে হইয়াছিল, যেমন তিনি স্বয়ং একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, শুরু করার সময়ে মহানবী ﷺ তাঁহার নিকটতর ও রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজন

وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الاَقْرَبِيْنَ- কে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ্‌র নির্দেশপ্রাপ্ত হন। কিন্তু এই ঘটনা হইতে কাহারও পক্ষে ইহা অনুমান করা উচিৎ নহে বা সম্ভব হইবে না যে, প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি নিজেকে তাঁহার পরিবার বা আত্মীয়-স্বজনের জন্য একজন নবী ভাবিয়াছিলেন এবং শুরুটি প্রকাশ্যে করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচারের কার্যক্রমের দিকটি আরবদেশের সকল অধিবাসীকে— "জনপদসমূহের মাতা এবং উহার চারিপার্শ্বের জনপদসমূহের" লোকজন এবং ঐসব ব্যক্তিগণকে যাহারা মহানবী ﷺ-এর সংস্পর্শে আসিবার সুযোগপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সম্প্রসারিত করেন। "জনপদসমূহের মাতা"-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় দেশটির সকল জনপদের মধ্যে ইহার গুরুত্ব ও কেন্দ্রস্থলে অবস্থানের কারণে, ধর্ম প্রচারের পরিসর ও প্রকৃতি সুনির্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নহে। এমনকি তখনও অভিব্যক্তিটি অপরিবর্তনীয়ভাবে "ইহার চারিপার্শ্বস্থ জনপদ" وَمَنْ حَوْلَهَا -এর সহিত জড়িত করা হইয়াছিল এবং শুরু হইতে ধর্ম প্রচার কার্যক্রমের মক্কা বহির্মুখী প্রকৃতি নির্দেশ করা হইয়াছিল।

অনুরূপভাবে আরবী ভাষায় কুরআনের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবরদেশবাসীদের সহিত ইহার প্রাসঙ্গিকতা সীমাবদ্ধ করার জন্য করা হয় নাই বরং এই ঘটনার উপর জোর দেওয়ার জন্য করা হইয়াছে যে, যেহেতু ইহা তাহাদের নিজের ভাষায়, সেহেতু তাহারা অধিকতর সহজে ও আগ্রহে ইহা অনুধাবন করিবে এবং মানিয়া লইবে। সত্যকে তাহাদের বোধগম্য করার একই উদ্দেশ্যে ইহা উল্লেখ করা হয় যে, ইতোপূর্বে তাহাদের বা তাহাদের পূর্বপুরুষদের নিকট কোন নবী প্রেরণ করা হয় নাই। এই বর্ণনাটিও এই কথা বুঝাইবার জন্য প্রদান করা হয় নাই যে, মহানবী ﷺ শুধু একটি জাতি বা জনগোষ্ঠীর জন্য ছিলেন। সে যাহাই হউক, আমাদের বিবেচনা শুধু কার্যক্রমের দিকে রাখিলেও এই দাবি বজায় রাখার জন্য কুরআনে এমন কিছু নাই যে, মহানবী ﷺ প্রাথমিকভাবে নিজেকে শুধু মক্কার কুরায়শদের একজন নবী ভাবিয়াছিলেন এবং কেবল আবূ তালিবের মৃত্যুর পর যখন মক্কায় তাঁহার অবস্থা অসহনীয় হইয়া উঠে তখন তিনি দূরবর্তী কোন স্থানের অনুসন্ধান করেন।

এখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, একটি আন্দোলন বা একটি ধর্মের সর্বজনীনতা ইহার সমগ্র বিশ্বব্যাপী একযোগে শুরু ও প্রচারিত হইবার মধ্যে নিহিত নহে, বরং ইহার আবেদনের সর্বজনীনতা এবং প্রত্যেক স্থানে ও প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান একই প্রকার পরিস্থিতির প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে নিহিত। এই কারণে ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯-১৭৯৩ খৃ.) ফ্রান্সের অন্যান্য অংশে দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে না ঘটিয়া প্রধানত প্যারিসে ঘটা সত্ত্বেও ইহা ছিল একটি ইউরোপীয় বিপ্লব। কারণ সেখানকার ঐশ্বরিক অধিকার এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সুবিধাভোগী শ্রেণীপ্রথার ধ্বংস সাধন ইউরোপের অন্যান্য যে কোনো স্থানের অনুরূপ প্রথার ধ্বংস সাধনের পূর্বাভাস দিয়াছিল।

তদ্রূপ ইসলাম যে কোন প্রকারের বহু ঈশ্বরবাদ ও পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করিলে ইহার বিরোধিতার সংবাদটি স্বয়ং সমগ্র বহু ঈশ্বরবাদ ও সমগ্র মানবজাতির মধ্যে ইহার সুবিধাভোগীদের

বিরুদ্ধে একটি হুমকি সৃষ্টি করে। যখন ইহা ইহার সূচনালগ্নেই অবতারবাদ বা ঈশ্বরের পুত্রত্ব বা ঈশ্বরের কন্যাত্ববাদের ধারণার মাধ্যমে মানবসত্তার উপর দেবত্ব আরোপের বিরোধিতা করে এবং ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে তখন বিশ্বব্যাপী এই ধরনের প্রথা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ইহা একটি হুমকি হইয়া দাঁড়ায় এবং হুমকিরূপে রহিয়াছে।

মহানবী -এর মক্কী জীবন সম্পর্কে কুরআনী প্রমাণাদি ছাড়াও এই ধরনের কিছু সংখ্যক স্পষ্ট ও সুপরিচিত ঘটনা এই অনুমানটিকে মিথ্যা প্রমাণিত করে যে, তিনি আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্বে মক্কার কুরায়শ গোত্রের বাহিরে ধর্মপ্রচার সম্প্রসারিত করা সম্পর্কে চিন্তা করেন নাই। ইহা সুবিদিত যে, প্রকাশ্যে ধর্ম প্রচারের প্রারম্ভ হইতে মহানবী সমগ্র আরবের হজ্জযাত্রী এবং বিভিন্ন গোত্রের অন্যান্য ব্যক্তিদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করিতেন যাহারা হজ্জের মৌসুমে মক্কা ও উহার পার্শ্ববর্তী পবিত্র স্থানসমূহ যিয়ারত করিতে আসিতেন। ইহাও সুপরিজ্ঞাত যে, মহানবী উকায, যুল-মাজায ও মাজান্নার ন্যায় বিভিন্ন মেলায় ধর্ম প্রচার করিতেন যেখানে আরবের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু সংখ্যক লোক আগমন করিত ও নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অবস্থান করিত। প্রকৃতপক্ষে ইব্ন ইসহাক খুব স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, মহানবী কর্তৃক প্রকাশ্যে প্রচার শুরু হইবার পর প্রথম হজ্জ মৌসুম শুরু হইলে কুরায়শ নেতাগণ মক্কায় আগমনেচ্ছু গোত্রসমূহের মধ্যে তাঁহার প্রচারণার প্রভাব কিভাবে প্রতিহত করা যাইবে— তাহা স্থির করার জন্য মন্ত্রণাসভা আহ্বান করে। পরিণামে তাহারা তাঁহাকে একজন জাদুকর হিসাবে প্রচারিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং মহানবী সম্পর্কে হজ্জযাত্রিগণকে সতর্ক করার জন্য শহরে আসার সকল পথ ও প্রবেশপথে তাহাদের লোক নিযুক্ত করে। এই কাজ করিতে যাইয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে গোত্রসমূহের নিকট মহানবী তাঁহার সংবাদ প্রচারের জন্য নিজে যাহা করিতেন তাহা অপেক্ষা অধিক কিছু করে। ইব্ন ইসহাক খুব সঙ্গতভাবে বলেন, "আরবগণ ঐ মৌসুমে আল্লাহ্র রাসূল সম্পর্কে (তাঁহার উপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত হউক) একটি ধারণা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিল এবং রাসূলুল্লাহ সম্পর্কে আলোচনা সমগ্র আরবে ছড়াইয়া পড়িল"।[৪০] এইভাবে মহানবী একেবারে শুরুর সময় হইতে যখনই তাঁহার সামনে মক্কার বাহিরের লোকদের নিকট ধর্ম প্রচারের সুযোগ আসিত তখনই তিনি যত্নসহকারে উহার সদ্ব্যবহার করিতেন।

দ্বিতীয়ত, ইহাও একটি স্বীকৃত ঘটনা যে, দূরবর্তী স্থানে বসবাসকারী গোত্রসমূহের কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তি মক্কায় মহানবী -এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইহাও লিখিতভাবে রহিয়াছে যে দূরবর্তী স্থানের নবদীক্ষিত মুসলমানদের কিছু সংখ্যক মক্কায় মহানবী -এর সঙ্গে অবস্থান করতে ইচ্ছ পোষণ করেন, কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তাহাদের নিজ নিজ গোত্রের মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য কাজ করার নির্দেশসহ ফেরত পাঠাইয়াছেন। এই সকল ঘটনা পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত প্রদান করে যে, তাহাদের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা মহানবী -এর তাইফ গমনের যথেষ্ট পূর্বে সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ, ঐ ঘটনার পর মক্কায় তাঁহার অবস্থা খুব সংকটাপন্ন হয় এবং তিনি নিজে সেখানে তাঁহার অবস্থান মুত'ইম ইব্ন আদিয়্যের

নিরাপত্তাধীনে অব্যাহত রাখেন। ইহা নব-মুসলমানদের জন্য এমন সময় ছিল না যখন তাহারা মহানবী ﷺ-এর নিকট অবস্থান করার প্রস্তাব দিতে পারেন। অবশ্য এই সময়ে মহানবী ﷺ -এর অবস্থা অজ্ঞাত ছিল না, যত অজ্ঞাত থাকিলে ইহা কুরায়শ নেতাগণকে তাহাদের অতিথিবৃন্দকে মহানবী ﷺ -কে এড়াইয়া চলার জন্য আগাম সতর্ক করিতে অনুপ্রাণিত করিতে পারে যাহা সকল বর্ণনা অনুসারে অতিথিবৃন্দকে মহানবী ﷺ-এর বিষয়ে কৌতুহলী করিয়া তোলে ও পরিণামে তাহারা তাঁহার সহিত মিলিত হন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। দূরবর্তী স্থানে অবস্থানকারী গোত্রসমূহের এই সকল ধর্মান্তরিতদের সর্বাপেক্ষা খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন দিমাদ ইব্ন ছা'লাবা আল-আযদী[৪১] এবং আবূ যার আল-গিফারী।[৪২] এমন কি তুফায়ল ইব্ন 'আমর আদ-দাওসীর ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনায় ঘটনাটি মহানবী ﷺ তাইফ গমনের পূর্বে ঘটে। কারণ মহানবী ﷺ সম্পর্কে তাহাকে কুরায়শ নেতাদের আগমন সতর্কীকরণ শুধু মহানবী ﷺ সম্পর্কে তাহার (তুফায়লের) কৌতুহল জাগ্রত করে না। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর তাহার গোত্রে ফিরিয়া যান, কিছু সময়ের জন্য তিনি তাহাদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন এবং আবার মক্কায় মহানবী ﷺ-এর নিকট ফিরিয়া আসেন এবং দাওস গোত্রের মধ্যে ইসলামের সাফল্যের জন্য তাঁহাকে দু'আ করিতে বলেন। ইহা উল্লেখও করা যাইতে পারে যে ইব্ন ইসহাক, যদিও তিনি ঘটনাবলী সম্পর্কে তাহার বর্ণনায় সম্পূর্ণরূপে কালানুক্রমের অনুসারী নহেন, আবূ তালিবের মৃত্যু[৪৩] এবং মহানবী ﷺ-এর তাইফ গমন[৪৪] সম্পর্কে বলার পূর্বে তুফায়ল ইব্ন আমরের ধর্মান্তর[৪৫] গ্রহণের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

তৃতীয়ত, গোত্রসমূহের নিরাপত্তা কামনা করিয়া তাহাদের নিকট গমন প্রসঙ্গে প্রক্রিয়াটি, যেমন পূর্বে বলা হইয়াছে, আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্বেই শুরু হইয়াছিল। 'শেষোক্ত ঘটনা ঘটিবার পূর্বে মহানবী ﷺ তাঁহার ধর্ম প্রচার আরব গোত্রসমূহ পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন নাই' এই কথা বলিতে গিয়া ওয়াট এই কথাটি এড়াইয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রতীয়মান হয় যে, প্রাথমিক বৎসরগুলিতে যখন মহানবী ﷺ গোত্রসমূহের সম্মুখে দীন ইসলাম পেশ করেন তখন তিনি তাহাদিগকে ইহা শুধু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। আবূ তালিবের মৃত্যুর পর তিনি গোত্রগুলির নিকট তাহাদিগকে ইসলাম গ্রহণ করানো এবং কুরায়শ নেতাদের বিরোধিতা ও শত্রুতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে নিরাপত্তা ও সহায়তা কামনা করা উভয় উদ্দেশ্যে গমন করেন। সে যাহাই হউক, কোন সন্দেহ নাই যে, মদীনার সঙ্গে যোগাযোগ আবূ তালিবের মৃত্যুর আগেই স্থাপন করা হইয়াছিল। কারণ খাযরাজদের বিরুদ্ধে কুরায়শ নেতাদের নিকট সামরিক মিত্রতা কামনা করিয়া 'আওসদের প্রতিনিধিদল প্রেরণ, ঐ প্রতিনিধি দলের সদস্যগণকে মহানবী ﷺ কর্তৃক ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানানো এবং তাহাদের একজন ইয়াস ইব্ন মু'আযের ইসলাম গ্রহণ প্রভৃতি সুপরিচিত ঘটনা সবই বু'আছ যুদ্ধের পূর্বেই ঘটে। এভাবে শুধু এই ধরনের ঘটনাবলীর এবং উপরে উল্লিখিত কুরআনী প্রমাণসমূহ অস্বীকার করিয়াই কেহ বলিতে পারে, "বলার কোন উপায় নাই যে, তিনি

[মহানবী ﷺ] আবূ তালিবের মৃত্যুর পূর্বে সাধারণ আরববাসীদের নিকট তাঁহার প্রচারকার্য প্রসারিত করার চিন্তা করিয়াছিলেন কিনা"।

গোত্রসমূহের নিকট গমন প্রসঙ্গে ওয়াটের অন্য (তৃতীয়) বিবরণটি এই যে, তিনি বলেন, "প্রাচীনতম উৎসসমূহ" উল্লেখ করিয়া মহানবী ﷺ শুধু বানূ কিনদা, বানূ কাল্‌ব, বানূ হানীফ ও বানূ আমের ইব্‌ন সা'সা'আর নিকট গিয়াছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন, "ইহা জ্ঞাত হওয়া কঠিন যে, কেন এই গোত্রগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে এবং অন্যগুলির নাম উল্লেখ করা হয় নাই"। অতঃপর তিনি মহানবী ﷺ-এর "এই প্রত্যাশার জন্য" বিশেষ কারণসমূহ অনুসন্ধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন "যে, তিনি যাহা বলিবেন তাহা তাহারা শুনিবে"। ওয়াট ধারণা করেন যে, প্রথমে উল্লিখিত গোত্রটি ব্যতিরেকে অন্য তিনটি গোত্র "হয় সম্পূর্ণরূপে, না হয় আংশিকভাবে খৃস্টান" থাকার কারণে ইহা বিশেষ কারণ হইতে পারে। তিনি কিন্তু আরও বলেন, এই সম্পর্কে "নিশ্চিত হওয়া অসম্ভব" এবং এই বলিয়া উপসংহার টানেন, "আমাদের ইহা বিশ্বাস করা যুক্তিসঙ্গত যে, এই সময়ে মুহাম্মাদ ﷺ বেদুইন গোত্রসমূহের সদস্যদিগকে ইসলাম গ্রহণ করার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে আরম্ভ করেন এবং এই তৎপরতার পশ্চাতে সকল আরববাসীর মধ্যে ঐক্যের কমপক্ষে একটি অস্পষ্ট ধারণা ছিল"।[৪৬]

ওয়াট "প্রাচীনতম উৎসসমূহ" দ্বারা স্বীকৃতরূপে ইব্‌ন হিশাম (ইব্‌ন ইসহাক) ও আত-তাবারীকে বুঝাইয়াছেন যাহাদের নাম তিনি তাহার পাদটীকায় উল্লেখ করেন। তিনি অবশ্য এই ধারণা করিতে গিয়া ভুল করেন যে, প্রাচীনতম উৎসসমূহ মহানবী ﷺ যাহাদের নিকট গমন করিয়াছিলেন শুধু এই চারিটি গোত্র সম্পর্কে উল্লেখ করে।

অন্যান্যদের মধ্যে ইব্‌ন সা'দ, ইমাম যুহরী প্রমুখের একটি বর্ণনা প্রদান করেন যাহাতে ১৫টি গোত্রের উল্লেখ রহিয়াছে যাহাদের নিকট মহানবী ﷺ গমন করিয়াছিলেন এবং যেহেতু ভিত্তিটি যে, এই প্রসঙ্গে মাত্র চারিটি গোত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, ভুল সেহেতু অপ্রয়োজনীয় হওয়া ছাড়াও এইরূপ করার জন্য বিশেষ কারণ সম্পর্কে অনুমানটিও সঠিক নহে। ইহাও সঠিক নহে যে, ইহা শুধু "এই সময়ে" ঘটিয়াছিল যে, মহানবী ﷺ "বেদুঈন গোত্রসমূহের সদস্যগণকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে আরম্ভ করেন"। বিবৃতিটি, উপরে যেরূপ উল্লেখ করা হইয়াছে, "এই সময়"-এ মহানবী ﷺ-এর গোত্রসমূহের নিকট গমন করার প্রকৃত প্রকৃতির প্রতি একটি অমনোযোগ দ্বারা স্পষ্টভাবে অনুপ্রেরিত হইয়াছে যাহা ছিল তাহাদিগকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানানো ছাড়াও কুরায়শদের শত্রুতা ও বিরোধিতার বিরুদ্ধে তাহাদের সমর্থন ও নিরাপত্তা প্রদান।

প্রকৃতপক্ষে ওয়াটের এই স্থলের সমগ্র আলোচনাটি কিছু পরিমাণে স্ববিরোধী, অগোছালো। পূর্ববর্তী সময়ে মহানবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে বিরোধিতার কারণ ও সূত্রপাত সম্পর্কে তিনি অনুমান

করেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ কুরায়শ নেতাদের শত্রুতা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে তাইফ, নাখলা ও কুদায়দের অধিবাসীদের নিজ নিজ দেবদেবীদের স্বীকৃতি দিয়া তাহাদিগকে স্বপক্ষে আনার চেষ্টা করিয়াছিলেন।[৪৭] এবং এখন ওয়াট বলেন যে, আবূ তালিবের মৃত্যুর পর মক্কায় মহানবী ﷺ -এর অবস্থার অবনতি ঘটিলে তাঁহাকে মক্কার বাহিরে দৃষ্টি দিতে বাধ্য করে এবং এই সময়ে তিনি বেদুঈন গোত্রসমূহের সদস্যগণকে ইসলাম গ্রহণের জন্য আহ্বান জানাইতে আরম্ভ করেন এবং এই তৎপরতার পশ্চাতে "সমগ্র আরবের ঐক্যের একটি অস্পষ্ট ধারণা" ছিল।

মহানবী ﷺ -এর তথাকথিত সম্প্রসারণ দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে দুই স্থানে কৃত ধারণা দুইটি পরিষ্কাররূপে অসঙ্গতিপূর্ণ। পূর্বে ও উপরে যেরূপ দেখান হইয়াছে, তাইফ, নাখলা ও কুদায়দের অধিবাসিগণকে স্বপক্ষে আনার জন্য গৃহীত উদ্যোগ প্রসঙ্গে ওয়াটের পূর্বেকৃত ধারণাটি তাহার পরবর্তী কালে কৃত ধারণাটির মতই ভুল যে, শুধু আবূ তালিবের মৃত্যুর পরই মহানবী ﷺ মক্কার বাহিরে দৃষ্টি দিতে আরম্ভ করেন। ইহা "সমগ্র আরবের ঐক্যের একটি অস্পষ্ট ধারণা" ছিল না যাহা এখন তাহার মনে উঁকি মারিতেছে, বরং মহানবী ﷺ -এর তথাকথিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি অস্পষ্ট অনুমান যাহা এই ধরনের পরস্পর বিরোধী বক্তব্য প্রদান করিতে প্ররোচিত করে।

এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও সুস্পষ্টভাবে বিভ্রান্তিকর যে, কোন ব্যক্তি যিনি মূলগতভাবে নিজেকে শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকার এবং ইহার অধিবাসীদের একজন নবী ও সংস্কারক হিসাবে ভাবিয়াছিলেন এবং ঐ ভাবনা সহকারে ঐ উদ্দেশ্যে দীর্ঘ দশ বৎসর কাজ করিয়াছিলেন সেই তিনি কি না তাঁহার নিজের এলাকার সকল অধিবাসীর সংস্কার সাধন ও তাহাদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিতে আরম্ভ করিবেন। কারণ তিনি নিজ এলাকা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছেন এবং তিনি ইহার অধিবাসিগণকে তাঁহার অধীনে ঐক্যবদ্ধ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। কোন কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন সংস্কারক বা কোন নেতৃত্ব প্রত্যাশী এতটা অসংযতভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইবেন না। পরিষ্কারভাবে আলোচনাটি মহানবী ﷺ-এর জীবনের কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ দিক লক্ষ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে এবং তাঁহার সম্পর্কে অধিকতর বলিবার ও উপলব্ধি করিবার মত কিছু ত্যাগ করিয়াছে।

তিন ঃ মদীনায় দীন ইসলামের সাফল্যের কারণসমূহ

মহানবী ﷺ -এর প্রতি মদীনাবাসীদের অনুকূল সাড়ার কারণ সম্পর্কে মুইর, মার্গোলিয়থ ও ওয়াটের মতামতসমূহের একটি অপরটির সহিত বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। মুইরের প্রধান ধারণা এই যে, ইহা ছিল বু'আছ যুদ্ধের ফল এবং ইয়াহূদী ও খৃস্টধর্মের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব যাহা মদীনা কর্তৃক ইসলাম ও মহানবী ﷺ-কে গ্রহণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মার্গোলিয়থ অবশ্য খৃস্ট ধর্মকে কোন কৃতিত্ব প্রদান করেন না এবং ধারণা করেন যে, ইহা ছিল ইয়াহূদীবাদের প্রভাব এবং ইয়াহূদীদের আল্লাহ্‌র ফলপ্রসূ করার ক্ষমা, যেরূপ বু'আছ যুদ্ধে দেখান হইয়াছে যাহা আওস ও

খাযরাজগণকে মুহাম্মাদ ﷺ-এর নিকট যাইতে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, যিনি নিজেকে একজন নবী ও ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসাবে দাবি করেন। ওয়াট তাহার পালায় মদীনাবাসিগণ কর্তৃক ইসলাম ও ইহার মহানবী ﷺ -কে গ্রহণের বাস্তব কারণসমূহ অনুসন্ধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে কোন ইয়াহূদী-খৃষ্টান প্রভাব সম্পর্কে বলেন না। নিম্নে তাহাদের নিজ নিজ মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ প্রদত্ত হইল।

মুইর বলেন, (ক) ইয়াহূদীগণ কর্তৃক একজন ত্রাণকর্তার ধারণা 'আওস ও খাযরাজগণকে অবগত করানো হয় যাহাদের মন এইভাবে মুহাম্মাদের মধ্যে ভবিষ্যত নবীকে চিনিয়া লইতে প্রস্তুত হয়। (খ) খাটি আস্তিক্যবাদ এবং "Old Tsetament-এর কঠোর নৈতিকতা" তাহাদিগকে ধর্মশূন্যতার ত্রুটিগুলির সহিত বৈসাদৃশ উপলব্ধি করায়। (গ) মদীনা ছিল "সিরিয়ার খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী গোত্রগুলি হইতে মক্কার অর্ধেক দূরত্বে। সুতরাং খৃষ্টধর্ম ইয়াহূদী ধর্মের সঙ্গে মিলিত হইয়া" সম্ভবত উপদ্বীপটির যে কোন স্থান অপেক্ষা মদীনার সামাজিক অবস্থার উপর অধিকতর শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। (ঘ) বু'আছ যুদ্ধটি, দল দুইটির একটিকে বাস্তবভাবে শক্তিশালী না করিয়া অন্যটিকে দুর্বল ও অবনমিত করিয়াছিল এবং নাগরিকগণ, আরব ও ইয়াহূদী উভয়ই অনিশ্চয়তা ও সন্দেহের মধ্যে বসবাস করে। এই কারণে ক্লান্ত দল দুইটি "মক্কা হইতে বিতাড়িত অতিথি"কে সাদরে গ্রহণ করে। (ঙ) মক্কার রাজনীতি এবং মহানবী ﷺ-এর পরিস্থিতি ও শিক্ষা সম্পর্কে মক্কায় বার্ষিক হজ্জে যাত্রা ও মদীনায় ঘন ঘন যাত্রাবিরতিকারী কুরায়শ বাণিজ্য কাফেলার মাধ্যমে মদীনাবাসিগণ মোটামুটি অবগত ছিল। (চ) "মদীনার একজন মহিলার সঙ্গে হাশিমের বিবাহের মাধ্যমে" মহানবী ﷺ "নিজের ধমনীতে বনূ খাযরাজের রক্ত ছিল এবং একটি অনুকূল স্বার্থ, কমপক্ষে ঐ গোত্রে নিশ্চিত হইয়াছিল" এবং (ছ) ইয়াহূদীগণ ইতোমধ্যে তাহাদের ধর্মশাস্ত্রের একজন উৎসাহী সমর্থক হিসাবে মহানবী ﷺ-এর সহিত পরিচিত হইয়াছিল।[৪৮] এইসব উপাদানের সঙ্গে প্রকৃত ধর্মান্তর গ্রহণকারীদের সমর্থন যুক্ত হইয়াছিল।[৪৯]

এইভাবে ভবিষ্যত নবী বা ত্রাণকর্তার ধারণাটি যে ইয়াহূদীগণ কর্তৃক আওস ও খাযরাজগণকে অবহিত করা হইয়াছিল এবং গোত্র দুইটি যে ধ্বংসকর বু'আছ যুদ্ধের পর নিঃশেষিত হইয়া শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য আগ্রহবশত একজন নিরপেক্ষ নেতা হিসাবে মহানবী ﷺ -কে সাদরে গ্রহণ করে তাহা উৎসসমূহে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও প্রমাণিত হয় যে, মক্কার রাজনীতি এবং সেখানে মহানবী ﷺ -এর অবস্থা বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে মদীনাবাসিগণের নিকট পরিচিত ছিল এবং মহানবী ﷺ খাযরাজ গোত্রের একজন মহিলার সঙ্গে (অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিবের মাতা) হাশিমের বিবাহের মাধ্যমে ঐ গোত্রের একজন দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় ছিলেন। কিন্তু আওস ও খাযরাজ গোত্রের ইসলাম গ্রহণের ও মহানবী ﷺ-কে তাহাদের নেতা হিসাবে মানিয়া লওয়ার উপর শুধু মহানবী ﷺ-এর প্রজ্ঞা ও তাঁহার শিক্ষা বা দৃঢ় সম্পর্কীয় আত্মীয়তা কোনটির কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য প্রভাব ছিল বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। মক্কাবাসিগণ নিজেরা অন্য যে কোন ব্যক্তি অপেক্ষা মহানবী ﷺ ও তাঁহার শিক্ষা সম্পর্কে অনেক বেশী জানিত এবং তাহারা তাঁহার সঙ্গে রক্ত

সম্পর্কে ও বৈবাহিক সম্পর্কে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। এতদসত্ত্বেও তাহাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ, এমনকি মহানবী ﷺ-এর নিজের বংশ বানূ হাশিমের অধিকাংশ নিজদিগকে ইসলাম হইতে দূরে রাখিয়াছিল।

ইয়াহূদী ও খৃস্ট ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে মুইরের দফাগুলি (খ ও গ) প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ইসলামের ইয়াহূদী-খৃস্টান উৎপত্তি ও মহানবী ﷺ-এর উত্থান সম্পর্কে অনুমান করিতে গিয়া প্রায় একই কথা বলিয়াছেন। আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই যে, তিনি মদীনাবাসীদের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে একই প্রকার যুক্তির পুনরাবৃত্তি করিবেন। ইহা অবশ্য সন্দেহজনক, মদীনা সিরীয় সীমান্তের নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সিরিয়ার খৃস্ট ধর্মের প্রভাব ইহার উপর তুলনামূলকভাবে অধিকতর গভীর ছিল কিনা। বরং মক্কার কুরায়শ নেতাগণ মদীনায় তাহাদের ঘন ঘন বাণিজ্য যাত্রাকালে তাহারা অধিকতর পরিমাণে সিরিয়ার খৃস্ট ধর্মের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে। সাধারণভাবে অবশ্য খৃস্টধর্মের প্রভাব মক্কা ও মদীনায় একই রকম ছিল। শেষোক্ত স্থানটির অধিবাসীরা কিন্তু সেখানে ইয়াহূদী গোত্রসমূহের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করিত। সুতরং ইহা সম্পূর্ণরূপে বোধগম্য যে, আওস ও খাযরাজগণ ইয়াহূদী ও তাহাদের ধর্মীয় রীতিনীতি সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে একটি অধিকতর ঘনিষ্ঠ জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তথাপি খৃস্ট ধর্মের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, এমনকি ইয়াহূদী ধর্মের প্রতি আওস ও খাযরাজদের মধ্যে কোন লক্ষণীয় ঝোঁক ছিল না, যদিও মক্কায় যেমন মদীনায় তেমন, ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে একত্ববাদের প্রতি একটি প্রবণতা দেখা দিয়াছিল এবং বাস্তবিকই মদীনায় কিছু সংখ্যক লোক (হানীফগণ) একত্ববাদ দাবি করিত। একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাসী এই ব্যক্তিগণ স্পষ্টত খৃস্টধর্ম বা ইয়াহূদী ধর্ম কোনটাই গ্রহণ করে নাই। কারণ এই ধর্মগুলির কিছু সংখ্যক মৌলিক দিক তাহাদের নিকট খাঁটি একত্ববাদ সম্পর্কিত তাহাদের ধারণার সহিত অবশ্যই অসঙ্গতিপূর্ণ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। যাহা হউক, প্রশ্নটি হইতেছে ঃ কেন খৃস্ট ধর্ম ও ইয়াহূদী ধর্মের সকল প্রভাব ও সান্নিধ্য সত্ত্বেও মদিনাবাসীগণ উভয়টির কোনটিই, বিশেষভাবে ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, এই ঘটনা সত্ত্বেও যে, তাহারা অধিকতর ঘনিষ্ঠভাবে ইয়াহূদী ধর্মের সংস্পর্শে ছিলেন এবং তাহাদের ইয়াহূদী প্রতিবেশিগণ অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উভয়ভাবেই স্বীকৃতরূপে তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল? যদি আওস ও খাযরাজগণ যে কোন সংখ্যায় ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিত তবে সম্ভবত বু'আছ যুদ্ধ সংঘটিত হইত না এবং প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্র দুইটির জনসাধারণের বাহিরের এক ব্যক্তির মধ্যে একটি নিরপেক্ষ নেতৃত্বের অনুসন্ধান করার প্রয়োজন দেখা দিত না। এমনকি যদি বু'আছ যুদ্ধের পর বিজয়ী আওসগণ তাহাদের মিত্রদের (বানূ কুরায়শ) ধর্ম গ্রহণ করিতে পারিত এবং তাহারা যৌথভাবে একটি স্থিতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক কৌশল বাহির করিতে পারিলে খাযরাজগণ তাহাতে সম্মত হইত। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আওসগণ আগ্রহ সহকারে তাহাদের মিত্রদের পরিত্যাগ করে এবং ইসলাম ও মহানবী ﷺ -কে সানন্দে গ্রহণ করার জন্য প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের সহিত যোগদান করে। তাহাদের বিজয়ের প্রায় অব্যবহিত পরে শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য শুধু আগ্রহ কমপক্ষে আওস গোত্রের আচরণের

ব্যাখ্যার জন্য অপর্যাপ্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পরিস্থিতি ইঙ্গিত প্রদান করে যে, মদীনায় ইসলামের সাফল্যের কারণ সেখানে ইয়াহূদী ধর্মের ব্যর্থতার কারণের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মুইর অবশ্য মদীনাবাসিগণ কর্তৃক ইয়াহূদী ধর্ম অপেক্ষা ইসলামকে অধিকতর পছন্দ করার একটি কারণ অনুমান করেন। কিছুকাল পরে আকাবার প্রথম শপথের পর মদীনায় ইসলামের অগ্রগতি সম্পর্কে বলিতে গিয়া মুইর বলেন, স্থানটির ইয়াহূদীগণ প্রচণ্ড বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করে যে, জনগোষ্ঠীটিকে, "যাহাদিগকে পুরুষানুক্রমে তাহারা ধর্মহীনতার ত্রুটিগুলি বুঝাইবার ব্যর্থ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছিল" তাহারা এখন নিজেদের ইচ্ছায় তাহাদের প্রতিমাগুলি একপাশে সরাইয়া রাখিতেছে এবং এক সত্য আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছে। মুইর বলেন, "রহস্যটি ইয়াহূদীদের সহিত খাপ খাওয়ানোর মধ্যে নিহিত রহিয়াছে"। বিদেশে উদ্ভূত ইয়াহূদী ধর্ম আরবদের কোন সহানুভূতি স্পর্শ করিতে পারে নাই; উপদ্বীপটির বিশ্বাস ও কুসংস্কার রীতিনীতি ও জাতীয়তার মধ্যে নিহিত মূল ইসলাম, অভ্যন্তরে প্রবেশ করার পূর্বে প্রস্তুত পথ পায়"।[৫৩]

ব্যাখ্যাটি দুই দিক দিয়া কালের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ। ইহা আওস ও খাযরাজদের পক্ষে এক ধরনের আরব জাতীয় সচেতনতা ধারণ করে যাহা প্রকৃতপক্ষে ইহার সময়ে ইহার অস্পষ্ট আকারেও বিদ্যমান ছিল না। মুইর সাধারণভাবে তখন পর্যন্ত কলহে লিপ্ত দুই গোত্রের পরিস্থিতির মধ্যে আধুনিক কালের একটি ধারণাকে অনুমান করিয়াছেন যাহারা কোন প্রকারে বংশের প্রতি আনুগত্য ও গোত্রীয় ধারণার পর্যায় অতিক্রম করে নাই।

দ্বিতীয়ত, যদি ইসলামের তথাকথিত উপদ্বীপটির বিশ্বাস ও কুসংস্কার, রীতিনীতি ও জাতীয়তার মধ্যে নিহিত মূল হওয়ার বিবরণটির এই ধরনের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে, যেমন হজ্জ প্রথা, কা'বার দিকে কিবলা প্রভৃতি, যাহা সচরাচরভাবে কিন্তু ভুলভাবে অনেকের দ্বারা ইসলামের "আরব" বৈশিষ্ট্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে ইহা উল্লেখ করা উচিত হইবে যে, এগুলি তখনও ইসলামের ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা প্রথা হিসাবে স্বীকৃত হয় নাই। এমনকি তখন জেরুসালেমের দিকে মুখ করিয়া সালাত আদায় করা হইত, অন্ততপক্ষে মদীনায় হিজরত করার প্রাক্কালে। সুতরাং ইহা বলা পরিষ্কারভাবে কালের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ যে, ইসলামের এই প্রকারের "আরব" বা "জাতীয়" বৈশিষ্ট্যসমূহ মদীনাবাসী কর্তৃক ইয়াহূদী ধর্মের পরিবর্তে ইসলাম গ্রহণ করার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত উপাদান ছিল। মুইরের নিজস্ব বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার কালের সহিত অসঙ্গতি আরও বেশী প্রকট যে, মদীনার ইয়াহূদীগণ নিজেরা মহানবীকে তাহাদের ধর্মশাস্ত্রে একজন উৎসাহী সমর্থক হিসাবে দেখিত (উপরে দ্র.)। প্রকৃতপক্ষে আওস ও খাযরাজগণ কর্তৃক ইয়াহূদী ধর্ম প্রত্যাখ্যান করার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মার্গোলিয়থ প্রদত্ত ব্যাখ্যাটি আরও বেশী অযৌক্তিক। তিনি বলেন, ঐ সকল লোকজন যাহাদের মনোযোগ প্রথমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কথা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহারা খাযরাজ গোত্র

হইতে আসিয়াছিল এবং তাহারা "ছিল" আওস ও ইয়াহূদীদের যৌথ বাহিনীর হাতে "একটি মারাত্মক পরাজয় বরণ হইতে সদ্যাগত"। মার্গোলিয়থ বলেন, আস'আদ ইব্ন যুরারা ছিলেন একজন ইয়াহূদী বিদ্বেষী। খাযরাজগণ ইয়াহূদীদিগকে "একজন মুক্তিদাতা" সম্পর্কে বলিতে শুনিয়াছিল "যিনি একদিন আবির্ভূত হইবেন এবং তাহাদের জন্য বিশ্বজয় করিবেন"। অতঃপর যখন খাযরাজগণ মহানবী ﷺ সম্পর্কে শুনিতে পায়, যেরূপ "হাদীছে আছে, চতুরতায় ইয়াহূদীদিগকে পরাজিত করার জন্য দ্রুত তাঁহার সঙ্গে যোগ দেয়। বু'আছ যুদ্ধে বিজয়ও ইয়াহূদীদের মাথা বিগড়াইয়া দিয়াছিল যাহারা ইহাকে তাহাদের অনুকূলে "তাহাদের আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ হিসাবে" বিবেচনা করিল। "এবং যেহেতু আওসদের দেবতাগণ তাহাদের জন্য বিজয় নিশ্চিত করিতে ব্যর্থ হইল সেহেতু ইহা ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র অলৌকিক ক্ষমতার স্বীকৃতি দানের জন্য তাহাদের শত্রুগণকে প্রস্তুত করিল, মুহাম্মাদ ﷺ যাহার দূত ও প্রতিনিধি হইবার দাবি করিলেন"।[৫১] আওসগণ সম্পর্কে যাহারা এতদিন পর্যন্ত মদীনার গৃহযুদ্ধে পরাজিত হইয়া আসিতেছিল তাহারা "এখন আল্লাহর, ইয়াহূদীদের দেবতার সহায়তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জন করিল"। এই সকল বিজয়ী আওসগণের সহিত সাফল্যের সঙ্গে আল্লাহ্র নাম যুক্ত হইল এবং "তাহারা ইচ্ছা পোষণ করিতে ছিল না যে, তাঁহার (আল্লাহর) আনুকূল্য তাহাদের শত্রুদের দিকে স্থানান্তরিত হউক যাহাদিগকে তাহারা পরাজিত করিয়াছে"। এখন খাযরাজগণের সহিত একত্র হইয়া তাহারাও মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে যোগ দিল। এইভাবে মার্গোলিয়থ বলেন, "গৃহযুদ্ধটিকে অব্যাহত রাখার জন্য কৌশলটি অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা দুই পক্ষের ঐক্যে পর্যবসিত হইল"।[৫২] তিনি আরও বলেন, ইয়াহূদীরাও ছিল ইসলামের প্রাথমিক নীতিসমূহের, যেমন আল্লাহ্র একত্ব ও মৃতদের পুনরুজ্জীবন প্রভৃতির যথার্থতা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট "সরল ও অদূরদর্শী" এবং "এই ঘটনা যে, সালাত তাহাদের মন্দিরের দিকে মুখ করিয়া আদায় করিতে হইবে, বিষয়টি মীমাংসা করিয়া দেয়"। তাহারা মুহাম্মাদ ﷺ-এর সহায়তায় মদীনায় একটি ইয়াহূদী রাজ্য প্রতিষ্ঠার কল্পনা করিয়া থাকিতে পারে যেমন তাহারা দক্ষিণ আরবে একজন আরব দলপতির ধর্মান্তর গ্রহণের মাধ্যমে করিয়াছিল। "অতএব ইয়াছরিবের মাটি ইসলামের জন্য পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিল"।[৫৩]

ইয়াহূদীদের মনোভাব সম্পর্কে অনুমানসমূহ ছাড়াও মার্গোলিয়থের প্রধান ধারণা এই যে, ইয়াহূদী ও 'আওসগণের যৌথ বাহিনীর হাতে পরাজিত হইয়া খাযরাজগণ ইয়াহূদীদের দেবতার ফলপ্রসূতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইয়াছিল এবং মুহাম্মাদ ﷺ ঐ দেবতার একজন দূত হিসাবে দাবি করায় তাহারা ঐ দেবতার সহায়তা পাওয়া এবং গৃহযুদ্ধটি অব্যাহত রাখার জন্য তাঁহার সঙ্গে যোগ দেয়। অপরপক্ষে আওসগণও ইয়াহূদীদের দেবতার সহায়তাই তাহাদের জন্য বু'আছ যুদ্ধে বিজয় আনিয়া দিয়াছে উপলব্ধি করিয়া "যাহাদিগকে তাহারা পরাজিত করিয়াছে তাহাদের নিকট" ঐ আল্লাহ্র সহায়তা "হস্তান্তরিত হওয়া" প্রতিহত করার জন্য মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে যোগ দেয়।

এখন ইহা অবশ্যই সত্য যে, মুহাম্মাদ ﷺ নিজেকে ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র রাসূল হিসাবে দাবি করেন, যিনি ছিলেন একাধারে ইয়াহূদী ইবরাহীম ও মূসার আল্লাহ। মদীনাবাসিগণ মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে যোগদান প্রসঙ্গে মার্গোলিয়থের ব্যাখ্যা ভিত্তি ও সিদ্ধান্ত উভয় দিক হইতে ভ্রান্ত। বু'আছ যুদ্ধে বানূ কুরায়যা আওসদের পক্ষ সমর্থন করায় এবং বানূ নাযীর ও বানূ কায়নুকা খাযরাজদের পক্ষ অবলম্বন করায় ইয়াহূদীরা নিজেরাই দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এইভাবে শেষোক্তদের এই কথা চিন্তা করার কোন কারণ ছিল না যে, ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র সহায়তা শুধু তাহাদের বিপক্ষ দলের পক্ষে ছিল এবং তাহাই ছিল তাহাদের বিজয়ের কারণ।

দ্বিতীয়ত, যদি খাযরাজগণ আদৌ ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র ফলপ্রসূতায় অতটা বিশ্বাস করিত, তবে তাহারা একজন অ-ইয়াহূদী নবীর মাধ্যমে ইয়াহূদীদের আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করার পরিবর্তে ইয়াহূদীদের ঘনিষ্ঠ হইয়া বা সরাসরি ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহায়তা পাইবার উদ্যোগ লইতে পারিত। মোটের উপর তাহারা দুই বা তিনটি ইয়াহূদী গোত্রের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিল। মার্গোলিয়থ বলেন, ইয়াহূদীরা আওস ও খাযরাজদিগকে ইয়াহূদী ধর্মে ধর্মান্তরিত করিতে উদ্যোগ গ্রহণ না করিলেও তাহাদের ইয়াহূদী ধর্ম গ্রহণ করায় কোন বাধা ছিল না।

তৃতীয়ত, যদি শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সামরিক বিবেচনা এবং 'গৃহযুদ্ধ অব্যাহত রাখা'র অভিপ্রায় খাযরাজদের মহানবী ﷺ-এর সঙ্গে যোগ দেওয়ার কারণ হইত তবে তাহারা এই বিষয়টি দেখার জন্য সতর্ক থাকিত যে, মহানবী ﷺ-এর সামরিক মিত্র হিসাবে টিকিয়া থাকার যোগ্যতা আছে কি না। তাহারা তখন লক্ষ্য করিত যে, তিনি একজন শক্তিধর মিত্র হওয়া দূরে থাকুক, নিজেই মদীনাবাসীদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করিতেছেন এবং ইয়াহূদীদের আল্লাহ, তিনি নিজেকে যাঁহার 'দূত' বলিয়া দাবি করেন, তাহার মক্কাস্থ বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন দৃষ্টিগ্রাহ্য বিজয় অর্জনের জন্য এখন পর্যন্ত তাঁহাকে আপাত প্রতীয়মানভাবে সমর্থ করেন নাই।

চতুর্থত, আওসদের প্রসঙ্গে বলা যায়, যদি তাহারা উপলব্ধি করিতে পারিত যে, বানূ কুরায়যার সঙ্গে মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় তাহারা ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহ অর্জন করিয়াছে, তবে তাহারা ঐ মিত্রতা বন্ধনকে বজায় রাখিতে আরও দৃঢ় হইত। ততদিন পর্যন্ত তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের নিকট ঐ আল্লাহ্র সহায়তা হস্তান্তরের আশঙ্কা করার কোন কারণ ছিল না, যতদিন পর্যন্ত তাহারা তাহাদের ইয়াহূদী মিত্রদের সঙ্গে থাকা অব্যাহত রাখিত। তাহার পরও সেখানে মহানবী ﷺ-এর উপর বর্ষিত সেই বিজয়ের আনুকূল্যের কোন চিহ্ন ছিল না। প্রকৃতপক্ষে সামরিক বিবেচনা এবং গৃহযুদ্ধ অব্যাহত রাখার একটি অভিপ্রায় বা তাহাদের স্ব স্ব গোত্রের জন্য ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র বিশেষ আনুকূল্য পাওয়ার একটি আকাঙ্ক্ষা কোনটি খাযরাজ ও আওসগণকে ইসলাম গ্রহণ ও মহানবী ﷺ ও তাঁহার উদ্দেশ্যকে সমর্থন করার জন্য একত্র হইতে অনুপ্রাণিত করে নাই। মার্গোলিয়থের ধারণাটি প্রকৃতপক্ষে স্ববিরোধী। যদি তাহাদের নিজ নিজ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ইয়াহূদীদের আল্লাহ্র আনুকূল্য নিশ্চিত করা আওস ও খাযরাজদের

উভয়ের পক্ষে প্রতিযোগিতামূলক উদ্দেশ্য হইত তবে তাহারা একজন তৃতীয় পক্ষের অধীনে নিজদিগকে ঐক্যবদ্ধ করিত না। সমস্ত ঘটনার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল আওস ও খাযরাজ উভয় পক্ষ কর্তৃক নিজ নিজ মিত্রগণকে পরিত্যাগ করা। বাস্তবভাবে ইহা ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে মার্গোলিয়থ সহজভাবে বিষয়টি এই বলিয়া তালগোল পাকান যে, কৌশলটি "যাহা গৃহযুদ্ধ অব্যাহত রাখার জন্য অবলম্বন করা হইয়াছিল তাহা উভয় পক্ষের ঐক্যে পর্যবসিত হইল"।

ওয়াট তাহার পক্ষে ঘটনাটির একটি আর্থ-সামাজিক ব্যাখ্যা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি বলেন, মদীনায় বারংবার দ্বন্দ্বের অন্তর্নিহিত কারণ ছিল জায়গা-জমির জন্য অনুবর্তী প্রতিযোগিতাসহ সীমিত খাদ্য সরবরাহের উপর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ। কারণ মদীনা ছিল প্রাথমিকভাবে একটি কৃষি নির্ভর সমাজ। ছোট ছোট যুদ্ধের বিজয়িগণ প্রায়শ পরাজিতদের ভূমি দখল করিত। মদীনা এইভাবে মক্কার অনুরূপ ব্যাধিতে ভুগিতেছিল, একটি স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের জীবনধারার সঙ্গে "যাযাবর মূল্যবোধ ও রীতিনীতির অসঙ্গতি," যাহার প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ও দলের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য "একটি একক সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ" প্রয়োজন ছিল । কিন্তু গোত্রীয় সংহতি ও বংশের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে গঠিত হওয়ায় মদীনার সামাজিক সংগঠন মরুভূমির সংগঠনের অনুরূপ ছিল এবং মরুভূমির নীতি "সামরিক শক্তি দিয়া যাহা রাখিতে পার তাহা রাখিয়া দাও" ছিল আচরণবিধি। এই ধরনের একটি আচরণবিধি বিশাল এলাকায় ভেড়া ও গোমহিষাদির পালের জন্য প্রযোজ্য হইলেও উহা "মরূদ্যানের সংকীর্ণ চৌহদ্দির মধ্যে যে কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট ছিল"।[৫৪] কিন্তু যেখানে মক্কাতে "বাণিজ্যিক স্বার্থসমূহ বিভিন্ন দলকে একত্র করিতে সহায়তা করিয়াছিল এবং কুরায়শ ঐক্যের একটি অনুভূতির জন্ম দিয়াছিল" সেখানে মদীনার কৃষি সংক্রান্ত পরিস্থিতি সম্ভবত ভূমির খণ্ডকরণ এবং "গোত্রসমূহের উপবিভাগের" একটি "বৃহত্তর সংখ্যা" অস্তিত্বশীল করিয়াছিল, যেমন বদরের যুদ্ধে কুরায়শদের ১৫টি বংশের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আওস ও খাযরাজদের ৩৩টি বংশের উল্লেখ দ্বারা প্রমাণিত হয়। ওয়াট বলেন, ঐ প্রমাণের প্রাসঙ্গিকতা ছাড়াও মদীনা বহু ভাগে বিভক্ত ছিল। অতএব "বিষয়টি যাহা মক্কায় বিরোধিতার মূলে ছিল রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ ﷺ-এর অবস্থান এবং ইহার রাজনৈতিক জটিলতা—উহাই ছিল সেই বিষয় যাহা মদীনাবাসীদিগকে শান্তির সামান্য আশা প্রদান করিয়াছিল" "বংশভিত্তিক নহে, বরং ধর্মভিত্তিক কর্তৃত্বসহ একজন নবী দ্বন্দ্বরত দলসমূহের উর্ধ্বে থাকিতে পারেন এবং তাহাদের মধ্যে মধ্যস্থতা করিতে পারেন"। "মুহাম্মাদ ﷺ -কে রাসূল হিসাবে স্বীকৃতি দানের জন্য এইভাবে আনসারদের একটি সর্বসম্মত বাস্তব কারণ ছিল"।[৫৫] মদীনায় অস্থিরতার একটি ধর্মীয় কারণও ছিল। ওয়াট বলেন, যেমন "সীমাহীন দ্বন্দ্ব-কলহজনিত গভীরভাবে অনুভূত" একটি "বেদনা"। এই সমস্যার জন্য ইসলামের একটি সমাধান ছিল। "ইহার শেষ দিবস (আখিরাত) সংক্রান্ত মতবাদ এই তাৎপর্য বহন করে যে, জীবনের সাফল্য ব্যক্তিবিশেষের আচরণের উৎকর্ষের মধ্যে নিহিত"। "সন্দেহ নাই যে, আনসারদের এই সকল তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু পরিমাণ উপলব্ধি ছিল", কিন্তু "তাহাদের

অধিকাংশ অনুমেয়রূপে মুসলমান হইয়াছিল প্রাথমিকভাবে এই কারণে" যে, তাহারা ইসলামের "নীতিসমূহকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত" এবং "বিশ্বাস করিত যে, আরবদের প্রতি বার্তাসহ আল্লাহ মুহাম্মাদকে রাসূলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন"।[৫৬]

আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে শুধু একটি "বার্তা"সহ নহে বরং একটি "গ্রন্থ"সহ এবং শুধু "আরবদের প্রতি" নহে বরং সমগ্র মানবজাতির প্রতি প্রেরণ করিয়াছেন। বিষয়টির ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি কী হইতে পারে সেই সম্পর্কে ওয়াট যাহা ভাবেন তাহা ছাড়া ইহাকে "নিঃসন্দেহে" "অনুমিতভাবে মুসলমান হইয়াছিল," "প্রাথমিকভাবে এই কারণে" প্রভৃতির ন্যায় অর্থ নিয়ন্ত্রক বাক্যাংশ দ্বারা শর্তযুক্ত করিলেও তাহার অন্যান্য দফাগুলি প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ও পরবর্তী লেখকগণ বু'আছের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফলাফল, একটি নিরপেক্ষ নেতৃত্বের নিকট মদীনাবাসীর চাওয়া-পাওয়া সম্পর্কে যাহা বলেন তাহার একটি বিশদ ব্যাখ্যা। এমনকি দ্বন্দ্ব-কলহের মূলে জায়গা-জমির জন্য প্রতিযোগিতা থাকা সম্পর্কিত দফাটি ওয়াটের পূর্বসূরিগণ কর্তৃক উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণে উদাহরণস্বরূপ মার্গোলিয়থ বলেন, "ভূমি বা লুটের মাল অধিকার" ছিল মদীনার দলাদলির মূলে[৫৭] এবং বু'আছ যুদ্ধের প্রাক্কালে "খাযরাজদের প্রকৃত উদ্দেশ্য" ছিল "ইয়াহূদীদের লাভ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করা"।[৫৮]

মার্গোলিয়থের বিবরণসমূহের শেষেরটি বু'আছ যুদ্ধে ইয়াহূদীদের জড়াইয়া পড়ার কারণের প্রেক্ষিতে অবশ্যই যথার্থ নহে। কেননা ইহা সর্বজনবিদিত যে, ইয়াহূদী গোত্রসমূহ নিজেরাই যুদ্ধের সময়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সাথে জড়াইয়া পড়ে। সে যাহাই হউক, জায়গা-জমি অধিকারজনিত কলহ-কোন্দল সৃষ্টিকারী জনসংখ্যা বৃদ্ধির মতবাদটি মদীনার পরিস্থিতির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অপ্রযোজ্য নহে। কারণ জায়গা-জমি সংক্রান্ত কলহ মদীনায় আওস, খাযরাজ ও ইয়াহূদীদের সহাবস্থান শুরু হওয়ার সময় হইতে বিদ্যমান ছিল। উৎসসমূহও বু'আছ যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় জনসংখ্যার দৃষ্টিগ্রাহ্য কোন বৃদ্ধি সম্পর্কে উল্লেখ করে নাই। প্রকৃতপক্ষে মরুভূমি এলাকায়, যেখানে মারামারি কাটাকাটি ছিল তৎকালের অব্যাহত পরিস্থিতি, সেখানে পানি ও মরূদ্যানসমূহের জন্য 'হানাহানি' ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংক্রান্ত মতবাদের প্রয়োজন নাই।

"একটি স্থায়ীভাবে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাযাবর মূল্যবোধের অসঙ্গতি"-এর প্রশ্নটি সম্পর্কে স্মরণ করা যাইতে পারে যে, ওয়াট ইসলামের উত্থানের মক্কী পটভূমি সম্পর্কে কম-বেশী একই কথা বলেন। বাস্তবে তিনি এখানে স্বীকার করেন যে, মদীনা মক্কার ন্যায় একই রোগে ভুগিতেছিল। কিন্তু ঐ দুইটি স্থানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাহার বর্ণনা একটি অস্পষ্ট সাধারণীকরণ মাত্র। ইহা বাণিজ্যিক স্বার্থাদি ছিল না যাহা ঐক্যের জন্ম দেয় এবং "প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিবর্গ ও দলের মধ্যে শান্তি বজায় রাখার উদ্দেশ্যে একটি একক সার্বভৌম কর্তৃত্বের" উন্মেষ ঘটাইবার জন্য মক্কায় বিভিন্ন দলকে একত্র করে। সেখানকার বেসামরিক শাসন ছিল কুরায়শদের সাধারণ

পূর্বপুরুষ হইতে প্রাপ্ত তাহাদের একটা উত্তরাধিকার। ইহা কুসায়্যি কর্তৃক উদ্ভূত ও হাশিম কর্তৃক বিকশিত হইয়াছিল এবং বেসামরিক কার্যক্রম পরবর্তী কালে বংশসমূহের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। ওয়াটের বিশ্লেষণের অযথার্থতা এই ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইতোপূর্বে বাণিজ্যতন্ত্র (Commercialism) ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে কুরায়শ বংশসমূহের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে বিভক্ত হইবার জন্য দায়ী হিসাবে উল্লেখ করেন; এবং এখন তিনি তাহাদের মধ্যে বৃহত্তর ঐক্যের সৃষ্টি এবং স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের জন্য উপযোগী একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা উদ্ভাবনের হেতু হিসাবে বাণিজ্যতন্ত্রের একই বিশেষ ঘটনা উল্লেখ করেন। সত্য এই যে, তাহার পূর্বের ও বর্তমানের সাধারণীকরণের কোনটিই যথার্থ নহে।

কৃষি সংক্রান্ত পরিস্থিতি দ্বারা সৃষ্ট জায়গা-জমি খণ্ড-বিখণ্ডকরণের কারণে মদীনায় অনুমেয় "গোত্রসমূহের বিভাগসমূহের বৃহত্তর সংখ্যা" প্রসঙ্গে ওয়াট নিজেই "প্রমাণ"-এর প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নহেন। তাহা ছাড়া ইহা অবশ্যই স্মরণীয় যে, মদীনার জ্ঞাত যুদ্ধগুলি বিশেষভাবে বু'আছ যুদ্ধটি "গোত্রসমূহের উপবিভাগসমূহ"-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় নাই, উহার বিস্তৃতি ও কারণ যাহাই হউক, ইয়াহূদী গোত্রসমূহসহ এইসব গোত্রের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের হালচালের সঙ্গে যাযাবরদের হালচালের অনুমিত অসঙ্গতির প্রশ্নটি সম্পর্কে যতদূর আলোচনা করা যায়, ইহাতেও গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন যে, ইয়াহূদী গোত্র বা আওস ও খাযরাজ গোত্রের কোনটিই যাযাবর অবস্থা হইতে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী অবস্থায় পরিণত হয় নাই। তাহারা বু'আছ যুদ্ধের কমপক্ষে দুই শতাব্দী পূর্বে মদীনায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল। আওস ও খাযরাজদের প্রসঙ্গ বাদ দিলেও, এমনকি ইয়াহূদীগণও উন্নত শিক্ষাদীক্ষা ও একটি অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও যাযাবর মান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মানের কোন সামাজিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত করিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয় না যাহাতে আওস ও খাযরাজগণ অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিত বা যাহা তাহারা অনুকরণ করিতে পারিত। এইভাবে যাযাবর চিন্তাধারা ও আচার-আচরণের বিদ্যমানতা বা বাণিজ্যতন্ত্রের অনুপস্থিতি বা এমনকি কৃষি সংক্রান্ত অবস্থার প্রভাব কোনটিই মদীনার জনসাধারণের বৃহত্তর অনৈক্যের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে দায়ী নহে। সেই স্থানের বৃহত্তর অনৈক্যের কারণ প্রাথমিকভাবে ইহার জনসংখ্যার ব্যাপক বৈসাদৃশ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আওস ও খাযরাজদের ইসলাম ও মহানবী ﷺ-কে গ্রহণ করার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নিহিতার্থ ছিল। (এক) ইহার অর্থ ছিল ইসলামের মতবাদসমূহ সম্পর্কে তাহাদের উপলব্ধি এবং ইয়াহূদী ধর্ম অপেক্ষা ইহার প্রতি তাহাদের অগ্রাধিকার দান যাহার সহিত তাহাদের কয়েক দশকের সংশ্লিষ্টতা ছিল। (দুই) ইহার অর্থ ছিল, আওস ও খাযরাজগণ তাহাদের শত্রুতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার অতীতকে স্মৃতি হইতে মুছিয়া ফেলিয়াছিল এবং বিশ্বাস ও আচরণের একটি নূতন পদ্ধতির অধীনে শান্তি ও সৌহার্দ্যের জীবন যাপনের জন্য আগাইয়া আসিয়াছিল। (তিন) ইহার অর্থ ছিল, আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্রই তাহাদের নিজ নিজ ইয়াহূদী মিত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে আওস ও খাযরাজ উভয় গোত্র কর্তৃক ইয়াহূদীদের এই পরিত্যাগ এবং শেষোক্তদের প্রভাব হইতে

তাহাদের নিজেদের মুক্তকরণ সমস্ত ঘটনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক ছিল। বু'আছ যুদ্ধের ধ্বংসকর ফলাফল এবং একটি নূতন ও নিরপেক্ষ নেতৃত্বের মাধ্যমে শান্তি ও ঐক্যের জন্য অনুবর্তী প্রত্যাশা অবশ্যই আওস ও খাযরাজগণকে তাহাদের মধ্যে মহানবী ﷺ-কে স্বাগত জানাইবার ব্যাপারে প্রভাবিত করিয়াছিল। কিন্তু ঘটনার একটি যথাযথ উপলব্ধির জন্য তাহাদের নিকটতম প্রতিবেশী ও একদা মিত্রদের বিরুদ্ধে তাহাদের এই আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের একটি ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করাও প্রয়োজন।

এই আকস্মিক বিরাট পরিবর্তনের প্রধান কারণ এই ছিল যে, ইয়াহূদীরা মূলধন থাকায় অর্থ-ঋণ দেওয়ার একটি বিস্তৃত ও অত্যাচারপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে আওস ও খাযরাজগণকে শোষণ করিত যাহা তাহাদের দারিদ্র্যকে বর্দ্ধিত ও তাহাদের ঋণদাতাদের ধনসম্পদকে স্ফীত করিত। শোষণের এই পদ্ধতি চালু রাখার জন্য ইয়াহূদীরা এক গোত্রকে অন্য এক গোত্রের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দেওয়া ছিল তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী কলহ ও বিবাদের প্রধান কারণসমূহের একটি। বু'আছ যুদ্ধ, যাহাতে সরাসরি ইয়াহূদীরাও জড়িত ছিল, তাহাদের জন্য ততটা ক্ষতিকর বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, আওস ও খাযরাজদের জন্য যতটা ক্ষতিকর হইয়াছিল। আর আওসগণ নামমাত্র বিজয়ী হইলেও প্রকৃত বিজয়ী হইয়াছিল তাহাদের ইয়াহূদী মিত্রগণ এবং এই ব্যাপারে তাহারা কোন গোপনীয়তাও অবলম্বন করে নাই। বস্তুত "বিজয় ধরিয়া রাখিতে এবং পূর্ণ প্রতিশোধ আদায়"-এ মার্গোলিয়থের ভাষায় "ইয়াহূদীরা সেই নীতির খাতিরে সংযমী হয় নাই যাহাকে আরবগণ শ্রদ্ধা করিত"।

সুতরাং ইহাই শুধু স্বাভাবিক ছিল যে, আওসগণ অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করিল যে, খাযরাজগণকে পরাজিত করিতে যুদ্ধ করিয়া এবং নিজেদিগকে নিঃশেষ করিয়া তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইয়াহূদীদের বিজয়ের জন্য যুদ্ধ করিয়াছিল। পরাজিত ও অপমানিত খাযরাজগণও অনুরূপভাবে অনুধাবন করিতে পারিল যে, ইহারা প্রকৃতপক্ষে আওসগণ ছিল না বরং ইহারা ছিল ইয়াহূদীগণ যাহারা তাহাদের উপর ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে। উভয় পক্ষই এইভাবে অনতিবিলম্বে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিল, পরস্পর নিকটবর্তী হইল এবং একটি স্থায়ী শান্তি ও ঐক্যের জন্য আকাঙ্ক্ষী হইল।

ইহা উল্লেখযোগ্য যে, গোত্র দুইটির মধ্যে এক ধরনের ঐক্য মহানবী ﷺ-এর মদীনা আগমনের পরবর্তী কালের নহে বরং পূর্ববর্তী কালের ছিল। প্রকৃতপক্ষে তাহারা মহানবী ﷺ-কে তাহাদের সমর্থন জানাইবার এবং তাঁহাকে মদীনায় আসার জন্য আমন্ত্রণ করার পূর্বে তাহারা তাহাদের মধ্যে একটি মৌলিক ঐক্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। বু'আছ যুদ্ধ এবং ইহাতে ইয়াহূদীদের ভূমিকা পূর্ববর্তী কালেও ইহার প্রতি ভূমিকার ন্যায়, এখন শত্রু ভাবাপন্ন দুইটি গোত্রকে শান্তি ও সৌহার্দ্যের একটি নূতন জীবনের প্রতি চালিত করে এবং ইসলাম ও মহানবী ﷺ তাহাদিগকে এই নূতন জীবন এবং বহু প্রতীক্ষিত নিরপেক্ষ নেতৃত্ব প্রদান করেন। মদীনায় ইসলামের

সাফল্যের জন্য যদি কোন বাস্তব কারণ অনুসন্ধান করিতে হয় তবে তাহা মদীনার ইয়াহূদী সম্প্রদায় ও তৎকর্তৃক শোষিত প্রতিবেশী আওস ও খাযরাজদের মধ্যকার সম্পর্কের মধ্যে অনুসন্ধান করিতে হইবে, সেখানকার অনুমিত জনসংখ্যা বৃদ্ধির মধ্যে বা স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের সঙ্গে তথাকথিত যাযাবর আচার-অনুষ্ঠানের অসঙ্গতির মধ্যে নহে। ঐগুলি যে কোনভাবে মক্কা ও মদীনা উভয়ের মধ্যে সাধারণ ছিল। আইশা (রা) যথার্থ মন্তব্য করেন, বু'আছ যুদ্ধের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা পরোক্ষভাবে মদীনাকে ইসলাম ও মহানবী ﷺ-কে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

অনুবাদ ঃ মুহাঃ আবু তাহের

চার ঃ কুরায়শদের কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গ

পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, প্রাচ্যবিদগণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাশয়দের শত্রুতা এবং মুসলমানদেরকে নির্যাতন করার বিষয়টিকে খাট করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।[৫৯] ইহারই সহিত সঙ্গতি রাখিয়া একই মনোভাব প্রকাশ করিয়া মুসলমানদের হিজরতের প্রাক্কালে কুরায়শগণ যে কূটকৌশল ও ষড়যন্ত্র করিয়াছিল প্রাচ্যবিদগণ তাহা সমর্থন করে এবং খাট করিয়া দেখে। এইভাবে উইলিয়াম মুইর 'আকাবার দ্বিতীয় শপথের ফলাফলের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেন মদীনাবাসীদের দ্বারা "একটি অন্যায্য হস্তক্ষেপ" হিসাবে যাহাকে "মক্কার ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ" বলিয়া আখ্যায়িত করেন এবং ইহাকে বাস্তবিকভাবে একটি শত্রুতামূলক আন্দোলন হিসাবে অভিহিত করেন।[৬০] ইহার পর তিনি বলেন, যখন কুরায়শ নেতারা মুসলমানদের এই উন্নতির কথা জানিতে পারে তখন তাহারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে মুসলমানদিগকে নূতন করিয়া নির্যাতন করিতে থাকে। যে স্থানেই তাহারা শক্তিমান ছিল সেই স্থানেই হয় তাহারা মুসলমান ধর্মবিশ্বাসীদেরকে তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বল প্রয়োগ করিয়াছে অথবা আটক বা অবরোধের দ্বারা তাহাদের দেশত্যাগকে বাধাগ্রস্ত করিয়াছে।[৬১] এমন সব কথা বলিয়া তিনি আত-তাবারীকে উদ্ধৃত করেন যে, তিনি নির্যাতনের দুইটি চরম কাল নির্দেশ করিয়াছেন ঃ একটি হইল আবিসিয়ায় হিজরতের পূর্বে এবং অপরটি আকাবার দ্বিতীয় শপথের পরবর্তী সময়ে। তিনি বলেন, ইহা সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, নির্যাতন সম্পর্কে যেইভাবে বলা হয় উহা যদি সেইভাবে হইত তাহা হইলে এই সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যাইত। এতদসত্ত্বেও অবরুদ্ধ অথবা ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের ব্যাপারে নজরদারি, যে কোন আঘাতের অথবা ভোগান্তির উপর আমাদের বিস্তারিত জানা নাই। কুরায়শ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আঘাত বা নির্যাতনের বিস্তারিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।[৬২]

এই বর্ণনা যাহাতে বলা হয়, "যে কোন আঘাত অথবা নির্যাতন সম্পর্কে আমাদের বিস্তারিত জানা নাই" শুধু "অবরোধ অথবা দোদুল্যমান ব্যক্তিদের নজরদারি" ছাড়া এই দুইটি তথ্যই ভুল এবং বিভ্রান্তিকর। কুরায়শদের আঘাত ও নির্যাতনে যাহারা ভোগান্তির শিকার হন তাহাদের মধ্যে

উম্ম সালামা (রা) এবং 'আয়্যাশ ইব্‌ন আবী রাবী'আ ও হিশাম ইবনুল আস ইব্‌ন ওয়াইল, তাহাদিগকে নির্যাতন করা ছাড়াও দীর্ঘকাল শৃঙ্খলবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। যদিও এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি সহজলভ্য নহে তবুও ব্যক্তিবিশেষকে বন্দী করিয়া রাখা এবং শৃঙ্খলবদ্ধ রাখিয়া তাহাদিগকে নির্যাতন করাও তুচ্ছ ঘটনা ছিল না। যেমনটি উইলিয়াম মুইরও স্বীকার করেন, "যে সকল স্থানে কুরায়শদের শক্তি ছিল" সেই সকল স্থানে তাহারা মুসলমানদিগকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে। শক্তি প্রয়োগের দ্বারা ধর্মবিশ্বাসের দাবি পরিত্যাগ করানোর সংখ্যা সামান্যই ছিল। প্রকৃতপক্ষে ও বাস্তবসম্মতভাবে মুইর তাহার রচনার পরবর্তী অংশে এই বিষয়ে নিজেই বিপরীত কথা বলেন। সেখানে তিনি বলেন, "নির্যাতন এবং চালাকী ও ধূর্ততার কারণে সামান্য সংখ্যক লোক ধর্মীয় বিশ্বাসচ্যুত হয়"।[৬৩] তিনি এই সম্পর্কে 'আয়্যাশ ও হিশামের ঘটনা উল্লেখ করেন যাহাদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, তাহারা "কিছু সময়ের জন্য পুনরায় মূর্তিপূজায় প্রত্যাবর্তন করেন"।[৬৪] বাস্তবিকপক্ষে তাঁহারা অত্যন্ত জঘন্যভাবে ধর্মীয় কারণে হয়রানির শিকার হন এবং দীর্ঘ সময়কাল তাঁহারা বন্দী জীবন অতিবাহিত করেন, যতক্ষণ না তাঁহারা বন্দীদশা হইতে মুক্ত হইতে সক্ষম হন এবং মদীনায় তাঁহাদের মুসলমান ভাইদের সঙ্গে মিলিত হন। মুইর এই বর্ণনায় অত্যন্ত ভুল করেন যে, তাঁহারা পুনরায় মূর্তিপূজায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। তাহার (মুইর-এর) বর্ণনায় তাঁহারা (আয়্যাশ ও হিশাম) যে বিপন্ন হইয়াছিলেন (افتن) তাহা অবশ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের পুনরায় মূর্তিপূজায় প্রত্যাবর্তন করার চাইতে তাঁহাদের উপর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে যে কঠোর নির্যাতন ও হয়রানি নামিয়া আসিয়াছিল এই বক্তব্য এই ক্ষেত্রে তাহাই নির্দেশ করে। তাঁহারা কি বাস্তবিকই ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? তাঁহারা পলায়নের পূর্ব পর্যন্ত বন্দী থাকিতেন বা এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁহাদের মুক্তির জন্য তাঁহাদের কুরায়শ বন্দীকারীদের নিকট আবেদন জানাইতেন না। যেমন নির্ভরযোগ্য সূত্রের ভিত্তিতে জানা যায় যে, তিনি তাহাদের মুক্তির জন্য দীর্ঘ সময় ধরিয়া প্রচেষ্টা চালান, ফলে তাঁহারা মদীনায় মুসলমানদের সঙ্গে মিলিত হইতে সক্ষম হন।[৬৫] মুইর এই বর্ণনায়ও মারাত্মক ভুল করেন যে, 'আয়্যাশ ছিলেন উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর ভাই।[৬৬]

অধিকন্তু আরও জোরে-শোরে কুরায়শ নেতাদের জন্য মুইর কৈফিয়তমূলক কথা বলেন। মুইর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁহার মদীনায় হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে হত্যা করার জন্য তাহাদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে কৈফিয়ত প্রদান করেন। মুইর এই ঘটনা ইব্‌ন ইসহাকের বর্ণিত বিবরণে উল্লিখিত বর্ণনা এবং কুরায়শ নেতাদের গোপন সভা সম্পর্কে অন্যান্য কর্মকাণ্ড এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হয় বন্দী করার প্রস্তাব বিবেচনা অথবা তাঁহাকে মক্কা হইতে নির্বাসিত করার অথবা তাঁহাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরে তিনি বলেন, "পরিশেষে তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, একটি দল মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাসভবনের দিকে অগ্রসর হইবে"।[৬৭] উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করার পর বর্ণনায় ইহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, অবশেষে তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং গুপ্তহত্যাকারী একটি দল নিয়োজিত

করে যাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসভবনের চর্তুদিকে অবস্থান গ্রহণ করে। তাহাদের নীলনক্সা অনুযায়ী যথাশীঘ্র পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কিন্তু তিনি তাহাদেরকে এড়াইয়া চলিয়া যান। মুইর এই ঘটনাকে বিকৃত করেন এবং কুরায়শদের সমন্বয়ে সঠিক হত্যাকারী দলকে একটি প্রতিনিধি দল বলিয়া আখ্যায়িত করেন। ফলে যাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসভবনের দিকে অগ্রসর হয় কিন্তু তিনি বাস্তবিকপক্ষেই তাহারা মন্দ কাল্পনিক কৈফিয়তের অসমর্থনীয় বিষয়কে অস্বীকার করেন ঐ বর্ণনার অব্যবহৃতি পরে এই বলিয়া যে, ভবিষ্যত কর্মপন্থা কি? এই প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্যই বা কি ছিল? এই বিষয়টি হাদীছের মধ্য হইতে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা একটি অসম্ভব ব্যাপার। ইহা বিশ্বাস করার খুব কমই কারণ রহিয়াছে যে, ইহা একটি গুপ্ত হত্যা ছিল, যদিও আমরা বলিয়াছি যে, এই ধরনের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছিল আবূ জাহল-এর প্ররোচনার ফল... ।[৬৮] যে কেহ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যদিও ইহা "নিষ্পত্তি "করা কষ্টকর" সভায় কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, ইহা কিভাবে পর্যায়ক্রমে বর্ণিত হইয়াছে যে, "সর্বশেষে তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, একটি দল মুহাম্মাদ ﷺ-এর বাসগৃহের দিকে অগ্রসর হইবে"? পুনরায় বলা যায়, যদিও "বর্তমান প্রতিনিধিদল প্রেরণের উদ্দেশ্য" জানা না থাকিত তাহা হইলে কিভাবে ইহা ধারণা করা যায় যে, যে দলটি সেই স্থানে যায় সেইটি ছিল একটি 'প্রতিনিধি দল' (ডেপুটেশন) এবং এই প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ? এতদসত্ত্বেও ঘটনা এই যে, (কুরায়শ) নেতারা অত্যন্ত কঠোরভাবে ও গোপনীয়তার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বন্দী করার, নির্বাসিত করার অথবা হত্যা করার মত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করিয়াছিল। তাহাদের কেহই শক্তি প্রয়োগ ছাড়া এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের দ্বারা পরিস্থিতি মুকাবিলার কথা বলে নাই। অভিযোগে বর্ণিত "প্রতিনিধি দল" কি রাত্রিকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসগৃহে গিয়া কেবল তাঁহাকে শান্তিপূর্ণভাবে মহল ত্যাগ করার কথা বলিয়াছিল অথবা তাঁহাকে ইচ্ছাকৃতভাবে আগাইয়া আসিয়া স্বেচ্ছাবন্দিত্ব বরণ করার জন্য বলিতে গিয়াছিল?

এই সভায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যার সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস করার কৈফিয়ত হিসাবে মুইর বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ 'নিজে' পবিত্র কুরআনে তাঁহার শত্রুদের পরিকল্পনা সম্পর্কে "অমীমাংসিত শব্দমালায়" উল্লেখ করিয়াছেন এবং তিনি (মুইর) পবিত্র কুরআনের আয়াতের (৮ ঃ ৩০) তাঁহার নিজস্ব অনুবাদ উদ্ধৃত করেন যাহাতে তিনি বলেন, অবিশ্বাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বন্দী করিতে অথবা হত্যা করিতে অথবা নির্বাসিত করিতে গোপন ষড়যন্ত্র করে। যদি "হত্যাকাণ্ডই তাহাদের সিদ্ধান্ত হইত এবং পরিষদ যদি অবিলম্বে কার্যকর করার নির্দেশ দিত" তাহা হইলে, মুইর উপসংহার টানেন, "মুহাম্মাদ ﷺ এই ঘটনা বর্ণনায় সুস্পষ্ট ভাষার প্রয়োগ করিতেন, বিকল্প বর্ণনা দিতেন না" ।[৬৯]

এখানে মুইর-এর অনুমান যে, কুরআন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর নিজস্ব রচনা, অবশ্যই একেবারেই অসংগত। কিন্তু উহা ছাড়াও আলোচ্য আয়াত থেকে গৃহীত অনুসিদ্ধান্তটিও ভ্রান্ত। এই আয়াত অনিশ্চিতভাবে নয়, বরং অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে এবং পরিষ্কারভাবে চূড়ান্ত ও একান্ত

গুরুত্ব সহকারে বলে যে, অবিশ্বাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল (مَكَرُوْا)। এবং যদিও সুনির্দিষ্টভাবে কুরায়শ নেতাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয় নাই, তবুও এই যুক্তি উত্থাপন করা যায় না যে, কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্পর্কে তাহাদের দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতে কুরায়শ নেতাদের সভার সম্পূর্ণ বর্ণনা প্রদান করা উদ্দেশ্য নহে বরং এই আয়াতে আল্লাহ এই বিষয়ের উপরই জোর দিয়াছেন যে, আল্লাহ কিভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সাহায্য করেন এবং তাঁহার শত্রুদের সকল ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করেন। অবিশ্বাসীদের সভা অনুষ্ঠান সম্পর্কিত বর্ণনার সঙ্গে কুরআনের আয়াতে প্রদত্ত বক্তব্যের সঙ্গে পার্থক্য নাই। এই বক্তব্যসমূহ পরস্পরের পরিপূরক। কুরআনের এই আয়াতকে ঐ বর্ণনার সঙ্গে মিলাইয়া ব্যাখ্যা করা উচিত। এইরূপ করার পরিবর্তে মুইর এই বর্ণনাকে পৃথকভাবে গ্রহণ করেন এবং আয়াতের অর্থকে বিকৃত করেন অর্থাৎ ইহাতে দ্বিমুখী ধারণা পোষণ করেন। অতঃপর তিনি কুরআনের আয়াতের অর্থকে পৃথকভাবে গ্রহণ করেন এবং ইহার প্রয়োগে দ্বিমুখী অর্থ গ্রহণ করেন তাহার অন্যায় ও স্ববিরোধী বর্ণনার সমর্থন খোঁজার স্বার্থে। তাহার মতে, হাদীছের বর্ণনা দ্বারা এই ধরনের একটি বিস্ময়কর সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব যে, কুরায়শদের পরিষদে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল এবং তাহারা "সর্বশেষে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, একটি দল মুহাম্মাদের বাসভবনের দিকে অগ্রসর হইবে"।

এই ধারণার অন্যায্যতার কথা মুইরের পরবর্তী আলোচনায় প্রকাশ পাইয়াছে যেখানে তিনি এইভাবে শুরু করেন, "পরিদর্শনের উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, মুহাম্মাদ ﷺ এই সম্পর্কে পূর্বেই অবহিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাহাদের চক্ষু এড়াইয়া নিজ গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করেন"। মুইর আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার বিছানায় আলী (রা)-কে রাখিয়া যান "প্রতিবেশীদের সন্দেহ" দূর করার জন্য। তিনি সরাসরি আবূ বক্‌র (রা)-এর বাসগৃহের দিকে যান এবং "পরবর্তী গন্তব্যের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করার চেষ্টা করেন" ইত্যাদি।[৮০] এখন যে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে, যদি কুরায়শরা ইহার দ্বারা কোন ক্ষতির কথা না ভাবিত এবং তাহাদের কথিত প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য যদি শান্তিপূর্ণ হইত তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ কেন পূর্বেই এই সম্পর্কে তথ্য লাভ করেন এবং "তাহাদের চক্ষু এড়াইয়া এই বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করেন"? মুইর এই ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষভাবে মনে করেন যে, গুপ্ত হত্যাকারীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাসভবনে রাত্রি বেলায় আসিয়াছিল।

তিনি (মুইর) এই ঘটনাও উল্লেখ করেন যে, আলী (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর রাখিয়া যাওয়া বিছানায় আবৃত হইয়া শুইয়াছিলেন। মুইর এই ঘটনার আর একটি বিকৃত বর্ণনা দেন এই বলিয়া যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এই ধারণায় এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাহাতে তাঁহার "প্রতিবেশীদের সন্দেহ" দূর হয়। প্রকৃতপক্ষে ইহা "প্রতিবেশীদের সন্দেহ" দূর করার জন্য করা হয় নাই বরং গুপ্ত হত্যাকারীদেরকে দ্বিধায় ফেলার জন্য এই পদক্ষেপ নেওয়া হইয়াছিল।

কুরায়শ নেতাদের অনুকূলে কৈফিয়ত প্রদানের একই উদ্দেশ্যে মুইর কুরায়শ নেতাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বক্র (রা)-এর প্রত্যেকের মাথার জন্য ১০০ উট পুরস্কারের ঘোষণার কথা উল্লেখ করার বিষয়টি বাদ দেন এবং কিছুকাল পর এই বলিয়া উক্ত ঘটনা হইতে সরিয়া আসেন যে, কুরায়শ নেতারা যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে নিরাপদে চলিয়া যাওয়ার কথা জানিতে পারে "তখন তাহারা চতুর্দিকে তাঁহার সন্ধানের জন্য এবং তাঁহার গমন পথের গোপন সূত্র ও শেষ গন্তব্য সম্পর্কে জানার জন্য লোক প্রেরণ করিল, কিন্তু তাহারা কোন সঠিক তথ্য পায় নাই"।[৭১] ইহা পুনরায় বলা যায় যে, কুরায়শ নেতারা কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয় নাই? তাহারা বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলিয়া যাওয়ায় হালকা বোধ করে এবং তাঁহার গতিবিধি অনুসন্ধানে লোক প্রেরণের ঝুঁকি লইতে চাহে নাই। কারণ তাঁহার গন্তব্যস্থল যে মদীনা ছিল তাহা তাহাদের জানাই ছিল।

অনুরূপ পন্থায় কুরায়শ নেতাদের স্বপক্ষে কৈফিয়ত প্রদানপূর্বক মুইর সুরাকার ঘটনার বাপারে বিকৃত করিয়া সুরাকাকে তিনি "অন্যতম একজন অশ্বারোহী স্কাউট, যে তাহার অনুসন্ধানমূলক কাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে", এমন বর্ণনা করেন এবং তিনি আরও বর্ণনা করেন যে, সুরাকা যখন দেখিল, "সে একা এবং তাহার চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সে পারিয়া উঠিবে না, তখন সে বিরোধিতার পরিবর্তে তাহার বক্তব্যে এই নিশ্চয়তা প্রদান করিল যে, তাহাকে শান্তিপূর্ণভাবে প্রস্থান করার অনুমতি দিলে তাঁহাদের সঙ্গে যে তাহার দেখা হইয়াছে তাহা সে প্রকাশ করিবে না"।[৭২]

এই সম্পর্কে বলা যায়, সুরাকা কেবল তাঁহার অনুসন্ধান ফেরৎ অন্যতম একজন স্কাউট ছিল না বরং যাহাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মাথার মূল্য বাবদ কুরায়শ কর্তৃক পুরস্কার ঘোষণার মাধ্যমে প্রলুব্ধ করা হইয়াছিল সে তাহার মিশনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করিতে এবং তদনুযায়ী পুরস্কার লাভ করিবার জন্য গিয়াছিল। সুরাকার মিশন যদি শান্তিপূর্ণ হইত, তাহা হইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে সুরাকা তাহার 'প্রতিদ্বন্দ্বী' মনে করিত না। এমন চিন্তাও সে করিত না যে, সে তাঁহাদের [রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীদের] বিরদ্ধে একা, তাই তাহার জয় লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। কেননা না রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গীগণ পথিমধ্যে যাহার সহিত দেখা হইত তাহার সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইতেন, সুরাকাও রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার সঙ্গিগণের সহিত প্রচণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য যাইত।

সুরাকা সেখানে অস্ত্রসজ্জিত হইয়া গিয়াছিল এবং সে স্থির নিশ্চিত্ত ছিল যে, সুবিধাজনক দূরত্ব হইতে তাহার উদ্দেশ্য পূরণ করিতে সক্ষম হইবে। সে শান্তিপূর্ণভাবে প্রত্যাবর্তন করে এইজন্য নহে যে, সে চারজন প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে পারিয়া উঠিবে না বরং এই ক্ষেত্রে অন্যান্য কারণ নিহিত ছিল, যে সকল কারণের কথা সে নিজে এই ঘটনা সংশ্লিষ্ট বিবরণে বর্ণনা করিয়াছে"।[৭৩] সুরাকা শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করার অনুমতি প্রার্থনা করিল এবং এই কথা প্রকাশ না করার প্রতিশ্রুতি

দিল যে, 'সে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের কথা প্রকাশ করিবে না'; এই কারণে নহে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার অনুসারিগণ তাহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন বরং এই কারণে যে, সে অতিপ্রাকৃতিকভাবে অক্ষম হইয়া পড়ে যেমন সে নিজে বর্ণনা করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কুরায়শ নেতাদের জন্য তাহার আয়াসলব্ধ কৈফিয়ত প্রদানের মাধ্যমে মুইর অপ্রত্যক্ষভাবে স্বীকার করেন যে, সুরাকা কুরায়শ নেতাদের ইচ্ছা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হত্যা করার জন্য অথবা তাঁহাকে বন্দী করার জন্য তাহার মিশনে গিয়াছিল।

মুইর বাস্তবিকপক্ষে মার্গোলিয়থের সহিত দ্বিমত পোষণ করেন যিনি কুরায়শ নেতাদের প্রতি সুস্পষ্টরূপে সহানুভূতিপ্রবণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ সত্ত্বেও তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে যে হত্যার চেষ্টা করিয়াছিল সেই সত্যকে স্বীকার করেন। মার্গোলিয়থ বলেন যে, "সম্মানিত ও ভাল স্বভাবের" কুরায়শ নেতারা তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অদ্ভুত ও খামখেয়ালীপনা স্বভাবের ব্যাপারে "কঠোরতা অবলম্বন করেন নাই"।[৭৪] কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, "এই পাগল মানুষটির প্রতিরক্ষায় বিভিন্ন গোত্রের ও বিভিন্ন শহরের তাঁহার একদল অনুসারী নিয়োজিত" তখন তাহারা তাঁহাকে (রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে) হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।[৭৫] কিছুটা দুঃখ প্রকাশের সুরে মার্গোলিয়থ বলেন, আরব "হয়ত পৌত্তলিকই থাকিয়া যাইত"; মক্কায় কি এমন স্থির সংকল্পের মানুষ থাকিত, "মারামারিতে মদদ দিত" এবং "কাজ করার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে প্রস্তুত থাকিত"। পক্ষান্তরে কুরায়শ নেতারা চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত নিল যে, "মুহাম্মাদ ﷺ -কে হত্যা করা উচিত, মক্কার প্রতিটি গোত্র এই হত্যায় অংশগ্রহণ করার জন্য একজন করিয়া প্রতিনিধি প্রেরণ করিল"। যাহা হউক, যখন "ভয়ে কম্পিত ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহার (রাসূলুল্লাহ্‌র) বাসভবনে পৌঁছাইল তাহাদের এই অতি রোমাঞ্চকর নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য যেন তিনি ঘুম হইতে উঠিলেন, (কিন্তু) তিনি সেইখানে ছিলেন না"।[৭৬] কিছু সময় পরেই মার্গোলিয়থ পুনরায় হত্যা প্রচেষ্টার বিষয় নিশ্চিত করেন যখন তিনি মন্তব্য করেন অবশ্য ভুলভাবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মদীনায় পৌঁছার পরও "হত্যা প্রচেষ্টা ভীতি তাঁহার মনে জাগরুক ছিল এবং তিনি কয়েক দিন ও রাত্রে গুহায় অবস্থানের দিন-রাত্রের কথা তাঁহার মনে জাগরুক ছিল"।[৭৭] যাহা হউক, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরুদ্ধে মার্গোলিয়থের বিদ্বেষপূর্ণ বাক্য সুস্পষ্ট যখন মার্গোলিয়থ তাঁহাকে "পাগল মানুষ" বলিয়া অভিহিত করেন।

মুইর ও মার্গোলিয়থের মত ওয়াটও মুসলমানদিগকে হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে কুরায়শদের নির্যাতনের বিষয়টি হালকা করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সম্পর্কে তিনি তাহার নিজস্ব অনুবাদ 'উরওয়ার পত্রে উদ্ধৃত করেন যাহা আত-তারাবীতে ও ইব্‌ন হিশামেও বর্ণিত হইয়াছে এবং এই বর্ণনার উদ্ধৃতি মুইর এই বলিয়া দেন যে, আত-তাবারী নির্যাতনের দুইটি চরম সময়ের কথা উল্লেখ করেন।[৭৮] ওয়াট ধারণা করেন, যে সময় হইতে আয-যুবায়র-এর পরিবার উমায়্যাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করেন উরওয়া তখন নির্যাতনের বিষয়টি অতিশয়োক্তিসহ উল্লেখ করেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে যে, "উমায়্যা গোত্র মুহাম্মাদ ﷺ-এর লোকদের বিরুদ্ধে গভীর শত্রুতায়

জড়িত ছিল"।[৭৯] এই ধারণা কষ্টকল্পিত। কেননা এই বর্ণনায় উমায়্যাদের সম্পর্কে কোন ইঙ্গিতই নাই। অধিকন্তু, ইহা যদি সাধারণভাবে জানা থাকিত যে, উমায়্যারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর "বিরোধিতায় গভীরভাবে লিপ্ত ছিল" তাহা হইলে এই কথার উপর জোর দেওয়ার প্রয়োজন নাই যে, 'উরওয়ার সময়ে নির্যাতনে কেবল দুইটি নির্দিষ্ট সময় চরম ছিল। এই ধারণা আর একটি কারণেও অসঙ্গতিপূর্ণ। যেমন ওয়াট-এর ইতোপূর্বেকার আর একটি বর্ণনার ব্যবহারের কারণে যে বর্ণনায় উরওয়া রাসূলের বিরোধিতার সূচনা সম্পর্কে বলিয়াছেন। উরওয়ার বর্ণনার উপর ভিত্তি করিয়া ইহা পুনরায় বলা যাইতে পারে, ঐ বর্ণনায় বলা হয় যে, তায়িফ হইতে কতিপয় সম্পদশালী কুরায়শ আসিয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা শুরু করিল। ওয়াট মনে করেন, কতিপয় কুরায়শ নেতার তায়িফে বিশেষ বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত থাকায় তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বিরোধিতা শুরু করে।[৮০] উরওয়ার কি উমায়্যাদের বিরুদ্ধে দূরবর্তী কোন উদ্দেশ্য ছিল যাহার কারণে তিনি তাঁহার বর্ণনাকে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন প্রথম ঘটনায় মনে করা হইয়াছে যে, তাহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরদ্ধে বিরোধিতা করার জন্য দায়ী?

যাহা হউক, হত্যা প্রচেষ্টা সম্পর্কে ওয়াট মূলত মুইর-এর ধারণা উল্লেখ করেন এবং মার্গোলিয়থের আংশিক ধারণা উদ্ধৃত করেন। এইরূপে কুরায়শ নেতাদের গোপন বৈঠকের কথা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে সম্মিলিত উদ্যোগে হত্যা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সকল গোত্রের প্রতিনিধির এই হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ—এইসব বিষয়ের আন্তসম্পর্ক বর্ণনার পর ওয়াট বলেন, যদিও ইহা অস্বীকার করার কোন কারণ নাই যে, এই ধরনের কিছু সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কুরায়শ নেতারা "অনুধাবন করিয়াছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করিতেছিলেন"। "পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে" ইহা পরিষ্কার হয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে "হত্যা করার কোন দৃঢ় প্রচেষ্টা ছিল না" এবং "তথ্যাদিতে যেমন জোর দিয়া বলা হইয়াছে, তাহাদের বৈঠকে সেই রকম সমঝোতা হয় নাই"। যাহা হউক, সম্ভবত আসন্ন বিপদ মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রস্থানের পর দ্রুত উদ্ভূত হয়।[৮১]

এইরূপ বলিয়া "বৈঠকে কোন অংগীকার হয় নাই, যেমনটি তথ্যাদিতে জোর দিয়া বলা হইয়াছে" এবং তৎসত্ত্বেও "আসন্ন বিপদ সম্ভবত মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রস্থান ত্বরান্বিত করে", ওয়াট সুস্পষ্টভাবে মুইর-এর ধারণার প্রতিধ্বনি করেন এবং অনুরূপ আপত্তি এই বর্ণনায়ও প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে এই কথা বলা যে, কুরায়শরা অনুধাবন করিল যে, "মুহাম্মাদ ﷺ তাহাদের বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করিতেছিলেন"; ওয়াট এই ক্ষেত্রে মুইর-এর ধারণা অবলম্বন করিয়া বলেন যে, "আকাবার দ্বিতীয় শপথ ছিল মক্কার অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ"-স্বরূপ, ইহা মার্গোলিয়থের ধারণারও একটি প্রতিবিম্ব, "যখন মুহাম্মাদ ﷺ-এর সকল কূটনৈতিক তৎপরতা তাহাদের শহরের (দেশের) স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি হইয়া দাঁড়াইল", "তখন কুরায়শরা বল প্রয়োগের ব্যবস্থা" অবলম্বন করিল।[৮২] অধিকন্তু "পরবর্তী ঘটনাবলী" প্রমাণ করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ-কে হত্যা করার কোন দৃঢ় প্রচেষ্টা ছিল না"—এই বক্তব্য মার্গোলিয়থের

ধারণাকে আড়াল করে যে, কুরায়শরা কেবল দুর্বলভাবে এবং অকৃতকার্যতার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে হত্যা করার পরিকল্পনা করিয়াছিল। যদি "পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা ইহা বুঝায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকৃতপক্ষে নিহত হন নাই এবং তিনি সফলতার সঙ্গে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা হইলে ইহা বলা দরকার যে, যে হয়রানি ভুক্তভোগীদিগকে মৃত্যুর দিকে নিয়া যায় তাহা কোনক্রমেই হালকা বিষয় ছিল না।[৮৩] অনুরূপভাবে হত্যা প্রচেষ্টা কেবল সংকল্পহীন ছিল না, কারণ ভুক্তভোগী এই হত্যা প্রচেষ্টা হইতে নিজেকে বাঁচাইতে সক্ষম হন।

পাঁচ ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরত করার পদ্ধতি সম্পর্কে উপরিউক্ত তিনজন প্রাচ্যবিদ (ওয়াট, মার্গোলিয়থ ও মুইর) এই প্রশ্নের উপর তাহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন যে, কেন রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম তাঁহার অনুসারিগণকে মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলেন এবং মক্কার প্রায় সকল মুসলমান মদীনায় না পৌঁছা পর্যন্ত তিনি নিজে মদীনায় হিজরত বিলম্বিত করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া তাহারা বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেন। মুইর বলেন, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা হইতে এই 'নিশ্চয়তা' পাওয়ার অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, সেইখানে তাঁহার সম্বর্ধনার জন্য যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা "নির্বিঘ্ন" ছিল কিনা এবং সেইখানে তাঁহার অনুগতরা প্রস্তুত ছিল কিনা এবং তাঁহার নিরাপত্তার জন্য "তাঁহাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করিতে তাহারা সক্ষম ছিল কিনা"। এমনকি তিনি "অত্যন্ত ঔদার্য্যের সঙ্গে ইহাও নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিলেন" যে, তিনি নিজে মক্কা ত্যাগ করার পূর্বে "অনুগত সাহাবীগণ নিরাপদে মদীনায় পৌঁছাইতে সক্ষম হইয়াছেন কিনা" অথবা তিনি "অস্পষ্ট অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন যে, আল্লাহ্র প্রতিশোধমূলক শাস্তি এই অবিশ্বাসপ্রবণ নগরীতের (মক্কায়) নামিয়া আসে কিনা"।[৮৪] মুইর উপরিউক্ত কারণসমূহের সঙ্গে যোগ করিয়া বলেন, কুরায়শরা চাহিতেছিল যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁহার লোকদিগকে লইয়া হিজরত করিয়া যেন চলিয়া যান, কিন্তু তাহারা হিজরতের এই ধরনের "অপরিচিত পদ্ধতির" কারণে "কিংকর্তব্যবিমূঢ়" হইয়া পড়িয়াছিল।[৮৫]

মুইর-এর প্রথম ধারণার প্রতিধ্বনি করিয়া ব্যাপক পরিধিতে মার্গোলিয়থ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁহার মদীনায় হিজরত বিলম্বিত করার কারণ, তিনি মদীনার লোকদের ধর্মবিশ্বাস পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং তাঁহার 'সুরক্ষিত' আশ্রয় ত্যাগের পূর্বে তিনি নিশ্চিত হইতে চাহেন যে, মদীনাবাসিগণ যেন মক্কা হইতে হিজরতকারী "ঐ সকল ক্ষুধার্ত মুখগুলিকে" স্বাগত জানায়। মার্গোলিয়থ আরও যোগ করেন, যদি মদীনাবাসী আনুগত্য প্রমাণে ব্যর্থ হয় তাহা হইলে হিজরতকারিগণ "চৌকস লোকদের সমন্বয়ে একটি দেহরক্ষী দল গঠন করিতে পারে" যাহাদের আনুগত্য সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ "সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত হইতে পারেন"।[৮৬] আর মার্গোলিয়থ যখনই মুইর-এর ধারণাসমূহের একটি ধারণা গ্রহণ করেন তখনই উহার সহিত নূতন একটি যোগ করেন। অনুরূপভাবে ওয়াট মার্গোলিয়থ-এর শেষ উল্লিখিত ধারণার পুনরাবৃত্তি করেন এবং ইহার সঙ্গে নূতন আর একটি যোগ করেন। ওয়াট বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় ততদিন পর্যন্ত

অপেক্ষা করেন যতদিন না তাঁহার অধিকাংশ অনুসারী মদীনায় পৌঁছান, "সম্ভবত ইহা নিশ্চিত করিতে যে, দোদুল্যমান লোকেরা যে পর্যন্ত না এই দুঃসাহসিক অভিযান পরিত্যাগ করে" এবং তিনি এই অভিযানকে নিশ্চিত করিতে চাহেন আর তিনি মদীনায় পৌছার পর "একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন অবস্থানে উপনীত হইতে পারেন এবং কেবল মদীনার মুসলমানদের সমর্থনের উপর যেন তাঁহাকে নির্ভর করিতে না হয়"।[৮৭] এই বর্ণনার শেষ অংশের তথ্য মার্গোলিয়থের ধারণার অনুরূপ। যেমন মার্গোলিয়থ বলেন, যদি মদীনাবাসীরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে প্রদত্ত ওয়াদায় অটল না থাকে তাহা হইলে হিজরতকারীদের মধ্য হইতে যাহাদের আনুগত্যের উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আস্থাবান তাহাদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী দেহরক্ষী দল গঠন করা যাইতে পারে। ওয়াট তাহার এই বর্ণনার সমর্থনে Leo Caetani- এর Annali dell' Islam (১খ., পৃ. ৩৬৫) গ্রন্থের তথ্য উদ্ধৃত করেন। মার্গোলিয়থ ও কায়তানী উভয়ে স্বতন্ত্রভাবে একই ধারণা পোষণ করেন। তাহাদের রচনা একই বৎসর (১৯০৫ খৃ.) প্রকাশিত হয়।

এখন তাহাদের ধারণাসমূহ পর্যালোচনা করা যাইতে পারে। কায়তানী-মার্গোলিয়থ ওয়াট অনুমান করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্ততপক্ষে হিজরতকারীদের সমর্থন সম্পর্কে নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিলেন, যদি মদীনাবাসীরা বিশ্বাস ভঙ্গ করিত অর্থাৎ তাহাদের প্রদত্ত ওয়াদায় অটল না থাকিত। ইহা নিতান্তই একটি অবান্তর কথা এবং ইহা কোনক্রমেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মদীনায় যাওয়ার পূর্বে তাঁহার যে অনুসারিগণ মদীনায় হিজরত করেন তাহাদের প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার বিষয় হইতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ একদিকে তিনি হিজরতকারীদের সমর্থনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন, কেননা তাহারা তাঁহার পূর্বে অথবা তাঁহার সঙ্গে ঐ স্থানে (মদীনায়) যান। তাহাদের অন্যান্য অনুমানসমূহ, উদাহরণস্বরূপ (ক) রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত মদীনাবাসীদের বিশ্বাসকে পরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন অথবা (খ) তিনি এই নিশ্চয়তা পাইতে চাহেন যে, সেইখানে তাঁহার জন্য প্রদেয় সম্বর্ধনার ব্যবস্থা "নিরাপদ" ছিল অথবা (গ) তিনি নিশ্চিত হইতে চাহিয়াছিলেন যে, তাঁহার মদীনাবাসী অনুগতরা তাঁহার নিরাপত্তার জন্য তাহাদের নিজেদের অংশগ্রহণে প্রস্তুত এবং সক্ষম ছিল কিনা অথবা (ঘ) তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন যে, মক্কা হইতে আগত "ক্ষুধার্ত মুখগুলিকে" মদীনার লোকেরা স্বেচ্ছায় পানাহার করায় কিনা—এইসব কিছু কারণ ও ঘটনা হিসাবে সমর্থনযোগ্য নহে।

উপরিউক্ত চারটি অনুমানই প্রকৃতপক্ষে প্রথমটির বিভিন্ন রূপ। উদাহরণস্বরূপ, মদীনাবাসীদের বিশ্বাস পরীক্ষা করা। কিন্তু উহার কোন বাস্তব পরীক্ষা করা সম্ভব ছিল না। রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বয়ং সেইখানে যাইতেন। যদি মদীনাবাসিগণ মন্দ বিশ্বাসের মনোভাব পোষণ করিতেন তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় না পৌঁছা পর্যন্ত উত্তম বিশ্বাস প্রদর্শন করিতেন এবং তারপর তাঁহাকে তাঁহার অনুসারীদেরসহ পরিত্যাগ করিতেন। কোন পার্থিব বিচক্ষণতা এবং পূর্বসতর্কতা তাহাদিগকে উহা করিতে বাধা দিতে সক্ষম হইত না।

দ্বিতীয়ত, মদীনার সঙ্গে কমপক্ষে দুই বৎসর ধরিয়া যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যাহার মাধ্যমে মদীনাবাসীদের ঈমান (বিশ্বাস) ও আন্তরিকতা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট সম্পূর্ণ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছিল। মুস'আব ইব্ন 'উমায়র (রা) মদীনাবাসীদের সঙ্গে প্রায় এক বৎসর ধরিয়া অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে কুরআন শিক্ষা দান করেন এবং তাঁহাদের জনগণের মধ্যে ইসলাম প্রচার করেন। সুস্পষ্টরূপে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁহার কার্যক্রম এবং মদীনায় ইসলামের সম্ভাব্য অবস্থা সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত করেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে, 'আকাবার দ্বিতীয় শপথের পর কতিপয় মদীনাবাসী মুসলমান হিজরত প্রক্রিয়া সমন্বয় করিতে মক্কায় আগমন করেন। এইসব কিছুর বিবেচনায় ইহা চিন্তা করা অমূলক যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনাবাসীদের দৃঢ় বিশ্বাসের আরও প্রমাণ পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

তৃতীয়ত, যদি ইহা তাহাদের আন্তরিকতা পরীক্ষা করার জন্য হইত তাহা হইলে ইহা আরও সহজভাবে এবং আরও সচেতনভাবে সকল মুসলমানকে প্রেরণ করার পরিবর্তে একটি দল পাঠাইয়া সংবাদ লওয়া যাইত।

পরিশেষে, যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ ধারণাকৃত বিবেচ্য বিষয়গুলির দ্বারা সক্রিয় হইতেন, তাহা হইলে তিনি এই বাস্তবতা উপেক্ষা করিতে পারিতেন না যে, তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি তাঁহার শত্রুদের মধ্যে একা পড়িয়া যাইতেন। পরন্তু তাঁহার অনুসারিদের মধ্যে পুনরায় সমস্যা দেখা দিত, তাহারা তাহাদের আনুগত্য প্রকাশে ঐকান্তিকতা দেখাইতেন না অথবা তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে চলিয়া যাইতেন, বিশেষ করিয়া মদীনাবাসীদের সমর্থন ও সহযোগিতা যখন তাহাদের প্রয়োজন ছিল। প্রাচ্যবিদদের এইসব অলীক অনুমান রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক গৃহীত কার্যপ্রণালীর সঠিক ও যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা করে না।

মুইর-এর অনুমান যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কার উপর আল্লাহ্র গজব পড়ে কিনা তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সম্পূর্ণ অসমর্থনীয়। কোন তথ্যে বা উৎসে এই ধরনের ইঙ্গিত নাই যে, মক্কার উপর আল্লাহ্র গজব পড়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ আশা করিতেছিলেন। তিনি কি এই রকম কোন ধারণা পোষণ করিতেছিলেন? তিনি তো তাঁহার অনুসারিগণকে লইয়া অতি দ্রুত মক্কা ত্যাগ করিয়াছিলেন। সমভাবে ওয়াট-এর ধারণাও অসমর্থনীয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্ভবত অপেক্ষা করিতেছিলেন দোদুল্যমান লোকেরা যাহাতে "উদ্যোগটি পরিত্যাগ" না করে তাহা নিশ্চিত করার জন্য। এমন কোন উদাহরণ নাই যে, কোন দোদুল্যমান ব্যক্তির উপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোন কর্তৃত্ব ছিল না, যেমন তথাকথিত 'বিপজ্জনক উদ্যোগে অধ্যবসায়ী ছিল। ওয়াট হিজরতকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করিয়া দেন 'বিপজ্জনক উদ্যোগ' হিসাবে যাহা কার্যত তাহার কেবল লক্ষণমূলক এবং মুইর ও মার্গোলিয়থ-এর ধারণাগত যাহা 'আকাবার দ্বিতীয় শপথের উপসংহার দ্বারা এবং ফলে মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কুরায়শদের বিরুদ্ধে "শত্রুতামূলক কর্মকাণ্ডের" পরিকল্পনা করেন। ইহা অবশ্যই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধী কুরায়শদের ধারণা

ছিল এবং কার্যত পরবর্তী কালে দুই তরফে শত্রুতা শুরু হইয়া যায়। সত্য কথা বলিতে পরবর্তী কালের ঐসব ঘটনা ছিল কেবল ধারাবাহিকতা এবং কুরায়শদের দ্বারা শত্রুতার তীব্রতা বৃদ্ধি; যে শত্রুতা তাহাদের মধ্যে পূর্ব হইতে বিদ্যমান ছিল। এই শত্রুতাই রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁহার অনুসারী মুসলমানদিগকে তাঁহাদের বাড়ি-ঘর হইতে তাড়াইয়া লইয়া যায় এবং অন্য একটি দূরবর্তী শহরে আশ্রয় লইতে বাধ্য করে। আকাবার দ্বিতীয় শপথ এবং হিজরতের মধ্যে যতটুকু সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা সকলেই কার্যত আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং মুসলমানগণ তাঁহাদের গৃহ ও সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিবেকের কারণে পরিত্যাগ করেন। এই ক্ষেত্রে কুরায়শ চাপ প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে তাঁহাদের কোন ধরনের সামরিক প্রতি-আক্রমণের পরিকল্পনা ছিল না।

সত্য কথা এই মদীনাবাসিগণ সঠিকভাবে পূর্ব হইতেই কুরায়শদের শত্রুতামূলক ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আশংকা করিতেছিলেন। তাঁহারা নিজেদের মধ্যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও ইসলামের প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবেন। কার্যত কুরায়শদের মুসলমানদিগকে নির্যাতন করা ও শত্রুতার বিরুদ্ধে মদীনাবাসী কর্তৃক রাসূলুল্লাহ ﷺ ও মুসলমানদেরকে আশ্রয় দেওয়ার ফলে তাঁহাদের (মদীনাবাসীদের) উপর এই দায়িত্ব বর্তায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনও আল্লাহ্র পক্ষ হইতে এই কারণে অস্ত্র ব্যবহার এবং যুদ্ধ করার অনুমতি পান নাই। এমনকি তাঁহার অনুসারীদিগকেও এমন কিছু করার অনুমতি দেন নাই।

বাস্তবিকপক্ষে হিজরতের আত্মরক্ষারমূলক বৈশিষ্ট্য এবং সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার অনুমতির অনুপস্থিতি যাহাকে মুইর আখ্যায়িত করেন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর 'অস্বাভাবিক ও কৌতুহলোদ্দীপক' কার্যপ্রণালী হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে প্রথমে হিজরত না করিয়া এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে পিছনে শত্রুদের মধ্যে ফেলিয়া না রাখিয়া এক নজীরবিহীন বদান্যতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এমনকি তিনি তাঁহার সকল অনুসারীকে লইয়া একসঙ্গে হিজরত করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। কারণ এমতাবস্থায় কুরায়শরা অবশ্যই সশরীরে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিত যাহা অপরিহার্যরূপে এক সামরিক সংঘর্ষের রূপ নিত। এই সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি আল্লাহ্র পক্ষ হইতে তখনও অনুমতি পান নাই। একই কারণে তিনি মদীনার মুসলমানদের সাহায্য চাহেন নাই অথবা তাঁহাদের কোন সৈন্যদলকে মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন নাই অথবা মক্কার নিকটে আসিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া মদীনায় লইয়া যাইবার জন্যও বলেন নাই, যদিও তাহারা এমন কিছু স্বেচ্ছায় করিতে প্রস্তুত ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, ঐ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে কুরায়শরা তদনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে শত্রুতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করিত।

এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং আল্লাহ্র নির্দেশনা অনুযায়ী তিনি (রাসূল) তাঁহার অনুসারীদের মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দান করেন এবং তিনি স্বয়ং আল্লাহ্র সুনির্দিষ্ট অনুমতির

জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন এবং এই ব্যাপারে যত ঝুঁকি ছিল সেইদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ করেন নাই। এবং যখন তিনি নিজে মক্কা ত্যাগ করার জন্য নির্দেশনা লাভ করেন, তখন তাহা করেন অত্যন্ত আস্থার সঙ্গে আল্লাহ্‌র সাহায্যে, সকল মানবীয় কল্পনাপ্রবণ ঝুঁকি ও বিপদের মধ্যেও নিরস্ত্র অবস্থায় কোন দেহরক্ষী সৈন্যদল না লইয়া (মদীনার দিকে) অগ্রসর হন। তথাকথিত "অস্বাভাবিক ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রক্রিয়া ছিল আল্লাহ্‌র পরিকল্পনার অংশবিশেষ, রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক গৃহীত পদ্ধতি নহে যাহা প্রাচ্যবিদগণ অনুমান করিয়া থাকে।

অনুবাদ ঃ সিরাজ উদ্দিন আহমাদ

তথ্যনির্দেশিকা

১. মুইর, পূ. গ্র., পৃ. ১০৪-১০৫।

২. ঐ, পৃ. ১০৫।

৩. ঐ।

৪. নিম্নে দ্র. পৃ. ৮৯৩-৮৯৫, ৯১৬-৯১৯।

৫. আরও দেখুন, নিচে, মূলপাঠ।

৬. Margoliouth, পূ. গ্র., ১৭৮।

৭. ঐ।

৮. ঐ।

৯. মুইর, পূ. স্থা., ১০৬।

১০. মার্গোলিয়থ, পূ. স্থা., ১৮০।

১১. ওয়াট, M. at M., ১৩৯।

১২. ঐ।

১৩. Supra, অধ্যায় ৯।

১৪. Watt, M. at M., ১৩৯। এই ঘটনার জন্য ওয়াট Lammens-কে উদ্ধৃত করেন। অবশ্য ইহা ইবন হিশামে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত, ১খ, ২৮২, ৩১৫, ৩৬০, ৩৮১।

১৫. পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়নি।

১৬. মুইর, পূ. স্থা., পৃ. ১০৯।

১৭. ঐ ১০৭।

১৮. ঐ ১২৯, পাদটীকা ১।

১৯. ঐ, ১১৮-১১৯।

২০. দেখুন Supra, পৃ. ২৬৫-২৬৮।

২১. মুইর, পূ. গ্র., ১৩৯ প.।

২২. ঐ, ১২০।

২৩. Supra, পৃ. ৮৭১।

২৪. কুরআন, ১৫ ঃ ৯৪ । আরও দেখুন, ৫৩ ঃ ২৯; ৭ ঃ ১৯৯ এবং ৩২ ঃ ৩০।

২৫. দৃষ্টান্তের জন্য দেখুন কুরআন ১১ ঃ ১২, ১৫ ঃ ৮৯, ১৭ ঃ ১০৫, ২২ ঃ ৪৯, ২৫ ঃ ১, ২৫ ঃ ৫৬, ২৯ ঃ ৫০, ৩৪ ঃ ২৮, ৩৪ ঃ ৪৪, ৩৪ ঃ ৪৬, ৩৫ ঃ ২৩-২৪, ৩৫ ঃ ৪২, ৩৮ ঃ ২০, ৪২ ঃ ৪৮; .... ৪৮ ঃ ৮, ৫১ ঃ ৫০, ৬৭ ঃ ২৬।

২৬. মার্গোলিয়থ, পূ. স্থা., ১৮১-১৮২।

২৭. ঐ, ১৮১।

২৮. ওয়াট, M. at M., ১৪০।

২৯. ঐ।

৩০. Supra, পৃ. ৬৭৫—৬৭৬।

৩১. ওয়াট, M. at M., ১৩৮। প্রকৃতপক্ষে ওয়াট তাইফ গমন হইতে মদীনায় হিজরত পর্যন্ত ঘটনাবলী সম্পর্কে তাহার আলোচনার অধ্যায়ের নাম দেন "সম্প্রসারণশীল দিগন্তসমূহ"।

৩২. কুরআন ৬ ঃ ১৩১; ১৫ ঃ ৪; ২৬ ঃ ২০৮।

৩৩. কুরআন ৭ ঃ ৮২ঃ ২৭ ঃ ৫৬; ৩৪ ঃ ৩৪; ৪৩ ঃ ২৩; ৪৭ ঃ ১৩; ৬৫ ঃ ৮।

৩৪. কুরআন ৬ ঃ ৯২ এবং ৪২ ঃ ৭।

৩৫. কুরআন ৩৫ ঃ ৪২।

৩৬. কুরআন ১৯ ঃ ৯৭ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِيْنَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا

৩৭. কুরআন (৩৮ ঃ ৪৮) ও ৩২ ঃ ৩, মূল পাঠ যথাক্রমে এইরূপ ঃ

وَلَكِنْ رَّحْمَةً مِّنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِنْ نَّذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ .

بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا اَتٰهُمْ مِّنْ نَذِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ .

৩৮. কুরআন ৩৬ ঃ ৫-৬ ঃ تَنْزِيْلُ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ . لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ اٰبَائُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ .

৩৯. দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন কুরআন, ৪৫ ঃ ২৩; ৩৯ ঃ ২৭; ৩০ ঃ ৫৮; ২৯ ঃ ৪৩; ২৮ ঃ ৪৩; ২৪ ঃ ৩৫; ১৮ ঃ ১৭; ১৭ ঃ ৮৯ এবং ১৪ ঃ ৪৪।

৪০. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ২৭০-২৭২; ইব্‌ন ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, ২৫০-১৫২। আরও দেখুন Supra, পৃ. ৬৪৬।

৪১. আল-ইসাবা, নং ৪১৭৭ (২খ., পৃ. ২১০); আরও দ্র. Supra, পৃ. ৫৩৫-৫৩৬।

৪২. বুখারী, নং ৩৫২৩। আরও দ্র. Supra, ৫৩৭-৫৩৮।

৪৩. ইব্‌ন হিশাম, ১খ., ৪১৫-৪১৮।

৪৪. ঐ, ৪১৯-৪২২।

৪৫. ইব্‌ন হিশাম, ১খ, ৩৮২-৩৮৫।

৪৬. ওয়াট, M. at M., ১৪০-১৪১।

৪৭. Supra, পৃ. ৭২১।

৪৮. মুইর, পূ. গ্র., ১১২-১১৩।

৪৯. ঐ, ১১৪।

৫০. ঐ, ১১৫।

৫১. মার্গোলিয়থ, পূ. গ্র., ১৯৬-১৯৭।

৫২. ঐ, ১৯৭।

৫৩. ঐ, ১৯৭-১৯৮।

৫৪. ওয়াট, M. at M., ১৪২-১৪৩।

৫৫. ঐ, ১৪৪।

৫৬. ঐ।

৫৭. মার্গোলিয়থ, পূ. গ্র., ১৯২।

৫৮. ঐ, ১৯৪।

৫৯. Supra, পৃ. ৭৪৭-৭৫৬।

৬০. মুইর, op. cit., ১২৭।

৬১. প্রাগুক্ত, ১২৮।

৬২. প্রাগুক্ত, টীকা ১।

৬৩. প্রাগুক্ত, ১২৯।

৬৪. প্রাগুক্ত, , ১২৯-১৩০।

৬৫. দ্র. বুখারী, নং ৪৫৬০।

৬৬. মুইর, op. cit., ১২৯।

৬৭. প্রাগুক্ত, ১৩২।

৬৮. প্রাগুক্ত।

৬৯. প্রাগুক্ত, ১৩৩।

৭০. প্রাগুক্ত।

৭১. প্রাগুক্ত, ১৩৬।

৭২. প্রাগুক্ত, ১৩৭-১৩৮।

৭৩. দ্র. Supra, পৃ. ৮৮১-৮৮২।

৭৪. মার্গোলিয়থ, op. cit., ১৮৩।

৭৫. প্রাগুক্ত, ২০৭।

৭৬. প্রাগুক্ত।

৭৭. প্রাগুক্ত, ২১৪।

৭৮. ওয়াট, M. at M., ১৪৫-১৪৬।

৭৯. প্রাগুক্ত, ১৪৬।

৮০. Supra, পৃ. ৭১৭-৭১৮, ৭২৬, ৭৩৫-৭৩৬।

৮১. প্রাগুক্ত, ১৫০।

৮২. মার্গোলিয়থ, op. cit., ১৮৩।

৮৩. দ্র. Supra, ৭৫০-৭৫১।

৮৪. মুইর, op. cit., ১৩১।

৮৫. প্রাগুক্ত, ১৩২।

৮৬. মার্গোলিয়থ, op. cit., ২০৬।

৮৭. ওয়াট, M. at M., ১৫০।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

সূত্র ১ঃ কুরআন ও হাদীছ (অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ)

(ক) আল-কুরআনুল কারীম (আরবী পাঠ)

'আলী ঃ আবদুল্লাহ ইউসুফ, দি হোলি কুরআন, আরবী পাঠ, ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৬ খৃ.), পুনর্মুদ্রণ ইসলামিক ফাউন্ডেশন, লিসেষ্টার ১৯৮৬ খৃ.।

'আলী ঃ মীর আহমদ, দি হোলি কুরআন, মূল পাঠ, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, নিউইয়র্ক ১৯৮৮ খৃ.।

'আলী ঃ মুহাম্মাদ, দি হোলি কুরআন, মূল পাঠ, অনুবাদ ও টীকা, ৭ম সংস্করণ, শিকাগো ১৯৮৫ খৃ.।

আনদালুসী ঃ আল-, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ, আবূ হায়্যান আল-গারনাতী (৬৫৪-৭৫৪ হি.), তাফসীরুল বাহরিল মুহীত, ৮ খণ্ড, বৈরূত, তা. বি.।

আরবেরী ঃ এ. জে., দি কুরআন ইন্টারপ্রেটেড, অক্সফোর্ড ক্লাসিক্স, ১৯৮৮ খৃ.।

বাগাবী ঃ আশ-শাফি'ঈ, আবূ মুহাম্মাদ আল-হুসায়ন ইব্ন মাস'উদ আল-ফাররা (মৃ. ৫১৬ হি.), মা'আলিমুত-তানযীল (তাফসীরুল বাগাবী), ৪ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭ সাল।

বায়দাবী ঃ আল-, আল-কাদী নাসিরুদ্দীন আবূ সা'দ 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমার ইব্ন মুহাম্মাদ আশ-শীরাযী ঃ (মৃ. ৭৯১ হি.), আনওয়ারুত- তানযীল ওয়া আসরারুত-তা'বীল (তাফসীরুল-বায়দাবী), ২ খণ্ড, দারুল-কুতুব আল-ইলমিয়্যা, প্রথম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮ সাল।

ফারীদ ঃ মালিক গুলাম, দি হোলি কুরআন, ইংরেজী অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (আরবী পাঠসহ), প্রথম সংস্করণ, রাবওয়াহ ১৯৬৯ খৃ.।

ফাররা ঃ আল- আবূ যাকারিয়্যা ইয়াহ্ইয়া ইব্ন ইয়াযীদ (মৃ. ২০৭ হি.), মা'আনিল-কুরআন, ৩ খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, বৈরূত, ১৪০৩/১৯৮৩ সাল।

ইব্ন আববাস ঃ 'আবদুল্লাহ, তানবীরুল মিক্'য়াস মিন তাফসীর ইব্ন 'আব্বাস (রা), বৈরূত, তা. বি.।

ইব্ন কাছীর ঃ আবুল ফিদা 'ইসমা'ঈল ইমাদুদ্দীন ইব্ন 'উমার ইব্ন কাছীর ইব্ন দাও' আল-কুরাশী আদ-দিমাশকী, (৭০১-৭৭৪ হি.), তাফসীরুল কুরআনিল কারীম, সম্পা. 'আবদুল 'আযীয গুনায়ম ও অন্যান্য, ৮ খণ্ড, কায়রো তা. বি।

ইব্ন কুতায়বা ঃ আবূ মুহাম্মাদ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুসলিম (২১৩-২৭৬ হি.), তাফসীর গারীবিল-কুরআন, সম্পা. আস-সায়্যিদ আহমাদ আস-সাকর, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮ সাল।

ইসফাহানী ঃ আল-, আবুল কাসিম আল-হাসান ইব্ন মুহাম্মাদ (আর-রাগিব আল-ইসফাহানী নামে পরিচিত, মৃ. ৫০২ হি.), আল-মুফরাদাত ফী গারীবিল কুরআন, বৈরূত তা. বি.।

কারামানী ঃ আল-, মাহমূদ ইব্ন হামযা ইব্ন নাসর (৫ম-৬ষ্ঠ হি. শতক), আসরারুত -তাকরার ফিল-কুরআন (আল-বুরহান ফী তাওজীহি মুতাশাবিহিল কুরআন লিমা ফীহি মিনাল-হুজ্জাত ওয়াল- বায়ান), সম্পা. 'আবদুল কাদির আহমাদ 'আতা, শিবরা (মিসর), তা. বি.।

খাযিন ঃ আল-, 'আলাউদ-দীন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন ইবরাহীম আল-বাগদাদী (মৃ. ৭২৫ হি.), লুবাবুত-তা'বীল ফী মা'আনিত তানযীল (তাফসীরুল-খাযিন), ৪ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, কায়রো, ১৩৭৫/১৯৫৫ সাল।

মাওয়ারদী ঃ -আল-, আবুল-হাসান 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ হাবীব (৩৬৪-৪৫০ হি.) , আন-নুকাত ওয়াল-'উয়ূন (তাফসীরুল মাওয়ারদী), সম্পা. 'আবদুল মাকসূদ ইব্ন আবদুর রাহমান, ৬ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত, ১৪১২/১৯৯২ সাল।

মুহাসিবী ঃ আল-হারিছ ইব্ন আসাদ (১৬৫-২৪৩ হি.), আল-'আক্ল ওয়া ফাহমুল-কুরআন ওয়া মা'আনীহি, সম্পা. আল-হুসায়ন আল-কাওওয়াতলী, দারুল-ফিকর (বৈরূত), ১ম মুদ্রণ, ১৩৯১/১৯৭১ সাল।

কুরতুবী ঃ আল-' আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবী বাক্র আল-আনদালুসী (মৃ. ৬৭১ হি.), আল-জামি' লিআহ্কামিল-কুরআনিল কারীম, ২২ খণ্ড, বৈরূত ১৯৬৫ খৃ.।

রাযী ঃ আল-, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'উমার (আল-ফাখরুর-রাযী, ৫৪৪-৬০৪ হি.), মাফাতীহুল-গায়ব (আত-তাফসীরুল-কাবীর), ১২ খণ্ড, দারুল-ফিকর (বৈরূত), ১ম মুদ্রণ ১৪০১/১৯৮১ সাল।

শাওকানী ঃ আল-, মুহাম্মাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন মুহাম্মাদ (মৃ. ১২৫০ হি.) , ফাতহুল কাদীর আল- জামি' বায়না ফান্নায়র-রিওয়ায়াত ওয়াদ-দিরায়াত মিন 'ইলমিত তাফসীর, ৫ খণ্ড, বৈরূত ১৪০৯/১৯৮৯ সাল।

সুয়ূতী ঃ আল-, 'আবদুর রাহমান জালালুদ-দীন (মৃ. ৯১১ হি.), আদ-দুররুল-মানছুর ফি'ত-তাফসীরিল-মা'ছূর, ৮ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮৩ খৃ.।

তাবারী ঃ আল-, 'আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর (মৃ. ৩১০ হি.), জামি'উল-বায়ান আত-তা'বীলি আয়িল-কুরআন, ১৫ খণ্ড, দারুল-ফিকর, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮ সাল।

যাজ্জাজ ঃ আল-, আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইব্নুস সাররী (মৃ. ৩১১ হি.), মা'আনিল-কুরআন ওয়া ই'রাবুহূ, ৫ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮ সাল।

যামাখশারী ঃ আল-, আল-খাওয়ারিযমী, আবুল কাসিম জারুল্লাহ মাহমূদ ইব্ন 'উমার (৪৬৭-৫৩৮ হি.), আল-কাশশাফ 'আন হাকাইকিত-তানযীল ওয়া 'উয়ূনিল-আকাবীল ফী উজূহিত তা'বীল, ৪খণ্ড, বৈরূত, তা. বি.।

(খ) হাদীছ ও গ্রন্থাবলী ইহার ভাষ্য

আবূ দাঊদ ঃ সুনান, সুলায়মান ইব্নুল আশ'আছ ইব্ন ইসহাক আল- আযদী আস-সিজিসতানী (২০২-২৭৫ হি.), সুনান আবী দাঊদ, শায়খ আহমাদ সা'দ আলী-এর টীকাসহ, ২ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৪০৩/১৯৮৩ সাল।

'আওনুল-মা'বূদ শারহ সুনান আবী দাঊদ ঃ আবুত-তায়্যিব মুহাম্মাদ শামসুদ-দীন আল-'আজীমাবাদীকৃত, ১৪ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, মদীনা মুনাওওয়ারা ১৩৮৮/১৯৬৮ সাল।

বাযলুল মাজহূদ ফী হাল্লি আবী দাঊদ ঃ শায়খ খালীল আহমাদ আস-সাহারানপুরীকৃত (মৃ. ১৩৪৬ হি.), ২০ ভাগ, ১০ খণ্ডে, বৈরূত, তা. বি.।

বায়হাকী ঃ আল-, আবূ বাক্র আহমাদ ইব্নুল-হুসায়ন ইব্ন 'আলী (৩৮৪-৪৫৭ হি.), আস-সুনানুল-কুবরা (আলাউদ-দীন ইব্ন 'আলী ইব্ন 'উছমান আল-মারদীনী, আলিয়াস ইব্নুত-তুরকমানী, মৃ. ৭৪৫ হি. কৃত আল-জাওহারুন নাকীসহ), ইউসুফ 'আবদুর রহমান আল-মার'আশীকৃত, নির্ঘণ্টসহ, ১০ খণ্ড, দারুল মা'রিফা, বৈরূত, তা. বি.।

বুখারী ঃ আল-, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল (১৯৪-২৫৬ হি.), সাহীহ আল-বুখারী, দারুল কুতুব আল-ইসলামিয়্যা, ৪ খণ্ড, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২ সাল।

ফাতহুল বারী বিশারহি সাহীহিল বুখারী ঃ আহমাদ ইব্ন 'আলী ইব্ন হাজার আল-'আসকালানী কৃত, সম্পা. শায়খ 'আবদুল 'আযীয 'আবদুল্লাহ ইব্ন বায, ১৩ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৪০১ হি.।

দারা কুতনী ঃ আল-, 'আলী ইব্ন 'উমার (৩০৬-৩৮৫ হি.), সুনানুদ-দারা কুতনী, ৪ ভাগ, ২ খণ্ডে, ৪র্থ মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সাল।

দারিমী ঃ আল-, আস-সামারকানদী, 'আবদুল্লাহ ইব্ন আবদির রাহমান (১৮১-২৫৫ হি.), সুনানুদ দারিমী, সম্পা. ফাওয়ায আহমাদ যামরালী ও খালিদ আস-সাব আল- 'আলামী, ২ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৭/১৯৮৭ সাল।

হাকেম, আল-, আন-নায়সাবুরী, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন মুহাম্মাদ (৩২১–৪০৫ হি.), আল-মুসতাদরাক 'আলাস-সাহীহায়ন, ৩ খণ্ড, তা. বি.।

ইব্ন হাম্বাল ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ (১৬৪-২৪১ হি.), মুসনাদুল ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল ওয়া বি-হামিশিহি মুনতাখাবু কানযুল-'উম্মাল, ৬ খণ্ড, পুরাতন মুদ্রণ, তা. বি.।

— আল-মুসনাদ লিল-ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল, সম্পা. আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ২০ ভাগ, ১০ খণ্ডে (অসম্পূর্ণ), ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৩৬৮/১৯৪৯ সাল।

— আল-ফাতহুর-রব্বানী লি-তারতীবি মুসনাদ আল-ইমাম আহমাদ ইব্ন হাম্বাল আশ-শায়বানী, ওয়া মা'আহু কিতাব বুলূগুল আমানী মিন আসরারিল-ফাতহির-রাব্বানী, সম্পা. আহমাদ 'আবদুর রহমান আল- বান্না, ২৪ ভাগ, ১২ খণ্ডে, ২য় মুদ্রণ, কায়রো তা. বি.।

ইব্ন মাজা ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-কাযবীনী (২০৭-২৭৫ হি.), সুনান ইব্ন মাজা, সম্পা. মুহাম্মাদ ফুআদ আবদুল বাকী, ২ খণ্ড, কায়রো তা. বি.।

— সাহীহ সুনান ইব্ন মাজা, সম্পা. মুহাম্মাদ নাসিরুদ-দীন আল-আলবানী, ২ খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, রিয়াদ-বৈরূত ১৪০৮/ ১৯৮৮ সাল।

— যা'ঈফ সুনান ইব্ন মাজা, সম্পা. মুহাম্মাদ নাসিরুদ-দীন আল-আলবানী, ১ম মুদ্রণ, রিয়াদ-বৈরূত ১৪০৮/১৯৮৮ সাল।

ইব্ন খুযায়মা ঃ আবূ বাক্র মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক আস-সুলামী, আন-নায়সাবূরী (২২৩-৩১১ হি.), সাহীহ ইব্ন খুযায়মা, সম্পা. মুহাম্মাদ মুসতাফা আল-আ'জামী, ৪ খণ্ড, রিয়াদ ১৪০১/ ১৯৮১ সাল।

মালিক ঃ আবূ 'আবদিল্লাহ মালিক ইব্ন আনাস ইব্ন মালিক আল-আসবাহী (৯৩-১৭৯ হি.), আল- মুওয়াত্তা, সম্পা. মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদুল বাকী, বৈরূত, তা. বি.।

মুসলিম ঃ আন-নায়সাবূরী, আবুল-হুসায়ন মুসলিম ইব্নুল হাজ্জাজ আল-কুশায়রী আন-নায়সাবূরী (২০৬–২৬১), সাহীহ মুসলিম, সম্পা. মুহাম্মাদ ফুআদ 'আবদুল-বাকী, ৫ খণ্ড, ইস্তাম্বুল তা. বি.।

— সাহীহ মুসলিম বিশারহিন-নাওয়াবী, ১৮ ভাগ, ৯ খণ্ডে, কায়রো তা. বি.।

নাসাঈ ঃ আল-, আবূ 'আবদির রহমান আহমাদ ইব্ন শু'আয়ব ইব্ন 'আলী (২১৫–৩০৩ হি.), কিতাবু সুনানিল কুবরা, সম্পা. মুহাম্মাদ হাবীবুল্লাহ আমীরুদ-দীন আল-আতহারী, ৩ খণ্ড, বোম্বাই ১৪০৫/ ১৯৮৫ সাল।

— সুনান আন-নাসাঈ বিশারহিল- হাফিজ জালালুদ-দীন আস-সুয়ূতী ওয়া হাশিয়াতুল ইমাম আস-সিনদী, সম্পা. 'আবদুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দাহ, ৮ ভাগ, ৪ খণ্ডে, নির্ঘন্ট, ৫ খণ্ডসহ, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সাল।

— সাহীহ সুনানুন- নাসাঈ, সম্পা. মুহাম্মাদ নাসিরুদ-দীন আল-আলবানী, ২ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, রিয়াদ / বৈরূত ১৪০৮/ ১৯৮৮ সাল।

তায়ালিসী ঃ আল-, সুলায়মান ইব্‌ন দাউদ ইব্‌নুল জারূদ আবূ দাউদ (১৩৩–২০৪ হি.), মুসনাদ আবূ দাউদ আত-তায়ালিসী, বৈরূত, তা. বি.।

তিরমিযী ঃ আল-, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'ঈসা ইব্‌ন সাওরা (২০৯–২৭৯ হি.), আল-জামে' আস-সাহীহ ওয়াহুয়া সুনান আত-তিরমিযী, সম্পা. আহমাদ মুহাম্মাদ শাকির, ৪ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৩৯৮/১৯৭৭ সাল।

— তুহফাতুল আহ্‌ওয়াযী বিশারহি জামে' আত-তিরমিযী, আবূ'আলা মুহাম্মাদ 'আবদুর রাহমান ইব্‌ন 'আবদির রাহীম আল-মুবারাকপুরী (১২৮৩-১৩৫৩ হি.) কৃত, ১০ খণ্ড, কায়রো (১৩৮৪ হি.)।

— শারহ ইলালিত তিরমিযী, ইব্‌ন রাজাব আল-হাম্বালী (৭৩৬– ৭৯৫ হি.) কৃত, সম্পা. হাম্মাম 'আবদুর-রাহীম সা'ইব, ২ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, আয-যারকা. জর্ডান ১৪০৭/১৯৮৭ সাল।

সূত্র ২ঃ প্রাচীন সীরাত ও সহায়ক রচনাবলী

আবুল-ফিদা ঃ 'ইমাদুদ-দীন (মৃ. ৭৩২ হি.), কিতাবুল মুখতাসার ফী আখবারিল বাশার, ২ খণ্ড, বৈরূত তা. বি.।

আনদালুসী ঃ আল-, আবূ মুহাম্মাদ 'আলী ইব্‌ন আহমাদ ইব্‌ন সা'দ ইব্‌ন হায্‌ম (মৃ. ৪৫৬ হি.), জাওয়ামি'উস-সীরাতিন নাবাবিয়্যা, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮৩ সাল।

— জামহারাতু আনসাবিল-'আরাব, ২ খণ্ড একসঙ্গে বাঁধাইকৃত, বৈরূত ১৪০৩/১৯৮৩ সাল।

'আকীলী ঃ আল-, আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন মূসা ইব্‌ন হাম্মাদ, কিতাবুদ-দু'আফা আল-কাবীর, সম্পা. আবদুল মুতী' আমীন কাল'আজী, ৪ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৪ হি.।

'আসকালানী ঃ আল-, শিহাবুদ-দীন আবুল ফাদল আহমাদ ইব্‌ন 'আলী ইব্‌ন হাজার (মৃ. ৮৫২ হি.), আল-ইসাবা ফী তাময়ীযিস-সাহাবা, পার্শ্বটীকায় ইব্‌ন 'আবদিল- বারকৃত আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব-সহ), ৪ খণ্ড, মিসর, সংস্করণ ১৩২৮ হি., পুনর্মুদ্রণ, বৈরূত তা. বি.।

— তাহযীবুত তাহযীব, ১২ খণ্ড, হায়দরাবাদ ১৩২৬ হি.।

— লিসানুল-মীযান, ৮ খণ্ড, ৩য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সাল।

— হাদ্য়ী আস-সারী মুকাদ্দামাত ফাতহুল-বারী, বৈরূত তা. বি.।

আযরাক ঃ, আল-, আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আহমাদ (মৃ. ২৫০ হি.), আখবার মাক্কা ওয়ামা জাআ ফীহা মিনাল-আছার, সম্পা. রুশদী আস-সালিহ মুলহিস, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯ সাল।

বাগদাদী ঃ আল-, আবূ বাক্র আহমাদ ইব্ন 'আলী আল-খাতীব (৩৯২-৪৬৩ হি.), তারীখ বাগদাদ, ১২ খণ্ড, মদীনা মুনাওওয়ারা, তা. বি.।

বাগদাদী ঃ আল-, মুহাম্মাদ ইব্ন হাবীব (মৃ. ২৪৫ হি.), কিতাবুল মুনাম্মাক ফী আখবার কু'রায়শ, সম্পা. খুরশীদ আহমাদ ফারিক', ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৫ সাল।

বালাযুরী ঃ আল-, আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া ইব্ন জাবির আল-বাগদাদী (মৃ. ২৭৯ হি.), ফুতূহুল-বুলদান, সম্পা. আবদুল্লাহ আনীস আত-তাব্বা ও 'উমার আনীস আত-তাব্বা, বৈরূত ১৪০৭/ ১৯৮৭ সাল।

— আনাসাবুল-আশরাফ, সম্পা. মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ, দারুল-মা'আরিফ, মিসর ১৯৫৯ খৃ.।

বায়হাকী ঃ আল-, আবূ বাক্র আহমাদ ইবনুল হুসায়ন (৩৮৪-৪৫৮ হি.), দালাইলুন-নবূওয়া ওয়া মা'রিফাতি আহ্ওয়ালি সাহিবিশ-শারী'আ, সম্পা. ড. 'আবদুল মুতী' কাল'আজী, ৭ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮৫/ ১৪০৫ সাল।

বুখারী ঃ আল-, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন ইসমা'ঈল (১৯৪-২৫৬ হি.), আত-তা'রীখুল কাবীর, সম্পা. 'আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মা'লামী, ৬ খণ্ড, তা. বি.।

যাহাবী ঃ আল-, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন আহমাদ ইব্ন 'উছমান (মৃ. ৭৪৮ হি.), তারীখুল ইসলাম (আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা), সম্পা. ডঃ 'উমার 'আবদুস সালাম তাদমূরী, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৭ হি.।

— সিয়ারু আ'লামিন- নুবালা, সম্পা. শু'আয়ব আল-আরনাউত ও অন্যান্য, ২৫ খণ্ড, ৮ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪১২/১৯৯২ সাল।

— মীযানুল ই'তিদাল ফী নাকদির রিজাল, সম্পা. 'আলী মুহাম্মাদ আল-বাজাবী, ৪ খণ্ড, বৈরূত, তা. বি.।

— তাযকিরাতুল- হুফফাজ, সম্পা. 'আবদুর রহমান ইব্ন ইয়াহ্ইয়া আল-মা'লামী, ৩ খণ্ড, মক্কা ১৩৭৪ হি.।

— আল- মুগনী ফিদ-দু'আফা, সম্পা. নূরুদ-দীন 'আতীর, ২ খণ্ড, তা. বি.।

দিয়ারবাক্রী ঃ আল-, হুসায়ন মুহাম্মাদ ইব্নুল হাসান (মৃ. ৯৬৬ হি.), তারীখুল-খামীস ফী আহওয়ালি আনফাসি নাফীস, বৈরূত, তা. বি.।

হাকেম ঃ আল-, আন-নায়সাবূরী, আল-হাকেম আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ (মৃ. ৪০৫ হি.) , কিতাব মা'রিফাতি 'উলূমিল হাদীছ, সম্পা. সায়্যিদ মু'আজজাম হুসায়ন, ২য় মুদ্রণ, মদীনা মুনাওওয়ারা ১৩৯৭/১৯৭৭ সাল।

হালাবী ঃ আল-, 'আলী ইব্ন বুরহানুদ-দীন (৯৭৫-১০৪৪ হি.), ইনসানুল 'উয়ূন ফী সীরাতিল- আমীন ওয়াল-মা'মূন (আস-সীরাতুল হালাবিয়্যা), ৩ খণ্ড, বৈরূত ১৪০০/ ১৯৮০ সাল।

হায়ছামী ঃ আল-, আবূ বাক্র নূরুদ-দীন 'আলী ইব্ন আবী বাক্র ইব্ন সুলায়মান (মৃ. ৮০৭ হি.), মাজমা'উয-যাওয়াইদ ওয়া মামবা'উল-ফাওয়াইদ, ৩ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৩৮৭/১৯৬৭ সাল।

ইব্ন 'আবদিল বারর ঃ আবূ 'উমার ইউসুফ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আন-নামরী (৩৬৮–৪৬৩ হি.), আদ-দুরার ফী ইখতিসারিল মাগাযী ওয়াস- সিয়ার, সম্পা. শাওকী দায়ফ, কায়রো ১৩৮৬/১৯৬৬ সাল।

— আল-ইসতী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব, সম্পা. 'আল-মুহাম্মাদ আল-বাজাবী, ৪খণ্ড, কায়রো তা. বি.।

ইব্ন 'আসাকির ঃ আবুল কাসিম 'আলী ইব্নুল হাসান ইব্ন্ হিবাতুল্লাহ ইব্ন 'আবদিল্লাহ আশ-শাফি'ঈ (৪৯৯–৫৭১ হি.), তারীখ মাদীনাতি দিমাশ্ক (সীরাতুন নাবাবিয়্যা), সম্পা. নাশাত গাযযাবী, দামিশক, তা. বি.।

ইব্নুল আছীর ঃ 'ইযযুদ-দীন আবুল হাসান 'আলী ইব্ন আবিল- কারাম মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল- জাযারী (৫৫৫-৬৩০ হি.), আল-কামিল ফিত- তা'রীখ, ১০ খণ্ড, বৈরূত ১৩৮৭ হি.।

— উসদুল গাবা ফী মা'রিফাতিস-সাহাবা, ৪ খণ্ড, বৈরূত, তা. বি.।

ইব্ন হায্ম ঃ দ্র. আল-আনদালুসী।

ইব্ন হিব্বান ঃ আবূ হাতিম মুহাম্মাদ ইব্ন হিব্বান ইব্ন আহমাদ আল-বুসতী (মৃ. ৩৫৪ হি.), আস-সীরাতুন- নাবাবিয়্যা ওয়া আখবারুল-খুলাফা, সম্পা. আস- সায়্যিদ আযীয বেক ও অন্যান্য, বৈরূত ১৪০৭ হি.।

— কিতাবুল মাজরূহীন মিনাল-মুহাদ্দিছীন ওয়াদ-দু'আফা ওয়াল-মাতরূকীন, সম্পা. মুহাম্মাদ ইবরাহীম যায়দ, ১-৩ খণ্ড একত্রে বাঁধাইকৃত, ১ম মুদ্রণ, আলেপ্পো ১৩৯৬ হি.।

ইব্‌ন হিশাম ঃ আবূ মুহাম্মাদ আবদুল মালিক (মৃ. ২১৩/২১৮ হি.), আস-সীরাতুন- নাবাবিয়্যা, সম্পা. মুসতাফা আস-সাক্‌কা ও অন্যান্য , ২ খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, কায়রো ১৩৭৫/১৯৫৫ সাল।

ইব্‌ন ইসহাক ঃ মুহাম্মাদ আল-মাতলাবী (মৃ. ১৫১ হি.). কিতাবুস সিয়ার ওয়াল-মাগাযী, সম্পা. ড. সুহায়ল যাক্‌কার, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৩৯৮/ ১৯৭৮ সাল।

ইব্‌নুল জাওযী ঃ আবুল ফারাজ 'আবদুর রহমান 'আলী ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন 'আলী (৫১০-৫৯৭ হি.), তালকীহু ফুহূমি আহলিল-আছার ফী 'উয়ূনিত-তাওয়ারীখ ওয়াস-সিয়ার, গুজরানওয়ালা, তা. বি.।

— আল-ওয়াফা বিআহওয়ালিল মুসতাফা, সম্পা. মুসতাফা 'আবদুল কাদির 'আতা, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৮/ ১৯৮৮ সাল।

ইব্‌নুল কালবী ঃ কিতাবুল আসনাম, সম্পা. আহমাদ যাকী, কায়রো ১৩৮৪ হি.

ইব্‌ন কাছীর ঃ আবুল ফিদা ইসমাঈল (৭০১-৭০৪ হি.), আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, ১৪ ভাগ ৭ খণ্ডে. বৈরূত, তা. বি.।

— আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা, ৪ খণ্ড, বৈরূত ১৩৯৬ হি.।

— শামাইলুর-রাসূল ﷺ, সম্পা. ডঃ মুসতাফা আবদুল ওয়াহীদ, ২য় মুদ্রণ, জেদ্দা-বৈরূত ১৪০৯/১৯৮৮ সাল।

— আল-ফুসূল ফী সীরাতির রাসূল, সম্পা. মুহাম্মাদ ঈদ আল-কাতরাবী ও মুহ্‌য়িদ দীন মুসতাও, বৈরূত ১৪০৫ হি.।

ইব্‌ন খালদূন ঃ 'আবদুর রহমান ইব্‌ন মুহাম্মাদ (মৃ. ৮০৮ হি.), তারীখ ইব্‌ন খালদূন, ২য় ও ৩য় খণ্ড।

ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ আবুল 'আব্বাস শামসুদ-দীন আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র (৬০৮–৬৮১ হি.), ওয়াফায়াতুল আ'য়ান ওয়া আনবাউয-যামান, সম্পা. ইহ্‌সান 'আব্বাস, ৭ খণ্ড, তা. বি।

ইব্‌ন কায়্যিম আল-জাওযিয়্যা ঃ শামসুদ-দীন আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবী বাক্‌র আয-যার'ঈ আদ-দিমাশকী (৬৯১-৭৫১ হি.), যাদুল মা'আদ ফী হাদয়ি খায়রিল 'ইবাদ, ৫ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৩৯৯/১৯৭৯ সাল।

ইব্‌ন কুতায়বা ঃ আবূ মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুসলিম আদ-দীনাওয়ারী (২১৩–২৭৬ হি.), আল-মা'আরিফ, বৈরূত ১৩৯০ হি.।

ইব্ন সা'দ মুহাম্মাদ ইব্ন সা'দ ইব্ন মানী' আবূ 'আবদিল্লাহ (১৬৮–২৩০ হি.), আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ খণ্ড, বৈরূত, তা. বি.।

ইব্ন সায়্যিদিন-নাস ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (৬৭১–৭৩৪ হি.), 'উয়ূনুল আছার ফী ফুনূনিল মাগাযী ওয়াশ-শামাইল ওয়াস-সিয়ার (আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা), বৈরূত ১৪০৬ হি.।

ইব্ন তায়মিয়্যা ঃ তাকিয়্যুদ-দীন আবুল 'আব্বাস আহমাদ ইব্ন 'আবদিল হালীম আল-হাররানী আদ-দিমাশকী (৬৬১–৭২৮ হি.), আস-সারিমুল-মাসলূল 'আলা শাতিমির-রাসূল, সম্পা. এম. মুহ্য়িদ-দীন আবদুল হামীদ, ১ম মুদ্রণ, ১৩৭৯ হি.।

— মাজমূ'আ ফাতাওয়া ইব্ন তায়মিয়্যা, ৩৬ খণ্ড।

ইব্ন যুবালাহ ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন হাসান (মৃ. ১৯৯ হি.), মুনতাখাব মিন কিতাবি আযওয়াজিন-নাবিয়্যি ﷺ রিওয়ায়াতুয-যুবায়র ইব্ন বাক্কার (মৃ. ২৫৬ হি.), সম্পা. ড. আকরাম দিয়া আল-'উমারী, ১ম মুদ্রণ, মদীনা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ১৪০১/১৯৮১ সাল।

ইব্নুয-যুবায়র ঃ 'উরওয়া (মৃ. ৯৪ হি.), মাগাযী রাসূলিল্লাহ ﷺ, সম্পা. মুহাম্মাদ মুসতাফা আল-'আজামী, রিয়াদ ১৪০৬/ ১৯৮৬ সাল।

ইসফাহানী ঃ আল-, আবূ নু'আয়ম আহমাদ ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন মূসা ইব্ন মাহরানী (মৃ. ৪৩০ হি.), দালাইলুন নুবুওয়া, সম্পা. ডঃ মুহাম্মাদ রাওওয়াস কাল'আজী ও 'আবদুল-বারর 'আব্বাস, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৬/১৯৮৬ সাল।

মাকরীযী ঃ আল-, তাকিয়্যুদ-দীন আহমাদ ইব্ন 'আলী , ইমতা'উল আসমা বিমা লির-রাসূল মিনাল- আন্বা ওয়াল-আমওয়াল ওয়াল-হাফাদাতা ওয়াল-মূতা', ১ খণ্ড, সম্পা. মাহমূদ মুহাম্মাদ শাকির, ২য় মুদ্রণ, কাতার, তা. বি.।

কারী, আল-, মুল্লা 'আলী ঃ নূরুদ-দীন আলী ইব্ন মুহাম্মাদ ইব্ন সুলতান, শারহুশ-শিফা ফী শামাইলি সাহিবিল ইসতিফা সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সম্পা. হুসায়ন মুহাম্মাদ মাখলূফ, ৫ খণ্ড, কায়রো ১৩৯৮ হি.।

— আল-আসরারুল- মারফু'আ ফী আখবারি মাওদু'আতিল কুবরা, সম্পা. মুহাম্মাদ ইব্ন লুতফী আস-সাব্বাক, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৬/ ১৯৮৬ সাল।

কাসতাল্লানী, ঃ আল-, আবুল 'আব্বাস শিহাবুদ-দীন আহমাদ ইব্ন মুহাম্মাদ আল-খাতীব (৮৫১– ৯২৩ হি.), আল-মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা, বৈরূত, তা. বি.।

সালিহী ঃ আল-, মুহাম্মাদ ইব্ন ইউসুফ (মৃ. ৯৪২ হি.), সুবুলুল হুদা ওয়ার-রাশাদ ফী সীরাতি খায়রিল 'ইবাদ, ৭ খণ্ড, কায়রো তা. বি.।

সুহায়লী ঃ আল-, আবুল কাসিম 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আবদিল্লাহ ইব্ন আহমাদ ইব্ন আবিল-হাসান আল-খাছ'আমী (৫০৮–৫৮১ হি.), আর-রাওদুল উনুফ ফী তাফসীর সীরাতিন-নাবাবিয়্যা লি- ইব্ন হিশাম, সম্পা. তা-হা 'আবদুর রাউফ সা'ঈদ, ৪ খণ্ড, বৈরূত ১৩৯৮/১৯৭৮।

সুয়ূতী ঃ আল-, জালালুদ-দীন 'আবদুর রহমান ইব্ন আবী বাক্‌র ইব্ন মুহাম্মাদ (৮৪৯–৯১১ হি.), আল-খাসাইসুল-কুবরা, ২ খণ্ড, বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৫ সাল।

তাবারী ঃ আল-, আবূ জা'ফার মুহাম্মাদ ইব্ন জারীর (২২৪–৩১০ হি.), তারীখুর-রুসুল ওয়াল-মুলূক, সম্পা., মুহাম্মাদ আবুল-ফাদল ইবরাহীম, ১ম ও ২য় খণ্ড, কায়রো ১৯৮৭ খৃ.।

তিরমিযী ঃ আল-, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ ইব্ন 'ঈসা ইব্ন সাওরা (২০৯–২৭৯ হি.) , আওসাফুর রাসূল, সম্পা. সামিহ 'আব্বাস, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৫/১৯৮৫ সাল।

ওয়াহিদী ঃ আল-, আবুল হাসান 'আলী ইব্ন আহমাদ আন-নায়সাবূরী (মৃ. ৪৬৮ হি.), আসবাবুন-নুযূল, সম্পা. 'ইসাম 'আবদুল-মুহসিন আল-জামিদান, ১ম মুদ্রণ, দামিশক ১৪১১/১৯৯১ সাল।

ইয়া'কূবী ঃ আল-, আহমাদ ইব্ন আবী ইয়া'কূব ইব্ন জা'ফার ইব্ন ওয়াহ্‌ব ইব্ন ওয়াদীহ (২৮২/২৯২ হি.), তারীখুল ইয়া'কূবী, ২ খণ্ড, বৈরূত ১৩৭৯ হি.।

যুহ্‌রী ঃ আল-, মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'উবায়দিল্লাহ ইব্ন শিহাব (৫১–১২৪ হি.), আল-মাগাযী আন-নাবাবিয়্যা, সম্পা. ডঃ সুহায়ল যাক্কার, দামিশক ১৪০১/১৯৮১ সাল।

যুরকানী ঃ আল-, আবূ 'আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ ইব্ন মুসলিম ইব্ন 'আবদিল বাকী আল-মালিকী (১০৫৫-১১২২ হি.), শারহ মাওয়াহিবুল-লাদুন্নিয়্যা লিল-কাসতাল্লানী, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৩৯৩ হি.।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রসমূহ

১ ঃ আরবী ভাষায়

আবদুল হামীদ ঃ 'আলী ইব্ন হাসান ইব্ন 'আলী, দালাইলুত-তাহ্কীক লি-ইবতালি কিস্‌সাতিল-গারানীক ঃ রিওয়ায়া ও দিরায়া, জেদ্দা ১৪১২/ ১৯৯২ সাল।

'আবদুন-নাজির মুহসিন ঃ দিরাসাত গোল্ডযিহার ফিস-সুন্না ওয়া মাকানাতুহাল-'ইলমিয়্যা, পি.এইচ. ডি. থিসিস, তিউনিস ইউনিভার্সিটি ১৪০৪/ ১৯৮৪ সাল।

আবদুল ওয়াহ্‌হাব ঃ শায়খ মুহাম্মাদ ইব্ন মুখতাসার সীরাতু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম, সম্পা. মুহাম্মাদ হামীদ আল-ফাকী, মদীনা মুনাওওয়ারা ১৪০৮ হি.।

আবূ শাহবা ঃ মুহাম্মাদ ইব্ন মুহাম্মাদ, আস-সীরাতুন নাবাবিয়্যা ফী দাও'ইল কুরআন ওয়াস-সুন্না, ২ খণ্ড, দামিশ্ক/ বৈরূত ১৪০৯/ ১৯৮৮ সাল।

— দিফা' 'আনিস–সুন্না ওয়া রাদদি শুবাহিল-মুসতাশরিকীন ওয়াল-কুত্তাবিল- মু'আসিরীন, রিয়াদ ১৪০৭/ ১৯৮৭।

— আল-ইসরা'ঈলিয়াত ওয়াল-মাওদূ'আত ফী কুতুবিত-তাফসীর, ৪র্থ মুদ্রণ, কায়রো ১৪০৮ হি.।

আহমাদ ঃ হানাফী, আত-তাফসীরুল 'ইলমী লিআয়াতিল কাওনিয়্যা ফিল-কুরআন, দারুল-মা'আরিফ, কায়রো তা. বি.।

আহমাদ ঃ ড. মাহদী রিযকুল্লাহ, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা ফী দাও'ইল- মাসাদিরিল আসলিয়্যা, ১ম মুদ্রণ, রিয়াদ ১৪১২/১৯৯২ সাল।

'আলী ঃ আহমাদ ইব্ন হাজার আল-, ইব্ন, আর-রাদ্দুশ-শাফী আল-ওয়াফির 'আলা মান নাফা উম্মিয়্যাতা সায়্যিদিল আওয়াইল ওয়াল-আওয়াখির, ২য় মুদ্রণ, কাতার ১৩৯৯/ ১৯৭৮ সাল।

'আলী ঃ জাওয়াদ, তারীখুল-'আরাব ফিল-ইসলাম, ১ম ভাগ (আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা), বাগদাদ ১৯৬১ খৃ.।

'আমিরী ঃ আল-আহমাদ আল-বারক, ইবরাহীম আলায়হিস-সালাম ওয়া দাওয়াতুহু ফিল-কুরআনিল কারীম, ১ম মুদ্রণ, জেদ্দা ১৪০৬/১৯৮৬ সাল।

'আমিরী ঃ আল-, মুহাম্মাদ আল-ওয়াফা, আল- ইশারাতুল 'ইলমিয়্যা ফিল-কুরআনিল কারীম, ২য় মুদ্রণ (স্থানের নামবিহীন), ১৪০১ হি.।

অ্যারাব ব্যুরো অব এডুকেশন ফর দ্যা গালফ স্টেটস ঃ মানাহিজুল মুসতাশরিকীন ফিদ-দিরাসাতিল 'আরাবিয়্যা আল- ইসলামিয়্যা, ২ খণ্ড, রিয়াদ ১৪০৫/১৯৮৫ সাল।

'আরজূন ঃ মুহাম্মাদ আস-সাদিক ইবরাহীম, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ ﷺ, ৪ খণ্ড, ১ম মুদ্রণ, দামিশ্ক ১৪০৫/ ১৯৮৫ সাল।

'আতার ঃ ডঃ হাসান যিয়াউদ-দীন, নবূওয়াতু মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ফিল-কুরআন, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৪১০/১৯৯০ সাল।

'আতওয়ান ঃ ড. হুসায়ন, রিওয়ায়াতুশ-শামিয়্যীন লিল-মাগাযী ওয়াস-সিয়ার ফিল-কারনায়নিল-আওওয়াল ওয়াছ-ছানী আল- হিজরিয়্যায়ন, বৈরূত ১৯৮৬ খৃ.।

বাদাবী ঃ ডঃ 'আবদুর রহমান, মাওসূ'আতুল-মুসতাশরিকীন, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৯৮৯ খৃ.।

বুহূছ ঃ আল-, ওয়াদ-দিরাসাতুল-মুকাদ্দামা লিল-মু'তামারিল 'আলামী আছ-ছালিছ লিস-সীরাতিন নাবাবিয়্যা, ৭ খণ্ড, দোহা, কাতার ১৪০০ হি.।

দারওয়াযাহ ঃ মুহাম্মাদ 'ইযযাত, সীরাতু রাসূলিল্লাহ সূরা মুকতাবাসা মিনাল-কুরআনিল কারীম, ২ খণ্ড, বৈরূত, তা. বি. (১৯৮০?)।

গাযালী ঃ আল-, মুহাম্মাদ, ফিকহুস-সীরা, ৭ম মুদ্রণ, কায়রো ১৯৭৬ খৃ.।

হামাদা ঃ ডঃ ফারূক, মাসাদিরুস-সীরাতিন নাবাবিয়্যা ওয়া তাকবীমুহা, ১ম মুদ্রণ, দারুল-বায়দা, ১৪০০/ ১৯৮০ সাল।

হামাদান ঃ নাযীর, আর-রাসূল ﷺ ফী কিতাবাতিল মুসতাশরিকীন, ২য় মুদ্রণ, জেদ্দা ১৪০৬/ ১৯৮৭ সাল।

হামীদুল্লাহ ঃ মুহাম্মাদ (সম্পা.), মাজমূ'আতুল ওয়াছাইকিস সিয়াসিয়্যা লিল-'আহদিন-নাবাবিয়্যা ওয়াল-খিলাফাতির রাশিদা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৭/ ১৯৮৭ সাল।

জাবারী ঃ আল-, 'আবদুল-মুতা'আল, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা ওয়া আওহামুল-মুসতাশরিকীন, ১ম মুদ্রণ, কায়রো ১৪০৮/ ১৯৮৮।

জামালঃ আহমাদ মুহাম্মাদ, মুফতারায়াত 'আলাল-ইসলাম, ৩য় মুদ্রণ (স্থান নামবিহীন), ১৩৯৫/ ১৯৭৫ সাল।

খালীল ঃ 'ইমাদুদ-দীন, দিরাসাত ফিস-সীরা, বৈরূত ১৩৯৭/১৯৭৭ সাল।

লুকমান ঃ আস-সালাফী, ড. মুহাম্মাদ, ইহ্তিমামুল মুহাদ্দিছীন বিনাকদিল হাদীছ সানাদান ওয়া মাতানান ওয়াদাহ্দ মাযা'ইমিল-মুসতাশরিকীন ওয়া আতবা'ইহিম, ১ম মুদ্রণ, রিয়াদ ১৪০৮/ ১৯৮৮ সাল।

মাহরান ঃ ড. মুহাম্মাদ বায়্যূমী, দিরাসাত তা'রীখিয়্যা মিনাল কুরআনিল কারীম, রিয়াদ ১৪০০/ ১৯৮০ সাল।

মাস'উদ ঃ জামালুদ-দীন ও জুম'আ, ওয়াফা মুহাম্মাদ রিফা, আখতা' ইয়াজিবু 'আন তুসাহ্হাহা ফিত-তারীখ 'আন ইবরাহীম 'আলায়হিস-সালাম, রিয়াদ ১৪০৬/ ১৯৮৬ সাল।

মুবারাকপুরী ঃ আল-, সাফিয়্যুর-রাহমান, আর-রাহীকুল মাখতূম, জেদ্দা ১৪১৪/১৯৯০ সাল।

মুনজ্জিদ ঃ আল-,সালাহুদ-দীন, মু'জামু মা উল্লিফা 'আন রাসূলিল্লাহ ﷺ, বৈরূত ১৯৮২ খৃ.।

নাজ্জার ঃ আল-, ড. মুহাম্মাদ তায়্যিব, আল-কাওলুল মুবীন ফী সীরাতি সায়্যিদিল-মুরসালীন ফী দাও'ইল-কুরআনিল-কারীম ওয়াস-সুন্নাতিন-নাবাবিয়্যা, রিয়াদ ১৪০১/ ১৯৮১ সাল।

কাল'আজী ঃ ড. মুহাম্মাদ রাওওয়াস, আত-তাফসীরুস-সিয়াসী লিস-সীরাত 'আলা দাওইল ইখতিসার ওয়া তারতীব তাহযীবুস-সীরা লি- ইব্ন হিশাম, ১ম মুদ্রণ, বৈরূত ১৩৯৯/ ১৯৭৯ সাল।

রিদা ঃ মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদুর-রাসূলুল্লাহ ﷺ, বৈরূত ১৩৯৫/ ১৯৭৫ সাল।

সাবূনী, ঃ আল-, মুহাম্মাদ 'আলী, আন-নবুওয়া ওয়াল-আম্বিয়া, ৪র্থ মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৯/ ১৯৮৯ সাল।

সা'উদী, আল-, ড. সুলায়মান ইব্ন 'আলী, আহাদীছুল-হিজরা, বার্মিংহাম ১৪১১/১৯৯০ সাল।

শালাবী ঃ ড. 'আবদুল জালীল, রাদ্দু মুফতারায়াতিল- মুবাশ্শিরীন 'আলাল-ইসলাম, ২য় মুদ্রণ, রিয়াদ ১৪০৬/ ১৯৮৫ ।

শাকরা ঃ মুহাম্মাদ ইবরাহীম, আস-সীরাতুন-নাবাবিয়্যা আল-'আতিরা ফিল-আয়াতিল কুরআনিয়্যাতিল মুসাত্তারা, ১ম মুদ্রণ, আম্মান ১৪০৮/ ১৯৮৭ সাল।

তাহ্তাবী ঃ আল-, মুহাম্মাদ 'ইয্যাত ইসমা'ঈল, মুহাম্মাদ নাবিয়্যুল ইসলাম ফিত-তাওরাত ওয়াল-ইনজীল ওয়াল-কুরআন, তা. বি. (১৯৭২?)।

'উমার ঃ 'আবদুল-মুন'ইম মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদ আল-মুসতাফা সাল্লাল্লাহু 'আলায়হি ওয়াসাল্লাম দিরাসাত মুসতামাদ্দা মিনাল-কুরআনিল কারীম 'আন বা'দি নাওয়াহিস-সীরাতিল মুহাম্মাদিয়্যা আল-'আতীরা, তা. বি.।

ওয়াহবা ঃ তাওফীক 'আলী, আল-ইসলাম ফী মুওয়াজিহাতি আ'দা'ইহি, ১ম মুদ্রণ, রিয়াদ ১৪০৩/ ১৯৮৩ সাল।

যাকযূক ঃ ড. মুহাম্মাদ হামদী, আল-ইসতিশরাক ওয়াল-খালফিয়্যাতুল-ফিকরিয়্যা লিস-সীরাতিল- হাদারী, ২য় মুদ্রণ, বৈরূত ১৪০৫/ ১৯৮৫ সাল।

— (অনু.) সীরাতুর-রাসূল ফী তাসাওউরাতিল- গারবিয়্যীন লিল মুসতাশরিকিল-আল-মানী Gustav Pfan-Muller, বাহরায়ন ১৯৬৮ খৃ.।

যায়নুল-'আবিদীন ঃ মুহাম্মাদ সারওয়ার ইব্ন, দিরাসাত ফিস-সীরাতিন-নাবাবিয়্যা, ২য় মুদ্রণ, বার্মিংহাম ১৪০৮/ ১৯৮৮ সাল।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সূত্রসমূহ

২ ঃ বিভিন্ন ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী

(ABBOTT : নাবীয়া, আইশা– The Beloved of Mohammed, শিকাগো ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৪২, পুনর্মুদ্রণ ১৯৮৫ খৃ.।

'আবদুল খালেক ঃ সাইয়েদুল মুরসালীন (বাংলা সংস্করণ), ১ম খণ্ড, ঢাকা ১৯৮৪ খৃ.।

আহ্মাদ ঃ ফযল মুহাম্মাদ, The Holy Prophet, লাহোর ১৯৬০ খৃ.।

আহমাদ ঃ খুরশিদ ও আনাস, (সম্পা.) The Prophet of Islam, করাচী ১৯৬৬ খৃ.।

আযীযোলা ঃ আলহাজ এ. ডি., The Myth of the Cross, রিয়াদ ১৯৮৪ খৃ.।

ALEXANDER : GRANT, The story of the Ka'ba, The MoslemWorld, 1938, PP. 43-53.

আলী ঃ চেরাগ, A Critical Exposition of the Popular Jihad, কলিকাতা ১৮৮৮ খৃ.।

আলী ঃ মুহাম্মাদ, Muhammad and Christ, মাদ্রাজ ১৯২১ খৃ.।

— Muhammad the Prophet, লাহোর ১৯২৪ খৃ.।

— The Living Thoughts of Mahammad, লন্ডন ১৯৪৭ খৃ.।

আলী ঃ পারভীন শওকাত, The Prophet as theWorld's Greatest Lawgiver, লাহোর ১৯৭৬ খৃ.।

আলী ঃ সায়্যিদ আমীর, The Spirit of Islam, লন্ডন ১৮৯১ খৃ., পুনর্মুদ্রণ, দিল্লী ১৯৭৮ খৃ.।

আল-সদর ঃ আয়াতুল্লাহ মুহাম্মাদ বাকির, He His Messenger & His Message, Islamic Seminary, পাকিস্তান ১৯৮০ খৃ.।

ANDRAE : TOR, Mohammed the Man and His Faith (অনু. Theophil Menzel), New Hampshire ১৯৭১ খৃ.।

— "Muhammad's doctrine of Revelation", The Moslem World, ১৯৩৩ খৃ., পৃ. ২৫২-২৭১।

আনীস ঃ মুনাওওয়ার আহমাদ ও আতহার, আলিয়া এন., Guide to Sira and Hadith Literature in Western Languages, লন্ডন/নিউইয়র্ক ১৯৮৬ খৃ.।

আরাফাত ঃ ডাব্লিউ., Review of W.M. Watt's Muhammad at Mecca, The Islamic Quarterly (লন্ডন), ১ম খণ্ড, নং ৩, ১৯৫৪ খৃ., পৃ. ১৮২-১৮৪।

ARMSTRONG : KAREN, Muhammad A Western Attempt to Understand Islam, লন্ডন ১৯৯১ খৃ.।

আ'জামী ঃ মুসতাফা মুহাম্মাদ, Studies in Early Hadith Leterature, Indianapolis ১৯৭৮ খৃ.।

—Studies in Hadith Methodology and Literature, Indian polis 1977.

—On Schacht's Origins of Muhammadan Juris prudence, Riyadh 1988.

— কুত্তাবুন- নাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম (আরবী পাঠ), বৈরূত ১৩৯৪ হি.।

'আযযাম ঃ 'আবদুর রহমান, The Life of Prophet Muhammad, Leicester 1981.

—The Enternal Message of Muhammad, NewYork 1964, reprinted 1984.

BALAYUZI : H. M., Muhammad and the Course of Islam, Oxford 1976.

বাশীর ঃ যাকারিয়্যা, The Makkan Crucible, Leicester 1978.

—Sunshine at Medinah, Leicester 1990.

— Hijra Story and Significance, Leicester 1983.

BATE : J. D., AN Examination of the Claims of Ishmael as viewed by the Muhammadans, Reprinted Benares 1984.

BEESTON : A.F.L. and others (ed.), The Cambridge History of Arabic Literature to the end of the Umayyad Period, Cambridge 1983.

BELL : RICHARD, The Origin of Islam in its Christian Environment, Edinburgh 1926, reprinted, London 1968.

— The Quran Translated with a critical rearrangement of the Surahs, 2 vols., Edinburgh, 1937-39.

— Introduction to the Quran, Edinburgh 1953.

—"Who were the Hanifs?" The MoslemWorld, 1930, PP. 120—124.

— "The Origin of the Id al-Adha", ibid, 1933, PP. 117-120.

— " Mohammed's Call", Ibid, 1934, PP. 13-19.

— "Muhammad's Visions", Ibid., PP. 145-154.

— "Muhammad and previous Messengers", ibid, PP. 330-40.

—The Men of A'raf, ibid, 1932, P 43-48.

— Muhammad & Divorce in the Quran, Ibid, 1939, PP 55-56.

— "The Beginning of Muhammad's Religious Activity," Transactions of the Glasgow University Oriental Society, vol. viii, PP. 16-24.

— "The Sacrifice of Ishmael", ibid, vol. x, PP. 29-31.

— "The Style of the Quran," ibid, vol. xi, PP. 9-15.

BEY : ESSAD, Muhammed, 1938, reprinted, London 1985.

BEY : HILMY OMAR, "Some considerations with regard to the Hanif Questions," The MoslemWorld 1932, PP. 72-75.

BIJLEFELD : WILLEM ABRAHAM, A Prophet and More than a Prophet? Some observations on the Quranic use of the words 'Prophet' and apostle, The MoslemWorld, 1969, PP. 1-28.

BIRKELAND : HARRIS, The Lord Guideth, Studies on Primitive Islam, Oslo 1956.

— "The Interpretation of Surah 107", Studia Islamica, vol. IX, 1958, PP. 13-30.

BODLEY : R. V. C., The Messenger The Life of Mohammed, 1946, reprinted Connecticut 1969.

BOSWORTH : SMITH, R., Mohammed and Mohammedanism, London 1889.

BOULAINVILLIERS : COUNT OF, The Life of Mahomet 1731, reprinted, London 1983.

BRAVMAN, M. V., The Spiritual Background of Early Islam : Studies in Ancient Arab Concepts, Leiden 1972.

BUCAILLE : MAURICE, The Bible, The Quran and Science, Paris 1977.

— What is the Origin of Man? The Answers of Science and the Holy Scriptures, Paris 1988.

BURTON : J., "Those are the High-Flying Cranes," Journal of Semitic Studies," vol. xv, No. 2, PP. 246-265.

— The Collection of the Quran. Cambridge University Press, Paperback edition 1979.

BURY, : J.B. (ed.)-, The Cambridge Medieval History, vol. 11, 1926.

CALVERLEY : EDWINE., "Sources of The Koran," The MoslemWorld, 1932, PP. 64-68.

— Mohammed, Seal of the prophets?" ibid, 1936, PP. 79-82.

CARLYLE : THOMAS, On Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History (Lecture I1), London, 1841.

COOKE : FRANCIS T. "Ibn al-Qayyim's Kitab al-Ruh," The MoslemWorld 1935, PP. 129-144.

COOKE : MICHAEL, Muhammad (Past Master Series), Oxford University Press 1983.

—Early Muslim Dogma, A Source Critical Study, Cambridge University Press 1981.

CRONE : PATRICIA, Meccan Trade and the Rise of Islam, Oxford 1987.

DANIEL : NORMAN, Islam and Europe, Edinburgh 1966.

DAVENPORT : JOHN, An Apology for Mohammed and the Koran, London 1966.

DERMENGHAM : EMILE (tr. by Arabella Yorke), The Life of Mahomet, London 1930.

— Muhammad and the Islamic Tradition (tr. from the Frence by Jean M. Watt), London 1958.

DINET : E. & IBRAHIM, SLIMAN BEN, The Life of Mohammad The Prophet of Allah, Delhi, n.d.

DURI : A. A., "Al-Zuhri, Study on the Beginnings of History Writing in Islam", B. S. O. A. S., vol. 19 (1957), PP. 1-12.

FUCK : JOHANN, Muhammad ibn Ishaq, Frankfort-am-Main 1925.

FINKEL : JOSHUA, "Old Israelitish Tradition in the Koran", The MoslemWorld, 1932, PP. 169-183.

FOSTER : H.F.,"An autobiography of Mohammed," The MoslemWorld, 1936, PP. 130-152.

FREEMAN GRENVELLE : G.S.P.,The Muslim Christian Calendar, second edn., London 1977.

GAUBA : K.L., The Prophet of the Desert, Delhi 1981.

GHAZI : MAHMOOD AHMAD : The Hijrah, its philosophy and message for the modern man, Lahore 1981.

GIBB : H.A.R., Mohammedanism, An Historical Survey, London 1953.

GLUBB : JOHN BAGOT (Glubb Pasha), The Life of Muhammed, London 1970.

GOLDZIHER : IGNAZ, Muhammedanische Studien (Halle 1889-1890), 2 vols., tr. into English under the Title Muslim Studies, 2 vols., London. 1967-1971.

GRIFFITH : SIDNEY H., "The Prophet Muhammad His Scripture and His Messege according to the Christian apologies in Arabic and Syriac from the first Abbasid century", in La Vie Du Prophete Mahomet, Calloque de stassbourg, Paris 1983, PP. 99-146.

GRIMME : HUBERT, Mohammed, Munster 1892.

GUILLAUME : ALFRED, Islam, Penguin Books Ltd., 1954.

—The Life of Muhammad A Translation of Ibn Ishaq's Sirat Rasul Allah, O.U.P, Pakistan 1978.

—New Light on the Life of Muhammad, Manchester 1960.

— The Traditions of Islam : An Introduction to the Study of Hadith Literature, Oxford 1924.

— "The biography of the Prophet in recent research" The Islamic Quarterly, London, vol. 1, No. 1, 1954, PP. 5-11.

GULICK : ROBERT, Mahammad, The Educator, Lahore 1961.

HAKIM : KHALIFA ABDUL, The Prophet and His Message, Lahore 1974.

HAMIDULLAH : MUHAMMAD, Muhammad Rasulullah, Hyderabad, Deccan 1972.

—Le Prophete de l'Islam, 2 vols., Paris 1959/1378.

— "Review of R. Bell's Introduction to the Quran, The Islamic Calture, London, vol. 1, 1954, PP. 239-243.

— Review of Kenneth Cragg's The Call of the Minaret. ibid, vol. iii, No 4, 1956, PP. 245-249.

HAYKAL : MUHAMMAD HUSAYN, The Life of Muhammad (tr. Ismail R. Al-Faruqi), North American Trust Publications 1976.

HILLIARD : F.H., The Buddha the Prophet and the Christ, London 1956.

HITTI : PHILIP K., History of the Arabs, 10th edn., 11th print, London 1986.

HODGES : RICHARD & AHITEHOUSE, DAVID, Mohammed Charlemagne and the Origins of Europe, reprinted, London 1983.

HOROVITZ : JOSEPH, "The Earliest Biographies of the Prophet and their authors" (tr. from the German), The Islamic Culture, Hyderabad, Deccan, vol. 1, 1927, PP. 535-559, vol. 11, PP. 22-50, vol. 111, PP. 164-182 and vol. iv, PP. 495-525.

HUSSAIN : ASAF AND Others সম্পা., Orientalism, Islam and Islamists, Brattleboro 1984.

IRVING : WASHINGTON, Mahomet and his Successors, 2 vols. (first published 1849), reprinted, London 1985.

JEFFERY : ARTHUR, Islam : Muhammad and His Religion, New York 1958.

— "The Quran as Scripture" The Moslem World, vol. 40 (1950), PP. 41-55; 106-134; 184-206 and 257-275.

JOHNSTONE : P. DELACY, Muhammad and His Power, Edinburgh 1901.

JURJI : EDWARD J. , "Khadijah, "Mohammed's First Wife", The Moslem World, 1936, PP. 197-199.

— Pre-Islamic use of the name Muhammad," ibid, P.P. 389-391.

KAMAL-UD-DIN : KHWAJA; The Ideal Prophet (First Published in 1925), reprinted, London 1986.

KARAMI : HASAN. Review of Alfred Guillaume's Islam, The Islamic Quarterly, vol. 11, No. 1, 1955, PP. 60-65.

KARIM : FAZLUL, The Ideal Prophet, Dacca 1955.

KHALIFA : MUHAMMAD, The Sublime Quran and Orientalism, London & New York 1983.

KHAN, MAJID ALI, Muhammad the Final Messenger, Delhi 1980.

KHAN : MUHAMMAD AKRAM, মুসতাফা চরিত (বাংলা পাঠ, ১ম প্রকাশ ১৯৩৬ খৃ.), পুনর্মুদ্রণ ৪র্থ সংস্করণ, ঢাকা ১৯৭৫ খৃ.।

KHAN : MUHAMMAD ZAFRULLAH, Muhammad the Seal of the Prophets, London 1982.

KHAN : SYED AHMAD, BAHADUR, A Series of Essays on the Life of Mohammad and Subjects Subsidiary thereto, first published, London 1870, reprinted, Lahore 1968.

KHATTAK : MUSTAFA K. (ed.), Islam, the Holy Prophet and Non-Muslim World, Lahore 1976.

KIRMANI : ZIAUDDIN, The Last Messenger with a Lasting Message, Delhi 1983.

KISTER : M. J., Studies in Jahiliyya and Early Islam, London 1980.

LAMMENS : H., Islam Beliefs and Institutions (tr. from the French by Sir E. Denison Ross), London 1929.

LA VIE DU PROPHETE MAHOMET : Colloque de Strassbourg (October 1980), Paris 1983.

LINGS : MARTIN, Muhammad His Life based on the Earliest Sources, London 1988.

MACDONALD : DUNCAN B., "Theodore Noldeke and Edward Sachau," The Moslem World, 1931, PP. 221-222.

— The Development of the Idea of Spirit in Islam," ibid, 1932, PP. 25-43, 153-168.

মালিক ঃ ফিদা হুসায়ন, Wives of the prophet, New Delhi 1985.

মানসূরপূরী ঃ কাদী মুহাম্মাদ সুলায়মান, সালমান, রহমাতুল লিল-'আলামীন (উর্দূ), তিন অংশ একত্রে এক খণ্ডে বাঁধাইকৃত, দিল্লী ১৪৯১/১৯৮০।

MARGOLIOUTH : DAVID SAMUEL, Mohammed and the Rise of Islam, Third edn, London 1905 (Reprinted with introduction by Ram Swarup, London 1985).

— Relations between Arabs and Israelites prior to the Rise of Islam, Oxford University Press 1924.

— Mohammed, London 1939.

— The Early Development of Mohammedanism (Lectures delivered in the University of London, 1913), London 1914.

— "Is Islam a Christian Heresy?" The Moslem World, 1933, PP. 6-15.

— "The Relics of Prophet Mohammed," ibid, 1937, PP. 20-27.

আল- মাওদূদী ঃ সায়্যিদ আবুল 'আলা, সীরাতে সারওয়ারে 'আলাম (উর্দূ), ২ খণ্ড, লাহোর ১৩৯৮/ ১৯৭৮।

MOHY-UD-DIN : DR. ATA, The Arabian Prophet, Lahore 1983.

MUIR : (SIR) WILLIAM, The Life of Mahomet and History of Islam, to The era of the Hegira.With Introductory Chapters on the Original Sources for the Biography of Mahomet and on the pre-Islamic History of Arabia, 4 vol, London 1858-1861 (Reprinted London 1988).

— The Life of Mahomet from the Original Sources, Third Edition, London 1894 (New and revised edition by T. H. Weir, Edinburgh 1923)

— Mahomet and Islam, London 1895.

— The Mahomedan Cotroversy, Edinburgh 1897.

— The Qurnan : Its Composition and Teaching and the Testimony it bears to the Holy Scriptures, London 1897.

— The Caliphate : Its Rise, Decline and Fall, London 1901 (Re-Printed, London 1984).

MUTAHHARI : AYATULLAH MURTADA, The Ummi Prophet, Tehran n. d.

নাদবী ঃ সায়্যিদ আবুল হাসান আলী, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ (অনু. মুহিউদ্দীন আহমাদ), লক্ষ্নৌ ১৯৭৯ খৃ.।

নাদবী ঃ সায়্যিদ সুলায়মান, সীরাতুন-নাবী (উর্দূ), ৭ খণ্ড, ৪র্থ মুদ্রণ, আজমগড় ১৯৬৮ খৃ.।

— আরদুল কুরআন (উর্দূ), ২ খণ্ড, আজমগড়, ৪র্থ সংস্করণ তা. বি.।

নাসর ঃ সায়্যিদ হুসায়ন, Mohammad Man of Allah, Northern Irlenad 1988.

NICHOLSON : R.A, A Literary History of the Arabs, Cambridge (first peinted 1907), reprinted Cambridge 1988.

NJOZI : HAMZA MUSTAFA, The Sources of the Quran A Critical Review of the Authorship theory, Riyadh 1991.

নু'মানী ঃ আল্লামা শিবলী, সীরাতুন্নবী, ইংরেজী অনু. M. T. B. BADAYUNI, ২ খণ্ড, লাহোর ১৯৮১ খৃ.।

"ORIENTALIST : "The Moslem Doctrine of Revelation and Islamic Propagenda", The Moslem World 1935, pp. 67-72.

রহীম ঃ এ,. এ. , Mohammad in Prophecy & in Fact, Tripoli 1975.

রাহমান ঃ আফযালুর (সম্পা.), Mohammad Encyclopaedia of Seerah, 7 vol., London 1981-1989.

ROBSON : JAMES, An Introduction to the Science of Tradition, Being আল-মাদখাল ইলা মা'রফতিল-ইকলাল, আল-হাকিম আন-নায়সাবুরী কৃত, একটি ভূমিকা, অনুবাদ ও টীকাসহ সম্পা., ১৯৫৩ খৃ.।

RODINSON : MAXIME, Mohammed (tr. from the French by Anne Carter), Penguin Books 1985.

— "A Critical Survey of Modern Studies on Muhammad" in Studies in Islam (ed. Marlin Swartz), Oxford University Press. 1981, PP. 23-85.

ROSENTHAL : FRANZ, A History Of Muslim Historiography, Second edn, Leiden 1968.

SAID : ADWARD W., Orientalism, first published 1978, reprint, Penguin 1987.

সারওয়ার ঃ হাফিজ গুলাম, Muhammad the Holy prophet, Lahore 1964.

SCHACHT : J., Origins of Muhammadan Jurisprudence, O.U.P., 1952.

SELL : REV. CANON, The Life of Muhammad, London 1913.

সিদ্দীকী ঃ মুহাম্মাদ যুবায়র, Hadith Literature, It's Origin, Development, Special Features and Criticism, Calcutta University 1961.

SMITH : REGINALD BOSWORTH, Mohammed and Mohammedanism, London 1874, reprinted, London 1986.

SPRENGER : ALOYS, Life of Mohammad from Original Sources, Allahabad 1851.

— Das Leben Und Die Lehre Des Mohammed, 3 vols. Berlin 1861-1865.

— "Foreign Words Occurring in the Qoran", Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1852, PP. 109-114.

STUBBE : HENRY, An Account of the Rise and progress of Mahometanism with the Life of Mahomet And a Vindication of him and his Religion from the Calumnies of the Christians, ed. with an Introduction by Hafiz, Khan, Shirwani, London 1911.

TIBAWI : A.L., English-Speaking Orientalists— A Critique of their Approach to Islam and Arab Nationalism, London 1964.

— Arabic and Islamic Themes : Historical, Educational and Literary Studies, London 1976.

— Review of W. Montgomery Watt's, Muhammad Prophet and Statesman, in the Islamic Quarterly, vol. VI, Nos. 1—2, 1961, PP. 127-128.

— "Ibn Ishaq's Sira, A Critique of Guillaume's English Translation", Islamic Quarterly, vol. III, 1956, PP. 196-214.

TORREY : C.C., The Commercial-Theological Terms of The Koran, Leiden 1892.

— The Jewish Foundation of Islam, New York 1933.

TURNER : BRYAN, Marx and the End of Orienlatism, London 1978.

VAHIDUDDIN : S., "Richard Bell's Study of the Quran : (A Critical Analysis)", The Islamic Calture, vol. xxx, 1956, PP. 263-272.

VIDYARTHI : A. H., & ALI, U., Muhammad in Parsi, Hindoo and Buddhist Scriptures, New Delhi 1983.

ওয়াহাব ঃ সায়্যিদ আবদুল, The Shadowless prophet of Islam, Lahore 1962.

WARREN : RUTH, Muhammad, Prophet of Islam, New York 1965.

WATT : W. MONTGOMERY, Mahammad at Mecca, First published 1953, reprinted, Oxford: Clarendon Press 1960.

—Muhammad at Medina, Oxford: Clarendon Press 1966.

— Muhammad Prophet and Statesman, Oxford University Press 1961.

— Islamic Revelation in the Modern World, Edinburgh University Press 1969.

— Muhammad's Mecca, Edinburgh University Press, 1988.

— Bell's Introduction to the Quran (Revised and edited), Edinburgh University Press 1970, reprinted 1990.

— Islam and Christianity, London 1983.

— "Economic and Social aspects of the origins of Islam", The Islamic Quarterly, vol. 11, No 2, July 1984, PP. 90-103.

— "The reliability of Ibn Ishaq's sourec" in La Vie Du Prophet Mahomet Colloque de Strassbourg, Paris 1983, PP. 33-43.

— "Thoughts on Muslim Christian Dialogue", in Hamdard Islamicus, vol. 1, No. 1, Karachi 1978, PP. 1-52.

— "The Dating of the Quran: A Review of Richard Bell's theories, J. R. A. S., 1957, PP. 46-56.

— "The Early Development the Muslim Attitude to the BIble", T. G. U.O. S., XVI (1957), PP. 50-62.

WESSELS : ANTONIE, A Modern Arabic Biography of Muhammad Husayn Haykal's Hayat Muhammad, Leiden 1972.

WIDEN GREN : GEORGE, Muhammad, The Apostle of God, and His Ascension, Upsala 1955.

ZWEMER : S. M., Islam, a Challenge to faith, Second rev. edn., New York 1907.

অনুবাদ ঃ ড. আবদুল জলীল

ইসলামী বিশ্বকোষ বিভাগ/১০/নসাজীবি/মুদ্রণ/১/৯৬(উ)/৩২৫০